চাতিম চাতিম

শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ

পণ্ডিত জোয়াহির লালজী আর যাই হোন তিনি স্পষ্টবাদী। নিজের সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, তার ভাষ্য হচ্ছে এই যে, "আমি একটু দামাল প্রকৃতির; যেখানে অন্য ঘড়িবাজ মানুষ সমঝে চলে, ঝোপ বুঝে কোপটি মারে এবং সুসময়ের প্রতীক্ষায় ঘাপটি মেরে থাকে, সেখানে আমি ডাইনে বাঁয়ে না চেয়ে ছুটে চলি।" পণ্ডিতজীর বিনয় প্রসংশার্হ, কিন্তু লম্ফ দেওয়া এবং ছুটে চলার বাতিক আমাদের জাতির নেতাদের স্বধর্ম। কংগ্রেস যখন মহাত্মাজীর তাড়নায় এক বছরে স্বরাজের খোলাপথ (খিলাফৎ) আবিষ্কার করেছিল, তখন আমরা সুনিশ্চিত খানাকে লক্ষ্য করে যে রকম বেগে ছুটেছিলাম তার মাঝে পরিণাম চিন্তা বলে কোন বস্তুই ছিল না।

* * *

বর্তমানকে বেমালুম উড়িয়ে দিয়ে একটা সুদূর রাজনৈতিক কল্পরাজ্যকে তেগে লম্ফ ঝম্ফ ও ক্রোধ মানেই তো ভারতের রাজনীতি। আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা এই মুহূর্তে বা দু' দশ দিনের মাঝে পাব না, একথা ভাবা বা বলা আমাদের কল্পরসিক বেদে এত বড় মহাপাপ, যে, তার প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না সন্দেহ। যে একথা বলে বা ভাবে তার হুঁকা নাপিত তখনই বন্ধ হয়, কংগ্রেস পংক্তিতে পাত পেতে সুখি ভোজন তার [illegible] 'বাপরে [illegible]' [illegible]

হয়ে যায়। পণ্ডিতজী তাঁর খেয়ালকে 'ভ্যাগারিজ' নাম দিয়েছেন। ১৯০৬ সাল থেকে আজ ত্রিশ বছর ধরে নেশানল পার্টির নেতারা হরেক রকম ভ্যাগারিজই চালিয়ে এসেছেন। একটি ভ্যাগারী অপঘাতে মরেছে, তার জায়গায় দশটি নূতন ভ্যাগারিজ জন্মেছে। আমরা চলেছি অন্ধকার হতে আলোকে নয়, অসত্য হতে সত্যে নয় কিন্তু খেয়াল থেকে খেয়ালে, ষ্টান্ট থেকে ষ্টান্ট-এ, চাল থেকে চালে, পোজ থেকে পোজে।

* * *

আমাদের খেয়াল দেখা হচ্ছে স্বভাব ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে অর্দ্ধেক রাজ্য ও রাং কন্যার খোয়াল রসান স্বপ্ন দেখার গোট আমাদের পেয়ে বসেছে। শঙ্করাচার্য ঠাকুরের মতে বাস্তবটা যখন স্রেফ "ক তব কান্তা" মার্কা মায়া, তখন বর্তমানটা তাই। ডে-টু-ডে পলিটিক্স — জাতির নি: নৈমিত্তিক তৈল তণ্ডুল বস্ত্র ইন্ধন চি ওটাও তা' হলে মনের স্রেফ বা খরচ। ও রকম কাঠ খোট্টা তত্ত্ব ব্যাপারে সুখ ন বিস্তর হয়রাণি আছে; কল্পনার খো ওখানে চলে না, চলে কঠিন অঙ্ক শা কিন্তু বর্তমান এবং নিকট ভবিষ্য ডিঙ্গিয়ে দশ বিশ পঞ্চাশ বছর পরে খেয়াল আরব্য উপন্যাসের রঙ ইন্দ্রধনু আঁকছে, তাতে আছে আয়েস ও হাততালি। ঝঞ্ঝাট হয়রাণি তাতে আদৌ নেই, কারণ ফল হাতে হাতে দেখাতে হয় না, কাল অন্তে তার "নয় পুত্র নয় গর্ভপাত" একটা কিছু হবেই।

* * *

বড়লাট লিনলিথগো, [illegible]

গোমাতার চাষ ও সংস্কার সম্বন্ধে লম্বা চৌড়া বিবৃতি দিয়েছেন। মানুষের সাম্যবাদী আবাদ করতেই আমরা ব্যস্ত, পূর্ণ স্বরাজের খোয়াবে আমরা মসগুল, ষাঁড় এবং গোমাতার দিকে নজর দেবার আমাদের অবসর কই? আমাদের দুধের বাছারা পেটমোড়া পিলে নিয়ে কে সি বোসের আর রবিন্সনের বার্লি খেয়েই মানুষ; তাদের মধ্যে যারা তাতে নারাজ তারা শত্রুপাঠ পাততাড়ি গুটোয়, মা বেটিরা কেঁদেকেঁদে আবার যথাশাস্ত্র ঠাণ্ডা হয়। গরুরচাষে খাঁটি দুধ থাকতে পারে, নেশানলী গ্ল্যাস কই?

*

কাজেই আনন্দবাজারের অফিস থেকে আনন্দভবন অবধি, কলিকাতা থেকে এলাহাবাদ অবধি ও কুমারিকা থেকে হিমাচল অবধি একটা বিরাট ব্যাপক জাতীয় এবং নেশনলী হাস্ত লাট সাহেবের বগুকে নস্যাৎ করে খেলে গেছে। দেশ যদি উদ্ধারই হয় তা' হলে আমার দ্বারাই হোক, গঠন যদি করতেই হয় তবে সে গঠনকে জাতে তুলতে চাই দল বিশেষের ছাপ ও অনুমোদন। চাঁদার থলে থেকে উদ্ভূত পল্লীগঠন তো অনেক দেখা গেছে সাম্যের বিধানে কবে যে চাষার কুঁজ পৃষ্ঠে ধানের পর্ব্বত নামবে তা' অনুমান করে ওঠা যাচ্ছে না। সরকার বাহাদুর ও কংগ্রেস, লর্ড লিনলিথগো ও মহাত্মাজীতে প্রতিযোগীতার ফলে গরীব চাষা ভুখা ও পল্লীবাসীদের অদৃষ্ট যা' যৎকিঞ্চিৎ জেবে ভাই পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা বলে আমরা শিরোধার্য্য করবো। কম্পিটিশন্ না থাকলে তো কর্তারা জিহ্বা ছাড়া হাত পা নাড়বেন না। এবং কম্পিটিশন হবেই, কারণ রাজা ও নেতা দুজনকেই রাজত্ব চালাতে হবে।

আইনের খোঁচায়—দেশজোড়া প্রতিষ্ঠানের বলে এই সব গঠনমূলক সমস্যার সমাধান করতে হবে। তার জন্যে চাই রাজদণ্ড, রাজবিধি, রাজ অনুশাসন, রাজ ব্যবস্থা। সুতরাং রাষ্ট্র চক্রকে করতে হবে আয়ত্ত ও অধিকার,—গঠনের মন নিয়ে, ভাঙনের নয়। যে অস্ত্রকে ব্যবহার করবো জাতির কল্যাণে, যে অস্ত্রে শান দিয়ে দিয়ে তাকে উপযুক্ততর করবো সমস্যার সমাধানের জন্য, সেই অস্ত্রকে গ্রহণ করেই যে অব বেঙ্গলের জলে নিক্ষেপ করবার ভূয়া হুমকী ও পন্থা যাঁরা বাৎলান, তাঁরা লীডারী বজায় রাখতেই গলদঘর্ম, কাজ তাঁদের লক্ষ্য নয়। নহিলে ধ্রুবকে ত্যাগ করে অধ্রুবের সেবা করার অশাস্ত্রীয় প্রবৃত্তি তাঁদের এমন বৎসরের পর বৎসর জের কেটে চলতো না। দেশ সেবা মানেই খানিকটা ক্রোধ, প্রচুর লম্ফ ঝম্প ও কোন প্রকার টাগ অব ওয়ার—এই হয়ে গেছে লীডারদের ধারণা। ইংরাজ যদি কোন দিন বিবাগী হয়ে মায় লাগেজ ও ব্যাগেজ ইংলণ্ডাভিমুখে জাহাজ ছেড়ে যাত্রা করে, তা' হলে দেশের সেবা তখনই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবে। অথবা তোড়জোড় আয়োজন করে আমাদের ডেকে আনতে হবে বোঁচা নাক জাপানী বা বেওয়াড়োজী আফগানকে, যাতে পলিটিক্স ও দেশনদী দেশসেবা আমাদের বেঁচে থাকে।

পাঁচ মিশালী

রাসমণি বনাম নলিনীরঞ্জন সরকার মামলা আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া মিঃ এস কে, সেনের আদালতেই আসিয়াছে। যাহাতে উহা স্থানান্তরিত হয়, সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। প্রথমে আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তাহার পর খাস হাইকোর্ট—উভয় স্থানেই চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু কোথাও মামলা স্থানান্তরিত করিবার উপযুক্ত কারণ বিচারকরা দেখিতে পান নাই। তবে এবার নলিনীর পক্ষে আর মিঃ বরদা পি, পাইন হাজির না হইয়া মিঃ বি, সি, চাটার্জ্জি দাঁড়াইয়াছেন। ভাওয়ালের মামলা শেষ হইয়াছে, এখন তিনি এই মামলায় মসগুল হইয়াছেন। যে মিঃ বি, এম, চাটার্জ্জি এই মামলায় সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহার সহিত মিঃ বি সির কি কোন সম্বন্ধ আছে? যদি থাকে, তবে সম্বন্ধটা কি তাহা আমরা জানিতে পারি কি?

—:*:—

নলিনী সরকারের মামলার মত নলিনী পণ্ডিতের মামলাও চলিতেছে। নলিনী পণ্ডিত দ্বিতীয় পক্ষে যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন, তিনি আদালতে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। আর সাক্ষ্য দিয়াছেন, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা। নরেনবাবুর সঙ্গে নলিনী পণ্ডিতের সম্বন্ধ কি তাহা লইয়াই নরেনবাবুর আদালতে উপস্থিতি। পাঠকগণ ইহাতে আর কিছু ভাবিবেন না। মনোরমা বলিয়াছিলেন, নলিনী পণ্ডিত নরেন্দ্রনাথের কাছে চাকুরী করেন এবং চাকরীতে যেমন তিনি বোনাই পাইয়া থাকেন। সেই কথা সত্য কিনা তাহা প্রমাণের জন্যই নরেনবাবুকে সাক্ষ্য মানা হইয়াছিল। চাকরীটা কি অথবা নরেন বাবুর সঙ্গে নলিনীর সম্বন্ধ কি তাহা কিন্তু কাহারও কথায় ঠিক প্রকাশ পায় নাই। সে যাহাই হউক, নলিনী পণ্ডিত যে এখনও নরেনবাবুর অনুগত তাহা আদালতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। নরেনবাবুকে আদালতে হাজির হইতে হইয়াছিল, ইহা তিনি অবশ্যই কর্ম্মফল বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

—:*:—

দেখিতেছি, কলিকাতা সহরে পেট্রোল ও তেল লইয়া ষাঁড়ের লড়াই সুরু হইল। এখন বলিতে গেলে বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী একচেটিয়া কারবার করিতেছে। মধ্যে অন্য যেসব কোম্পানী বাজারে আসিয়াছিল, তাহাদিগকে আর স্থায়ী হইতে হয় নাই। এবার বোম্বাইয়ের এক কোম্পানী রুষিয়া হইতে তেল আমদানি করিয়া তাহাই সস্তা দরে বিক্রয় করিবে বলিয়া আশা দিতেছে। তেল রুষিয়ার, বিক্রেতা বোম্বাইওয়ালা। কিন্তু আমাদের আশুতোষ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র সরাসরি ফতোয়া দিয়াছেন, বোম্বাই যখন ভারতবর্ষের সীমার বাহিরে নয়, তখন এ দেশের লোকের পক্ষে এই কোম্পানীর তেল কেনাই কর্ত্তব্য। কেন ব্রহ্মও ত' এখনও ভারতবর্ষের মধ্যে আছে? সুতরাং স্বদেশী বলিয়া বোম্বাইয়ের রুষিয়ার তেল বিক্রেতারা আমাদের কাছে কোনরূপ আদর পাইবার অধিকারী নহে। তবে এই ব্যাপার লইয়া যদি বাঙলার আচার্য্য "দেবে"র সঙ্গে বোম্বাইওয়ালাদের প্রেম হইয়া যায়, সে স্বতন্ত্র কথা। আশা করি, শুভ যোগাযোগ পেট্রোল

বোম্বাইয়ে ফিরিয়া যাইয়া বলিবেন, বোম্বাইওয়ালাদের সকলেরই বেঙ্গল কেমিক্যালের ঔষধ প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে সেবন করা কর্ত্তব্য।

—:*:—

বিলাতে স্যর ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রের কার্য্যকাল শেষ হইল। সে দিন এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার শেষ গাহনা গাহিলেন। এইবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিবেন এবং ফিরিয়া তিনি কি করেন, তাহাই দেখিবার বিষয়। এক সময় তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সরকারী চাকুরী হইতে অবসর লইয়া ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন। তখন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু পরিষদের স্বরাজীদলের লীডার ছিলেন। তিনি সে প্রস্তাবে বড় আমোল দেন নাই। ভূপেন্দ্র বাবুও বিলাতে চাকুরী পাইয়াছিলেন। তাহার পর ৫ বৎসর কাটিয়া গেল। এখনও কি ভূপেন্দ্র বাবুর সে ইচ্ছা আছে?

—:*:—

বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেট কতকগুলি বাসের মালিকের সমর্থন পাইয়াই মনে করেন, কলিকাতার বাসের ব্যাপার তাঁহারাই যেমন ইচ্ছা চালাইতে পারেন। সম্প্রতি দুইজন বাস চালককে অত্যধিক দ্রুতবেগে বাস চালানোর অভিযোগে দণ্ড দিবার সময় কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এই সিণ্ডিকেটের হাঁড়ি হাটের মধ্যে ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই সিণ্ডিকেটের কাজ যেভাবে পরিচালিত হয়, তাহাতে তাঁহাদের বিবরণে নির্ভর করা যায় না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইহার পরও কি পুলিশ এই সিণ্ডিকেটের কোনরূপ মাতব্বরী স্বীকার করিবেন? যদি ইহার কথারই নির্ভর করা না যায়, তবে এ সিণ্ডিকেট থাকে কেন? সিণ্ডিকেটের দ্বারা যে বাস চালকরা কোনরূপেই নিয়ন্ত্রিত হয় না, তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের ত মনে হয়, যে প্রতিষ্ঠানের কোন সার্থকতা নাই, তাহা থাকিবারও কোন কারণ দেখা যায় না।

—

বালাই নিয়ে মরি

বাতায়ন সম্পাদক অবিনাশ ঘোষালের 'তচনচ' করিবার ক্ষমতা অসাধারণ জানিতাম, কিন্তু তিনি যখন রুচির দোহাই পাড়েন, তখন না হাসিয়া আর পারা যায় না। তাঁহার এক বন্ধুর (!) বিরুদ্ধে প্রকাশিত কতকগুলি অভিযোগ অগ্রদূত হইতে উদ্ধৃত করিতে গিয়া ভণিতা করিয়াছেন, "বাতায়নের পাঠক পাঠিকাদের রুচি বিরুদ্ধ এই অভিযোগগুলি কর্ত্তব্যের খাতিরে বাতায়নে মুদ্রিত করার জন্যে আমরা যথার্থই লজ্জিত।" —মাইরি?

এই সম্পর্কে আমাদের একটা গল্প মনে পড়িয়া গেল। এক বালক তার মাতাকে শালী বলিয়া গালাগালি দিয়াছিল। মাতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে শাসন করিতে বলিলে সে ছোটভাইকে ধমক দিয়া বলে:—মা, গর্ভধারিণী, তারে কও শালী, শালীর পো?

'বাতায়নে'র দেখিতেছি সেই অবস্থা!

—

কিন্তু সে কথা যাউক, আজ শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর খেয়ালী ভাগিনের সম্বন্ধে কিছু বলিব। শরৎচন্দ্র যখন অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন শরৎচন্দ্রের নাম ভাঙ্গাইয়া ইনি অনেক কিছুই করিয়াছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র মুক্তিলাভ করিবার পর হইতেই কিন্তু ভাগিনের তাহার উপর বিরূপ হইয়াছেন। ইহা পাঠকগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন। শরৎ বাবু বোধ হয় শ্রীমানের আব্দার (অর্থাৎ করপোরেশন কাউন্সিলার হওয়া রূপ চাঁদে হাত দেওয়ার) গেবাস্থির মধ্যে আনেন নাই, তাই তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন।

শ্রীমান স্বার্থ ছাড়া এক পাও চলেন না। অবশ্য এখন মুরুব্বিদের দৌলতে মোটর হইয়াছে। কিন্তু যাহারা এই স্বার্থের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন, একে একে তাহাদের উপকারের উপযুক্ত প্রতিদান দিয়াছেন। তাই বলি, রসময় অসময়ই সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু এখনকার 'সুসময়' অসময়ে আবার পরিণত হইতে পারে না কি?

—

খেলার কথা

শ্রীসুধীর বসু
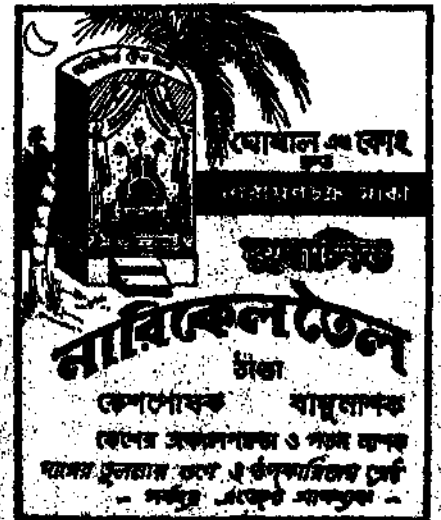
আহত সামাদ

রেফারিং যে কতটা খারাপ হচ্ছে সে সম্বন্ধে গত সপ্তাহে কিছু আলোচনা করেছি। এই রেফারিংয়ের দোষেই বর্ত্তমান বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় সামাদ আহত হয়ে এ বছরের মত খেলা বন্ধ করতে বাধ্য হলেন।

গত ১৬ই জুন ইষ্ট বেঙ্গল মাঠে হোম ক্লাব বনাম ই বি আর দলের খেলা হচ্ছিল। খেলার আরম্ভ হওয়ার মিনিট চার পরে রেল দলের তরু সেনগুপ্ত সামাদকে বল দেন। সামাদ স্পষ্ট অফ-সাইডে দাঁড়িয়েছিলেন, রেফারী কো তা দিলেন না। সামাদ বল ধরে দৌড়ালেন, পরেশ বাধা দিতে এল, তাকে কাটিয়ে সামাদ গোলের মধ্যে বল নিয়ে ঢোকেন আর কি। এমন সময় অসহায় পদ্ম ব্যানার্জ্জী উপায় না দেখে হঠাৎ 'ডাইভ' খেয়ে সামাদের পায়ের কাছে বলের ওপর পড়েন, সামাদের 'সিন বোন', তার দরুণ কি প্রকারে যেন ভেঙ্গে যায়। মাঠ হতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়, প্রাথমিক শুশ্রূষা করেন মোহনবাগান ক্লাব, তারপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

আন্তর্জ্জাতিক টীম?

এ বছরে এই টিম এই ভাবে নির্ব্বাচিত করা উচিৎ। যথা—

গোলে এম ব্যানার্জ্জী বা কে দত্ত, ব্যাকে সন্মথ দত্ত এবং হাফে মজুমদার বা পি দাস, হাফে বিমল মুখার্জ্জী, নূর মহম্মদ ও আবিদ আমেদ, ফরোয়ার্ডে ভুলাল, রহিম, রসিদ, কে ভট্টাচার্য্য ও আব্বাস। নির্ম্মল ঘোষ এ বছরে ভাল খেলতে পারছেন না সুতরাং তাকে বাদ দেওয়াই উচিৎ। ভুলাল অসুস্থতার জন্য একটু 'স্লো' হলেও তিনি এখনও শ্রেষ্ঠ লাইন।

৮ই জুন মোহনবাগান ও কাষ্টমসের রিটার্ণ ম্যাচ প্রথম খেলার ন্যায় পুনরায় ড্র হয়েছে। উভয় পক্ষেই একটী করে গোল হয়। এই গোল দিয়েছেন যথাক্রমে আদিত্য গাঙ্গুলী পেনালটী কিক্ করে এবং কাষ্টমস্ পক্ষে সিমান। মোহন-বাগান মোটের ওপর বিপক্ষ দলের চেয়ে ভাল খেলেছেন, সম্মথ দত্তের খেলা সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল।

ঐ দিনে ক্যালকাটা মাঠে রিটার্ণ ম্যাচে মহমেডান বনাম কালীঘাটের খেলায় শেষোক্ত ক্লাব ১ গোলে হেরেছেন। গোল দিয়েছেন রসিদ কালীঘাটের ব্যাক এস সিংহের দোষে।

এই তারিখে ব্লাক ওয়াচ সর্ব্বাংশে ভাল খেলে ডালহৌসিকে দুই গোলে পরাজিত করেছেন। প্রথম গোলটী ছাড়া বিজিত পক্ষের গোলরক্ষক ডেভিস যেরূপ খেলেছেন তা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

৯ই জুন নিজের মাঠে ইষ্ট বেঙ্গল ভাল খেলে এটাচড সেক্সানকে ৩-০ গোলে পরাজিত করেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ম্যাচেও ইষ্ট বেঙ্গল ৪-১ গোলে জয়লাভ করেছিলেন। এই দলে সেণ্টার হাফ-ব্যাকে মজিদ পুনরায় প্রশংসনীয় খেলা দেখিয়েছেন।

এই দিনে ক্যালকাটা ও পুলিসের খেলা গোলশূন্য ড্রতে পরিণত হয়েছে। শেষে যে টিম সেই পুলিস দল খুব ভাল খেলে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। ভাগ্য দোষে পুলিসদল জয়ী হতে পারল না, এদের প্রথম খেলায় ক্যালকাটা ১-০ গোলে জয়লাভ করেছিল, কিন্তু খেলেছিল ভাল পুলিশ দল।

১০ই জুন মহমেডান এরিয়ানকে ৪-১ গোলে হারিয়েছেন। এরিয়ানের এত গোলে হারা কোনমতেই উচিৎ হয় নি, এই ৪টী গোলের মধ্যে ৩টী গোলই এস ভট্টাচার্য্যের বাঁচান উচিৎ ছিল।

ঐ দিনে ই-বি আর ডালহৌসিকে ২-১ গোলে পরাজিত করেছেন। এই খেলায় সামাদ সব চেয়ে প্রশংসনীয় খেলা দেখিয়েছেন।

এই দিনে ব্লাক ওয়াচ কাষ্টমসকে ২-০ গোলে পরাজিত করেন। এই খেলায় কাষ্টমসের গোল রক্ষক জার্ডিন অসুস্থতার জন্য খেলতে নামেন নি, খেলেছিলেন গ্রীণ।

১১ই জুনের খেলায় কালীঘাট ৩-০ গোলে এটাচড সেক্সানকে পরাজিত করে। প্রথমার্দ্ধে, উভয় দলই সমান সমান খেলেন, দ্বিতীয়ার্দ্ধে কালীঘাট সর্ব্বাংশে ভাল খেলে জয়ী হন। কালী-ঘাট পক্ষে পাগলসী, সুবোধ ব্যানার্জ্জী, মির্জ্জা, যোসেফ ভাল খেলেছেন। সৈন্য-দলের ব্যাকদ্বয়ের খেলা ভাল হয় নি, গোলরক্ষক বেটারটন, সেণ্টার হাফ বাক্সটন, সেণ্টার ফরোয়ার্ড ক্যাস ভাল খেলেছেন।

১২ই জুন মহমেডান ও কাষ্টমসের খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়। এদের পূর্ব্বের ম্যাচের ফলও এইরূপ হয়েছিল। পূর্ব্বের খেলায় জার্ডিনের অসামান্য দক্ষতার জন্যই মহ-মেডান জয়ী হতে পারে নি। এবার তার অনুপস্থিতির জন্য নতুন গোল রক্ষক গ্রীণের দুর্ব্বলতার সুযোগে তারা গোলটী করতে সক্ষম হয়েছিল। রহিম, রসিদ, নূর মহম্মদ ও সাকি মহমেডান পক্ষে ভাল

খেলেছেন, অপর পক্ষে কে ভট্টাচার্য্য ও পি ডিকোষ্টস্ ফরোয়ার্ডে ভাল খেলেছেন।

এই দিনে ই বি আর পুলিশকে ২-০ গোলে পরাজিত করেন। ই বি আরের আরো ৩।৪ খানা গোল করা উচিৎ ছিল। পুলিশও খানকয়েক গোলের সুযোগ নষ্ট করেছেন। আগের ম্যাচেও রেলদল এদের ৩-০ গোলে হারিয়াছিলেন। এই দিনে ব্লাকওয়াচ এরিয়ানকে ২-০ গোলে পরাজিত করেন। কর্দ্দমাক্ত মাঠ, এরিয়ান প্রথমার্দ্ধেই গোল দুটী খান, নচেৎ তারা মন্দ খেলেন নি।

১৩ই জুন মোহন বাগান ও ক্যালকাটা ১-১ গোলে খেলা ড্র রেখেছেন। মাঠ সাংঘাতিক কর্দ্দমাক্ত ছিল। এই মাঠে বুট পরিহিত মোহন বাগানের খেলোয়াড়গণ বেশ ভালই খেলেছিলেন। তারা প্রথমার্দ্ধের চেয়ে দ্বিতীয়ার্দ্ধে ভাল খেলেছেন। এই সময় অন্ততঃ দুটী গোল দেওয়া উচিৎ ছিল। এই খেলায় সন্মথ দত্ত ও বিমল মুখার্জ্জী চমৎকার খেলেছেন।

ক্যালকাটা মাঠে কালীঘাট ১-১ গোলে ইষ্ট বেঙ্গলের সহিত ড্র রেখেছেন। সবুট কালীঘাট দল সর্ব্বাংশে বিশেষতঃ দ্বিতীয়ার্দ্ধে খুবই ভাল খেলেছেন। এই দলের পক্ষে পাগসলী চমৎকার খেলেছেন, তার দেওয়া গোলটিও চমৎকার। মহমেডান ডালহৌসীকে এই দিনে ২-০ গোলে পরাজিত করে পুনরায় চ্যাম্পিয়ান হতে চলেছেন।

১৫ই জুন কালীঘাট ২-১ গোলে মোহন বাগানকে পরাজিত করেন। প্রথমে মোহন বাগানই গোল দেন, পরে কালীঘাট দুটী গোল দিয়ে জয়লাভ করেন।

এরিয়ান্স ও ইষ্টবেঙ্গলের খেলার ফল হয়েছে ১-০। ইষ্টবেঙ্গল আগাগোড়া ভাল খেলেও পরে ব্যানার্জীর দোষে গোল খেয়ে পরাজিত হলেন। এইদিনে প্রমোদ দাস ব্যাকে তার স্বাভাবিক খেলা দেখাতে পারেন নি। লাইনম্যান দুলাল ও হীরা অজস্র সেণ্টার করলেও গোলে সট করে কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। হাফ ব্যাকের ও ব্যাক পরেশ ভাল খেলেছেন। বিপক্ষী পক্ষে ব্যাক হুনে মজুমদার ও গোলরক্ষক ডি মজুমদার চমৎকার খেলেছেন। লেফট লাইন এস রায়ের খেলাও খুব ভাল হয়েছে। মিত্র সাইড হাফে মন্দ খেলেন নি।

এইদিনে পুলিশ ৩-০ গোলে এটাকে সেকসানকে পরাজিত করেছেন। পূর্ব্বের ম্যাচে সৈন্যদলই কিন্তু ১-০ গোলে পুলিশকে হারিয়েছিল।

১৬ই জুন ইষ্টবেঙ্গল ভাল খেলেও ই বি আরকে পরাজিত করতে পারেন নি। খেলাটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে।

এইদিনে ক্যালকাটা ও এরিয়ান্সের খেলা গোলশূন্য ড্র হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ভারতীয় দলটী ভাল খেলেছেন। (মঙ্গলবার ১৬ই জুন পর্য্যন্ত)।

তাই কি মনের চঞ্চলতা

শ্রীইন্দু রায়

তাই কি মনের চঞ্চলতা
ঘন মেঘ জুড়ে প্রথম আষাঢ়ে
প্রিয়া কি পাঠাল তার বারতা!

তারি কি এ কালো শাড়ীর আঁচল
নীল আকাশেরে করেছে উতল
তারি এলোচুল প্লাবিয়া দুকুল

বিছায়েছে কি এ শ্যামলতা!

এই কি তাহারি নয়নেরি বারি
অভিমান ভরা মুখখানি তারি
ঝড়ের বাতাস তারি দীর্ঘশ্বাস
এনেছে কি বয়ে ব্যাকুলতা?

তারি স্মৃতি আজ আকাশে বাতাসে
বনানীর বুকে উঠিয়াছে ভেসে
উছলা নদী কল কল ভাসে
কহিছে কি কাণে তাহারি কথা?

———

ভারতীয় ক্রিকেটের কথা

শ্রীকালীজীবন সোম

ভারতবর্ষে ক্রিকেট কেবল রাজা মহারাজাদের জন্যই একথা দেশের লোকেরা ত বলেনই, বিদেশীরাও বলিয়া থাকেন। বিখ্যাত বোলার মরিস তাঁহার 'ক্রিকেট রেমিনিসেন্সেস্' পুস্তকে একটী মজার ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কলিকাতা ইডেন গার্ডেনে পাতিয়ালার মহারাজা খেলিতেছিলেন, টেষ্ট বোলিং করিতেছিলেন, (১৯২৬) অকস্মাৎ খেলা বন্ধ হইয়া গেল। কারণ খুঁজিয়া দেখা গেল, মহারাজা যে পঁচিশ হাজার পাউণ্ড দামের ইয়ারিং পরিয়া খেলিতেছিলেন তাহা পাওয়া যাইতেছে না। সমস্ত পিচ তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল কিন্তু কোথাও তাহা পাওয়া গেল না। অবশ্য শেষে তা পাওয়া গিয়াছিল। যে চিরুণ জাল দিয়া মহারাজ তাঁহার দাড়ি বাঁধিয়া রাখিতেন তাহারই এককোণে সে ইয়ারিং

আটকিয়া ছিল। এসব শুনিয়া সাহেবেরা আমাদের ক্রিকেট সম্বন্ধে আমাদের চেয়ে অন্যরকম ধারণা করিবে এতে আর আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে। তা' ছাড়া বিদেশী টিমগুলি এদেশে আসিলে যে রাজার হালে থাকিয়া আমোদ স্ফূর্ত্তি করিয়া যায়, বিরাট কাণ্ডকারখানা দেখিতে পাওয়ার পরে যখন অতি সহজে দেশীয় দলকে হারাইয়া দেয় তখন যদি তাহারা ধারণা করিয়া বসে যে ভারতের লোক ক্রিকেট খেলার চেয়ে ক্রিকেট খেলা দেখিতেই অধিক আনন্দ পায়, তবে কি তাহারা অতি বড় ভুল করিয়া বসে? অতি বৃহৎ বৃহৎ পৃষ্ঠপোষক থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় ক্রিকেট যে থমকিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহার কারণ কি ইহাই নয়? মোটকথা ক্রিকেটকে এখনও আমরা জাতীয় খেলায় পরিণত করিতে পারি নাই।

ফুটবলের মত ক্রিকেট এখনও সহরের গণ্ডী ছাড়াইয়া গ্রামের প্রান্তরে প্রান্তরে স্থান পায় নাই। তাই নূতন নূতন প্রতিভার সন্ধান সচরাচর মিলেনা। অথচ ভারতে ক্রিকেট খেলার বিপুল উৎসাহ জাগিয়া উঠিয়াছে। উৎসাহ আছে, কিন্তু তদনুযায়ী ক্রিকেটের উন্নতির জন্য চেষ্টা নাই।

এদিকে যে কয়টী প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় আছেন, আভ্যন্তরিতার পরস্পর পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণেই তাঁহারা ব্যস্ত আছেন। আজ যদি ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার মত আমাদের দেশেও শত শত নূতন খেলোয়াড়ের উত্থান হইত, তবে এই ব্যক্তিরা এ প্রকার কলহ করিতে [illegible] পাইতেন না। জাতীয় [illegible]

পাওয়ার গৌরবের লোভে ইহাদের ব্যক্তিগত ভেদবুদ্ধি কোথায় হারাইয়া যাইত।

এম, সি, সির ভারত ভ্রমণের (১৯৩৩-৩৪) পরেই ক্রিকেটে এদেশের লোকের উৎসাহ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু খেলোয়াড় ও কর্ত্তৃপক্ষ মহলে যে আভ্যন্তরিক বিক্ষোভ ও বিদ্বেষ এতদিন ধূমায়িত ছিল তাহা যখন অষ্ট্রেলিয়ানদের সফরের সময় স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিল তখন এদেশের ক্রিকেট উৎসাহীরা শঙ্কিত হইলেন। ভারতীয় ক্রিকেট টিমের ইংলণ্ড যাত্রা আসন্ন, এ অবস্থায় টিম নির্ব্বাচনে গোলমাল হইলে বিদেশে ভারতীয় ক্রিকেটের গৌরব ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা।

ক্যাপ্টেন নির্ব্বাচন লইয়াই কর্ত্তৃপক্ষ মহা সমস্যায় পড়িলেন। অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখিতে গেলে সি,.কে, নাইডুর দাবী সর্ব্বপ্রথম। ওয়াজির আলিও অনেকবার কোয়াড্রাঙ্গুলার খেলায় মুস্লিমদলের নেতৃত্বে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। লাহোর ও মাদ্রাজ টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়ানরা অনেকাংশে তাঁহার অধিনায়কত্বের জন্যই ভারতীয় দলের কাছে পরাজিত হইয়াছে। কিন্তু সিলেক্শন বোর্ড ইহাদের কাহাকেও ক্যাপটেন করিতে সাহস পান নাই। পাতাউদির নবাব অসুস্থতার জন্য ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করিতে অসম্মত হইলে নানা গুজব গবেষণায় দেশ ভরিয়া গেল এবং যেদিন নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়গণ ও ক্যাপ্টেনের নাম কাগজে বাহির হইল, সকলে একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ভিজিয়ানাগ্রামের কুমারকে ক্যাপ্টেনের স্থানে দেখিয়া কেহ উল্লসিত হইয়া

না উঠিলেও সকলে এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইল যে নিজেদের ভিতরকার দলাদলি হয়ত এবার চাপা পড়িবে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, একটী জাতীয় দলের নেতৃত্ব করিতে যে অভিজ্ঞতা ও ক্রিকেট সম্বন্ধে সর্ব্বাধিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন মহারাজ কুমারের তাহা নাই। নেহাৎ বরাত জোরেই তিনি জার্ডিনের দলকে ১৪ রাণে হারাইয়া দিয়াছিলেন। বিলাতে এতগুলি খেলা হইয়া গেল, অথচ প্রায় সর্ব্বত্রই তিনি খেলোয়াড় ক্যাপ্টেন হিসাবে নৈরাশ্যজনক ফল দেখাইয়াছেন।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এতবড় একটী শক্তিশালীদলের বারবার পরাজয়ের জন্য কেবল মাত্র ক্যাপ্টেনকে দায়ী করা সঙ্গত নয়। অনেকে সন্দেহ করিতেছেন যে, দলের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ এখনও তেমনই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মনোমালিন্যের ফলে ইহাদের খেলায় একাগ্রতা ও আগ্রহ নাই। মিডল্‌সেক্সের সহিত ভারতীয় দলের পরাজয়ের কারণ সম্বন্ধে ডেইলি স্কেচও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

ক্যাপ্টেন হইতে গেলে নানা প্রকার অপ্রিয় কথা শুনিতে হয়। ১৯৩৩ সালে চ্যাপম্যানকে বাদ দিয়া যখন ওয়াটকে অষ্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধে খেলিবার জন্য ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন করা হইল, তখন শত শত চিঠিযোগে গালিগালাজ আসিয়া তাঁহার উপর পড়িতে লাগিল। টেষ্ট খেলার দিন সকালে তিনি এক তার পাইলেন—প্রাণের মমতা যদি থাকে তবে নেতৃত্ব ছাড়িয়া দাও, নচেৎ তোমাকে গুলি করিয়া মারা হইবে। মরিস টেট্ তাঁহার বইয়ে জার্ডিনকে 'সজার্ণ কারো' আখ্যা দিয়াছেন।

কিন্তু যখন কোন ক্যাপ্টেন বা খেলোয়াড়ের ক্ষমতার উপর কটাক্ষ করা হয় এবং তাহার যদি সঙ্গত কারণ থাকে সে অবস্থায় বুদ্ধিমানের কাজ সরিয়া পড়া। পাতিয়ালার যুবরাজ কেবলমাত্র স্বীয় ক্রীড়ানৈপুণ্যে ভারতীয় টীমে স্থান পাইবার অনুপযুক্ত, এইরূপ মত প্রকাশ পাইতে লাগিল। তথাপি এই যুবরাজকে যখন ভারতীয় দলে লওয়ার প্রস্তাব উঠিল তখন পাতিয়ালার মহারাজ নিজের ছেলেকে সরাইয়া লইয়া বিশেষ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছিলেন। বিজয়নগরের কুমারেরও সে নীতি অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। অন্ততঃ কয়েকটী খেলায় তিনি অন্য ক্যাপ্টেন নিয়োগ করিয়া দেখিতে পারেন, ফল কি হয়। তাছাড়া যখন তিনি রাণ করিতে পারেন না তখন প্রত্যেক খেলাতেই তাঁহার খেলার কোন মানে হয় না—ইহা দৃষ্টিকটুও বটে। ১৯৩৪ সনে ইংলণ্ডে অষ্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেন উড্‌ফুল অনেক খেলায় নিজে না খেলিয়া ব্রাডম্যানকে নেতৃত্বের সুযোগ দিয়াছিলেন।

ডি-জি অসুস্থ

'দ্বীপান্তর' সম্পর্কে আমরা যে খবর পেয়েছি, তাতে বলা যায় যে, ডি-জি এই ছবিখানির সাফল্যের জন্য কোন পাথর ওল্টাতেই বাকী রাখছেন না। কালী ফিল্মসের ষ্টুডিয়ো এখন দ্বীপান্তর নিয়েই মশগুল—একটী হোটেলের সেট তোলা হয়েছে—সাধারণতঃ বাংলা বইতে তার তুলনা পাওয়া ভার হবে। কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ওরফে কানুবাবু একটী নগণ্য ভূমিকায় যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা অনেক অভিনেতার কাছেই স্পৃহণীয় বিষয়। ডি, জির পরিকল্পনায় একটি শিকারিণী বালিকা [illegible]

নটীরূপ তব সার্থক হ'ল

প্রিয় রায়

'প্রথম প্রেমে'র হাসিটীর মতো
সুষমা মাখানো তোমার দেহ,
অন্তর মাঝে আনিল প্লাবন
প্রেম ভালবাসা মমতা স্নেহ,
তাই তো তোমার নিবিড় পরশে
প্রেম-পাগলিনী সেই সে রাধা—
মোদের উচ্চ কল্পনা হোতে
কঠিন ধরায় আসিল নামি।
তোমার আননে ফুটিয়াছে আজ
অশ্রু-ভেজা সে মধুর হাসি—
তুমিই শোনালে ধরণীরে পুন
রাধা—প্রেমে-গড়া মোহন বাঁশী,
নটীরূপ তব সার্থক হল
কাম-গন্ধহীন প্রেমের গানে—
ইন্দ্র-সভার নটী-উর্ব্বশী—
বুঝি বিস্ময়ে চাহে তোমার পানে
যে-রসের ধারা বহায়েছ তুমি
প্রতিটী জীবের বক্ষ মাঝে,
কেহ ভুলিবেনা তারে দেখি,
কোনো সুখে দুখে কোনই কাজে!

তা হয়েছে অনবদ্য। বালিকাটীর নাম করুণা। আমরা ছবিখানির মুক্তি প্রতীক্ষায় আছি।

ছবিখানি জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেই মুক্তিলাভ করত। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ডি, জি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।

প্রগতি

(গল্প)

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

ছেলেরা যেহেতু দাদার স্ত্রীকে 'বৌদিদি' বলিয়া ডাকে, মেয়েরা দিদির স্বামীকে 'বর-দাদা' কেন বলিবে না—ইহা লইয়া তর্ক বাধিয়া গেল। ললিতার প্রস্তাবে বোর্ডিংএর প্রত্যেকটি মেয়েই একে একে গাছকোমর বাঁধিল। ক্রমে প্রত্যেকের কণ্ঠই যখন স্বরগ্রামের সমুদয় পর্দা অতিক্রম করিয়া অবশেষে মেছুয়াবাজারে গিয়া পড়িল, রেসিডেন্ট-কবি লীলা সহসা কানে আঙুল দিয়া উঠিয়া পড়িয়া সক্ষেদে মুখ-ব্যাদান করিল—

—বাবা! বাবা! তোদের কি আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই?

দুই পা অগ্রসর হইতেই ললিতা আসিয়া লীলাকে টানিয়া ধরিল। বলিল—

—সকলেই তো কল্পরাজ্যের জীব নই! দিদির বর, দাদার কুটুম—এদের নিয়েই একটু টাইম কিল করা! বিশ্বজনীন্ উদার কি আর সবাই লো?

কণিকা মাঝখান হইতে হিঁ হিঁ করিয়া গড়াইয়া পড়িল। বলিল—

—যা' বলেছিস ভাই! কল্পনার রূপ-কুমার শতরূপে বিশ্বময় ছড়িয়ে! কথার মালা গেঁথে ও পরায়, যা'র গলায় খুশী! কিন্তু, আমরা যা'রা কঠিন বাস্তবের হাতের পুতুল—

কথা আর শেষ করা হইল না। ঘুরিয়ে বলিতে সহসা কণিকার চোখ শিশিরকণায় ঝিক্ ঝিক্ করিয়া উঠিল। সিঁদুরে মেঘের মত মুখমণ্ডলও রাঙিয়া উঠিল এবং অশ্রুবৃষ্টি হইয়া ভাসিয়া ভওয়ার দারুণ জ্যৈষ্ঠের দিনেও পৌষমাসের পেঁচোয় পাইয়া বসিল! অবশেষে তড়িৎ-চালিত পাম্পিং-হ্যাণ্ডেলের হাজার-অশ্বশক্তির গুঁতায় অস্থির হইয়া আচম্বিতে ঠকঠকাইয়া উঠিতে "মাগো!" বলিয়া উবু হইয়া পড়িয়া চক্ষুদ্বয় শিবলোকে তুলিয়া দিল। হায় হায়, কি হইতে কী হইয়া গেল রে!

ছাত্রীমহলে 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গেল। দিদির বরকে বরদাদা বলিবার আলোচনা লইয়া যে এমন হিষ্টিরিয়া আমদানী হইয়া বসিবে, ইহা কি ছাই আগে কেউ জানিত? সকলে যখন কণিকাকে লইয়া পড়িল, ললিতা তাহাদের অগোচরে টেবিলের উপরেই আড়াই হাত নাকে খৎ দিয়া আচ্ছা করিয়া নিজের কানদুটিও মলিয়া লইল। লীলার চোখে ইহা এড়াইল না। কিন্তু তাহার টিপ্পনীর পূর্ব্বেই অরুণা বিজ্ঞভাবে বলিয়া উঠিল—

—জানিস লীলা? ফ্রয়েডের সাবকন্সাস্ কথাটা? ওরও (কণিকার) সেই অবচেতনারই ইয়ে আর কি! রিএক্সন্! মানে—সেকশুয়াল রিরেলাইজেশন্ও বলা চলে। আমার তো ভাই এই মনে হয়।

যৌনতত্ত্বে অরুণার প্রগাঢ়তা সকলের দৃষ্টি টানিয়া লইল। কণিকা একটু সুস্থ হইলেই, অতএব দেহতত্ত্বের গূঢ়তা লইয়া ফুস্‌ফুস্ ফাস্‌ফাস্ সুরু হইল। এ-বিষয়ে লাই-ওনিয়ার অরুণাই তৎপরতাসহকারে একটা হাই তুলিয়া তুড়ি মারিয়া লইল, সগর্ব দৃষ্টি ও সচমক হাসি টানিয়া বলিল—

—হু! আমরা মেয়েরা যতই কেন না হই! স্বভাবের সঙ্গে লড়াই—কেমন? সাজে কি?

অরুণার ইহা পাকামি! বিদ্যুতের সহ্য হইল না। দৃঢ় প্রতিবাদ জানাইল। তা'র সতেজ অভিব্যক্তির সাথে সাথে প্রায় সকলেই তাহার দলে ভিড়িয়া গেল। মুখ-পাত্র হিসাবে ঊষা বলিয়া উঠিল—

—ছাখ অরুণা, পষ্ট কথার কষ্ট নেই! ব'লেই ফেল না কেন? নিজে একজন ফিল্ম-এক্টর মানে ইয়ে—

ঊষার বক্তৃতা সহসা বাধা পাইল। কালনাগিনীর মত ফোঁস করিয়া অরুণা গর্জ্জিয়া চোখ পাকাইয়া চাহিল—

—ঊষা !

হয়তো একদিন এই চাহনিই সুদূর অতীতে একজন পপুলার মহর্ষির মুণ্ডপাত করিয়াছিল ! ঊষা মহর্ষি না হইলেও, বর্ত্তমান অবস্থা কাছাকাছিই দাঁড়াইয়াছিল। অর্থাৎ তা'র নিগূঢ় একটি দুর্ব্বলতার কাহিনী অরুণা জানিত। কোন্ এক আত্মবিস্মৃত মুহুর্ত্তে অরুণার কাছে মনের কথা বলিয়া হাল্কা হইয়াছিল। অতএব স্বয়োপিত মায়াবৃক্ষের ফল-দর্শনে অরুণার নিকট কেঁচো না হইয়া উপায় ছিল না। খোঁতা মুখ সত্যসত্যিই ভোঁতা হইয়া গেল।

তাহার দশা দেখিয়া হিষ্টিরিয়াক্রান্তা কণিকার মন কেমন করিয়া উঠিল। মেয়ে-মহলে সুরসিকা বলিয়া তাহার একটু অহঙ্কার ছিল। এবং বাহাদুরী লইবার লোভেই এতক্ষণে তাহার রোগের দৌর্ব্বল্য কাটিয়া গেল। সুতরাং অরুণার মুখে মিষ্টি-জুতা মারিবার প্যাঁচ মনে কষিয়া, পায়ের উপর দাঁড়াইয়া উঠিল, আর অবিলম্বে হাঁ করিয়া বলিল—

—আহা, অরুণা শুধু সেন্সোণজিষ্টই নয়, ওয়াণ্ডারফুল মনোলজিষ্টও বটে ! বেদের মেহেরবাণী আর কি ! নয় ?

কথা ক'টি বলিয়াই কণিকা অরুণার সকরুণ দৃষ্টিতে কিছুটা ব্যথিত হইয়া উঠিল। হাজার হইলেও অরুণার সহিত তাহার অনেকটাই মিলিয়া যাইত। এতক্ষণে তা'র মনে হইল, ঊষার দিক্ লওয়া তাহার পক্ষে ঠিক হয় নাই। তারপর তাহার অপরূপ কাহিনী কণিকার মনে হইয়া গেল। পরপর চারিটি স্বামী গ্রহণ করিয়া প্রথমটির বিরুদ্ধে খোরপোষের দাবী করিয়া অবশেষে মামলায় জিতিতে না পারায় স্বাবলম্বী হইবার জন্য এই হোষ্টেলে আসিয়াছিল। ইহা কে না জানে ? সুতরাং স্বামকে ত্যাগ করিয়া কুল রাখিবার ইচ্ছায় আবার হাঁ করিল। ঊষার দিকে একটি কটাক্ষ হানিয়া ক্রমে অরুণার দিকে চাহিল, এবং ভঙ্গিমায় রঙীন্ হইয়া ঢলিয়া পড়িয়া কহিল—

—শুন্‌লি অরুণা ? মজার কথা ! সেদিন কাগজে দেখলুম। একটি ভদ্র-লোকের বিরুদ্ধে শ্লীলতা-হানির অভিযোগ। কিন্তু, জেরার মুখে যখন ভদ্রমহিলার মুখ দিয়েই স্বামী-চয়নের বহুমুখিতা প্রকাশ পেল, আর আদালতের মন্তব্যেও শ্লীলতা রক্ষা হল না—

ঊষা আর পারিল না। অরুণার চোখরাঙানি সে অগত্যা হজম করিয়াছিল। আর কণিকা ? সেও কিনা তাহাকে ঠেস্ পাড়িয়া কথা কহিবে ? অবিলম্বে ঊষাও কণিকার ছিদ্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। বলিল—

—ভদ্রমহিলার শ্লীলতা-রক্ষার ক্ষমতা না হয় কণিকারই একচেটে ! তবে ঐ বাঙাল ইস্কুল-মাষ্টারের ইতরামির হাত এড়াবার শক্তিও কি ও'র তেমনিই ? এই কথাটার জবাব ও দিক্ ?

ঊষার মুখে এতবড় খোঁচাটা খাইয়াও কণিকা রাগিল না। কিছুমাত্র অপ্রতিভও হইল না। বরং গালভরা হাসি মুখে লইয়া সহজেই উত্তর দিল। বলিল —

—যা'র সাথে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা, তা'র সঙ্গে প্রকাশ্যে মেলামেশা করাটা না হয় ইতরামিই মে'নে নিচ্ছি। কিন্তু, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুলের পর একটি সহদেব নিলেই যে দ্রৌপদী হ'তে পারতো, তা'র সেটা না-হ'তে-পারার—

কথাটা শেষ না করিয়াই কণিকা উচ্চকরূপে হাসিয়া উঠিল। এবং তদনুরূপ কটাক্ষে ঊষাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ক্রমে কটাক্ষে-কটাক্ষে সংঘর্ষ লাগিয়া তপ্ত কণ্ঠের তড়বড়ানি সুরু হইবার মত দুর্য্যোগ উপস্থিত হইলে, শান্তির অবতার হোষ্টেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া পড়িলেন। এই অবসরে শান্তির অগ্রদূত হিসাবে নির্ব্বাক্ সবিতা সবাক্ হইয়া উঠিল—

—হাঁ চারুদি' ? ললিতা বলছিল, ছেলেরা যদি দাদার বৌকে বৌদিদি বলতে পারে, আমরাও বা দিদির বরকে বরদাদা বল্‌ব না কেন ? বলা যায় ? আপনার কি মত ?

সবিতার প্রশ্নে চারুদি ওরফে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হাসিলেন কি কাঁদিলেন—মালুম হইল না। ভাবে বোধ হইল, একটু আমোদ পাইয়াছেন। অপরূপ হাসিয়াই বুঝি বলিলেন—

—ছেলেরা তো কত কিছুই করে! মেয়েরাও যে তাই কত কিছুরই মধ্যে এগিয়ে যাবে, এমন কি কথা? পাল্লা দিতে যাওয়ায় বিপদ্ এই, ছেলেরা যা' নিয়ে ছেলে, আর মেয়েরা মেয়ে তা'র তো আর বদ্‌বদল হবে না? যে জন্ম ছেলেরা ছেলে, আর মেয়েরা মেয়ে—মনে হয়, তাই নিয়ে থাকাই ভালো। নয় কি?

কিন্তু মেয়েদের মুখ দেখিয়া চারুদি' হতাশ হইয়া গেলেন। মেয়েদের নিকট হইতে নানা উপায়ে দানাপাণির অনেকটাই তাঁহার পকেটে (অর্থাৎ লেডিস্ পকেট যাহা হইয়া থাকে) আসিত। তাঁহার বিবাহিত-জীবনের অনেক কিছু খুঁটিনাটি প্রধানতঃ ইহার উপরই নির্ভর করিত। অতএব শ্যাম ও কুল রাখিবার ভাবনায় দিশেহারা হইয়া টালুমালু করিতে লাগিলেন। চারুদির শ্রুতিযোগ্য চাপা গলায় ললিতা তো বলিয়াই বসিল—

—বিয়ে ক'রে মাগী একেবারেই গেছে!

প্ল্যান বৈচিত্র্যে হঠাৎ চারুদির মস্তিষ্ক উর্ব্বরা হইয়া উঠিল। ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি টানিয়া বলিয়া ফেলিলেন—

—হাঁ, এক কাজ করা যায়। বরদাদার সঙ্গে তফাৎ নেই—এমন একটা কথা। ঐ, দিদির বরকে বড়দাদা বলা যায়। বুঝলি ললিতা? তোর কথাই রইলো।

ললিতার গালে একটা টোকা দিয়া এইবার চারুদি বাস্তবিকই হাসিয়া উঠিলেন। চারুদির কি সাফ মাথা! ললিতার মন সত্যই গলিয়া গেল। চারুদির দিকে তাকাইয়া সোৎসাহে বলিয়া উঠিল—

– ঠিক বলেছেন চারুদি! যে বরদাদা, সেই বড়দাদা! চমৎকার ব্রেন কিন্তু! জিনীয়াস্! উঃ!

ললিতা হাসিয়া কেবল হার্টফেলই করিল না। অল্প হইতেই রক্ষিয়া গেল। এবং তাহার হাসির ধমকে উষার পিত্তি চটিয়া উঠিল। সে বলিল—

—ছাই মাথা! দিদির যদি পাঁচটাই বর থাকে? সবাই কি ক'রে বড়দাদা হয়?

হি হি করিয়া সকলেই গড়াইয়া পড়িল। কণিকা বলিল—

—উঃ! উষা নিজের কথাই যাচাই ক'রে নিচ্ছে, নয়? তা' যে-দিদির পাঁচটা ইয়ে থাকে, তা'র আগে ১নং, ২নং;—

নিজের ভুল বুঝিয়া উষা থ' বনিয়া গেল। হা হা করিয়া তখনি বলিয়া উঠিল—

—কেন, পাঁচটা দিদির পাঁচ বর বুঝি হ'তে নেই?

উষার বক্তব্য এতক্ষণে সকলের মগজেই পথ প্রাপ্ত হইল।

চারুদি কাসিয়া বলিলেন—

—ওঃ, তাই বল?

সবিতা বলিল—

—তা' হলই বা পাঁচ-দিদিরই পাঁচ বর। ছোট বড়দাদা, সেজ বড়দাদা, মেজ বড়দাদা—বিশেষণ জুড়তে কতক্ষণ? ওর আবার ভাবনা!

চারুদি সবিতার বুদ্ধির তারিফ করিলেন। কণিকা এইবার বলিল—

—তা বড়দাদা বলতে বড্ড সময় লাগে ব-ড়-দা-দা—উঃ! তা'র চেয়ে বড়দা বলো, খাটুনী কম, শোনায়ও ভালো।

অতএব দিদির বর বড়দাই হইয়া গেলেন। পরদিন 'ভারতের সর্ব্বাধিক প্রচারিত' দৈনিকের সম্পাদকীয় স্তম্ভে সে কি অভূতপূর্ব্ব উৎসাহবর্দ্ধন! সম্পাদকের মন্তব্যের মর্ম্ম হইল—

"নারী-প্রগতির ইতিহাসে বড়দা অমর হইয়া থাকুন! কুমারী ললিতা রায়ের মৌলিকতা···ইত্যাদি ইত্যাদি।"

প্রাতঃকালীন চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিতে দিতে কাগজখানি পড়িয়া কণিকা বলিল—

—দেখলি ললিতা? সু-কুমার সম্পাদক আমাদেরই দলে!

ললিতার অর্থপূর্ণ উত্তর গর্ব্ব ও আনন্দের মিশিশিপি হইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। অবশেষে যে-কাগজখানায় 'জাহাজের খবর' এবং 'পাত্রপাত্রী'র নিশানা আছে—উষা আসিয়া তাহার উপর চোখ বুলাইয়া লইল। ক্রমে শূন্য নয়নে খড়খড়ির ফাঁকে আলিসার উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া এক পাউণ্ড ওজনের একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তথায় তা'র তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কবুতরদম্পতি তিলমাত্র বিচলিত হইল না। বরং সোল্লাসে ডাকিয়া উঠিল—

—বক্ বকুন্ কুম!

অর্থাৎ ললিতার "বড়দা"র কথা সে উষাই কেবল ভাবিতেছে—তাহা নহে, উহারাও ভাবিতেছে!
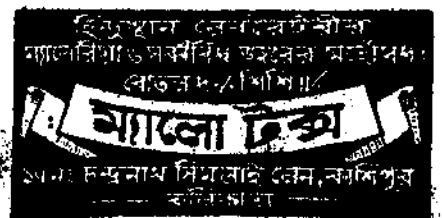
———

চাবুক-চুবুক

পাণ্ডুমুখ শর্ম্মা

'প্রবাসীর' পাতায় যাঁহার পল্লী-প্রেমের চুল্লী মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতে দেখিয়াছি, 'প্রবর্ত্তক'-এর পৃষ্ঠায় আবার তাহা দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিতে ফেলিতে কোনোক্রমে রহিয়া গিয়াছি! কিন্তু আর বুঝি রহিয়া যাওয়া হইল না। অবশেষে 'উত্তরায়ণ' এর পৃষ্ঠায় কবির সহজ-সরল পল্লী-প্রীতি যখন মিটিমিটি করিতে করিতে ক্রমে দাউ-দাউ করিয়া উঠিতে চাহিতেছে, তখন হাউ হাউ করিয়া ফেলিয়াছিলাম আর কি। কিন্তু কবিই এ যাত্রা বাঁচাইয়া দিলেন। বলিলেন—

"ঐ ঘরে থাকে রাজার দুলালী,
সোণার বরণা মেয়ে'
রোজ সন্ধ্যায় তুলসীতলায়
জ্বালে তার দীপখানি ;
সারারাত কালো চোখ দুটি তার
থাকে দূর পথচেয়ে···"

চোখে নেশা ধরিয়া গেল। ভাবিলাম কবি কোন্ পল্লীর কথা কহিতেছেন—তাহার সুড়ুক-সন্ধান না হয় কাহাকে না-ই দিলেন, কিন্তু যে-মেয়েটি 'দূর পথচেয়ে' 'সারারাত' কাটাইতে শিখিয়াছে—সে-মেয়েটি যে নেহাৎ আড়াই-বছুরে খুকীটিই নয়—অন্তত তাহাও জানাইয়া দেওয়া উচিৎ ছিল। অকস্মাৎ দৈববাণীর মত কাণে আসিয়া ঠেকিল—

"ভেঙ্গিল গেল—রাজার দুলালী
দেখে তার তনিমায়
কুঁড়ির মতন এসেছে মুকুল
রূপ-সায়রের গায়ে,
মনের অতল গহ্বরে যেন
কত-সুর মূরছায়,
আনন্দ যেন ব্যথার মতন কাঁটা
হয়ে বুকে বাজে!"

অতএব ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় মশয় যে কেবল কবিই নন—একজন 'ভবিষ্যৎ'-দর্শীও বটেন ('ভবিষ্যৎ'-এ 'রাবণ' দেখিয়া তাহা মালুম হইয়াছিল), তাহা বুঝা গেল! 'রাজার দুলালী'র 'তনিমায় কুঁড়ির মতন মুকুল এসেছে' দেখিয়া তিনি যে উহার 'মনের অতল গহ্বরে' সময় বুঝিয়া 'সুর' খুঁজিয়াও লইবেন—ইহাতে মারাত্মক কিছু নাই। কিন্তু রাজার দুলালীর হইয়া যে বলিলেন—

"এমন করে তো আসেনি রাখাল
থেকে এত কাছে কাছে,
সময় নাহিক! রাজার দুলালী
চলে ওরই হাত ধরে"

ইহাতে কবির মন কেমন করিয়া উঠে নাই তো? অবশেষে তাঁহারই 'রাজার দুলালী' তাঁহারই সম্মুখে যে রাখালের হাত ধরিয়াই চলিয়া গেল, কবির এই দুঃখের 'কাহিনী' শুনিয়া সত্যসত্যই সহানুভূতি আসিয়া যাইতেছে।

—:*:—

লেখকেরা বিভিন্ন হইয়াও সময়ে সময়ে যে একই রকম অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া থাকেন, 'প্রবর্ত্তক'-এর জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় তাহার নমুনা পাওয়া গেল। নজরুল ইসলাম নামক একজন অখ্যাত (?) কবির লেখা একটি বহু প্রচারিত গান—'অরুণ কিরণ'—নামা একজন বিখ্যাত (?) কবির অনুবাদ বলিয়া কথিত হইয়া স্বনাম-ধন্য (?) মণি বাগচী মশয় কর্ত্তৃক হজমী-কৃত হইয়াছে। তাহার প্রমাণ—

"হে পার্থ-সারথি!
বাজাও বাজাও, পাঞ্চজন্য-শঙ্খ।
চিত্তের অবসাদ দূর কর, কর দূর
ভয়ভীত জনে কয়হে নিঃশঙ্ক॥"
—ইত্যাদি।

অতঃপর মনে-ময়রা যদি রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী'কে মণি বাগচীর অনুবাদ বলিয়া 'অগ্রগতি'তে চালাইয়া দেয়, আমরা না হয় 'গ্রেট মেন থিঙ্ক এলাইক' বলিয়াই ধরিয়া লইব।

'চৈত্র চলিয়া গেল' দেখিতে পাইয়া তরুণ-কবির মধ্যে কাল বৈশাখের ঝড়ের আশঙ্কা কতদূর প্রবলরূপে আত্ম প্রকটিত হইয়াছে, এবং তিনি কিরূপ হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন—'পার্থ সারথির' পরে তাহাও দেখিলাম।

"রুদ্র-ক্ষ্যাপার উগ্র দাপটে
নিভিল দেউলে বাতি,
উচ্ছৃঙ্খল যৌবন কাঁদে—
দুয়ারে ঝড়ের রাতি!"

কিন্তু ঝড়ের রাত্রে দেউলের বাতি নিভিয়া গেলেও, যে-তরুণ ও তরুণীর মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল যৌবন রহিয়াছে—তাহাও আবার কাঁদিয়া উঠে? কি জানি বাপু! চৌধুরী মশায়ের কথাটা যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছে! ইহা হইলে 'যুগের প্রগতি… আজ সুরু' হইল কিরূপে? 'সতী-শোকে' বুঝি 'কালভৈরবের থৈই হারাইয়া গিয়াছে? তাহা হইবে!

—:*:—

'বিবর্দ্ধন' অবস্থা যে গোবর্দ্ধনের গিরিধারণই নহে, 'অপূর্ব্ব প্রতিভা'র বিকাশ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াও তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে! বন্দ্যোপাধ্যায় বাবাজী বুঝি তাহারই প্রমাণ দিতেছেন—

"বাঁশ থেকে বেরিয়েছে দুটো কচি অসহায় চিকন পাতা!"

শুধু তাহাই না, সেই চিকণ পাতার ফাঁকে আবার কি বিচিত্র এক জিনিষই না গজাইয়া উঠিতেছে! অর্থাৎ—

"পাগল একটা কিশোর কুঁড়ি
পূবের দিন প্রভাতে ফুটে
উঠল সেখানে
আকাশের হাসি মাখা একটী
হলদে ফুল…"

বটেই তো! কিন্তু ফুলটি যদি হলদে না হইয়া লালই হইত? আহা!

নাম জানা দুই বন্ধু মোরা

(বড় গল্প)

দিলীপ দাশগুপ্ত
মনসা চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

বসন্তের এক সকাল বেলা, মদের মতো স্বচ্ছ, টলটলে এক সকালবেলা অরুন্ধতী যেন ঘুম থেকে চমকে উঠলো। তার একা লাগছে। এই একাকীত্বের নির্জ্জনতা যেন তাকে রেখেছে ঢেকে, সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে'। বুকের ভেতরটা যেন টনটন্ করে উঠলো আর সমস্ত শরীরে অবচেতনার মূঢ়তা। জানলা দিয়ে টুকরো হ'য়ে গড়িয়ে পড়া বাতাসের স্নিগ্ধ মধুর স্পর্শ জানা দিতে লাগলো তার বুকের রক্তে। মনে হ'লো, তার কি যেন ছিল, আর কি যেন নেই, হারিয়ে গ্যাছে, মিলিয়ে গ্যাছে রামধনুর রঙে, সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের কলরোলে। মেঘাবৃত আকাশের কালিমায় আর নিশীথের নীরবতায়। কী কোরবে অরুন্ধতী! কিছুই যেন ভাল লাগছিল না তার। তাড়াতাড়ি উঠে গেল বারান্দায়। না, সেখানেও সে থাকতে পারলে না! একটা নিষ্ঠুর কোকিল ডেকে গেল তার সর্ব্বনেশে সুরের কাঁপনিতে ভরে' দিয়ে বাইরের উদার আকাশটাকে। অরুন্ধতী যেন কিছুই বুঝতে পারছিল না। তার কী হয়েছে আর কী চায় তার মন! আকাশ আর সমুদ্র ছুটে চলেছে, ছেদহীন, বিরামহীন তাদের গতি। একটা মহামিলনের আকাঙ্খা নিয়ে অনবরত, অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছে আর রাত্রির অন্ধকারে তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে একটা কাঙাল দৃষ্টিতে। অরুন্ধতী গুণ গুণ করে গান গাইলে, ভাঙা ভাঙা গলায়, রাত্রির কুয়াসার মতো অস্পষ্ট সুরে। পিয়ানোর রিডগুলো যেন আপনা থেকেই ঠুং ঠাং বেজে উঠলো। অরুন্ধতীর গলার সুরে যেন একটা গোপন ছন্দ।

তারপর—তারপর আবার ঘরে এসে একটা চেয়ারের বুকে ভেঙে পড়লো চুরমার হ'য়ে। আর ভাবতে লাগলে: না, একা আর সে থাকবে না, থাকতে পারবে না। এই নিরবচ্ছিন্ন বেদনার হাত থেকে মুক্তি তাকে পেতেই হ'বে।
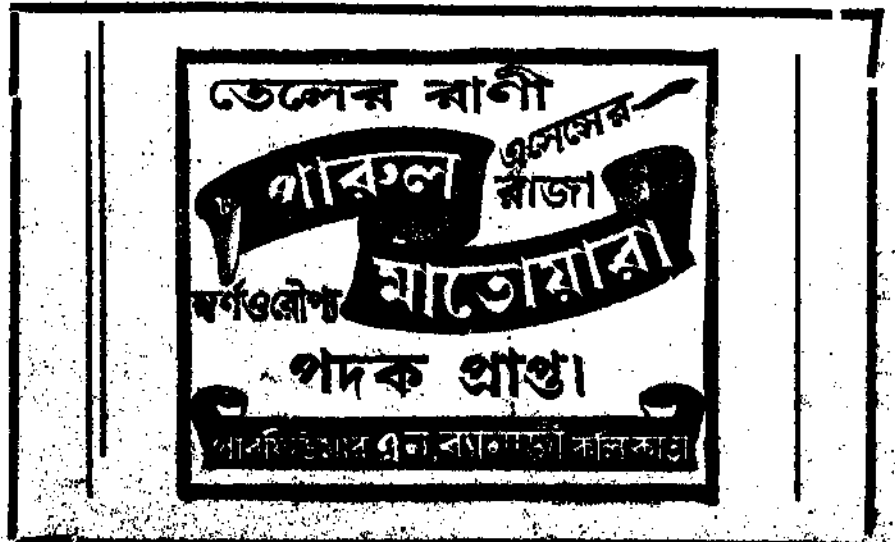
তার রক্তে জেগে উঠেছে, স্পর্শের ঢেউ, বাসনার তীব্রতা। হিন্দোলের কাপুরুষতা, কামনাময় ক্ষুধার্ত্ত চাউনি যেন আর ভাল লাগেনা অরুন্ধতীর। হিন্দোল অরুন্ধতীকে চায় হোয়াটটু—এওয়ের সোকেইসে নাইট গাউনের মতো, আর সে মনে করে, অরুন্ধতী এক স্তূপ মাংস, একটা শারীরিক স্তূপ মাত্র। হিন্দোল তাকে পেতে চায়, আর পেলে সুখী হয় রাত্রির অন্ধকারে শয্যা সঙ্গিনীরূপে। এর বেশী যেন আর কিছুই নয়। কিন্তু অরুন্ধতী চায় প্রবীরের মতো পৌরুষে দীপ্ত এক পুরুষকে ভালবাসতে, তার বেদনার অসহায়তাকে পরিপূর্ণ করে' তুলতে তার সঙ্গ-সুখে। ঝড়ো হাওয়ার এমনি করে আর পাখা ঝাপটিয়ে বেড়াবে না সে। মাটীতে পা' দিয়ে ঘুরে বেড়াবে সুন্দর পৃথিবীতে। তার মনে হ'লো কী সুন্দর প্রবীরের ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক চেহারা। সারা দেহে তার উত্তাল লীলা নয়, অস্তিত্ব বোধের দৃঢ়তা। যেন তার বলবার অনেক কিছু আছে, জগতের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে অনেক কিছু বলবে সে। তার সমস্ত উপস্থিতি দিয়ে সে যেন তাই ঘোষণা করে। অনেকক্ষণ অরুন্ধতী প্রবীরের কথা ভাবলে। আর তার অপরূপ রূপের কথা। উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত রূপের কথা। তার অতীত জীবনের রঙিন স্বপ্নের কথা। যখন উৎপলাকে সে প্রথম ভাল বেসেছিল, প্রতিটি মূহুর্ত্ত তাদের পরস্পরের সামীপ্যের উষ্ণতায় যেন গুঞ্জরণ করে উঠত। অস্পষ্ট সন্ধ্যায় নদীর পাড়ে বসে' যত কথা তারা বলেছিল তখন, তার অস্ফুট ঝঙ্কার যেন অরুন্ধতীর কাণে বেজে উঠতে লাগল আর তাদের জীবনের পরিপূর্ণতার সুর। কত সুখী আজ তারা। তারপর মনে মনে অনেক কথার গাঁথনি গেঁথে কাগজ কলম নিয়ে অরুন্ধতী চিঠি লিখতে বস্‌লে :

প্রবীর আমার, সেদিন বারাকপুরের সেই নতুন ফিল্‌ম্‌ কোম্পানীর স্‌টুডিওটা দেখতে গিয়ে অযাচিত হৃদ্যতার অছুহাতে আমার বুকে যে ব্যথার কাঁটা বিঁধিয়ে দিয়ে গ্যাছ তার অসহ্য জ্বালায় আমি অস্থির। তোমাকে ছাড়া আমি যেন আর পারি না। আজকের এই ফাল্গুনের সকাল বেলাটা যেন আমার পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠছে। ইচ্ছা হচ্ছে, তোমার কাছে ছুটে গিয়ে অসংখ্য চুমোর ঘায়ে তোমাকে কেলি ক্লান্ত, অবসন্ন করে'। তুমি চোখ বুজে আমার কোলের উপর শুয়ে পড় আর আমি হাত বুলিয়ে দেই তোমার চুলে আর সঙ্কোচির -হওয়া মসৃণ গাল দুটোতে। তখন হয়তো আমার বুকের তলে চিৎকার করে' উঠবে একটা সুতীব্র কামনা। তা' উঠুক। আবার একটা কোকিল মাতাল

হ'য়ে চিৎকার করে' ডাকছে। আর আমার প্রাণের আবেগ যেন শত মুখ হ'য়ে উথলে উঠছে তোমাকে ভাসিয়ে রাখবে বলে। ধূপের ধোঁয়ার মতো আমার ভালবাসা যেন শুধুই চেয়ে আছে তোমার মুখ পানে। বাণীহীন একটি করুণ চাউনি হেনে। কিন্তু বৃথা! কমলিনীর দিকে চেয়ে চেয়ে চাঁদের দৃষ্টি আসে ম্লান, পাণ্ডুর হয়ে। হয়তো প্রতীক্ষার অপচয়ে আমি উঠবো রুক্ষ হ'য়ে। আর তুমি ছায়ার মতো, একটা অশরীরী প্রেতের মতো আমাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করবে চিরকাল। বন্ধু, বলতে পার, তোমাকে এতো ভাল লাগে কেন? এক নিশ্বাসে তিন গ্লাস শ্যাম্পেন খাওয়ার মতো মধুর, সুন্দর।' তারপর হঠাৎ তার-হাতটা কেঁপে উঠলো।

বার বার অরুন্ধতী সে-চিঠিখানা পড়লে। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে' সেখানাকে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। তবু তার শান্তি নেই। এমনি করে' সারাদিন উৎকণ্ঠা আর অশান্তিতে কাটিয়ে দিল। তারপর সন্ধ্যার ছায়া যখন লম্বা হ'য়ে ঢুলে পড়লো কোলকাতার রাস্তায়, উৎপলার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলে অরুন্ধতী। হয়তো সে আসবে রিণিকে গান শেখাতে। কিন্তু সত্যিই যখন এলো না, তার আধ ঘণ্টা পর উৎপলাদের বাসায় গিয়ে সে দেখলে উৎপলা গান গাইছে, আর তারি সামনে একটা চেয়ারে বসে' এক যুবক। একটা ঢোলা-হাতা পাঞ্জাবী তার গায় আর পরণে খুব মিহি একখানা কাপড়, যার ভেতর দিয়ে তার পরিহিত আণ্ডার উইয়ারের প্রত্যেকটি ভাঁজ দেখা যাচ্ছিল সুস্পষ্ট। পায়ে বার্নিস জুতো আর চোখে চশমা।

উৎপলা গান গাইছিল, বেশ দুলে দুলে সুরের অভিনবত্বে নিজকে ডুবিয়ে দিয়ে গান গাইছিল সে, আর সেই যুবক অপলকে চেয়ে ছিল উৎপলার দিকে। যেমন করে একটা চাতক চেয়ে থাকে আষাঢ়ের আকাশের দিকে। হঠাৎ অরুন্ধতীকে দেখেই লাফিয়ে উঠে বল্লে উৎপলা: অরু, সত্যিই তোকে আশা করেছিলুম অনেকক্ষণ থেকে। ভাবছিলুম, আমি যখন রিণিকে গান শেখাতে গেলুম না, তুই আসবি-ই। আয় বোস্ এখানে। (তার হাত ধরে' একরকম টেনে' নিয়েই টেবিল অর্গ্যানের কাছে বসালে উৎপলা।) তারপর আবার বল্লে: 'অরু, এ আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু। মালঞ্চ মিত্র এর নাম। এর লেখা পড়িস নি? মাইরি খুব ভাল লেখেন। (হাত তুলে পরস্পরে নমস্কার করলে) আর এ হচ্ছে 'বেল ফুল', মিস্ অরুন্ধতী সান্যাল। বেশ ডান্‌স্ করতে পারে। অবিশ্যি প্রোফেশনাল নয়। আর গান যা' গায়, চমৎকার। (মালঞ্চের দিকে চেয়ে বল্লে।) তবে মিস্ অরুন্ধতীর কাছে আমার অনুরোধ, তিনি যদি একখানা গান গাইতেন—ইনিয়ে বিনিয়ে বল্লে মালঞ্চ। মাপ কোরবেন মিঃ মিটার। শরীরটা ভাল নেই, বিশেষ করে মনটা।

আপনাকে জুলুম কোরবার মতো অধিকার আর সৌভাগ্য আমার নেই। তবে আপনি যদি দয়া করে'—'

নে অরু, আর ন্যাকমো করিস্‌নে। ভদ্রলোক যখন বলছেন, না-হয় নিজের একটু অসুবিধে স্বীকার করে' একখানা গান গা-ই। বল্লে উৎপলা।

বেশ তো তা' নয় হ'লো। তবে প্রথমে গানখানা বরং মিঃ মিটারের মুখ থেকে শোনা যাক।

• প্রিজ একস্‌কিউজ মি, মিস্। গান আমি গাইতে জানিনে। খুব আস্তে বল্লে মালঞ্চ, যেন ভোরের হাওয়া গাছের পাতায় মর্মরিত হয়ে উঠলো।

বেশ, গান তাহলে আমিও জানিনে। একটু মুচকি হেসে বল্লে অরুন্ধতী।

সে পরিচয় তো পাওয়া গ্যাছে আপনার বেলফুলের কাছ থেকে।

আচ্ছা উৎপলা, মিঃ মিটার কী সত্যিই গান গাইতে জানেন না? জিজ্ঞেস কোরলে অরুন্ধতী।

নাও জানতে পারেন।

তার মানে!

মানে টানে বুঝিনে। নিজেই যখন অস্বীকার করছেন তখন আমি কেমন করেই বা বলি যে তিনি গান জানেন।"

অরুন্ধতী আর মালঞ্চ দুজনেই হেসে উঠলো। অনেকক্ষণ কাটলো। কয়েকটা সোনালী মুহূর্ত্তে গড়িয়ে গেল তাদের পায়ের তলা দিয়ে। তারপর উৎপলা আবার তাদের ছিঁড়ে যাওয়া আলাপের সূত্রপাত করে বল্লে: ও অরু, মালঞ্চ বাবুর 'ওগো কালো কোকিল' বইখানা পড়েছিস্? এই তো সেদিন বেরুল।

না ভাই, আমাদের লাইব্রেরীতে এখনো নেওয়া হয়নি।

পড়ে দেখবি কী চমৎকার হয়েছে ও-বইটা। রবিবাবু আর শরৎবাবু তাদের বিশাল মন্তব্য প্রকাশ কোরেছেন।

কী-রে!

অনেক কিছু। লিখেছেন—তোমার বই পেয়েছি। ভালোও লাগলো খুব। এখন আর নতুন লেখকদের পর্য্যায় তোমাকে ফেলা চলেই না। তোমার লেখায় আছে বিশেষ একটা ভঙ্গী, অভি-

নব সুর, যা' সাধারণতঃ নতুন লেখকদের নেই। আশীর্ব্বাদ করি, ভবিষ্যৎ তোমার উজ্জ্বল হোক, জয়যুক্ত হোক। ইত্যাদি আবার শরৎবাবু লিখেছেন—মেয়েদের সুদূরতম, সূক্ষ্মতম রহস্য, দেখছি, সহজেই ধরা পড়ে গ্যাছে তোমার অন্তরের অন্তবীক্ষণে। তোমার এ বই পড়ে, আমার বিশ্বাস, মেয়েরা নিজেরাই অবাক হ'য়ে যাবে। বিস্মিত, লজ্জিত, মুগ্ধ হবে তোমার লেখার আরশায় তাদের প্রতিফলিত চেহারা দেখে।

তোর কপিখানা কোথা রে? আমায় একবার দেনা। কালকেই না হয় শেষ করে' আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

আমার কাছে নেই এখন। সিমলা ষ্ট্রীটের রঞ্জিতা নিয়ে গ্যাছে। রঞ্জিতাকে চিনলি তো? অই সেদিন কালীঘাট ট্রাম ডিপোতে দাঁড়িয়ে যার সঙ্গে কথা বল্লুম।

ও-ও।

থাক না, আমিই না হয় কালকে আপনাকে একটা কপি দিয়ে যাব। (একটু থেমে আবার) আরে প্রবীর বাবুকেও যে একটা কপি দিয়ে গেছলুম। সেটাও কি নেই নাকি!—মলয় বল্লে।

বেরিয়ে যাবার সময় নিয়ে গ্যাছেন তিনি।

হ্যাঁরে উৎপলা, প্রবীর বাবু কোথায় গ্যাছেন রে? খুব আস্তে জিজ্ঞেস করলে অরুন্ধতী, হয়তো তার বুকের রক্ত থেকে খানিকটা ফিনকি বেরিয়ে আসতে পারে।

দমদম্‌।

কখন ফিরবেন?

সন্ধ্যারই তো ফেরবার কথা ছিল। কিন্তু এখনো ত এলো না।

আবার স্তব্ধতা।

অনেকক্ষণ চুপ করে' থেকে তারপর বল্লে মালঞ্চ: রেস্ট্‌ এ্যাসিওরড মিস্‌। কালকেই বই আপনি পেয়ে যাবেন। এবার এবার কাইণ্ডলি একটা গান করুন। (বেশ অনুনয়ের সুরে)। অরুন্ধতী একটা গান ধরলে: 'বিদায় বেলার মৌন মাঝে

আমার প্রিয়ে যাওগো ভুলে,
আর চেওনা আমার পানে
অশ্রু-পিচ্ছিল নয়ন তুলে'

প্রাণের সমস্ত ঘুমন্ত অনুভূতি দিয়ে গাইতে গাইতে অরুন্ধতীর চোখ থেকে গড়িয়ে এলো কয়েক ফোটা জল। সে যেন ব্যথা পেলে পাথরের মতো নিরক্ত, কঠিন সে ব্যথা। আর মালঞ্চ মুগ্ধ হ'লো। তার চোখের আশ্চর্য্য দীপ্তি বিস্ফারিত করে' সে তাকিয়ে রইলো অরুন্ধতীর চোখের দিকে। আর অপেক্ষা করতে লাগলে, হয়তো যদি আসে মুহূর্ত্তের আত্ম-বিস্মৃতি, যদি যদি মুহূর্ত্তের জন্যও ক্ষণিকের কোন আবেশে সে অরুন্ধতীর প্রেমে, উন্মাদ, উচ্ছ্বসিত প্রেমে পড়তে পারে, সে ধন্য হবে, জ্যোতিষ্মান হবে। লাভ কোরবে নতুন জীবন।

[ক্রমশঃ]

বীমা প্রসঙ্গ

শ্রীবীমানন্দ শর্ম্মা

ভারতীয় বীমা-কর্ম্মী সম্মেলন

ইনডিয়ান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ফিল্ড ওয়ার্কাস' এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারী জানাইতেছেন যে, বাৎসরিক সম্মেলনের জন্য অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার আন্দোলন চলিতেছে এবং ২৫ জন সভ্য সদস্য তালিকাভুক্ত হইলেই প্রেসিডেন্ট, চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কার্য্যনির্ব্বাহক মনোনয়নের জন্য সভা আহুত হইবে?

অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী নির্ব্বাচন সাপেক্ষ থাকায় এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারীর উপরেই উক্ত পদের কার্য্যভার নিয়োজিত হইয়াছে এবং তাঁহার সহিতই সমস্ত পত্র বিনিময় ও টাকা পয়সার আদান-প্রদান করিতে হইবে।

যে কোন ভারতীয় কোম্পানীর কর্ম্মী ২৲ টাকা দিয়া অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য হইতে পারেন।

ভারতীয় কোম্পানীর নিয়োজিত যে কোন বীমাকর্ম্মীই সম্মেলনের কার্য্যালোচনায় যোগ দিয়া প্রতিনিধি হিসাবে ভোট দিতে পারেন। প্রতিনিধির ফি এক টাকা।

সম্মেলনের তারিখ, সময় ও কার্য্যক্রম যথা সময়ে বিজ্ঞাপিত হইবে।

মাদ্রাজে "ন্যাশন্যালে"র নব গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন

১লা মে তারিখ মাদ্রাজে কলিকাতার ন্যাশন্যাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর শাখা কার্য্যালয়ের নিজস্ব স্থায়ীর দ্বারোদ্ঘাটন

হইয়াছে। স্যর পি, এস শিবস্বামী আয়ার এই উৎসবের পৌরহিত্য করেন। এই উপলক্ষে তথায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল।

নিউ ইণ্ডিয়ার নূতন কাজ

জানা গেল, নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে একৎকোটী ছিয়াত্তর লক্ষ, ৪১ হাজার ৭৫০ টাকার নূতন জীবন বীমা পত্র বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা ইহার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

—

স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি

প্রসিদ্ধ প্রতিভাবান ব্যবসায়ী স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ১৫ই মে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ন্যাশন্যাল ইনডিয়ান লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সমূহ ক্ষতি হইল। এই কোম্পানীকে স্যর রাজেন নিজ হাতে গড়িয়া তোলেন এবং প্রথম হইতে তিনি ইহার চেয়ারম্যান ছিলেন।

—

পরলোকে ডাঃ এম, এ আনসারি

ডাঃ মুক্তার আহম্মদ আনসারির পরলোক গমনে আমরা আন্তরিক গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ দেশমাতৃকার সাধক খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে ডাঃ আনসারি যেরূপ আন্তরিক উৎসাহ প্রকাশ করিতেন, তেমনি বীমা ব্যবসায়েও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। পরলোকগত পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সহযোগিতায় তিনি ট্রপিক্যাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং মৃত্যু অবধি বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি উহার চেয়ারম্যান ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইষ্টার্ণ ফেডারেল ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সঙ্গেও তিনি বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন।

—

খুচরো খবর

নিউ এশিয়াটিক ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব এজেন্সি ম্যানেজার মিঃ বিজয়নারায়ণ সেন সম্প্রতি বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

—

ওরিয়েণ্টলের নাগপুরের অরগানাইজার মিঃ এস, এম ঘটক কোম্পানীর কলিকাতা শাখায় যোগদান করিয়াছেন।

—

হিন্দুস্থানের ঢাকা অফিসের ম্যানেজার ডাঃ পরিমল রায় কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

—

ট্রপিক্যাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার সেক্রেটারী পদ কিছুদিন যাবৎ শূন্য ছিল। আমরা জানিতে পারিলাম এই পদে মিঃ জি, এল মিত্র যোগদান করিয়াছেন।

—

ভুজঙ্গ বিলাসিনী রূপসী

এ বিজনে কে তুমি রূপসী?

মিঃ এলিসের ভীতি বিহ্বল কণ্ঠ হইতে সহসা এই অস্ফুট প্রশ্ন উত্থিত হইল। কিন্তু যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া তিনি এই প্রশ্ন করিলেন তাঁহার কর্ণকুহরে ইহা প্রবেশ করিল না। মৃদুল প্রভাতী পবনে পত্রের মর্ম্মর শব্দে তাঁহার সে অস্ফুট স্বর গহন বনানীর বুকে কোথায় মিলাইয়া গেল। মিঃ এলিস শুধু মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় অপলক নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রভাতের রক্তিম অরুণালোকে তিরাই জঙ্গলের বৃক্ষ শীর্ষগুলি তখন সবে মাত্র সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে স্বর্ণরশ্মি বনানীর গহন বুকে তখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই। নানাজাতীয় বন্য বিহঙ্গের ককলীতে নিঃস্তব্ধ বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। মিঃ এলিস বৃক্ষ শাখা হইতে তন্দ্রাবিজড়িত নয়নে একবার উপরের দিকে চাহিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

পূর্ব্বদিন পূর্ব্বাহ্নে তিনি তিরাইয়ের এই জঙ্গলে শিকারান্বেষণে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সারাদিন শিকার সন্ধানের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর ক্ষুৎপিপাসায় মিঃ এলিস অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। বনের কণ্টক লতাগুল্মে তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। একাকী এ বিজন বনে থাকা বিপদজনক মনে করিয়া তিনি বন হইতে বাহির হইবার জন্য আকুলি বিকুলি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই পথ খুঁজিয়া পাইলেন না। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে বনানীর বুকে ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। পথহারা শিকারী

বন প্রদেশে নিশা যাপন করা ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই দেখিয়া অবসন্ন দেহে এক বৃক্ষ শাখায় আরোহন করিলেন। ক্ষুৎ-পিপাসার তাড়নায়, ক্ষতবিক্ষত দেহের যন্ত্রণায় এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় তাঁহাকে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হইল।

পরদিন তিরাইয়ের তরুশীর্ষে প্রভাতের অরুণালোক দেখিয়া তিনি যেন নবজীবন লাভ করিলেন। বৃক্ষ শাখা হইতে নামিবার পূর্ব্বে মিঃ এলিস সহসা নীচের দিকে চাহিয়া যাহা দেখিতে পাইলেন তাহাতে তিনি স্তম্ভিত ও বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বিস্ময় বিহ্বল কণ্ঠ হইতে সহসা অস্ফুট প্রশ্ন উত্থিত হইল

—এ বিজনে কে তুমি রূপসী ?

বনানীর বুক হইতে অন্ধকারের অস্পষ্ট যবনিকা তখনও সম্পূর্ণ অপসারিত হয় নাই। আলো-আঁধারের সেই লুকোচুরির মধ্যে মিঃ এলিস দেখিতে পাইলেন, এক অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী তরুণীকে। মিঃ এলিস পদস্থ সরকারী কর্মচারী। চাকুরীর দায়ে তাঁহাকে অনেক দেশবিদেশে ঘুরিতে হইয়াছে এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির বহু রূপসী তরুণীই তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইয়াছে। তাছাড়া সত্যই যাদের রূপের খ্যাতি বিশ্বভুবনে বিদিত তাঁহাদিগকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার না ঘটিলেও অনেকেরই প্রতিকৃতি তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু কৈ এমন অলোকসামান্য রূপ ত কোনদিন তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। প্রভাতালোকে মিঃ এলিস বৃক্ষ শাখা হইতে চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু কোথাও লোকালয়ের কোন চিহ্ন দেখিতে পান নাই। কিন্তু এত প্রত্যুষে এ তরুণী আসিল কোথা হইতে? তবে কি এ বনদেবী! মানবীতে এত রূপ ত সম্ভবে না। এক লহমায় ভিতর মিঃ এলিসের অবসন্ন মস্তিষ্কে কত চিন্তা-তরঙ্গই না উত্থিত হইল। তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় চিত্রার্পিতের ন্যায় বৃক্ষ শাখা হইতে রূপসীর অপরূপ রূপ সুধা প্রাণ ভরিয়া পান করিতে লাগিলেন।

আপন রূপের প্রভায় বনভূমিকে উজ্জ্বল করিয়া তরুণী বসিয়াছিল এক নাতিদীর্ঘ বৃক্ষের তলদেশে। তাহার সে চূর্ণ কুন্তলগুলি রক্তিম কপোলের পরশ লাভের আশায় চঞ্চলভাবে হেলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছিল। কখনও বা মৃদুল বাতাসে অসংবদ্ধ কেশপাশ কণ্টকগুল্মগুলিকে সাদরে আলিঙ্গন করিতেছিল। তরুণীর কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে পরিধেয় বস্ত্রের অভ্যন্তর হইতে একটি বাঁশী বাহির করিয়া আপনার মনে বাজাইতে লাগিল। বাঁশীর লহরীতে বনভূমি যেন আকুলিয়া উঠিল।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে বংশীধ্বনি নীরব হইল। স্বরের রেশ বাতাসে মিলাইতে না মিলাইতে মিঃ এলিস বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, অদূরে একটি দীর্ঘ শ্বেতকায় ভুজঙ্গ যেন তখনও বাঁশীর স্বর লহরীর তালে তালে হেলিয়া দুলিয়া আকুল আগ্রহে তরুণীর দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সে দৃশ্য দেখিয়া মিঃ এলিসের অন্তরাত্মা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তরুণীর শমন শিয়রে ভাবিয়া মিঃ এলিস একবার মনে করিলেন সাপটাকে এখনি গুলি করিয়া মারিবেন কিন্তু তাঁহার শিথিল হাত তাহাতে সক্ষম হইল না।

এদিকে ভুজঙ্গবর তখন তরুণীর অঙ্গে মাধবীলতার ন্যায় জড়াইয়া ঘন ঘন তাহার মুখ চুম্বন করিতেছে। তরুণীও পরমাগ্রহে দুই বাহু পাশে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া অধরে অধর মিশাইয়া দিয়াছে। ঠিক যেন প্রেমিক প্রেমিকার প্রেমালাপ। মিঃ এলিস এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া প্রথমটা শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু তার পর অহি মানবীর এই অপূর্ব্ব প্রেমালাপ দেখিয়া তিনি বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে পরস্পরের মৌন আলাপন ও মুখ চুম্বন বিনিময়ের পর সাপটি তরুণীর দেহলতার আবেষ্টন ছাড়াইয়া আপনার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। রূপসীও বনভূমি ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। মিঃ এলিস ধীরে ধীরে বৃক্ষশাখা হইতে অবতরণ করিলেন এবং আধা বাংলা আধা হিন্দিতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি

রূপসী এবং কোথা হইতেই বা এ বিজন বনে আসিয়াছ ?

জনমানবহীন বনানীর গহন প্রদেশে সহসা মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তরুণী সচকিত হইয়া উঠিল এবং পিছু ফিরিয়া দেখিল, এক সাহেব তাহার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া।

তরুণী সাহেবের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া একবার রোষ কষায়িত নয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু মিঃ এলিস তাহাতে একটুও সঙ্কুচিত না হইয়া বরং অধীর আগ্রহে উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তরুণী মুখ ফিরাইয়া কহিল, সাহেব। তুমি বুঝি লুকাইয়া এতক্ষণ সব দেখিয়াছ ? এ কিন্তু তোমার ভারী অন্যায়। এত প্রত্যূষে এ বিজন বনভূমে তুমি আসিলে কি প্রকারে ? যাহা দেখিবার দেখিয়াছ, কিন্তু আর কোনদিন এমন দুশ্চেষ্টা করিও না। বলিয়াই তরুণী সাহেবের প্রতি একবার বক্র কটাক্ষ হানিয়া আপনার গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। মিঃ এলিস অনিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু মানবী কি মায়াবিনী সন্দেহে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিবার একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও সাহস পাইলেন না। তরুণী বৃক্ষের অন্তরাল হইতে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মিঃ এলিস বাসায় ফিরিলেন বটে, কিন্তু গত দিবসের ক্ষুৎ পিপাসায় কাতরতা, অনিদ্রা, উদ্বেগ ও শারীরিক ক্লেশের কথা কিছুই তাঁহার চিত্তে স্থান পাইল না। তাঁহার সমগ্র চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল, বনদেবীর সেই ভুবন ভুলানো রূপ রাশি, তাহার চঞ্চল নয়নের সেই চটুল চাহনি। আফিসের কাজের মাঝেও তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিত রূপসীর সেই আবেশমাখা মুখচ্ছবি, প্রিয় পরিজনের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মধ্যেও তাহার সেই বিস্ময় ও রোমাঞ্চকর প্রণয় কাহিনী ও বঙ্কিম চাহনীর কথাই মনে পড়িত। মিঃ এলিস সাগ্রহে আবার তাহার দর্শনের আশায় অবকাশের দিন গণিতে লাগিলেন।

সেদিন রবিবার। সকাল সকাল আহারাদি শেষ করিয়াই মিঃ এলিস শীকারে বাহির হইলেন তিরাইয়ের সেই জঙ্গলে। গতবারের বিপদের কথা স্মরণ করিয়া ভৃত্যদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিল, কিন্তু তিনি কাহাকেও সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন না। একটী বাঞ্ছিতার অভিসারে দুর্গম বন প্রদেশে যাত্রা করিলেন।

তিরাইয়ের জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া তিনি ইতস্ততঃ লোকালয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন, এমন সময় শুষ্ক পত্রের উপর অদূরে কাহার পদধ্বনি শুনা গেল। মিঃ এলিস ভয় চকিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন এক দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী, পরিধানে গেরুয়া বসন, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, গলায় রুদ্রাক্ষের সহিত হাড়ের মালা, আবক্ষ বিলম্বিত পক্ক শ্মশ্রু।

বন প্রদেশে সাহেবকে দেখিয়াই সন্ন্যাসী উদ্বেগ কাতর কণ্ঠে কহিলেন, সাহেব, আমার কন্যা আজ কয়দিন যাবৎ গুরুতর পীড়িতা, তুমি যখন সাহেব তখন নিশ্চয়ই ডাক্তারীও তোমার জানা আছে, যদি দয়া করে একবার আমার কুটীরে যাও তা হলে বোধ হয় তার প্রাণ রক্ষা হ'তে পারে। সন্ন্যাসীর মুখে এই কথা শুনিয়া মিঃ এলিস মনে মনে ভাবিলেন, কে এই সন্ন্যাসী, সেদিন ত কোথাও কোন সন্ন্যাসী তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। তবে কি তাঁহার সেই বাঞ্ছিতা রূপসীই এই সন্ন্যাসীর কন্যা ? যাহা হৌক, আমি যে আজ এ জঙ্গলে আসিয়াছি সন্ন্যাসী তাহা জানিল কিরূপে এবং আমাকে দেখিয়া ডাক্তার বলিয়া তাহার ধারণা হইল কি প্রকারে ? সেই সঙ্গে মিঃ এলিসের অন্তরে একটা আশঙ্কাও দেখা দিল। সে দিন তিনি রূপসীর অলক্ষিতে বনভূমে তাহার প্রিয় সম্ভাষণ দেখিয়াছিলেন। হয়তো তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তরুণী পীড়ার ছল করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতে পাঠাইয়াছে। অনেক কিছু ইতস্ততঃ করিয়া মিঃ এলিস সন্ন্যাসীর সহিত রোগিণীকে দেখিতে যাওয়াই স্থির করিলেন। আর তাঁহার শিকারে আসার উদ্দেশ্যও ত সেই বন দেবীর সাক্ষাৎ লাভ। মিঃ এলিসের মনে জাতীয় গর্ব্বের কথা স্মরণ হইল, তিনি পকেটে হাত দিয়া রিভলবারটাকে একবার দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিলেন। তারপর রোগিণী ও তাঁহার রোগ রহস্যের কিনারা করিবার জন্য সাহসে নির্ভর করিয়া সন্ন্যাসীকে কহিলেন, চল. তোমার সঙ্গে যাইতে আমি প্রস্তুত।

সন্ন্যাসী আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিলেন, মিঃ এলিস তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বিস্তীর্ণ বনানীর প্রান্তে লতা গুল্মে ঢাকা একটী ভগ্ন দেউলের নিকট আসিবার পর সন্ন্যাসী বলিলেন, এই মন্দিরের মধ্যে আমার কন্যা আছে। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পার। এই বলিয়া সন্ন্যাসী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। মিঃ এলিস চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন,

মন্দিরটী লতাগুল্মে এমনি আচ্ছাদিত যে বাহির হইতে মন্দির বলিয়া বুঝিবার কোন উপায় নাই। নিকটে আর কোন লোকালয়ের চিহ্ন মাত্র নাই। মিঃ এলিস মন্দিরের দ্বার দেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ। তিনি কয়েকটা ধাক্কা মারিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। মিঃ এলিস বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, এ তাঁহারই সেই বাঞ্ছিতা বনদেবী! কিন্তু সন্ন্যাসী যে পীড়ার কথা বলিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল, ইহার শরীরে পীড়ার ত কোন লক্ষণ দেখা যায় না। তবে কি তিনি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই সত্য! মিঃ এলিস মনে মনে একটু শঙ্কিত হইলেও বাহিরে সে ভাব প্রকাশ করিলেন না, পকেটের ভিতর হাত দিয়া রিভলবারটাকে আর একবার দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিলেন। তরুণী একবার সাহেবের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য সহকারে কহিল, সাহেব! এই বিজন বনে একাকী আসিতে তোমার ভয় করেনা?

—ভয়? তোমার মত অপ্সরী যেখানে বাস করে সে ত নন্দন কানন, সেখানে আবার ভয় কিসের?

একজন সাহেবের মুখেও নিজের রূপের খ্যাতি শুনিয়া রূপসী আত্মগর্ব্বে মনে মনে বেশ একটু উল্লসিত হইয়া সাহেবের প্রতি কটাক্ষ হানিলেন। মিঃ এলিস কহিলেন, সন্ন্যাসী যে আমাকে তোমার চিকিৎসার জন্য ডাকিয়া আনি-লেন, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া ত অসুস্থ বলিয়া মনে হয় না।

তরুণী এবার আর হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিল, অসুখ কারো হয়নি সাহেব, আজ আমাদের দেবতার উৎসব, তাই তোমাকে সে উৎসবে যোগ-দান করবার জন্য আহ্বান করেছি।

এই বলিয়া রূপসী সাহেবকে মন্দিরের অভ্যন্তরে বসিবার আসন দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মিঃ এলিস মন্দিরের চারিদিকে দৃষ্টি-পাত করিলেন, কিন্তু কোথাও কোন দেব-তার বিগ্রহ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। তিনি দেখিলেন, মন্দিরের ভিতরে যৎসামান্য কয়েকটী তৈজসপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং এক কোণে একখানি মাদুর গুটানো আছে মাত্র।

মিঃ এলিস তরুণীর আহ্বানের প্রকৃত উদ্দেশ্য তখনও বুঝিতে না পারিয়া ঘটনার শেষ পরিণতি দেখিবার জন্য একাকী মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তরুণীর আগমন প্রতীক্ষায় তিনি মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া আছেন, এমন সময় ভিতরে একটা হিস্ হিস্ শব্দ উত্থিত হইল। মিঃ এলিস সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, সে দিনকার বনের সেই শ্বেতকায় ভুজঙ্গটী প্রকাণ্ড ফণা তুলিয়া তাঁহার দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। সে দৃশ্য দেখিয়া মিঃ এলিসের অন্তরাত্মা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তিনি সাহসে নির্ভর করিয়া পকেট হইতে টোটা-ভরা রিভল-বারটা বাহির করিলেন এবং কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া সর্পের মস্তক লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি দুইবার গুলী করি-লেন। গুলীর আঘাতে ভুজঙ্গের প্রাণ-হীন দেহ কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল।

মিঃ এলিস তখনও বদ্ধ মুষ্টিতে রিভল-বারটী চাপিয়া ধরিয়া আছেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল।

মন্দিরের ভিতর হইতে অকস্মাৎ গুলীর শব্দ শুনিতে পাইয়া তরুণী কোথা হইতে ব্যস্ত ত্রস্তভাবে ছুটিয়া আসিল এবং মন্দিরের মেঝেতে তাহার প্রিয়তমের প্রাণহীন দেহ বিলুণ্ঠিত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। মিঃ এলিস তখনও পূর্ব্ববৎ রিভলবার হস্তে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া।

তরুণী কিছুক্ষণ প্রিয়তমের প্রাণহীন দেহের প্রতি অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল। তারপর ভুজঙ্গের মৃত দেহটী একবার সাগ্রহে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল।

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তরুণীর সে শোক বিহ্বল উদভ্রান্ত ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ক্রোধে তাহার অমল কমল সদৃশ আনন-খানি রক্তিমাভ ধারণ করিল, স্নিগ্ধ নয়ন দুইটী হইতে অগ্নি-জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। সঘন নিঃশ্বাসে বক্ষস্থল দ্রুত স্পন্দিত হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে মৌন শান্ত মূর্ত্তি রণ চণ্ডীর মূর্ত্তি ধারণ করিল।

মিঃ এলিস সভয়ে একবার তরুণীর দিকে চাহিলেন। চারি চক্ষের মিলনে তরুণীর দু নয়নের দীপ্ত বহ্নিজ্বালায় মিঃ এলিসের সমস্ত শক্তি যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল। তিনি অতিকষ্টে রিভলবারটাকে চাপিয়া ধরিয়া শ্লথ চরণে মন্দির হইতে বাহির হইলেন।

তরুণী তখনও তাঁহার দিকে তেমনি রোষ কষায়িত নয়নে চাহিয়া।

তারপর আজ কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু তিরাইয়ের জঙ্গলে ভুজঙ্গ বিলাসিনী সেই তরুণীর কোমল ও কঠোর মূর্ত্তি বিশেষতঃ বিদায় বেলায় বিরহ বিধুরা রুদ্রাণীর দু'নয়নের সে বহ্নি জ্বালায় দৃপ্ত মনে পড়িলে আজও তাঁহার অন্তর অলক্ষ্যে কাঁপিয়া উঠে।

ছায়া ও কায়া

শ্রীমধু বসু

বিজয়া

গত শুক্রবার ১২ই জুন আমরা নব নাট্যমন্দিরে 'বিজয়া' দেখতে অনেক আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম—এ অভিনয়ের বিশেষত্ব ছিল প্রধান ভূমিকাগুলিতে শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের অবতরণ, যথা, রাসবিহারী—অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেন—শিশির ভাদুড়ী ও বিলাস—ভূমেন রায়। অন্যান্য ভূমিকা-লিপি পূর্ব্ববৎ ছিল।

দেখা গেল, বর্ত্তমানে 'বিজয়া' কতদূর নিম্নশ্রেণীতে নেমে গেছে। পূর্ব্বের অভিনেতৃরা স্ব স্ব ভূমিকায় অতি অভিনয়ের মারায় আচ্ছন্ন হয়ে সকলের বিরক্তিভাজন হয়েছেন। নাম ভূমিকায় কঙ্কাবতী পর্য্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছেন। বিজয়ার শিক্ষা দীক্ষা এমন সুন্দর বাতে বিলাস কটূক্তি করলেও সে যেভাবে তার রাগ প্রকাশ করে তাতে তার সংযমের অভাব থাকে না। কঙ্কাবতী পূর্ব্বে সেইভাবেই অভিনয় করতেন কিন্তু এখন তিনি গ্যালারী দর্শকের প্রতি সদয়া হয়ে তাদের মন ভোলাতে চাচ্ছেন, অথচ তার পূর্ব্বের অভিনয় কিন্তু সর্ব্বশ্রেণীর দর্শককেই অশেষ আনন্দ দান করেছিল। বৃদ্ধ বয়সে শীতল পাল পর্য্যন্ত 'ভালবাসে' কথাটা কৌতুকরসের মধ্য দিয়ে বলতে আরম্ভ করেছেন। শিশির-কুমার টাকমস্তক ও রেখামণ্ডিত মুখ নিয়ে নরেনের মত এক যুবকের ভূমিকায় নেমেছেন। আহা কি চমৎকারই না মানিয়েছিল। ভেবেছিলেন বাংলাদেশের দর্শকেরা তাঁকে দেখলেই সব ভুলে যাবে, কি হবে প্রসাধন করে। হ্যাঁ বাংলা দেশের দর্শকেরা তাকে ভালভাবেই চেনে তা সত্য। তাহলে তিনি যখন রাসবিহারীর মত বৃদ্ধের ভূমিকায় নামেন তখন মুখসজ্জা করেন কেন? বাক্ চেহারা যেমন বিরক্তিজনক, কণ্ঠস্বর তেমনি ভারী—অভিনয়ে একটী রসিক দর্শককেও আনন্দদানে সমর্থ হননি। আগাগোড়া তিনি যেভাবে অভিনয় করেছেন তাতে শরৎ অনুরাগী দর্শকেরা মর্ম্মাহত হয়েছেন, আর বিস্মিত হয়ে দেখেছেন বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের একটী চরিত্রকে কেমন করে বিকৃতরূপ দিয়ে চলেছেন। নরেনের চরিত্র যেভাবে লেখক অঙ্কিত করেছেন তার সহিত কোন সামঞ্জস্য আমরা শিশিরকুমারের নরেনের পেলাম না। আগাগোড়া তিনি বলতে চেয়েছেন—"আমি শিশির ভাদুড়ী, আমাকেই তোমরা দেখ।" অমন আত্মভোলা, সুন্দর চরিত্রটীর যে এমন বিকৃতরূপ কোন শক্তিশালী অভিনেতা দিতে পারেন আমাদের সে ধারণা পূর্ব্বে ছিল না। চিঠি পড়ার পর বিজয়ার সেই অবস্থা দেখে নরেন না বলে প্রস্থান করে, এখানে বিশ্বনাথের অভিনয় হয়েছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। শিশিরবাবু সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ভাবে প্রস্থান করলেন। নরেন উচ্চশিক্ষিত চমৎকার তার স্বভাব, সেই নরেন একজন সম্ভ্রান্ত তরুণীকে 'সপায়' বলছেন। এতটা গ্যালরীসুলভ অভিনয় যে বাংলার শ্রেষ্ঠ নট করতে পারেন সে ধারণা আমার ছিল না। বিশ্বনাথের অভিনয় ঢের বেশী উপভোগ্য হয়েছিল। বিলাসের ভূমিকায় ভূমেন রায়ের অভিনয় ভাল হয়েছে, বেশী বাড়াবাড়ি না করে তিনি সহজতররূপে অভিনয়

করে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। রাসবিহারীর ভূমিকায় অহীনবাবুর অভিনয়ের প্রথমাংশ হয়েছে চমৎকার, তাঁর কনসেপসান হয়েছে সুন্দর, আগাগোড়াই তিনি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মূল রাসবিহারীর চরিত্রকে অনুসরণ করে গেছেন এবং এজন্যই তাকে বিশেষভাবে প্রশংসা করছি। গ্যালারীর দর্শকদের প্রতি তাঁর বেশ টান আছে তা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু এবার তাদের প্রতি তিনি বেশী দৃষ্টিপাত করেন নি দেখে সুখী হয়েছি। এই চরিত্রাভিনয়ে শিশিরকুমার হাততালির মায়ায় আচ্ছন্ন থাকতেন অত্যধিক মাত্রায়। অহীনবাবু শেষের দিকে আর তেমন প্রাণ দিয়ে অভিনয় করেন নি, ফলে রাসবিহারীর ওই অংশগুলি তেমন জমাট হয় নি। অবশ্য এরূপ ২১ দিনের জন্য কোন ভূমিকায় নামতে হলে অভিনেতারা ক'দই তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন। কিন্তু শিশির বাবু তো নরেনের ভূমিকায় রীতিমত মহলা পর্য্যন্ত দিয়েছিলেন, সুতরাং নরেন চরিত্রে তার ওই রূপ দেখে সত্যই দুঃখিত হয়েছি।

কায়া-জগৎ

নব নাট্যমন্দিরের 'অচলার' সাড়াশব্দ তেমন পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য নাটক সম্পূর্ণ হয়ে ৭ দিনের মহলাতেই বই খোলা যায়; সুতরাং জুলাইয়ের প্রারম্ভে এর দেখা পেলেও বিস্মিত হব না।

রঙমহলে এবার নাকি 'চক্রব্যূহ' প্রণেতা নট-নাট্যকার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের একটী নতুন নাটক মঞ্চস্থ হবে। কোন বিদেশী নাটকের ছায়া অবলম্বনে ভট্টাচার্য্য মশাই এ নাটক লিখেছেন নাকি। এ সবই শোনা কথা, সুতরাং এ নিয়ে বেশীদূর অগ্রসর না হওয়াই ভাল।

তবে যদি এ কথা সত্য হয় তাহলে আমরা যথার্থই আনন্দিত হব, কারণ 'সর্বহারা' যদি থাকে তাহলে সত্যিই সমস্ত হারাতে হতে পারে। বৃথাই সতু বাবু বাজে নাটকের পেছনে শক্তি ব্যয় করেছেন।

নাট্য নিকেতনে আগামী ১লা জুলাই হতে একখানা পঞ্চাঙ্ক নৃত্য-গীত বহুল নাটকের অভিনয় হবার কথা আছে। নাট্য জগতের বিচক্ষণ কর্ম্মী শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র গুহের মধ্যমপুত্র বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুধীর গুহ এ নাটক প্রযোজনা করবেন। এখানে অভিনীত সমস্ত নাটকের প্রযোজনায় সুধীরবাবুর কৃতিত্ব বড় কম নয়, এবার তিনি নিজেকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ করছেন, তার প্রথম প্রচেষ্টা সার্থক হোক।

আরব্য উপন্যাসের মনোরম কাহিনী আলাউদ্দিন ও আশ্চর্য্য প্রদীপ অবলম্বনে এই নাটক গড়ে উঠেছে—সুধীর বাবুর নির্দ্দেশমত এখানাকে রঙ্গালয়ে অভিনয়ের মত করে লেখা হয়েছে। দৃশ্য-পট ও সাজ-পোষাকের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ খরচ করবেন মুক্তহস্তে, ভূমিকায় অহীনবাবু ও নরেশ বাবু ছাড়া সম্প্রদায়ের সমস্ত নামজাদা নট-নটীরা অভিনয় করবেন যথা,—রবি ও ভূমেন রায়, মণি ঘোষ, সন্তোষ দাস, জহর গাঙ্গুলী, নিরুপমা, চারুবালা, দুর্গারাণী প্রভৃতি। আলাউদ্দিনের ভূমিকায় নামবেন জহর গাঙ্গুলী, আর জিনের ভূমিকায় দেখা দেবেন ভূমেন রায়। একটী নতুন ধরণের ভূমিকায় রবি রায় অভিনয় করবেন। নায়িকার ভূমিকায় একটী সুশ্রী ও সুগায়িকা অভিনেত্রীর দেখা পাওয়া যেতে পারে। দুর্গারাণী অনেকগুলি গান গাইবেন। সম্পূর্ণ নতুন ধরণে এই নাটকাভিনয় হবে বলে আমরা আগ্রহান্বিত হয়ে রইলাম। ১লা, ২রা, ৩রা জুলাই

এই নাটক অভিনীত হবে এবং ৪ঠা ও ৫ই 'কেদার রায়ের' পরে পুনরায় অভিনয় হবে এই নাটকের।

রূপমহলের খবর যা পূর্ব্বে দিয়েছিলাম অর্থাৎ শুভ রথ যাত্রার দিন মণিলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটকের উদ্বোধন অভিনয় হবে।

মিনার্ভার 'দস্যু' বেশ দর্শক আকর্ষণ করছে। কারাজগতের আর তেমন খবর নেই।

নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর খবর কি? অত বড় অভিনেতার চাহিদা কি একেবারেই নেই? কত বড় অভিনেতা তা তিনিই জানেন, তবে আমরা তাকে এক-জন ভাল অভিনেতা বলেই জানি, তাই তাকে কোন রঙ্গালয়ে যোগ-দিতে দেখলে সত্যিই আনন্দিত হব। দর্শকেরা বড়ই ভোলানাথ, তাই বেশীদিন কাউকে না দেখলে তাকে সহজেই ভুলে যায়। আশা করি, নির্ম্মলেন্দু বাবু শীঘ্রই কোন রঙ্গালয়ে স্থায়ীভাবে যোগদান করবেন।

ওরিয়েণ্টাল কিনেটোনের "রামকান্তের" একটী দৃশ্যে

সুশীলাসুন্দরী

প্রৌঢ়া অভিনেত্রীর সংখ্যা বর্ত্তমানে খুবই কম, তাই সুশীলা সুন্দরীর মত শক্তিশালিনী অভিনেত্রীর বসে থাকা সমর্থন করা যায় না। অবশ্য সেই অশেষ শক্তিশালিনী অভিনেত্রীর শক্তিতে ভাঁটা পড়েছে, তবু যা আছে তাই বা ক'জনের আছে? তাই তাকে স্থায়ীভাবে কোন রঙ্গালয়ে যোগ দিতে দেখলে খুবই খুশী হব।

কালী ফিল্ম্স্

উত্তরায় গত শনিবার হতে নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণার মন্দির' ও বীরেন ভদ্রের 'ভোট ভণ্ডুলের' চিত্ররূপ প্রদর্শিত হচ্ছে। আমরা আগামী সপ্তাহে 'অন্নপূর্ণার মন্দি-রের' পরিচয় পত্রস্থ করবো।

সুকুমার দাশগুপ্তের 'আশিয়ানা'র একটি করুণ দৃশ্যের স্যুটিং শেষ হয়েছে। এই দৃশ্যে নায়িকার মৃত্যু হয়, নিউ থিয়ে-টার্সের অভিনেত্রী দেববালা এ চরিত্রে রূপদান করেছেন।

মর্ডার্ণ লেডী 'বা হিন্দি তরুণীর পরি-চালক জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমানে মহলা দেওয়াচ্ছেন, শীঘ্রই পূর্ণ ভূমিকালিপি জানাবার ইচ্ছা রইল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মুক্তি স্নানের' চিত্র নাট্য রচনায় পরিচালক সুশীল মজুমদার বিশেষভাবে ব্যস্ত আছেন। হপ্তাখানেকের মধ্যেই এ কাজ শেষ হয়ে যাবে, তৎপর তিনি শিল্পী নির্ব্বাচনে মনোনিবেশ করবেন। পত্রান্তরে প্রকাশ, কুমারী লীলা হালদারকে নাকি নায়িকার ভূমিকায় নামাবার কথা চলছে,

তা যদি সত্য হয় তাহলে আমরা নির্বাচকের তীব্র নিন্দা করতে বাধ্য হব, কারণ শীলার না আছে চিত্রোপযোগী সুন্দর দেহাবয়ব, আর না আছে অভিনয় করবার ক্ষমতা। যদি ভদ্র তরুণী হলেই অভিনয় করবার যোগ্যতা হয় তাহলে আমরা বলবো এমন ভদ্র তরুণীদের না দেখতে পেলেই আমরা খুশী হব, এর চেয়ে বারাঙ্গনা নটীদের আমরা সমর্থন করব বেশী মাত্রায়।

এর পর গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সীতা দেবীর 'পরভৃতিকার' শুটীং আরম্ভ হবে। ছবিখানার সমস্ত তৈরি হয়ে আছে, শুটীং আরম্ভ হলেই হয়।

নিউ থিয়েটার্স

পরিচালক নীতিন বসুর বাংলা ও হিন্দি ভাষায় উত্তর ছবির বহিদৃশ্যগুলি প্রায় সবই তোলা হয়ে গেছে। এখন অন্তর্দৃশ্য তোলা হচ্ছে। বাংলায় অভিনয় করছেন চন্দ্রাবতী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, সাইগল, ইন্দু মুখো: প্রভৃতি এবং হিন্দিতে আছেন কমলেশকুমারী, সাইগল, জগদীশ, নবাব, কাপুর প্রভৃতি। একটী নতুন মেয়ের দেখা এতে পাওয়া যাবে, যার অভিনয় ও রূপ সবাইকে খুসী করবে। নীতিন বাবুই আলোকচিত্র তুলছেন এবং তাই মুকুল শব্দ গ্রহণ করছেন। রাইচাঁদ বড়াল সঙ্গীত পরিচালনা করছেন।

এদের ছ নম্বর ষ্টুডিয়োতে 'বিজয়া' প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—খুব সম্ভব জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে রূপবাণীতে এর মুক্তিলাভ হবে। তিমিরবরণের সঙ্গীত পরিচালনা এ ছবির বিশেষ আকর্ষণের জিনিষ হবে। কৃষ্ণচন্দ্র ও সাইগলের কণ্ঠ সঙ্গীতও কম আকর্ষণীয় নয়।

হেমচন্দ্র তার আগামী বাংলা ছবির চিত্রনাট্য শেষ করেছেন। এখনই শুটীং আরম্ভের কথা রয়েছে।

রামনিক প্রোডাকসনের হিন্দি চিত্র "মায়া" বড়ুয়ার পরিচালনায় এখানে তোলা হচ্ছে। নিউ থিয়েটার্সের ১নং ষ্টুডিয়ো এর সেটই পূর্ণ হয়ে রয়েছে, এরূপ সেট এবং পোষাক-পরিচ্ছদ ভারতীয় চিত্রজগতে খুবই কম দেখা যায়। গল্পেও মনোহারিত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে। 'মায়া'র বাংলা সংস্করণও হবে।

ওরিয়েন্টাল কিনেটোন

এদের 'রামকান্তে'র কাজ শেষ হয়ে গেছে। ভূমিকায় ফণি বিদ্যাবিনোদ, রাধিকা মুখার্জ্জি, তুলসী ব্যানার্জ্জি, আশু বসু সুরমা দেবী, ঊষারাণী ও রোজী আছেন। শ্রীযুত পান্নালাল পাঠক এখন তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'দিকভুলে'র জন্য ব্যস্ত রয়েছেন। 'দিকভুল' একখানি সামাজিক কাহিনী। শ্রীযুত কালিপদ ব্যানার্জ্জি 'দিকভুলে'র চিত্রনাট্য রচনায় নিয়োজিত হয়েছেন। শুনছি, ক্যামেরাম্যান পি, ক্যাণ্ডেল ও তার সহকারী অজিত সেনের কাজ বেশ সন্তোষজনক হয়েছে। এভার-গ্রীণ পিকচার্সের হিতেন মজুমদার এখানে যোগদান করেছেন।

রূপবাণী

সর্ব্ব সাধারণের অনুরোধে রূপবাণী কর্তৃপক্ষ আর এক সপ্তাহ 'মহানিশা' দেখাবেন স্থির করেছেন। তদনুযায়ী ৮ম সপ্তাহেই চিত্রখানির স্থির নিশ্চয় শেষ সপ্তাহ বলে পরিগণিত হবে। ২০শে জুন শেষ সপ্তাহ সুরু হবে। আগামী ২৭শে জুন শনিবার থেকে মেট্রোর বিশ্ব বিশ্রুত চিত্র 'এ টেল অফ টু সিটিজ' প্রদর্শিত হবে। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন রোনাল্ড কোলম্যান ও এলিজাবেথ অ্যালান। এ ছাড়া বিশ সহস্র অভিনেতা বিভিন্ন ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করেছেন। এ ধরণের চিত্র বৎসরে একখানি আসে কিনা সন্দেহ।

সচিত্র সাপ্তাহিক

দ্বিতীয় বর্ষ—২০শ সংখ্যা

শুক্রবার—১২ই আষাঢ়

১৩৪৩

২৬শে জুন—১৯৩৬

জাতির প্রশ্ন
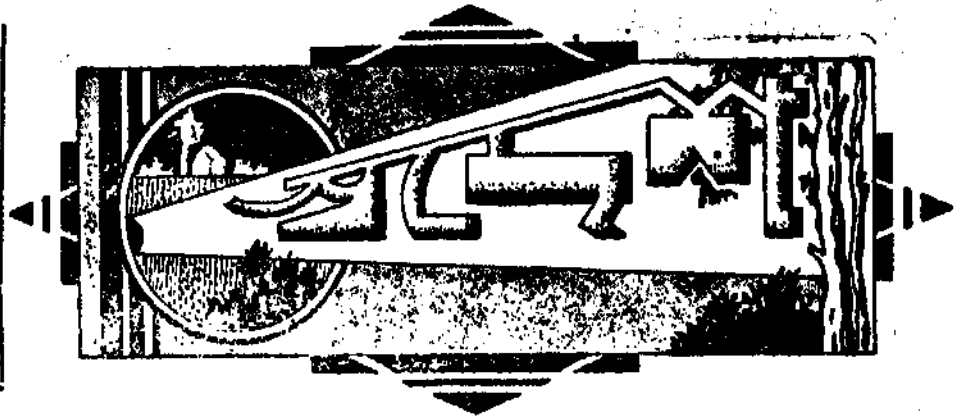
'আমি আর তুমির মধ্যে যে ব্যবধান—তা'র সীমারেখা অপসারিত হ'য়ে তখনই এক মহামিলনের তীর্থে এসে একাকার হয়ে যায়, যখন নাকি পরস্পরের উদারতা পরস্পরকে চেনা-জানার স্বাভাবিক নীতি অতিক্রম করবার কল্পনাকেও মনে ঠাঁই দেয় না। নিজের স্বার্থকে বড়ো ক'রে দেখবার ইচ্ছা হয়তো মনের কোণে উঁকি দিয়ে যায়, এবং তা' নিয়ে হয়তো সাময়িক আত্মপ্রসাদ মানুষকে চঞ্চল ক'রে তোলে, তা'র ফলে মৌখিক আন্তরিকতার আবরণে নিজেকে ঢে'কে রে'খে এক একটা সম্প্রদায়, দল বা জাতির উপর ব্যক্তিত্বের অপপ্রয়োগকেই ন্যায়সঙ্গত নীতি ব'লে মেনে নেওয়ার দৃঢ়তা প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু পরস্পরকে জানা ও চেনার যে শাশ্বত প্রেরণা—সেটা তখন নাগালের বাইরে চলে যায়। তার মাঝে জেগে ওঠে একটা অবিশ্বাস, একটা ঘৃণা—উভয়ক্ষেত্রেই তা'র পরিণাম ভয়াবহ আকারে আত্মপ্রকাশ করে। এই যে মুখোস-পরানো সভ্যতার অভিনয়, ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে এর চেয়ে বড়ো অভিশাপ আর কি হ'তে পারে ?

সমাজ-জীবনে যোগ্যতার মাপকাঠি যখন দলগত বা সম্প্রদায়গত হয়েই ওঠে, আর রাষ্ট্রব্যবস্থাও তা'র অনুকূল হয়, তখন পাশাপাশি সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক আত্ম-হত্যার মোহ কাটানো যে কতখানি ত্যাগ-তপস্যার বিষয়—হতভাগা বাঙলা দেশ আজ তা' মর্ম দিয়েই অনুভব করছে !

নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের প্রারম্ভে যে আত্মঘাতী নীতি উত্তরোত্তর শাখাপ্রশাখা মেলে মহীরুহে পরিণত হ'তে চলেছে, তা'র বিষময় পরিণতি দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিফলিত হ'য়েও তাই আত্ম-উদ্বোধনে অক্ষম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের গলদ, বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্তির মধ্যে যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রশ্ন নিতান্ত পুরানো কথা। ও নিয়ে হয়তো পারস্পরিক অবিশ্বাসের ক্ষেত্র ক্রমাগত প্রসারিত ক'রে তোলবার সহজ পন্থা এখনো আছে। কিন্তু একটা দেশ, একটা জাতি বা একটা সম্প্রদায়কে তার মরণোন্মুখ অগগতির পথ থেকে ফেরাবার যোগ্যতা ওতে নেই। তাই এখনো শুধু এই কথাটাই বলা বেশি দরকার, যা'তে তুমি ও আমির সীমা-রেখা নেহাৎ আত্মমুখী স্বার্থপরায়ণ পরিস্থিতির ভুয়ো দাম্ভিকতা সরিয়ে রে'খে সময় থাকতে চিরন্তনী প্রেম ও ঐক্যের ক্ষেত্রে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়।

জাতি গঠনের ক্ষেত্রে এই আত্ম-উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা আজো কি মহা-মিলনের মোহানায় মিলিত হ'য়ে পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার মন্ত্রে ধ্বনিত হ'য়ে উঠবে না ?

চাতিম চাতিম

শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ

"বদনা গাড়ুতে গলাগলি করে
নব প্যাক্টের আশনাই
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি
হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই।"

বদনা গাড়ুর লড়াই—বাংলার পলিটিক্সে এটা একেবারে মডার্ণ যুগের ব্যাপার। স্বদেশী যুগের আগে এদেশে হিন্দু মুসলমানের মাঝে সদ্ভাব ছিল, টিকি-দাড়ি সংবাদ তখন এই দুই দলের খোয়াবেরও অগোচর ছিল। এইটেকে চটকে অনেকে আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন এবং নেশানলী ভাষায় গরম বক্তৃতায় বলে থাকেন, "আমরা দু'ভাই পরম প্রীতিতে বাস করতাম, মাঝে এক থার্ড পার্টি এসে দু' ভাই-এর প্রেমে চিড় খাইয়ে দিয়ে পরমানন্দে রাজত্ব করছে। ভেদ নীতিটা স্রেফ 'ডিভাইড এণ্ড রুল' জাতীয় ব্যাপার। আমাদের এতে কোন দোষ নাই।

* * *

এই নেশানলী যুক্তির ভাষ্য হচ্ছে যা' তা' নিতান্তই হাস্যকর। আমরা যতদিন পলিটিকাল হিসাবে ছিলাম মরা, ততদিন আমাদের ছিল গভীর প্রেম; আর যখনই উঠলাম বেঁচে তখনই লেগে গেল গুঁতোগুঁতি। দেশ বলে কোন বস্তুই যতদিন আমাদের ছিল না, ততদিন ইংরাজের রাজ্যে আমরা করতাম কেরাণীগিরি আর ওরা হতো বাবুর্চ্চি, ততদিন—

বাবু যেন মেখে দাড়িতে খেজাব,
মিঞা চৈতনে তৈল,
চার চোখে করে আড়া চোখোচোখি,
কি মধু মিলন হৈল।

আমাদের সে কাশী মিত্তিরের ঘাটের প্রেম তখন ইংরাজ বাহাদুর ভেদ বংশে ধ্বংস করেন নাই, কারণ আমাদের দু' ভাই-এর প্রসাদাৎ তাঁদের অফিস ও বাবুর্চ্চিখানা পরমানন্দে চলছিল। এখনও তা' পূর্ব্ববৎই চলছে, কেবল তা'তে এসে ভাগ দিয়েছে মাদ্রাজী, ভাটিয়া, বোম্বেটে, গুজরাটি ইত্যাদি "অল ইণ্ডিয়া" ভায়ারা।

* * *

নেশানলী যুক্তির মধ্যে একটু ফাঁক রয়ে গেছে কিন্তু। সেই কিন্তুটুকু হচ্ছে এই যে, চতুর ইংরাজ হিন্দু-মুসলমানের নিরেট প্রেমের কংক্রিটের গাঁথুনীর মাঝে চিড় খাওয়ালো কি করে? চিড় তার মধ্যে আত্মগোপন করে ছিল বলেই তো চাড় দিয়ে তাকে ফাঁক করে নিয়েছে? অফিসের থাটি আর্য্য সন্তানে এবং বাবুর্চিখানার মেচ্ছে কি ভাসুর ভাদর বৌ সম্পর্ক ছিল, না, কষ্টরসিক ব্রাদারহুড ছিল? বিষ ছিল বলেই তো জীবন সমুদ্রে মন্থন দণ্ডটি পড়বামাত্র সেই গরল ভেসে উঠলো। যতদিন ওঁরা ছিলেন বাবুর্চিখানা ছ্যাকরা গাড়ী, লাঙ্গলের হাণ্ডেল আর টিমটিমে মক্তব আলো করে ততদিন চাকুরী নিয়ে টাগ অব ওয়ার বাধে নাই, থার্ড পার্টির উস্‌কানীও কিছু করতে পারে নাই। এইটেই আসল কথা নয় কি?

* * *

আমরা হচ্ছি নাকি অত্যন্ত প্যাট্রিয়টিক, ন্যাশনালিজমের গাঢ় রসে সদাই ডগমগ। তাই যদি হয় তা' হ'লে আজ এই মুসলমানী জাগরণকে এতো ডরাই কেন? বাংলাদেশের অর্দ্ধেক থাকবে জেগে আর অর্দ্ধেক থাকবে ঘুমিয়ে এবং স্বরাজ-রথ

পরমানন্দে গুটি গুটি আপনিই এগিয়ে আসবে এইটেই কি বাঙালী জাতের মনের কথা? আজ ওরা নালিশ করছে এই বলে, যে, তোমাদের এত বড় সাহিত্যে আমরা কোথায়? কথাটা ওরা ঠিক ঠিক বলতে পারছে না, কিন্তু কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা কি? আমাদের নাটকে নভেলে সাহিত্যে ভেভিল-এর পার্ট ছাড়া ওরা আর কোন পার্ট কি 'প্লেকে' করতে পেরেছে? খুব বেশি পায় নি। আমাদের দিন ওদের বিনা দিব্য কেটে গেছে।

* * *

এর উত্তরে কথা উঠবে, "ওরা অশিক্ষিত রইলো কেন? ওরা ব্যাক্-ওয়ার্ড বলেই তো আজ এই দুর্দ্দশা। সেটা কি আমাদের দোষ?" এই যুক্তি ইংরাজ বাহাদুরের মুখে খুবই তিক্ত শোনায়,—উপযুক্ত হ'লেই আমরা স্বরাজ পাব, অর্থাৎ ডাঙায় সাঁতার শিখলেই জলে নামতে পাব। মুসলমান ভায়ারাও তো একেবারে উপযুক্ত হয়ে এসে তারপর কর্পোরেশনে টুয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট দাবি করলে পারতেন। তা হ'লে কর্পোরেশনী কর্ত্তারা বোধ হয় মোটা মোটা চাকুরী ওদের দিয়ে পত্রপাঠ বাণপ্রস্থ নিতেন। সেই রকম "সি-আর-দাসই" প্রাণের আমেজ বাংলার কল্পরসিক মহলে খুব সুলভ কি?

* * *

সোজা কথা,—এই চাচা ভাইদের জাগরণ আমাদের ন্যাশনালিজমের একটা অবস্থা—; বয়স কালে যেমন ছুলি হয়, কিশোরীর যেমন প্রাপ্তেষু ষোড়শে বর্ষে অবস্থান্তর হয়, এও সেই রকম। ময়নার কণ্ঠী বের হবার সময় সে মর মর হয়, মেয়েদের হিষ্টিরিয়ার একটা বয়স আছে সেটা পার হ'লে আর তেমন ভয় থাকে না, পলিটিকাল্ ন্যাশনালিজমেরও তাই। জীবের পাশবদ্ধ অবস্থা হচ্ছে "আমি আমি"র অবস্থা, নিজের কোলে ঝোল টানবার অবস্থা, কারণ সেটা সেলফ্ কনসাস্ অবস্থা। পলিটিক্সেও কাঁচা সেল্ফ্ মানেই "আমি আমি, আমার আমার" এই টনটনে জ্ঞান। জীবের পাশমুক্ত অবস্থা লাভ ঘটে এই অনর্থের মধ্যে দিয়ে, "আমি আমি" করার বিড়ম্বনা ভোগ না করে কেউ "তুমি তুমি"র আস্বাদ পায় না, তত্ত্বজ্ঞান বহু ডেঁপোমোর পরে আসে। সুতরাং মাভৈ—ডোণ্ট ওরি!

* *

সুতরাং সমঝদার মানুষ বাংলার কম্যুনালিজমে ভয় পায় না। গোটা জাতটাকে জাগতে হবে, সেলফ কনসাস্ হতে হবে, তার পর আসবে সংহতি ও একতা। মড়ার সঙ্গে জীয়ন্তকে গাঁঠছড়া বেঁধে দিলে সে পরিণয় হয় ভয়াবহ। সুতরাং মুসলমান বাঁচুক—এ্যাট এনী কস্ট্—এবং আপাতত না হয়—

"সারা রারা রারা সহসা অদূরে
উঠুক হোরির হর্‌রা
শত্রু ছুটুক বধ্ তুলিয়া
ছক্কু মিঞা নিক্ ছর্‌রা।
পুনঃ ঠোকাঠুকি বদনা গাড়ুতে
রোল উঠিল "হা হন্ত"
উর্দ্ধে থাকিয়া সিদ্ধি মাতুল
হাসে ছিরকুটি দন্ত।
মসজিদ পানে ছুটে যান মিঞা
মন্দির পানে হিন্দু
আকাশে উঠুক চির জিজ্ঞাসা—
করুণ চন্দ্র বিন্দু।

বৃদ্ধ কাক ভুষুণ্ডী তা'তে ভয় পায় না, কারণ এইসা দিন নেহি রহেগা। শীঘ্র বা বিলম্বে জাতির আক্কেল দন্ত বের হবেই, বয়স কাটলে ছুলিও সারবে, বদনা ও গাড়ু দুই শিকেয় তুলে মায়ের সিংহাসন দু'ভাই মিলে একদিন পেতে নেব। কিন্তু বর্ত্তমানের কল্পরসিক দাদারা বেঁচে থাকতে সে শুভদিন আসবে না, ওঁরাও গঙ্গা পাবেন আর মায়েরও কপাল ফিরবে।
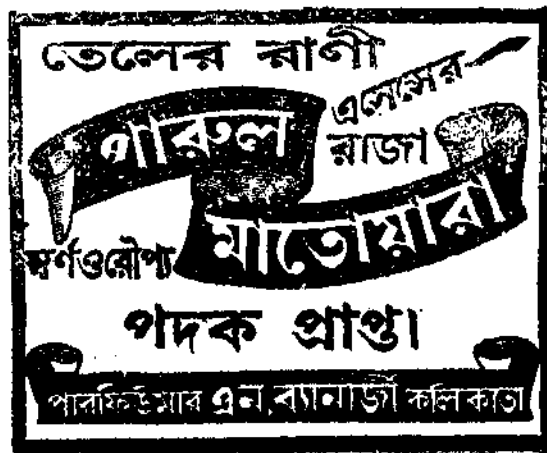
পাঁচ মিশালী

সম্রাটের জন্মদিনে মামুলী প্রথায় যে উপাধি বর্ষণ হইয়াছে, তাহাতে আমরা দুইটী নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। সেকালের 'বেঙ্গলীর' ও একালের 'দুইপের' শর্ম্মা এবার নাইট হইয়াছেন। সরকার তাঁহাকে নাইট কেন, মহারাজাধিরাজ করুন, তাহাতেও আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু তাঁহাকে যেন সাংবাদিক পরিচয়ে ঐরূপ উপাধিদান করিয়া সাংবাদিকদিগের মস্তক লজ্জায় অবনত না করেন। দ্বিতীয় নাম এসোসিয়েটেড প্রেসের অন্যতম সংবাদ সংগ্রাহক —ষ্টেটসম্যানের পি, এন, জির স্থাগিনেয় মিঃ হীরেন ঘোষের। তিনি এবার এম, বি, ই হইয়াছেন। এসোসিয়েটেড প্রেসের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ (কলিকাতায়) অথবা কলিকাতার প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুত কুমুদিনী মোহন নিয়োগীকে উপাধি না দিয়া যে মিঃ ঘোষকেই উপাধি প্রদান করা হইল, তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে, এই উপাধি দান তাঁহার এসোসিয়েটেড প্রেসে কাজের জন্য নহে, পরন্তু তিনি কোন না কোন কাজের দ্বারা সরকারের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

*

এতদিনে দুইপক্ষের পত্র পাওয়া গিয়াছে, একদিকে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যর বিজয়চাঁদ তাঁহার পুত্রের জন্য, আর একদিকে রাজা বাহাদুর মণিলাল ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য পত্র প্রচার করিয়াছেন। দুইপক্ষে আপোষ বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে, মহারাজকুমার সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে এবং স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় বর্দ্ধমানের জমিদারকেন্দ্র হইতে বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচন প্রার্থী হইবেন সাধারণকেন্দ্র হইতে মহারাজকুমারের প্রার্থী হইবার কারণ বোধ হয় এই যে, তাঁহার পিতা বর্ত্তমানে তিনি জমিদারী কেন্দ্রে ভোটার হইতে পারেন না। স্যর বিজয় প্রসাদের সে বালাই নাই। তিনি কখনও পিতৃনামে পরিচিত নহেন এবং এই ছয় বৎসর মিনিষ্টারী করিবার পর বর্দ্ধমানের বন্যাপীড়িতদিগকে যখন পুরা ১৫৲ টাকাও দেন নাই, তখন জমিদারী না হউক, অন্ততঃ পত্তনী সম্পত্তি করিবার সুযোগ যে তাঁহার হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। এখন দেখা যাউক, শেষ ফল কাহার ভাগ্যে কি হয়।

মহারাজা স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর। এবার সম্রাটের জন্মদিনে কে, সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

*

এ সপ্তাহের সর্ব্বপ্রধান সংবাদ কলিকাতা হাইকোর্টে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের মামলায় যবনিকাপাত। এই মামলায় তিনজন ডিরেক্টরকে নানা অনাচারের জন্য অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। এতদিনে সেই মামলার শেষ বিচারে হাইকোর্ট রায় দিয়াছেন। ডিরেক্টরত্রয়কে তিনমাস কারাবাস করিতে হইবে এবং কিছু জরিমানাও দিতে হইবে। বসন্তকুমার লাহিড়ীর মামলার পর এইরূপ বড় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ডিরেক্টরদিগের গুরু দণ্ড এই প্রথম। যাঁহারা এই দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, সমাজে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠার অভাব ছিল না এবং ঢাকেশ্বরীর পরিচালনে তাঁহাদের আয়ও যে নিতান্ত অল্প হইত, এমন বলা যায় না। কিন্তু মানুষের লোভ কোন সীমায় বদ্ধ থাকে না এবং তাহার অতি বৃদ্ধিতে যে ফল ফলে, এক্ষেত্রে আমরা তাহাই দেখিতে পাইতেছি।

———

কর্ত্তা ও কর্ম্ম

কালীজীবন সোম

ভারতীয় ক্রিকেট টীম বিলাতে যাইয়া পরপর পরাজিত হইতে থাকিলেও সকলে আশা করিতেছিলেন যে এখনও ভারতীয় দলের গৌরব উদ্ধারের সময় আছে। কিন্তু অকস্মাৎ এক নিদারুণ সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল—অমরনাথকে আর বিলাতে খেলিতে দেওয়া হইবে না এবং তাহাকে স্বদেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। বিদেশী সংবাদ হইতে এইটুকু জানা গেল যে, অমরনাথের অবাধ্যতা মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং তাহার শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।

দলের শৃঙ্খলা কেহ যদি ভঙ্গ করে তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া উচিৎ, একথায় কাহারও আপত্তি নাই কিন্তু শাস্তির মাত্রা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে।

কিন্তু অমরনাথের বহিষ্করণের ঘটনাটীর একটী বিশেষ গুরুত্ব আছে। অমরনাথ তাহার অপূর্ব্ব খেলা দেখাইয়া বিলাতে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছেন। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতায়, যেখানে জাতীয় সম্মানের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে সে অবস্থায় অমরনাথের মত একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়কে বাদ দেওয়াতে স্পষ্টতঃ এই বোঝায় যে অমরনাথ এমনই অপরাধ করিয়াছিলেন যে যাহার শাস্তিবিধানের জন্য জাতীয় সম্মানকে বিপন্ন করা যাইতে পারে।
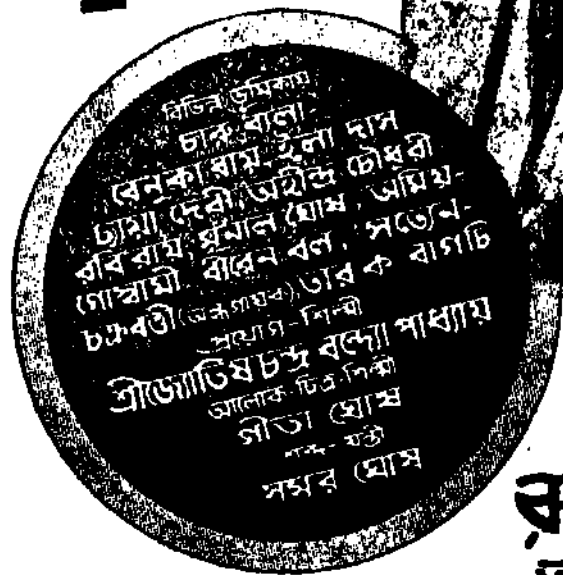
কিন্তু, কী এমন অপরাধ অমরনাথ করিয়াছেন দেশবাসীর আজ তাহা জিজ্ঞাসা করিবার সময় আসিয়াছে। অপরাধ যদি কিছু করিয়াও থাকেন, তার জন্ম তিনি অনুতাপ করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি বিজয়নগরের কুমার নরম হন নাই। এই কি খেলোয়াড়ের মনোবৃত্তি? ইহাতে কি তাহার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিই প্রকাশ পায় নাই?

কিন্তু এই ঘটনার কারণ খুঁজিতে গেলে অনেক কথাই আসিয়া পড়ে। খেলোয়াড়গণের পারস্পরিক বিবাদ বিসংবাদের সুযোগেই বিজয়নগরের মহারাজকুমার ভারতীয় ক্রিকেটদলের ক্যাপ্টেনের গৌরবময় আসনে বসিয়া পড়িয়াছেন। এই আসনের সমস্ত সুবিধা তিনি উপভোগ না করিয়া ছাড়িবেন না। কারণ এ সুযোগ ও সম্মান তাহার কাছে আর আসিবে কিনা সন্দেহ। তাই তিনি রাণ করিতে না পারিলেও অবিরাম খেলিয়া চলিয়াছেন, পদে পদে তাহার অনভিজ্ঞতা ধরা পড়িতেছে। ভারতীয়দলের ম্যানেজার হইলেন খেতাঙ্গ মেজর ব্রিটেন জোন্স, ইঁহার বিরুদ্ধেও অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছে। আত্মকলহ ও অনাবশ্যক অশান্তির ফল এই রকম হইয়া থাকে। বিজয়নগরের কুমারের সহিত অমরনাথের ব্যক্তিগত মন কষাকষি কি হইয়াছিল দেশবাসীর তাহা জানিবার আগ্রহ নাই। অমরনাথ একজন জাতির প্রতিনিধি সেই হিসাবে দেশবাসী ইহা জানিবার দাবী করিতে পারে যে, অমরনাথের দুরবস্থার জন্ম দায়ী কি মহারাজকুমারের ব্যক্তিগত জিদ্, না জাতীয়দলের গৌরব রক্ষার জন্ম তাহার হিতাকাঙ্ক্ষা?

তবু একটা কথা—

"তুমি ওরূপ করিতেছ কেন?" কথাটা শুনিয়া হয় তো মেজাজই চড়িয়া গেল। রাগিয়া মাগিয়া উত্তর দিলে,—"আমার খেয়াল!" কিন্তু সব সময় মেজাজ ও খেয়াল বজায় করিয়া মানুষ চলিতে পারে কি? রাগের মাথায় অবশ্য মাত্রা জ্ঞান থাকে না। অকর্ম্ম-কুকর্ম্ম সম্বন্ধেও থৈই হারাইয়া যায়। কিন্তু মাথাটা ঠাণ্ডা হইলে তখন ভাবিয়া দেখিতে হয়, যাহার নিমক খাইয়াছ, কিম্বা কারণে অকারণে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্ম যাহার দুয়ারে মাথা ঠুকিয়া কপাল ফুলাইয়া ফেলিয়াছ—তাহার স্থান বিশেষে কাঠি দিয়া বাঁচিয়া থাকা যায় না। কারণ, এমন দিন আসিতে পারে—যখন ঐ কাঠিই নিজের স্থানে আসিয়া আঘাত করে! তখন নেড়া বেলতলায় যাইব না বলিয়া নিস্তার পায় কৈ? খেয়ালী মানুষের শাস্তিই যে এই!

দুর্দ্দিনে 'নিউ থিয়েটাস'-এর কাছে উপকারের কথাটা খেয়ালের মাথায় হয় তো ভুলিয়া যাইতেও পার। কিন্তু বাঁচিয়া আসিয়া নাকে খত দিবার পূর্ব্বে একবার ধাতস্থ হইয়া ভাবিতে চেষ্টা করিও যে, নুন খাইয়া নিমকহারামী করিতে নাই। ভগবান তোমার সুমতি দিবেন কি?

কিন্তু আমরা ভাবিতেছি,—তোমাকে বলিয়া হইবে কি? মানুষ যখন ভালমন্দ বুঝিবার বাহিরে চলিয়া যায়, তখন বেতালা হইতে তাহাকে তালে আনিতে স্বয়ং যীশুও পারেন নাই। শিশু হইলে না হয় চোখ রাঙিয়া, দু'এক ঘা বসাইয়া দিয়াও বাগ মানাইতে পারা যায়! দুঃখ হয় তোমার অধঃপতন নেহারি!

খেলার কথা

শ্রীসুধীর বসু

১৬ই জুন ইষ্ট বেঙ্গলের সহিত ই বি রেল দলের খেলায় সামাদ আহত হয়েছেন। ঐ মাঠেই তার পরদিন মহমেডান স্পোটিং ও এটাচড সেক্সানের খেলায় কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরোয়ার্ড রসিদ সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছেন। এভাবে আহত হওয়ায় রসিদের নিজের ত্রুটীই সব চেয়ে বেশী, কারণ মিলিটারী টিমের লেফট ব্যাক মার্টিন বল ক্লিয়ার করতে উদ্যত হয় এমন সময় রসিদ ড্যাস্ করে সেই বল কিক্ করতে পা বাড়িয়ে দেন। মার্টিনের পা হঠাৎ বলে না লেগে রসিদের ডান পায়ের ওপর পড়ে, ফলে তার হাড় ভেঙ্গে যায়। অর্দ্ধচেতন ভাবে তাকে মাঠে পড়ে থাকতে দেখা যায়। সমস্ত লোক (ক্লাবের, দর্শক নয়) ছুটে গিয়ে তাকে ধরাধরি করে ইষ্ট বেঙ্গল টেণ্টে নিয়ে যায়। সেখানে একখানা ছড়ি ও ছাতির দ্বারা পাখানা বেঁধে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়, তৎপর হাসপাতালে পাঠান হয়। তারপর জানা গেল তার সিন্‌বোনের আঘাত খুব গুরুতর নয়—একে 'সিম্পল ফ্রাক্চার' বলা যায়। প্রিন্স অব ওয়েলস্ হাসপাতালে ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে চলেছেন। বর্ত্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় সামাদও ঐ হাসপাতালে আছেন। তার অবস্থাও আশাপ্রদ।

ঐ ১৭ই জুন ডালহৌসীর সহিত কালীঘাটের খেলায় (ক্যালকাটা মাঠে) কালীঘাটের সেণ্টার হাফ রাঘবনের সহিত

ডালহৌসীর সেন্টার ফরোয়ার্ড সি ব্রাউটনের সংঘর্ষ হয়, ফলে রাঘবন আহত হয়ে মাঠ পরিত্যাগে বাধ্য হন। গত ৮ই জুন কালীঘাটের আরেকটী তরুণ খেলোয়াড় রামস্বামী মহমেডান স্পোর্টিংয়ের আব্বাসের সহিত সংঘর্ষে আহত হয়ে এ বছরের মত খেলা বন্ধ করেছেন (ক্যালকাটা মাঠে)। কালীঘাট ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাদের এই দুজন খেলোয়াড়ের সংবাদ আমাদের জানালে খুশী হব। এদের শীঘ্র আরোগ্য কামনা করি।

ইন্টারন্যাশন্যাল খেলা

এবারকার ইন্টারন্যাশন্যাল খেলা কি হবে তা বেশ বুঝতে পারছি। উত্তর বিভাগের সিলেকশান্ কমিটী যেরূপভাবে খেলোয়াড় নির্ব্বাচন করেছেন তাতে তাদের যোগ্যতার ওপর আস্থা হারিয়েছি। কি হিসাবে তারা রাইট ব্যাকে সন্মথ দত্ত, রাইট ব্যাকে বিমল মুখার্জ্জী বা কালীঘাটের মির্জ্জা, এবং ফরোয়ার্ডে করুণা ভট্টাচার্য্যকে বাদ দিলেন তা আমাদের ধারণায় আসে না! ফরোয়ার্ডে দুই ইনে কে ভট্টাচার্য্য ও লক্ষ্মীনারায়ণকে এবং সেণ্টারে রহিমকে বা দ্বিতীয় ডিভিসনের জর্জ্জ টেলিগ্রাফের সেণ্টার ফরোয়ার্ড ডি ব্যানার্জ্জীকে দিলে ফরোয়ার্ড লাইন যে শক্তিশালী হত তাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আবার রিজার্ভে রাখা হয়েছে গোলকিপার ওসমানকে। সুবোধ ব্যানার্জ্জীর গোল রক্ষা বোধ হয় এই নিকৃষ্ট সিলেকশান্ কমিটীর সভ্যরা এবছর দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেন নি। তারপর পদ্ম ব্যানার্জ্জী রয়েছেন, এদের বাদ দিয়ে ওসমানকে রিজার্ভে রাখা কোন বুদ্ধির পরিচায়ক? যেবার মহমেডান দলে সামাদ, রসিদ, ও রহমতের মত খেলোয়াড়রা ছিলেন তখনও মেদল হতে পাঁচজনের বেশী মনোনীত হন নি, এবার সেই দল হতে ছজন মনোনীত হয়েছেন।

ভারতীয়দলের যে দুরবস্থা, ইউরোপীয়ান দলেরও ততোধিক অবস্থা হয়েছে। পুলিসের রাইট ইন ফরোয়ার্ড জে মিলস্ ও কাষ্টমসের রাইট হাফব্যাক এম স্মিথ মনোনীত হয়েছেন। অথচ ফরোয়ার্ডে উইলকিনসন ও পাওসনীর মত খেলোয়াড়দেরও বাদ দিয়ে বাজে প্লেয়ারদের নেওয়া হয়েছে। গোলে ডেভিস এবছর খুব ভাল খেলেছেন তা স্বীকার করি, তবু আর্ম্মষ্ট্রংকে রিজার্ভে না রেখে মূল টীমে নেওয়া উচিৎ ছিল। আগামী চীনা দলের সহিত যে টিম নির্ব্বাচিত হবে তা যদি এই ভাবের হয় তাহলে ফল যা হবে তা এখন থেকেই ভবিষ্যবাণী করে রাখা যায়। চীনা দলের সহিত খাঁটী ভারতীয় দলের খেলা হবে ৪ঠা জুলাই এবং ইউরোপীয়দলের সহিত খেলা হবে ৬ই জুলাই।

নিম্নে আগামীকাল শনিবার ২১শে জুন যে ইন্টারন্যাশন্যাল খেলা হবে তার টিম দিলাম: ভারতীয় দল—কে দত্ত (মোহন বাগান) এস্ মজুমদার (এরিয়ান, ক্যাপ্টেন) ও জুম্মা খাঁ (মহমেডান); অখিল আমেদ, নূর মহম্মদ ও মাসুম (মহমেডান); দুলাল (ইষ্ট বেঙ্গল), রহিম (মহঃ), লক্ষ্মীনারায়ণ (ইষ্ট বেঙ্গল), মজিদ (ইষ্টবেঙ্গল) ও আব্বাস্ (মহঃ)। রিজার্ভ—ওসমান (মহঃ) পি দাশগুপ্ত (ইষ্টবেঙ্গল), বিমল মুখোঃ (মোহনবাগান, সাবু (মহঃ); এস রায় (বড়, এরিয়ান), নন্দ রায়চৌধুরী (মোহনবাগান)। ইউরোপীয় দল—ডেভিস [ডালহৌসী], জি কার্ভে [ই বি আর] ও ফ্লেমিং [ডালহৌসী], এম স্মিথ [কাষ্টমস], গেষ্ট [ব্লাক ওয়াচ] ও টার্ণবুল [ক্যালকাটা], হান্টার [ব্লাক ওয়াচ], জে মিলস [পুলিশ] ক্যাস [এটাচড সেক্সন্], ম্যাকিউ [ব্লাক-ওয়াচ] ও উইলকিনসন [ব্লাকওয়াচ] রিজার্ভ—আর্ম্মষ্ট্রং [ক্যালকাটা], টমসন [ক্যালঃ] হার্সেল [ব্লাক ওয়াচ], সি ব্রাউটন [ডালহৌসী] ও ব্যারোজ [ক্যালকাটা]।

খেলোয়াড়ের ঔদ্ধত্য

১৭ই জুনের খেলার সময় মহমেডানদলের লেফট্ ইন ফরোয়ার্ড সাবু গোল করবার মানসে ড্যাস্ করে একেবারে এটাচড সেক্সানের গোলকিপার বেটারটনের ওপর পড়েন। এতেই ক্রুদ্ধ হয়ে সৈনিক গোলকিপার সাবুর গলাটিপে ধরেন, ফলে ওই গোল এরিয়ার সান্নিধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। রেফারী বলাইদাস চট্টোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপের ফলে তখনকার মত এ ব্যাপারে যবনিকা পতন হয়। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, বেটারটনের বিরুদ্ধে রেফারী মহাশয় আই, এফ, এ কাউন্সিলে অভিযোগ করলেন না কেন বা ঘটনার পরেই ঐ খেলোয়াকে ওয়ার্ণিং দিলেন না কেন? সন্তোষ দত্ত ঘুষি মারবার ফলে যদি ক'বছরের জন্য শাস্তি পেতে পারেন, তবে বেটারটনই বা অব্যাহতি পাবেন কেন?

এবারও মহমেডান স্পোর্টিং লীগ-চ্যাম্পিয়ান হতে চলেছে। প্রথম ডিভিসনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই উপর্য্যুপরি তিনবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়া যে সে ব্যাপার নয়। আমরা লীগবিজয়ী ক্লাবকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি এবং তাদের এই কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দিতও করছি। অল ইণ্ডিয়া টিম বলে অনেকেই এই ক্লাবকে অভিহিত করে থাকেন, কিন্তু একপভাবে খেলোয়াড় আমদানি তো

আরো ওএকটী টিমও করেছেন—যথা কালীঘাট ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব। কিন্তু তারা তো এ গৌরবের অধিকারী হতে পারেন নি। কালীঘাট সবার পেছনে একটী বাঙ্গালী সুবোধ ব্যানার্জ্জীকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন আর ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বশেষে দুটী ব্যাক আর একটী গোল-কিপার রেখেছেন, হাফে আর ফরোয়ার্ডে মাঝে মাঝে দুএকটী বাঙ্গালীর দেখা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু না থাকলেই ভাল হত। মঙ্গলবার ২৩শে জুন পর্য্যন্ত প্রথম ডিভিসন লীগ তালিকা দিলাম—

	খেলা	জয়	ড্র	পরাঃ	সঃ	বিঃ	পয়েন্ট
মঃ স্পোর্টিং	১৮	১৪	৪	০	৪০	৫	৩২
ক্লাবওয়াচ	১৯	১৩	৩	৩	৪০	২১	২৯
মোহনবাগান	১৯	৮	৬	৫	১৬	১৪	২২
ক্যালকাটা	১৮	৭	৭	৪	২৫	১৩	২১
ই বি আর	১৭	৮	৪	৫	২৩	১৯	২১
ইষ্ট বেঙ্গল	১৯	৭	৫	৭	২৫	১৬	১৯
এরিয়ান্স	১৮	৭	৪	৭	১৬	২৫	১৭
কালীঘাট	১৯	৫	৬	৮	২১	২৯	১৬
কাষ্টমস	১৭	৩	৯	৫	১৭	২২	১৫
ডালহৌসী	১৮	৫	৩	১০	১০	২৪	১৩
পুলিস	১৯	৩	৫	১১	১৪	২৮	১১
এঃসেকসন	১৯	২	০	১৭	১৫	৫০	৪

দ্বিতীয় ডিভিসন

	খেলা	জয়	ড্র	পরাঃ	সঃ	বিঃ	পয়েন্ট
ভবানীপুর	১৮	১২	৫	১	২৬	৮	২৯
হাওড়া ইউ	১৭	৯	৪	৪	২৪	৯	২২
রেঞ্জার্স	১৭	১০	২	৫	১৭	১১	২২
টাউনক্লাব	১৮	১১	১	৫	২৪	১০	২১
কুমারটুলী	১৭	৬	৭	৪	১২	১১	১৯

দ্বিতীয় ডিভিসনের এই পাঁচটী টিম ছাড়া আরো এগারটী ক্লাব খেলছে, তাদের পয়েন্ট এত কম, যার আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। এবার ভবানীপুরের প্রথম ডিভিসনে উন্নীত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ১৮টী খেলে তারা পয়েন্ট লাভ করেছেন ২৯টী। বহুবার এরা উন্নীত হতে চেয়েছেন, কিন্তু সামান্য কমের জন্য পেরে ওঠেন নি, এবার তাদের সেই সুযোগ এসেছে।

বেঙ্গল ল্যান্সার চিত্রের রহস্য

"লাইভস্ অব এ বেঙ্গল ল্যান্সার" (ওদেশে 'বেঙ্গলী') ছবি সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকে এ কথা বলিয়াছেন যে, "লাইভস্ অব এ বেঙ্গল ল্যান্সার" বইখানির সহিত ছবিখানির কোনও তফাৎ নাই; আবার অনেকে বলেন যে, মূল পুস্তক ও প্রদর্শিত চিত্রের ঘটনাবলী বাহ্যতঃ এক হইলেও অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। সম্প্রতি পাইওনিয়ার পত্রিকায় 'লাইভস্ অব এ বেঙ্গল ল্যান্সার' ছবির চিত্রনাট্য লেখক মিঃ বলডারষ্টনের স্বীকারোক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে এই বাদানুবাদের অবসান হইবে এবং জন-সাধারণ এই চিত্র প্রদর্শনের উদ্দেশ্য ও ইহা তুলিবার রহস্য সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য অবগত হইবেন বলিয়া মনে হয়।

মিঃ বলডারষ্টন জানাইতেছেন যে, হলিউড হইতে যখন 'লাইভস অব এ বেঙ্গল ল্যান্সার' চিত্রখানি সাধারণ্যে প্রদর্শনের জন্য বাহির হয়, তখন উহার সহিত মেজর এফ ইয়েটস্ ব্রাউনের লিখিত মূল পুস্তকের সম্পর্ক খুব অল্পই ছিল। কেবলমাত্র পুস্তকের নামটা ছাড়া ছবির মধ্যে আর কিছু ছিল না বলিলেই চলে। এই পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি প্যারামাউন্টের নিকট হইতে প্রতি শব্দের জন্য গড়ে ৬০ হইতে ৮০০ পাউণ্ড পাইয়াছিলেন।

মিঃ বলডারষ্টন বলেন,—"পূর্ব্বোক্ত কাজ চলিতেছিল, অবশেষে মেজর ইয়েট ব্রাউন নিজেই হলিউডে আসেন এবং তাঁহাকে লইয়া বহু গবেষণা চলিতে থাকে তাঁহাকে প্রধান ভূমিকায় নামান হইবে বলিয়া কথা হয়। কিন্তু পরে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হয় এবং একমাত্র পুস্তকের নাম ছাড়া আর কিছুই রাখা হয় নাই।"

এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে ছবি তুলিবার জন্য একদল লোক পাঠান হয়। তাহারা ভারত হইতে ৮০,০০০ ফুট ছবি তুলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহারও খুব অল্পই মূল ছবিতে ছিল, বাকী অংশগুলি তোলা হইয়াছিল কালিফোর্ণিয়াতে। যাঁহারা টাকা যোগাইতেছিলেন তাঁহারা উত্যক্ত হইয়া উঠেন এবং ছবি তোলা বন্ধ করিতে নির্দ্দেশ দেন।

এদিকে ষ্টুডিও হইতে বলা হয় যে, তাঁহারা 'লাইভস অব এ বেঙ্গল ল্যান্সার' ছবি তুলিবেন না এবং তাহার বদলে সম্পূর্ণ নূতন একখানি ছবি তুলিবেন।

প্রশ্ন হইল,—নূতন ছবির নাম কি? ষ্টুডিও হইতে উত্তর আসিল "মোর লাইভস অব এ বেঙ্গল ল্যান্সার এবং এই ভাবেই দায়িত্ব এড়ান হইল। অতঃপর প্রার্থনারত মুসলমানদের ছবি তোলা হইল।

একজন বলিলেন—"কিছুই হয় নাই।" প্রযোজক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন?" বিশেষজ্ঞ উত্তর দিলেন,—ছায়ার দিকে চাহিয়া দেখুন, তাহাতেই বুঝা যাইবে যে, ভারতীয় মুসলমানগণ নমাজের সময় যেদিকে মুখ করিয়া বসে, ইহারা সেদিকে মুখ করিয়া বসে নাই। সুতরাং আবার ছবি তুলিতে হইল।

"—সীমার মাঝে অসীম তুমি—"

[গল্প]

হরিদাস মুখোপাধ্যায়

উমানাথ শিকদার, বর্দ্ধমান জেলার নাদনঘাটে গুড় চালানীর ব্যবসা করে। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বাপের এই সামান্য কারবারটুকুর ও'পর অনেকেরই লোভ ছিল। এবং ঠিক সময়মত হাতে না নিলে সমস্ত সম্পত্তিই যে একদিন বেহাত হয়ে যেত, এ'কথা উমানাথ নিজে স্বীকার না করুক, পাড়ার হিতৈষী পাঁচজনের তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না।

বছরের অধিকাংশ সময়েই উমাকে নদীর ধারে চালা তুলে থাকতে হয়। দেশ বিদেশ থেকে গুড়ের নাগরী বোঝাই নৌকা এসে ঘাটে লাগে; সেই সমস্ত জিনিষ গুদামে জমা হয়। মাঝি, মাল্লা, কর্ম্মচারী, মুটেদের হল্লা—মনে হয় এ ছাড়া যেন উমার জীবনে করণীয় কিছু নেই। সময়ে সময়ে স্ত্রী এসে, নদীর ধারের বাড়ীটাতে থাকে, তখন উমা একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

বর্ষাকালে কানায় কানায় নদীর জল ফেঁপে উঠেছে। তীরে ক'খানি চালানি নৌকা কালনা'র দিকে পাড়ি দেবে বলে দাঁড়িয়ে আছে। ও'পার দিয়ে একখানি পানসী সাদা পাল তুলে দ্রুত বেগে এগিয়ে চলেছে। সমস্ত দিনের মধ্যে উমার এই টুকুই অবসর। বৈকালে এই সময় বহুদূর পর্য্যন্ত নদীর ধারে ধারে ও' ঘুরে বেড়ায়। সেদিনও তার ব্যতিক্রম হয় নি। নদীর বুকে ঘোলাটে ঢেউগুলি বাতাসে তরঙ্গায়িত হয়ে ফিরছে; বকের পালকের মত সাদা কাশ ফুলগুলি দুলে দুলে হাসছে, প্রকাণ্ড একটা গাছ আধভাঙ্গা অবস্থায় ধারে দাঁড়িয়ে ঝুঁকছে; ও'ধারের মধু সাঁতরার আড়ত থেকে গোলদারদের ক্ষীণ জটলার শব্দ কাণে এসে লাগে। উমা যেন মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। কতদিন ওর বৈরাগী উদাসী মনে প্রকৃতির এই আপনহারা সৌন্দর্য্য একটা গভীর উন্মাদনা এনে দিয়েছে। আজও যেন দূরাগত সঙ্গীতের মত ঐ সবের মধ্য দিয়ে অতীতের মধুর স্মৃতি মনকে উতলা করে দিচ্ছিল।

আড়তে ফিরতেই স্ত্রী ফিস ফিস করে বল্লে—"বাইরে কে এক বিটলে মিনসে অনেকক্ষণ থেকে তোমায় খোঁজ করছে। দেখে এস না কে"?

বাইরের বারান্দায় আসতেই, একেবারে দু'জনে মুখোমুখি দেখা।

"আরে, শ্যামা যে"?

"হাঁ, ভাই উমা"।

শ্যামার মাথার চুলে পাক ধরেছে। তোবড়ান গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ে একটী আধময়লা টুইল সার্ট। উজ্জ্বল চোখ দু'টী উমার মুখের পরে তুলে শ্যামা বল্লে—"উমা, কতকাল পরে দেখা, চ বাইরে নদীর ধারে গিয়ে বসিগে, অনেক কথা আছে"।

দু'জনে নদীর ধারে এল। মাথার উপর কৃষ্ণপক্ষের রজনী নিবিড় কালো চুলে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে; অশান্ত জল-কল্লোলের শব্দ, অনেকক্ষণ থেকে বাতাসে ভেসে আসছে—শ্যামা বারবার উমাকে চেয়ে দেখতে লাগল।···

শ্যামার সঙ্গে উমার পরিচয় একটু অভিনব ভাবে হয়েছিল। ছোটবেলা কালনার জেলা স্কুলে দু'জনে একসঙ্গে পড়ত। বাড়ী ছিল কাছাকাছি। একই কারণে দু'জনে একদিন স্কুলে মাষ্টারের কাণ্মলা খেয়ে ঠিক করলে—জীবনে লেখা পড়া শেখাটা কিছু নয়। তা ছাড়া লেখা পড়া শিখে কেই বা বড়লোক হয়েছে! শ্যামাই পরামর্শ দিলে—"বেশ মজা হবে ভাই, দু'জনে পালিয়ে যাই"। উমার

তাতে গভীর আপত্তি ছিল, বল্লে—বাবা যদি বকে" ? কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দু'জনেই একদিন বাড়ী ছাড়লে। বাইরে বেরিয়ে উমা ভড়কে গেল, বল্লে—"শ্যামা, ভয় করেছে ভাই, চ' বাড়ী ফিরে যাই"।

শ্যামা বল্লে—"দূর গাধা। আর এখন ফেরা চলে না"।

সঙ্গে কিছু নেই, অথচ দু'জনে দেশের পর দেশ ঘুরতে লাগল। বিনি টিকিটে বেড়ান'র জন্ম মাঝে মাঝে রাস্তায় নামিয়ে দেয়; এমনি করতে করতে একদিন দু'জনে কলকাতায় এল।

শ্যামা বল্লে—"উমা তুই এমন মুসড়ে পড়ছিস কেন? দেখ দি'কি কত বড় সহর, কত লোকে কাজ করছে। আমরাই কি আর বসে থাকব" ?

শ্যামা রাস্তার মোড়ে কাগজ ফেরী করতে লাগল। উমাও কোন একটা দোকানে ছোট কাজ জুটিয়ে নিলে। বেশ চলতে লাগল। একদিন উমা বল্লে—"শ্যামা" !

"কি ভাই"।

"ভাল লাগছে না, বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে"।

শ্যামা বল্লে—"দূর, এত আরাম কি বাড়ীতে পাওয়া যায়? কিন্তু এ জায়গা ছাড়তে হবে। রাস্তায় পিসেকে দেখেছি"।

কিছুদিন পরে লম্বা পাড়ি একেবারে লক্ষ্ণৌ। রাত্রে এক ভদ্রলোকের বাড়ী অতিথি হ'তেই তাঁর স্ত্রী বল্লেন—"আহা, দুধের বাছা, তোমরা এতটুকু বয়সেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছ, কোথায় বাড়ী বাবা তোমাদের" ?

উমা, শ্যামার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কোন রকমে রাত কাটিয়ে, একেবারে চম্পট দিল্লীর দিকে। একদিন শ্যামা বল্লে—"উমা, এ দুনিয়ায় সব চাইতে বড় জিনিস কি জানিস" ?

"কি" ?

"পয়সা রোজগার করা। আর একটা উপদেশ তোকে দিয়ে রাখি—'কাউকেই বিশ্বাস করতে নেই,—করলেই ঠকতে হয়। আর বেশী চাল দেখাতে যাবি নে"।

অনেক ক'বছর কেটে গেল, দু'জনেই বয়সে বড় হয়েছে। বাড়ীর খবর কেউ জানে না। উমার বিষণ্ণ মন দেখলে শ্যামা তা'কে দাবড়ে রাখে। একসময় শ্যামা উমাকে চুপি চুপি বল্লে—"চাকরী করে কিছু হবে না রে! একটা ব্যবসা করব ঠিক করেছি"।

শ্যামার ওপর উমার অগাধ বিশ্বাস ছিল। হঠাৎ একদিন বাজারে বিজ্ঞাপন বেরুল—"ভাল ভাল স্বপ্নাদ্য মাদুলী; হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার; দুরারোগ্য ব্যাধির অব্যর্থ ঔষধ। বিনামূল্যে পাওয়া যায়"। ইত্যাদি।...

উমা সবিস্ময়ে দেখলে—তাদের ছোট বস্তীর ঘর ক'দিনে যেন তীর্থক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল। কাতারে কাতারে লোক এসে—তাদের নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। শ্যামা অধিকাংশ সময়েই নীরব থাকে। দিনকতক পরে মণিঅর্ডারে টাকা আসতে লাগল। মাদুলী তৈরী করবার জন্য লোকও রাখতে হ'ল। শ্যামা বাইরে ঘোরে। উমা ঘরে থাকে। একদিন গভীর রাত্রে উমা শুয়ে আছে হঠাৎ পুলিশ এসে ওদের বস্তী ঘিরলে, তারপর আরম্ভ হল কঠিন প্রশ্ন—যার সঙ্গে উমার কোন দিনই পরিচয় নেই।

"কোথায় বাড়ী, বাপের নাম কি? সঙ্গী কোথায় গেছে, এখানে কেন এয়েছ"?

উমা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। সদুত্তর দিতে না পারায় ওকে পুলিশে চালান দিলে। উমা কাঁদতে লাগল। ভাবলে—শ্যামা নিশ্চয়ই খবর পেয়ে পালিয়েছে। চালাক ছেলে। শয়তান, নেমকহারাম!

সন্দেহজনক চাল চলনের অজুহাতে উমার যখন দীর্ঘ একবছর জেল হ'ল; শ্যামা একবার নাম ভাঁড়িয়ে ও'র সঙ্গে দেখা করতে এল; দেখা হতেই বার বার মাপ চাইলে, বল্লে—"ছি ছি, ভারী অন্যায় হয়েছে ভাই, দোষ যদি করে থাকি সে আমিই। বিনাদোষে তোর শাস্তি হ'ল"।

যৌবনের সন্ধিক্ষণে এসে দু'জনের হ'ল ছাড়াছাড়ি। উমা বাড়ী চলে এ'ল। শ্যামার কোন খোঁজ নেই। ভেতরের ব্যাপার কেউ জানলে না। উমা ফিরতেই বাবা এতটুকু বকলেন না। শুধু একটী ডাগর মেয়ের সঙ্গে ওকে উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে কারবারের চাবিকাঠিটি হাতে তুলে দিলেন। বুঝি ভাবলেন এর চেয়ে বড় বন্ধন সংসারে আর কিছু হতে পারেনা।

...উমা'র মনে কোন অভিমান নেই। দীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদে শ্যামার প্রতি ও'র একটা শ্রদ্ধার ভাব এসেছিল। শ্যামার হাত দু'টি ধরে বল্লে—"তোর সঙ্গে যে আর কখনও দেখা হবে, এ' আমি কোনদিন ভাবি নি। তোর ছেলেপিলেরা কোথায় আছে।"

শ্যামা যেন চমকে উঠল, বল্লে—"উমা বিয়ে করেছিস"?

—"হাঁ রে, এখন যে আমি পুরো সংসারী—"!

নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত করতে লাগল। উমা, শ্যামার হাত ধরে, বাড়ী নিয়ে এল। স্ত্রী বল্লে—"লোকটা কে গো"? উমার তখন আনন্দে টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে পড়বার মত অবস্থা হয়েছে। বল্লে—"আমার কৈশোরের বন্ধু শ্যামা।" স্ত্রী চমকে উঠল, বল্লে—সেই যাঁর সঙ্গে একবার পালিয়ে গিইছিলে"? উমা, তেমনি হাসি মুখে জবাব দিলে—"হাঁ গো, জীবনে ও'র চেয়ে বড় বন্ধু আমার কেউ নেই"। স্ত্রী'র মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

রাত্রে শ্যামা বল্লে—"উমা, বাইরে আমরা দু'জনে একসঙ্গে শোব। কেমন?" উমা খুসী হয়ে মত দিলে। দীর্ঘ রাত্রি ব্যাপী চলতে লাগল, ও'দের অবিশ্রাম আলাপ। উমা'র মুখে যেন খই ফুটছে। প্রতিদিনের অসম্ভব খাটুনী,—পয়সা রোজগারের দুরন্ত মোহ, ও'কে যেন এতদিন কঠিন শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছিল। না ছিল কোন সঙ্গী, না ছিল কারুর সঙ্গে আলাপ করবার মত সময়ের প্রাচুর্য্য। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল। থেকে থেকে উমার কথা জড়িয়ে আসছে, শ্যামা ধাক্কা দিয়ে বল্লে—

—"উমা, ঘুমুলি নাকি"?

"—না, ভাই"।

শ্যামা ইতস্ততঃ করে বল্লে—"সংসারে মন বসাতে পারলাম না ভাই। বউ মরেছে, না হাড় জুড়িয়েছে। চ' আগেকার মত আবার বেরিয়ে পড়ি। তেমনি উদ্দেশ্য হীন নির্লিপ্ত ভাবে। কোন কিছুই আমাদের আটকে রাখতে পারবে

না—শুধু থাকব, তুই আর আমি। যাবি তাই" ?

উমা জড়িত স্বরে উত্তর দিলে—"তা, কি আর হয় রে। মস্ত বড় কারবার, তা' ছাড়া বিয়ে করেছি, ছেলেপিলে রয়েছে, তাদের প্রতিও ত একটা কর্ত্তব্য রয়েছে"।

তাই বটে! শ্যামা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। সংসার, স্ত্রী, কর্ত্তব্য, কারবার! উমা, বেশ সুখে আছে, আর সে? শ্যামার মনে হল, নিদারুণ দুঃখের সঙ্গেই মনে হল, উমা যেন তার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। চেষ্টা করলেও আর তাকে নাগালের মধ্যে আনা যায় না।

একটু বেলা হয়ে গেছে, স্ত্রী'র ডাকে উমার ঘুম ভাঙ্গল। বিছানার ও'পর উঠে বসতেই দেখলে, শ্যামা আগেই উঠে গেছে। স্ত্রী, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বল্লে—'সে মিনসে গেল কোথায়, কাল সারা রাত্রি ত পালিয়ে যাবার মন্দী দিয়েছে। দেখতে পেলে, খ্যাংরা মেরে বিদেয় করব"।

সকাল বেলাতেই স্ত্রী'র উগ্র মূর্ত্তি দেখে উমা বিস্মিত হল। একটু হাসিও এল, হয়ত আলোচনার কিছু অংশ কাণে গেছে। বাবা ঠিকই বুঝেছিলেন—এ'র চেয়ে বড় বন্ধন বুঝি আর সংসারে দ্বিতীয় কিছু নেই।

প্রাতঃকৃত্য সেরে উমা বাইরে এসে দাঁড়াল। কাল শ্যামাকে যত্ন করা হয় নি। আজ ও'কে নিয়ে নৌকোয় করে অনেকদূর বেরিয়ে আসবে। আরও কত কথা জানবার আছে। ও'র সম্বন্ধে কোন কথাই ত বলে নি? হঠাৎ উমা'র নজরে পড়ল, হাতে মোটা সোনার চেন-শুদ্ধ কবজটী ত নেই। মুহূর্ত্তে ও পাগলের মত ঘরে ছুটে এল—বিছানা পত্তর ওলট পালট করে ফেল্লে। কিন্তু সবই বৃথা!—কাল'ও যে ওটা হাতে ছিল। তবে কি শ্যামা নিয়ে পালিয়ে গেছে? পয়সার অভাব যদি ছিল, একবার মুখ ফুটে বলেনি কেন?

স্ত্রী এসে পাশে হাত দিয়ে দাঁড়াল। বল্লে—"সকালবেলা ভীমরতি হ'ল নাকি! ও'কি হচ্ছে"?

উমা একটু শুষ্ক হাসি হেসে কথাটা চাপা দিলে। সামনের রাস্তা দিয়ে একখানা গরুর গাড়ী মন্থর গমনে চলেছে, ও' সেইদিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বহুদিন আগেকার শ্যামার কথাই মনের মধ্যে ভেসে উঠল—"দুনিয়ার কাউকেই বিশ্বাস করতে নেই—করলেই, ঠকতে হয়।"

—

চাকুম-চুকুম

পঞ্চমুখ শর্ম্মা

কোন্ এক সাহিত্য-সভায় কি এক বন্ধু মশায় (শুনিতে পাই ইনি একজন কবি) ব্যঙ্গ-রসাত্মক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সভার নাম কিনিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সভার নাকি 'তিন অবস্থা'! পুরুষেরা যখন তাহা শুনিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিলেন, মেয়েরা শরম বাঁচাইবার পথ খুঁজিতে লাগিলেন। মহিলা অধিবেশনের উক্ত দিবসে হাজির হইতে না পারিলেও, প্রথম দিনকার সাহিত্য সভায় নিজেরও একটি প্রবন্ধ-পাঠের আমন্ত্রণ থাকায় হাজির না হইয়া পারি নাই। এই দিবসেই উক্ত কবি-

মশায়ের ব্যঙ্গ-রস উপলব্ধি করিবার দুর্ভাগ্য (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সৌভাগ্য!) হইয়াছিল। কিন্তু সভাপতি মশায় হইতে সকলেই (মায় পণ্ডিত মশায়) যখন সমভাবেই তাহা উপভোগ করিতে লাগিলেন, এমন কি সভাপতি মশায় গুরুরোদ খোদ ইয়া-লম্বা প্রশংসা দ্বারা কবি-মশায়কে স্বর্গে তুলিয়াও দিলেন—তখন আমাদেরও তাহা হজম করিতে হইয়াছিল। ক্রমে যখন মহিলা-অধিবেশনের দিনও কবি-মশায় সাহিত্যাকাশের 'প্রভাতকিরণ' স্বরূপ জাহির হইয়াছিলেন, সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া কিছুমাত্র বিস্মিত হইবার কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। কারণ মহিলারা গোঁসা করিয়াছেন, বা তাঁহাদের আত্মসম্মানের মূল্য বুঝিয়াছেন—এমন কোনো প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিবার মত কিছুই পাই নাই। সুতরাং 'মায়ের পুড়িল না, মাসীর পুড়িয়া উঠিল'—এই দুর্নাম লাভ করিবার আশঙ্কায় অগত্যা বোবা বনিয়া ছিলাম। কিন্তু জ্যৈষ্ঠের 'জয়শ্রী' দেখিয়া ভুল ভাঙিল। অতএব সেই কথাই বলিতেছি—

"আমার জবাব হচ্ছে এই,—আলোচনা ভদ্র ভাষায় সংযত ভাষায় করা উচিত, তা যদি না করতে পারেন এবং সভা যদি সেই গ্রাম্যতার সরসতা লঘুভাবে উপভোগ করেন, সে সভা তা হলে তাঁদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক, মেয়েদের সে সভা বর্জ্জন করাই ভালো—যতদিন না তাঁরা সংযত হ'ন। (অথবা মেয়েরা অত নীচে নেমে যেতে পারেন!)"—তাইত!

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তবু যে মেয়েদের হইয়া এতদিনে 'কয়েকটা কথা' বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের মর্য্যাদা-বুদ্ধি জাগ্রত হইতে দেখিয়া সত্য সত্যই আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছি। লেখিকা 'সে সভা' এবং 'গ্রাম্যতার সরসতা' বলিতে কি বুঝিয়াছেন জানি না। তবে উপসংহারে যাহা বলিয়াছেন—তাহাতে তাঁহার দূরদর্শিতা উপলব্ধি করিলাম।—

"আমার কথা এই, যে এই দর দাম ও এই শ্লেষ বিদ্রূপ একে উচ্ছেদও করতে হবে ওই ওঁদের পণ (আরো পরিষ্কার করিলে ভালো হইত) ধরেই। (১ম) প্রয়োজন অতিরিক্ত স্বাচ্ছন্দ্য সুখ বিলাস বর্জ্জন করে। এবং (২য়) উপার্জ্জন ক্ষমতা অর্জ্জন করে।"

এই 'বর্জ্জন' ও 'অর্জ্জন'এর মধ্যে যে নির্ভীক স্বাবলম্বন আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে, অতঃপর তাহা মেয়ে মহলে আত্মপ্রকাশ করুক, ভগবানের নিকট কায়মনে উহা প্রার্থনা করিলে আশা করি তাঁহারা চটিবেন না। কারণ 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর' তাঁহারা যে আদৌ ধরিতে পারিবেন—এরূপ ভরসা করিতেই সাহস পাইতেছি না। আগামী বৎসরই আবার যদি তাঁহারাই ঐ সভাতে প্রবন্ধপাঠ করেন, ইত্যাদি ইত্যাদির জন্য...তাহা হইলে? মেয়েরা গোঁসা বজায় রাখিলে বুঝিব—তাঁহারা শুধু মুখেই বলেন না, কাজেও করেন! দেখা যাক।

* * *

কোনো সম্পাদক প্রবীণ বয়সের স্মৃতি মনে রাখিয়া যে হুবহু সত্য উদঘাটন করিতে পারেন, এরূপ ধারণা ছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষ' তাহা বিশ্বাস করাইয়া ছাড়িল। '১৫ বৎসর' বয়সের কোনো 'এঁচোড়ে পাকা' ছেলে 'চুপে চুপে ঘরে বসে একখানি ছোট-খাটো উপন্যাসই' যদি লিখিয়া ফেলিতে পারে, এবং 'গ্রামবার্ত্তা'র মত কাগজের সংস্পর্শে থাকিয়াও লেখা ছাপাইবার উদাসীনতা সমভাবেই তাহার মধ্যে থাকিয়া যায়—তাহা না বিশ্বাস করিয়া মহাপাতকী হইবার ইচ্ছা জাগা অবশ্যই উচিৎ নহে। কিন্তু কোনো মুসাফির মানুষের প্রবীণ সময়ে আত্মজীবনী লিখিবার সারল্য দেখিয়া মুসাফির সুলভ আত্মবিস্মৃতির নিপুণতায় মুগ্ধ না হইয়া আর পারিলাম কৈ? কারণ—

"এ কয়টি কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে এখনকার ছেলেরাই এঁচোড়ে পাকে না—সেকালেও এচোড়ে পাকা ছেলে জন্মাতো—এই আমিই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।"

সুতরাং বুঝা গেল। বিচক্ষণ সাংবাদিক, সুপ্রবীণ সাহিত্যিক (ভ্রমণ-সাহিত্য ইনক্লুডেড) এবং দস্তুরমত দার্শনিক—এমন কি ইয়া-চওড়া খেতাব—এতগুলি সুসংবদ্ধ ভাবে হইতে ও পাইতে হইলে 'এচোড়ে পাকা' ছেলে হইতেই হইবে? প্রত্যক্ষ প্রমাণই যখন রহিয়া গিয়াছে, অস্বীকার করিবার উপায় নাই! অতঃপর এচোড়ে পাকাইবার একটি টোল খুলিলেই

বেশ মজা হইবে। আর দেশের ছেলেরা অমানুষ হইয়া যাইতেছে, তাহাদের মানুষ করিতে হইলে উহা খোলাই উচিৎ!

সাবিত্রীপ্রসন্নকে 'ভারতবর্ষ'এর স্থান-বিশেষে বেশ সুপ্রসন্ন বলিয়াই মনে হইতেছে। সোনার 'হিন্দুস্থানে' 'সোনার তরী' বাহিয়া এরূপভাবে কোনো কবিকে বহুদিন ভাসিয়া যাইতে দেখি নাই।

"বিশ্বের আগে নেহারি তোমায়,
নয়ন লোভন রূপে,
জ্যোৎস্না-সায়রে সাঁতারিয়া এলে
পূর্ণচাঁদের সাথী,
না জানি কখন সোনার স্বপন
রচিয়াছ চুপে চুপে
দেহ-যমুনায় জাগিল জোয়ার,—
আজিকে শুক্লারাতি!"

প্রেয়সীকে দেখিয়া কেবল যে 'দেহ যমুনায়'ই জোয়ার জাগিয়া উঠিল তাহাই নয়, অবশেষে যাহা হইল—

"দক্ষিণা হাওয়ায় আনমনা
যদি বসন অসম্বৃত
ওগো সুন্দরী বুকের আড়ালে
তোমারে লুকায়ে থুই,
ক্ষমা করো মোরে বিশ্বভুবন
যদি হই বিস্মৃত।"

সুন্দরীর বসন যদি ভাবাবেগে অসম্বৃত হইয়া যায়, লজ্জা নিবারণের জন্য শঙ্কিত কবি 'বুকের আড়ালে' ঢাকিয়া লইবার যে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া করযোড়ে ক্ষমা চাহিয়া বসিলেন—(আহা!) তখন 'দু' জনে মিলিয়া'ই 'জ্যোৎস্না সায়রে···সোনার তরী' ভাসাইয়া দিতে হয়। একজন হাল ধরিবে। অপর জন বাহিয়া যাইবে। তবে একের তরণী অপরে বাহিয়া না গেলেই মঙ্গল।

কিন্তু 'শত জনমের কামনার দেহ' যেরূপ 'উন্মাদ কৌতুকে' তরীতে বোঝাই করা হইয়াছে, মাঝ-দরিয়ায় অবশেষে ডুবিয়া যাইবে না তো! (হে দেবাদিদেব' তুমিই নাকি মদনভস্ম করিয়াছিলে?)

'বঙ্গশ্রী'র (জ্যৈষ্ঠ) 'মিনতি-উদ্ধার' যতই কেন না গল্প সাহিত্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করুক, উহার মধ্যে কাব্যরস গব্য-রসের মত বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ ছাত্রীকে পড়াইতে আসিয়া মাষ্টার মশাই জানিতে পারিলেন যে তাহার (বিলাত প্রবাসী ভাবী স্বামীর) অসুখ। সুতরাং ছাত্রীর ভাবী হবু ব্যাণ্ড পটল তুলিলে মাষ্টার মশাই কিরূপ ডগডগ হ'ন—লেখিকা মাষ্টার মশায়ের মুখ দিয়া তাহাই বলিতেছেন —

—"শুধু কলিক? কেন, নিউমোনিয়াও তো হ'তে পারে। ন'দিনের দিন হার্টফেল, নাভিশ্বাস, গলা ঘড় ঘড়— পটল!"

মাষ্টার ওরফে রমেনের কথা শুনিয়া ছাত্রী ওরফে মিনতি—"ষাট! বালাই! ও কথা ব'লনা" বলিয়া প্রোপোজড স্বামীর উদ্দেশে হয়তো ফরম্যালিটী জানাইয়া অবশেষে দুঃখে ও আশঙ্কায় খাতা টানিয়া লইয়া একটি বিরহ কবিতাই লিখিয়া ফেলিল। পরে রমেনকে "শোন দিকি, কেমন হয়েছে—" বলিয়া পড়িতে লাগিল—

"সুদূর বিদেশে প্রিয়াহীন বিছানায়
প্রিয়তম মোর ভুগিছে কলিক পেনে
হিয়া মোর তা'র কাছে ছুটে যেতে চায়,
হেথা গজানন রাখিছে তাহারে টেনে—
বলিতেছে গজু টিকিটি নাড়িয়া
হায়! কেন হয়নি ক' নিমোনিয়া!"

মাষ্টাররূপী গজাননের প্রতি আকৃষ্ট ছাত্রীর মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া লেখিকা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা গল্প নহে—কবিতা। 'বঙ্গশ্রী'র শ্রী ইহাতে সত্যসত্যই ফুটিয়া বাহির হইতেছে!
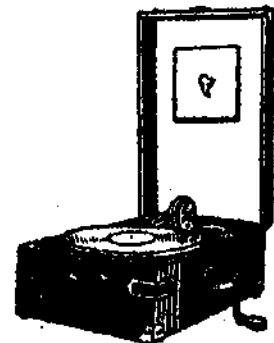
নাম জানা দুই বন্ধু মোরা

(বড় গল্প)

দিলীপ দাশগুপ্ত
মনসা চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

সেদিন রাত্দুপুরে হঠাৎ বাঁকাচাঁদ জল জলে হোয়ে উৎপলার মশারীর উপরে চোখ বুলিয়ে নিলে, আর উৎপলার ঘুম কাতুরে চোখের দুটি ঘন পল্লবিত পাতা এলো খুলে। সে সবিস্ময়ে দেখলে আকাশের বুক চিরে প্রশান্ত একটি কাপুরুষতা তাকে ঘিরে ফেলতে আসছে। কাটা শশার মতো ঠাণ্ডা একটু হাওয়া তার চুলে আর নাকের ডগাকে ছুঁয়ে গ্যালো। ভীরু উৎপলা বালিশটাকে আঁকড়ে ধোরলে। একবার মনে হোলো, বাইরের দরজা দিয়ে কে যেন তাকে টেনে নেবে। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে প্রবীরের বিছানায় সে এগিয়ে গ্যালো। মেঘদূতের একখানা বিরহী প্রকাণ্ড ছবি (এই তো সেদিন প্রবীর হ্যাকশন মার্টে কিনে ফেলল তার রুচিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে) সামনের আয়নায় পড়ে জ্যোছনায় তার বিছানার গড়িয়ে পড়েছে। মৃদু সেই ছায়া প্রবীরের মাথার ওপরের একরাশ ফুলের ভেতরে ঝিনঝিন্ কোরে কাঁপছে; যেন পাইনের শাখা।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উৎপলা প্রবীরের কপালে হাত রাখলে। প্রবীরের ঘুম ভাঙল না। উৎপলা ভাবলে তাকে ডাকবে। কিন্তু না। যদি প্রবীর কিছু ভেবে ফেলে···যদি···। উৎপলা কাঠ হোয়ে রইল। রাত্রির চুল ছিড়ে সময়গুলো দু'ভাগ হোয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। হঠাৎ প্রবীর স্বপ্নভরা চোখে বোললে: কে? উৎপলা নরম হোয়ে জানালে যে সে উৎপলা।

কেন? প্রবীর হ্যাক্সিডেন্টাল টোনে বোললে: কি হোয়েছে তোমার উৎপলা?

ভয় কোরছে।

কিসের ভয়?

কি জানি।

আমার বিছানায় এলে কেন?

ভয়ে। উৎপলা লজ্জায় অদ্ভুত হোয়ে উঠলো, তারপরে হঠাৎ বিছানার পাশ ছেড়ে দিয়ে তার নিজের বিছানায় যাবার জন্য পা বাড়ালে।

প্রবীর তার হাতখানা ধোরে টেনে কাছে আনলে। চোখ ভোরে তাকে দেখে নিয়ে বোললে: একটা কথা বোলবো উৎপলা?

আমিও বোলবো?

বলো।

না, তুমি বলো।

না, তুমি আগে।

উঁহু, তুমি আগে।

আচ্ছা শোনো, প্রবীর উচ্চারণ করে গ্যালো: একলা একলা শুতে খুব কষ্ট হচ্ছে না?

হুঁ। উৎপলা প্রবীরের বুকে মাথা রাখলে আর প্রবীর তার চুলের খোপা ঝপ কোরে খুলে ফেলে থমকে দাঁড়ালে।

কিন্তু, প্রবীর বোললে: এমনি আত্মশুদ্ধি না হোলে যে দু'জনের কাছেই দু'জনে একদিন আমরা ফুরিয়ে যাবো উৎপলা। তখন? আজ আমি যেমন বাবাকে ছেড়ে এসেছি, জানই তো তিনি কেমন বদরাগী; হয়ত আমায় ত্যাজ্যপুত্র কোরে বসেছেন। তুমিও তো তোমার দাদাকে চেন। এত সোজা মানুষ এত বড়ো আঘাত নিয়ে টিকে থাকতে পারেন না। আমরা যদি নিজেদের দিক দিয়ে না বুঝে চলি, উৎপলা, তবে তাদের ব্যথাকে যে বাড়িয়ে দেয়া হবে, তাতো বুঝতে পারো?

উৎপলা কিছু বোললে না। শুধু বোললে: আমার আর ভয় নাই। এবার যাই।

নিঃশ্বাস টেনে প্রবীর বোললে: না, আরেকটু বোস। দেখছ না আকাশে কতকগুলো তারা উঠেছে?

আবার যদি এত আদর পেয়ে আমার ভয় হয় প্রবীর-দা?

তখন? প্রবীর বোললে: তখন আমার উৎপলার হাত চেপে ধোরে বোলব:

'আমি বিশ্বের কুসুম-পরাগ ছানি'

অঙ্গেতে দিব সযতনে মাখি আনি।

চিকুরে তোমার ঢাকিয়া আনন মোর

ভীরু রজনীরে বাঁধিয়া করিব ভোর।

তুমি তো বেশ কবি হয়ে উঠছো প্রবীরদা।

হাঁ। তুমি আছো বলে। চোখের সামনে রজনীগন্ধা, আকাশে ফোটা চাঁদ।

আর আমরা শুধু দু'জন এই নিবিড় অন্ধকারকে উজ্জ্বল করে দিচ্ছি। এতে কি কবি না হয়ে পারি ?

হ্যাঁ। এবার আমি যাই। ছাড়ো প্রবীরদা। আর আমার ভয় নেই। চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে। উৎপলা তার বিছানার দিকে এগিয়ে চললো। প্রবীর ভাবলে, বহুদিন সে যেন উৎপলাকে কাছে পায়নি। থমথমে ভাবনার ঊর্ণনাভ ক্রমশঃ তাকে ঠেলে নিয়ে গ্যালো তার বিছানায়। এ যেন দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করবার একটা সুসজ্য ইঙ্গিত। এটা আমরা সত্যিই জানি যে দু'জনের কেউই ঘুমোয়নি।

* * *

কলকাতার আকাশ ফর্সা হবার সাথে স্টোভে কেৎলী চাপিয়ে, মাথার কালো-ভ্রমরের দলকে পিঠে ছড়িয়ে উৎপলা যখন গুণগুণ কোরে রবিঠাকুরের একটা সন্ধ্যা সুর ভাঁজছিল তখন অরুন্ধতী এসে হাজির।

জয় হোক উৎপলার। অরুন্ধতী গান গেয়ে বোললে।

স্বাগতম্। কিন্তু কেন এত সকালে ?

আজ রীণার জন্মদিন। বাড়িতে তোমাদের পদধূলি দেওয়া চাইই। অরুন্ধতী বললে।

রীণার জন্মদিন ? উৎপলা সানন্দগুঞ্জন কোরে উঠলো। তারপর মুহূর্তে শাদাটে মেঘের মতো সে এলো নিভে। মনে পোড়লো গ্যালো বছরে ঠিক এমনি একটা উৎপলার জন্মদিনে তার দাদাও কতো লোককে নিমন্ত্রণ কোরতে 'মোটর বাইক্' নিয়ে জোরে বেরুত। ভেসে গ্যালো চোখের সামনে দিয়ে একটা কমেডী-ফিল্মের মতো গতদিনের কথা।

দে, এককাপ্ চা দে, রেকফাষ্ট হোয়ে যাক্।

তোর প্রবীরদা কৈ ?

এখনো ওঠেনি।

অরুন্ধতী প্রবীরের বিছানার কাছে গ্যালো এগিয়ে। দেখলে, সমস্ত আকাশ বেয়ে নীল একটা জ্যোতিঃ যেন প্রবীরের মুখে ছড়িয়ে পড়ে তাকে ক্রীশ্‌টমাসের একটি লোভনীয় উপহার কোরে তুলেছে। আল্‌গোছে—অতি আল্‌গোছে অরুন্ধতী তার মাথার ওপরে হাত রাখলে। সে মনে কোরলে, দেবদুর্লভ বর সে লাভ কোরতে এগিয়েছে। হাত রাখলে তাই প্রবীরের মাথার ওপরে। প্রবীর চোখ চাইলে। আর অরুন্ধতী চোলে এলো উৎপলার গরম কেৎলীর পাশে, যেখান-টাতে প্রবীরের জাগ্রত ধ্যান নীড় রচনা কোরে ভাগ্যবান হোয়েছে।

প্রবীরের আলসেমী ভাঙতে না ভাঙতেই অরুন্ধতী বনমৃগীর মতো স্থান-চ্যুতা হোয়ে গ্যালো। উৎপলা চায়ের কাপ নিয়ে প্রবীরের বিছানা স্পর্শ কোরলে। ঘুমন্তচোখেই দু'হাত দিয়ে উৎপলাকে জড়িয়ে ধোরে প্রবীর বোললে, দুষ্টু।

উৎপলা তার চুলের ভেতরে নিজের মুখ নত কোরে আনলে।

আমার জন্মোৎসবের দিন তোমার মনে আছে প্রবীরদা ? যেবারে তুমি প্রথম এলে ? প্রবীর উঠে বোস্‌লে। আনন্দে। হ্যাঁ যথেষ্ট আনন্দে। অপ্রত্যাশিত আনন্দে।—জ্যোৎস্নার মতো মনোরম আনন্দে। 'তুমি আমার নাম জিজ্ঞেস করেছিলে যেবার ?'

হ্যাঁ। যেবার তুমি আমার খোঁপায় একটা হাসনুহানা গুঁজে দিয়েছিলে।

ওহ্! যেবারে তুমি আমার হাতে একটুখানি চাপ দিয়ে বোলেছিলে 'মনামী'

মিথ্যেবাদী। তুমিই তো বোলেছিলে।

না, তুমি।

না, তুমি।

কখনো না।

নিশ্চয়ই হ্যাঁ।

না।

হ্যাঁ। উৎপলা বোললে মিষ্টি কোরে : আজ রীণার জন্মোৎসব। অরু বোলে গ্যাছে। যেতে হবে কিন্তু।

স্টুডিও থেকে ফিরে এসে কেমন ? বোলে প্রবীর বাথরুমে ঢুকলো।

[ক্রমশঃ]

বিশ্ববিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গর্কী

রাশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গর্কীর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। নিশিনি নভগরদে গর্কীর জন্ম হয়। তাঁহার প্রকৃত নাম পেশকফ। কিন্তু গর্কী ছদ্ম নামেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গর্কীর অর্থ 'তিক্ত'। আশৈশব জীবন সম্বন্ধে তাঁহাকে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল, তাহারই সহিত সমন্বয় সাধনের জন্ত তিনি এই নূতন পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না কে জানে! শৈশবেই তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। মাত্র পাঁচ মাসের জন্ত তিনি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পিতা-মাতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ হয়। মাত্র দশ বৎসর বয়সে তিনি এক মুচির দোকানে কাজ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ কাজ তাঁহার ভাল লাগিল না, তিনি অন্ত কাজের সন্ধানে বাহির হইলেন। কখনও ষ্টীমারের খালাসী-দের জন্ত পাচকবৃত্তি করিয়া, কখনও পাঁউরুটীর কারখানায় রুটী সেঁকিয়া, কখনও কেরাণীগিরি এবং কখনও চৌকীদারী করিয়া তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

প্রথম সাহিত্য প্রচেষ্টা

টিফলিসে থাকিবার সময় গর্কী রেলে চাকরী করিতেন। সেই সময় আপনার বিচিত্র জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার কল্পনা সর্ব্বপ্রথম তাঁহার মনে উদয় হয়। তাহার ফলে "কাভকাজ" পত্রিকায় তাঁহার প্রথম রচনা 'মাকার চুদরা' প্রকাশিত হয়। ইহার পর স্বগ্রামে ফিরিয়া গিয়া ছোট ছোট গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময় প্রসিদ্ধ গল্প লেখক ভ্যালাডিমির করলে-ঙ্কোর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ভ্যালা-ডিমিরের সহিত এই পরিচয় গর্কীর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। কারণ গর্কীর রচনায় যে দুরন্ত প্রতিভার লক্ষণ ছিল, তাহা সেই দিনই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় গর্কীর প্রসিদ্ধ রচনা 'চেলকাশ' (গল্প) রাশিয়ার একটি বিশিষ্ট সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও পাপে জীবন যাহাদের প্রতিনিয়ত ব্যর্থতার পথে ছুটিয়া চলিয়াছে গর্কী তাহাদের মধ্য হইতে সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার গল্পের নায়কদের মধ্যে কাহারও "রূপার চামচ মুখে করিয়া" জন্ম গ্রহণের সুবিধা হয় নাই—তাহাদের সবাই কামনা ও বাসনা, লোভ ও লালসার বশীভূত সাধারণ মানুষ। 'চেলকাশ'ও তাহাই।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কতকগুলি গল্প দুই খণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। নাটক রচনা করিয়াও গর্কী অসম্ভব খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এক-খানি নাটক (ইন দি ডেপথস্) বার্লিনে ক্রমাগত পাঁচশত রাত ধরিয়া অভিনীত হইয়াছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আত্ম-জীবন কাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন উহার নাম—"মাই চাইল্ডহুড"।

বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি

বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্ত রুশ সরকার ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সিম গর্কীকে গ্রেপ্তার করেন। পর বৎসর তিনি আমেরিকায় গিয়া জারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালান। কিন্তু যে রমণীকে তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রী নহেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়। ফলে তিনি ইউরোপে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি ক্যাপ-রিতে ছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর তিনি রাশিয়ায় ফিরিয়া আসেন এবং যুদ্ধে যোগদান করেন। গ্যালিশিয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি আহত হইয়াছিলেন। পরে অসুস্থ দেহ লইয়া তিনি বলশেভিক বিদ্রোহে যোগদান এবং একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন। গর্কী ছিলেন সত্যের পূজারী—মিথ্যার সহিত রফা করিবার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। লেনিনকে গণতন্ত্রের পূজারী মনে করিয়া তিনি রুষ বিপ্লবে যোগদান করিয়াছিলেন; কিন্তু কাছে আসিয়া যখন দেখিলেন যে, লেনিন একাই সর্ব্বশক্তি গ্রাস করিতে চাহেন, সেদিন মনে তাঁহার আঘাত লাগিলেও প্রকাশ্যে লেনিনকে আক্রমণ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

লেনিনের বিরুদ্ধাচরণের অভিযোগে তাঁহার কাগজ বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু রাশিয়ার নরনারীর চিত্তে তাঁহার জন্ত শ্রদ্ধার আসন সেদিন এমন দৃঢ়ভাবে রচিত হইয়াছিল যে, সোভিয়েটের বিরুদ্ধাচরণের জন্ত আর কোন শাস্তি তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই। শেষ

পর্য্যন্ত তিনি বলশেভিক নীতি সমর্থন করিতেন। কিন্তু বলশেভিকদের সমর্থন করিলেও তাঁহাদের অন্যায় আচরণ তিনি কোনদিন সহ্য করিতে পারেন নাই। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের আদেশে যখন বহু মনীষীকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয় তখন তিনি আবেগপূর্ণ ভাষায় লেনিনের নিকট পত্র লিখিয়া উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লবীদের নিগ্রহে ব্যথিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, উহাতে নীতি হিসাবে রাশিয়াকে ইউরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইতেছে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে অভাবপীড়িত রাশিয়ানদের সাহায্যের জন্য ম্যাক্সিম গর্কী দেশ ভ্রমণে বাহির হন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য এবং অন্যান্য কারণে তাঁহার সে চেষ্টায় বিশেষ ফল হয় নাই। রাশিয়ায় না ফিরিয়া ইটালী এবং প্রেগে অবস্থান করেন। প্রেগে অবস্থানকালে তাঁহার হৃদরোগ প্রবল হইয়া উঠে এবং কয়েক বৎসর পরে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রাশিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মস্কোয় আসিলে রাজোচিত সমারোহের সহিত তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। ইহার পর তিনি কখনও বা ইটালীতে কখনও বা উইকরাইনের পল্লীভবনে বাস করিতেন। ১৯৩১ অব্দে গর্কী যখন ইটালীতে ছিলেন তখন স্থানীয় সরকার জানিতে পারেন যে, তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র হইতেছে। পর বৎসর সংগ্রাম বিরোধী কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আমষ্টার্ডামে যাইবার পথে বার্লিনে তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন।

গর্কীর ৪০ বৎসর ব্যাপী সাহিত্য সাধনা স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহার নাম অনুসারে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাশিয়ার কতকগুলি সহরের নূতন নামকরণ হইয়াছে। একদা অখ্যাত নিজ্নি-নভগরদেও আজ গর্কীর নামের সহিত জড়িত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

বৃদ্ধ বয়সেও গর্কী প্রতিদিন সকাল নয়টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যা ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত সাহিত্য চর্চ্চা করিতেন। পাঠকদের নিকট হইতে প্রতিদিন অসংখ্য পত্র তাঁহার নিকট আসিত। প্রত্যেকটি পত্র পাঠ করিয়া গর্কী স্বহস্তে তাহার উত্তর লিখিতেন। তাঁহার বিশ্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'মা' পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাশিয়ায় সাহিত্য অপেক্ষা সমাজতন্ত্রের আদর ছিল বেশী। সেদিন পর্য্যন্ত সাহিত্য বিচারের ভার যে প্রতিষ্ঠানটির উপর ছিল তাহা আর, এ, পি, পি, নামেই সমধিক পরিচিত। রচনা সাহিত্য পদবাচ্য হইল কি না, সে দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকিত না, গ্রন্থকার শ্রমিক শ্রেণীর বা শ্রমিকপন্থী হইলেই রচনার সর্ব্বপ্রকার দোষ স্খালন হইত। কিন্তু ইহাতে রুশ সাহিত্যের প্রতিপত্তি যেন ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। দেশের গ্রন্থকারদের রচনা ছাড়িয়া রাশিয়ার নরনারী ডিকেন্স ও সার ওয়াল্টার স্কটের রচনা পাঠ করিতে লাগিল। সাহিত্যের মধ্যে প্রচারের প্রাধান্যের ফলে পাঠকচিত্ত পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা কল কারখানা, মাঠ ও মজুরের, এক কথায় জীবন্ত নরনারীর কাহিনী শুনিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল।

গর্কী বুঝিলেন যে রুশ সাহিত্যের সঙ্কট মুহূর্ত্ত উপস্থিত। তিনি প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শ অনুসারে ষ্ট্যালিন 'আর, এ, পি, পি' ভাঙ্গিয়া দিলেন। রূপকথা পাঠ রাশিয়ায় নিষিদ্ধ ছিল, সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইল। রাশিয়ার সাহিত্যের আদর আবার বাড়িতে লাগিল। ম্যাক্সিম গর্কীর বিরাট প্রতিভা সাহিত্য ও সমাজের বহু প্রচলিত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে, তবু সাহিত্যের মধ্যে প্রচারকে প্রাধান্য দিতে তিনি সম্মত হন নাই। সোভিয়েট রাশিয়ার জন্মের বহু পূর্ব্বেই তিনি সাম্যবাদকে জীবনের

মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পর পদানত অত্যাচার ও দুঃখবেদনা জর্জ্জর কৃশ শ্রমিকের যে চিত্র তাঁর রচনায় ফুটিয়াছে, তাহা বোধ হয় অসংখ্য রাজনৈতিক বক্তৃতায় সম্ভব ছিল না। তবু প্রপাগাণ্ডাই তাঁহার সাহিত্যের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে। সেখানে প্রচার কৌশল ছাপাইয়া মানুষই বড় হইয়া উঠিয়াছে। "কি বলিতে হইবে সেইটুকু জানাই যথেষ্ট নহে, কেমন করিয়া সে কথা বলিতে হইবে তাহাই সর্ব্বাগে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।"—ইহা ম্যাক্সিম গর্কীরই কথা।

আধুনিক সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান পুরোহিত হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকদের তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। সোভিয়েট রুশিয়ার সাহিত্যিকদের উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি ভাল করিয়া পড়া উচিৎ, ইহাও তিনি বহুবার বলিয়াছিলেন। পাশ্চাত্যের আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে গর্কীর বিশেষ আস্থা ছিল কি না বলা কঠিন। তবে রোমা রোঁলার সাহিত্যিক দৃষ্টিশক্তি স্বীকার করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

একবার তরুণ ইংরাজ সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন—"তাহারা যেন রক্তাল্পতা রোগে ভুগিতেছে। জীবন সম্বন্ধে তাহাদের কোন আগ্রহ নাই। সকলেই যেন উহার নিকট হইতে পলাইয়া বেড়াইতেছে। বাস্তবের সম্মুখীন হইবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। যে ধনতন্ত্রবাদী সমাজে লক্ষ লক্ষ নরনারী বেকার হইয়া বসিয়া আছে, সেখানে গঠনের প্রেরণা আসিবে কোথা হইতে? দোষত্রুটী প্রদর্শন এবং ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছুই উহার মধ্যে নাই।"

রুশিয়ার ভবিষ্যৎ সাহিত্য সম্বন্ধে গর্কী যথেষ্ট আশা করিতেন। তিনি বলিতেন, "কোন নাটক বা উপন্যাসে সোভিয়েট নারীর যথার্থ মূর্ত্তি আজও পরিস্ফুট হয় নাই। নাট্যকারগণ যথাসম্ভব অল্প নারী চরিত্র অঙ্কন করেন। তাহা হইলেও এক দিন তাহা সম্ভব হইবে এবং সোভিয়েট নারী যে দিন সাহিত্যরূপ গ্রহণ করিবে, সেদিন বুঝিব যে, সংস্কৃতির সাধনায় আমরা বহু দূর অগ্রসর হইয়াছি।"

সাহিত্যের মধ্য দিয়া গর্কী সমগ্র রাশিয়ার হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। তিনি ঘরের বাহির হইলে মস্কোর পথে ছেলেদের ভিড় জমিয়া যাইত, তাঁহার দর্শন লাভের আশায় কৌতূহলী নরনারী ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া থাকিত।

তাঁহার নামানুসারে সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ রণতরী ও বিমানপোতের নামকরণ হইয়াছে। একদা শ্রমিকবৃত্তি করিয়া যাঁহাকে উদরান্নের সংস্থান করিতে হইত, পরবর্ত্তী জীবনে তিনি এমনি করিয়া রাশিয়ার নরনারীর অন্তরে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন। শৈশব হইতে অন্তরে অন্তরে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি যে অবিশ্রান্ত স্বপ্নকে লালন করিতেন, উত্তর কালে তাহাই বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল—রাশিয়ার আধুনিক ইতিহাসের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারাই এ কথা স্বীকার করিবেন। সাহিত্যিকের জীবনে তাঁহার এই সৌভাগ্যের বোধ করি তুলনা নাই।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

সাহিত্য সংসদ—

গত ২১শে জুন, রবিবারে ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটীর গৃহে উক্ত সংসদ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এক শোক সভায় রুশিয়ার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ম্যাক্সিম গোর্কীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সাহিত্যিকগণ মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুত ফণিভূষণ মৈত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতির নির্দ্দেশে উপস্থিত সকলে গোর্কীর পরলোকগত আত্মার মুক্তির জন্য দুই মিনিট কাল নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। পরে শ্রীযুত ভূপেন্দ্র মজুমদার "গোর্কীর জীবনী ও সাহিত্য-প্রতিভা এবং জাতীয় জীবনে তাহার প্রভাব" সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত বক্তৃতা দেন।

উক্ত সভায় শ্রীযুত নলিনীকান্ত মজুমদার, সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী, সুনীল মজুমদার, দ্বিজেন চৌধুরী, আশু বন্দোপাধ্যায়, বিজয় গুপ্ত, সৌরীন্দ্র মজুমদার, নীতিশ দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরামপুর "বনফুল-সাহিত্য-সমিতি" হইতে শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ মিত্রের সম্পাদনায় শ্রাবণ মাস হইতে "আগামী-কাল" নামে একটি উচ্চাদের মাসিক-সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশিত হইবে।

গান

(ভাটিয়ালী কাহারবা)

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

নদীর ঘাটে কে রূপসী—
কাঁখেতে গাগরী।
ও তার জল নে'য়া চল্ ঢেউ তুলি' আজ
দোলায় আমার তরী॥

ভাটীর টানে চল্‌ছে তরী ;—
মনটী কিসের টানে
চায় কেবলই পিছন ফিরে
ঐরূপসীর পানে,

বিজলী তা'র নয়ন কোণে
পড়ছে যেন ঝরি॥
কবরীতে করবী ফুল,
গন্ধ ছড়ায় বায়ে

ও সে, কাজলা বিলে শাপলা কুঁড়ি
ভ্রমর লোটে পায়ে
মনে হয় তার রূপসাগরে—
সত্যি ডুবে মরি॥

———

ছায়া ও কায়া

শ্রীমধু বসু

অন্নপূর্ণার মন্দির

বাংলা দেশের সাহিত্য-রসিক নরনারীদের কাছে শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর উপন্যাস 'অন্নপূর্ণার মন্দির' অপরিচিত নয়, প্রায় সকলেই এখানা পড়ে তৃপ্তি পেয়েছেন তাও বলা যায়। বর্ত্তমান কালে এরূপ উপন্যাস হয়ত তেমনভাবে সমাদৃত হবে না, কিন্তু ওখানা যখন বাজারে প্রকাশিত হয়েছিল তখন এর প্রশংসায় সবাই একমত হয়েছিলেন।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ অতি কষ্টে সপরিবারে দিন কাটায়, পত্নী কন্যারা নানারূপ কাজ কর্ম্ম করে তা বাজারে বিক্রয় করিয়ে যা সামান্য লাভ পায় তার দ্বারাই কোনক্রমে রামশঙ্করের পরিবারবর্গ দিন কাটায়। অভাবের তাড়নায় একদিন ব্রাহ্মণ রোজগারের উপায় না হলে আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করবেন না বলে বেড়িয়ে পড়েন, সাধ্বী স্ত্রী এবং বালিকা কন্যাদ্বয় সতী ও সাবিত্রী ব্রাহ্মণের জন্য পথপানে তাকিয়ে থাকেন। সেই গ্রামের ধনী সচ্চরিত্র ২২ বৎসর বয়স্ক যুবক বিশ্বেশ্বর এদের অবস্থার কাহিনী জ্ঞাত ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণকে হন হন করে যেতে দেখে অবস্থা বুঝে নিয়ে তার সমীপবর্ত্তী হন এবং কথাচ্ছলে জানেন যে তিনি রোজগারের চেষ্টায় বেরিয়েছেন। নিজ ১০৲ টাকা মাহিনায় তার একটী কাজ যোগাড় করে দেন। কোনমতে এই ১০টী টাকা ও সাধ্বী স্ত্রী জাহ্নবী ও কন্যাদ্বয়ের হাতের কাজের জিনিষ বিক্রয় দ্বারা এই পরিবারের দিন গুজরাণ হতে থাকে। পুত্র হরিশঙ্কর পড়াশোনা ছেড়ে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী গ্রামের জমিদার নরেনের আড্ডায় ভিড়ে থিয়েটার করে দিন কাটায়। মাসে এক আধদিন বাড়ীতে আসে, পিতা দূর হয়ে যেতে বলেন, পুত্রও চলে যায়, মায়ের চোখের জল, ভগ্নিদ্বয়ের কাতর চোখ কোন কিছুই তাকে সৎপথে আনতে পারে না। কন্যা সতী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী প্রতিমা, রূপে গুণে তার তুলনা হয় না, কনিষ্ঠা কন্যা সাবিত্রীও তার দিদিরই তুল্যা সর্ব্বগুণান্বিতা, তবে দিদির ওপর বড্ডই নির্ভরশীল হওয়াতে নিজের সত্ত্বা হারিয়ে ফেলে দিদিরই কথামত চলে। পত্নী জাহ্নবী এ সংসারের মূর্ত্তিমতী জাহ্নবী, শান্ত সৌম্য এই পতিপ্রাণা নারী সংসারের তীব্র অভাব এবং রুগ্ন স্বামীর কর্কশ ব্যবহারের মধ্যেও নিজেকে স্থির ধীর রেখেছেন।

সতী বড় হচ্ছে—এমনি সময় হঠাৎ বিশ্বেশ্বরের মাসীমাতা অন্নপূর্ণার কাছ হতে জাহ্নবী প্রতিশ্রুতি পান যে, সতীকে তিনি বধূরূপে গ্রহণ করবেন। এদিকে বিশ্বেশ্বর এ প্রস্তাবে রাজী হয় না, কারণ তার বিবাহে একান্ত অনিচ্ছা—সে তার জীবনের সাধ আগে পূর্ণ করবে তারপর বিয়ের কথা ভাববে। মাসিমা লজ্জায় কিছুদিনের

'পরপারে'র একটী দৃশ্য

জন্ম গ্রাম ছেড়ে তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন।

বাড়ী বাঁধা দিয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যে কুলীন সৎপাত্রের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করলেন তার বয়স আশীর কাছাকাছি। তিনি শুধু বিয়ে করেই খালাস, টাকার দরকার তাই ভদ্রলোককে কন্যাদায় মুক্ত করতে এগিয়েছেন। জাতি কুলমান বজায় রাখতে গিয়ে রামশঙ্কর কন্যাকে মৃত্যুপথযাত্রী এক বৃদ্ধরূপ হাড়িকাঠে জুড়ে দিলেন। রুগ্ন রামশঙ্করের জীবনদীপ নিভে গেল। যাবার সময় যাকে কঠিন হৃদয় পিতা বলে পুত্রকন্যারা জানত তারা তার সেই কঠিন অন্তঃকরণের মধ্যে যে স্নেহের ফল্গুনদী গোপনে বয়ে যাচ্ছিল তার পরিচয় পেল। সবাইকে এমন কি অসৎচরিত্র পুত্রকে পর্যন্ত আশীর্বাদ করে গেলেন। প্রাণের পুত্তলী সতীকে জীবন্ত বলি দিয়েছেন তার জন্ম যে কি নিদারুণ ব্যথাই এই শুষ্ক কঠিন চরিত্রের লোকটী সহ্য করে এসেছেন তাও জানা গেল। পিতার মৃত্যুর পর সতী চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখলে—মাতা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন, তাকে এবং কনিষ্ঠ শিশু-ভ্রাতার আহারের পর্য্যন্ত সংস্থান নেই। একে একে সামান্য যা তৈজসপত্র ছিল তা সবই বিক্রি করিয়ে শেষে আর দিন চালা-বার কোন উপায়ই সতী পায় না। ভ্রাতা হরিশঙ্কর বাবুদের কাছেই থাকে, মাঝেমাঝে বাড়ীতে আসে, দু'দশটা টাকা কালে-ভদ্রে দিয়ে যায়, এক রাত্রিও এ বাড়ীতে বাস করে না। কিন্তু বিশু টাকা সাবিত্রীর হাত দিয়ে পাঠায় ভ্রাতার অধিকার নিয়ে সাহায্য করতে চায়, কিন্তু সতী সে অর্থ ফেরৎ পাঠায়—বলে, "আপনি আমাদের কে যে আপনা কাছ হতে সাহায্য নিতে যাব। যখন ভিক্ষা করতে রাস্তায় বেরুব তখন আপনার কাছেও ভিক্ষা চাইব।"

সময় আসে যখন মহাজন তার প্রাপ্য টাকার সুদসহ দাবী জানায়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শোধ করতে না পারলে সকলে বাড়ী হতে বের করে দেবে। চিন্তায় সতী চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে। চাঁদ-পুরের যুবক জমিদার নরেন সতীর বাল্যবন্ধু কমলার স্বামী। হঠাৎ একদিন তার নজর সতীর ওপর পতিত হয়, প্রায়ই সে তাকে প্রলোভন দেখায়। উপায় না দেখে মা ভাই বোনকে রাস্তায় যাতে না দাঁড়াতে হয়, কিছুদিন যাতে নির্ভাবনায় গ্রাসাচ্ছাদন চলে তার জন্য সতী স্বেচ্ছায় সে নরপিশা-চের ১০০০ টাকার নোট গ্রহণ করে। বোন সাবিত্রীকে বোঝায় যে এ টাকা সে কুড়িয়ে পেয়েছে—এ নিতে কোন দোষ নেই। মনে মনে স্থির করে রেখেছে তাকে এখান হতে যেতে হবে, তবে নরেনের সহিত নয়—সেখানে—যেখানে কোন জ্বালা যন্ত্রণা নেই, সেই অপরিচিত পুরীতে। যাবার পূর্ব্বে বিশুকে পত্রদ্বারা সমস্ত ঘটনা জানিয়ে যায়, আর এও জানায় সে তার খুব অযোগ্য ছিল না—তাকে যদি সে পায়ে স্থান দিত তাহলে নরেনের প্রলোভনে সে পতিতা হত না। আজ তার মা ভাইবোন-দের এত দুরবস্থা হত না। আজ তাকে

উপায়ান্তর না দেখে দেহ বিসর্জ্জন দিতে হত না। মনে মনে সে বিশুকেই পূজা করে এসেছে।" চিঠি পড়ে উন্মাদের ন্যায় বিশু সতীদের বাড়ী ছুটে আসে...যদি...যদি সতীকে বাঁচান যায়...এসে দেখে সব শেষ! জাহ্নবী সতীর মৃতদেহ জড়িয়ে ধরে ধৈর্য্যহারা হয়ে কাঁদছেন। সাবিত্রী ও কালীপদ অব্যক্ত ভাষায় শোক প্রকাশ করছে। সতী বিষপানে দেহ ত্যাগ করেছে, বাড়ীতে মহাজন পেয়াদা নিয়ে দখল নিতে এসেছে।

এর পরও গল্পের আকর্ষণ কারো আছে কি? ঐদিনই বিশ্বেশ্বর মহাজনকে নিজ হতে সমস্ত টাকা মিটিয়ে বাড়ীখানা দায়মুক্ত করে। নরেনকে তার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে ভর্ৎসনা করে আসে, তাকে জানিয়ে আসে যে তার এই টাকাই সতীকে দেহ ত্যাগে বাধ্য করেছে। কমলার মধ্যে সতীর আত্মা লুকিয়ে রয়েছে। তাকে যেন সুখী করে। নরেন ভাল হয়, কারণ মন তার অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছিল। উপেক্ষিতা স্ত্রী কমলাকে ফিরে পেতে চায়। হরিকে বিশু নিয়ে এসে মানুষ করে তুললো। সাবিত্রীর বিয়ে। বিবাহ আসর হতে পাত্রকে তার পিতা উঠিয়ে নিয়ে যায়, কারণ কিছু মনোমালিন্য হয়েছিল। বিশু নিজেই বিয়ের টোপর মাথায় দিয়ে বসে। যে গৃহে সতীর স্থান হয়নি, সেই গৃহই সাবিত্রীকে সাদরে স্থান দিল।

এই মূল কাহিনীকে চিত্রনাট্যকার তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী যথাযথভাবে রূপ দিতে পারেন নি। তার রচনায় অনেকগুলি ভাল জিনিষই বাদ পড়ে গেছে—যথা, রামশঙ্করের মৃত্যু, এই পরিবারের তীব্র অভাব অনটনের কথা, সর্ব্বোপরি সতীর মুখ দিয়ে বিশুকে ভর্ৎসনা করান, সতী যে কি অভাবের মধ্যে পড়েছিল, সদ্যবিধবা মাতার ও শিশুভ্রাতার আহারের সংস্থান পর্য্যন্ত করে উঠতে পারেনি, বাড়ী হতে মহাজন সবাইকে তাড়িয়ে দেবে, এই মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নির হাত ধরে তাকে রাস্তায় বেরুতে হবে এ চিন্তাও যে তার পক্ষে অসহ্য! এর চেয়ে নিজেকে বিক্রয় করা কি এতই দোষণীয়! যার বিয়ের জন্যই আজ এ বাড়ী চলে যাচ্ছে সে কি নিজের মায়ায় এভাবে সব চলে যেতে দেবে। সতী বাধ্য হয়ে নরেনের প্রদত্ত অর্থ গ্রহণ করল। তারপর অর্থ যখন সে গ্রহণ করেছে, তখন নরেনের কাছে তাকে যেতেই হবে ধর্ম্মের দিক দিয়েও যাওয়া উচিৎ, কিন্তু তা সে পারে না, কিন্তু নরেনের কাছে না গিয়ে সে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে না, বাধ্য হয়ে স্বহস্তে নিজের জীবনদীপ নিভিয়ে দিয়ে সতী পরলোক যাত্রা করল। এ সমস্তের মূল ভাব তিনকড়ি বাবুর চিত্রনাট্যে পরিস্ফুট হয়নি, অথচ এসব দেখান মোটেই কষ্টকর ছিল না। তিনকড়ি বাবু রামশঙ্করকে জীবিত রেখেছেন, সাবিত্রীর সহিত বিশুর বিয়ের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়েছেন, সতীর মৃত্যু দেখিয়ে ছবি শেষ করলেন, মরবার পূর্ব্বে সতী প্রদীপের শিখায় নোটগুলি পুড়িয়ে ছাইয়ে পরিণত করে যায়।

তিনকড়িবাবু সাবিত্রীর সহিত বিশুর সতীর জীবদ্দশাতেই বিয়ের বন্দোবস্ত করিয়ে অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। এরূপ হওয়াতে বিশুর চরিত্র ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে।

আমরা মূল উপন্যাসের মতই চিত্রনাট্য দেখতে চেয়েছিলাম এবং তাতেই খুসী হতাম। সান্যালের মুখ দিয়ে বিশ্রি কয়েকটি কথা (মহাজনের পুত্র না হওয়া সম্বন্ধে) এবং নরেনের আড্ডাটি আমাদের ভারী বিশ্রী লেগেছে এবং এজন্য চিত্রনাট্যকারের রুচির তারিফ করতে পারছি না। অবিলম্বে এগুলি বাদ দেওয়া উচিত। ছবির শেষাংশ অত্যন্ত দ্রুত করা হয়েছে এবং এত তাড়াতাড়িতে এই শেষাংশ এগিয়েছে যার দরুণ কাহিনী ভালমত পরিস্ফুট হতে পারে নি।

পরিচালনা চলনসই, তিনকড়ি বাবুই পরিচালক, আলোকচিত্র চলনসই, শিল্পী হচ্ছেন সুরেশ দাশ, শব্দ-যোজনা মন্দ নয়, যন্ত্রী হচ্ছেন জগদীশ বসু। সম্পাদনা ভাল হয়নি, তার যদি বুদ্ধি থাকতো তাহলে শেষাংশের ওপর হয়ত এমন নির্ম্মমভাবে কাঁচি চালাতেন না। রসায়নাগারের কর্ম্মীরাও যোগ্যভাবে কাজ করতে পারেন নি। পশ্চাৎ-পট-সঙ্গীত মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।

জাহ্নবীর ভূমিকায় প্রভাকে যেমন সুন্দর মানিয়েছে তার অভিনয়ও হয়েছে তেমনি সর্বাঙ্গসুন্দর। অবশ্য রঙ্গাভিনেত্রী যে তিনি তা ভুলে থাকা তার পক্ষে সব সময় সম্ভবপর না হলেও তার অভিনয়কেই শ্রেষ্ঠ স্থান অসঙ্কোচে দিতে পারি। সতীর সুকঠিন চরিত্রটিকে অভিনেত্রীর শক্তির মত যতদূর সম্ভব সহজ করা হয়েছে, যদি মায়া মুখার্জ্জি ভাবপ্রকাশে নিপুণা হতেন তাহলে তার খুব প্রশংসা করতে পারতাম। সাবিত্রীর অংশটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, কিশোরী নটী মিনার্ভার ব্যালেটগার্ল সাবিত্রী তাকে ভালরূপেই রূপ দান করেছেন। ছোট ভূমিকায় প্রবীনা নটী প্রকাশমণি সু-অভিনয় করেছেন, দুটি কথার ভূমিকায় কালীপদরূপে প্রভা তার স্বীয় কন্যা বুলাকে নামিয়েছেন, মেয়েটি মন্দ নয়। চমৎকার নারীচরিত্র অন্নপূর্ণা, মনোরমা কিন্তু তাকে হত্যা করেছেন।

রামশঙ্করের জীবন্ত ছবি কালী ফিল্মস দেখিয়েছেন—ফণী রায়কে সত্যিই চমৎকার মানিয়েছে এই ভূমিকায়। অভিনয় তার খুবই প্রশংসার যোগ্য হয়েছে, শুধু তার স্নেহের দিক ফোটে নি, তার জন্য তার কোন দোষ নেই—দায়ী চিত্রনাট্যকার। বিশুর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস চেহারা ও অভিনয়ে চলনসই পর্য্যায়ে স্থান পাবেন। বিশুর মূল চরিত্র তার অভিনয়ে প্রকাশ পায় নি। হরিশঙ্করের চরিত্র যেমন ভাবে লিখিত হয়েছে অভিনেতা মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় কোনমতে চালিয়েছেন, তার গানখানা মন্দ নয়। নরেনের ভূমিকায় তারা ভট্টাচার্য্য বিশ্রীভাবে মাতলামো করেছেন, তার সংযত হওয়া উচিৎ ছিল। অন্যান্য ভূমিকাগুলি মন্দ নয়। কমলার (ঝরিয়া) গানটা মন্দ নয় কিন্তু শব্দ যোজনার দোষে লোকে হেসেছে। নর্ত্তকীর নৃত্যগীত বিশেষত্বহীন। দৃশ্যপট যে পটে আঁকা তা বেশ বোঝা গেছে।

ভোট ভণ্ডুল

হাসির ছবিরূপে বীরেন ভদ্র রচিত এই ছবিটী কথিত হলেও আমরা হেসেছি খুব কম। অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ করা হয়েছে, কাহিনীকে এর চেয়ে ঢের বেশী উপভোগ্য করা যেত। মাতা মাতঙ্গিনী ও কন্যা মনোহরার হাতাহাতি অত্যন্ত দৃষ্টিকটু হয়েছে। সুর মন্দ নয়, গান কথা-নাও ভাল লাগলো না। শৈলেন চৌধুরীর দারুকেশ্বর, সন্তোষ দাসের গঙ্গারাম নীরদাসুন্দরীর মাতঙ্গিনী ও ফুল্লনলিনীর মনোহরা মন্দ নয়, উমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রিদাম মুদী প্রশংসনীয় হয়েছে। রেকর্ডিং ভাল হয়েছে, ফটোগ্রাফী মন্দ নয়। এ উভয় কাজই করেছেন যথাক্রমে জগদীশ বসু ও সুরেশ দাস।

'দ্বীপান্তর'

ডি,জির অসুস্থতার জন্য 'দ্বীপান্তরে'র কাজ কয়দিন পুরোদমে অগ্রসর হতে পারে নি। ডি, জি এখন একটু সুস্থ হয়েছেন এবং দ্বীপান্তরের কাজে অখণ্ড মনোযোগ দিয়েছেন। ডি, জি এবার দ্বীপান্তরের জন্য কয়টী নূতন মুখ যোগাড় করেছেন, তারা অচিরেই চিত্রজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সবিতা দেবী ডি, জিরই রিক্রুট ছিলেন—এমন কি এই নামটীও ডি, জিরই দেওয়া। তিনি যেমন অল্পদিনের মধ্যে সুনামের অধিকারিণী হয়েছেন, ডি, জির এই নূতন রিক্রুটগুলির সম্বন্ধেও আমরা সেই ধারণাই পোষণ করি। গল্পের অভিনয়ে—অভি-

নেতা অভিনেত্রীদের সুষ্ঠু রূপদানে 'দ্বীপান্তর' চিত্রজগতের অনবদ্য অবদান হবে বলে মনে করা অন্যায় হবে না।

রাধা ফিল্ম্‌স

"বিষবৃক্ষ" বা 'পয়জন ট্রি' রাধার পরবর্ত্তী বাংলা চিত্র। কাননবালা কুন্দের ভূমিকায় এবং শান্তি গুপ্তা সূর্য্যমুখীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। জহর গাঙ্গুলী নগেন্দ্রের চরিত্রের রূপ দিচ্ছেন। যাক, রাধা আমাদের কথা শুনেছেন। হীরামালিনীর ভূমিকায় চারুবালাকে না নামিয়ে আর একটি অভিনেত্রীর সন্ধান করছেন।

'অভয়ের বিয়ে' কবে হবে পঞ্জিকা দেখে তার দিন ঠিক এখনও করা হয়নি।

'পরপারে'

চিত্রামোদীগণ শুনে উল্লসিত হবেন যে, চন্দ্র ফিল্মের বহু আলোচিত প্রথম বাণীচিত্র দ্বিজেন্দ্র লালের "পরপারে" বহু প্রতীক্ষার অবসান করে আগামী ৪ঠা জুলাই শনিবার চিত্রায় মুক্তি লাভ করবে। পরপারে যেরূপ অভিনেতৃ সমাগম হয়েছে, তা বাংলাচিত্রে একরূপ দুর্লভ বললে অত্যুক্তি হবে না। অহীন্দ্র চৌধুরী ও দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়ের সম্মিলিত অভিনয় ছবিখানির বড় আকর্ষণ। পরিচালক যতীন দাস সুস্থ হয়ে ছবিখানিকে সম্পূর্ণ করেছেন। যতীন বাবু একাধারে পরিচালক ও চিত্রশিল্পীর কাজ করেছেন ছবিখানির অভাবনীয় সাফল্যের জন্যে। ভাই প্রবোধ দাসকে তিনি সর্ব্বদা নিজের বহু অভিজ্ঞতাপ্রসূত পরামর্শ দ্বারা সাহায্য করেছেন। কাজেই ছবিখানি যে দেখবার মত হবে, সে বিষয়ে আমরা একরূপ স্থির নিশ্চিত। দুর্গাদাস ও অহীন্দ্র ছাড়া মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, শ্রীমতী জ্যোৎস্না, বীণা, নিভাননী প্রমুখ নামকরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে 'পরপারে' দেখা যাবে। গীতি-দুলাল শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র দে পরপারের গানে সুর যোজনা করেছেন। আমরা সাগ্রহে 'পরপারে'র মুক্তি প্রতীক্ষা করছি।

রূপবাণী

শনিবার ২৭শে জুন হইতে এই চিত্রগৃহে মেট্রোর একখানি অমর আলেখ্য প্রদর্শিত হবে। ছবিখানির নাম—"এ টেল অফ টু সিটিজ"।

চার্লস্‌ ডিকেন্সের অমর লেখনী একদিন এই বইখানি দ্বারা বিশ্বসাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করেছিলেন। মেট্রো কোম্পানী তাহা সবাক চিত্রে রূপান্তর দান করে সারা জগতে প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন—রোনাল্ড কল্‌ম্যান ও এলিজাবেথ অ্যালেন। এতদ্ব্যতীত ৪৯০০০ বিভিন্ন চরিত্রের একত্র সমাবেশ এই চিত্রে দেখা যাবে। ফরাসী বিদ্রোহের যে আলেখ্য চিত্রখানিতে দেখানো হয়েছে তা সত্যই মন ও চোখকে বিস্ময়াবিষ্ট করে রাখে।

কুমার বিশ্বনাথ রায়

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ৩১ নং ওয়ার্ডের জনপ্রিয় তরুণ কাউন্সিলার কুমার বিশ্বনাথ রায় ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টে কলিকাতা করপোরেশনের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই পদের জন্য আরো অনেক প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করায় গত শুক্রবারে কলিকাতা করপোরেশনের এক বিশেষ সভায় তিনি বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কুমার বিশ্বনাথ রায় কর্ম্মপ্রাণ—দেশসেবায় তাঁহার উৎসাহ ও অবসরের অভাব নাই। আমরা তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে আরো বিস্তৃতভাবে আত্মনিয়োজিত দেখিলে সুখী হইব।

সচিত্র সাপ্তাহিক

দ্বিতীয় বর্ষ—২১শ সংখ্যা

শুক্রবার—১৯শে আষাঢ়

১৩৪৩

৪ঠা জুলাই—১৯৩৬

বর্ত্তমান সাহিত্য
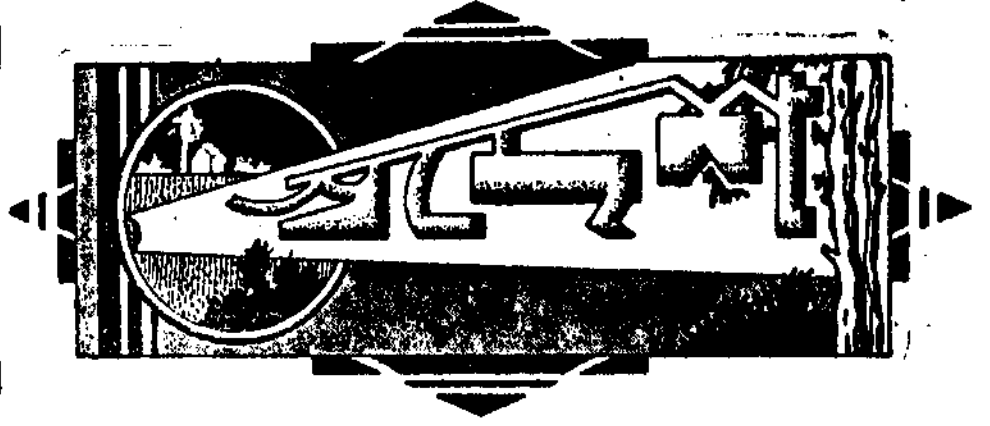
ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না—সব কিছুকে একীভূত ক'রে নিয়ে একটা বিশ্বজনীন ছন্দের ঐকতান যেমন সৃষ্টি মাধুর্য্যের সর্ব্বাঙ্গীন অগ্রগমনে আত্মহারা, সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তেমনি। এই দিক দিয়ে বিশ্বস্রষ্টার সাথে সাহিত্যস্রষ্টার কোনো প্রভেদ নেই। সমগ্রভাবে সকলকে নিয়েই সৃষ্টির বৈচিত্র্য লীলায়িত। যেখানে সৃষ্টি, সেখানে যেমন কোনো একটা নীতিগত ধরা-বাধা নিয়মের ঠাঁই নেই, সাহিত্য সৌন্দর্য্য-রসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ ধারাও তেমনি কারো নীতিগত ধরা-ছোঁয়ার গণ্ডীতে দাঁড়িয়ে থাকতে চায় না বা জানে না। সৃষ্টি চেতনার উন্মাদ আত্মবিস্মৃতিই তাই সাহিত্য সৃষ্টির স্বাভাবিক পরিণতি। আর এর কোনো মাপকাঠি না থাকাই মঙ্গল।

কিন্তু বর্ত্তমান সাহিত্যে দুর্নীতির প্রসার ক্রমে সীমা ছাড়িয়ে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিকেই সাহিত্য সৃষ্টির স্বাভাবিক গতি হিসেবে ধরে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলেছে, এইরূপ একটা অভিযোগ প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। অভিযোগ যাঁরা করেছেন, তাঁরা বলছেন—তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যে একটা বেপরোয়া সাহিত্যমেধের আস্ফালন দেখা যাচ্ছে, এতে ক'রে সাহিত্য সৃষ্টি তো হচ্ছেই না, বরং এতদিনকার সুশৃঙ্খল সামাজিক ভিত্তিটাকে নড়িয়ে চড়িয়ে এমনই হাল্কা ক'রে তুলেছে যে এর জন্য বিশেষ-ভাবে একটা নৈতিক মাপকাঠির আশু প্রয়োজন।

পূর্ব্বেই বলেছি, সাহিত্য কোনো ব্যক্তিগত আত্মগরিমার বস্তু নয়। এরূপভাবে লিখো না, এরূপভাবে লেখো বা ঐরূপ না করে এইরূপ কর—এ সব উপদেশ অবশ্য শিক্ষকতার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাই বলে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যে ঐ স্কুল-মাষ্টারীই সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয় হবে—এ কথা বলে নীতি-রক্ষার সনাতন মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার ঐকান্তিকতা প্রকাশ পেলেও, সাহিত্য সৃষ্টির স্বকীয়তা রক্ষা পায় না। ফরমায়েস দিয়ে হয় তো নিজের মনের মত জিনিষ ব্যবহার করতে পারি এবং অর্থের বিনিময়ে খেয়াল মত রুচির পথে আপনার প্রবৃত্তিকে পরিচালিত করে তৃপ্তি পাই। কিন্তু সৌন্দর্য্য রসের স্বতঃ উৎসারিত গতি পথেও যদি এই সজাগ মনোবৃত্তির বিধি ও নিষেধকেই সব চেয়ে বড়ো বলে মেনে নেই, তার চেয়ে অন্যায় আর আছে কি? সৃষ্টির ক্ষেত্রে সজাগ অবস্থা সৌন্দর্য্যের পরিপন্থী এবং সাহিত্যের প্রেরণা সেখানে নেহাৎ মনগড়া। আত্মবিস্মৃতিই সৃষ্টির আদি। আর সাহিত্যও এই আপনভোলা পথেরই পরিপূর্ণ প্রকাশ। এখানে ভালমন্দ বিচারের অবসর কই?

সাহিত্যের বহুমুখীন গতি-বৈচিত্র্যে হয় তো চঞ্চলতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকাশ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই অবাঞ্ছনীয় প্রাণ স্পন্দনের গতিশীল ভঙ্গীই আসন্ন পরিপূর্ত্তির ধৈর্য্যে একদা কল্যাণময়, মধুময় হয়ে ওঠে, এমন প্রমাণ আমরা অহরহ পেয়েছি এবং পাচ্ছি। সুতরাং বর্ত্তমান সাহিত্যের উপর শ্লেষ বর্ষণের পূর্ব্বে সহানুভূতির প্রচেষ্টাই সর্ব্বাধিক কাম্য ও গ্রহণীয় বলে মনে করি।

চাঙিম চাঙিম

শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ

"কত রঙ্গ জান রে চাচা,
কত রঙ্গ জান,
জলের মদ্দি থুইয়া জাল
ডাঙায় বইস্যা টানো।"

কোন এক ক্যালকেশিয়ান্ মুসলমান যুবক জোয়াহির লালজীকে পত্রাঘাত করেছেন। তাঁর মতে সাম্যবাদ ভাল জিনিষ, যদি তার ফলে ধড়িবাজ হিন্দুরা সেই রাজনৈতিক ব্রাহ্ম ব্রাদারহুডেও আবার যে যার মোড়ল হয়ে চেপে সিট ডাউন না করে। হিটলার নাকি যেমন জু'দের জ্বালায় জ্বালাতন, বাংলার তথা ভারতের মুসলমানরাও নাকি তদ্বৎ জাত হিন্দুদের মোড়লীর চাপে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। বাবা জীবনের লেখায় আভাস পাওয়া যায়, যে, এবার লর্ড জেটল্যান্ড ... নাজিমুদ্দীন সাহেবের মোগলাই আমল আরম্ভ হ'লে বঙ্গদেশে তৎসহ হিন্দু বিতাড়ন যজ্ঞ আরম্ভ হলেও হতে পারে। অন্ততঃ এই উদার সাম্যবাদী তরুণ মনের তাই আশা!

* *

এই বাবাজীবনের ধারণা বড়ই বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি বলেছেন, আপনার ন্যায় আমরাও বিশ্বাস করি, যে, সমাজতন্ত্রবাদই ভারতের দুঃখ দুর্গতি অপনোদনের একমাত্র উপায়।" কেবল ভারতের নয়, গোটা দুনিয়ার দুঃখ দুর্দশা এই সাম্যবাদের ছোঁয়ায় নাকি রাতারাতি কর্পূরের ড্যালার মত উপে যাবে, কিন্তু পণ্ডিতজীর সমাজতন্ত্রবাদে আর এই মুসলীম-মস্তিষ্ক-উদ্ভূত সাম্যবাদে নাকি আসমান্ জমিন্ ফারাক! তা তো হবেই। মর্কটকে যদি ধর্মরাজ্য স্থাপনা করতে বলা হয়, তা' হ'লে, মর্কট তার বাহুরে বুদ্ধিতে লঙ্কাদাহের ব্যবস্থা ছাড়া আর কি ব্যবস্থা দেবে? কপিরাজের মস্তিষ্কে যে খাণ্ডবদাহের মাইক্রোব আছে, সেই কীটকুলের দংশনে ক্ষিপ্ত তিনি সদাই চঞ্চলভাবে ভাবের বৃক্ষে এ ডাল ও-ডাল করছেন। আদর্শ-হিষ্টিরিয়ার খিঁচুনীতে তিনি সদাই অষ্টাবক্র।

* *

পণ্ডীতজীর সাম্যবাদ নাকি কংগ্রেসী হিন্দু জনসাধারণের দরদে পূর্ণ; অথচ এর কিছু আগেই বাবাজীবন বলেছেন, "পরলোকগত সি আর দাসের ন্যায় আপনিও সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র গণ্ডী ও স্বার্থ হইতে মুক্ত।" এ হেন উদার বুদ্ধি বসুধৈব কুটুম্বকম্ পণ্ডিতজী নাকি এক ঢিলে চার চারটি পাখী বধ করতে চেষ্টা করছেন, যথা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান, অস্পৃশ্যজাতি, শ্রমিক ও কৃষাণ এবং ধন—তান্ত্রিক হিন্দুদের স্বাধীনতা লাভের আদর্শ। রাজনীতির এই কচি ও কাঁচার বোধ হয় ইচ্ছা, সাম্যবাদের জগড়-নাথী রথ তার নো কম্প্রোমাইজ চাকায় এই চার জাতীয় জীবকেই দলে পিষে একটা রক্তরাঙা চাপন ও মারণ রাজ্যে পৌঁছে দেয়, যেখানে ডিক্টেটর আর অগপু নামক গুপ্ত পুলিশ মিলে সাম্যবাদী ভূস্বর্গ রচনা করছে।

* * *

কম্যুনিজমের গুরু লেনিন্ স্বয়ং বলেছেন, সব রকম আপোষ রফাই দরকার, আপোষ রফা এড়িয়ে কোন কাজই চলে না। অথচ আমাদের তরুণ মুসলীম কম্যুনিষ্ট প্রমাণ করছেন, যে, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। মস্কোতে অগপুর অপ্রতিহত শক্তি ইতি মধ্যেই হরণ করা হয়েছে, ডিক্টেটরের পক্ষপুট ছাটবার ব্যবস্থা স্বয়ং ষ্ট্যালিন্ করছেন, দেশবাসীকে জিহবার

কলিকাতা করপোরেশন

অগ্নি বীমা কোম্পানীসমূহের (ফায়ার ইন্সিওরেন্স) প্রতি বিজ্ঞপ্তি।

কলিকাতা করপোরেশনের নিজস্ব বাজারগুলির অগ্নি বীমার (ফায়ার ইন্সিওরেন্স) জন্য দর (কোটেশন) আহ্বান করা যাইতেছে। ১৯৩৬ সালের ১৫ই জুলাই তারিখ পর্য্যন্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারী দর পত্রগুলি গ্রহণ করিবেন। বিস্তৃত বিবরণের জন্য কলিকাতা করপোরেশনের সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন। ১৯৩৬ সালের ৩রা জুলাই তারিখে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

ভাস্কর মুখার্জ্জি
বি, এ [ক্যান্টাব], বি, এস, সি [কলিকাতা]
অফিসিয়েটিং সেক্রেটারী।
সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস
২৭শে জুন, ১৯৩৬ সাল।

স্বাধীনতা ও পার্লামেন্টি স্বায়ত্ত শাসন দিয়ে। ক্রয় ভদ্রুক মানুষ হচ্ছে আর আমাদের মুসলীম "হ্যাভ-নট"-রা কি মনে মনে আও ভদ্রুকত্ব প্রাপ্তির আশা পোষণ করছেন? বাবাজীবন ধড়িবাজ—ভদ্রলোক উচ্চজাতির হিন্দুদের পশ্চাতে কম্যুনিষ্ট ভদ্রুক লেলিয়ে দিতে চান, আমরাও বলি বাংলা দেশে তথা ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়েই 'হ্যাভ নট' বেশি, সুতরাং ইলি-সিয়াম্ রোর সাধু সাবধান। হিন্দু টের-রিষ্টের দিন গেছে, এখন আসছে সাম্য-বাদের মেছুয়াবাজার।

* * *

আসল কথা, আমাদের মাথায় কম্যু-নাল্ কীট গজগজ করছে, আমরা সাম্যবাদ গড়তে গেলেই চা' হবে হিন্দু চা মুসলমান চায়ের সগোত্রজ। তাই যতদিন পরস্পরের প্রতি আমাদের এই সারমেয় জাতীয় প্রেম না ঘুচে যাচ্ছে, ততদিন মাঝখানে ব্রিটিশ বুলেট মিডিয়েটর হয়ে থাকবেই এবং তা' থাকাও বাঞ্ছনীয়। বড়বাজার ও মেছুয়াবাজারে পলিটিক্যাল টেষ্ট ম্যাচ লেগে গেলে তখন মাদৃশ নল-খাগড়ারা যে ধনে প্রাণে মারা যাবে। এই নল খাগড়াইতো শতকরা নব্বই পার্সেণ্ট। লড়াইয়ে মেড়া আর ক'টি? কি হিন্দু, কি মুসলমান আর কি খৃষ্টান, এ তিন সম্প্রদায়েই বেশির ভাগ মানুষ আজকে এবং কালকে বেঁচে বর্ত্তে থাকতে চায়, পরন্তর খোয়াবে মসগুল হয়ে পরস্পরের চালায় আগুন দিতে আমরা নারাজ।

চাকুম-চুকুম

পঞ্চমুখ শর্ম্মা

য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত যাঁহারা পরিচিত—ল্যাপ ডগ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে আর বলিতে হইবে না। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে যিনি বিড়ালের আধিপত্য লক্ষ্য করিলে উঁহাও নিশ্চয় হইয়া যাইবে। সারমেয় অস্পৃশ্য, এবং বিড়াল স্পৃশ্য। 'ভবিষ্যৎ'-এর লেখক উগ্রপন্থী হইয়াও

> ## বিশেষ দ্রষ্টব্য
>
> **স্ব দে শ কা র্য্যা ল য়**
>
> ১৩৩ নং আপার সার্কুলার রোড হইতে ২৯২ নং আপার সার্কুলার রোডে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখন হইতে চিঠিপত্র, টাকা কড়ি, বিনিময় পত্রিকাদি নূতন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। বিনীত
>
> কার্য্যাধ্যক্ষ, স্বদেশ
> ২৯২, আপার সার্কুলার রোড
> কলিকাতা।

জাতীয় বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তাই লিখিতেছেন—

"একদিন যখন ও বাড়ী ফিরলো তার সমস্ত চোখ ও মুখের ভেতর দিয়ে একটা আনন্দের আভা ফুটে বেরোচ্ছিল। তাই পোষা বেড়ালটা কাছে আসতেই ও চট্ করে সেটাকে কোলে তুলে নিয়ে জড়িয়ে ধরলে নিবিড় ভাবে। তার মনের মধ্যে প্রলয় সুরু হয়েছে এ তারই চিহ্ন।"

নায়িকার মধ্যে প্রলয়ের চিহ্ন সুপরি-স্ফুট! বিশেষত যখন 'সে হয়ে উঠেছে স্বর্গীয় সুষমার অধিকারিণী এক অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী।' সুতরাং বেশবিন্যাস সমাধা করিয়া বাহিরে হাওয়া খাইতে যাইবার মুহূর্ত্তে সে যাহা করিয়া থাকে—

"আর বাইরে যাবার আগে অনেকক্ষণ ধরে বেড়ালটাকে আদর করা ওর স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

অবশেষে তাহাকে বাহির হইতে ঘরে ফিরিবার কালে দেখা গেল—

"একদিন দরজা খুলে লাবণ্য যখন ভেতর ঢুকলো, দেখা গেল যে সে একা নয়, সঙ্গে একটী সুবেশ ও সুন্দর পুরুষ।"

কিছুদিন পরে—

"আজকাল ভদ্রলোকটী সোফার ওপরেই বসে। লাবণ্যর কিন্তু সাহস হয় না ওর পাশে গিয়ে বসতে।"

ভদ্রলোকটির নিরবচ্ছিন্ন যাওয়া-আসার মধ্যে ক্রমে লাবণ্য সাহসী হইয়া উঠিল। অবশেষে বাস্তবিকই একদিন যখন সে সাহসী হইয়াছে—

"হঠাৎ লাবণ্যর নজর পড়লো বেড়াল-টার দিকে, তখন সে একদৃষ্টে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে।" কেউ যেন তাদের দেখছে এই ভাবটা মনে আসতেই লাবণ্য হয়ে উঠলো লজ্জায় লাল। ব্যস্তভাবে সে নিজের শাড়ীটাকে টেনে গুছিয়ে ঠিক হয়ে বসলো। তারপর ধীরে ধীরে বেড়ালটাকে বার করে দিয়ে লাবণ্য দরজাটাকে দিলো বন্ধ করে।"

অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতভাগ্য বিড়া-লটি অতঃপর কি করিয়াছিল জানি না। কিন্তু আশ্রিতবৎসল লাবণ্যের পক্ষে লজ্জায় অতোটা লাল হইয়া উঠা সঙ্গত হইয়াছে কি? আহা! বেচারা বেড়াল!

* *

'আষাঢ়-সন্ধ্যায়' 'উত্তরায়ণ' বেশ জমাট হইয়া উঠিয়াছে। আষাঢ়ে বৃষ্টির টিপুটিপুনি যখন বিরহিণীর বুকে শেল

ফুটাইয়া দিতেছে, প্রিয়তমই কাছে নাই। অতএব প্রিয়ার মনের মধ্যে যাহা দাঁড়াইতেছে—

"আকাশের অশ্রুসজল মোর পানে
শুধু চেয়ে আছে,
আমারো নয়নে বন্ধু!
বেদনায় অশ্রুবিন্দু ভাসে।"

কুঁড়ির ব্যথা এই সময় যৌবনের চাপে পড়িয়া যতক্ষণ না নিষ্পেশিত হয়—ততক্ষণ অশ্রুর বিন্দুই হউক আর 'কণা'ই হউক—কিছুই বাগ মানিতে চাহে না। তাই একটি নহে, আধটি নহে—

"মুঞ্জরিত কুঁড়ি দুটী (!) স্পর্শ বিনা
হোলো শুষ্ক প্রায়,"

শুধু ইহা হইলেও বা হইত! কিন্তু ক্রমেই বিপদ্ বাড়িয়া যাইতেছে। 'কুঁড়ি দুটী' তো শুষ্ক হইয়া আসিতেছেই, উপরন্তু—

"কঙ্কন পড়িছে খসি, বারে বারে
শিহরিছে হিয়া।"

অতএব উপায় নাই। 'যক্ষ বধূ সম' অগত্যা 'শীর্ণ দেহ নিয়া' খাঁ খাঁ করিতেছে—এমন এক 'শূন্য গেহে' রহিতেই হইবে? আহা রে? শূন্য কলসী যত সহজে পূর্ণ করা যায়, শূন্য গৃহও যদি সেইরূপেই পূর্ণ হইয়া যাইত! তবে 'উত্তরায়ণ' আর 'দক্ষিণায়ণ'-এ তফাৎ বেশি নাই,—এই যা রক্ষা!

* *

'মহাপ্রাণ ডক্টর লুৎফর রহমান সংখ্যা'—'মোয়াজ্জিন' পড়িয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। সুনির্ব্বাচিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি পাঠ করিয়া তৃপ্তি পাইলাম। জনৈক লেখকের সংস্কৃতানুরাগ বিশেষ আনন্দ দিল। 'নান্য পন্থাঃ বিদ্যাতে হয় নায়।'—এমন নিৰ্ভুল সংস্কৃত বহুদিন নজরে পড়ে নাই। কিন্তু 'মর্ম্মান্তিক স্মৃতি'র লেখক ফুটনোটে—'যেহেতু আমরা বিশেষভাবে মানি'—ইহার মধ্যে 'মানি' বলিতে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন জানিতে পারিলাম না। একটি এ-কার যোগ করিলে অভিধানে অবশ্য একটি শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে মানে উল্টা হইয়া পড়ে। তবে কথাটি যদি ফার্সি বা আরবী হইতে লওয়া হইয়া থাকে, আমার অজ্ঞতা স্বীকার করা ছাড়া আর উপায় কি? ইহা ছাড়া উক্ত বিশেষ-সংখ্যা 'মোয়াজ্জিন' সত্যসত্যই সবিশেষ সুসম্পাদিত হইয়াছে।

* *

সাহিত্য-চর্চ্চা যে ক্রমে ক্রমে বংশানুক্রমিক হইয়া উঠিতেছে, 'বিবর্দ্ধন'-এ তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক সরোজ রায়চৌধুরীর ভ্রাতা সুধাংশুকুমার একটি গল্প লিখিয়াছেন—'অভিসারে'। একটি গেঁয়ো ছেলে কলির সহর কল্‌কতায় আসিয়া বন্ধুদের নিকট চাল মারিতে শিখিল। একাধিক মেয়ের সহিত তাহার প্রেমে-পড়ার কাহিনী ফেনাইয়া ফেনাইয়া বন্ধুদের শুনাইত। বন্ধুরা হাঁ করিয়া গিলিয়া যাইত। অবশেষে বন্ধুরা একদিন ধরিয়া ফেলিল, উহা রচা কাহিনী। বাস্তবের গন্ধও উহাতে নাই। শ্রীমান সুধাংশুকুমার ডেঁপো-নায়কের চরিত্র যে-ভাবে ফুটাইয়াছেন, তাহাতে গল্পের নায়ক অপেক্ষা গল্প-লেখকের উপরই দৃষ্টি পড়িয়া যায় বেশি!

* *

সাহিত্য বংশানুক্রমিক হইয়াই যে তবু হাল ছাড়িয়া দেয় নাই, ইহা আনন্দের কথা। সাহিত্যের ক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হইতেছে। বেতার-জগৎ হইতে ছায়া-পটে তাহার পরিক্রমণ দেখিয়া মনে হইল, ভাগিস্ 'ভোট তত্ত্ব' দেখিয়াছিলাম! ন'গণ্ডা পয়সা খরচ করিয়া শুধু 'শনিবারের চিঠি'ই দেখিলাম—তাহা নহে, উহার ব্যাক্‌বোন ও স্কেলিটনও প্রত্যক্ষ করিলাম। এমন কি সংগ্রহ-সাহিত্যের সম্ভাবনাও উঁকি মারিয়া গেল! ভাবিলাম, অতঃপর কায়া-পীঠে কবে ত্রিমোহানার সঙ্গম দেখিয়া নয়ন-মন সার্থক করিয়া তুলিব? মোহন বাগান হইতে অবিলম্বে বেতার-যোগে তাহার উত্তর আসিয়া পৌছিল।—'আর দেরি নাই।' বটে?

* *

'বন্দেমাতরম'-এর বৈঠকীতে 'প্রবর্ত্তক'-এর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ভ্রমণবীর রমানাথ বিশ্বাস মহাশয়ের সহিত তুর্কী-কল্লালের কথোপকথনের সময় এক ভদ্রলোক বিশ্বাস মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি যে মুসলমান নন তার প্রমাণ কি?" তিনি যে হিন্দু—একথা কোনোক্রমেও বুঝাইতে না পারিয়া অবশেষে ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু তিনি যে মুসলমান নন, ইহাও বুঝাইতে পারিলেন না। অবশেষে একটু রসিকতা করিলেন। বলিলেন, "প্রমান আর কি দিব, এক মেংটা করে দেখতে পারেন, নয় দেশে লিখে জানতে পারেন।" ইহাতেও ফল ফলিল না। অবশেষে বৌদ্ধ বলিয়া রেহাই পাইলেন! ভাগ্যিস্ শ্রীবুদ্ধদেব এই দেশেই জন্মিয়াছিলেন!

কিন্তু আমরা ভাবিতেছি, মৌলিকতাটি কাহার? বিশ্বাসের? ভদ্রলোকের? না, 'প্রবর্ত্তক'-এর!

পাঁচ মিশালী

দার্জ্জিলিংয়ে বাংলা সরকারের বার্ষিক অবস্থিতির প্রথম পর্ব্ব শেষ হইল। প্রথম পর্ব্ব বলিবার কারণ এই যে, বর্ষার পর আর একদফা সরকারের বড় বড় কর্ম্মচারীরা দার্জ্জিলিংয়ে যাইয়া থাকেন। গ্রীষ্মের সময় যাইবার কারণ—কলিকাতায় বড় গরম, কলিকাতায় থাকিয়া কাজ করা চলে না। আর শরৎকালে যাইবার কারণ—শারদ শোভা সন্দর্শন। পয়সা যখন বাংলার নিরন্ন প্রজার, তখন এ সব সাজে ভাল! এই দ্বিতীয়বার দার্জ্জিলিং ভ্রমণের বিরুদ্ধে ব্যয় সঙ্কোচ কমিটী মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সরকারের যে মত মুখরোচক নয়, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিবেন কেন? এদিকে বাংলার গভর্ণর যে এই দুর্ভিক্ষের সময়ও দার্জ্জিলিং হইতে নামিয়া আসেন নাই, সে জন্য লোক নানা কথা বলিতেছে। সহযোগী দৈনিক বসুমতী দেখাইয়া দিয়াছেন, পূর্ব্ববার যখন বিহারে দুর্ভিক্ষ হয়, তখন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক সিমলা যাত্রা বন্ধ করিয়া বাংলায় থাকিয়া স্বয়ং সাহায্য দান কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে গভর্ণরের যে সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তখন যিনি বাংলার ছোট লাট তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া কলিকাতায় থাকিতে পারেন নাই, পরন্তু দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট অঞ্চলে যাইয়া থাকিতে হইয়াছিল। সেবারের তুলনায় এবারের কাজ যে লোকের মনে অসন্তোষের উদ্ভব করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে?

—

কতকগুলি লোক আছে, যাহাদের রবারের বলের সঙ্গেই তুলনা করিতে হয়। বাংলা দেশে সেরূপ লোকের মধ্যে নলিনী সরকারের স্থান সর্ব্বোচ্চে। রাসমণির মামলা হইতে অব্যাহতি পাইতে না পাইতে নলিনী আবার আপনাকে জাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। জাপানের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বিষয়ে সে একটা বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছে। নলিনী যখন বিবৃতি পাঠাইয়াছে, তখন যে তাহা অমৃত বাজারে বিকশিত হইবে, তাহাতে কাহারও বিস্মিত হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমরা অমৃতবাজারকে বলি, নলিনীর বিদ্যা যখন সহযোগীর অবিদিত নাই, তখন দুর্নীতিমূলক মামলার জের মিটিতে না মিটিতে নলিনীর এতটা বিজ্ঞাপন কি না দিলেই হয় না? তুষার বাবুর অবশ্যই মনে আছে, পুলিশ কমিশনারের ব্যাপারে নলিনীই তাঁহাকে ফাঁসাইয়া দিয়াছিল। নহিলে সে কথা প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু তাহার পরও যে তাহার নলিনী প্রীতি ক্ষুণ্ণ হইতেছে না, ইহারই বা কারণ কি?

—

কলিকাতা কর্পোরেশনে সে দিন দুই দলে তুমুল লড়াই হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেসী দল চাকুরীর ব্যাপারে খিচুরিদলকে এবং খিচুরি দল কংগ্রেসীদলকে দোষী বলিয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, কোন পক্ষই এ বিষয়ে কম যান না। আসল কথা এই যে, অনাচার যখন আরম্ভ হয়, তখন তাহা ছড়াইয়াই পড়ে। কলিকাতা করপোরেশনে চাকুরীর ব্যাপারে যাহা হইতেছে, তাহা যে বাঙ্গালীর পক্ষে লজ্জার কথা

তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রতীকারের কোন উপায়ও হইতেছেনা। ইহাও দেখিতে পাই যে, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও তাঁহার মন্ত্রী শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় করপোরেশনে না থাকিলেও চাকুরী হইতে আরম্ভ করিয়া কণ্ট্রাক্ট পর্য্যন্ত নানা কাজে তাঁহাদের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা যে কোন পক্ষেরই প্রশংসার কথা, তাহা কেমন করিয়া বলিব ? যেখানে দলাদলি, অর্থাৎ দল পাকানো প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে যদি মিউনিসিপালিটীর প্রকৃত কাজ সেই হাঙ্গামে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে সে জন্য লোক কাহাকে দায়ী করিবে ? নির্ব্বাচনের সময় যাহারা প্রতিশ্রুতির কল্পতরু হইয়া দাঁড়ান, তারপর তাহারা কোথায় থাকেন ? শ্রীযুত কুমারকৃষ্ণ মিত্র কি আজ কাল মামলা লইয়াই বিব্রত আছেন ?

সাহিত্য ও সঙ্গীত

প্রীতি সম্মিলনী

সিঁথী 'সৎসঙ্গ নগেন্দ্র স্মৃতি ফ্রি রিডিং রুম'-এর উদ্যোগে ১লা জুলাই, বুধবারে একটি প্রীতি সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। 'বর্ত্তমান সাহিত্যের ভাবধারা' বিষয়ে সমাগত সাহিত্যিকবৃন্দ কর্ত্তৃক গবেষণাপূর্ণ আলাপ আলোচনা ও আবৃত্তি সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্নপ্রকার অনুষ্ঠানের মধ্যে উক্ত সভার কার্য্য সমাধা হয়।

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুত গিরিজাকুমার বসু, অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ফণিভূষণ মৈত্র, আশুতোষ সান্যাল, সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী, কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মজুমদার, রায় হেমচন্দ্র দে বাহাদুর প্রভৃতির আলোচনা এবং সুগায়ক শ্রীযুত জয়কৃষ্ণ সান্যাল, দেবরঞ্জন পণ্ডিত প্রভৃতির সুললিত সঙ্গীত শ্রীযুত রামরতন চৌধুরীর বাদন কৃতিত্বে সবিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

কর্পোরেশনের সুযোগ্য কাউন্সিলার কুমার বিশ্বনাথ রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান বাসরের পুরোহিত শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের আদর আপ্যায়নে প্রচুর জলযোগ ইত্যাদির পর অধিক রাত্রে সভার কার্য্য শেষ হয়।

পথের ইঙ্গিৎ—

এক প্রকার নিকর্ম্মা লোক আছে যাহারা দায়ে পড়িয়া অপরের পদলেহন করিতেও পশ্চাৎপদ নহে। আবার বিপদ কাটিয়া গেলে, উপকারীর কথা আর স্মরণও থাকে না। নিজেকে গুছাইয়া নিয়া অবশেষে গরল ছিটাইতে লাগিয়া যা'য়। পরের স্কন্ধে চাপিয়া নিজের কাজ হাসিল করিয়া অবশেষে তাহাকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো ইহাদের ফ্যাসান। এবং এই সব বেহায়াদিগকে উপদেশ দিয়া পথে আনিতে যাওয়াও বিপদ, কারণ কাণা গরু সোজা পথ কিছুতেই দেখিবে না।

তবু তোমার কথা শুনে দুঃখ হয়! খাম-খেয়ালী আর কতদিন চলিতে পারে ? কোনো দিকে হালে পানি না পাইয়া অবশেষে বুড়ি গঙ্গায় ডুবিয়া এড়াইয়া যাইতে হয়তো বাধিবে না। লোকেও তোমার জ্বালাতনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। অনেকে তোমার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছে, কিন্তু তুমি তাহার জবাব দিতে পার নাই। তোমার আত্মরক্ষার বা আত্মসমর্থনের কি কোন পথই নাই ? যদি না থাকে তবে একটা উপায় বলিয়া দিতেছি। চারিদিকে যখন সিভিল লিবার্টীর দিকে ঝোঁক পড়িয়াছে, এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা-সঙ্ঘ যখন একটা নূতনত্বের আমেজে গড়িয়া উঠিতেছে, তখন ইহার শরণাপন্ন হও। নচেৎ পদের আসনও টলমল হইবে।

খেলার কথা

শ্রীসুধীর বসু

লীগ খেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গত হপ্তায় সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ব্লাক ওয়াচের কাছে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের পরাজয়।

শীল্ড খেলার সময় আগত প্রায়। এবার শুনছি এই খেলায় ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব তাদের নিয়মিত খেলোয়াড়দের মধ্যে কয়েকজনকে হারাবেন। তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাক্ প্রমোদ দাস তার নিজ জিলা হতে যে দল শীল্ড খেলতে এসেছে তাদের হয়ে খেলবেন। মজিদ তার ভ্রাতুষ্পুত্র আক্তার হোসেন নাকি দানাপুর দলের হয়ে খেলবার জন্ত অনুমতি চেয়েছেন। লক্ষীনারায়ণ পর্য্যন্ত নাকি চলে যাচ্ছেন, কারণ তাঁর ছুটী ফুরিয়ে এসেছে বলে শোনা যাচ্ছে। দুলাল একেই অসুস্থ তার ওপর গত ইন্‌ট্যার-ন্যাশান্যাল ম্যাচে ইউরোপীয়ান দলের লেফট ব্যাক ডালহৌসির ফ্লেমিং তাকে অন্যায়ভাবে যে চার্জ্জ করতে গিয়েছিলেন তার দরুণ তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ উঠে যায়, ফলে তিনি হয়ত এ সিজনে আর কোনদিন মাঠে নামতে সমর্থ হবেন না। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই ক্লাবের অবস্থা সত্যই শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে।

যে সব প্লেয়াররা লীগে কোন টিমের হয়ে খেলবেন তারা যাতে সেই সিজনে অন্ত কোন খেলায় অন্ত কোন দলের হয়ে না খেলতে পারেন সেই ব্যবস্থা অবশ্যই হওয়া খুবই প্রয়োজন, নচেৎ লীগ খেলবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টায় যে সব প্লেয়ারদের সংগ্রহ করে দলভুক্ত করা হয় তারা যদি শীল্ড খেলায় সেই দলের হয়ে না খেলেন সেই সব দলগুলির অবস্থা যে কি হয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমেয়। লীগের চেয়ে শিল্ড খেলার সম্মান বেশী, সুতরাং সেই খেলার সময় স্থানীয় দলগুলি হতে যদি কোন কোন প্লেয়ার চলে যান তাহলে তা সেই সব টিমের পক্ষে ক্ষতিজনক হয় না কি?

লীগ খেলা লোকাল বা স্থানীয় ক্লাবগুলি নিয়ে হয়, অথচ এই সব টীমে যে সব প্লেয়ারদের নেওয়া হয় তাদের সঙ্গে এই স্থানের কোন সম্পর্ক তো নেই-ই, তাদের সংগ্রহ করা হয় দিল্লী, মহীশূর, কোয়েটা, যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি স্থান হতে। এরূপ হবে কেন,—যদি বাংলা প্রদেশে এতগুলি এ ডিভিসনের টীমে খেলবার যোগ্য প্লেয়ার না থাকে তাহলে না হয় দু একটী নেমেই যাক, অনর্থক তাদের রেখে লাভ কি? শীল্ড খেলায় এবার বাংলার সর্ব্বস্থান হতে বিস্তর টীমের আমদানী হয়েছে—সে গুলি খাঁটী বাঙ্গালীর দ্বারা গঠিত। এখানে বাংলার হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর প্লেয়ারদেরই আমি বাঙ্গালী নামে অভিহিত করছি। এই যে এতগুলি টীম্ এসেছে আমাদের স্থানীয় টীম্‌সমূহের কর্ত্তারা যদি এদের মধ্য হতে খেলোয়াড় বেছে শিক্ষা দিয়ে ইচ্ছামত গড়ে নিতে পারেন তাহলে যারা বাইরের মায়ায় আচ্ছন্ন তাদের বিরুদ্ধে আমাদের বলবার আর তেমন কিছু থাকবে না! আমার ধারণা বাইরের প্লেয়ারদের পেছনে এই শ্রেণীর ক্লাব সমূহ যথেষ্ট খরচ করেন। সেই সব খরচের একাংশ যদি বাংলা প্রদেশের প্লেয়ারদের পেছনে ব্যয় করা যায় তাহলে তাদের সংগ্রহ করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে বলে বোধ করি না। পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে এখনও ভাল প্লেয়ারের অভাব হয় নি। সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন সংগ্রহকারীরা তাদের যদি বেছে নিতে পারেন তাহলে কালে এরাই খেলার ব্যাপারে বাংলার মান বজায় রাখতে সক্ষম হবেন। রাইট লাইন নির্ম্মল ঘোষ (বর্ত্তমানে এরিয়ান দলভুক্ত), শুনেছি গৌহাটীতে তার খেলা দেখে তাকে নিয়ে আসা হয়, কিন্তু প্রথম দু চারদিন তিনি এখানে নৈরাশ্যজনক খেলা দেখালেন। এই সময়ে যদি একে বসিয়ে দেওয়া হত তাহলে এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাইট লাইনের সন্ধান আমরা পেতাম না।

মফঃস্বল হতে যারা খেলতে আসেন তাদের কলিকাতার মাঠের সহিত পরিচিত হতেই কদিন চলে যায়, তারপর এই বৃহৎ মাঠে সবুট সাহেব খেলোয়াড়দের সহিত খেলতে ভয়ও তাদের কম হয় না, তারপর এখানকার খেলার নিয়ম প্রণালীও তারা তেমন জানেন না, এই সব কারণে যার মধ্যে সত্যিকারের শক্তি আছে তিনিও নিজের কৃতিত্ব প্রথমে প্রকাশ করতে সক্ষম হন না। এজন্তই চাই যোগ্য শিক্ষক—যারা তাদের তৈরি করে নেবেন।

পাওয়ার লীগ বা এ শ্রেণীর খেলায় দু চারজন ভাল খেলোয়াড়ের নামা খুবই প্রয়োজন। তারা এই সময়ে তরুণ খেলোয়াড়দের খেলবার রীতিনীতি শেখাবেন। এ সব খেলা শিক্ষার জন্তই হচ্ছে এই ধারণা যেন তাদের থাকে।

কুমার, সূর্য্য চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রা যেন এ বিষয়ে অবহিত হন। সব চেয়ে দুঃখের বিষয় বাংলা প্রদেশ হতে যে যোগ্য খেলোয়াড় বেরুচ্ছে না তার জন্য দায়ী আমাদের ক্লাব সমূহই। তারা চান এমন খেলোয়াড়দের যাদের কোনরূপ শিক্ষা না দিয়েই একেবারে এ ডিভিসনের লীগ্ খেলায় নামান যায়। এজন্য বোধ হয় অজস্র অর্থও ব্যয়িত হয়, কারণ "ঘরের খেয়ে পরের মোষ তাড়াতে" সেই সব প্লেয়াররা সুদূর বাঙ্গালোর, দিল্লী বা কোয়েটা হতে এখানকার ক্লাবের হয়ে খেলতে আসেন তা আমরা কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারি না। সমস্ত ক্লাবগুলিই যেন মফঃস্বলের প্রতি দৃষ্টি দেন—বাইরে হতে আনা বা স্থানীয় অন্য ক্লাবগুলির ভাল খেলোয়াড়গুলিকে দল ভাঙিয়ে আনা আমরা মোটেই সমর্থন করি না। ইষ্ট বেঙ্গল, কালীঘাট ও মহমেডান স্পোর্টিং বাইরে থেকে খেলোয়াড় সংগ্রহ করতে যেমন সিদ্ধহস্ত, তেমনি আমাদের মোহনবাগান ক্লাবও স্থানীয় ক্লাব সমূহকে কানা করে প্লেয়ার যোগাড়ে সিদ্ধহস্ত। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় মানা গুই, কার্ত্তিক দত্ত (ভবানীপুর), নন্দ রায় চৌধুরী, প্রেমলাল ও বেণী প্রসাদ (কালীঘাট) এবং আদিত্য গাঙ্গুলী (এরিয়ান) প্রভৃতিদের তাদের ক্লাব হতে বিচ্ছিন্ন করিয়ে আনা হয়েছে।

গত হপ্তার খেলার আলোচনার স্থানাভাব। শুধু ইন্টার ক্রাশঙ্গাল ম্যাচ সম্বন্ধে দু একটা কথা বলবো। গত ২৭শে জুন ক্যালকাটা মাঠে এই খেলা হয়। খেলার রেফারিং ভাল হয় নি। কোয়েটার মাষ্টার মেজি ইউরোপীয়ানদের অনেকগুলি অন্যায় ব্যবহারই উপেক্ষা করে গেছেন। প্রথমার্দ্ধে লক্ষ্মীনারায়ণকে দুবার অন্যায়ভাবে ফেলে দিয়ে বিরুদ্ধদল গোল বাঁচিয়েছেন, আব্বাস ও রহিমকেও অন্যায়ভাবে বাধা দিয়ে গোল দিতে ক্ষান্ত করতে বাধ্য করেছেন, অতিরিক্ত সময়ের শেষার্দ্ধে জি কার্ভের পরিষ্কার 'হ্যাণ্ডবল' চোখের সামনে হওয়া সত্ত্বেও মেজি সাহেব চোখ বুঁজে এড়িয়ে গেছেন।

এই খেলায় ভারতীয়দলের সেণ্টার হাফরূপে নুরমহম্মদ যে অত্যাশ্চর্য্য ক্রীড়া কৌশল দেখিয়েছেন তা যারা দেখেছেন তাদের বহুকাল স্মরণ থাকবে। ভারতীয়দলের রাইট লাইন দুলালের স্থান তার পরেই উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মীনারায়ণ প্রথম দিকে ভাল খেলেছেন। দুখানা গোলও দিলেন, কিন্তু সমস্ত খেলা হিসাবে তার প্রশংসা করা যায় না। রহিম মোটেই সুবিধা করতে পারেন নি, মজিদ এক কথায় একেবারে অচল, আব্বাস্ প্রথমে দুচারটী বল পান, কিন্তু ভাল সেণ্টার করতে না পারায় শেষে আর তাকে বল তেমন দেওয়া হয় নি। মাসুম ভালই খেলেছেন. অখিল আমেদ চলনসই মাত্র। ব্যাকদ্বয় এস মজুমদার ও জুম্মা মন্দ নন। জুম্মা কয়েকটী ভুল করেছেন। গোলে কে দত্তের খেলা আশানুরূপ ভাল হয়নি, যদিও তিনি কয়েকটী কঠিন বল ফিরিয়েছেন।

অপর পক্ষে গোলরক্ষক ডেভিস ভাল খেলতে পারেন নি, একপ্রকার তার দোষেই গোলগুলি হয়েছে বলা চলে। সেণ্টার হাফ গেষ্ট ও সাইড হাফদ্বয় টার্ণবুল ও স্মিথ ভাল খেলেছেন, ব্যাকে জি কার্ভে অপূর্ব্ব খেলা দেখিয়েছেন। ফরোয়ার্ডে দুই ইন প্লেয়ার জে মিলস্ ও ম্যাকিউ সুন্দর খেলেছেন। প্রথম দিকে লেফট লাইন ব্যারোজ কয়েকটি ভাল সেণ্টার করেছেন, শেষের দিকে তার খেলা তেমন ভাল হয় নি। উভয়পক্ষে তিনটি করে গোল হওয়াতে অতিরিক্ত সময় খেলান হয়, তাতেও কোন গোল হয় না। শেষে 'টসে' ভারতীয়দল বিজয়ীরূপে ঘোষিত হয়।

আগামী কাল চীনাদলের সহিত ভারতীয়দলের খেলা হবে—খেলবেন এরা—গোলে—এস ব্যানার্জ্জী, ব্যাকে সন্মথ দত্ত ও এস্ মজুমদার, হাফে বিমল মুখার্জ্জী, নুর মহম্মদ ও মাসুম, ফরোয়ার্ডে সেলিম, রহিম, আর কার, কে ভট্টাচার্য্য ও আব্বাস্। রিজার্ভে আছে ওসমান, জি কার্ভে, মির্জ্জা, সাবু, দুলাল, নির্ম্মল ঘোষ লক্ষ্মীনারায়ণ, মজিদ ও বেণীপ্রসাদ।

৬ই জুলাই চীনের বিরুদ্ধে সিভিল ও মিলিটারী সম্মিলিত দলে এরা খেলবেন—গোলে আর্মষ্ট্রং, ব্যাকে জি কার্ভে ও জুম্মা খাঁ, হাফে টেলর, গেষ্ট ও টার্ণবুল, ফরোয়ার্ডে সেলিম, রহিম, ক্যাশ, ম্যাকিউ ও উইলকিনসন্। রিজার্ভ—ওসমান, ম্যাগয়ার, হার্শাল, অখিল আমেদ, বারোজ, লক্ষ্মীনারায়ণ, ব্লাক ও সি ব্রাউটন।

আগামী সংখ্যায় লীগ্ খেলার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করব।

—'আধুনিকা'—

[গল্প]

শ্রীরামেন্দ্রকুমার দেশমুখ্য

আজ পুরোপুরি সাতদিন হ'তে চল্ল—ভবভূতি দেখে, কে একজন ওর পেছনে লেগেছে। ইচ্ছে করে বড় রাস্তা ছেড়ে সরু গলিতে পড়ে, তবুও দেখে তিনি ওর পেছনে। ট্রামেও দেখে তাকে;—বাসেও দেখে তাকে! হেঁটে চলার পথেও দেখে, ছায়ার মতন তিনি অনুগমন কর্চ্ছেন। সাহস হয় না জিজ্ঞেস করে—কেন এমন ধারা তিনি ছায়ার মতন ওর সঙ্গ-প্রিয়া? যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে, ততক্ষণ পর শ্যেন দৃষ্টি থেকে রেহাই পায় হয়ত; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে পায়ের ওপর সে সচল প্রতিষ্ঠিত হয়, সে মুহূর্ত্তেই ওর সান্নিধ্য অনুভব করে। বাড়ীতে বসে থাকা ওর নাকি সাধ্যাতীত। অকর্ম্মণ্য, স্থবিরের মত বাড়ীতে বসে থাকার মধ্যে সে দৈহিক অস্বস্থতা ভোগ করে।

যেদিন তা'র ধৈর্য্যের মাত্রা অদমনীয়-তার সীমায় গিয়ে পৌছল, সেদিন ওর কাছে গিয়ে ঝাঁজালো সুরে বল্লে,—দেখুন, আপনি বোধ করি কাজের ঘরে নূতন প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন। আর—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তিনি বল্লেন, —আপনি যা সন্দেহ কর্চ্ছেন, তা নিতান্তই অমূলক, অধিকন্তু আমার অনুমান যদি সত্য হয়। আচ্ছা আপনাদের পুরুষ জাতটা কেন এমন মুখ-পর্দ্দাহীন? নারী জাতকে অপমান করাতেই ওঁদের স্পর্দ্ধার যত বাহাদুরি। তারপর কিছুক্ষণ থেমে দীর্ঘনিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে আবার বলে চল্লেন,—অবস্থা খুব স্বচ্ছল নয়। বাবা কেরাণীগিরি করেন। মাইনে যা পান, তা' দিয়ে সংসারে স্বচ্ছলতা আনা অসম্ভব। বিদ্যের জোর আমার খুব বেশী নেই। সব দিক থেকে বাধা পেলেও আলট্রা মডার্ণ না হওয়ার অপবাদ মাথায় নিতে আমি রাজী নই। বেকার সমস্যা এখন আমার জীবনে চরমত্ব লাভ করেছে। ঘুরে ফিরে তাই দেখছি নিখিল কলকাতায় উপার্জ্জনের পথ সুলভ কিনা?

বিনীতভাবে দৃষ্টি কাতর করে ভবভূতি উচ্চারণ কল্লে,—রূঢ় আচরণের জন্যে মাপ চাইছি। বলে সামীপ্যগতা তরুণীর চরণ-যুগল স্পর্শ কর্ত্তে মাথা যখন আনত কর্ত্তে চল্ল, তরুণীর তনুতে এল তখন অভিনব শিহরণ। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে এলার্ম দেওয়া ঘড়ির চপল ধ্বনির মত এক নিঃশ্বাসে তিনি বলে চল্লেন,—ও কি কর্চ্ছেন, না—না, ও সব আধুনিক রুচিসঙ্গত নয়। ও সব কর্বেন না। তারপর এগিয়ে এসে ভবভূতির চুলাল মাথাকে উন্নমিত ক'রে দিলেন। ভবভূতি দিল না বাধা। শুধু কাতর দৃষ্টি বিনিময় কর্ল্লে। অবান্তর কথার মধ্য দিয়ে ছলো তারপর রাস্তা চলার সুরু। বিদায় নেবার সময় এতক্ষণ অবচেতন প্রদেশের ভবভূতি ইংরেজদের কায়দা মাফিক প্রথম পরিচয়ের নিদর্শন-স্বরূপ ওর প্রসারিত কর চুম্বনের অপেক্ষা রাখল না। সবুর সয়ে মেওয়া ভাল করে ফলাতে গেলে অনেক সময় নাকি বিপর্য্যয় ঘটে থাকে।

(২)

ট্রেণে চলেছিল ওরা। সেকেণ্ড ক্লাসের জনমানবহীন কামরায় বসে, নীল মলাটের একখানা বই পড়তে পড়তে ভবভূতি কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সে তা বলতে পারে না। পাঞ্জাবীর বুকের দিকটায় ঈষৎ আকর্ষণ পড়তেই তরল ঘুম শরতের লঘু মেঘের মত উধাও হয়ে গেল। সে চেয়ে দেখল—তার পার্কারের ঝরণা কলমটী নিয়ে উনি সেমিজের ভেতর তাড়াতাড়ি লুকিয়ে নিচ্ছেন। আশ্চর্য্য হ'ল সে ওর এমন ধারা অকুণ্ঠ আচরণে। বল্লে,—ও কি কর্চ্ছেন?

উত্তর এল,—বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছিলো। সঙ্গে লেখার সরঞ্জাম আনিনি। পুরুষের বিরুদ্ধে একটা প্রবন্ধ লিখবার পরিকল্পনা মগজে স্থিতি নিতেই ওটার দরকার নিবিড় করে অনুভব করেছিলুম। তাই হাতের ধারে পেয়ে ওটা নিয়ে নিয়েছি। আশা করি, রাগের দোরে মাথা গলাবেন না।

—সে ভেবে দেখা যাবে 'খন। আচ্ছা পুরুষের বিরুদ্ধে যখন প্রবন্ধ লিখছেন, তখন ওদেরই একটা সামগ্রী নিতে আপনার অর্থাৎ নারীর আত্মমর্য্যাদায় যা পড়লা না একটুও।

খানিকক্ষণ নীরব থেকে তিনি বল্লেন, —পরিচয় যখন আপনার সঙ্গে নিবিড় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন অনধিকারও তো অধিকারের ক্ষেত্রে পা বাড়াতে পারে।

—তা' হলে দেখুন, ধৃষ্টতা নেবেন না। আমার মত আপনারও বোধ হয় অতৃতীয় হ'বার সাধ জেগেছে।

উত্তর কিছুই মিলল না। মৌনং সম্মতি লক্ষণম্'—ভাবতেও ভবভূতি সাহস পেলে না। কেন না যিনি এ কথা লিখেছিলেন,—তিনি এ যুগের নন। বর্ত্তমান প্রগতির যুগে ও কথার সারবত্তা আর নেই তবুও সে কাছে এগিয়ে গেল। ইংরেজদের কায়দামাফিক নিবিড় পরিচয়ের দাবী নিয়ে ওর ললাটে চুম্বন অঙ্কন করে দিল। আধুনিক রুচিসঙ্গত বলে বাধা পেলে না হয়ত।

(৩)

যেদিন ভবভূতি বিয়ের ইচ্ছে প্রকাশ কর্ল', সেদিন তিনি অতি আধুনিকার মত বল্লেন,—বেশ ত'। কোনও আপত্তি রইল না—ভবভূতি তখন বিয়ের বন্দোবস্ত করতে উঠে পড়ে লেগে গেল।

এক সময় মস্তক কণ্ডুয়ন কর্ত্তে কর্ত্তে উনিকে ভবভূতি নম্রভাবে বল্লে,—আমি যে নির্ব্বান্ধব—সে কথা বোধ হয় জানেন, কাজেই আপনি যদি কিছু সাহায্য—

—ও: সাহায্য করবার কথা। তা' আপনি উমেদারের প্রশ্ন দিচ্ছেন কেন? বন্ধু এবং ভাবী স্বামী যখন, তখন অনুরোধ রাখব বৈকি।

পরের দিন সকালের দিকে দেখা গেল, ভবভূতির অজান্তে তিনি সশরীরে উপস্থিত হয়ে ওর প্রাতঃকৃত্যের একটী বিশিষ্ট কাজ আপন ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ আলস্য পরবশ ভৃত্যদিগকে আধুনিক রুচি অনুযায়ী তিরস্কার কর্চ্ছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাত্রা ধীরে ধীরে এত বাড়তে লাগল যে শেষে ভয় হ'ল, উনির দেহ-থার্ম্মমিটার বিস্ফোরিত হয় কি না। শেষ পর্য্যন্ত অবিশ্যি কিছুই হ'ল না। ভৃত্যদের পক্ষ থেকে কোনরূপ দ্বিরুক্তি না আসায় তা' সম্ভবপর হয়েছিল বোধ করি। ওরা আর বলবেই বা কি? তাদের তদানীন্তন সপ্তদশ পুরুষেরাও কখনও এমনধারা শব্দ শোনেনি নিশ্চয়ই। অর্থও তাই বোধগম্য হয় নি।

ভবভূতি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলো ভৃত্যদের চক্ষুস্ফীতি দেখে। দেখার জের যখন পূর্ণ উদ্যমে চলছিল—উনি এসে ওর সামনে পড়লেন,—বল্লেন,—এই যে তুমিই এসেছ,—দেখেছ ওরা কি কাণ্ড-চোরা? ভবভূতি তখন অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত ছিল,—সে ভাবছিল,—প্রগতির গঙ্গায় পড়ে তুমি অতি সত্বরই 'তুই'র বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশবে।

বিয়ে হয়ে গেল—আর পাঁচ জনেরই মত। ফুলশয্যার রাতে বিছানায় শুয়ে তিনি বল্লেন,—দেখো—আমার জীবনের মুক্ত ধারাকে কোন দিনই বেঁধে দেবার চেষ্টা করো না যেন। আমি যেখানে সেখানে যাব। যার তার সাথে ফ্লার্ট করব, এতে বাঁধা দেয়া চলবে না।

ভবভূতি মনে মনে বল্ল,—তথাস্তু। মুখে বল্ল,—যেখানে ইচ্ছে, সেখানে যেতে পারো। দিনান্তে একবার ঘরে ফিরলেই হ'ল। দড়ির বাঁধন দিয়ে তোমাকে আটকে রেখে আমি আধুনিকতার অপমান কর্ত্তে চাইনে।

তিনি বল্লেন,—জানো, আমি সব শুদ্ধ কুড়িটী বিয়ে কর্ল্লুম।

নরম সুরে ভবভূতি বল্লে,—হ্যাঁ, তা তো বেশ বোঝা যাচ্ছে যে বিংশ শতাব্দীর নামের জীবনকে সার্থক করার প্রচেষ্টা ফলবতী হয়েছে। আশা করি, এর পরে আর পৃথিবীকে একবিংশবার নিঃপৌরষ কর্ব্বার প্রয়োজন হবে না।

তিনি মুখে কিছুই বল্লেন না। খানিকক্ষণ পরে ইংরেজদের কায়দামাফিক প্রণয়ীর দাবী নিয়ে ভবভূতি ওর গোলাপী গণ্ডে ওষ্ঠ স্পর্শ কর্ল্লে। আধুনিকা নির্ব্বিবাদে সেটা হজম করে গেলেন।

———

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সমাচার

পুষ্টি সাধনের প্রচেষ্টা

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে জনসাধারণের পুষ্টি সাধন সমস্যা আলোচিত হইতেছে, সুতরাং পুষ্টি সাধনে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রচেষ্টার কথা যে ভারতবর্ষে কৌতূহল জাগাইয়া তুলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কয়েক বছর হইল রাষ্ট্রসঙ্ঘে নানা দিক দিয়া স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইতেছে।

গত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসভাতে সাধারণ স্বাস্থ্যের সহিত পুষ্টি সমস্যা কিভাবে জড়িত এবং পুষ্টি সাধনের সহিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্পর্ক কি ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ইহার ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত উপায়ে পুষ্টি সাধন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং তাহাতে কিরূপ উপকার দেখা দিয়াছে, সে সম্বন্ধে সমাচার সংগ্রহ করা স্থির করে। ইহা ছাড়া পুষ্টি বিষয়ে তন্ন তন্ন করিয়া গবেষণা করিবার জন্য বিভিন্ন বিশারদকে নিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘ একটী সম্মিলিত সমিতি গঠন করিয়াছে। লর্ড অ্যাষ্টার এই সমিতির সভাপতি হইয়াছেন।

উপস্থিত জেনেভাতে পুষ্টি সাধনের এই সম্মিলিত সমিতির অধিবেশন হইয়াছে। এই সমিতি সম্বন্ধে লর্ড অ্যাষ্টার্ যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায়, সমিতির নামটী মিশ্রিত সমিতি হওয়াই ঠিক হইয়াছে। কেন না, পুষ্টি সমস্যার সমাধান করিতে হইলে অন্যান্য আনুষঙ্গিক সমস্যারও সমাধান করিতে হইবে। পৃথিবীতে পুষ্টি বিষয়ে উন্নতি সাধিত হইলে, সাধারণ স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইবে। পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি হইলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কৃষি কার্য্যের উন্নতি ও সেই সঙ্গে বিশ্ব-বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি হইবে। সেই জন্য সমিতিতে বিভিন্ন বিষয়ে বিশারদবর্গকে লওয়া হইয়াছে।

এই সমিতিতে দুইজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক কাষ করিতেছেন। অধ্যাপক মেলান্‌বি এবং অধ্যাপক ম্যাককোলাম। মেলানবি যুক্তরাজ্যের মেডিকেল রিসার্চ কাউন্‌সিলের প্রধান কর্ম্মসচিব। অধ্যাপক ম্যাক্‌কোলাম বাল্‌টিমোরে জন্ হপকিন্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট আছেন। স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের সম্পর্ক বিষয়ে ইনি পারদর্শী।

কৃষি সম্বন্ধে বিশারদবর্গও এই সমিতিতে আছেন। ফ্রান্সের সুবিখ্যাত কৃষি-বিশারদ মুস্তিয়ে জুলে গোতিয়ের এবং যুগোশ্লাভিয়ার মুস্তিয়ে মাক্‌কোভিচ এই সমিতির সদস্য হিসাবে কাষ করিতেছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। রোমের আন্তর্জাতিক কৃষি প্রতিষ্ঠান, জেনীভার আন্তর্জাতিক শ্রমিক অফিস ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন পারিভাষিক প্রতিষ্ঠানও এই সমিতির সহযোগে কায করিতেছে।

পুষ্টিসাধন সমিতির উদ্দেশ্য, পুষ্টি সম্বন্ধে এমন কোনও বৈজ্ঞানিক উপায় বাহির করা, যাহার দ্বারা বিভিন্ন দেশ জনসাধারণকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে পারিবে। পুষ্টির সহিত জাতীয় কৃষি এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত যে সমস্ত সমস্যা রহিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ সমাধান করা এই সমিতির উদ্দেশ্য।

বহু প্রমাণ ও উদাহরণ দেখাইয়া লর্ড অ্যাষ্টার্ বলিয়াছেন, ভাল খাদ্যের দ্বারা সাধারণ স্বাস্থ্যের অনিবার্য্যরূপে উন্নতি সাধিত হইতে পারে। শিক্ষালয়ের শিশুদের দৈনিক খাদ্যের উন্নতি, দুধের বন্দোবস্ত করিলে তাহাদের শরীরের ওজন ও উচ্চতা বৃদ্ধি হইবে—সহজে তাহারা রোগাক্রান্ত হইবে না।—এমন কি সাধারণ সর্দ্দি কাশীর হাত হইতে তাহারা পরিত্রাণ পাইবে—ইহাতে তাহাদের স্ফূর্ত্তির বিকাশ হইবে। গর্ভবতী নারীর সন্তান জন্মের সময়ে যে সমস্ত আশঙ্কা দেখা যায় ভাল খাদ্যের দ্বারা তাহা দূরীভূত হইতে পারে। স্তন্যপান করানোর দরূণ প্রসূতিদের মধ্যে যে রক্তাল্পতা দেখা যায় তাহারও নিরাময় হইতে পারে।

তাই, সমিতির উদ্দেশ্য, এমন কোনও উপায় বাহির করা যার দ্বারা পৃথিবীর জনসাধারণ পুষ্টিকর খাদ্য পাইতে পারিবে। বর্ত্তমানে, দারিদ্র্য, অনভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্কটের দরুণ যাহারা পুষ্টিকর খাদ্য পাইতেছে না, তাহারা যাহাতে পুষ্টিকর আহার সুলভে পায় তাহার সম্যক ব্যবস্থা করিতেই এই সমিতি উদ্যোগী হইয়াছে।
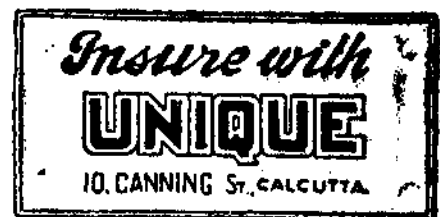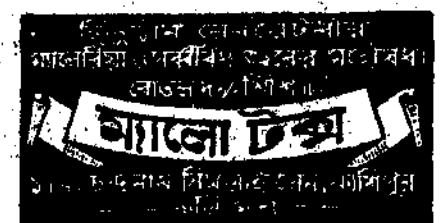
ছায়ালোক

(গল্প)

শ্রীমৃণাল কান্তি দাশ

অস্তরবির শেষ রশ্মি দিগন্তরেখায় ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়—ঘনিয়ে আসে আঁধার, নীড়হারা পাখী ফিরছে কুলায় চঞ্চল পাখায় ভর করে। ধ্বনি বহুল জগৎ শান্ত হয়ে আসচে। রাত্রির উন্মেষ। স্বাপ্নায়িত, দ্বিধাজড়িত তার আগমনী। সে আসচে, সে আসচে। একটা দীর্ঘ মৃত্যুর পর সে জন্ম নিল। আর বহুতন্ত্রী বীণার মত ঝঙ্কার দিয়ে উঠল আমার প্রাণ, নেশার অঞ্জন লাগে আমার চোখে। অন্ধকারের এই আবছা-আবছা রূপটা আমার কাছে বড় প্রিয়। রাত্রির রূপে আমি মুগ্ধ, বিস্মিত।

দিন আমার কাছে বড় বিশ্রি ঠেকে। দিবস-বর্বর মুখর, কোলাহল আর কর্মের পেষণে। চুপ করে একলা তখন আপন ঘরে বসে থাকি। (কারণ, জনতাকে আমি ভয় করি, এই জনতা জিনিষটা হলো—যা কঙ্কালের সারির মত, প্রেত-দলের মত—আত্মসর্ব্বস্ব, অসূয়ার গ্লানি জর্জ্জর আর আত্মার বামন।) নিরালা নিঃসঙ্গতা। দিন হচ্ছে একটা সৈনিক সত্তার প্রতীক—সেই সত্তা সব সময় আত্মচেতনায় তীব্র, প্রখর।

আর গোধূলি। আধ অন্ধকার···সদ্য ফোটা তারাদের নীচে, আলোছায়ার রাজ্যে—কি মুক্তি। এলোমেলো রঙীন ভাবনায় আমার সমগ্র সত্তাকে তখন ছেয়ে ফেলে। অন্ধকারের ছায়া যত বেড়ে যায়—আনচান করে উঠে মন, মেতে উঠে। আর জিজ্ঞাসু চোখে চাই আকাশের দিকে, আর চেয়ে চেয়ে দেখি নরম ছায়া পুঞ্জের লীলা: ছেয়ে সমগ্র বায়ু মণ্ডলকে শব্দহীন মদী তরঙ্গে, মুছে ফেলে সব বর্ণ আর বৈচিত্র্য—চুপি চুপি জড়িয়ে ধরে দৃশ্যমান জগৎকে এক প্রেতায়িত রহস্য। ইচ্ছা হয়, তখন রাত্রি-চরের মত অকথ্য, অনির্ব্বচনীয় একটা খুসিতে চেঁচিয়ে উঠি; বেড়ালের মত ছাদে ছাদে নিঃশব্দ পা ফেলে ছুটে ফিরি। জ্বলে উঠে আমার শিরায় শিরায় দুর্ব্বিবার আকাঙ্ক্ষা—সমর্পনের আকাঙ্ক্ষা, নীরবে নিজকে জীবন-দেবতার উদ্দেশ্যে সঁপে দিতে।

যাকে ভালবাসি সে চিরদিন থাকে অব্যক্ত, গোপন থাকে মনের মণিকোঠায়। রাত্রি। রাত্রি। বলবার ভাষা নেই, তুমি যে আমার কাছে কত প্রিয় তা আমি কি করে বলবো? এক মুহ্যমান ইন্দ্রিয়ের উন্মাদনা।

অভ্যাস মত কাল খাওয়ার পর বেড়াতে বেরিয়েছি। ধূসর গোধূলি—তপ্ত, নরম। যেন অশরীরী নারীস্পর্শ। যাচ্ছি পার্কের দিকে। মাথার'পরে অগণিত নক্ষত্র এবং ছেঁড়া টুকরো টুকরো মেঘ ছুটে ফিরচে অতলস্পর্শ আকাশে। বেশ লাগে।

আর দিন।—অতি স্পষ্ট, অতি অভিব্যক্ত। এর চাইতে উদার গম্ভীর তারা খচিত জ্যোতির্ম্ময় নিশি আমার কাছে অনেক—অনেক মায়া মাখা মনে হয়। রাত্রি গোপন, রাত্রি রহস্যনিবিড়। আকাশে বাতাসে আমি তখন কিসের একটা মধুর আলাপন, অস্ফুট গুঞ্জন শুনতে পাই। সেখানে কি যেন আছে, সেখানে কি যেন আছে—চোখের সামনে বিভাসিত কিন্তু স্পর্শের অতীত। যুবতীর নীল শাড়ি ঢাকা বিকচ বক্ষের মত রমণীয়, লোভনীয়। অন্ধকার,—সেখানে একটা মুক্তি, সেখানে জীবনের সব অবসাদ আস্তে আস্তে নীচে তলিয়ে যায়। সেখানে স্তব্ধতার স্বয়ং সম্পূর্ণতা, গম্ভীর শান্তি।

পার্ক। ধারের সরাইগুলোতে জ্বলছে বাতি, চলেছে আমোদ—বিশ্রি একটা জীবনানন্দে সবাই মশগুল।

সেখান থেকে সারদা স্মৃতিভবনের কাছে গিয়ে পৌছলুম। আঃ কি ফাকা জায়গা! মুক্ত অপ্রতিহত বাতাস। পীতাভ আলো স্পর্শে রাস্তার পাশের পাইন গাছগুলো ঝলমল্ করছে। যেন সোনালি পাতে মোড়া সারি সারি স্তম্ভ। আর ইলেকট্রিক বাল্ভ, আকাশ থেকে খসে পড়া যেন আশ্চর্য্য দেবী ফুলের মত সহসা ফুটে উঠা। সামনে সুরমা-ব্রীজ। ওপারে বড় বট গাছটার মাথার উপরে আকাশ ঢলে পড়েছে। স্তিমিত শীর্ণতায় একফালি চাঁদ সেখানে শোভা পাচ্ছে।

পথ চল্‌তে চল্‌তে একবার থাম্‌লুম। সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে কালপুরুষ হয়ে তারকা বীথিকা চলেছে তির্য্যক গতিতে নীল আকাশের বুকে, চলেছে কোন অসীমের পানে। হীরার কুচির মত দীব্ দীব্ করছে তারা। অপূর্ব্ব এ পরিমণ্ডল—অপূর্ব্ব।

অনেকক্ষণ সেখানে ঘুরে ফিরলুম চক্ষ-ছাড়ার মত। এক অভিনব পুলকে আমার দেহমন অধিকার করে বসলো। এক অভীভূত মানসিক প্রেরণা—বিকৃতি-হীন কিন্তু গভীরতা আছে। এক উন্মনা মন—বা মধুর তন্ময়তার অবসর! আপন মনে চল্‌তে লাগলুম, নিশীথ নগরী তখন নিদ্রিত। আর আকাশের গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ—মেঘের'পরে মেঘ, গড়িয়ে চলেছে সকারমান মেঘের মিছিল।

ঠাণ্ডা পড়েছে। স্তব্ধ রাত্রি—আকাশ অন্ধকার, পৃথিবী অন্ধকার। আকাশে বাতাসে অদ্ভুত নীরবতা। স্তব্ধ নিঃসঙ্গ প্রহরী শুধু রাজপথে দাঁড়িয়ে আছে। কখনও আমি এই শহরকে এমন নির্জন, এমন মৃত দেখিনি।

এগিয়ে তো চলেছিই। কোন অদ্ভুত শক্তি যেন নিয়ত আমায় নড়াচাড় করছে। এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।...আবার মেঘ নিকষ কালমেঘ—পুরু যবনিকা টেনে দিচ্ছে তারকা মণ্ডলের'পরে। যেন ছেয়ে ফেল্‌তে চায় জগৎটাকে সঘন ছায় সমারোহে।

সদর স্ট্রিটের মোড় দিয়ে চলে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ মেয়েলি স্বর শুনতে পেলুম: দেখুন। চকিতে ফিরে তাকালুম, এক পা এগিয়ে এলো মেয়েটী। বললে, দেখুন বড় বিপদে পড়েছি। একটু ইতস্ততঃ করলুম:

কেন, কি হয়েছে আপনার...?'

আমার ছোট্ট ভাইটা কোথায়, খুঁজে দিতে পারেন? মুখখানা তার কেমন যেন ফ্যাকাসে।

তার নাম কি?

দেবু।

অনেক অনুসন্ধানের পরও সন্ধান নেই দেবুর।

বললাম, চলুন।

কিন্তু দেবুকে যে পাওয়া গেল না! আরো অসহায় কণ্ঠে বললে তরুণী। আপাততঃ তা'কে না পাওয়া গেলেও, বিশেষ কিছু এসে যাবে না, সে বেটাছেলে, একটু তীক্ষ্ণ স্বরে বললাম: কিন্তু আপনাকে পাওয়া না গেলে পরিবারের উদ্বেগটা বাড়বে অনেক। কারণ, অত রাত্রে এই ইতর জনবহুল ছায়াছায়ীর প্রাঙ্গনটা খুব নিরাপদ স্থান নয়......চলুন।

বিবর্ণ মুখে তরুণী সম্মতি জানালে।

আপনার বাসা—।'

চৌরাঙ্গী। সংক্ষিপ্ত উত্তর।

হাঁ, এই শ্রীমতীকে যেন আরো অনেক দিন সিনেমায় যেতে দেখেছি। (লাইব্রেরী থেকে ফেরবার পথে) অনেক দিনই অনেক দেখেছি। সিনেমাই। পাকে হাইহিল্ সু, পরণে জর্জেট সাড়ী যেন জড়লতা ঘিরে কাণে কাণে কথা বলছে। ঠোঁটের কোনে একটা বিলোল হাসি—গজদন্ত পীত দাঁত। রেশমি চুলের এলো খোপা... অবিকল, অবিকল সেই চোখ, সেই মুখ... সেই সবই।...সিনেমা, সিনেমা! আশ্চর্য্যতার সম্মোহিনী শক্তি! কি যে আকর্ষণ।

*   *

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের সমুখে একটা লোক কী খুঁজছে নর্দমায়। ছোট একটা লণ্ঠন তার বামহাতে। গায়ের জামা কাপড় শতছিন্ন। রুগ্ন বিশ্রি চেহারা, মাথায় একরাশ উস্‌কো-খুস্‌কো চুল। তাকে শুধালুম: ওহে, কটা বাজে বলতে পারো?

আমি কি করে বলব। তার রুক্ষ স্বর শোনা গেলো: আমার কাছে ঘড়ি নেই।

হ্যাঁ, একটা বাতিও তো জলচে না। (বৎসরের এই সময়টায় মিউনিসিপ্যালিটী থেকে তাড়াতাড়ি বাতিগুলো নিবিয়ে দেয়া হয়, অনেক রাত থাকতেই নিবিয়ে দেয়া হয় নিছক টাকা বাঁচাবার জন্যে।)

আচ্ছা, শ্যামনগরের দিকে যাওয়া যাক। স্বগতঃ বললুম: সেখানে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। উষাদি, উমাদি হয়ত এখনো জেগে আছে, নিশ্চয়ই। সে রাত জেগে নিশ্চয় পড়ছে। একটা! দেড়টা! এমনি তো রোজই-জাগে সে। বেশ একটু গল্প করা যাবে।......

চারিদিক কেবলই অন্ধকার—নিরন্ধ্র, দুর্ভেদ্য অন্ধকার। নিদ্রিত নগরী। আস্তে আস্তে আমি এগোতে লাগলুম। যেমন শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যের মধ্য দিয়ে শিকারী এগিয়ে যায়। চললুম রামকৃষ্ণ মিশনের সমুখ দিয়ে। বারুজের বাগানের

ঝাউগাছগুলো শির শির করে কাঁপছে। গেটের আইভিলতা ও আর আর ফুলের কেমন একটা গন্ধ ভেসে আসছে—আবেশ ভরা, স্বপ্ন এবং নিবীড় শীতল। সমগ্র সহর তখন সুপ্ত, এক গভীর ভয়াবহ সুপ্তি।

যাঃ, পথ হারিয়ে ফেলেছি। কোথায় কোথায় আমি, আমি কোথায়? কোন হতভাগা সব বাতিগুলো নিবিয়ে দিয়েচে এতো তাড়াতাড়ি? একটা লোকও পথে নেই, একটা পথভোলা পথিক, যে কোন একটা লোক, অন্ততঃ একটা চোর। নাঃ একটা লোকও নেই।

কোথায় গেল প্রহরীরা? আপন মনে বললুম: কোথায় গেল? একবার চেঁচিয়ে উঠি, তবে তারা আসবে। নিশ্চয়ই। চিৎকার করে উঠলাম। কোন সাড়া নেই। শুধু আমার কণ্ঠস্বর শূন্যে মিলিয়ে গেল। রাত্রি। রাত্রি। 'ওগো, অপরূপ তোমার অবগুণ্ঠন একটুখানি উন্মোচন কর।' বোবা পৃথিবী শুধু তার বিকট মুখখানা ব্যাদন করে আছে। যেন আমাকে গ্রাস করে ফেলতে চায়।

পথ চলতে লাগলুম অন্ধের মত, লাল কাঁকর বাঁধান রাস্তার হাতে লাঠিগাছি ঠুক ঠুকে ফিরে ফিরে চাইতে লাগলুম আকাশের দিকে—যদি ভোর হয়। আর, আর একটু পরেই হয়ত ভোর হবে, স্বচ্ছ হয়ে যাবে আকাশ। ভোর হবে! এক টুকরো অনন্ত উৎসাহের মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে দিগন্তের রক্তমরী উষা। সে—ই কবে একটা বেজেছে। কন্ধখানে অন্ধকারের ছায়া, ভারি আবরণের মত আমাকে আচ্ছাদিত করে ফেলতে লাগলো।

চোখের পাতা ঘুমে ঢুলে পড়ছে, ফুলের 'পরে প্রজাপতির পাখার মত। একটা আশ্রয় চাই—আশ্রয়। সামনের দোতালা বাড়ীটায় গিয়ে করব করাঘাত।······ কড়ায় নাড়া পড়লো। একটা প্রেতায়িত শব্দ করে উঠলো মাত্র। চুপ চাপ। কোন সাড়া নেই। দোর খুললো না। আবার নাড়া পড়লো। আবার চুপচাপ। ফিস্ ফিস্, ফিস্ ফিস্। একটা ভীত মৃদু গুঞ্জন, কোন মৃদু পাতুর কথা?··· কিছুই না। ভয় পেয়ে গেলুম ছুটে গেলুম পাশের বাড়ীতে, আঘাত করতে লাগলুম হাতের লাঠি দিয়ে দেয়ালের গায়ে বার বার। একটা লোক সেখানে ঘুমিয়েছিল গাড়ী-বারান্দায়। বোধ করি কোন কর্মক্লান্ত স্বজনহীন, গৃহহীন দিন-মজুর। সে জাগলো না। আরো খানিকটা এগিয়ে গেলুম বাড়ীর দ্বারে আঘাত করে। কিন্তু মৃত পৃথিবীর কঙ্কাল নির্বিকার নিস্পন্দ!

নিজের অজান্তে কখন মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে এসে পড়েচি, জানিনে। নিঝুম নিস্তব্ধ বাজার। একটা গাড়ী নেই, একটা মানুষ নেই—নেই একগুচ্ছ ফুল বা শাক-

সবকিছু—বা আবর্জনায় রূপান্তরিত হয়েছে। ভয়ে একেবারে সারা দেহে শিউরে উঠলুম।

…পথ চলতে লাগলুম।…না, কিছুই নেই। সহরের মধ্যে একটা স্পন্দন, একটা খাতি, একটু ক্ষীণায়মান বাতাসের আভাষ …কিছুই নেই। এমন কি দূরাগত শকটের বাতাসে ভেসে আসা শব্দও নয়। চাঁদনি ঘাটে গিয়ে পৌঁছলুম। কেমন যেন হিমেল হাওয়া বইছে নদী থেকে। ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেলুম সিঁড়ি বেয়ে। সেতুবন্ধে জলতরঙ্গের অভিঘাতের কোন শব্দ নেই, নেই সুরমার কলমর্মর! এগিয়ে গেলুম আরো কয়েক পা—তারপর বালু—কাদা—তারপর জল। শীতল…শীতল…শীতল। একেবারে হিম।

বেশ টের পেলুম, যেন জল থেকে উঠে আসবার ক্ষমতা আমার বিলুপ্ত: যেন মরে যাচ্ছি আমি। আড়ষ্ট। এদিকে দারুণ ক্ষুধা ও ক্লান্তি।…

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চেষ্টা করছি, আপ্রাণ চেষ্টা।…কিন্তু হঠাৎ এ কি, তুমি। সদ্য নিদ্রোত্থিতা তুমি। ভোরের বাতাসে ভেসে আসছে তোমার চুলের ও সাড়ীর মেয়েলী গন্ধ। চোখে, মুখে ও স্খলিত বসনে তোমার এখনও লেগে আছে রাত্রির মধুর জড়িমা। হে নিরুপমা, আজ প্রভাতী আলোয় মতো তোমার স্মিত মুখমণ্ডলে যে সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে, এর সঙ্গে কী জগতের কোন সৌন্দর্যের তুলনা হয়? আজ আমি ধন্য।*

*দুর্গাপূজার ছায়া নিয়ে।

স্মৃতি-সুনিবিড় রাতি

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

বৃষ্টি সেদিন নেমেছিল সখি, বজ্রের সাথে সাথে,
প্রলয়ের ঝড়ে ধূলো উড়ে এসে চোখ করেছিল কাণা,
ঈশান-আকাশে ছিল বিদ্যুৎ—বজ্র মুখর রাতে
কত বার মোরে ঘরের বাহির হ'তে করেছিলি মানা!

ছোট কুঁড়ে ঘর, খড়ো চালখানি কুমড়ো পাতায় ঢাকা
ফাঁক দিয়ে তার কালো আকাশের বিদ্যুৎ আলো আসে,
হাওয়ার দোলায় চাপে আছড়ায় নিমগাছটার পাতা,
কি যে ভয় কি যে আনন্দ সখি, আজো স্মৃতিপটে ভাসে;
দুর্যোগ রাত, ঘরে চাল নেই, ভিজে গেছে কাঠকুটো,
ঘরের মেঝেতে জমেছে তখন এক হাঁটু কাদা জল
শিক বের-করা ছাতাখানা, তারো দশ যায়গায় ফুটো;—
তবু আমি ছিনু তোর আর তুই ছিলি মোর সম্বল।
তার পরে হায় কতদিন—সেই ব্যথার স্মৃতির সুখে
কল্পনা বলে মনে হয় এই ঐশ্বর্য্যের মাঝে—
সোনাদানা দিয়ে ঢেকেছিস দেহ, খালি হয়ে গেছে বুক;
ভেবে দেখ, সখি, সেই কুঁড়ে লাগি' ব্যথা কি প্রাণে না বাজে?
সে দিন বিশ্বে ছিলনা কিছুই, শুধু তুই আর আমি,
বজ্রের মত ছেয়ে ছিল শুধু নিবিড় দরিদ্রতা,
আজ দুইজনে তফাৎ করেছে সম্পদ-নদী নামি'
দুই তীরে বসে দুইজনে কই কেবল কাজের কথা!
বাজে কথা সখি ছিল সেইদিন, ছিনু যবে কাছাকাছি,
আজ কাজকাম—ঘরসংসার—ছেলে মেয়েদের কথা
তোর কাছ থেকে সরে' গিয়ে যেন নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচি;—
আজ ভেবে দেখ, কেমন ছিল সে নিবিড় দরিদ্রতা!
আবার শাওন ঘনায়ে এসেছে—পড়ে থাক ঘরদ্বার—
সেই কুঁড়ে ঘরে তুই আর আমি চল্ আর একটিবার!

—

বাংলাদেশ ও ম্যালেরিয়া

ডাঃ শ্রীনগেন্দ্র নাথ দে

বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার যেন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। চেষ্টা চরিত্র সত্ত্বেও এই সম্বন্ধের কোনই ব্যতিক্রম হইতেছে না, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, যেন এই সম্বন্ধ ক্রমে ঘনিষ্ট হইতে ঘনিষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। বাংলার জনসাধারণ এবং বাংলা সরকারের শত চেষ্টাতেও কিছুই হইতেছে না। বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্ট পাঠ করিলে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া পড়ে যে,বাঙ্গালী সত্য সত্যই একটী ধ্বংসোন্মুখ জাতি, যে হারে এই জাতির মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, তাহাদের জীবনাকাশে সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে যাইয়া স্থান লইয়াছেন।

অন্যান্য রোগের মধ্যে ম্যালেরিয়াই যে এই জাতির সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনিষ্ট সাধন করিতেছে, সে বিষয়ে দুই মত থাকিতে পারে না। ১৯৩৩ সালের রিপোর্ট পাঠ করিলে দেখা যায় যে কেবল ম্যালেরিয়া নহে, সকল রোগেই মৃত্যু সংখ্যা দিন দিন ভয়ানক ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে। নিম্নে কয়েকটী রোগের মৃত্যুহারের তালিকা মাত্র দেওয়া হইল :——

	১৯৩২	১৯৩৩
ম্যালেরিয়া—	৮৬,৫৩৬	৪,১৩,৯২২
অন্যান্য জ্বর—	৬,৯১,৫১৩	৮,১২,৩৯৩
কালাজ্বর—	২,৭২৭	১৩,৪৪৭
যক্ষ্মা—	১১,৮০১	১৪,৮০২
শ্বাসযন্ত্রের রোগ—	৬২,২৪৯	৮২,১৭৩

এই সমস্ত সংখ্যাদৃষ্টে দেখা যায় যে, ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যুর সংখ্যা এক বৎসরে ৩,২৭,৩৮৬ বাড়িয়াছে। বাংলা দেশে ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যুর সংখ্যা হইতে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, এই জনপদের প্রত্যেক মাইলে ১৯৩৩ সালে গড়ে ১৬ জন করিয়া লোক মারা গিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় প্রতি মাইলে কোন জেলায় কত লোক মরিয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

দিনাজপুর—১৩ মুর্শিদাবাদ—১৪'৯
পাবনা—১৩'২ মালদহ—১৭'৭
নদীয়া—২০'০ যশোহর—১২'৫
রাজসাহী—১৯'২ বীরভূম—১৪'৫-ইত্যাদি

এই হিসাব দৃষ্টে ভয়ে মন আঁৎকাইয়া উঠে। মনে হয় যেন বাঙ্গালী আর বেশী দিন নাই, শীঘ্রই হয় পৃথিবীর বুক হইতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে, না হয় নির্জীব হইয়া দীনভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে।

এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থার প্রতিকার কল্পে আমাদিগের অবহিত হইতে হইবে। প্রথমতঃ ইহার কারণ কি তাহা অনুসন্ধান করিয়া, সেই গুহ্য কারণের মূল উৎপাটন করিতে না পারিলে উপর হইতে আলগা চেষ্টায় বিশেষ কিছু ফল হইবে না। বাঙ্গালীর জীবনী শক্তির হ্রাসই এই অবস্থার মূল কারণ। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপের দিকে যাইতেছে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালী জাতি স্বাস্থ্যবান ছিল। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড মিণ্টো (১৯০৫-১৯১০) তাহার জীবন স্মৃতিতে বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বাঙ্গালীর অতীত দেহ সৌন্দর্য্যের গর্ব্বে বুক ফুলিয়া উঠে এবং বর্ত্তমানের অবস্থা দর্শনে মনে বিকার জন্মে। লর্ড মিণ্টো বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালীরা পৃথিবীতে সব চেয়ে সুন্দর

জাতি। ইহারা উচ্চতায় প্রায় সকলে ৬ ফুট এবং ইহাদের অনিন্দ্য সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমান স্থাপত্যের মূর্তিগুলির কথা মনে হয়। সেই একদিন ছিল, আর আজ বাঙ্গালী অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে।

উপযুক্ত খাদ্য ও ব্যায়ামের অভাবে এবং নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার দরুণ বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, দেহের প্রতিরোধক ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। অধিকন্তু দেশে অত্যধিক ভাবে পাট চাষ ও কচুরি পানা বৃদ্ধি হওয়ায় মশার উপদ্রবও খুব বাড়িয়াছে। ইহাতেও এই রোগের সংক্রামকতাও শত সহস্র গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই অবস্থায় বাঙ্গালীকে বাঁচিয়া থাকিয়া সংসারে সুখ উপভোগ করিতে হইলে, এমন জিনিষ গ্রহণ করা দরকার; যাহা দেহের প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াইয়া দিয়া দেহকে সুদৃঢ় বর্ম্মের ন্যায় রোগাক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া রাখিবে। সুপ্রসিদ্ধ "রুচি" কোম্পানীর তৈরী "রুচিটোন" টনিকের এই গুণ বিশেষ ভাবে আছে— ইহা দেশের সকল লোকেরই বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত লোকদিগকে সেবন করিতে অনুরোধ করি।

ছায়া ও কায়া

মধু বসু

২১শে জুনের সচিত্র-শিশিরে অধুনা অভিনেত্রী চারুবালার 'আমার কথা' শীর্ষক একখানা খোলা চিঠি প্রকাশিত হয়েছে, এ পত্রের বিষয়ে সম্পাদক মহাশয় লিখেছেন "প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী শ্রীমতী চারুবালা এই খোলা চিঠিখানি বিশেষভাবে সচিত্র শিশিরের জন্য লিখিয়াছেন। অভিনেত্রী-জীবন তাহার কেমন লাগে, নাট্যজীবনে তাহার শিক্ষাগুরু কে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে অভিনয়-জীবনের পার্থক্য কি এবং কতটুকু, অভিনয় তাহার নিকট নেশা না পেশা— প্রভৃতি নানা প্রশ্নের উত্তর উৎসুক পাঠকেরা এই পত্রে পাইবেন।"

শিশির সম্পাদকের এতদূর অধোগতি হতে পারে বলে আমরা কোনদিন ধারণাই করতে পারি নি—অবশেষে চারুবালার মত অভিনেত্রীর চিঠি ভাঙ্গিয়ে তাকে কাগজ চালাতে হচ্ছে? এজন্য সহরের দেওয়ালে দেওয়ালে মস্ত প্রাকার্ড পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে, চারুবালার নামটী প্রকাণ্ড অক্ষরে দেখা গেল এবং তাকে সুপ্রসিদ্ধা 'অভিনেত্রী' বলে পরিচিত করা হয়েছে। চারুবালাকে ওরফে চরিকে আমরা খুব ভাল রকমই জানি, ভূতপূর্ব্ব আর্ট-থিয়েটারে সখী-সাজে একটী মেয়েকে নাচতে দেখা যেত, মেয়েটী সকল সময়েই অহেতুকভাবে হাসতো, সেই মেয়েটীকেই একদিন ওই ষ্টার রঙ্গমঞ্চে কর্ণার্জ্জুনে বৃষকেতুরূপে দেখি, কলতে বাধা নেই বৃষকেতু আমাদের মন্দ লাগেনি। সে আজ কত বছরের কথা, তারপর তাকে নাট্য-মন্দিরে ও মনোমোহনে নাচতে দেখি। তারপর রঙমহল গঠিত হল, শিশির ভাদুড়ী সদলবলে এখানে যোগ দিলেন আবার সদলবলে এখান হতে প্রস্থান করলেন। তখন রবি রায়ের রাজত্ব, ব্যালেট গার্ল চারুবালা তখন স্থায়ী অভিনেত্রীর পর্য্যায়ে উন্নীত হলেন। এখানে অনেক নাটকেই তার দেখা পেয়েছি, এদানিং তিনি অভিনয়ে কৃতিত্বের পরিচয়ও মন্দ দিচ্ছেন না, মহানিশায় যাঁরা তার সূচনা, 'বাংলার মেয়ে'তে ও 'পথের সাথী'তে বিভিন্নরূপ দুটী চরিত্র নিপুণভাবে রূপ দেওয়াতে তার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হলাম। সেই অভিনেত্রীকে হঠাৎ এত বড় বলে প্রচার করার সার্থকতা কি? শিশিরের এই উন্মাদনা দেখে হাসছেন না এমন লোক বিরল। কত লোকই যে আমাদের জিজ্ঞাসা করছেন—"হাঃ মশাই চারুবালা এত বড় অভিনেত্রী হলেন কবে থেকে আর তিনি কত বড় অভিনেত্রী? বর্ত্তমানের প্রভা, নীহার, সরযূ প্রভৃতিদের মত কি তিনি শক্তিশালিনী অভিনেত্রী?" উত্তর দিতে পারি না—তবে তাদের বুঝিয়ে দিই—মস্ত বড় অভিনেত্রী না হলেও আমাদের চারুবালা পরিচিতা তো বটেই, মহানিশার কল্যাণে তাকে কে না জানেন, আর ছবির মহানিশায়

কল্যাণে সমস্ত চিত্রপ্রিয় বাঙ্গালীদের কাছেও পরিচিতা হয়েছেন ও হবেন। এবার চারুবালার আলোচ্য চিঠি সম্বন্ধে দু একটি কথা বলে এ আলোচনা শেষ করব। চারু লিখেছে—

"প্রিয় বরেষু—

তোমার চিঠি পেয়েছি, মহানিশার বীরা দেখে এসে তুমি অজস্র প্রশংসা করেছ এবং বলেছ ওই অংশটি অভিনয় করে আমি নাকি বাংলা দেশের প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীদের একজন হবার দাবী করতে পারি। দাবী আমি সত্যিই করতে পারি বলে আমার মনে হয় না…।"

আমরা বলি প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী হবার দাবী করতেই পারেন না, চারু যদি পরিষ্কার করে এ কথা লিখতেন তবেই আমরা খুসী হতাম, 'মনে হয় না' বলে একটু গেয়ে রাখার কোন প্রয়োজনই ছিল না। এই প্রসঙ্গে অতীতের একটি বিষয় মনে ভেসে উঠল, কোন এক প্রয়োজনে একবার স্বর্গীয়া অভিনেত্রী-শ্রেষ্ঠা কৃষ্ণভামিনীর বাড়ী আমার আমার এক বন্ধুর সহিত যেতে হয়েছিল। নানারূপ আলোচনার মধ্যে বন্ধু সেই অভিনেত্রী কুলরাণীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা সাজাহান আপনার অহীনবাবু না শিশিরবাবুর ভাল লাগে?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন 'দুজনের অভিনয়ই ভাল লেগেছে, কার যে বেশী ভাল সে বিচার করা আমার মত ক্ষুদ্র অভিনেত্রীর পক্ষে কি সম্ভব?' চমৎকার উত্তর নয় কি? আরেক প্রশ্নের উত্তরে তাঁর মুখ হতে বেরুল—আপনারা আমায় স্নেহ করেন বলে দয়া করে নবযুগের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বলেন, আসলে আমি সে সম্মানের যোগ্যা তো নই-ই, যে সব অভিনেত্রীদের আমরা দেখেছি তাদের সহিত আমাদের তুলনা করলে শ্রেষ্ঠা তো দূরের কথা—একজন অভিনেত্রী বলেও নিজেকে মনে করতে পারি না।" সত্যিকারের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কি সুন্দর জবাবই না দিয়েছিলেন—এ ব্যাপারটা আমি আজও ভুলে যেতে পারিনি। এর পর আরো তথাকথিতা প্রসিদ্ধা অভিনেত্রীদের সঙ্গে আলাপ করেছি, প্রায় সবার মধ্যেই গর্বের ভাব বেশ লক্ষ্য করেছি। চারুর মধ্যে এমন শক্তির পরিচয় আজও পাইনি যাতে তাকে প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীদেরই একজন বলে মনে করতে পারি। চারুকে আমাদের ভালই লাগে, সহজ সবাক ভূমিকাগুলি তার হাতে পড়ে বেশ প্রাণবন্তও হয় কিন্তু তাই বলে জনা, শৈবলিনী, ভ্রমর, প্রভৃতি চরিত্রের কি তিনি প্রশংসনীয় রূপ দান করতে পারবেন?

পরিশেষে শিশিরকে চারুবালার মত অভিনেত্রীর পত্র ভাঙ্গিয়ে চলতে হচ্ছে দেখে সত্যিই কৌতুক বোধ করছি। পত্র তারা ছাপতে পারেন, কিন্তু যাকে যা বলা না যায় তাই যদি বলেন তা হলে তা কি প্রকারে উপেক্ষা করা যায়?

চিত্রায় পরপারে

আগামী কাল শনিবার নব গঠিত চন্দ্র ফিল্মসের অভিনব সামাজিক বাণী-চিত্র 'পরপারে' চিত্রায় আত্মপ্রকাশ করবে।

ছবিখানা নানাদিক দিয়েই মহা আকর্ষণীয়। কাহিনী দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক হতে গৃহীত হয়েছে, পরিচালনা করেছেন প্রসিদ্ধ আলোকশিল্পী যতীন দাস, আলোক চিত্র তুলেছেন দাদার নির্দ্দেশমত ভাই প্রবোধ দাস, শব্দযোজনা করেছেন তরুণ যন্ত্রী জ্যোতিষ সিংহ। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, জনপ্রিয় চিত্রনট দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহিমের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, এ ভূমিকায় যোগ্যতা দেখবার যথেষ্ট উপাদান আছে। বৃদ্ধ দাদামশায়ের অপূর্ব্ব চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরীর অবতরণ আর এক আকর্ষণের জিনিষ, এই ভূমিকার মিনার্ভায় তিনি দারুণ সুনাম অর্জন করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় মনোরঞ্জন, নির্ম্মলেন্দু, ভূমেন, শৈলেন, সুগায়ক অনুপম ঘটক, সন্তোষ সিংহ ও দাস, বীণা, জ্যোৎস্না,

নিভাননী, নগেন্দ্রবালা প্রভৃতিদের মত খ্যাতনামা শিল্পীরা অভিনয় করেছেন। পশ্চাৎপট সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে।

দ্বীপান্তর

ডি, জি, টকিজের 'দ্বীপান্তরে'র শ্যূটিং এখনও চলছে। এই সঙ্গে 'শ্যামসুন্দর' নামে একটী দু রীলের কৌতুকচিত্র দেখান হবে। 'শ্যামসুন্দর' পরিচালনা করবেন

'পরপারে'—শ্রীমতী নিভাননী

'বাথার দানের' পরিচালক হেম গুপ্ত। শীঘ্রই এর শ্যূটিং আরম্ভ হবে। হেম-বাবুর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করলেই আমরা খুসী হব। শ্রীতে ছবি দুখান শীঘ্রই প্রদর্শিত হবে।

শ্রীভারতলক্ষ্মীর 'আলিবাবা'

মিঃ মধু বোসের নাম সৌখিন নাট্য সমাজে সুপরিচিত। 'আলিবাবা' গীতি নাটিকাখানাকে তিনি তার নিজের দলের দ্বারা চিত্রে রূপান্তরিত করবেন। মরজিনার ভূমিকায় তার খ্যাতনামা নর্ত্তকী স্ত্রী সাধনা বসুকে দেখা যাবে, অন্যান্য ভূমিকায় সম্রান্ত বংশীয় তরুণ তরুণীদের নামান হবে। শ্রীভারতলক্ষ্মী আরেকখানা বাংলা ছবি তুলছেন দেখে আনন্দিত হয়েছি।

এদের 'বাঙ্গালী' ও 'জোর বরাত' মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে, কবে যে মুক্ত হবে তার কোন স্থিরতা নেই।

রীতিমত নাটক

কালী ফিল্মস এই নাটকখানাকে ছবিতে গাঁথবার জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রদর্শন করছেন। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার ভার শিশির ভাদুড়ীর উপরই ন্যস্ত হয়েছে। এ কাজের ভার অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তির ওপর দিলেই আমরা সুখী হতাম, কারণ শিশির কুমার যদি এ সব কাজের ভার নেন তাহলে সে ছবিটী ষোলআনা মঞ্চঘেঁসা হবারই আশঙ্কা থাকবে। তবে বড় কর্ত্তা আর কারো পরিচালনায় অভিনয় করতে স্বীকৃত হবেন না নিশ্চয়। মঞ্চে যারা যে ভূমিকা-গুলিতে অভিনয় করছেন সাধারণতঃ তাদেরই সেই সব ভূমিকায় নামাবার চেষ্টা হবে।

নিউ থিয়েটার্স

'গৃহদাহ' সম্ভবতঃ আগামী ৺মহাপূজার পূর্ব্বে চিত্রায় প্রদর্শিত হবে। 'অচিন প্রিয়ার' কোন খবরই জানা যায় না, সে খানা কি গৃহদাহের সঙ্গেই দেখান হবে?

নীতিন বসুর ছবিদ্বয়ের অন্তর্দৃশ্য তোলা হচ্ছে। দীনেশরঞ্জন দাশের 'বিজয়া'র কাজও চলেছে। সম্ভবতঃ মহাপূজার পূর্ব্বে 'বিজয়া'ও রূপবাণীতে জয়যাত্রা সুরু করবে।

হেমচন্দ্রের নতুন বাংলা ছবির শ্যূটিং আরম্ভ হয়েছে কিনা বা কে কে নামছেন সে খবর এখনও পাইনি।

বড়ুয়ার হিন্দি ছবির কাজ নাকি দ্রুত গতিতে চলেছে।

কালী ফিল্মস্

হিন্দি 'প্রফুল্ল' বা 'আশিয়ানার' নামের মানে হচ্ছে 'নীড়'। গল্পের নায়ক যোগেশ সারাজীবনব্যাপী সংগ্রামের পর যে 'নীড়' বেঁধেছিল তা নিমেষে ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল—ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতে তার সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ সবই চলে গেল। একটী একটী কাঠি সংগ্রহ করে পাখী অতি যত্নে অতি পরিশ্রমে তার যে 'নীড়' গাছের ডালে বাঁধে তাও এমনি ভাবেই একটি ঝড়ে আকস্মিকভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

'আশিয়ানা' নাম্বটীর প্রশংসা করা যায়। সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায় ছবিখানা দ্রুত তোলা হচ্ছে।

জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়ের হিন্দি 'তরুণী'তে খ্যাতনামা হিন্দুস্থানী অভিনেতৃদের দেখা পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য বাঙ্গালী শিল্পীও থাকবে।

সুশীল মজুমদার 'মুক্তিস্নান' নিয়েই ব্যস্ত আছেন। তিনি সম্প্রতি 'বসন্ত পূর্ণিমা' নামে একটী তিন রীলের পৌরাণিক ছবিও তুলছেন। গুণময়ের পরভৃতিকার সবই শেষ, শুধু বাকী শ্যূটিং আরম্ভ হওয়ার।

পপুলার পিকচার্স

শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত মশাই'কে এরা চিত্রে রূপান্তরিত করবেন সে কথা বহুদিন যাবৎ শুনে আসছি। এর ভূমিকা বণ্টনও একপ্রকার হয়ে গেছিল। সে সব স্বদেশের পাঠকেরা জানেন। সম্প্রতি পত্রান্তর হতে জানা গেল—এবার নাকি সত্যিই কালী ফিল্মসের ষ্টুডিয়োতে এর শ্যূটিং আর কয়েকদিনের মধ্যেই আরম্ভ হবে, প্রধান ভূমিকায় বৃন্দাবন ও কুসুমরূপে অভিনয়ার্থ মনোনীত হয়েছেন রতীন বন্দোপাধ্যায় ও শান্তি গুপ্তা। কুসুমরূপে শান্তির মনোনয়নে তেমন আপত্তির কারণ নাও থাকতে পারে, কারণ যোগ্য অভিনেত্রীর সন্ধান বোধ হয় পাওয়া যায় নি। কিন্তু বৃন্দাবনের সুকঠিন চরিত্রে রতীনের মনোনয়ন ঠিক হয় নি বলেই আমাদের ধারণা। ছবি তোলা হয় ব্যবসায় হিসাবে, সেখানে যদি এভাবে ভূমিকা বণ্টিত হয় তাহলে আপত্তি করবার যথেষ্ট কারণই থাকতে পারে। কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করছি।

ক্ষুদ্রা-জগৎ

রঙমহলে শীঘ্রই যোগেশচন্দ্রের সামাজিক নাটক 'তাসের ঘর' 'নন্দরাণীর সংসার' নামে অভিনীত হবে।

নব নাট্যমন্দিরে 'অচলা' শীঘ্রই মঞ্চস্থ হবে। শিশিরবাবু বোধ হয় কেদার বাবুরূপেই আত্মপ্রকাশ করবেন, তার এই মনোভাবে সুখী হয়েছি। সুরেশরূপে তাকে মোটেই মানাবে না। দুটী কঠিন চরিত্রে বিশ্বনাথ ও শৈলেন নামবেন।

নাট্যনিকেতনে এ মাসেই 'আলাদিন' তার আশ্চর্য্য প্রদীপের আলোয় সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ আলোকিত করবেন। সুধীর গুহের প্রযোজিত নাটক দেখবার জন্ম উন্মুখ হয়ে রয়েছি।

মিনার্ভার 'দস্যু'ই চলেছে। রূপমহলের কোন খবরই পাই না। তারা তাদের সমস্ত সংবাদ জানাবেন কি?

চিত্রভারতী

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তর (চানী দত্ত) পরিচালনায় হাস্যরসাত্মক ছবি মামা ভাগনে অর্থাৎ 'মাণিক জোড়ে'র চিত্রগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। চিত্রখানি এখানকার কোনও একটী জনপ্রিয় চিত্রাগারে মুক্তিলাভ করবে। ছবির ভূমিকালিপি নিয়ে দেওয়া হ'ল:—

মামা—শ্রীচানী দত্ত, ভাগনে—শ্রীঅতুল ভট্টাচার্য্য, নায়ক—শ্রীজ্ঞান ভট্টাচার্য্য, মেয়ে—শ্রীমতী পদ্মাবতী, ঘটকী—মিস্ চামেলী, বান্ধবী—শ্রীমতী প্রীতি দেবী। এ ছাড়া আরো নতুন নতুন মুখ পর্দ্দার উপরে দেখতে পাওয়া যাবে।

রূপবাণী

মেট্রোর বহু প্রশংসিত চিত্র চার্লস্ ডিকেন্সের অপূর্ব্বকীর্ত্তি "এ টেল অফ্ টু সিটিজ" শনিবার ৪ঠা জুলাই থেকে রূপবাণীতে দ্বিতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করল।

দেশের শাসক যখন অত্যাচারী হয় প্রজার সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত না করে যখন ভোগ বিলাসে মত্ত হয় তখন উন্মত্ত জনতা—কি ভাবে সেই অত্যাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করে ডিকেন্স লিখিত এই অপূর্ব্ব কাহিনী নিয়ে আলোচ্য চিত্রখানি গঠিত হয়েছে।

ছবিখানির ঘটনাবলী প্যারিসে এবং লণ্ডনে সঙ্ঘটিত হয়েছিল তাই ইহার নাম "এ টেল অফ টু সিটিজ—(দুইটী নগরীর কাহিনী।)

চিত্রখানিতে রেনাল্ড কলম্যান অতি উচ্চাঙ্গের অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। যাঁরা সত্যিকারের ভাল কিছু দেখতে চান—বর্ত্তমান চিত্রখানি তাঁহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য।

রূপবাণীর আগামী আকর্ষণ—মেট্রোর আর একটী চাঞ্চল্যকর চিত্র—"মিউটিনি অন্ দি বাউন্টি"। সুরু হবে শনিবার ১১ই জুলাই। এতে চার্লস লাফটন ও ক্লার্ক গেবল অতি প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্

আমরা শুনে দুঃখিত হলাম যে, দেবকী বসু পরিচালিত সোনুরেরী সংস্থার—বাংলায় সোনার সংসারের অন্যতম অভিনেতা জীবন গাঙ্গুলী কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন—এই কারণে ছবি তোলায় বাধা পড়েছে। নানারূপ ঝঞ্ঝাটে সোনার সংসার ছারখার যাতে না হয়ে যায়, প্রচার সম্পাদক সুধীরেন্দ্র সান্যাল যেন এ দিকে একটুকু দৃষ্টি রাখেন। জীবন গাঙ্গুলীর সত্বর আরোগ্য কামনা করি।

নাম জানা দুই বন্ধু মোরা

(বড় গল্প)

দিলীপ দাশগুপ্ত
মনসা চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

দিনের আলো ঘোলাটে হয়ে যেতেই সকল ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। বিচিত্র রঙের শাড়ীর ঝলকানি ছিটকে পড়লো সারা ঘরে। আর বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন সুরের আর বাজনার আওয়াজ ছুটে পড়তে লাগলো রাস্তায়। রেডিও ফিট করা হয়েছিল ঠিক গেটের সামনে। রাস্তার লোকগুলো চলতে চলতে থমকে দাঁড়াতে লাগলো সব সেখানে। হঠাৎ পাশের ঘরের ফোনটা বেজে উঠলো—ক্রিঙ ক্রিঙ। আবার ক্রিঙ ক্রিঙ! তাড়াতাড়ি অরুন্ধতী ছুটে গিয়ে রিসিভারটা ধরে বল্লে: হ্যালো।

কে, অরুন্ধতী?

আপনি মালক মিত্র তো?

ইয়েস, ইয়েস।

বলুন, কি খবর। আজকে আসছেন তো?

নিশ্চয়ই। রিণির জন্মোৎসবে আবার আসবো না?

তা' হলে বৃথা দেরী কোরে আর লাভ?

আরে এই আসছি আর কি। ইয়ে, হ্যাঁ মিস সান্যাল, কে কে এলো? প্রবীর আর উৎপলা এসেছে?

পৌছায়নি এসে। হয় তো এখনি এসে যাবে।

তারপর?

অনুমান আর কিছু নয়।

রিণিকে একবারটী ডেকে দেবেন?

রিণি কি আর আসতে পারবে এখন। বন্ধুদের নিয়ে খুব ব্যস্ত আছে সে।

এক মিনিট। শুধু এক মিনিটও কি স্পেয়ার করতে পারবে না?

আচ্ছা, লাইনটা আপনি ধরুন, দেখছি।

হ্যালো।

রিণা?

নিশ্চয়ই।

খুব ব্যস্ত আছ আজকে, না?

সেটা স্বাভাবিক।

ভাল আছ তো?

আমায় ক্ষমা করুন মালকবাবু। ও সব কথায় আজকে আমায় আটকে রাখলে চলবেনা মোটেই। আপনি চট করে চলে আসুন।

ওখানে তো, আর আমার করে পাব না তোমাকে। বন্ধুদের নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।

না—না আপনি আসুন। আচ্ছা রেখে দেই এবারটায়। দু'মিনিটের মধ্যেই আশা করি, আপনার ট্যাক্সি এসে দরজায় থামবে। হ্যাঁ, আরেক কথা—হ্যালো।

বল, কী বোলবে?

এইমাত্র প্রবীরবাবু আর উৎপলাদি এসেছেন। আপনি আর দেরী কোরবেন না কিন্তু।

তারপর রিসিভারটা হুকে জড়িয়ে দিলে রিণা।

সারা বাড়ীটা কলরোল আর উতরোলে ভরা। উচ্ছ্বাস আর অফুরন্ত আনন্দে। সবই যেন বয়ে যাচ্ছে স্রোতের মতো একটানা, অব্যাহত মুক্ত। সজীব, সপ্রাণ। আর একটা বিশ্রি রকমের গন্ধের তিক্ততা যেন হামাগুড়ি দিয়ে ফিরছে সমস্ত ঘরে। নানা রকমের তেল, লোশন আর ক্রীমের গন্ধের সমতায় সৃষ্টি হয়েছে অদ্ভুত রকমের বিশ্রি একটা গন্ধ। আবার একদল মেয়ে আর তাদের মায়েরা (অবশ্যি সকলের নয়) বসে গ্যাছে রেডিও আর্টিষ্ট প্রবীরের গান শুনতে। অনেকে হয় তো ধন্য হলো। এতদিন যার গান শুনে প্রশংসা করেও তৃপ্তি হতো না আজ তাকে দেখতে পেলো তাদেরি মধ্যে সাধারণ কোন লোকের মতো। আবার উৎপলাকে, তার অদৃষ্টকে অযথা প্রশংসা করতে লাগলে। প্রবীরের মতো বন্ধু পাওয়া নাকি নিতান্ত? তপস্যার ফল, সত্যিই কপাল ভাল বলে। আরও অনেক কিছু। প্রবীরের গান শেষ হতেই মিসেস নাগ তার মেয়ের নাম করে ডাকলে। আর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলো একটা কায়দা-দুরস্ত মেয়ে। মিসেস নাগকে চিনতো সবাই। এককালে (অর্থাৎ যখন তার উৎসুক দৃষ্টির দিকে সকলেই তাকিয়ে থাকত এবং তার সুন্দর দেহের দিকে) টেনিস আর ব্যাডমিন্টনে মস্ত বড় নাম ছিল এই মিসেস নাগের। এখন খেলা ছেড়ে দিয়েছে। তার দেহের স্থূলতা গ্যাছে বেড়ে। অসম্ভব রকম মোটা হয়ে পড়েছে সে। আর এখন সব চেয়ে তার বড় কাজ হচ্ছে, মেয়েকে একটা সোসাইটী গার্ল হিসেবে সবার কাছে পরিচিত করিয়ে দেওয়া। আর তার গানে আর নাচে সবাইকে মুগ্ধ করা। তারপর প্রবীরকে লক্ষ্য করে মিসেস নাগ বল্লেন:

মিস্ লাবণ্য নাগের নাম হয় তো অনেকেই শুনে থাকবেন। ভাল গায়ও। আর নাচেও বেশ। এবার ওর একটা গান হোক। অনেকেই চিৎকার করে উঠলেন: বেশ, বেশ। তাই হোক।

প্রবীরও সায় দিলেন। আর মালক

একটু মুচকি হাসলে। সে হাসির অর্থ দুর্বোধ্য, লৌহ প্রাচীরের মতো দুর্ভেদ্য।

আচ্ছা, সবাই যখন বোলছেন, বেশ তুমিই গাও লাবণ্য। তোমার সেই গানটাই গাও—কে কালো কাজল আঁখি—আবার বল্লেন মিসেস্ নাগ।

তার সমস্ত শক্তি আর যোগ্যতার চূড়ান্ত করে কল্যাণী গান গাইলে। কিন্তু তার গানের প্রশংসা অন্যে করুক আর না করুক মিসেস নাগ যেন ফেটে পড়লেন। তারপর আবার প্রবীরকে জিজ্ঞেস করলেন: আপনার তো এ সব বিষয়ে জ্ঞান যথেষ্ট। কল্যাণীর গানটা কেমন লাগল আপনার?

মন্দ নয়। ভবিষ্যতে আরো ভাল হবে বলেই মনে হচ্ছে। বল্লে প্রবীর, আর ও কথা বলেই যেন বেঁচে গেল সে এইভাব।

আপনার ভাল লাগলেই হ'লো। গান আর কটা লোকেই বা বোঝে! আমার বিশ্বাস—

হঠাৎ আর তাকে কোন কথা বলতে না দিয়ে একটু ঠাট্টার সুরে বল্লে মালঞ্চ: বিশেষ করে আপনার মেয়ের গান তো?

মালঞ্চের এ অপ্রত্যাশিত কথার বর্ষীয় মিসেস নাগের আত্মমর্যাদার আর আভিজাত্যে যে ঘা লাগলো তার মুখের রেখায় রেখায় ফুটে উঠলো তা সুস্পষ্ট, জাজ্বল্যমান করে। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বল্লেন মিসেস নাগ: [মালঞ্চর দিকে চেয়ে] আপনার কি করা হয় জিগগেস কোরতে পারি কি?

তেমন বিশেষ কিছু নয়। নিতান্ত সোজা কথায় বল্লে মালঞ্চ।

হঠাৎ কে যেন একটা অপরিচিত কণ্ঠে বলে উঠলো: আশ্চর্য্য ও ভদ্রলোককে চিনলেন না! নাম মালঞ্চ মিত্র।

ও মাই গড্! আধুনিক সাহিত্যিক তো। [তারপর তারা পরস্পরে প্রীতি নমস্কার কোরলে।]

মালঞ্চ মিত্রের পরিচয় পেয়ে অনেক মেয়েই তার দিকে নিক্ষেপ কোরলে তাদের দৃষ্টির উজ্জ্বলতা। বিশেষ করে যারা কলেজে ঢুকেই রাত্রি জেগে লিখতে সুরু করেছে প্রেমের কবিতা। তারপর এমনি করে গড়িয়ে এলো রিণির জন্মক্ষণটী। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সবাই দাঁড়িয়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা কোরলে রিণার দীর্ঘজীবন আর সুখ-শান্তির জন্য।

[ক্রমশঃ]

পৃথিবীর জন্ম ও মৃত্যু রহস্য

যে ভূমণ্ডলকে আমরা আজ কি সুখের স্থান বলিয়া পঞ্চমুখে তাহার বন্দনা গান গাহিয়া থাকি, এ ভূমণ্ডল চিরদিনই কিন্তু এমনি সুখের স্থান ছিল না এবং থাকিবেও না। বিশ্ব জগতের "চলা চলং ইদং সর্ব্বং" এর ন্যায় এ ধরার স্মৃতিও হয় ত একদিন ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে। যাঁহারা মনে করেন, এ ধরা চিরদিনই এমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্ভার ও সম্পদ শ্রীতে ভরা ছিল তাঁহারা ভ্রান্ত। ধরণী চিরদিনই এমনি তরুণী ছিলেন না। এমন কি, অনেকে শুনিয়া আশ্চার্য্যান্বিত হইবেন যে অনাদি অনন্ত কাল পূর্ব্বে সৃষ্টির আদিম যুগে আজিকার এই মনোহরা ধরার কোন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না। তবে কোথা হইতে এমন শস্য শ্যামলা নদী মেখলা, শৈলকুন্তলা, গিরিকিরীটিনী ধরণীর আবির্ভাব হইল এই প্রশ্ন হয় ত অনেকেই করিতে পারেন।

ধরণী তরুণী বলিয়া আমরা তাহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া থাকি বটে, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদদিগের মতানুকরণ করিলে ধরণীর সহিত আমাদের এই মাতা পুত্র সম্পর্কটা ভ্রমাত্মক বলিয়াই মনে হয়। কারণ জ্যোতির্ব্বিদগণ বলিয়া থাকেন, সৃষ্টির আদিম যুগে যখন এই ধরণীর কোন অস্তিত্বই ছিল না তখন ছিলেন কেবল সূর্য্য মামা। তাও আজিকার সৌর কণ্ডলে আমরা সূর্য্য মামার যে তেজোময় মূর্ত্তি দেখিয়া থাকি এরূপ তখন তাঁহার ছিল না। তখন তিনি এমন অগ্নি প্রজ্বাল-

কারং ছিলেন না সত্য, তবে চরাচর যে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। জ্যোতির্বিদদিগের মতে সৃষ্টির আদিম যুগে যে সূর্য্য মামাকে দেখা যাইত তিনি এমন অখণ্ড ছিলেন না; তিনি ছিলেন তীব্র জ্যোতির্ম্ময় খণ্ড খণ্ড দেহধারী। সেই জ্যোতির্ম্ময় খণ্ড গুলি আজিকার অপেক্ষা বহু গুণ তীব্রতর বেগে আপনার আবর্ত্ত পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। আবর্ত্ত পথে ঘুরিবার সময় সেই জ্যোতির্ম্ময় দেহ হইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র খণ্ড বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ে। উহারই একটা খণ্ড না কি আমাদের আজিকার এই প্রাকৃতিক শোভা সম্পদশালিনী ধরিত্রী। অপর একটী খণ্ড হইল নিশানাথ, সুতরাং সেই হিসাবে এ ধরণীকে জননী না বলিয়া বরং তাহাকে আমাদের মামাত বোন বলা যাইতে পারে। যে হেতু সৃষ্টির আদিম-যুগে একমাত্র যাঁহার অস্তিত্ব ছিল সেই বিশ্ব তাপন তপন দেবী একাধারে আমাদের জনক ও জননী।

যে দিন আমাদের এই প্রকৃতিরাণী সূর্য্য মামার অংশ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সে দিন যে কেহ তাহার ঠিকুজী কোষ্ঠী রাখে নাই ইহা একরূপ নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। কারণ আজিকার ন্যায় এমন বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন মানব তো পরের কথা জীব জগতের কোন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না, তবে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা বহু গবেষনার পর স্থির করিয়াছেন যে আমাদের সম্পর্কীয়া মামাত ভগ্নীর বয়স এই ২০০ কোটী বৎসর। ধরণী কিন্তু ২০০ কোটী বৎসর পদার্পণ করিলেও মাত্র ত্রিশ কোটী বৎসর পূর্ব্বে তাহাতে জীব জগতের কোন অস্তিত্ব ছিল বলিয়া জানা যায় না। বাকী ১৭০ বৎসর পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জানিবার জন্য সাধারণের মনে একটা কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

সূর্য্য মামা হইতে পৃথিবী যে দিন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দিন তিনি ছিলেন এক জলন্ত উষ্ণ পিণ্ডের মত। সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার পর আপনার আবর্ত্তন পথে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার প্রদীপ্ত তেজ ক্রমে স্তিমিত হইয়া পড়ে। ধরায় জীবের জন্ম লাভের পূর্ব্বে তাহার আবহাওয়া ছিল বিষম গাঢ়তর। প্রায়ই ঘন কৃষ্ণ মেঘ রাশি দিনমণিকে আবৃত করিয়া রাখিত এবং তীব্র ঝটিকাবর্ত্তে দিবা-মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকিত। ভূখণ্ড তাহাতে ছিল বটে কিন্তু আগ্নেয় গিরির প্রবল অগ্ন্যুৎপাতে ভূখণ্ড ছিল উষর মরু ভূমির ন্যায় আজিকার মত এমন শস্য শ্যামলা ছিল না।

চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবী তিন জনেই আপন আপন কেন্দ্র পথে প্রতি নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাদের গতি ছিল তখন নাকি বর্ত্তমান অপেক্ষা বহুগুণে দ্রুততর। বৈজ্ঞানিকেরা বহু গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে তাঁহাদের পূর্ব্বেকার সে গতি বর্ত্তমানে বহুগুণে হ্রাস হইয়াছে। পৃথিবী এবং সূর্য্য পিতাপুত্রী উভয়েরই গতি তখন দ্রুততর ছিল বলিয়া আজিকার মত দিনমান এত দীর্ঘ ছিল না। ঋতু বিশেষে এখন দিবা ভাগের সময়ের তারতম্য ঘটিয়া থাকিলেও তখনকার দিবা ভাগ এখনকার দিবসের তুলনায় অর্দ্ধেক অথবা এক তৃতীয়াংশ ভাগ ছিল। সূর্য্য ও পৃথিবীর গতি যতই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে দিবসের পরিমাণও ততই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বৈজ্ঞানিকদিগের মতে দিনে দিনে দিন যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে মনে হয় ইহার পর হয় তো এমন এক দিন আসিবে যে দিন দিবসের কর্ম্মক্লান্ত নর নারী নৈশ নিদ্রার বিশ্রাম সুখে বঞ্চিত হইবে। আজিকার মত তখন আর অমা-নিশার দিগন্তব্যাপী সূচীভেদ্য অন্ধকার কাহারও মনে ত্রাসের সঞ্চার করিবে না, কিম্বা পূর্ণিমা রজনীর অমল ধবল শুভ্র জ্যোৎস্না জড়া রজনী মানবের চিত্তকে বিশ্ব-স্রষ্টার সৌন্দর্য্য রসে এমন করিয়া আপ্লুত করিবে না। সে দিন হয় ত থাকিবে শুধু মাত্র কর্ম্মমুখর দিবসের কর্ম্মকোলাহল, নৈশ প্রকৃতির নীরব নিস্তব্ধতা মানুষের

কর্ম্ম ক্লান্তদেহ অথবা চিন্তা ক্লিষ্ট মনকে আজিকার মত এমন বিশ্রামের সুযোগে বঞ্চিত করিয়া রাখিবে। তখনকার দিবস-গুলি নাকি হইবে এখনকার বৎসরের ন্যায়। কিন্তু রাত্রির স্থিতিকালও অনুরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইবে কিনা বৈজ্ঞানিকেরা তাহা অবশ্য কিছু বলেন নাই। পাইলে ধরাবাসী মানব হইতে জীব জন্তু পর্য্যন্ত সকলকেই হয়ত কুম্ভকর্ণের মাসতুতো ভাই হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।

বৈজ্ঞানিকদের মতে শুধু যে পৃথিবীর আবর্ত্তন গতি মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে তাহা নহে অতি বৃদ্ধ সূর্য্য মামার পরমায়ু নিঃশেষের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও রথের অশ্ব সাতটীর চরণ ক্রমে শ্লথ হইয়া পড়িতেছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের তেজ বীর্য্য ও কর্ম্ম শক্তি যেরূপ শিথিল হইয়া আসে সৌর ও বিশ্ব জগতের বৃদ্ধ প্রপিতামহ সূর্য্য মামার অবস্থাও নাকি সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর কেন্দ্রভাগে পূর্ব্বের তুলনায় তাঁহার তেজ বীর্য্য বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইতেছে। এই ভাবে কৃষ্ণপক্ষের শশীকলার ন্যায় তিনি তিলে তিলে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া হয় তো একদিন চাঁদ মামার ন্যায় সম্পূর্ণ নিস্তেজ অবস্থায় মহা শূন্যে বিলম্বমান হইয়া থাকিবেন।

তখন হয় তো আজিকার এই দৃশ্য সৌন্দর্য্য ও সম্পদ বৈভবে ভরা ধরার অবস্থা মেরু প্রদেশের ন্যায় চির তুষারাবৃত হইয়া দাঁড়াইবে। সে চিরান্ধকারময় দিবসে ঘন তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশে আজিকার ন্যায় জীব জগতের কোন অস্তিত্ব থাকিবে কিনা এবং থাকিলেও সে অস্তিত্ব রক্ষা কি ভাবে সম্ভব হইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে।

সৃষ্টির আদি যুগে মানবের বুদ্ধি বৃত্তি আজিকার ন্যায় এমন প্রখর ছিল না। তখনকার যুগে মানুষের ধারণা ছিল পৃথিবী যেমন তেমনি স্থিরই থাকে, চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ উপগ্রহাদিই তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। চীন ও ব্যাবিলনের বৈজ্ঞানিক-দের ধারণা ছিল পৃথিবী এমন গোলাকার নহে। সৌরজগৎ সম্বন্ধে মানবের সে আদিম বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সভ্যতা ও কৃষ্টির সাহায্যে মানুষ বর্ত্তমানে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে অভাবনীয় সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহাতে এ ধরায় সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রলয়াস্তকালে কি ভাবে তাহারা আপনা-দের অস্তিত্ব বজায় রাখিবে এখন হইতেই তাহার গবেষণায় মনোনিবেশ করা বুদ্ধি-মানের কাজ নহে কি?
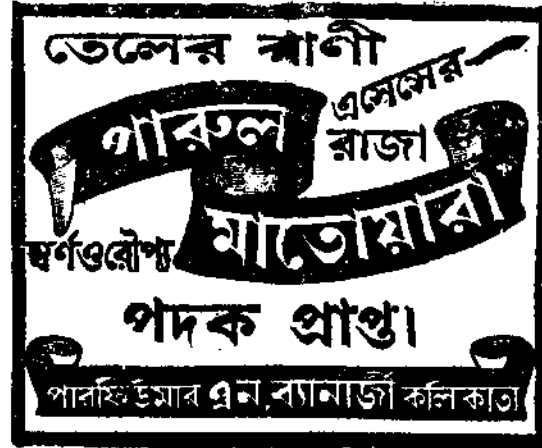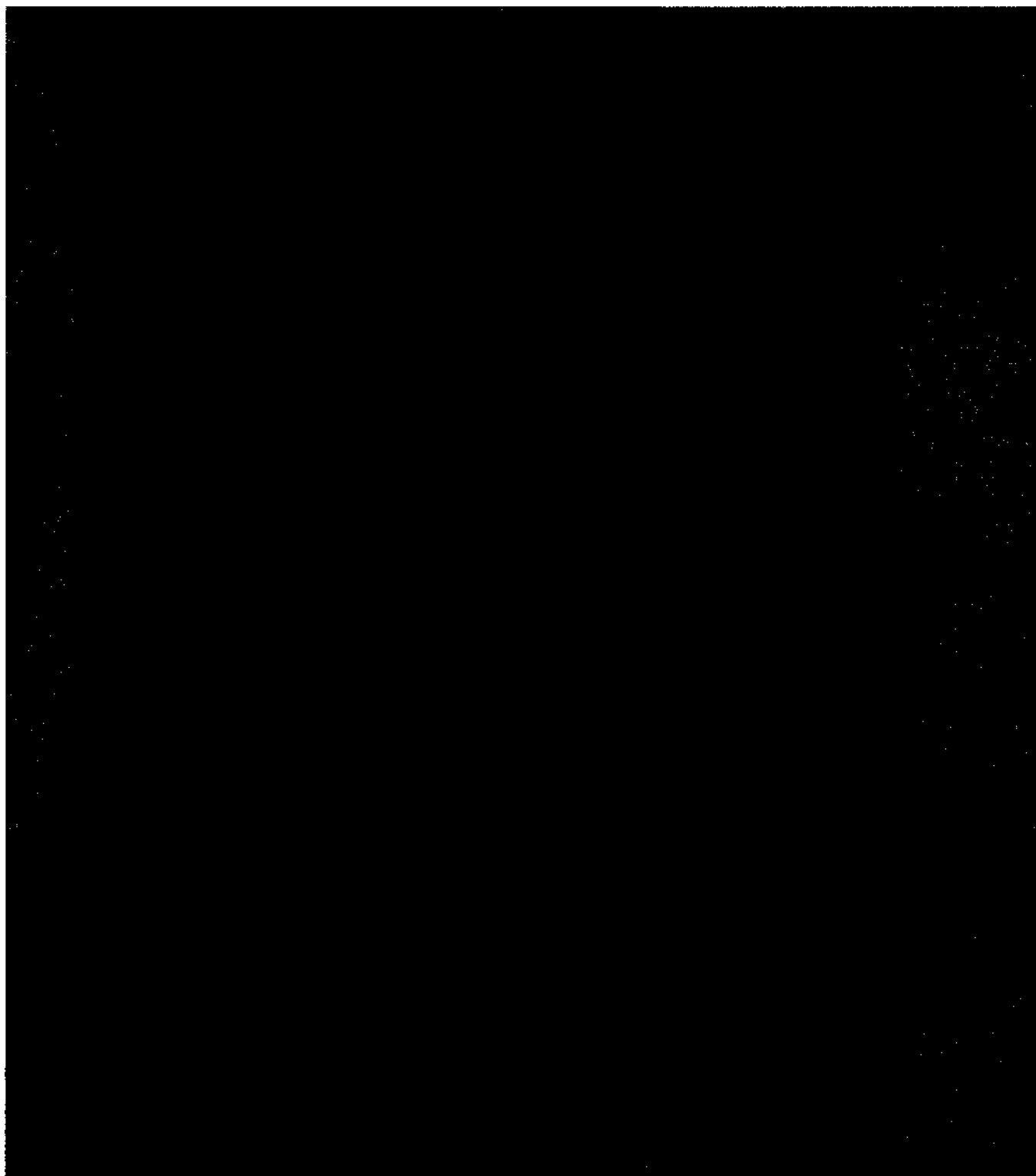
সচিত্র সাপ্তাহিক

দ্বিতীয় বর্ষ—২২শ সংখ্যা

শুক্রবার—২৬শে আষাঢ়

১৩৪৩

১০ই জুলাই—১৯৩৬

দ্বিজেন্দ্রলাল স্মরণে—

সত্যিকারের প্রতিভা কারো মুখ চেয়ে থাকতে জানে না। তটিনীর জল সাগরাভিমুখী গতি নিয়ে আপনার আনন্দে আপনি তন্ময় হ'য়ে ছু'টে চলে। পথের বাধা, বিস্মৃতি বা অবহেলার বাঁধ—তাকে পারে না ঠেকিয়ে রাখতে। তা'র যাবার পরিপূর্ত্তির প্রেরণায় হ'য়ে আসে মুক্ত, যেমন নাকি ফুল-ফো'টবার বেলায় দলগুলো ছড়িয়ে পড়ে আপনি! আবার হয়তো এমনও দেখা যায়, প্রতিভা তা'র পথ পেল না খুঁজে, উন্মেষের—বিকশিত হবার পূর্ব্বেই ঝড়ো-হাওয়ায় কুঁড়িতেই ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়লো, সান্ত্বনা দেবার মত রইলো না কেউ, দু'ফোটা চোখের জলের বদলে একফোঁটা দেবারও কেউ থাকলো না! তাই, বিজয়লক্ষ্মী কার গলায় মালা পরিয়ে দেবেন, সে রহস্যের সূত্র অজানা অন্ধকারেই অদৃশ্য হ'য়ে রইলো। অদৃষ্টবাদী আমরা, রহস্য নিয়েই থাঁ কড়ে প'ড়ে থাকি। ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রাপ্য শ্রদ্ধা ভয়ে ভয়েই দেই।

মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্য' তরুণ রবীন্দ্রনাথের কলমের মুখে প'ড়ে তা'র সুপ্রতিষ্ঠিত আসন থেকে অপসারিত না হ'য়ে বরং আরো দৃঢ়ীভূত হয়েছিলো, কারণ কাব্যের রস স্বতঃই জাতির মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে গেছে। উত্তর-জীবনে রবীন্দ্রনাথ তাঁ'র ত্রুটী স্বীকার ক'রে মহাকবির মর্য্যাদার যথাযোগ্য মূল্য দানে কৃপণতা করেন নি। সু-উপেক্ষিত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি জাতির ত্রুটী-সংশোধনের আয়োজন আজ প্রত্যক্ষ ক'রে, এই কথাটাই বড়ো ক'রে মনে হচ্ছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু কবি ও নাট্যকারই ছিলেন না। তৎকালীন বহির্মুখী সমাজের আড়ম্বর তাঁ'কে অন্তরমুখী দরদী অনুভূতিপ্রবাহে স্নাত-পরিস্নাত ক'রে—ক'রে তুলেছিলো চঞ্চল, উন্মাদ! তাঁ'র অন্তরপ্লাবী ক্রন্দনের সুর লেখনীর মুখে 'হাসির গান'রূপে রূপপরিগ্রহ ক'রেও যে ব্যথার রাগিনী ধ্বনিত ক'রে জাতির জাতীয়-জীবনে প্রাণশক্তির শিহরণ সঞ্চার করেছিলো, তা'র মূলে ছিল অমানুষকে মানুষ করবার দ্যোতনা। তাই হাস্যের অন্তরালে যে ক্রন্দনবিধুর ব্যথার নিবিড়তা দেখতে পাই, তা'র চেয়ে বড়ো কান্না আর কোথায় শুনবো?

আজকে জাতি যে তা'র উপেক্ষিত প্রতিভার যথাযোগ্য মূল্যদানে অবহিত হ'য়ে এতদিনে আপনার ত্রুটীস্খলনে যত্নবান হ'য়ে উঠেছে, দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি-বাসরে জাগরণের সম্ভাবনায় আমরা সেই অমর মানুষের মানুষ-গড়ার মন্ত্রে জানাচ্ছি আমাদের সঙ্কুচিত শ্রদ্ধার নিবেদন। তাঁ'র প্রতিভার আলোকে হ'য়ে উঠছি উদ্ভাসিত!

চাতিম চাতিম

শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ

আত্মরক্ষার চেষ্টা ও প্রবৃত্তি মানুষের বড়ই প্রবল, কারণ ওটা একেবারেই গোড়ার কথা। স্থূল ক্ষুৎপিপাসাতুর দেহটাকে আমরা জীবমাত্রে যে পরিমাণ ভালবাসি আকাশ-কুসুমকে তার শিকিও ভালবাসিনে। সেই ক্ষুৎপিপাসার আধার এই জড়পিণ্ড দেহ থেকে জন্মেছে আত্ম-রক্ষার প্রবৃত্তি। ঐ প্রবৃত্তিকে হিসেবের বাহিরে রেখে দেশ-হিতৈষণা ইত্যাদি নানা আশমানী ফুলের আবাদ করবার চেষ্টা পণ্ডশ্রমই হয়ে থাকে—তখনই না হোক, ইন্ দি লং রাণ—পরিণামে। দু'চার জন প্যাট্রিয়ট দেশের জন্ম দুর্গা বলে ফাঁসী কাঠে ঝুলে পড়তে পারে কিন্তু মাস্ অর্থাৎ জন সাধারণ সে রকম বোকামী যে করবে না, সেটা একেবারে নির্জলা ও অবধারিত সত্য। এইখানে ঠিক ভুল হয়ে আমাদের পলিটিক্স এ যাবৎ অরণ্যে রোদনে পর্য্যবসিত হয়ে আসছে।

* * *

হাজার অশিক্ষিত ও বোবা হলেও মাস্ এদিক দিয়ে স্বভাবতই চালাক, কোন্ পথে পদার্পণ করলে তার অন্নে অর্থাৎ পেটে হাত পড়বে না তা' সে বিলক্ষণ জানে। আজকাল কার্ল মার্ক্স যুগে সবাই বেশ বুঝে ফেলেছে, যে, মানুষের সব কিছু পেটে হাটে; তার ধর্ম্ম, সাহিত্য, কলা, শিল্প, বাণিজ্য, রাজ্যপাট সবই গড়ে উঠেছে নাকি—টাকা, আনা ও পাইয়ের সীমেন্ট কংক্রিটের ভিতের ওপর। এই আইডিয়া থেকে জোয়াহির লালজী বলেছেন,—ক্ষুধা রাক্ষসীই আমাদের ড্রিল মাষ্টার, ওরই ইঙ্গিতে আমরা জাতি হিসাবে যে যার সারি সারি উঠ্-বোস, কুচকাওয়াজ, রাইট ও লেফট্ টার্ণ করছি। এ সবই সত্যি কথা, কিন্তু ওর কোনটাই পুরা সত্যি নয়।

* * *

ক্ষুধা আমাদের তাড়না করে, আমরা তার ইঙ্গিতে অনেক কুকার্য্যই করে থাকি সন্দেহ নাই। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে, সে সীমা নির্দ্দেশ করে আমাদের সহজ দেহপ্রীতি ও তজ্জাত আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা। তা' যদি না হতো তা' হলে দেশে বিপ্লব বাধাতে প্যাট্রিয়টের অগ্নিময়ী বক্তৃতার দরকার হতো না, বাঁকুড়ার কেমিন বা একটা সুবিধাগোছের ছিয়াত্তরী মন্বন্তর দেশে পত্রপাঠ বিপ্লব এনে দিত। তা' কিন্তু হচ্ছে না, হাজারক্সপ ড্রিল সার্জ্জেণ্ট সাহেব উপর্য্যুপরি দুর্ভিক্ষের তাড়নে এতখানি এ্যাকিউট হয়েও আমা-দের মরিয়া করে তুলতে পারে নি, আমরা দুর্ভিক্ষের গ্রাসে পরমানন্দে মরেছি এবং পেট ও পিঠ এক করে বেঁচে থেকেছি। তিলে তিলে মরতে মানুষ রাজী, হঠাৎ তপ্ত গুলির মুখে মরতে রাজী না। কারণ স্লো-ডেথ্-এ বাঁচবার আশা আছে, বধ্যভূমিতে তা' আদৌ নাই।

* * *

তা' হলে দেখা যাচ্ছে, আমরা শুধু একজন ড্রিল মাষ্টারের গুঁতোয় চলি নে, আমরা চলি হরেক রকম উস্কানীর তাড়ায়। মানুষ পায়ে হাঁটে, পেটে হাঁটে, মাথায়ও হাঁটে এবং মানুষ যে বুকে হাঁটে অর্থাৎ ভাবের দমকায় চলে তা' বাংলা দেশের দৃষ্টান্তে সপ্রমাণিত হয়ে গেছে,—একবার নয়, বার বার। এতখানি গবেষণার পর

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যিনি বুভুক্ষু দেশকে রুটি দেবেন তিনিই দেশের ঠেসে ধরবেন কর্ণ। কংগ্রেসের চাঁদার খাতায় রুটি নাই, দু'চার জন লিডারের চাপরাশ আর এজিটেশনের গ্যাস ছাড়া চাঁদার থলিতে আর কিছু যে আছে তা' কেউ প্রমাণ করতে পারবেন না। কংগ্রেস আমাদের জাতি হিসাবে কিঞ্চিৎ প্রেষ্টিজ দেয় ও প্রচুর আশা দেয়, অন্ন দেয় না। তাই কংগ্রেসের নেতাদের ডাকে মাস্ সাড়া দেয় না, সাড়া দেয় দু' দশ শ' আইডিয়ালিষ্ট—যাদের ধর্মই হচ্ছে বুকে ও মাথায় হাঁটা। ১৯০৫ সাল থেকে নেতারা হরেক রকম ডাক দিয়েছেন, যথা, "গোলামখানা ত্যাগ কর", "শ্রীঘরে চল—স্বরাজের খাতিরে", "গ্রামের পাদাড়ে চলো—দেশের লাগি—ব্যাক্ টু দি ভিলেজেস্", "সয়তানী গভর্ণমেণ্টের চাকরী ছাড়—স্বরাজ না পাওয়া পর্য্যন্ত", লবন খেও না, তাড়ি ছুঁও না, ট্যাক্সো দিও না—আণ্টিল ফারদার অর্ডারস্"। এসব ডাকের মত ডাকে কেউ সাড়া দেয় নাই তা' বলতে পারি নে, কারণ কোন দেশেই রগচটা ও গোঁয়ার মানুষের অভাব নেই; কিন্তু দেশ হিসাবে এ সব ডাকের মত ডাক ব্যর্থ গিয়েছে, মাস্ যাবাজীবন ডাক শুনেছে আর দিব্য আরামে ঘরে বসে তামাক টেনেছে।

* * *

সাড়া তারা কেন দেয় নাই? তার কারণ পূর্ব্ব কথিত ঐ ঠিকে ভুল। মাস্ এবং বিশেষতঃ শিক্ষিত মাস্ বড়ই চালাক, তাদের ভাতে হাত দিলে নেতার নেতাগিরি তৎক্ষণাৎ অচল হবেই হবে। পুত্রকলত্রের মুখের পাকায় বাঁচিয়ে যা বলো বোঝাতে পারলে তারা তা' করতে রাজি হোলেও হোতে পারে। তদুপরি সেই দু' মুঠি অন্নকে চার মুঠি করবার পন্থা বাৎলাতে পারলে তো কথাই নেই, সে নেতা তাদের কুলের ঠাকুর। এ পর্য্যন্ত কোন রাজনীতির নেতাই সে রকম ঔদরিক হিসাবের সুবিধাজনক রাস্তা দেখান নাই; আজও যাঁরা ঔদরিক পলিটিক্স দেশকে শেখাচ্ছেন তাঁরা পেটকাওয়াস্তে খাণ্ডবদাহের রাস্তারই ইঙ্গিত করছেন। আগে লাখে লাখে জুটে লঙ্কাদাহ ঘটাও, তারপর সাম্যবাদের রামরাজ্য আসবে। ঐ সব ডেঞ্জারাস্ লজিক মাস্ শুনবে কি?

* * *

এক মস্কোতেই মাত্র লঙ্কাকাণ্ড করে কিঞ্চিৎ সাম্য আসবো আসবো করছে, এখনও পুরাপুরি আসে নাই। ইউরোপের অন্যান্য দেশে সাম্যবাদ আসছে গুটি গুটি—বৈধ আন্দোলনের পথে, ইভলিউশনের রাস্তায়, পার্লামেণ্টের আস্তাকুড় ঘুরে; রিভলিউশনের ডাণ্ডায় নয়। একদিন ফ্রান্স এই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার জন্যে মাস্‌কে ক্ষেপিয়ে প্যারি নগরীর রাজপথ নরমুণ্ডে রক্তাক্ত করেছিল, কিন্তু সে পণ্ড শ্রমের অনুপাতে ফল হয়েছিল একেবারেই ফাঁকা। জগতের মানব সমাজে তারপর আজ অবধি যতটুকু সাম্য বা মুক্তি এসেছে তা' বৈধ রাজনীতির পথে শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কিস্তা করেই এসেছে। আহার নিদ্রা আদি ত্রয়ী জীব ধর্ম্মকে মেনে নিয়ে তবে আমাদের এজিটেশন, তবে উন্নতি। এই সুবুদ্ধি আমাদের একচক্ষু রাজনীতিতে কবে আসবে?

চাকুম-চুকুম

পঞ্চমুখ শৰ্ম্মা

'সাহানা'র কোমল রাগিনী করুণ সুরে বাজিয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ 'কষ্টি পাথর-এ' নব-পরিণীত প্রণয়ীযুগলের প্রেম লইয়া কষাকষি করা উচিৎ হয় নাই। 'সম্পাদকের বিবাহ সংখ্যা' ক্রমশঃ যদি 'পুত্রের জন্মোৎসব সংখ্যা' প্রসব করিয়া অদূর ভবিষ্যতে সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করিতেই চাহে—তাহাতে গাত্রদাহ উপস্থিত হইবার কারণ নাই। আমরা বরং 'সচিত্র গর্ভাধান সংখ্যা'র জন্যই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিব! আশা করি, ৰনিপুণ বিলাসী বিধুবাবুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে!

*

প্রেম দ্রব্যটি যে 'কষ্টি পাথর'-এ কষিবার জিনিষ নহে, 'বিষাণ'-এ তাহার নমুনা পাওয়া যাইতেছে। প্রেম একবার পাইয়া বসিলে শনৈঃ শনৈঃ গিরি, প্রাচীর, বৃক্ষ ইত্যাদি লঙ্ঘন করাইয়া ছাড়ে—এ তাবৎ এইরূপই ধারণা ছিল। কিন্তু উহার উত্তাপে যে নির্ব্বিকল্প সমাধিও আসিয়া যায়, তাহা জানা ছিল না। সহসা বিষাণ আসিয়া কর্ণকটাহে টগবগ করিয়া উঠিতেই মরমে আসিয়া বাহা পশিল—

তুমি যদ ভালবাস আমাকে
চাও আমাকে নিবিড় কোরে পেতে,—
আমি কিন্তু তা চাই না
আমি চাই থাকতে একটু দূরে—
যাতে প্রেম চিরজীবন রয়।"

আধুনিক যুগে এইরূপ নিষ্কাম প্রেম

দেখিয়া সত্যই আতঙ্ক হয়। দূরে থাকিয়া উহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পাকা হইতে পারে, কিন্তু আনুষঙ্গিকগুলির কি ব্যবস্থা হইবে? এই আশঙ্কায় প্রেমিক প্রশ্ন করিয়া বসিল,—"তা' কেমন করে হয়?" তথাপি প্রেমিকা গোঁ ছাড়িতে গররাজি হইলেন—

"উত্তরে আমি বলি শোন, দূরেও নয়, কাছেও নয়, একটু কাছে একটু তফাতে ধরেও যেন ধরা যায় না।"

এইরূপ নিরাকার প্রেম আজকাল কতটা চলিবে জানা নাই। তবে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'—লক্ষণটা ভাল! কারণ—'ওতে বিচ্ছেদ নাই।'

*

'দুন্দুভি' যেরূপ বাজিতেছে, ভয় হয়! তবু রক্ষা, যাহার 'সামনে ছত্রিশ' তাহারই আবার 'পিছনে ষোলো' রহিয়া গিয়াছে! অর্থাৎ—

"নারীটির বয়স যদিও মাত্র পঁচিশ বছর, কিন্তু সাম্‌না সাম্‌নি তা'র মুখের দিকে তাকালে বোধ হবে তিরিশের কোঠায় সে বহুদিন আগে পড়েছে, আবার পিছন দিক থেকে দেখলে বোধ হ'বে সে একটি ষোড়শী যুবতী।"

নারী-দেহের এইরূপ দশআনা-ছ'আনা বৈচিত্র্যে জীব আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিবে অথবা ব্যথায় সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে—জীবানন্দ তাহার কি নির্দ্দেশ দিবেন জানি না, তবে তাঁহার উপলব্ধি বেশ অম্লমধুর হইয়াছে!

উহার কিছু পূর্ব্বে জীবানন্দে তন্ময় হইয়া শ্রীমান বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত ভাই বুঝি নাকে কাঁদিয়াছেন—

"সামনের নদী-জলে তুফান ওঠে,
ছোট বড় লাখো মেয়ে হাসছে ঠোঁটে,
বাহিরের কোলাহলে ভিড়বো নাকি?"

ভিতরের আনন্দ ভরপুর থাকিতে 'বাহিরের কোলাহলে' ভিড়িয়া কি লাভ? 'সামনের নদী-জলে' যখন তুফান উঠিয়াছে, তখন 'ছত্রিশ' ছাড়িয়া 'ষোলো'র উপর নির্ভর না করিয়া উপায় নাই। উহাই পথ!

*

বাস্তবের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া নায়িকার মধ্যে যে বিভীষিকা অহরহ বাজ হানিয়া যাইতেছে, 'ভারতবর্ষ'র মধ্যে 'অপত্য-স্নেহ'র লেখকও তাহার আবর্ত্তন বিবর্ত্তনে খেই হারাইয়া গিয়াছেন। হতাশ হইয়া বলিতেছেন—

"এমন করে চলে অভিশপ্ত জীবন। এ যেন একটা খেলা, শুধু মূল্যহীন খেলা মাত্র। নেই তার উদ্দেশ্য, নেই কোন আদি, অন্ত, নেই কোন ভিত্তি। হয়তো স্বপনের ঘোরে অলীক কল্পনার বিভীষিকা। করুণাময়, দয়াময়, সর্ব্ব মঙ্গলময় দেবতাকে চিনি নে, বুঝিও না, অবশ্য চেষ্টাও করি নে। বুঝিনে দার্শনিক তত্ত্ব। লোকের রচিত দর্শনতত্ত্ব শুনলে মনে হয় শুধু তোষামোদ, শুধু নিরুপায়ের আত্মবঞ্চনাময় হতাশ সান্ত্বনা। হয়তো আমার ভুল, ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার দোষ।"

কিছুই যখন বুঝিবার মত অবস্থা এখনো আসে নাই, মিছেমিছি মাসিক পত্রিকার পাতা ভরিয়া তামাসা করিবার সখ কেন? এরূপ অবস্থায় 'মঙ্গলময় দেবতাকে' চিনিয়া, বুঝিয়া বা ইত্যাদির চেষ্টা মাত্রও না করিয়া, বরং বাস্তবের লেজ ধরিয়া টানাটানি করিলে অধিক মঙ্গল হইত। দুধটি মরিয়া ক্রমে যখন ক্ষীরটি হইয়া আসিত, তখন গজাবতীকেও কেহ ভুল করিত না, সঙ্গে সঙ্গে অবুঝ অবস্থাও বুঝদার হইয়া উঠিত! এবং—

"অসীম বাস্তবতার মাঝে অতি সূক্ষ্ম দর্শনের রেখাপাত করা—কি করুণাময়ের দয়াবশতঃ সান্ত্বনা দেওয়া—না পথ পরিষ্কার রাখার ধূর্ত্ত চাতুরী?"—

ইহাও একে একে জলের মত পরিষ্কার হইয়া আসিত। মজুমদার মহাশয়ের কলমে দার্শনিক তত্ত্ব সুপ্রকট হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে!

*

কোনো এক মাসিকের সংস্রবে থাকিবার সময় একজন নূতন 'তারাশঙ্কর' লইয়া বিপদে পড়িয়াছিলাম। ইঁহার লেখা উক্ত কাগজে ছাপা হইলে, মূল তারাশঙ্কর আসিয়া অনুযোগ করিয়াছিলেন। অবশেষে 'শনিবারের চিঠি'কে তাহার জন্য আসরে নামিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, বর্ত্তমানে আবার ঐরূপ এক সমস্যায় পড়িয়া গিয়া বিশেষ তালাগোল পাকাইয়া গিয়াছি। 'দস্যু'—আশুতোষ সান্যাল এবং 'পল্লব'—আশুতোষ সান্যাল—দু'জনে যুগপৎ হাজির হইয়াছেন। একজন 'মিনার্ভা'র সখীসম্প্রদায়কে সজাগ ও দর্শকগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছেন, অপরজন কবিতার পল্লব বিস্তার করিয়া বিভিন্ন মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজে গুলজার হইয়া পাঠক সাধারণের হৃদয়ে ভাসিয়া উঠিয়াছেন। কবি আশুতোষ অগত্যা নামের পিছনে (এম-এ) য়ুনিভার্সিটীর লেজ জুড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। লজ্জাদাহনে লেজের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হউক, অতঃপর ইহাই কামনা করিব।

*

আষাঢ়ে 'প্রবর্ত্তক'-এ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনূদিত ডক্টর সত্য নারায়ণের আবিসিনীয়ার অভিজ্ঞতা প্রথম প্রকাশিত হইবার পর বিভিন্ন কাগজে তাহার ঢেউ ছুটিয়া চলিয়াছে। উহাতে 'দানের মূল্য' অবশ্যই বাড়িয়াছে। আত্মদান বা বলিদানের উদ্রূপ ঔদার্য্য সাহিত্যক্ষেত্রে বিরল নহে। অতএব তাহার মূল্য যথাযোগ্যভাবে বাড়িতে দেখিলে আনন্দই হয়। অল্পদিনের মধ্যেই ইনি যে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদিতে পাকিয়া উঠিতেছেন, উড্ডীয়মান সাহিত্যিকের পক্ষে ইহা আশার কথা!

এই জন্যই শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের 'মার্গট' দেখিয়াও বিশেষ প্রীত হইলাম। অবিলম্বে 'মর্কট' দেখিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিলাম। জানিনা কত দিনে তাহা সম্ভব হইবে!

*

'মোহাম্মদী'র 'বেঃ আঃ পাঃ' যাহা বলিয়াছেন—এইরূপ বলিবার মত বলিতে ইতিপূর্ব্বে আর কাহাকেও দেখিয়াছি কিনা, মনে নাই। 'হিন্দুদের ব্যক্তিগত দানের দ্বারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে।"—একজন ব্রাদারের নিকট হইতে এইরূপ অর্ব্বাচীন উক্তি লেখক যে সহ্য করেন নাই, ইহাতে তাঁহার সত্যের জন্য বেপরোয়া ভাব সত্য সত্যই সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য! এবং এই সত্যানুরাগ বশতঃ ইনি নির্ভীকভাবে যে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে যদি সত্যসত্যই লিখিয়া থাকেন—

"বলা বাহুল্য, বাঙ্গলার নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মুসলমানদের নানাভাবে শোষণ করিয়াই হিন্দুদানশীলদের ভাণ্ডার অনেকখানি স্ফীত হইয়াছিল। সুতরাং প্রত্যক্ষ ভাবে সেই অর্থসম্ভার হিন্দুধনীদের দ্বারা দেওয়া হইয়া থাকিলেও পরোক্ষ ভাবে তাহার অনেকখানি মুসলমানেরই দান।"—

তবে তাহা সাহিত্য হইয়াছে। কারণ সাহিত্যে সঙ্কীর্ণতার ঠাঁই নাই! প্রমাণ—নরনারীর আসঙ্গলিপ্সা যদি নবাগত অতিথির আগমনের হেতু হইয়া থাকে, তাহার জন্য যুবক-যুবতীর চেয়ে বালক-বালিকাই বেশি কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে, কারণ যুবক যুবতীই একদিন বালক-বালিকা ছিল। অতএব নবাগত অতিথির মূলই হইল খোকাবাবু। এই জন্যই বুঝি 'বংশ হইতে কঞ্চি দড়' হইয়া থাকে?

*

আবুল আদবের গবেষণা দেখিয়া বেশ রসোপলব্ধি করা গেল। কিন্তু পরিমল বাবু ও 'শনিবারের চিঠি'র সৌভাগ্য দেখিয়া ঈর্ষা জাগিয়া উঠিতেছে। 'মোহাম্মদী' যে উঁহাদের অন্তোটা সুনজরে দেখিয়া ফেলিয়া বৃহত্তর ভারতে (বিশেষতঃ বৃহত্তর ইসলাম-ভারতে) পপুলার করিয়া তুলিবেন—তাহা ইতি পূর্ব্বে ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই। 'প' এবং 'য'-এর সুমধুর প্রয়োগে বাঙলা ভাষা সমৃদ্ধ হইল! সাহিত্যে মুসলমানগণ যথেষ্ট দান করিয়াছেন, এখনো করিতেছেন, ভবিষ্যতেও করিবেন, কিন্তু আদব সাহেবকে কেহ ছাড়াইয়া যাইতে যে পারিবেন না, কেন যেন এইরূপই মনে হইতেছে। হঠাৎ চাহিয়া দেখি, ঙ, ণ, ও য়—এই তিনটি অক্ষরের অর্থ সমাধান করিয়া কে চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। সবিস্ময়ে পড়িয়া দেখি—

"ঙ—ব্যাঙের ছাতা।
ণ—শাপুত্তেনীর নরুণ।
য়—য়ুনিভার্সিটী।

বুঝিলাম, বাঙলাভাষা তড়িৎ-গতিতে ভরিয়া জমাট বাঁধিয়া যাইতেছে। অবল্যভাষা উত্তরোত্তর সবলা হউক!

*

'বঙ্গশ্রী'র অঙ্ক হইতে স্নেহের দুলাল 'বিজয়রত্ন' অতঃপর কোন্ রত্নগর্ভার শরণ লইয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলাম। যে রেণুর দুঃখে ফাটিয়া পড়িয়া তিনি 'বোস মহাশয়'-এর নিকট রচিত পেটেন্ট ধরাইয়া দিলেন, তাহাতে যে 'রেণু'ই 'পুনর্লাভ' করিল, আর কেহ করিল না—এমন কথা হলপ করিয়া বলা যায় কৈ? উক্ত গল্পে (?) বিজয়রত্ন যেরূপ চরিত্র-চিত্রণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন, বাঙলা-সাহিত্যে অবশ্য তাহা অমর হইয়া থাকিবে!

পাঁচ মিশালী

আবার বিপ্লববাদ

পুলিশ চট্টগ্রামে আবার বিপ্লববাদীদের সন্ধান পাইয়াছে, তাহা লইয়া এখন আবার আলোচনা চলিতেছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই আবিষ্কারের বার্ত্তা সহযোগী ষ্টেটসম্যানই পাইয়াছেন। সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিকারেরই বা কি ব্যবস্থা করা হইতেছে? এদিকে ত' পুলিশের অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে করিতে আমাদের প্রাণান্ত হইতে হইতেছে। তাহাতেও যদি পুলিশ পূর্ব্বাহ্নে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের সংবাদ সংগ্রহ করিতে না পারে তবে তাহা কি পুলিশের বিশেষ যোগ্যতার পরিচায়ক হইবে! আমাদের যতদূর মনে পড়ে, তাহাতে চট্টগ্রামেই বাংলার বর্ত্তমান গভর্ণর বলিয়াছিলেন, বেকার সমস্যার সহিত সন্ত্রাসবাদ সমস্যার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। তখন অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, তিনি যখন রোগের মূল ধরিতে পারিয়াছেন, তখন রোগের চিকিৎসা যেমনই কেন হউক না, রোগের মূল উৎপাটনের জন্ম তিনি ব্যবস্থা করিবেন। একান্ত পরিতাপের বিষয়, ৫ বৎসরেও বাংলার বেকার সমস্যা সম্বন্ধে সামাধানের একটা ব্যবস্থা হইল না! গভর্ণর যে কয় মাসের কার্য্যকাল বৃদ্ধি সম্ভোগ করিবেন, তাহার মধ্যে এ বিষয়ে তিনি অগ্রসর হইতে পারিবেন কি?

—

পেট্রল প্রতিযোগীতা

পেট্রোল লইয়া প্রতিযোগিতার কথা আমরা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। আমরা শুনিতেছি, বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী কলিকাতাতেও পেট্রোলের মূল্য কমাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। যদি তাহা হয়, তবে যে আমাদের পক্ষে বোম্বাইওয়ালাদিগের মারফতে রুশিয়া বা রুমানিয়ার পেট্রোল কিনিবার কোন প্রলোভন থাকিবে না, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। বার্ম্মা অয়েল কোম্পানী ভারত সরকারকে বৎসরে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা সেলামী হিসাবে দিয়া থাকেন। রুশিয়া বা রুমানিয়ার তেল আসিলে সরকারের এই আয় কমিয়া যাইবে। যে সময় নানা বাবদে সরকারের টাকার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী, সেই সময় এই আয় কমিয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। কেন না, আমরা দেখিয়া আসিতেছি, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা বাবদে যে ব্যয় সরকার করিয়া থাকেন, তাহা হ্রাস করা হয় না। হ্রাস হয় কেবল, জাতি গঠন বিভাগগুলির বরাদ্দ টাকার। কিন্তু এই ৪০ লক্ষ টাকার কথাই বড় কথা নহে। বড় কথা এই যে, এদেশে তেল থাকিতে আমরা কেন পেট্রল সম্বন্ধে অন্য দেশের উপর নির্ভর করিব? বরং যাহাতে এ দেশে উৎপন্ন তেলের পরিমাণ বাড়ানো যায়, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এক আমেরিকা পৃথিবীর পেট্রোলের শতকরা ৬৬ ভাগ উৎপন্ন করে। আর ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়, মাত্র ছয় ভাগ। কিন্তু এই ছয়ভাগকে বাড়াইয়া ১০ হইতে ১৬ ভাগ করা আদৌ কষ্টসাধ্য নয়। তাহা হইলে হয়তো আমরা এদেশে সমস্ত আবশ্যক তেল সরবরাহ করিয়া বিদেশেও পেট্রল রপ্তানি করিতে পারিব।

—

হিন্দুদের আবেদন

বাংলার হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কে এক আবেদন ভারত সচিবের বরাবর প্রেরিত হইতেছে। ইহাতে যে কোন ফল হইবে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। কিন্তু ইহাতেই 'ষ্টার অব ইণ্ডিয়া' একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু তদপেক্ষা ষ্টেটসম্যানের আক্ষেপ ও আশঙ্কাই বিশেষ উপভোগ্য। বাংলার হিন্দুদের বিশ্বাস (আর সেই বিশ্বাস, প্রমাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত) যে তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া মারা হইতেছে। ষ্টেটসম্যানের মন্তব্য এই যে, তবুও যদি হিন্দুরা তাহাতে কোনরূপ আপত্তি করেন, তাহা সহ্য করা সঙ্গত হইবে না। এই অদ্ভুত মনোভাব, এদেশে এংলো ইণ্ডিয়ার মুখপত্রেই সাজে। এই আবেদন সম্বন্ধে আমাদের একটী কথা বলিবার আছে। দেখিতেছি, সর্ব্বজ্ঞ অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এই ব্যাপারেও অগ্রণী হইয়াছেন। আশা করি, এই সুযোগে তিনি বিলাতে যাইবেন না।

খেলার কথা

শ্রীসুধীর বসু

লীগের খেলা

এ বছরের লীগ খেলা শেষ হয়ে গেছে। এবারও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব লীগ-বিজয়ী হয়ে অতুল যশ অর্জ্জন করলেন। প্রথম ডিভিশনে উঠেই পর পর তিনবার লীগে সর্ব্বশীর্ষস্থান অধিকার করা যা তা ব্যাপার নয়। একমাত্র ডারহাম লাইট ইনফ্যান্ট্রি ব্যতীত আর কোন দলই উপর্যু্যপরি তিনবার লীগবিজয়ী হতে পারেন নি।

লীগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ব্লাকওয়াচ দল রাণার্স আপ্ হয়েছেন।

রিটার্ণ লীগে মোহনবাগানের সহিত ড্র করে ও ক্যালকাটার কাছে পরাজিত হয়ে তিনটী মূল্যবান পয়েন্ট হারিয়ে এরা এবার লীগবিজয়ী হতে পারলেন না।

তৃতীয়স্থান অধিকার করেছেন মোহন-বাগান ক্লাব। রিটার্ণ খেলায় তারা যে যোগ্যতা দেখিয়েছেন তাতে এ সম্মানের সম্পূর্ণ যোগ্য তারাই। তেমন নামজাদা খেলোয়াড় ছাড়া এরা বুট পায়ে জলে-কাদায় যে খেলা দেখিয়েছেন তার প্রশংসা করি প্রাণ খুলে।

ক্যালকাটা ও ই বি আর এবার ভাল রেজাল্টই করেছেন। আগাগোড়া বাইরের খেলোয়াড় নিয়ে কালীঘাট মন্দ ফল দেখান নি। সব চেয়ে প্রশংসার যোগ্য এরিয়ান। বাংলার খেলোয়াড়-দের নিয়েই তারা সুন্দর ফল করেছেন। রিটার্ণ লীগে সার্পকে প্রায় খেলতে দেখা যায় নি।

সব চেয়ে হতাশ করেছেন ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব। রিটার্ণ লীগে তারা অনবরত পরাজিত হয়ে বা ড্র করে যে ফল দেখিয়ে-ছেন তা ক্লাবের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা। ডালহৌসী ও পুলিশের ন্যায় নিকৃষ্ট দল দুটীর কাছে পর্য্যন্ত তারা পরাজিত হয়েছেন। বাইরের প্লেয়াররা যে আন্তরিকতার সহিত খেলেন না তার প্রমাণ রিটার্ণ লীগের ইষ্ট বেঙ্গলের খেলায় যেরূপ পাওয়া গেল তা মনে রাখবার মত। লক্ষ্মীনারায়ণ, মজিদ প্রভৃতির ন্যায় খ্যাতনামা খেলোয়াড়-রাও এই কদিনে অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর খেলা দেখিয়েছেন।

পুলিশ দলকে প্রথম ডিভিসনে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই নামতে হল। শেষের দিকের খেলায় তারা বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে-ছিলেন—বিশেষতঃ উইহার্লের মত গোলকিপারের সহায়তা যদি তারা প্রথম হতে পেতেন তাহলে তাদের হয়তঃ নামতে হত না। এটাচড সেকসন ২২টী খেলে মাত্র ৫টী পয়েন্ট লাভ করেছেন, এর চেয়ে ডিভন্সও যে ভাল ছিল।

দ্বিতীয় ডিভিশন হতে এবার ভবানী-পুর ক্লাব প্রথম ডিভিসনে উন্নীত হওয়ায় আমরা অতীব আনন্দ লাভ করেছি। কয়েকবছর যাবৎই তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছেন। সামান্য ২।১ পয়েন্টের জন্য প্রথম ডিভিসনে ওঠবার সুযোগ তারা একাধিকবার হারিয়ে এসেছেন, এবার তারা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় তাদের অভি-নন্দিত করছি।

রেঞ্জার্স ও বহুকাল চেষ্টা করে প্রথম ডিভিশনে উঠতে পারলেন না। এবার তারা দ্বিতীয় ডিভিশন লীগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে 'রাণার্স আপ' হয়েছেন।

একবছর মাত্র দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলেই ইটালী স্পোর্টিং ৭ম স্থান তৃতীয় ডিভিশনে নেমে গেলেন। এদের পূর্ব্বে রয়েছেন বহুবাজার ক্লাব, তাদের যেরূপ দুরবস্থা তাতে আগামী বছরে তাদের চান্সই বেশী নেমে যাবার।

হাওড়া ইউনিয়ন রিটার্ণ লীগে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা যদি প্রথম হতে দেখাতেন—অন্ততঃ প্রথম দিকে যদি তিনটী খেলায়ও জয়ী হতেন তাহলে তারা এবারই হয়তঃ পুনরায় প্রথম ডিভিশনে উন্নীত হতে পারতেন। লীগ সম্বন্ধে এবার এখানেই শেষ করা গেল। এখানে আরেকটী কথার উল্লেখ না করে পারলাম না—লীগের শেষ দিনে মোহনবাগান ও ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের রিটার্ণ গেম ছিল। ঐদিন মোহনবাগান প্রথম হতেই একটু ফাউল গেম খেলেন। আখড়ার কে দত্তকে হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে যে ভাবে গোল করতে চেয়েছিলেন তা নিন্দনীয়। তার চেয়েও ঢের বেশী নিন্দনীয় কাজ করেছেন মন্ম রায়চৌধুরী পদ্ম ব্যানার্জ্জীকে গোলমুখে ফাউল করে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে সোমেন দেব মজিদকে ফাউল করেন, মজিদ উদ্ধতভাবে তাকে বলেন—"এই কি খেলা হচ্ছে।" রেফারী সুশীল ঘোষ হস্তক্ষেপ করায় মজিদ সোমেনের দোষ দেখাতে চান, ফলে রেফারী তাকে সতর্ক করে দেন। তারপর হতে রীতিমত ফাউল গেম হতে থাকে, মজিদ বল ধরতেই চান না কারণ তার ওপর প্রেমলালের তাক্ থাকে। কিছুক্ষণ পরে প্রমোদ দাসগুপ্ত ও প্রেমলালের সহিত সংঘর্ষ হয়, প্রেমলাল প্রমোদকে মারতে যান। অতি সন্নিকটে রেফারী দাঁড়িয়ে ছিলেন, তবুও তিনি প্রেমলালের ফাউল দিলেন না বা তাকে সতর্ক করলেন না। খেলা শেষ হওয়ার পর এক বিশ্রি ব্যাপার ঘটে রেফারী মহাশয়কে পুলিশ সার্জ্জেণ্ট ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্ত্তারা ঘিরে তাদের টেণ্টে নিয়ে যাবার সময় হোম ক্লাবের কতকগুলি নীচ সদস্য বিশ্রি গালাগালি দ্বারা ভদ্রতার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখালেন। দুলাল এবং ক্লাবের অন্যান্য কয়েকজন হাত জোর করে তাদের এরূপ না করবার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু কে কার কথা শোনে! তারপর মোহন-বাগানের প্লেয়ারদের নিয়ে আসার সময় প্রেমলালকে বিশ্রিভাষায় গালিগালাজ করা হয়—প্রত্যুত্তরে মোহনবাগানের এই উদ্ধত খেলোয়াড়টী লাফ দিয়ে মেম্বরদের মারতে যান। ঐ দিনকার ক্যাপ্টেন সমথ দত্ত পর্য্যন্ত তাকে ধরে রাখতে পারেন না—ইষ্ট বেঙ্গলের কর্ত্তারা তো অপারগই হয়ে-ছিলেন। যা হোক করে পুলিশ এবং

উভয় দলের কর্তাদের সহযোগীতায় এ ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের কয়েকজন মেম্বার কি কাণ্ডই না করলেন! যারা তাদের সেদিনকার অতিথি তাদেরই একজনের প্রতি এ ব্যবহার হতে দেখে আমরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি। খেলার সময় যে যাই করুন না কেন, পরে তা নিয়ে এরূপ করা কি কোন ভদ্র ব্যক্তিই সমর্থন করতে পারেন? ঐ ক্লাবে এমন কতকগুলি মেম্বার আছেন যাদের ভদ্রলোকই বলা চলে না। ক্লাব কর্তৃপক্ষ যেন ভবিষ্যতে মেম্বার করবার সময় তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখেন।

চীনাদলের খেলা

গত ৪ঠা জুলাই চীনা দলের সহিত ভারতীয় দলের এক্জিবিসন ম্যাচ হয়ে গেছে। এই খেলায় যেরূপ জন সমাগম হয়েছিল তা ইতিঃপূর্ব্বে আর কোন দিন হয়েছিল কিনা তা আমাদের জানা নেই। সকাল ৯টা হতে মাঠে টিকিট সংগ্রহের জন্য জনতার সমাবেশ হয়। টিকিট গেটে বিক্রয় হয়েছে মাত্র ১৸০ ও নয় আনার, দুটাকা চার আনার টিকিট বহু পূর্ব্বেই বিক্রী হয়ে গেছিল। এই টিকিট সংগ্রহ করতে অনেককে ১৫ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করতে হয়েছে। সেদিন মাঠে যে দৃশ্য দেখা গেছে তা অভূতপূর্ব্ব। অনেকেই অর্দ্ধমৃত অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন। যারা ভেতরে প্রবেশ করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন তারা জলের যে কি অভাব তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। আই এফ, এর উচিৎ ছিল মাঠে রীতিমত জলের ব্যবস্থা করা। তাদের উপেক্ষা যে কতদূর শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছিল তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। মাঠ সেদিন সুন্দর ছিল—মিনিট দশেক তার- তীয় দল ভয়ে ভয়ে খেললেন, তার পরই তাদের কৃতিত্ব প্রকাশ পেতে লাগল। চীনারা বুঝে গেছেন এরা বড় সহজ প্লেয়ার নয়। সারা মাঠের খেলোয়াড়দের মধ্যে নুরমহাম্মদ অতুলনীয় খেলার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ছাড়া মন্মথ দত্ত, করুণা ভট্টাচার্য্য ও সুবোধ ব্যানার্জ্জী চমৎকার ক্রীড়া নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। দুটী বল সুবোধ যা আটকিয়েছেন তার তুলনা হয় না। ছনে মজুমদার, বিমল ও মাসুম মন্দ খেলেন নি, সেলিমও মন্দ নন—কিন্তু রহিম, আব্বাস ও আর কার কোন কিছুই করতে পারেন নি। কারের পরিবর্ত্তে যদি লক্ষ্মীনারায়ণ বা নন্দ রায়চৌধুরীকে নেওয়া হত তাহলে সেদিন ভারতীয় দল অবশ্যই জয়ী হয়ে অতুল যশ অর্জ্জন করতেন। যদি একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানকেই নেওয়া সাব্যস্ত হয়েছিল তাহলে রেজার্সের আর ল্যাম্পসডেনকে সেণ্টার ফরোয়ার্ডরূপে নিলেও ফল ভাল হত।

চীনাদলের খেলায় মাধুর্য্য আছে, প্রত্যেকটি খেলোয়াড় সুন্দর পাস্ করে খেলেন, তাদের পাস্ ওজন করে মাপা, চমৎকার তাদের খেলার ধরণ। দলের ক্যাপ্টেন লি ওয়াই টং সেণ্টার ফরোয়ার্ডরূপে যে অপূর্ব্ব খেলা দেখিয়েছেন তা কলিকাতার দর্শকগণ বহুকাল দেখেন নি। এইচ, এল, আইয়ের গ্রেজস্ ছাড়া এরূপ খেলোয়াড় দৃষ্ট হয় নি, অথচ উনি এ দলের নিয়মিত সেণ্টার ফরোয়ার্ড নন। চীনাদলের তরুণ গোলকীপার পকা লিং তার অদ্ভুত খেলায় সকলকেই চমৎকৃত করেছেন। চীনা দলের পক্ষে গোল করেন সান্ কম শান, আর ভারতীয় দলের পক্ষে পেনালটীতে নুরমহম্মদ গোল পরিশোধ করেন।

গত ৬ই জুলাই পুনরায় ঐ মাঠে চীনা দল সিভিল মিলিটারীর মিলিত দলের সহিত খেলেন। এই খেলায় চীনা দল ২-১ গোলে জয়ী হয়েছেন। এই দিন জল হওয়ার দরুণ মাঠের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না, তবু এরূপ খারাপ মাঠেও উভয়দলই ভাল খেলেছেন। এদিনে চীনা ক্যাপ্টেন লি ওয়াং টং পুনরায় চমৎকার ক্রীড়াকৌশলের পরিচয় দিলেন। গোলকীপার পাউ কা-পিংয়ের খেলা পুনরায় দর্শকদের চমৎকৃত করেছে। তিনি যদি এরূপ অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় না দিতেন তাহলে চীনাদল যে অন্ততঃ আরো দুটী গোল খেতেন তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। এবার সেণ্টার হাফরূপে লাং উইং বিউ উচ্চাঙ্গের খেলা দেখিয়েছেন, তার পাশের হাফ চান্ চেন্ উও তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে ভাল খেলেছেন।

অন্য দলের গোল কীপাররূপে আর্মষ্ট্রং চমৎকার খেলেছেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধে চীনা সেণ্টার ফরোয়ার্ডের দুটী বুলেটের ন্যায় চমৎকার সট আটকে দিয়ে তিনি অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন।

জি কার্ডের খেলাতেও আমরা মুগ্ধ হয়েছি। হাফে টার্নবুল উচ্চাঙ্গের খেলা খেলেছেন। অন্য হাফ টেলার ও উইলকিনসন, মন্দ খেলেন নি। ব্রাউটন প্রথমার্দ্ধে মন্দ নন, দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিশ্রি। রহিম একেবারে অচল, জুমাও তাই, তবে তিনি মাঝে মাঝে লম্বা কিক্‌গুয়া বল উড়িয়েছেন। সেণ্টার ফরোয়ার্ড ক্যাশ ভাল খেলেছেন এবং গোলটীও তিনিই দিয়েছেন। সেণ্টার হাফ পেষ্ট মন্দ খেলেন নি, নুরমহম্মদের তুলনায় অনেক খারাপ। রেফারিং ভাল হয়নি। কার্ডের কাউলের জন্য পেনালটী দেওয়া খুবই উচিৎ ছিল, অন্য সব না হলেও।

বন্ধু

[চিত্র]

শ্রীবীরেন দাশ

"—চা খেয়ে এসে পড়তে বসেচি অনেকক্ষণ। একঘণ্টায় ইকনমিক্সের বই-এর একপৃষ্ঠা মাত্র এগিয়েচি। আর তাও যান্ত্রিকভাবে, কি যে পড়লাম ভুলেও বলতে পারবো না। বলতে পারবো না, কারণ এখানে আজ আমার মন নেই—এই বিশুষ্ক নীরস সরু সরু কালো পোকার মত অক্ষরগুলো ছাড়িয়ে মন চলে গেছে অনেক দূরে—পশ্চাতে। এক এক সময়, কোনো কোনো মুহূর্ত্তে আমরা পিছনে ছুটে চলি, কেন বলতে পারো? তুমি, হয়ত বলবে, মানুষের যখন সমুখের পথ রুদ্ধ হয়—যখন নেই তার ভবিষ্যৎ নেই কোনো আশা—কোনো স্বপ্ন, সামনে শুধু বিশুষ্ক উত্তপ্ত মরুভূমি বা সীমাহীন উত্তাল সাগর, মানুষ তখনই ফুরিয়ে যায়। তখনই ফুরিয়ে যায় মানুষ, যখন কল্পনা তার নিঃশেষিত। কিন্তু না বন্ধু, স্বীকার করবো না তা আমি। কিছুতেই করবো না স্বীকার, এই ত আমার জীবনের প্রথম কৈশোর; তুমি কি বলতে চাও আমি ফুরিয়ে গেছি—নিঃশেষিত, জীর্ণ আমি এরি মধ্যে,এই এতটুক বছরের জীবনের মধ্যেই? না তা নয়। জীবনের উজ্জ্বলতম মুহূর্ত্তেও আমরা সহসা পেছনে ফিরে যাই, আর গত জীবনের কোনো কলসে-ওঠা অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তের স্মৃতি মনে করি আর একটা ব্যথা মিশ্রিত আনন্দ পাই। তুমি নেই আমার কাছে, এ অনুভূতি আমার কাছে কত সুখের এই মুহূর্ত্তে—অন্ততঃ এই মুহূর্ত্তে এতে আমি কি আনন্দটাই না পাচ্ছি। কোন্ ভোর থেকেই পিন্ পিন্ করে বৃষ্টি পড়া সুরু হয়েছে। সূর্য্য হয়ত আর উঠবে না। সূর্য্য উঠলে হয়ত এই স্যাঁৎসেঁতে ভিজে স্যাঁত স্যাঁতে অনুভূতি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতো, মন উঠতো চাঙ্গা হয়ে। পড়তেও পারতাম মনযোগ দিয়ে; কিন্তু আর আশা নেই দেখচি। না, পরীক্ষার মাত্র তিনদিন বাকী। যেমন করেই হোক পরীক্ষা পাশ করতে হবে আমাকে। কিন্তু পড়তে যে পারচি না। চেয়ারের উপর মাথা এলিয়ে গেচে। চোখ বই-এর পাতার উপর বার বার বিদ্রোহ করচে ঘোষণা। পথ জনবিরল।···বন্ধু, তোমার দেশে কি এখন বৃষ্টি হচ্চে। এমনি মেঘলা ভোরে, কাজকর্ম্ম বাদ দিয়ে বাতায়ন খুলে জনবিরল পথের দিকে চেয়ো একবার আর মনে করো একখানি কোমল গোলাপফুলের মত মুখ···যে ফুলটাকে একদিন তুলে নিতে হাত বাড়িয়েছিলে। কিন্তু আমার প্রেমকে যে আমি এমনি সীমাবদ্ধ করতে পারি না বন্ধু। আমি যে সাগরের ডাক শুনতে পাই—"

—কি পড়চো? সুজাতা অচলেশের পেছনে এসে দাঁড়ালে।

—চিঠি। মোলায়েম স্বরে বললে অচলেশ।

—কার?

—নমিতার।

আকস্মিক আষাঢ়ের মেঘ ঘন হয়ে নামলো সুজাতার মুখে। দেখে যে কেউ বলতে পারে, এখনি নামবে বৃষ্টি। কণ্ঠে অজস্র বিস্ময় এনে বললে সুজাতা, কে নমিতা? বলনি তো কোনো দিন? কে হয় সে আমাদের? কোথায় থাকে?

—বন্ধু। গম্ভীরস্বরে বললে অচলেশ। বাড়ী ওদের কলকাতায়।

—মানে? সুজাতা পাহাড় থেকে সমতূমিতে পড়ল। আর পরক্ষণেই ভীষণ যন্ত্রণা, উৎকট যন্ত্রণা ওর স্বরে মূর্ত্ত হয়ে উঠলো। বেজায় লেগেচে সুজাতার। বেচারা!

—পড়বে তুমি? অচলেশ চিঠিখানি এগিয়ে দিতে দিতে বললে, এই নাও।

—না, থাক। বললে সে স্বর যথাসম্ভব নির্লিপ্ত করে। কিন্তু চোখে মুখে তার ফেটে পড়চে অজস্র কৌতূহল। তাই অচলেশ আবার বললে, পড়ো। নিতান্ত, অনিচ্ছায়, এমনি ভাব দেখিয়ে সে চিঠিখানির উপর উদাস দৃষ্টি বুলাতে লাগল। আর একটু পড়তে না পড়তেই তার চোখ হয়ে উঠলো হিংস্র—চিঠিখানা টেবিলের উপর থেকে ছুড়ে, সে গেল ঘর বেরিয়ে—প্রায় দৌড়ে।

অচলেশ হাসি চেপে করলে তার অনুসরণ।···সুজাতা বিছানায় পড়ে আছে উপুড় হয়ে মুখ গুজে। কাঁদচে বোধ হয়।

অচলেশ পাশে বসে, আস্তে তার মাথায় হাত রাখলে।

—সুজাতা—সু—উ—উ, প্রায় ক্ষমাভিক্ষার স্বরে বললে অচলেশ। আকস্মিক

ভেঙে পড়লো আকাশ—নদীতে ডাকলো বান। ডুকরে কাঁদচে সুজাতা। তার সুন্দর সুগোল বুক থেকে থেকে কেঁপে উঠচে।

—কেন কাঁদো সু ?

নিরুত্তর।

—আমার খুশী কাঁদবো। খেঁকিয়ে উঠলো সুজাতা, তুমি যাও।

—সু,

—তুমি যাও।

—আমি যাবো, হাঁা। তার আগে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক। রুক্ষস্বরে বললে অচলেশ, অবিশ্বাস করচো আমায় তুমি ?

সুজাতা উত্তর দেয় না।

—অবিশ্বাস করো, তাতে দুঃখ নেই, দীর্ঘশ্বাসের অভিনয় করে বললে অচলেশ, কিন্তু কিসের জন্তে শুনি ?…তাও শুনতে পাবো না ?…ভালো।

—তুমি আমায় ভালবাসো না ? কাঁদতে কাঁদতে সুজাতা বললে।

—যথা—

—যথা এই প্রেমপত্র। প্রায় চীৎকার করে উঠলো সুজাতা।

—প্রেমপত্র ?…আশ্চর্য্য। কিন্তু কোন যায়গাটায় প্রেম বলে দিতে পারো ?

শুধু কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সুজাতা। দেয় না কোনো উত্তর।

—ওদের বাড়ীতে থেকেই ম্যাটি্রিকে তিন বছর পড়লাম। ওদের থেকে কতখানি সাহায্য যে আমি পেয়েচি, ভুলবো না জীবনে।

—বেশ তো চলেই যাও না ওখানে। আমাকে আর কি প্রয়োজন।

—সু—

একটু চুপচাপ।

—জীবনে প্রেম আসে একবারই। যার তার সঙ্গে প্রেম হয় না। সঙ্কীর্ণ মানুষের জীবন তার চেয়েও ছোট যৌবন, সীমাবদ্ধ সংসার। ক'বার প্রেমে পড়তে পারে মানুষ। হ্যা, শুধু একবারই।

—সে তোমার বন্ধু।

—হ্যা বন্ধু, বন্ধুই তো। প্রেমিকা নয়—নয় প্রিয়া। শুধু বন্ধু। জীবনে অনেক মেয়ের সাথেই বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু ভালবাসি শুধু একবারই—একজনকেই।

সুজাতার কান্না থেমে আসচে।

—তাতেও তোমার আপত্তি আছে সু।

—না, আপত্তি আর কি। তোমাকে 'না' বলবার আমি কে। আমি তো তোমার বন্ধু নই।

—আশ্চর্য্য। মেয়ে বান্ধবীও হতে পারে, এটা কি তোমার ধারণায় আসে না সু ! কোনো মেয়ের সাথে কোনো ছেলের পরিচয় হলেই তোমরা ধরে নাও প্রেম হয়ে গেছে। কিন্তু 'প্রেম' বস্তুটা কি এমনই খেলো এমনই সুলভ,—ফিরিওয়ালার ঝুড়িতেও মিলে ?

সুজাতা কিছু বললে না। তার চারদিকে নীরবতার প্রাচীর খাড়া করে নিরাপদ হয়ে রইলো।

এখুনি যদি অচলেশ ওর মুখটা টানে, ও অচলেশের কোলে মুখ গুজবে;—একটা বড় গোলাপফুলের মত দুহাতে আলগোছে ধরে যদি ওর মাথাটা তুলে আর নিজের মুখটা নুইয়ে ওর রক্তিম গালের উপর পাতলা ঠোটের উপর, অচলেশের ঠোঁট ছুইয়ে দেয়, গালে গাল রাখে, চেপে ধরে মুখে মুখ তারপর আস্তে বুকে বুক;—খসে পড়ে ওর শিথিল বসনাঞ্চল, উদ্ঘাটিত হয়ে যায় সুজাতা জোছনা রাতের মত অচলেশের জ্যোতিতে; তবুও করবে না কোনো আপত্তি বরং হয়ে উঠবে উদ্ভাসিত, খুসীতে মগ্ন, প্রায় অবচেতন—হারিয়ে ফেলবে নিজের সত্তা।

কিন্তু থাক্। তার দরকার নেই। ওসব একঘেয়েমি অচলেশের আর ভালো লাগে না।
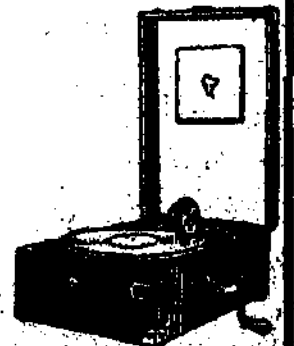
বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সমাচার

সাহিত্যের দ্বারা সমসাময়িক মানুষ গঠন

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সুধী সহকারিতা প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে বুডাপেষ্ট নগরে সম্প্রতি মননশীলদিগের একটী সভা হইয়াছে। তাহাতে আলোচনার বিষয়, সাহিত্যের দ্বারা সম সাময়িক মানুষকে গড়িয়া তুলিতে পারা যায় কিনা। গত দু'এক বছর ধরিয়া পৃথিবীর কয়েকটী প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক এবং রূপদক্ষের সাহায্যে যে সমস্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে বর্ত্তমান আলোচনা তাহারই অনুবৃত্তি। ফ্রাঙ্কফার্ট ম্যাডরিড, নাইস্, ভিনিস্ এবং প্যারিস সহরে পূর্ব্বের আলোচনাগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের মধ্যে নৈতিক একতা সৃষ্টি করাই এই আলোচনাগুলির উদ্দেশ্য। কেন না, মননশীলদিগের ধারণা, সর্ব্বত্র মনের নৈতিক একতা না থাকিলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে শুধু আইন গঠিত চুক্তি কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। তাই রাষ্ট্রসঙ্ঘকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে প্রয়োজন মনের সহযোগিতা বা যাহাকে প্রসিদ্ধ মনীষী পল্ ভ্যালেরী বলিয়াছেন আধ্যাত্মিক সহযোগিতা, তাহার সাধন করা।

সভার প্রারম্ভে মিঃ পল্ ভ্যালেরী বর্ত্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং সেই সঙ্গে মানব ধর্ম্ম কাহাকে বলে ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর সুধীবৃন্দকে আলোচনায় যোগদান করিতে অনুরোধ করিয়া তিনি বলেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘ একটী বিশেষ উদ্দেশ্যের অনুসরণ করিতেছে। যে সমস্ত লোকের সার্ব্বজনীন বিবেককে নিদ্রিত করিবার ক্ষমতা আছে—পৃথিবীর এই বর্ত্তমান সঙ্কটে যাঁহারা মানুষের মনে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সম্প্রীতি জাগাইয়া তুলিতে সক্ষম, রাষ্ট্রসঙ্ঘ সেই সমস্ত মননশীলকে সম্মিলিত করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছে। একঘেয়ে একতার দরুণ যে মনের মিল রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে না, কারণ, তাহার কোনই প্রয়োজন নাই। পল্ ভ্যালেরীর মতে, স্থান, কাল ও পাত্র হিসাবে মানুষের মনের ধারণা বিভিন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। জীবনে বৈষম্য থাকাই স্বাভাবিক ও প্রয়োজন। কিন্তু বিভিন্ন ধারা যাহাতে বাধা না পায় এবং যাহাতে তাহার আদান প্রদান বন্ধ না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য চাই মনের সহযোগিতা। যাঁহারা চিন্তার সৃষ্টি করেন, কল্পনাকে মিলিত করিয়া রূপদান করেন—যাঁহারা নূতন তথ্যের আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করেন, মনের সহযোগিতার দ্বারা তাঁহাদিগকে অবশ্যই একত্রিত করিতে হইবে চিন্তার উন্মুখ আদান প্রদানকেই বলে মনের সহযোগিতা।

মনীষী পল্ ভ্যালেরী আরও বলেন, বর্ত্তমান যুগে যন্ত্রের উন্নতি মানুষের মন ও আত্মাকে ছায়াচ্ছন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ সভ্যতার গতি কি হইবে, ইহা নিয়া সর্ব্বত্র উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে মনের আদান প্রদানের উপরই জোর দিতে হইবে—একনিষ্ঠভাবে মনের বিনিময় গড়িয়া তুলিতে হইবে।

সার রিচার্ড লিভিং ষ্টোন, অক্সফোর্ডে করপাস্ ক্রিস্টী কলেজের অধ্যক্ষ; অধ্যাপক ভিগো ব্রন্ডাল, কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের অধ্যাপক; সঙ্গীত-বিশারদ বেলা বার্টক; প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মিঃ টমাস মান, মুস্তিয়ে সাল্ভেডর মাডারিয়াগা প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষীগণ এই আলোচনায় যোগ দিয়াছেন।

আবার দেখা

(গল্প)

শ্রীমনসা চট্টোপাধ্যায়

না, অসহ্য—সত্যিই অসহ্য। এই উত্তপ্ত, বিষাক্ত হাওয়ায় নিঃশ্বাস যেন আটকে আসে। প্রাণ ওঠে অস্থির হ'য়ে। এতো গরম, যতদূর আমার মনে হয়, দশ বছরের ভেতরও এতো গরম পড়েনি কোনদিন কোলকাতায়। সময়ে মেঘের কালিমা জমে ওঠে আকাশে। হয়তো আকাশটা ফুটো হ'য়ে এক ঝলক জল গড়িয়ে আসবে পৃথিবীর বুকে। শান্ত, শীতল স্বচ্ছ জলের ধারা। কিন্তু ব্যর্থতা আর ব্যর্থতা। আকাশ ফুটো হয়ে জল পড়বার মতো কোন লক্ষণই আর দেখা যায় না। পাৎলা মেঘের টুকরোগুলো ছড়িয়ে যায়, হারিয়ে যায় বাতাসের চঞ্চলতায় ঢেউ-এ। তারপর আবার অসহ্য গরম আর ক্লান্তি। রোজই সন্ধ্যার অস্পষ্ট অন্ধকারে পার্কের নির্জ্জনতায় নিজকে ডুবিয়ে রেখে, সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন, আমর্জ্জিত রেখে, কান্তিশ ভাবে : আর হপ্তাখানেক কাটিয়েই সে বেড়িয়ে পড়বে কোলকাতা থেকে। হয়তো আজকেই সে যেতে পারতো, যদি পাবলিশারের কাছে একবার উপন্যাসটা পছিয়ে দিতে পারত। আসছে সোমবার নাগাদ এর একটা সুরাহা সে কোরবেই। তারপর—তারপর আর কে পায় তাকে। সটান বেরিয়ে যাবে মাদারিপুরের দিকে। সেখানে একটু কাজও আবার আছে কান্তিশের।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এক সপ্তাহ আর অধীর প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন গুণে' তাকে কাটাতে হ'লো না। একদিন তার বাড়ী এসেই পঞ্চাশটা টাকা হাতে গুজে দিয়ে পাবলিশার তার উপন্যাসটা নিয়ে গেল। কান্তিশের মনে আর আনন্দ ধরে না। অফুরন্ত আনন্দের স্রোত যেন উথলে পড়তে লাগল তার সারা গা' বেয়ে। তার পরদিনই বৃথা আর সময় নষ্ট না করে ঠিক তার পরদিনই কান্তিশ তিনটা চোয়াল্প মিনিটে খুলনা একস্প্রেশে চেপে বসলো। গাড়ী ছাড়তেই তার মনে হ'লো—ইস্, মীনার চিঠিখানা, যা সে একবারো পড়েনি। ভেবেছিল গাড়ীতে গিয়েই হয়তো পড়বে। আর অপর্য্যাপ্ত সময়ও পাওয়া যাবে গাড়ীতে। সত্যিই গাড়ী যদি না-ছাড়ত, সে ফিরে যেত বাসায়। নির্ব্বিবাদে, অনায়াসে সে ফিরে যেত। মীনার চিঠিখানা! মীনার চিঠিখানা! হয়তো কতো কথাই মীনা লিখেছে। সেতো আর জানতো না যে কান্তিশ তার চিঠিখানা ভুলে বাসায় রেখে, প্রায় দীর্ঘ পনের দিনের জন্ত কোলকাতার বাইরে চলেছে। মীনা আশা করে কতো সুন্দর করে উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগে পূর্ণ করে, না-জানি কত কথা লিখেছে। হয়তো গ্রীষ্মের ছুটিতে যাবার জন্ত কত অনুরোধ করে লিখেছে। অনেক, অনেক কিছু লিখেছে আরো : তোমাকে রোজই রাত্রে স্বপ্নে দেখি। তারপর মনটা ভয়ানক চঞ্চল হ'য়ে ওঠে তোমাকে দেখবার জন্ত। এই গ্রীষ্মের ছুটিতেই একবার এসো কিন্তু। আসবে তো? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কান্তিশের চোখে জড়িয়ে গেল তন্দ্রার এক পোঁচ সুন্দর এ্যানামিল। চলন্ত গাড়ীর জানলা দিয়ে যে বাতাস গড়িয়ে এসেছিল তারি স্পর্শে কান্তিশের ভেতর এসেছে অবচেতনার মূঢ়তা। আর শুধু কান্তিশ নয় আসে পাশের গাড়ীতে অনেক আরোহীই ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা দু'টো করে' স্টেশন পেরিয়ে গাড়ী কখন এসে বনগাঁ ধরেছে সে খবরও কান্তিশ জানলে না। মিনিট দশেক গাড়ী সেখানে ধরার পর ছাড়বার জন্ত আবার ঘণ্টা পড়তেই কান্তিশ লাফিয়ে উঠলো। চেয়ে দেখলে ছোট কামরাখানায় শুধু সে-ই। আর

যারা ছিল সবই নেবে গ্যাছে। গাড়ী চল্লো। ঠিক এমনি সময় একটী মেয়ে এসে লাফিয়ে উঠলো সেখানে। কাজিশ যেন চমকে উঠলো, দস্তরমতো ঘাবড়ে গেল। কোন কথাই যেন বেরুল না তার মুখ দিয়ে। অপলকে শুধু চেয়ে রইল মেয়েটার চোখের দিকে। অনেকক্ষণ কাটলো। জানলার দিকে মুখ করে, বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা। এই গাড়ীতে উঠেই যেন সে ভুল করেছে এই ভাব। আস্তে বালিশের তলা থেকে একটা খাতা বা'র করে, কাল রাত্রে যে কবিতাটা সে লিখেছে আপ্রাণ চেষ্টা করে, রীতিমতো মরিয়া হ'য়ে, কয়েকবার অস্পষ্ট উচ্চারণ করে, মনে মনে পড়লে কাজিশ:

চির লজ্জ দীনতারে ব্যঙ্গ করি
কে আমারে ঘৃণা করে—
কাহার সন্দেহ দৃষ্টি বার্তায় উঁকি দেয়
মোর বাতায়নে!
আর কিছু দেখিবনা, আর কিছু শুনিব না
বলে যাক যার যাহা খুশী।
আজ আমি সগৌরবে দাঁড়ায়েছি
মোর চির বাঞ্ছিতার হাতে হাত রাখি
আর—আর মুখোমুখী।
হে ঈশ্বর মোরে তুমি কর আশীর্বাদ
জীবনের যাত্রা পথে লভি যেন তোমার
প্রসাদ।

হঠাৎ অস্ফুট স্বরে মেয়েটী জিগগেস কোরলে: দেখুন, আপনি কোথায় নামবেন?

কাজিশের বুকটা একবার কেঁপে উঠলো। ঐ কণ্ঠস্বর যেন তার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এলো অতীতের কোন বিস্মৃত অধ্যায়। অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে কাজিশ বল্লে: মাদারিপুর যাচ্ছি আমি।'

—'মাদারিপুর!' সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটীও বলে উঠলো।

—হাঁ৷ মাদারিপুর। আর আপনি?

—(মেয়েটী একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে) একটু থেমে,—আমিও ওইদিকেই যাব।

আবার ঘুরে বসলো সে বাইরের দিকে মুখ করে'।

—আচ্ছা, বল্লে কাজিশ, কিছু মনে করবেন না। আপনাকে যেন চেনা চেনা লাগছে। এর আগে কোথাও দেখেছি বলে যেন মনে হচ্ছে।'

ফেনার মতো টুকরো টুকরো হ'য়ে ভেঙে পড়লো মেয়েটী। উচ্ছ্বসিত আবেগে চিৎকার করে' উঠলো:

'কাজিদা' আমায় চিনতে পারেন নি! আজ আপনি কেন, জগতের কেউ হয়তো আমাকে চিনতে পারবে না।'

কাজিশ আরো বিস্মিত হ'লো। অনায়াসে মেয়েটী তাকে কাজিশদা বলে ডাকলে কিন্তু, আশ্চর্য্য সে এখনো চিনতে পারলে না তাকে:

—'ওকি অমন করে' চেয়ে আছেন যে, আবার বল্লে মেয়েটী, আমায় বুঝি চিনতে পারেন নি!'

—'না ঠিক চিনে উঠতে পারিনি এখনো।'

—রোচনাকে মনে পড়ে আপনার।

—রুচি, রুচি তোর এই চেহারা! অনেকখানি বদলে গেছিস যে।

রোচনা চুপ করে' রইল। কোন কথাই বল্লে না।

—'মনে পড়ে' আবার বলতে লাগল কাজিশ, ছোট বেলাকার কথা। এক সঙ্গেই দু'জনে বড় হয়েছিলুম। জ্যৈষ্ঠের সকালে আম কুড়োবার সে কী সমারোহ, সত্যিই অতীত চিরকালই মধুর। সে সব দিন আর ফিরে আসবেনা, তার স্মৃতি কেন ব্যথা দেয় বুকে। (একটু থেমে) আচ্ছা এখন এমনি অবস্থায় কোথায় যাচ্ছিস তুই?

—কোথায় যে যাব তা' এখনো ঠিক বলতে পারিনে।

—কোথাকার টিকিট করেছিস্?

—খুলনার।

—অনেকদিন পর আবার তোর সঙ্গে দেখা হ'লো। দশ বছর, না?

—তা' হবে হয়তো।

—যাক তোর স্বামী কোথায় আছে?

রোচনা নির্ব্বাক। তার চোখের আকাশে যেন জমে উঠলো এক খণ্ড কালো মেঘ।

—তুই কি তাঁর কাছেই বসবাস থাকিস?

—না।

—তা' হলে?

—নিজেই।

—আর তোর স্বামী?

—জানিনে।

—(খুব আশ্চর্য্যের সুরে) সে-কিরে?

—কী দুঃখের কাঠামোতে জীবন গড়ে' তুলেছি তা' যদি শুনতে কাজিশদা' (আর বলতে পারলে না রোচনা, কান্না'র সুরে ভরে এলো তার কণ্ঠস্বর।)

—ওখানে কী করে চলে তোর। শিক্ষয়িত্রীর জীবন ধরেছিস্ নাকি?

—সেতো আমার পক্ষে গৌরবের ছিল। তাও করি না।

—তবে?

—অবশ্যি আপনার সঙ্গে যখন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, দেখা হ'লো, কোন কথাই গোপন রাখবো না। শুনুন আমার কলঙ্কিত জীবনের ইতিহাস: আপনাকে না পাবার ব্যথা আমার জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। সেই ব্যথার বেদনায় অস্থির হয়ে সমাজ, সংস্কার আর সংসার ছেড়ে নির্ব্বাসিতার জীবন যাপন করছি। স্পষ্টই মনে পড়ে, মাত্র তিনদিন স্বামীর ঘর করেছিলুম। কিন্তু আপনার চিন্তা আমার বুকের রক্তে এতো ভীষণভাবে দামা দিতে লাগল যে পাগল হয়ে বেরিয়ে পড়লুম সেখান থেকে। সেই অবধি স্বামীর আর কোন খোঁজ রাখিনে।

—সেখান থেকে পালিয়ে কোথায় ছিলে?

—কোলকাতা, একটা পতিতার আশ্রয়ে।

—(হঠাৎ কাস্তিশের নখাগ্র পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলো) থাক থাক আর তোর বলতে হবে না। আমি বুঝেছি, স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি কী করে এখন তুই জীবন চালাচ্ছিস্। ইস্ ভাবতেও দুঃখ হয় রোচনা, শেষটায় বেছে নিলি পতিতার জীবন।

— কাস্তিশদা, কাস্তিশদা, দস্তুর মতো ফেটে পড়লো রোচনা, তা' হ'লে তুমিও আমায় ক্ষমা করতে পারলে না!

তখনও কাস্তিশ তাকিয়ে রইলে রোচনার দিকে। দৃষ্টি তার পাংশু, ঘোলাটে!

ইতিমধ্যে গাড়ী এসে থামলো দৌলতপুরে।

কোন্ পথে

শ্রীআশুতোষ সান্ন্যাল এম্, এ

কোন্ পথে যাব দরদী আমার,
কোন্ পথ লব কহ,
কোথা মিটিবে প্রাণের পিয়াসা—
যাতনা দুর্ব্বিবহ?
রক্ত-গোলাপসম মোর হিয়া,
বেদনার রাগে উঠে যে রাঙিয়া,
কবে গাবে পিক জীবন-কুঞ্জে
ফাগুন-বারতাবহ?

কোন্ পথে যাব দয়িত আমার—
আরো দূর? ওগো আরো!
অমৃত-উৎস কোথা উথলিছে
তুমি কি বলিতে পারো?
সঘন গগনে বিজুরীর সম,
মাঝে মাঝে করি' বিদূরিত তম,
হাতছানি দেয় কেবা কোথা থেকে
আশার নিশান কারও?

কোন্ পথে যাব বন্ধু আমার,—
আমি তো জানি না তাহা,
তবু—তবু ক্ষ্যাপা পবনের মত
জীবন করিছে হা হা!
আমি যেথা ভাবি সলিল শীতল—
সেথা মৃগতৃষা পেতে রাখে ছল,
চঞ্চল জল-বিম্বের মত—
মিলালো—ধরিনু যাহা।

মহিলা-মঙ্গল

স্ত্রী শিক্ষা সংস্কার

শ্রীনমিতা দেবী

আজকাল আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষার যে বহুল পরিমাণে উন্নতি সাধিত হইয়াছে ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। শুধু প্রগতিবাদী অভিভাবকেরাই নহেন প্রগতি বিরোধীরাও বোধ হয় অভ্রান্তভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, জাতির অর্দ্ধাঙ্গকে অজ্ঞতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিলে অপরার্দ্ধ কখনও জাতীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রেই পূর্ণাঙ্গরূপে সাফল্যলাভ করিতে পারে না। তাই আজকাল দেখা যায়, কেবল যে ইংরাজীনবিশ অভিভাবকেরাই পুত্রদিগের ন্যায় তাঁহাদের কন্যাদিগকেও স্কুল কলেজে বিদ্যার্জ্জন করিতে পাঠাইয়া থাকেন তাহা নহে, যাঁহারা স্কুল কলেজে স্ত্রী শিক্ষার নিন্দাবাদে পঞ্চমুখ তাঁহারাও স্ব স্ব কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন না। স্ত্রী শিক্ষার বহুল প্রচার হয় ইহা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমানে যে শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে আমাদের দেশের বালিকাদিগকে শিক্ষা দান করা হয় তাহাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বালিকাদিগের ভবিষ্যৎ ব্যবহারিক জীবনে সে শিক্ষা কোন প্রয়োজনেই লাগে না, ইহা বোধ হয় অবিসংবাদিতরূপেই বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের অভিভাবকেরা যে বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যর্থতা পদে পদে উপলব্ধি করিয়া আজও তাহার কোনরূপ সংস্কার সাধনে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট আছেন ইহা বস্তুতঃই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানে বালিকাদিগকে স্কুল কলেজে শিক্ষা দান করা হয় বটে, কিন্তু তাহাদের জন্য এ পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র কোন শিক্ষা-প্রণালী নির্দ্ধারিত হয় নাই। স্কুল কলেজে আমাদের দেশের ছাত্ররা যে প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে, বালিকাদিগকেও সেই প্রণালীতে শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে। তাঁহাদের যে স্বতন্ত্র কোনরূপ শিক্ষার প্রয়োজন আছে অভিভাবকেরা কিম্বা শিক্ষার্থিনী বালিকারা তাহা তলাইয়া দেখেন না। ইহার ফলে স্কুল কলেজে তাঁহারা যে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন বিবাহিত সংসার জীবনে সে শিক্ষা তাঁহার কোন প্রয়োজনেই লাগে না। অথচ এই শিক্ষা লাভ করিতে ছাত্রীদিগের যেমন সময় উদ্যম ও অধ্যবসায় ব্যয়িত হয়, বর্ত্তমানের ব্যয় বহুল শিক্ষাদান করিতে অভিভাবকদিগের অর্থ ব্যয়ও তাহা অপেক্ষা বড় কম হয় না।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে সব বালিকারা স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করে তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই যে মধ্যবিত্ত পরিবার ভুক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মধ্যবিত্ত পরিবারের শতকরা এই ৮০ জন বালিকা শিক্ষালাভ করিয়া জীবনের কর্মক্ষেত্রে আত্মোন্নয়নের সুযোগ পায় না। পাঠ্য জীবনের অবসানে তাঁহাদিগকে বিবাহিত সংসার জীবনেই প্রবেশ করিতে হয়। সে ক্ষেত্রে স্কুল কলেজের বর্ত্তমান অধীত বিদ্যা তাঁহাদের পক্ষে গুণের পরিবর্ত্তে দোষ হইয়া দাঁড়ায়। সংসার জীবনে যে সকল বিষয়ের শিক্ষা লাভ তাঁহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, স্কুল কলেজে সে শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা না থাকায় সংসারে বধূ, জননী ও গৃহিনী জীবনে তাঁহাদিগকে পদে পদে বিড়ম্বিত হইতে হয়।

অভিভাবকরা কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া যে তাঁহাদের কন্যাদিগকে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন এরূপ মনে হয় না। তবে তাঁহাদের একটা উদ্দেশ্য থাকে এই যে কন্যাকে আধুনিক শিক্ষা বা কিঞ্চিৎ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে পারিলে বিবাহের বাজারে বর-পণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের এ ধারণা যে ভ্রান্ত ভুক্তভোগী অভিভাবকদিগের নিশ্চয়ই তাহা অবিদিত নহে। কন্যাকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিলে বিবাহের বাজারে পাসপোর্ট লাভ সহজ-সাধ্য হইবে ভাবিয়া তাঁহারা যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনরূপ সহায়তা করে বলিয়া মনে হয় না। কারণ পাত্রী শিক্ষিতা হইলেও বরপক্ষ পণের দাবী করিতে বড় একটা পশ্চাৎপদ হন না। সে ক্ষেত্রে অভিভাবককে দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হয়। প্রথমতঃ ব্যয় বহুল উচ্চ শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ; দ্বিতীয়তঃ বিবাহের বাজারে বরপক্ষের দাবী মিটাইতে অভিভাবকদিগকে হয়ত ক্ষেত্র বিশেষে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল নহে।

আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা শিক্ষিতা পত্নীকেই অধিকতর পছন্দ করেন বলিয়া যে সব অভিভাবক তাঁহাদের কন্যাদিগকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যুবকদিগের মনের দাবী মিটাইবার চেষ্টা করিলেও শিক্ষিতা পত্নী পালনে তাঁহাদের আর্থিক সামর্থ্যের প্রতি বড় একটা দৃষ্টিপাত করেন না। বর্ত্তমানে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত যুবকদিগের যেরূপ আর্থিক অবস্থা তাহাতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বিলাসব্যসনাসক্ত বউকে তাঁহারা এখন বোঝা বলিয়াই মনে করেন। পত্নী শিক্ষিতা হওয়া বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সে শিক্ষা স্কুল কলেজের কেতাবী শিক্ষা নহে। সংসারকে সত্য-সত্যই সুখের আগার করিয়া তুলিতে হইলে, পতির প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইতে হইলে পুত্র কন্যার প্রতি জননীর কর্ত্তব্য এবং পরিজনদিগের প্রতি গৃহিণীর কর্ত্তব্য প্রতি-পালন করিতে হইলে যে শিক্ষার প্রয়োজন সেরূপ শিক্ষায় শিক্ষিতা করাই তাহাদিগকে আবশ্যক। আমাদের দেশের অভিভাবকেরা যে ইহা বুঝেন না তাহা নহে. তথাপি কেন যে আজও তাঁহারা স্ব স্ব কন্যাদিগের সংসার জীবনের উপযোগী শিক্ষা সংস্কারে উদাসীন আছেন তাহা আমাদের সহজ বুদ্ধির অগম্য। আমাদের দেশে ক্রমেই স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ বিস্তৃতিলাভ ঘটিতেছে তাহাতে গতানুগতিকতা পরিহার পূর্ব্বক কালবিলম্ব না করিয়া অচিরে স্ত্রীশিক্ষার সংস্কারে মনোনিবেশ করা অভিভাবকদিগের একান্ত কর্ত্তব্য।

এই স্ত্রীশিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে এস্থলে জার্ম্মানী এবং মধ্য ইউরোপের স্ত্রী শিক্ষা-প্রণালীর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। জার্ম্মানীতে বালিকাদিগকে সাধারণতঃ স্কুলের শিক্ষা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহার পর তাঁহারা সকলেই যে কলেজে পড়িতে যান এমন নহে। ছাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা বাস্তবিকই ভবিষ্যৎ জীবনে ডাক্তার ব্যাবহারাজীবি, অথবা শিক্ষয়িত্রীর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবন যাপনে ইচ্ছুক কেবলমাত্র তাঁহাদিগকেই উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কলেজে ভর্ত্তি করা হয়। অবশিষ্ট যে সব বালিকাকে সংসার জীবনে প্রবেশ করিয়া গৃহিণী ও জননীরূপে জীবন যাপন করিতে হইবে তাঁহারা দুই বৎসর-কাল তথাকার পারিবারিক শিক্ষালয়ে তদুপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। মধ্য ইউরোপের প্রত্যেক সহরেই বালিকা-দিগের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর এইরূপ বহু পারিবারিক বালিকা-বিদ্যালয় আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি সরকারী বিদ্যালয় এবং কতকগুলি বে-সরকারী বিদ্যালয়। স্কুলের শিক্ষা সমাপনান্তে বালিকাদিগকে এই

সকল বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হইয়া থাকে। এই পারিবারিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা বিধানের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ।

প্রথমতঃ বালিকাদিগকে সুগৃহিণী, দ্বিতীয়তঃ সুজননী এবং তৃতীয়তঃ নাগরিক জীবনের উপযোগী শিক্ষা দান করা। বালিকাগণ সংসার জীবনে প্রবেশ করিবার পর যাহাতে সুগৃহিণী হইতে পারেন সেইজন্য এই পারিবারিক বিদ্যালয়ে তাঁহাদিগকে হাতে কলমে সকল রকম কাজকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বাসস্থানের স্বাস্থ্যরক্ষা, গৃহ আসবাবে সুচারুরূপে গৃহসজ্জা, গৃহদ্বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রক্ষা, পারিবারিক উদ্যানের কার্য্য, রন্ধনপ্রণালী, শিশু ও পীড়িতদিগের উপযোগী খাদ্য নির্ব্বাচন এবং শিশু পালন ও রোগীর পরিচর্য্যা প্রভৃতি কিভাবে করিতে হয় এখানে হাতে কলমে বালিকারা তাহা শিক্ষা করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার এবং স্বামীকে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহে সহায়তা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে বয়ন, পোষাক পরিচ্ছদ তৈয়ারী, সূক্ষ্ম সূচী শিল্প, বস্ত্র ধৌত প্রণালী প্রভৃতি যাবতীয় গৃহকার্য্যগুলি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই ত গেল হাতে কলমে শিক্ষাদানের কথা। ইহা ছাড়া কি উপায়ে গৃহের স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায়, গৃহে কোনরূপ সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটিতে না পারে, কি উপায়ে স্বাস্থ্য রক্ষা করিলে ক্ষয়রোগ প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিগুলির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারা যায়, পতিপুত্র ও আপনার স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার জন্য কিভাবে পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য নির্ব্বাচন ও রন্ধন করিতে হয় এসকল বিষয়ও তাঁহারা যথারীতি শিক্ষা পাইয়া থাকে। উপরোক্ত বিষয়গুলি ব্যতীত মিতব্যয়িতা, অনাবশ্যক বিলাসব্যসন পরিহার, স্বল্পব্যয়ে পুষ্টিকর অথচ সহজ পাচ্য খাদ্যদ্রব্য রন্ধন প্রণালী এবং স্বহস্তে সংসারের দৈনন্দিন আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিবার কার্য্যেও বালিকারা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে।

সংসার জীবনের উপযোগী উপরোক্ত শিক্ষা ব্যতীত পতির মনোরমা ভার্য্যা হইবার নিমিত্ত বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্যগুলিও বালিকাদিগকে যথারীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সংসারে নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব মাতৃত্ব। এই মহীয়সী মাতৃত্বের গুরু দায়িত্ব প্রতিপালন ও গৌরব অর্জ্জনের জন্য বালিকাদিগকে শিশু পালন, শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগ পরিচর্য্যা, চিকিৎসা, এমন কি শিশু মৃত্যুর কারণ ও তাহা নিবারণের উপায়গুলি পর্য্যন্ত যত্ন সহকারে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সেই সঙ্গে পুত্র কন্যাদিগের উপযুক্ত শিক্ষা বিধান, তাহাদের নৈতিক চরিত্র গঠন, এবং স্বাস্থ্যরক্ষা, মিতব্যয়িতা, বিলাস ব্যসন পরিহার প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের উপযোগী শিক্ষাও তাঁহারা পাইয়া থাকে।

উপরোক্ত পরিবারিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ গুলিতেই একটী করিয়া শিশুপালন বিভাগ আছে। যে সব স্ত্রীলোকদিগকে দিবাভাগে খাটিয়া খাইতে হয়, তাহাদের দুই হইতে ছয় বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্র কন্যাদিগকে এই শিশুপালন বিভাগে রাখিবার ব্যবস্থা আছে। পারিবারিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে শিশুপালন ও পরিচর্য্যা সম্বন্ধে হাতে নাতে শিক্ষা দিবার জন্য এই সব শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হয়। এই উপায়ে পারিবারিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ মাতৃত্বের অধিকারিণী হইবার পূর্ব্বেই মাতৃ জীবনের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যগুলি শিক্ষা করিয়া থাকেন। সংসার জীবনে প্রবেশের পূর্ব্বেই মাতৃ জীবনের দায়িত্ব পালনে বালিকাদিগের এই লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলেই বর্ত্তমানে জার্ম্মাণী ও মধ্য ইউরোপে শিশু মৃত্যুর হার পূর্ব্বের তুলনায় আশাতীত ভাবে হ্রাস পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শিশু পালন ও পরিচর্য্যা ব্যতীত বালিকাদিগকে সাধারণভাবে রোগীর পরিচর্য্যা প্রণালীও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতেই পরিবারে কেহ রোগাক্রান্ত হইলে গৃহ স্বামীকে আর শুশ্রূষাকারিণী রাখিয়া অথবা ব্যয় বাহুল্যের দায়ে পড়িতে হয় না। এই শুশ্রূষাকার্য্যে পারদর্শিনী করিবার জন্যে বালিকাদিগকে বিভিন্ন রোগের লক্ষণ, ঔষধ ও পথ্য নির্ব্বাচন, চিকিৎসকদিগের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীর শুশ্রূষা, দেহের উত্তাপ গ্রহণ, রোগীর শয্যা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, প্রাথমিক শুশ্রূষা এবং ব্যাণ্ডেজ বাঁধা

প্রভৃতি বিষয়ে যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে।

শিশু পালন ও রোগীর পরিচর্য্যা ব্যতীত নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যেও বালিকাদিগকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা আছে। বিবাহিত জীবনে স্ত্রীলোকদিগকে কি ভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হয় এবং কোন প্রকার স্ত্রীরোগে আক্রান্ত হইলে কিভাবে তাহার সুচিকিৎসা করিতে হয় ও গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে কি প্রণালীতে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয়, পারিবারিক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ মহিলা চিকিৎসকগণ এসকল বিষয়েও বালিকাদিগকে যথানিয়মে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহার ফলে সংসারে গৃহিণীর নিত্য নূতন রোগের তাড়নায় গৃহস্বামীদিগকে আর বিব্রত হইয়া পড়িতে হয় না।

পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ব্যতীত বাহিরের জাতীয় ও সমাজ জীবনে নারীর যে অসংখ্য কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আছে সে সকল বিষয়েও বালিকাদিগকে আবশ্যকীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারিবারিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বিস্মৃত হন নাই। সংসার জীবনে স্বামীর সহকর্ম্মিনী রূপে তাঁহারা যেমন এখানে সংসারে দৈনন্দিন আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষা, মিতব্যয়িতা, সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা, ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী-গুলির নিয়ম কানুন প্রভৃতি শিক্ষা পাইয়া থাকেন, তেমনি সমাজ জীবনেও তাঁহা-দিগকে কালোপযোগী সামাজিক রীতি নীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এছাড়া দেশের শাসন প্রণালী আয় ব্যয় জাতির জন্ম মৃত্যু মহামারীর আক্রমণ, দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্প বাণিজ্যের অবস্থা, নাগরিক জীবনে নারীর অধিকার, এবং তাহা প্রয়োগ ও রক্ষার রীতিনীতি এবং নাগরিক জীবনের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

জার্ম্মাণী ও মধ্য ইউরোপ উপরোক্ত প্রণালী অনুযায়ী স্ত্রীশিক্ষার সংস্কার সাধন করিয়াছে পারিবারিক, নাগরিক, সামাজিক এবং জাতীয় জীবনে সে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়া সে দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আমাদের দেশের স্ত্রী শিক্ষা অনুরাগী অভিভাবকগণ যদি স্ত্রী শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া শিক্ষা সংস্কারে সম্পূর্ণ না হইলেও দেশ কাল ও পাত্রোপযোগী ভাবে পাশ্চা-ত্যের শিক্ষা প্রণালীর অনুসরণ করেন, তাহা হইলে বালিকাদিগকে শিক্ষাদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে এবং বালিকারাও সকল বিষয়েই প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করিয়া শুধু নিজেদের সংসার জীবনকেই সুখময় করিয়া তুলিতে নহে, সংসার সমাজ এবং জাতীয় জীবনের পুষ্টি ও কল্যাণ সাধনে যে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন ইহা বোধ হয় নিঃসংশয়েই বলা যাইতে পারে।

———
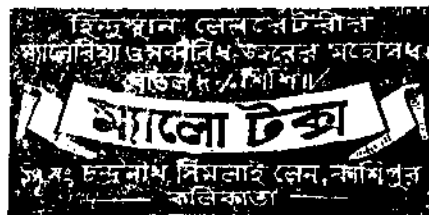
নাম জানা দুই বন্ধু মোরা

(বড় গল্প)

দিলীপ দাশগুপ্ত

মনসা চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

এক বিকেল বেলা। অরুন্ধতী তার পড়ার ঘরে বসে' একটা প্যাড আর পার্কার নিয়ে কি যেন লিখবে বলে' চিন্তা কোরতে কোরতে দস্তুরমতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একটা হাই ছেড়ে' বাইরের আকাশের দিকে একবার চাইতেই সে দেখতে পেলে আকাশ পরিষ্কার, আর টুকরো টুকরো সাদা মেঘের গুড়ো যেন ছুটে বেড়াচ্ছে সারা আকাশে। তারপর তার দরজায় একটা খুট করে' শব্দ হ'লো। সেদিকে তাকিয়েই সে দেখতে পেল মালঞ্চকে।

কি লিখছিলে অরু? জিগগেস করলে মালঞ্চ।

অরুন্ধতী রীতিমতো ঘাবড়ে গেল তার স্বরে।

(তার কাছে আরো ঘেসে দাঁড়িয়ে) সত্যি কি লিখছিলে অরু। আমায় দেখাও কি লিখছিলে। নিতান্তই জেদে পড়ে বল্লে মালঞ্চ।

কই, কিছুই তো লিখিনি। বল্লে অরুন্ধতী। দুর্ব্বল, ক্ষীণ তার স্বর।

দু'জনেই চুপচাপ। কাটলো কয়েকটা মুহূর্ত।

তোমাকে একটা কথা বলবো অরু, যে কথার সমুদ্র এতোদিন আমার বুকে ফেনিয়ে উঠেছিল। অন্ধকারের নিস্তব্ধতায়

আর তারা-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে যে কথা আজও আমার বুকে হানা দেয়, তাই তোমাকে বলবো অরু।

অনেকক্ষণ অরুন্ধতী তাকিয়ে রইল মালঞ্চের চোখের দিকে, দৃষ্টি তার ক্যাকাশে। তারপর বল্লে, বলুন, কি বোলবেন?

আমায় বাঁচাও, তুমি আমায় বাঁচাও অরুন্ধতী। এ যন্ত্রণা আর আমি সহ্য কোরতে পারিনে মোটেই।

কি হ'লো আপনার? আপনি অমন কোরছেন কেন মালঞ্চ বাবু? শরীর ভালতো?

ইস্! একি তোমার সরলতা না অভিনয় অরু? তুমি এখনও বুঝতে পারলে না আমার শিরায় কিসের উদ্দীপনা আর কার ছবি উদ্ভাসিত হয় আমার চোখের জ্যোতিতে। বল, সত্যি করে' একবার বল অরু, তুমি আমায় ভালবাস।

অরুন্ধতীর শরীর একবার কেঁপে উঠলো। কোন কথা বল্লে না সে। তাকিয়ে রইলো মালঞ্চের চোখের দিকে।

ওকি কথা কইছ না যে! বল, শুধু একটীবার বল অরু, তুমি আমায় ভালবাস। তোমাকে না পেলে আমি যে মরে যাব। কিছুতেই বাঁচবো না, বাঁচতে পারব না। তুমি আমাকে বাঁচাও। রাত্রে ঘুম হয় না। কেবল শুনতে পাই অন্ধকারের অস্ফুট গুঞ্জরণ আর কারো সচকিত পদধ্বনি। তারপর ভোরের তারা যখন জেগে ওঠে আকাশে, আর চাঁদ বাঁকা হ'য়ে ঢুলে পড়ে, তন্দ্রার আবিলতায় তখন ছেয়ে আসে আমার চোখ। তারপর সব অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি। নিতান্তই অদ্ভুত সব স্বপ্ন, তুমি যেন আমার পাশে ঘুমিয়ে আছ নিথর নিস্তব্ধ। রাতের কোন ফুলের সৌন্দর্য্য তোমাকে ঘিরে। পাশের জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে গড়িয়ে পড়েছে তোমার দেহে, মোমের মতো নরম আর সুন্দর দেহে। তারপর—

আপনার পায়ে পড়ি' মালঞ্চ বাবু ও-কথা আর বোলবেন না। নিতান্ত অসহায়ভাবে বল্লে অরুন্ধতী।

এক একটা জোনাকী পথিককে পথ চলতে যতটুকু আলো দেয়, ঠিক ততটুকু ভালবাসাও কি আমায় দিতে পারবে না? হয়তো তোমার কিছুই এসে যাবে না তাতে। বরং আমি বেঁচে যাব, আমার লাভ হবে পুনর্জন্ম। আর সে-গৌরবে তুমি হবে গৌরবান্বিতা। অস্বীকার করোনা অরু, বল আমায় ভালবাস।

মালঞ্চ বাবু, এবার আমি ধৈর্য্যের মাপ-কাঠি হারিয়ে যাচ্ছি। ক্ষমা কোরবেন আমার এ উদ্ধত ব্যবহার। আপনার মতো ভদ্রলোকের সঙ্গে মেশাও দেখছি আমার ভুল হয়ে গেছে। আমার অনুরোধ, আপনি আর কোন কথা না-বলে, কোনরূপ দ্বিধা না-করে' এখান থেকে চলে যান, অন্যথায় আমি স্পষ্টই বলে রাখছি, অপমানিত হয়ে যেতে হ'বে আপনাকে।

তা' হ'লে আমার এতোদিনের আশা কি আজ ধুলোর ঘরের মতো ভেঙে গেল অরু? তুমি কী আমায় ভালবাসতে পারবে না?

না। খুব কঠিন, কঠোর তার স্বর।

(একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে) তা'হলে তুমি প্রবীরকে ভালবাস?

কে বললে আপনাকে?

আমি নিজেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তুমি কী একবার চিন্তা করে দেখেছ, প্রবীর কত ভালবাসে উৎপলাকে। প্রবীরকে পাবার আশা তোমার পক্ষে নিতান্তই আকাশ-কুসুম।

সাবধান, আর কোন কথাই বলবেন না বলছি! ক্রোধে অরুন্ধতীর সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো।
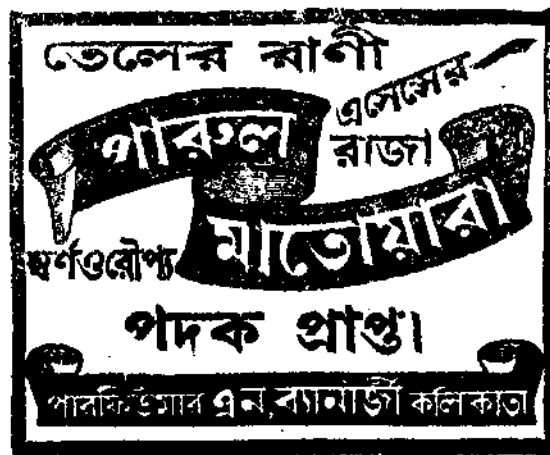
শোন অরু, আর ভয় নাই, আমি এখনই চলে যাব। কিন্তু কতটা ভাল তোমাকে বেসেছি, তুমি বুঝলে না। তাই আমার ভালবাসাকে আজ কোরলে তুমি অপমানিত। যাহোক, তুমি সুখী হও। আমি চল্লুম। জীবনে আর হয়তো দেখা হবে না অরু। যতোদিন তোমাকে ভুলতে না পারবো ততদিন—আর কোন কথাই বেরুল না তার মুখ দিয়ে। শিশুর মতো কেঁদে উঠলো মালঞ্চ। আর অরুন্ধতী তাকিয়ে রইলো তার দিকে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ।

* *

*

কেন তা হতে পারে না? অরুন্ধতী প্রবীরকে জিজ্ঞেস্ কোরলে।

হতে পারে না এইজন্য যে তা'হলে যথার্থ প্রেমের মৃত্যু ঘটাতে হয়।

সেকি? সাগরের মাঝখানে পড়বার ভঙ্গীতে অরুন্ধতী বোললে: তবে যে আজীবন একজনকে গোপনে ভালবেসে চোলল তার কি কোন দাবীই নেই বা থাকতে পারে না প্রবীরবাবু?

হ্যাঁ পারে। যদিনা সেই প্রেমিকের সঙ্গে অন্য প্রিয়ার পদরেণু দাগ কেটে কেটে যেতো।

এবার অরুন্ধতী নির্ব্বিবাদে চুপ কোরে রইল।

এবার তাহলে তার উপায় প্রবীরবাবু? আতঙ্কের পূর্ণ অনুভূতি নিয়ে অরুন্ধতী আবার প্রশ্ন কোরলে।

এর মীমাংসা নেই অরু দেবী। প্রবীর জানালে: যুগে যুগে পৃথিবীর বুক চিরে এমনিই প্রশ্ন উঠছে 'এবারে কি হবে?' কিন্তু আমি যদি হতুম—

আহত হরিণীর মতো লাফিয়ে উঠে অরুন্ধতী বোললে বলুন, আপনি যদি হতেন?

আমি তবে তার সেই ভালোবাসাকে কখনো অপমান কোরতে পারতুম না।

কি কোরে? প্রবল আগ্রহে অরুন্ধতী শুনতে চাইল গাঢ় হোয়ে। যেন সে শুনবে মেগাস্থিনিসের গত-বিবরণী।

আমি তা'লে, প্রবীর বোললে, আমি তা'লে তাকেও গোপনে মন দিয়ে দিতুম। কিন্তু যে আমার প্রাণ প্রিয়া, তার প্রেমকে আদর্শ কোরে, দ্বিতীয়াকে প্রশ্রয় দিতুম শুধু তাকে ধন্য কোরবার জন্য, তার তৃষ্ণা মেটাবার জন্য; কিন্তু আয়ু বৃদ্ধির জন্য নয়। যে আয়ুকে সে রেখেছে বুভুক্ষার ভেতরে, আমার মতো একটি ফুলন্ত চিবুককে আস্বাদন কোরতে তাকে কিন্তু প্রশ্রয় দিতুমই না।

সত্যি আপনি কবি প্রবীরবাবু। আপনার দৃষ্টি মনকে চিনে ফেলে তাকে এগিয়ে দিতে জানে।…কিন্তু প্রবীরবাবু অনেকের অনেক ব্যথা ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে অকস্মাৎ একজনকে দেখেই যদি জেগে ওঠে তখন তার উপায় কি হোতে পারে, এর মীমাংসা আজো হোলো না।

আজো হোলো না অরুদেবী, সত্যিই তাই। কে জানে কখন কার স্বপ্ন যায় ভেঙে, কে জানে কখন কে আলো পায়। যেমন উৎপলাকে দেখে আমি পেলুম (অরুন্ধতী এবারে আর্তনাদ কোরলে মনে মনে) আর উৎপলা পেলে আমায় দেখে।

আচ্ছা প্রবীরবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস্ কোরব?

বলুন।

উৎপলাকে আপনি বেশি ভালোবাসেন, না সে আপনাকে বেশি বাসে বলুন তো?

প্রবীর হেসে বোললে শুনুন তবে—জীবনের একটিমাত্র ফাল্গুনে একটিমাত্র কবিতা আমি লিখেছিলুম—তাকে যেদিন প্রথম দেখি।

আপনি কবিতা লিখেছিলেন? মনে আছে?

শুনুন—

আজ যদি বসন্তের ছন্দে নামে বুকের সেতার
সৃষ্টি হবে মোর কবিতার।
আজ যদি নভো-নীল-মেঘ-ছায়া-হতে
কেহ স্বর্গরথে
আমার দ্বারের পাশে ভিক্ষা চায় কবিতারে
মোর
বাঁধি দেয় অমরের ডোর
তারে তুচ্ছ করি আর রচি এক শোক
যারে দিয়া তোমাদেরি পেয়েছি আলোক।

ছায়া ও কায়া

শ্রীমধু বসু

নব নাট্যমন্দির

শিশিরকুমার পুনরায় সুস্থ হয়ে নিয়মিত ভাবে অভিনয় আসরে অবতীর্ণ হচ্ছেন। গৃহদাহের নাট্যরূপ 'অচলা'কে মঞ্চস্থ করবার জন্য সবাই অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন। আশা করা যায় এই মাসের শেষ সপ্তাহে 'অচলা'কে আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করতে দেখবো। ভূমিকালিপি সম্ভবতঃ এইভাবে বণ্টিত হয়েছে, যথা—কেদারবাবু শিশির কুমার, সুরেশ বিশ্বনাথ, মহিম শৈলেন, অচলা—কঙ্কাবতী, মৃণাল—প্রভা প্রভৃতি।

নাট্য-নিকেতন

কাণে এল এদের নতুন নৃত্য-গীতবহুল 'আলাদীন' আসছে ১০ই জুলাই অভিনীত হবে। নাটকখানার প্রযোজনায় প্রযোজক সুধীর গুহ অনেক কিছু করতে চেয়েছেন, তার প্রচেষ্টা সার্থক হলেই ভাল।

রঙমহল

যোগেশচন্দ্রের সামাজিক নাটক 'নন্দরাণীর সংসার' নাকি চমৎকার বই হয়েছে। জীবন গাঙ্গুলী কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছেন, সুতরাং তাকে এ অভিনয়ে দেখা যাবে না। তিনি ছাড়া সম্প্রদায়ের সমস্ত নামজাদা নট-নটীরা এতে ভূমিকা গ্রহণ করবেন। প্রযোজনা করছেন মিঃ সতু সেন। সর্ব্বহারায় তিনি তার শক্তি ক্ষয় করেছিলেন এবার যোগ্য নাটকে তার শক্তির পূর্ণ বিকাশের আশা রাখি।

আজ মোর বসন্তের নবদূত কেহ
রচি মায়া মোহ
পারে নাকি আনি দিতে তোমা
ওগো অনুপমা!
বসন্তের বৃন্তে ফোটা হে অনাদী মায়া
তব লাগি নীড়ে বাঁধা কায়া।

(ক্রমশঃ)

রূপমহল

আগামী শনিবার 'পুরুষোত্তম' রূপমহলে অভিনীত হলেও হতে পারে। এর রচয়িতা পরিচিত নাট্যকার মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রযোজনা করবেন এবং তিনিই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

মিনার্ভা

এখানে 'দস্যু'ই চলছে। নতুন কোন নাটকের প্রয়োজন নেই হয়তঃ।

নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

সুপরিচিত অভিনেতা নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী আর কতদিন আত্মগোপন করে থাকবেন? তাকে আমরা রঙ্গালয়ের মধ্যেই দেখতে চাই—এভাবে চুপচাপ থাকলে দর্শকেরা সহজেই তাকে ভুলে যাবেন এ খেয়াল কি তার নেই? পত্রান্তরে প্রকাশ, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভার সংস্রব পরিত্যাগ করেছেন। শরৎ চাটুজ্যের ভাঁড় জয়নারায়ণেরও মিনার্ভার দর্শকদের কাছে বেশ চাহিদা আছে, সুতরাং তার সহিত সংস্রব না ত্যাগ করাই মিনার্ভার পক্ষে সঙ্গত ছিল।

চিত্রায় 'পরপারে'

নানারূপ কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় দরুণ 'পরপারে' দেখে উঠতে পারিনি। গত ৪ঠা জুলাই চিত্রায় 'পরপারে' মুক্তিলাভ করেছে। 'পরপারে' ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আগামী সংখ্যায় এর বিস্তারিত বিবরণ পত্রস্থ করবার চেষ্টা করবো।

শিশিরের অবনতি

সহযোগী 'সচিত্র শিশির' ৪ঠা জুলাই-এর সংখ্যায় পুনরায় আরেকজন অভিনেতার 'আমার কথা' প্রকাশ করেছেন। এই অভিনেতা হচ্ছেন রঙমহলের রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'আমার কথায়' উনি লিখছেন …"তাঁর (নরেশ মিত্র) শিক্ষায় আমার নটজীবন সফল হয়েছে এ কথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু গুণী নট, যা পুরাতন তাকেই এমনভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখান যা মনে হয় সম্পূর্ণ এক নতুন সৃষ্টি। রতীন বাবু বোধ হয় নিজে এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন যে নরেশচন্দ্রের শিক্ষায় তার নটজীবন সার্থক হয়েছে এবং তা চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে—আমরা বলি তার নিজের কথাতেই প্রকাশ,—"অভিনেতার কাজ নতুন সৃষ্টি। নটের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করতে হলে দেখতে হবে তিনি রসস্রষ্টা কি না। নাটকের যে কোন চরিত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পরিস্ফুট করতে পারলেই সেটি হবে নতুন সৃষ্টি।" অথচ তিনিই বলছেন, জানিনা আমি গুণী কিংবা প্রতিভাবান নট—সে বিচার সুধীবৃন্দের।"

যদি নিজে নাই জানেন যে তিনি গুণী কিংবা প্রতিভাবান নট তাহলে নট জীবন সফল হয়েছে এ কথাই বা জানলেন কি প্রকারে ?

দ্বীপান্তর

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ডি জি টকীজের দ্বীপান্তরের শ্যুটিং শেষ হয়েছে এবং খুব শিগগির ছবিখানি সাধারণ্যে মুক্তিলাভ করে জনসাধারণের অধীর আগ্রহের অবসান করবে। শ্রীযুত মৃণাল চাটার্জ্জির রচিত দুই রীলের পৌরাণিক চিত্র শ্যামসুন্দরের চিত্র শ্রীযুত হেম গুপ্তের পরিচালনায় এবং মিঃ ডি, জির নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তোলা হচ্ছে।

দীপালীর খোঁজখবর

সহযোগী 'দীপালী' জানিয়েছেন, শান্তি গুপ্তা সর্ব্বপ্রথম রঙমহলে 'অশোকে' তিষ্যরক্ষিতার ভূমিকায় অবতীর্ণা হন। আমরা জানি, মহানিশাতে ছোট খুড়ীর ভূমিকায় শান্তি সর্ব্বপ্রথম রঙ্ মহলের মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

পপুলার পিকচার্স

এই মাসের মাঝামাঝি কালী ফিল্মসের ষ্টুডিয়োতে সতুবাবুর পরিচালনায় শরৎ চন্দ্রের 'পণ্ডিত মশাই'য়ের শ্যুটিং আরম্ভ হবে। নায়ক নায়িকার ভূমিকায় যাঁরা নামবেন তা গত সংখ্যাতেই জানিয়েছি, আরো নতুন জানা গেল, কুঞ্জ—রবি রায়, ব্রজেশ্বরী—রেণুকা ঘোষ, বৃন্দাবনের মা—প্রভা, ব্রজেশ্বরীর মা—রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি।

কালী ফিল্মস্

আসিয়ানার একটী দৃশ্য বাকী। এই দৃশ্যে একটী সুপরিচিতা নর্ত্তকী নাচ গান করবেন। বিরাট জমকালো সেটে এ দৃশ্যটী নেওয়া হবে।

জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়ের হিন্দি 'তরুণী' বা 'মডার্ণ লেডি'র শ্যুটিং শীঘ্রই আরম্ভ হবে। জ্যোতিষবাবু এর লোকেশান্ নির্ব্বাচনের জন্য পুরী, রাঁচি, পুরুলিয়া, হাজারীবাগ প্রভৃতি স্থানগুলিতে ঘুরে এসেছেন। নিম্নলিখিত অভিনেতৃগণ এতে ভূমিকাগ্রহণ করেছেন, হাসমৎ, মহম্মদ হোসেন, নওয়াজিস আলি, আব্বাস আলি, পঙ্কজী, নানাবতী, রামদুলালী, রাণী, চন্দা, পদ্মা, প্রকাশমণি হরিসুন্দরী প্রভৃতি।

গুণময় বন্দোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'পরভৃতিকা'র শ্যুটিং আরম্ভ হয়ে গেছে। ভূমিকায় আছেন ভানু বন্দ্যোঃ (নিষিদ্ধ ফলখ্যাত), শৈলেন চৌধুরী, প্রভা, শিশুবালা, মায়া মুখার্জ্জি, সাবিত্রী প্রভৃতি।

মুক্তিস্নানে নায়িকার ভূমিকায় নাকি লীলা হালদার মনোনীতা হয়েছেন। নির্ব্বাচকের প্রশংসা করতে পারলুম না।

'রীতিমত নাটকের' একটী ছোট দৃশ্য নাকি এরি মধ্যে তোলা হয়ে গেছে। ভূমিকালিপি নাকি এইমত বিতরিত হয়েছে—

দিগম্বর—শিশিরকুমার, সুহৃৎ—বিশ্বনাথ, দিব্যেন্দু—শৈলেন, স্বাগতা—কঙ্কাবতী, শান্তা—রাণীবালা প্রভৃতি। বসন্তের ভূমিকায় কে যে নামবেন তা জানি না।

বাজারে গুজব, সুন্দরী তরুণী অভিনেত্রী মীরা দত্ত নাকি এখানে যোগদান করবেন।

নিউ থিয়েটার্স

নীতিনবাবু হেমচন্দ্রের সহযোগীতায় একটী সুন্দরী অভিনেত্রীকে সংগ্রহ করেছেন। মেয়েটি ইউ পির, তার চেহারা যেমন সুন্দর তিনি নাকি কতকগুলি ভাষাও চমৎকারভাবে বলতে পারেন। নীতিন বাবুর হিন্দি ছবিতে একটী প্রধান ভূমিকায় তাকে নামান হবে, এবং আরো জানা গেল, ওর বাংলা সংস্করণেও ইনি অভিনয় করবেন। মেয়েটীর নাম লীলা দেশাই।

'বিজয়া'র শ্যুটিং দ্রুতগতিতে এগুচ্ছে। পূজার সময় রূপবাণীতে দেখান হবে। ভারতবিদিত সুরশিল্পী তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য এর সুরে নতুনত্বের পরিচয় দিচ্ছেন।

দেবদত্ত ফিল্মস্

'রজনী'র শ্যুটিং জোরভাবে চলছে, ছবিখানা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সম্প্রতি অমরনাথ, লবঙ্গলতা ও রজনীর অভিনয়ের একটী দৃশ্য তোলা হল। সমর ঘোষ ও গীতা ঘোষ, ছবির শব্দ গ্রহণ করছেন ও আলোকচিত্র তুলছেন। আশা করি,

দেবদত্ত ফিল্মের প্রথম বাংলা ছবিখানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে। ৮ই আগষ্ট রূপবাণীতে 'রজনী' মুক্ত হবে।

১১ই জুলাই মাদ্রাজের ৫টা হাউসে এদের তেলেগু পৌরাণিকচিত্র 'সতী সুলোচনা' প্রদর্শিত হবে। মেঘনাদ বা ইন্দ্রজিতের জীবনকথা নিয়ে এর কাহিনী রচিত হয়েছে।

রূপবাণী

প্রতিহিংসামূলক ভূমিকায় চার্লস্ লাফ্‌টন এবং নায়ক চরিত্র চিত্রনে ক্লার্ক গেবল যে কি অপূর্ব্ব অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারেন চিত্ররসিক কারো সে বিষয়ে অবিদিত নেই।

এইরূপ মনিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছে মেট্রোর "মিউটিনি অন্ দি বাউন্টি" চিত্রে।

একাধারে সমুদ্রবক্ষে অত্যাচারী ক্যাপ্টেনের আচরণে নাবিকদলের বিদ্রোহ অন্যদিকে নির্জ্জন দ্বীপে সুন্দরী তরুণীদের সঙ্গে সুমধুর প্রেমগুঞ্জন।

এরূপ চাঞ্চল্যকর প্রেম প্রতিহিংসা সংমিশ্রিত বৈদেশিক চিত্র বহুদিন কলিকাতার চিত্রপটে দেখানো হয়নি। ছবিখানি রূপবাণীতে সুরু হবে শনিবার ১১ই জুলাই। এই চিত্রগৃহের পরবর্ত্তী আকর্ষণ প্যারামাউন্টের "মিল্কিওয়ে", শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন হ্যারল্ড লয়েড্।

সমালোচনা

প্রেম—

কবিতার বই। তুলসী দেবী, পারুল দেবী ও পীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ষ্টাণ্ডার্ড বুক ষ্টল, ৩৪ ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম—ছ'টাকা।

উল্লিখিত তিনজন কবি একত্রে যাঁহার যাঁহার কথায় কবিতার মালা গাঁথিয়া গিয়াছেন। প্রেমের অনাবিল উৎসমুখ হইতে যে মন্দাকিনীর ধারাপ্রবাহ আপনার গতি-পথে আত্মহারা হইয়া তন্ময়-চিত্তে সাগর পানে স্নিগ্ধমধুর ছন্দে বহিয়া চলিয়া যায়, 'প্রেম'-এর প্রত্যেকটি কবিতা সেই ভাবেই ভরপুর। পীযূষকান্তি সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। ইতিপূর্ব্বেই তিনি কবিতার আসরে সাধারণের মনে রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উক্ত পুস্তকেও তাঁহার কাব্যপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রহিয়া গিয়াছে। পারুল দেবীর কবিতাও একটি স্ফুটনোন্মুখী কাব্য-সম্ভাবনার ইঙ্গিৎ জানাইতে অক্ষম নহে। কিন্তু বিরহী-মনের নিপুণ আত্ম-নিষ্পেষণে সুনিবিড় প্রণয়-স্পন্দন প্রাণ প্রতিষ্ঠায় জীবন্ত হইয়া ধরা দিয়াছে তুলসীদেবীর কবিতায়। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন কোন অভিশপ্ত বিরহিনী—তাহার হৃদয়ের প্রতিটি অণু, প্রতিটি পরমাণুর মধ্যে দয়িতের নিষ্ঠুর অবহেলার ছলনা উপলব্ধি করিয়া আপনাকে তিলে তিলে উৎসর্গ করিয়া উজাড় করিয়া মনোবেদনা নিবেদন করিতেছে! তাহার ধ্যানমগ্ন অন্তরের কণ্ঠ ঠেলিয়া তাই বাহির হইয়া আসিতেছে—

"প্রেমের প্রদীপ মোর দেহের দেউলে জ্বালি
কত আর রব নিদ্রাহীন!"

ফুটি ফুটি করিয়া কুঁড়ি-জীবনে ফুটিবার অবসর মিলিল না। যাহার গুঞ্জন-ধ্বনি শুনিবার আশায় কুঁড়ি তাহার বিনিদ্র-যামিনী যাপন করে, যাহার উন্মাদ আকুল দংশনের আশীর্ব্বাদ লভিয়া সে তাহার কুসুম-জীবনে পাপড়িতে পাপড়িতে উপচাইয়া উঠিতে, ভরিয়া উঠিতে চায়, আপনার যাহা কিছু অপরকে উজাড় করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়—সেই অপর-জন আসিতে আসিতে ফিরিয়া চলিয়া গেল। ব্যর্থতার এই তপ্তনিঃশ্বাস তাই পাঁজর ভাঙিয়া বাহির হইয়া আসে—

"ব্যর্থতায় সারাচিত্ত দহিতেছে তিলে তিলে
এ জীবন ক্ষয় হ'য়ে যায়,
আমার এ দেহ মন সমস্ত চেতনা দিয়ে
তোমারে নিবিড় করি চায়;"

বিরহিনীর তপ্ত-মনে এই যে আত্ম-ভোলা স্বভাবের তান—তাহাই প্রেমের অতলগর্ভ চেতনায় ব্যথায় সুন্দর ও সুগম্ভীর হইয়া দৃঢ় কণ্ঠে শেষ ভিক্ষা চাহিতেছে,—

"জীবন ভরিয়া আমি চাইনা তোমারে স্বামী—
চাহি শুধু ক্ষণিকের তরে,
একটি মুহূর্ত্ত শুধু, এর বেশী চাহিবনা—
এ'রই লাগি প্রাণ কেঁদে মরে,
*
আমার সমাধি হ'ক তব মাঝে—
আমার আঁখির আলো
আঁখি দিয়া হর!"

কবিতা-মালকে এই নবাগত বিহঙ্গীর গান সত্য সত্যই প্রশংসনীয়। 'প্রেম'-এ তুলসী দেবীর প্রথম অবদান কাব্য-জগতের বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ হিসাবে ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতর সম্ভাবনার নির্দ্দেশ দেয়। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। প্রচ্ছদপট মনোরম।

ফণিভূষণ মৈত্র।

ভিন্ গেরামের বন্ধু

আশ্রমবাসিনী বরুণার সঙ্গে টাঙ্গাইলের বক্রেশ্বর দা'র ঘনিষ্ঠতা অবশ্য দু'দশ দিনে জমে ওঠেনি। তবে প্রথম দর্শনেই যে দু'জনের মনটা কেমন করে উঠেছিল নাকের নিঃশ্বাসেই তা' অনেকটা টের পাওয়া গেছে। বরুণার চিত্তহরা মুখখানির দিকে তাকিয়ে বক্রেশ্বর দা'র সেই চোখের ইশারাটা সকলের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিলেও রাখালী তা' ভাল করেই দেখে নিয়েছিল। এবং হিংসার দাবানল বুকে পুরে বরুণাকে ঠাট্টা করে বলেছিল, "ভারী দরদ দেখছি যে! পীরিতের চাষ জমে উঠল নাকি! তোর ত তবু একটা জুটল। ঠক, জুয়াচোর, ফেরেববাজ যা' হক। আমার যে ভাই ভেড়ার গোয়ালে আগুন লেগেছে।" ঠাকুরের ছলায় কলায় ভুলে যারা এখানে এসেছিলেন তাদের সকলকেই সাগর সঙ্গমে স্নান করিয়েছি। কানাই, বলাই, শ্রীদাম, সুদাম কেউ বাদ যান নি। কিন্তু মন বসিয়ে কোন তোমরা যুগল জীবন যাপন করলনা। এরা সকলেই ভিন্ গেরামের বন্ধু। আসেন, বসেন, মজা লোটেন তারপর খানিকটা কেসে হেসে চলে যান। আকারের তুলনায় বয়সের অল্পতা মনে করে যাদের ছোকরা বলে মনে হয়, বাজিয়ে দেখেছি তারা ঘুঘু। প্রথম যে দিন এই আশ্রমে আসি, সেদিন অধরে অধর মিলেছিল। সে মহারাজজি আজ পরপারে। তারপর যে হতভাগাটা এক বাদলের সাঁঝে বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পোড়ারমুখোরা পেযে কিনা একটা কচি কিশোরীর মায়া মেদুর মুখখানি দেখে সব ভুলে গেল। মরুক গে ছাই। ভিন্ গেরামের বন্ধু। অমন কত আসে কত যায়। ভাদ্রের জোয়ারে ভেসেছিলেন এক ভদ্রলোক। তার আকার, ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা, ভাষা সবগুলিই আমার খোলা বুকখানির দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিল। জ্যোৎস্না রাত্রিতে বালুর চরে অনেক প্রলাপ বকে এই হাত দু'খানি ধরে বলেছিল, রাখালী তুমি পতিত পাবনী'। এতবড় মিথ্যা সোহাগও পুরুষ জানে। সাতটা দিনও পার হ'ল না। মাষ্টার মশাই ঐ নবাগতা বিধবাটার সঙ্গে জুটে গেলেন। অতটা গা চাটা আমার বড় ভাল লাগেনা ভাই। ভিন্ গেরামের বন্ধু। ওরা ত যেতেই আসেন। মিছে টানাটানি করে লাভ কি। গলায় তুলসীর মালা এক ব্যাটা বামুন, বোধ হয় মুখুজ্যে মশায় হ'বেন। নামটা ঠিক মনে আসছেনা। একদিন এসে দরজার ফাঁকে উঁকি মারছিলেন। হাত ধরে এনে ঘরে বসালেম। থাকলেনও দু'চার দিন। দুজনে মাখামাখিও বেশ হ'ল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বন্ধুত্ব টিকলোনা, আর কি করেই বা টিকবে। ভিন্ গেরামের বন্ধু! এরা মেল গাড়ী। কোন ইষ্টিসনে বেশী সময় হল্ট করেন না। মানুষ চিনতে আমার দেরী হয় না বরুণা, একবার দেখলেই চিনতে পারি। এরা "ইন" হ'য়েই "আউট" হ'য়ে যান। অনেক যায়গায় থামতে হয় কিনা। তারপর দেখা হ'ল বৌ-মরা বেদনা বিধুর এক পাগলের সঙ্গে। ঠাকুরের কৃপায় এই আশ্রমে পিরীতের ভিয়কুটী দেখাবার অভাব হয় না। শুকনো ডালে কি সাধে কলি ফোটে ভাই। তিনি এলেন ফাগুনের ফাগ মেখে। হাত থেকে আংটিটা আমার হাতে পরিয়ে দিয়ে বললেন, আপনাকে বড্ড মানিয়েছে কিন্তু। সীমারেখার উপরও যথেষ্ট এগিয়ে এলেন। আটপৌরে সাড়ীখানাকে বদলিয়ে ভ্যারি সাইনে ঝিঙে রংএর গরদখানা পড়তে হ'ল। অবশ্য তিনিও খানিকটা সাহায্য করলেন। পকেট থেকে রুমালটা বের করে হাতে গুঁজে দিলেন। কিছুদিন বাদ ছিঁড়ে গেল যোগসূত্রটা। ভিন্ গেরামের বন্ধু কিনা। মনোমোহিনী খিলি দিয়ে কতদিন ভুলিয়ে রাখা চলে। আপাততঃ জন্ম এসে দেখা দিলেন এক ক্যাবলাকান্ত। মাটির মানুষ। জোর না হ'তে কেবল আনাগোনা। নদীকূলে হিমেল হাওয়ায় কি কীর্ত্তির ইতিহাসই না রচনা করা হ'ল। মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। বুদ্ধিতে বৃহস্পতি। এক কথায় পিঁজরায় পোরা চলে। আদবে কিন্তু লোকটার ছিল বাছুরে বুদ্ধি। একদিন নিশুতি রাতে মহারাজজির ভ্রাতৃবধূর সহিত ক্যাবলাকান্তও নিখোঁজ হলেন। ইতি মধ্যে নাড়ী টেপা এক এম্, বি ডাক্তার এসে মুখ তুলে চাইলেন। তার স্ফুটন্ত অধর প্রান্তে হাসির বিলাস। গৃহে দুইটী গৃহিনী। স্বভাব দোষে এখনও যৌবন ললিতলতা বাহুর বন্ধনে অরুচি নাই। একান্ত নিকটে বুকের কাছে হাতখানাকে ঠেকা দিয়া বললেন। আমার কথা ত জানিসই ভাই। "যাহা পাই তাই লহি তুলি"। তাড়িয়ে দিলেম বৈদ্যরাজকে। তালিম দিয়ে দেখলাম তিনি বাজে জমার মালিক। "রাত্র দিন আটপর খড়ি পিটে মরে, তার খড়ি কে বাজার তল্লাস না করে।" উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ হ'য়েই এই আশ্রমে ঘুরে বেড়াচ্ছি। না হ'লে ভিন্ গেরামের বন্ধুদের কি দশা হ'ত বল দেখি!

সচিত্র সাপ্তাহিক
দ্বিতীয় বর্ষ—২৩শ সংখ্যা
শুক্রবার—১লা শ্রাবণ
১৩৪৩
১৭ই জুলাই—১৯৩৬

সাহিত্য ও শরৎচন্দ্র
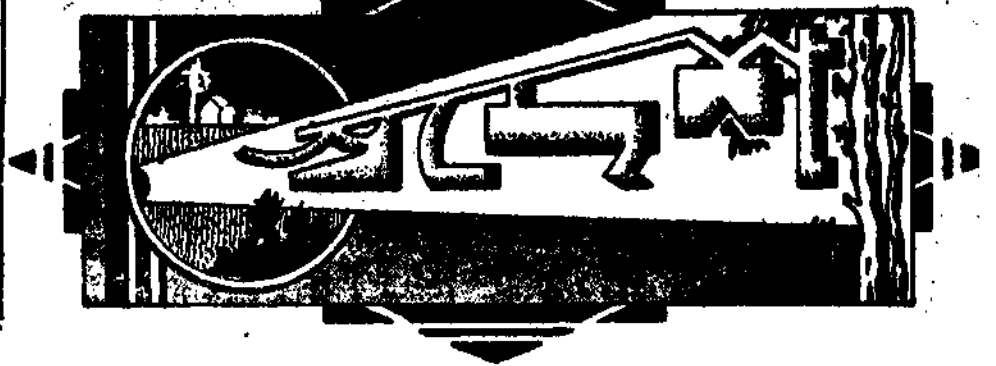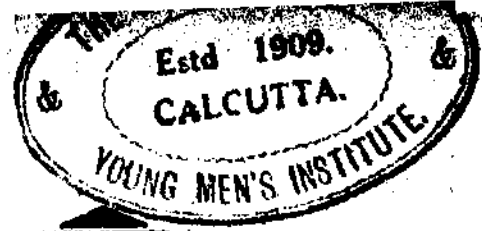
সাহিত্যের প্রসার যে প্রাণশক্তির প্রেরণায় সৃষ্টি-চঞ্চল চেতনার স্পন্দনে দিগ্বিজয়ে ছু'টে চলেছে, সেই উন্মাদ জয়যাত্রার পথে চলার নেই কোনো আদি, নেই কোনো অন্ত। সে চলে তার চলার আনন্দে, অনুভূতির ছন্দে, উন্মেষের ব্যথায় তু'লে তার সব-চাওয়া সব-পাওয়া, সব-না-চাওয়া সব-না-পাওয়ার প্রাণতরঙ্গ। কি চায়, কি না চায়—বোঝা না-বোঝার এই বিস্ময়মদে পাওয়া-হারানোর যুগপৎ দাবী আনে এক অভিনব জন্ম-মৃত্যুর সাধনা, দ্বন্দ্ব। তা'র দ্যোতনায় ধূলো হয় সোনা, সেঁউতি হয় সোনা, আর সোনা হয় প্রাণের পাষাণস্তরে অ-প্রাণের অনু-পরমাণু! মিলন হয় মধুর, বিরহও মধুর হয়। মাটির বুকে, আকাশের গায়, সমুদ্রের অতলে—যেখানেই কেন না হোক, তার চোখের দৃষ্টি সবেতেই মধুর, সবেতেই সুন্দর, সুনিবিড়, সুনিপুণ, সহজ!

'সাহিত্য সংসদ'-এর সাধারণ সভায় জনৈক বক্তার সাহিত্যসৃষ্টির আধুনিক মতবাদ হিসাবে একশ্রেণীর আবেদনের উত্তরে শরৎচন্দ্র যা বলেছেন, তা'র অন্তর্নিহিত সুনিবিড়ে প্রবেশ করলে দেখি, সাহিত্য তাই—যা কোনো নির্দ্দেশের অপেক্ষায় ব'সে নেই, বা থাকে না। যখন তাই থাকে, তখন তা'র মধ্যে প্রচুর নীতিপ্রেরণা ও জাতি-জাগরণের অনুপান থাকা সত্ত্বেও—তা'র অস্তিত্ব সত্যিকার সাহিত্য-গণ্ডীর অভ্যন্তরে ঠাঁই পাবে না, কোনো দিনই পায় নি।

অর্থনীতি-বিশারদের দৃষ্টি বাস্তব-জগতের কল্যাণে যে সত্যকে কেন্দ্র ক'রে সাহিত্যের পরিমাপ করবে, তা' হয় তো সাময়িক কল্যাণের ভিত্তি ও জাতীয়-জীবনের কাঠামোকে সুদৃঢ় ক'রে তোলবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। সে সাহিত্যেরও প্রয়োজনীয়তা আছে অবশ্যই, তবুও তা গণ্ডীবদ্ধ সাহিত্য। শুধু প্রয়োজনের খাতিরে তা'র সৃষ্টি। তাই প্রয়োজনের চাপেই তা'র ধ্বংস। এইখানেই সত্যিকার সাহিত্যের সহিত ক্ষণিক সাহিত্যের বিরোধ। কারণ যা সাহিত্য—তা' শাশ্বত। তার মরণ নেই।

শরৎচন্দ্রের জীবনে এই সাহিত্যের যে শাশ্বত রূপ আমরা দেখিতে পাই, সেটা কোনো একদেশদর্শী দৃষ্টির পরিচালনায় চলে নি। প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের মাপকাঠি নেই সেখানে। আছে শুধু স্বতঃস্ফূরিত অন্তরের আপনভোলা আত্মসমর্পণ নিগূঢ়তম সৌন্দর্য্যরসে আপ্লুত, পরিপূর্ণ। সত্যিকারের সৃষ্টি তাই আপেক্ষিক নয়, স্বাভাবিক। রাধার জন্যে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের জন্য রাধা—আবার কারো জন্য কেউই নয়! তখন এলো শাশ্বত উপলব্ধি, প্রেম। এই যে প্রেম এবং এই যে তন্ময় কল্লোলময়ী তটিনীর ধারা—সমুদ্র অনুসন্ধানে এই যে তা'র কান্না আর হাসি, বৃন্দাবনের রেণুতে রেণুতে মাখানো তা'র স্মৃতি—এরই সৌন্দর্য্যে সাহিত্য হ'ল সাহিত্য, সৃষ্টি হ'ল সুন্দর! মানুষ শরৎচন্দ্র তাই সাহিত্যাকাশেরও শরৎচন্দ্র।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

গত বুধবার অপরাহ্ণে কবিবর রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউন হলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ব্যবস্থার বিরোধী আবেদনের সমর্থনে হিন্দুদিগের সভা হইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্যর নীলরতন সরকারকে পার্শ্বে বসাইয়া অক্সিজেন সিলিণ্ডার হইতে অক্সিজেন শুকিতে শুকিতে তাঁহাকে সভাপতিত্ব করিতে হয়। তিনি যে এই অবস্থায়ও সভাপতিত্ব করিতে আসিয়াছিলেন, তাহাতেই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্বন্ধে বাংলার হিন্দুর মত সুপরিস্ফুট হইয়াছে। রবীন্দ্রবাবু স্পষ্ট বলিয়াছেন, যদি ইহার কোন প্রতীকার না হয়, তবে বাংলার হিন্দুকে তাহার উপায় করিতেই হইবে। সভায় এত লোক সমাগম হইয়াছিল যে, সহস্রাধিক লোককে স্থানাভাবে চলিয়া যাইতে হয়। এই সভার অনুষ্ঠাতৃবর্গের যত না ব্যস্ততা দেখা গিয়াছিল, তত ক্লান্ততা দেখা গিয়াছিল, নলিনাক্ষ সান্যালের। যদিও তাঁহার হিন্দুস্থানের মালিক নলিনী সরকারের স্বাক্ষর মেমোরিয়ালে লওয়া হয় নাই, তথাপি স্যর বিজয় প্রসাদ সিংহরায়ের স্বাক্ষর যখন আছে, তখন নলিনাক্ষ অবশ্যই ইহাতে ব্যস্ত হইবেন। কিন্তু সভাতেই একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনিই কি পূর্ব্বে কংগ্রেসের নামে অর্থাৎ বিধানীদলের জন্য সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিরোধীদিগের বিরোধিতা করেন নাই? তবে এমন অনেক লোকেরই ঘটনাচক্রে 'বদলে গেল মতটা' হয়। রবীন্দ্রনাথকে ইনি তাড়াতাড়ি বাহির করিবার জন্য বার বার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকেরই ধৈর্য্যচ্যুতির উপক্রম হইয়াছিল। রাধাকুমুদ বাবু ও তুলসী বাবু যে এ জন্য লজ্জিত হইয়াছিলেন তাহা অনুমান করিতে পারি, কিন্তু তাঁহারা ত' প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। ইহা যে দারুণ দৌর্ব্বল্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

চাতিম চাতিম

শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ

দুনিয়ায় শুধু দুঃখ ভোগই যথেষ্ট নয়; মূক পশুও দুঃখ পায়, সে দুঃখ এড়াবার উপায় কিন্তু তার জানা নেই। দুইটি হাড় জিরজিরে বলদের ঘাড়ে যখন একতলা প্রমাণ পাটের গাঁট বোঝাই গরুর গাড়ীর জোয়াল চাপানো যায় তখন তারা চক্ষু মুদে জিব বার করে অম্লান বদনে তা' টানে। এক আধটা দুষ্ট এঁড়ে পথের মাঝখানে শুয়ে পড়ে বটে, কিন্তু মহাত্মাজীর ননকো পন্থার সহজ পথিক এই দুষ্ট এঁড়ে পাচন বাড়ীর গুঁতাগাঁতা হজম করতে না পেরে উঠে গাড়ী নিয়ে ছুট দেয়। কখনও শোনা যায় নাই, যে, কর্পোরেশনের বলদকুল বা বড় বাজারের ষাঁড়েরা চিফ একজিকিউটিব অফিসারকে সদলবলে গুঁতিয়ে ধরাশায়ী করবার প্রস্তাব পাশ করেছে, বা মারোয়াড়ীদের ঘি-ফেড ভুঁড়ি খসিয়ে সেল্ফ ডিটারমিনেশনের অধিকার লাভ করেছে।

* * *

তাই বলছিলাম, শুধু দুর্ভোগই যথেষ্ট নয়, সে সম্বন্ধে হিসাব হদিসের টনটনে জ্ঞান চাই। সকল দেশের বঞ্চিতের দল বা হ্যাভ-নট্‌স্‌রা সেই ত্রেতাযুগের রামরাজ্য থেকে আজ অবধি সমাজের গাড়ীটানা বলদ হয়েই আছে। তারা চক্ষু মুদে গাড়ি টানে আর শুকনো বিচালির জাবর কাটে। তারা যদি কিছু ভাল করে জানে সেটা হচ্ছে এই যে, তারা জন্মেছে ভারবাহী হয়ে এবং মরবে ঠিক তদবস্থায়ই। দুগ্ধবতী গাই গরুর মত তারা খোল ভুসি কখনই পাবে না, পাঁজরার হাড় তাদের কস্মিন্‌কালেও ঢাকবে না। তাদের সবাইকে রাজকীয় হালে খোল ভুসি দিলে মহাজনের অট্টালিকার গণেশ ঠাকুর স্রেফ উল্টে যাবেন, গদিতে গদিতে লাল বাতি জ্বলবে। এত বড় অনর্থ ঘটিয়ে তো আর তারা প্রাণরক্ষা করতে পারে না?

* * *

দুঃখের অবসান এ দুনিয়ায় তারই হয়, যার শুধু দুঃখের জ্ঞান নাই, তার প্রতিকারের জন্য সচেতনত্ব আছে আর সকলের একজোট হবার ক্ষমতা গজিয়েছে। বড় বাজারের সব ষাঁড় রাস্তা জুড়ে এক শুভক্ষণে শুয়ে পড়লে বাস ট্রামের যখন চলাচল বন্ধ হবে, তখন সমস্ত কেরাণীজগৎ নাড়া দেবে কর্ত্তাদের দুনিয়াকে ধরে, তখন হবে প্রতিকার। আমাদের সখের লেবার ও চাষী মুভমেণ্ট হচ্ছে খাঁটি কুলি জাগরণ বা চাষী জাগরণ নয়, ওটা পরস্মৈপদী আন্দোলন। ফজলল্ হক সাহেবের স্তন বেয়ে যখন চাষার দুঃখে দুগ্ধ ঝরে তখন মনে করতে হবে তাঁর সাঙ্গ পাঙ্গদের ভোটের দরকার হয়েছে। বসু-রায় কোম্পানীর ক্যাট্‌-ব্যাক-ব্যালান্স-শীতল প্রাণ যখন হ্যাভ নটের দুঃখে টাটিয়ে ওঠে, তখন বুঝতে হবে লোভস্ এণ্ড ফিসের লোভে মহাপ্রাণী তাঁদের লোকহিতে টাটিয়ে উঠেছে। এ সংসারে কারও জাগরণই পরস্মৈপদে সারা যায় না, অথচ আমাদের পলিটিক্সের বার আনা গণজাগরণ হচ্ছে প্রক্সি মারফৎ।

* * *

সমাজের এই সব আয়েসী ক্লাস—এই সব পেট মোটা মুরুব্বীর দল পরস্পর চুলোচুলি করতেন না, যদি তাঁদের সবারই দরিদ্র নারায়ণের জন্য ব্যথাটুকু খাঁটি

সাহিত্যে দান

—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

বর্ত্তমানে সাহিত্য সংসদ নামে এই যে প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়েছে অনেকেই বলবেন—এতগুলি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান থাকতে আবার নূতন করে একটী গড়ে তুলবার দরকার কি? এর উত্তরে এই বলা চলে, বিভিন্ন পথে বিভিন্ন নামে জল ধারা বয়ে গেলেও পড়ে গিয়ে একই জায়গায় এবং সেখানে মহাসাগর নামটা বললেই সব প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়। নদ, নদী, খাল, বিল যত যার জলই হোক না, সবই মিশছে গিয়ে সেই একই জায়গায়, ক্ষুদ্রকে অনেক বড় করে তুলবার প্রচেষ্টা রয়েছে সবারই।

সাহিত্য হচ্ছে তেমনই একটী মহা-সাগর,—যে যে পথেই আসুক, মিশবে সেই একই জায়গায় এবং তাকেই করে তুলবে বৃহত্তর। ছোটর দানও যেমন, বড়র দানও তেমনই, দেওয়ার সময় কেউই ক্ষুদ্র বা মহৎ নয়। কেউ রাজ্য দান করে, কেউ নিজের সর্ব্বস্ব আধলা দান করে, তৃপ্তি দুই জনেই সমান পায়।

সাহিত্যের কোন একটী বিভাগ ধরে তাকে বিচার করা চলে না—অজস্র বিভাগ,—কোনটী রেখে কোনটীকে বিচার করা চলে—মাপ করা যায়? মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত যে জড়িয়ে আছে, প্রতি মুহূর্ত্তে যার নব নব বিকাশ; ক্ষুদ্র একটী বিভাগ ধরে তার বিচার বা মাপ করা যায় না।

প্রধানতঃ আমরা দেখতে পাই দুইটী দিক—পদ্য ও গদ্য। একটা তোলে সুরের ঝঙ্কার, অতি কোমল—কম্পন জাগায় মনের তারে। সুরের সঙ্গে তার ভাব, তার ভাষাও মনে ছাপ রাখে, তাকে ভোলা চলে না। আর একটা আনে ভাব ভাষা অনুভূতি, কোমলতা হয় তো আছে, কিন্তু কবিতার মত অতি সূক্ষ্ম নয়, অথচ জীবনে তার প্রাধান্য বড় কম নয়, একেই আমরা বলি কথা সাহিত্য।

এরই মধ্য হতে টুকরো টুকরো বিভাগ করা হয়েছে, কারণ সুর দিয়ে মানুষ আত্মহারা হয়, কাজের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ তাতে মেলে না। এক-কালে সাহিত্য গানেই প্রসারতা লাভ করেছিল, সেদিক দিয়ে মূল্য তার কম না হলেও নূতন কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করার শক্তি কথা সাহিত্যের মত তার যে ছিল না তা বোধ হয় বলা চলে। কথা সাহিত্যের মধ্যে আমরা প্রচার করতে পারি অনেক—পথ অনেক পাওয়া চলে। কবিতা দিয়ে তৃপ্তি মেলে, কাজের সন্ধান মেলে না। কেবল মাত্র স্বপ্ন নিয়ে দিন চলে না, বাস্তবের কঠোর আঘাতে জর্জ্জরিত মানুষ এখন তাই কবিতা রেখেছে তৃপ্তির জন্য, বাস্তবের জন্য বেছে নিয়েছে অন্য পথ।

কঠোর শিক্ষা কবিতায় চলে না, ভবিষ্যতের দিশা মানুষ হারিয়ে ফেলে। মানুষ তাই কথা সাহিত্য নির্ব্বাচন করে নিয়েছে এবং এর মধ্যে বিভাগ স্থির করেছে, কেন্দ্রও অনেকগুলি তৈরী হয়ে গেছে।

বর্ত্তমান যুগ যে সব সমস্যা জাগিয়ে তুলেছে এর যদি মীমাংসা কোনদিন সম্ভব হয়, তবে এরই মধ্য দিয়ে। আর এই মীমাংসা বা পথ নির্দ্দেশের ভার নিতে হচ্ছে তাদের—যাঁরা তরুণ—যারা দিশা পাচ্ছে না, তবু অক্লান্ত পরিশ্রমে তারা পথ খুঁজছে।

দেখা গেছে—যে যুগ যখন এসেছে—সেই যুগের তরুণেরাই অদম্য উৎসাহ নিয়ে যে কোন কাজে এগিয়ে এসেছে। আজ যে সাহিত্য সংসদ নূতন করে গড়ে উঠেছে, এও কতকগুলি তরুণের অদম্য উৎসাহের ফল। আজ এদের বাধা দেওয়া চলে না, পেছনে সরানোর চেষ্টা করা চলে না, ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর এতটুকু ধারাও যে মহাসমুদ্রকে পুষ্ট করে কেবল সেই কথাই মনে পড়ে যায়।

পূর্ব্বেই বলেছি দানের অধিকার সবারই আছে, পূজার অর্ঘ্য সাজাবার

হতো। সত্যমূর্ত্তি আর শার্দ্দুল সিং-এ, শরৎ বসু আর ডাক্তার রায়ে ভাশুর ভাদ্দর বউ সম্বন্ধ হয় শুধুই পরার্থে, একথা বিশ্বাস করা শক্ত। একেবারে গীতোক্ত নিষ্কাম কলহ দুনিয়ায় আছে কিনা সন্দেহ। আজ গত ত্রিশ বছর ধরে আমরা আঁদাড়ে পাঁদাড়ে হাম্বা হাম্বা রবে মাস্-এর দুঃখ দূর করেছি, তার ফলে তাদের ঋণভার আর অন্নাভাব হয়েছে হিসাবের বাহির। এখন একবার সদলে শাসনচক্র ধরে লেজিস্-লেশন-এর দ্বারা দেবকীর বুকের ঐ পাষাণ সরালে যদি ভারত উদ্ধারে দু'চার বছর দেরী পড়ে যায় তা'তেও এমনই কি ক্ষতি? স্বরাজে তো বাবুদের ছাড়া রামা শ্যামা দুখী ব্যাচার পেট ভরাবে না।

* * *

বাবু ভায়ারা দু'দশ হাজার আর ওরা যে সংখ্যায় পঙ্গপাল। বাবু ভায়া-দের আন্ এমপ্লয়মেন্ট বা মিনিষ্টারীর ব্যথা সহজেই ঘুচতে পারে। ঐ পঙ্গ-পালের দস্তোদরের জ্বালা চৈট্ এক্টের ছাড়া কোন 'পিস্-মিল্' চেষ্টায়, চাঁদার এজিটেশনে ঘুচবে না। সুতরাং হে বিবদমান লিডার দেবতারা, প্রসীদ!

ডান হাতেতে চরকা ঘোরে
বাঁ হাত কুড়ায় চাঁদার কড়ি,
দু'নয়নে ভোটের জ্বালা
পরস্পরে ছিঁড়চো দাড়ি!

———

অধিকারী সকলেই, দেখতে হবে শুধু তার মধ্যে ঐকান্তিকতা কতখানি আছে, নিষ্ঠা আছে কি না। হোক সে অতি হেয়, অতি ক্ষুদ্র, তার নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতাই তাকে করে তুলবে অতি মহীয়ান, আকাশের মত উদার অসীম। এই নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিকতাই গড়ে তোলে স্বর্গ, মাটির পুতুলও হয়ে ওঠে সজীব দেবতা।

অনন্ত সমুদ্র গর্ভ, কত রত্ন উঠেছে, এখনও কত রয়ে গেছে লোক লোচনের আবরণের বাইরে। এখনও কত উঠবে তার হয় তো সীমা নাই।

সেই জন্তই এদের বাধা দেওয়া চলে না। ছোটর শক্তি মহৎ,—ক্ষুদ্র বৃষ্টির ধারাই নদীর বক্ষে জল বাড়ায়—নইলে নদী কবে শুকিয়ে যেত,—সাগরের জলও বাষ্প হয়ে উড়ে যেত—আকাশের বুকে মেঘ জমবার কোন দরকার ছিল না।

এখন বলতে চাই সাহিত্য সংসদের উদ্দেশ্য কি—কেন এ সংসদ নূতন করে সৃষ্টি হল?

সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের, বা দেশের ও দশে'র উন্নতি সম্ভব, কিন্তু কেবল মাত্র গল্প উপন্যাস বা কবিতার নয়। সাহিত্য গড়বে জীবন—নিয়ন্ত্রিত করবে কাজের ধারা, বর্ত্তমান যুগ এনে দিয়েছে অনেক কিছু, উত্কর্ষতার সুযোগ সামনে—আর মানুষকে তা করতেও হবে, নইলে উপায় নেই।

সেই উৎকর্ষতার জন্তই আজ সব তরুণদের দরকার, তাদের চিন্তাধারার পরিপুষ্টি সাধনের দরকার—আর সেই জন্তই নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠা দরকার।

আজ যে কয়টী তরুণের ঐকান্তিক চেষ্টায় সাহিত্য সংসদ গড়ে উঠেছে—এদের এই সাফল্যলাভের ফল যেন চিরস্থায়ী হয়—দুদিনের জন্ত বুদ্বুদের মত উঠেই যেন মিলিয়ে না যায়। এ পর্য্যন্ত তরুণদের চেষ্টায় যতগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল তার কতকগুলি আছে, কতকগুলি মিলিয়ে গেছে, আছে কেবল তাদের নাম। বর্ত্তমান সংসদের নামের দরকার হবে না—চাই তার দীর্ঘজীবন—তার কাজ। তার কাজেই তাকে বাঁচিয়ে রাখবে, তাকে পরিচিত করবে জন সমাজে।

বর্ত্তমান যুগে কেবল কল্পনা নিয়ে চলবে না, চাই নব নব কাজের সঙ্গে পরিচিত হওয়া—এখানে সাহিত্য করবে প্রচার, দেবে শক্তি, দুর্কার সাহস। দেশের তরুণকে করবে কর্ম্মঠ, উৎসাহী, চিরজীবী। সে সেই জীবন এনে দেবে, দেহের ধ্বংসের পরও যা চিরকাল থাকবে কাজের মধ্যে বর্ত্তমান হয়ে।

সাহিত্য সংসদের উদ্দেশ্য মহৎ, কেবল-মাত্র কল্পনাই নয়, বাস্তবে সাহিত্যকে এর সভ্যেরা কাজে লাগাতে চায়। আশা করছি এদের এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, —দেশের সকল তরুণ এদের সঙ্গে অনুপ্রাণিত হবে। সাহিত্য কেবল কল্পনার বস্তু না হয়ে কাজের মধ্যেও স্থান পাবে।

আমরা শুধু সেইটাই দেখতে চাই। যদি উপদেশ দেওয়ার দরকার হয় সেই উপদেশই দেব—যেন মানুষ মানুষ হয়। প্রার্থনা করতে সেই প্রার্থনাই করব—যেন মানুষ মানুষ নামেই পরিচিত হয়।*

*রুমবার ম্যানসনে সাহিত্য সংসদের অধিবেশনে পঠিত।

চাকুম-চুকুম

পঞ্চমুখ শর্ম্মা

'সাহিত্য সংসদ'এর সাধারণ সভায় জনৈক এম-এ কবি কিছু বলিতে উঠিয়া সাহিত্য-সম্রাটকে দেখিয়া হয়তো আঁৎকাইয়াই উঠিয়াছিলেন। তাই যখন বলিলেন, "যেখানে সাহিত্যের শাহেন শাহ নিজে উপস্থিত"—'সেথা আর কি গাহিব গান?' ইত্যাদি। কিন্তু তখন নানা বাস্ততার মধ্যে আমি ভাবিলাম, বিশেষণটি মোটেই মৌলিক হইল না। 'সাহিত্যের রাহু' বলিলেই তো হইত! অর্থাৎ যিনি সাহিত্য-শক্তির সবখানি গ্রাস করিয়া লইয়া তরুন সাহিত্যিকগণকে একেবারেই সুযোগ দিতেছেন না, তাঁহাকে আর কি বলা যাইতে পারে? এই কথাটা নিজেও একদিন একজনকে সম্রাটের নিকট বলিতে শুনিয়াছিলাম, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই—তিনি রাগ তো করেনই নাই, বরং আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। এবং আশীর্ব্বাদ করাটা যে মোটেই কঠিন নহে, এই দিনকার সভায় 'সাহিত্য সংসদ'কে সহানুভূতি জানাইবার মুহূর্ত্তে শরৎচন্দ্রের বাণীই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ! অতএব বক্তা কেন আঁৎকাইয়া উঠিলেন, ভাবিয়া পাইতেছি না!

ঐক্য, বাক্য এবং অবশেষে অনৈক্য—সভাপতি হিসাবে 'সাহিত্য সংসদ'কে এগুলির ব্যাখ্যা জলধর দা যাহা দিয়াছেন, উহা হইতে অধিক সত্য কথা কেহ আর কহিতে পারেন নাই। তারুণ্যের চঞ্চলতা সাময়িকভাবে ঐক্য সংস্থাপন করিয়া ক্রমে বাকযুদ্ধ ও অবশেষে হাতাহাতি (অনৈক্য) অচিরে যদি উপস্থিতই হয়, অবশ্যই তাহা স্বাভাবিক হইবে। এবং সভায় যতীনবাবু বলিয়াছেন, 'কুহু ও কেকা', 'মলয় পবন', 'হৃদয় বিনিময়'—ইত্যাদির স্বাভাবিক পথ ছাড়িয়া, এক্ষণে অস্বাভাবিক পন্থারই আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং 'সাহিত্য সংসদ' অস্বাভাবিকতার লেজ যদি বাস্তবিকই দাঁতে চাপিয়া ধরিতে পারেন, শনৈঃ শনৈঃ উন্মার্গগামী যে হইতে পারিবেন—ইহাতে সন্দেহ কৈ?

তবে গিরিজা দা গোঁসা করিয়া হৃদয় বিনিময়ের পন্থা ছাড়িয়া দিতে চাহিলেও তাহা সম্ভব হইবে কিনা, এ-বিষয়ে ঘোর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা সভাতেই তাহার অন্তর্নিহিত আশঙ্কা উপলব্ধি করিয়াছি। এবং—'সে বড়ো কঠিন ঠাঁই'—কিনা!

\+ \+ \+

'বিচিত্রা'য় দেখিলাম,—'সে আজি বিদায় নেবে।' মন কেমন করিয়া উঠিল! ভাবিলাম, কবির ইহা ফাঁকা আওয়াজ। সে যদি সত্য সত্যই চলিয়া যাইবে, তাহা হইলে তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিয়া আর লাভ নাই। তখন মনকে চোখ ঠারিয়া অবশ্যই বলিতে হইবে—

"আপনি সে যদি যায় চলে
আমার দুয়ার হ'তে পদচিহ্ন যদি মুছে যায়,
সে কলগুঞ্জন যদি থেমে যায় কুঞ্জবীথিতলে
কখন আসিবে বলে' রহিব না তার
প্রতীক্ষায়।"

কিন্তু চলিয়া যাওয়ার পর আবার যদি ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা রহিয়া যায়? তখন আবার আড় চোখে তাকাইয়া থাকিয়া জপ করিতেও হইবে? অর্থাৎ—

"সে যদি চলিয়া যায়, সে যদি ফিরিয়া
পুনঃ আসে
তারই পরিচিত পথে আমন্ত্রিয়া
আনিবে তাহারে
এই ফুল-এই লতা,—চিরদিন যারা
ভালবাসে,
তাদের সবার মাঝে ফিরিয়া সে পাইবে
আমারে।"

অতঃপর তপস্যার বসা চলিবে—

"নিজেরে যে বুঝে না'ক',
কেমনে সে বুঝিবে আমারে
আমারে বাসিয়া ভাল, সে বুঝে না
তারে ভালবাসি,
দ্বিধাবিজড়িত পায়ে (?) সে আসিল
প্রিয়-অভিসারে,
অশেষ-চুম্বন সুখে ফুটিল না তার
মুখে হাসি।"

আহা! 'অশেষ-চুম্বন সুখে'ও যাহার মুখে হাসি ফুটিল না…তাহাকে লইয়া আর পৃথিবীর কোন কাজটি সুসমাধা হইবে? কপালকুণ্ডলাকে লইয়া নবকুমার এইজন্যই বুঝি বিপদে পড়িয়াছিল!

বৃদ্ধের পক্ষে যখন 'তরুণী-ভার্য্যা' গ্রহণ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, তখন 'তরুণী-ভার্য্যা'র পক্ষেও যে সপত্নী-পুত্রের উপর স্নেহের দৌরাত্ম্য অস্বাভাবিক নয়, 'বিপর্য্যয়'-এ তাহার আভাষ পাওয়া গেল। একস্থলে—

"কথা কহিতে গিয়া নূতন মার ওষ্ঠাধর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল,—সমস্ত মুখে অপরিসীম বেদনার আভাষ। তবু সে দৃঢ় অথচ মৃদুকণ্ঠে কহিয়া গেল,—সত্যি বোলচ সমস্ত জীবনটা নির্ভর করে। কৈ, আমাকে তো কেউ জিজ্ঞেস করেনি কোনদিন—কি আমার ইচ্ছা। লেখাপড়ার আস্বাদ জানিনে,—তবে আমার

মনে হয় অশিক্ষিতেরও ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে। ঐশ্বর্য্য দেহকে সাজাতে পারে, কিন্তু মনের শূন্যতা পূর্ণ করবার শক্তি তার নেই।"—

এইরূপ শুনিয়া, কিছুদিন পরেই যদি আবার দেখা যায় সপত্নীপুত্রের অবস্থা একদিন—

"টেবিলের উপর অন্যমনস্কভাবে ওটা-সেটা নাড়াচাড়া করিতে করিতে 'রাইটিং প্যাড'টা খুলিতেই এক জায়গায় মেয়েলী-হাতের কাঁচা অক্ষরের কতটুকু লেখা প্রণবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। লেখাটুকু প্রণব পড়িল। নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস হয় না, লেখা-টুকুর উপর আবার সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাইয়া গেল। তারপর ঘরের বাতাস অসহ্য মনে হওয়ায় যেমন আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।"—

তাহা হইলে অবশ্যই 'ভাগ্যবানের বোঝা' ভগবানের ঘাড়ে চাপাইয়া দিব! কিন্তু 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা'র গতি কি হইবে? 'বিচিত্রা'র লেখিকা 'ভাগ্য-রহস্যাবৃত' বলিয়াই হাল ছাড়িয়া না দিয়া, বরং একটা পরিণতির আভাষ দিয়া—তাহাকে একটা সুস্পষ্ট দাবীর দৃঢ়তায় ফুটাইয়া তুলিলে, নারীত্বের লাঞ্ছনা পথের নির্দ্দেশ পাইতে পারিত। চিত্রটি বেশ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে!

'প্রদীপ' বন্দে আলীর পল্লী-প্রীতিতে বেশ জলিতেছে! অর্থাৎ ভেঁপো রাখাল ছেলেদের সহিত কে যেন বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেছে। যথা—

"রাখাল ছেলে বন্ধু আমার তোমার সাথে
যাবো তোমার গাঁয়
সবুজ মাঠে রইবো বসে গাছের তলে
ঘন পাতার ছায়।"

ভরা দুপুর বেলা গাছের তলায় ঝিরি-ঝিরি বসিবার পর, অবশেষে যাহাই হউক না কেন, উত্তম ও মধ্যমের আশঙ্কা যে দেখা যাইতেছে না—তাহা হলপ করিয়া বলিলেও ক্ষতি নাই! কারণ ভুতে তখন মড়া আগ্‌লাইয়া যাইতেছে।

* * *

বেনের দোকানে গিয়া বামুন ঠাকুর, অভাবে পদ্ম পিসী আধ পয়সার পাঁচ-ফোড়ন অনায়াসে কিনিয়া আনিতে পারে। প্রয়োজন হইলে পদ্ম পিসীর জন্য বামুন ঠাকুর এবং বামুন ঠাকুরের জন্য পদ্ম পিসী যথাক্রমে স্যাকরার দোকানে নাকছাবি আর পোষাকের দোকানে সেমিজের অর্ডারও দিতে পারে। কিন্তু কবিতা বেনের দোকানের মশলাও নহে, আবার স্যাকরা বাবাজীবনের হাতুড়ীও নহে! উহা এক অপূর্ব্ব চীজ! সত্য সত্যই অপূর্ব্ব।

কিন্তু 'বঙ্গশ্রী'র একটি কবিতা দেখিয়া আমার মত একেবারে বদলাইয়া গেল। এমন একটি প্রাণস্পর্শী কবিতা নিশ্চয়ই বহুদিন পড়ি নাই। কবি বলিতেছেন—

"যারা আজ ভুলে গেছে
ঋষিদের মহা-মন্ত্র, কুশিক্ষায় মাতি'—
সংসারে দিয়াছে তুলি
শ্মশানের চিতাবক্ষে; কলঙ্কের স্রোতে
ভেসে যায় প্রতিদিন;
এ জাতির ভাগ্যাকাশে চির অমারাতি
যাহাদের অত্যাচারে
ঘনাইয়া আসে আজি; নানাদিক
হ'তে—"
ইত্যাদি।

উল্লিখিত দুর্ভাগাদের জন্য দিলদরদী কবি আপনা হইতেই যাহা করিতেছেন—

"বিপ্লবের গান গাহি,
আনন্দেতে পাশ্চাত্যের অবিদ্যা লভিয়া
কলুষিত করে দেশ,
হে ঈশ্বর! তাহাদের তুমি কর ক্ষমা"!

কবিতাটি আগাগোড়া পাঠ করিয়া মনে হইল, স্বয়ং বিশু যেন মানব তনুতে মাসিক পত্রিকার অফিসে আসিয়া হাজির হইয়াছেন! এই জন্যই বুঝি আত্মদান না করিলে কবি হওয়া যায় না? তবে এতদিনে একটি সত্যিকার কবিতা পাঠ করিয়াই এতই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি…থাক—আত্মসংবরণ করিতেই হইল!

'বঙ্গশ্রী'র জন্মক্ষণ হইতে 'জনৈক অর্থ-নীতির ছাত্রের' পাণ্ডিত্যে বিশেষরূপে পাঠকসাধারণের জ্ঞানক্ষুধা বাড়িয়া আসি-তেছিল। তারপর 'ক্যাটারপিলার' যেদিন হইতে 'বাটারফ্লাই' হইলেন, অর্থনীতির ছাত্র হইলেন শ্রীসচ্চিদানন্দ, এবং অর্থও নাকি সাহিত্যচর্চ্চার গাইড রূপে প্রতিপন্ন হইল· তখন হইতে আম-রাও প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া উঠিতে-ছিলাম। অতঃপর প্রথমে শ্রীসচ্চিদানন্দ ও শেষে সম্পাদকদ্বয়ের অনুমতিক্রমে—তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া ভাবিতেছিলাম, সম্পাদকদ্বয় তাহা হইলে করেন কি? পরে ভাবিয়া দেখিলাম, হয়তো প্রুফ দেখিয়া তাঁহারা সময় পাইয়াই উঠেন না। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অবিরাম লিখন-ক্ষমতা দেখিয়া হতবাক হইয়া গিয়াছিলাম। একটি লোক যে অবিশ্রান্ত এইরূপ লেখনী চালনা করিয়া যাইতে পারে ইহা বাঙা-লীর পক্ষে গৌরবের কথা, আনন্দের বিষয়। কিন্তু আনন্দ সেইদিন অবশ্য সার্থক হইয়া উঠিবে, যেদিন…অর্থাৎ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্পাদক হইবেন! কবে?

কিন্তু এই সচ্চিদানন্দের আওতায় সাবিত্রী প্রসন্ন, সজনীকান্ত রহিলেন না। এমন কি বিজয়রত্নও টিকিলেন না, এবং উপানন্দের টোলও প্রেমেন্দ্র দখল করিয়া লইলেন। ইহাতে সত্য সত্যই আমাদের
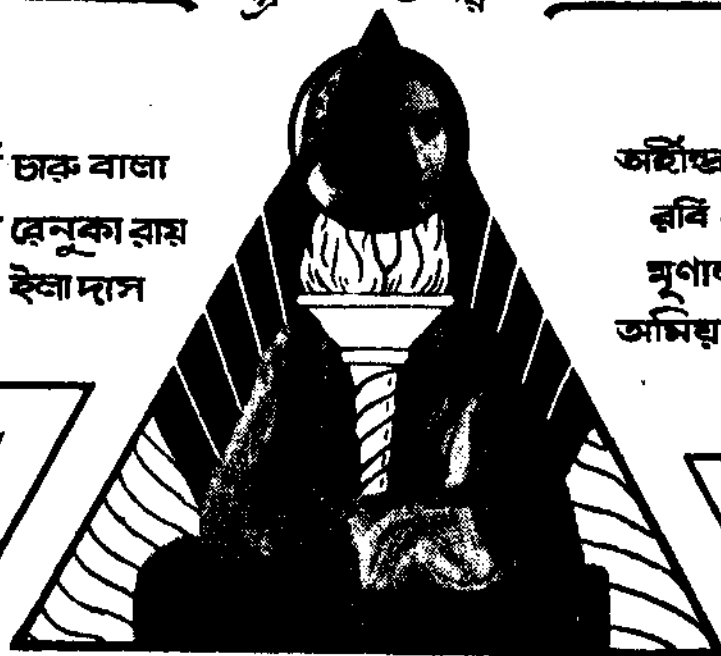
মন দমিয়া গিয়াছে! শ্রী ইহাতে বাড়িয়া উঠিল, কি কমিয়া গেল, খোদাই তাহার মর্ম উদ্‌ঘাটন করুন। আমাদের আর বলিবার কি আছে?

*   *   *

'বিবর্দ্ধন'-এর কবি যাহা বলিতেছেন, তাহা পড়িয়া তাঁহাকে গোবর্দ্ধন বলিয়াই মনে হইতেছে। 'রূপ-সিন্দু'র মধ্যে নামিবার মুহূর্ত্তে অবশ্য আত্মহারা না হইয়া উপায় নাই, কারণ সৌন্দর্য্যের প্রভাবে মহর্ষির মত মানুষও আত্মবিস্মৃত হইতে বাধ্য। তাহার প্রমাণ সর্ব্বদাই পাওয়া গিয়াছে। তাই—

"ডুবে যাই তিলে তিলে সখি, তব
সৌন্দর্য্য-পাথারে!
তব লাবণ্যের যারা পায় নাই
অমৃত-আস্বাদ
কূলে রহি' তারা সবে মোরে শুধু
ডাকে বারে বারে
ভ্রান্তিহীন! তাহাদের অর্থহীন
শুষ্ক নীতিবাদ
পশেনা শ্রবণে মোর!"

বলিয়া কবি ডুবিয়া যাইতেছেন। ইহাতে অবশ্য তাঁহার উপর আমাদের কোনোই হাত নাই। কেননা, অবস্থা যখন চরমে উঠিয়াছে, ধরিয়া আনিয়া তুড়ুং ঠুকিয়া লাভ কি? কিন্তু—

"আমি শুধু—
যাই—নেমে যাই
উতল-উন্মাদসম রাত্রিদিন
মহাসিন্ধু পানে
আকুল পিপাসা নিয়ে;"—

তখন কবিকে খরচ না লিখিয়া গতিও আর নাই! হায় কবি এমন করিয়াই কি 'রূপসিন্ধু-নীরে'—'আকণ্ঠ'ই (?) ডুবিয়া যাইতে হয়? আমরা কিন্তু—'দস্যু'কে বলিতেছিনা, এম-এ আশুতোষকে বলিতেছি!

*   *   *

'সাহানা'র 'যৌন আবেদন' এ যৌন-বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্বের পরিবর্ত্তে শেষ পর্য্যন্ত যে সংবাদ পাইলাম, তাহাতে অকালে 'এপ্রিল ফুল' হইয়াও আনন্দিত না হইয়া পারিলাম না। সিনেমা সাপ্তাহিকের আংশিক সম্পাদনে প্রথম মুসলিম মহিলা কুমারী সাহানারা চৌধুরীর সংসাহসে আমরা সবিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহার সুসম্পাদনে উত্তরোত্তর 'সাহানা'র শ্রীবৃদ্ধি হইলে আরো সুখের হইবে। এই জন্য সম্পাদক হেমন্তবাবুর কথা—

"মেয়েদের নিজের দিক থেকে অনেক কথাই বলবার আছে, যা আমরা— পুরুষরা ঠিকমত বল্‌তে পারি না। বল্লেও, তাঁদের অন্তরের কথা বলতে পারি না। তা ছাড়া চিরকাল মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষেরা ব'লে চল্‌বে এর মত অবিচার আর নাই। তাঁরা নিজেদের কথা নিজেরাই বলুন, তাঁদের সেই এতকালের মূক স্বীকারোক্তি থেকে পুরুষদের মুক্তি দিন,—তবেই হবে তাঁদের আন্দোলন সার্থক।"

আমরা সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করি। কিন্তু 'যৌন আবেদন'-এর ঘটা করিয়া অবশেষে এই শুভ সংবাদটি প্রচার না করিয়া, সহজ সরল পথে অগ্রসর হইলে আরো বেশি আনন্দিত হইতাম! প্যাঁচ কষিবার সত্যই কি দরকার ছিল?

তবে সম্পাদক মহাশয়ের যে 'হাইপোকোনাড্রিয়া'র স্থলে 'হাইড্রোফোবিয়া'র পাইয়া বসিয়াছে, এমন কথা নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস করিবনা! কারণ 'উদয়ন' প্রকাশের জাঁকজমক ইতিপূর্ব্বেই প্রত্যক্ষ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর আবার কোন তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিব, সেই কথা ভাবিয়াই আকুল হইয়া উঠিতেছি!

*   *   *

'চিত্রপঞ্জী'তে আমাদের গির্জ্জেদা' বলিতেছেন—

স্পন্দহীন বারিতে জাগিল
নবীন ঢেউয়ের সাড়া,
বিধু চুম্বিত উর্ম্মি দুলিল
সুপ্ত সকলের খাড়া,
প্রেম সাগরের বুকে আজি তার—
উদ্দাম খেলা চলে,"

'সকলের খাড়া' ব্যাপারের জন্য 'উদ্দাম খেলা' চালাইতে 'সাগর ধারে' যাওয়ার এমন ফতোয়া না পাইলে বিধু কি আর চুম্বিতে সাহস করিত?

সুধীরেন্দ্র সান্যালের 'নিছক নক্সা'টি পড়িয়া মনে হইল, 'ঠাকুর ঘরে কে?'—এই প্রশ্নটির উত্তরে তিনি যে কলা খান নি—তাহাই বলিতে চাহিতেছেন। তবে—'উৎপাতের কড়ি, চিৎপাতেই যায়!' এরূপ একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব তিনি যে উপলব্ধি করিয়াছেন, ইহাই মঙ্গল। 'চিৎপাৎ'-এর উদ্বোধন-দিন কি সত্য সত্যই ঘনাইয়া আসিতেছে?

পরী

(গল্প)

মৃণাল কান্তি দাস

একা দাঁড়িয়ে আছি এক মনোরম পাহাড়ের সামনে। নবীন নীল অরণ্যে ছেয়ে আছে গোটা পাহাড়টা।

ঊর্দ্ধে ময়ূরকণ্ঠী নির্মল আকাশ। আর চূড়ার ঢঙ্গে ঝলমল করছে স্বর্ণ-কিরণ। নীচে, আলোছায়ার রাজ্যে চলেছে তির্যক গতিতে রজত দ্রুত ঝরণা। বাতাসে ভেসে আসছে তার কল মর্মর।

মনে পড়লো একটা প্রাচীন কাহিনীর কথা। মনে পড়লো কী করে আদিম গ্রীকজাতি কোন পুণ্য-প্রভাবে ইজিয়ান সাগরে ভাসিয়েছিল তাদের জাহাজ।

দুপুর। সেদিন আবহাওয়া ছিল শান্ত। হঠাৎ নাবিকের মাথার উপরে আকাশে কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল: দ্বীপের পাশ দিয়ে যখন যাবে, জোরে চেঁচিয়ে উঠ: বন-দেবতা নেই।

বিস্মিত হয়ে গেল নাবিক—বিস্মিত, ভীত। কিন্তু আদেশ পালন করলো সে। না, দৈবকে সে এড়িয়ে যাবে না, কিছুতেই সে অবহেলা করবে-না দৈবকে: বনদেবতা নেই। মৃতস্বরে সে বললে। দুঃস্বপ্নের মত তার দৃষ্টির অন্তরালে জড়িয়ে ছিল অদূর ভবিষ্যৎ।

আর সেই মুহূর্তে, এল বাক্যহারা বার্তা নিয়ে সেই মুহূর্তে তার জবাব, (যদিচ দ্বীপটা জনহীন) শোনা গেল সকরুণ দীর্ঘশ্বাস, বিলাপ—যেন কোন্ চির বিরহিনী অপ্সরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল: নেই, আমার বন দেবতা নেই। সেই প্রাচীন কাহিনীর কথা ভাবতে লাগলুম আমি—আর অদ্ভুত সব চিন্তা এসে ভিড় করে দাঁড়াল আমার সামনে। আচ্ছা, আমি হ'লে তখন কী করতাম?

চারধারে মুক্ত সৌন্দর্য্য কম্পমান দুপুরের খর রৌদ্র মাথার'পরে সীমাহীন নীলাকাশ, আর দিক্‌হারা সমুদ্রের বিশালতা, নীলজল—অনন্ত তার সঙ্গীত। আর সামনের অপূর্ব্ব শ্যামল বনশ্রী। এই পরিপূর্ণ মহিমার মধ্যে অন্ততঃ কিছুতেই আমি মৃত্যুর কথা ভাবতাম না, কিছুতেই না। চেঁচিয়ে উঠতুম জোর গলায়—বন-দেবতা আছেন। আশ্চর্য্য, অতি আশ্চর্য্য! আমার ডাক শুনে নীলপাহাড় শব্দহীন কলহাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো! সহস্রকণ্ঠের প্রফুল্ল মর্মর আর করতালি শোনা গেল: তিনি আছেন, বন দেবতা আছেন। ফেটে পড়লো সব, আমার সম্মুখের দৃশ্যমান্ জগৎ ফেটে পড়লো হাসিতে। সূর্য্যের চেয়ে উজ্জ্বল, বাদলদিনের ইন্দ্রধনুর মতো সে হাসির বিলাস! লঘু পদক্ষেপের শব্দ শুনতে পেলুম। ছেয়ে গেল বনভূমি রূপালী আলোর···নিটোল তন্বীদেহের জ্যোতিতে···পরী! পরী! বনদেবী! এক শরীরী স্বপ্ন!—দ্রুততালে তারা নেমে আসতে লাগলো শিখর থেকে শিখরে।

একসাথে তারা এসে পৌঁছলো পাহাড়ের সানুদেশে। তাদের আঙুর দোলান অলক বাতাসে ভাসতে লাগলো, পুষ্প-পেলব ঊর্দ্ধবাহুতে দুলছে নাম না জানা ফুলের মালা। কী মিষ্টি কাঁকন-চুড়ির রিণিঠিনি! আর কল-হাসি—যুঁই ফুলের মত কলহাসি!···চলেছে তাদের নৃত্য।

নৃত্যের সম্মুখে এক দেবী মূর্ত্তি। সবচেয়ে উঁচু আর সুন্দর সে-মূর্ত্তি; মসৃণ কোমল বাহু, পীনোন্নত পয়োধর, মুখে লোধ্র রেণু,—এলোমেলো অলকে তার মেঘ সমারোহ, চোখে লীলাবিদ্যুৎ—চাঁদের মতো মুখশ্রী।

ভেনাস্!—তুমি?

সহসা থেমে গেল দেবীর নৃত্য ছন্দ—আর সাথে সাথে থেমে গেল পরীর দল। আলেয়ার আলোর মতো মুহূর্তে মিলিয়ে গেল তাদের মুখর হাসি।

একেবারে শুদ্ধ, বিবর্ণ দেবীমূর্ত্তি। যেন মাটীর বুকে মিশে গেছে তার পা, রাঙা ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে এক অকথিত ভয়ে; আঁখির পাতা বিস্ফারিত, কোন সুদূরে অবসিত দৃষ্টি—কী দেখছে দেবী? বিস্মিত চোখ মেলে দেবী কি দেখছে, কোথায় তার দৃষ্টি? আমি ফিরে তাকালুম—যে দিকে দেবী চেয়ে আছে বিস্মিত চোখ মেলে।

সুদূর দিগন্ত রেখায়, একখানি খোলা জমির পরে যেখানে নীল আকাশ ঝুঁকে

পড়েছে, সেখানে মাথা উঁচু কোরে দাঁড়িয়ে আছে আগুন রাঙা একটী মন্দিরের চূড়া,·· সেই চূড়ার দিকে তার দৃষ্টি।

এমন সময়ে পেছন দিকে শুনতে পেলুম এক বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। ফিরে তাকালুম--পরীর দল নেই --অসম্ভব এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তারা অদৃশ্য হতে পারে না! কিন্তু শুধু সাদৃশ্যে নয়, নিষ্ঠুর সত্যটা পরীর দল নেই, পরীর দল নেই! নির্জ্জন, নিরালা, কোনদিকে কেউ নেই।

বিস্তীর্ণ বনভূমি নীল, কোন পরিবর্ত্তন হয়না তার। এখনো সে পূর্ব্বৎ নীল। নীল ঘুম-ভরা পাহাড়টা। শুধু ঘন পল্লব-ঝালরে কেমন একটা সাদা আভা দীপ দীপ করছে। একী পরীদের বসনাঞ্চল নীল বনের অন্তরাল থেকে উঁকি মারছে, না আর্দ্র অদিত্যকার নীহারপুঞ্জ··· কে জানে!

অর্থহীন দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলুম ঐ অকরুণ নিস্তব্ধতার দিকে। ভারী দুঃখ হ'ল অদৃশ্য অপ্সরীদের জন্য।*

* টুর্গেনিভ।

আধুনিক সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

[দীনেশ বাবুর নিকট হইতে আমরা নিম্নলিখিত পত্রখানা পাইয়াছি। তিনি আধুনিক যুগের একজন উদীয়মান লেখক, তাঁহার বহু গল্প এবং উপন্যাস বিভিন্ন কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং পত্রখানা আমরা প্রকাশ করিলাম। যদি এ বিষয়ে কাহারও কোন বক্তব্য থাকে তাহাও আমরা গ্রহণ করিব, কিন্তু বক্তব্য ব্যক্তিগত আলোচনা মূলক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সঃ স্বঃ]

১৯ সংখ্যার স্বদেশ পাইলাম। বর্ত্তমান সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে অনেক নিখুঁত এবং সত্য কথার অবতারণা হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইয়াছি। সাহিত্য জাতির সম্পদ এবং ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয় একথা রসিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। যখন সাহিত্যে জোয়ার আসে তখনই সাহিত্যের নদীও যে আগাছায় ভরিয়া যায় ইহা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিলেই জানা যায়। ভাটার সময় শুধু জলই নামেনা, আগাছাও নামিয়া যায় এবং ভাটার আক্রমণে নীচের মৃত্তিকার সমস্ত জল ঘোলাইয়া ওঠে—ইহা প্রকৃতির কথা। প্রকৃতির এই বিচিত্র বিকাশই আমরা সব স্থানে দেখি, আকাশের ঐ পরিপূর্ণ বাতাসের মধ্যে, জোছনা রাত্রির ঢেউ খেলানো শ্বেত শুভ্র চাঁদের আলোয়, দূরে এবং নিকটে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের। যেখানেই তাকাই না কেন, দেখিতে পাই যে নব যৌবনের মধ্যেই ছন্দ পতন এবং বহুমুখী প্রতিভা দুইটিই পাশাপাশি স্থান পায়। বার্দ্ধক্যের জীবনে শুধু ভাটার টানই নয়—সব কিছুই তলাইয়া যায়। এখানেই তরুণ এবং নবীনের দ্বন্দ্ব।

আজকার সাহিত্যের কথাও এই। বর্ত্তমান সাহিত্যের দিকে দিকে যে শোভা যাত্রা, যে সৌন্দর্য্য রূপ লাবণ্য লইয়া দেখা দিয়াছে—তাহা বঙ্গ সাহিত্যের যৌবনের একটী সুর, মানুষের জীবনের মত সাহিত্যের যৌবন একবারই নয়—সে যুগে যুগে কোন বিরাট প্রতিভার মধ্য দিয়া জাগ্রত হইয়া উঠে। আধুনিক যুগ রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া বিশ্ব ভাণ্ডারের সাহিত্যেও অনেক কিছু দান করিয়াছে। কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়াও কম হয় নাই। শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে আমাদের নিজস্বতার সুর--রচনা পাঠের পর পাঠ করিয়াও পুরানো হয় না। এ যেন আমাদের একান্ত পরিচিত কতগুলি চরিত্র যাহারা রূপ রস লইয়া আমাদের নিকটে দেখা দিয়াছে। অবশ্য শরৎবাবু বিশ্ব সাহিত্যে কিছু দান করেন নাই, ইহার কারণও স্পষ্ট। কিন্তু গণ্ডী তাঁহার ছোট বলা চলেনা, শরৎচন্দ্র একান্ত ভাবে নিজের বঙ্গ ভাষাকেই বড় করিয়াছেন, অন্যদিকে তাকাইবার অবসর হয় নাই—দ্বিতীয়তঃ য়ুরোপীয় ভাষায় তাঁহার পুস্তক প্রকাশিত না হওয়াই তাঁহার প্রতিভার চরম বিকাশ ঘটে নাই। ওমর খৈয়াম পুড়ে নাই শিক্ষিত মহলে এমন লোক বিশে আর

খুবই কম। কিন্তু কেউ তাহাকে চিনিতনা, চিনাইয়া দিলেন অন্ত একজন য়ুরোপীয়। শরৎবাবু যদি নোবেল প্রাইজ পাইতেন তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে অনেক বড় করিয়া দেখিতে পারিতাম, কিন্তু পান নাই বলিয়া যে তাহার রচনা কাহাকেও কম মুগ্ধ করে তাও নয়।

যা বলিতেছিলাম। বঙ্গ সাহিত্যের যৌবন যখন আসিল আগাছা আসিল তখন। বৈষ্ণব সাহিত্যেও তখনই আগাছা জন্মিয়া উঠিয়াছিল যখন চণ্ডীদাস প্রভৃতির যুগ, বঙ্কিমের সময়ে বটতলার বই-ই বেশী প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ এক কথায় যাহার মধ্যে ভক্তিপোর সুর ভুল বা দোষ একমাত্র তাহার পক্ষেই সম্ভব।

অর্থাৎ আগাছা যদি আসে আসুক।

কিন্তু আসুক বলিয়া চুপ করিয়া থাকিলে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারেনা। কচুরি পানার মত আগাছা জিনিষটা এতই বেশী ছড়াইয়া পড়ে যে তাহাকে বাধা দেওয়াও কঠিন হইয়া ওঠে—উপরন্তু প্রতি শক্তিকে পদে পদে সে বাধা দেয়। সোজা কথায় আগাছাকে ভয় না করিলেও বিপদ ঘটাইতে সে পারে।

বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যের কথা অনেকটা এই। যৌবনের জন্মের সাথে আগাছা ঢুকিয়া সাহিত্যকে ভরিয়া ফেলিয়াছে। আধুনিক যুগ যান্ত্রিক যুগ—সুতরাং কেউ কোন বিষয় মন্দ বলিলে, অন্ত পক্ষ ভাল বলিবেই অথবা এক পক্ষ ভাল বলিলে অন্ত পক্ষ মন্দ বলিবেই, একজই বলিতেছিলাম যে আধুনিক সাহিত্যে আগাছার ভাগ বেশী। কারণ বঙ্গ সাহিত্যে রাখিবার মত একখানা বইও আধুনিক কোন লেখকরা দেন নাই, দিতে পারেন বলিয়াও এখনও ভাবিবার অবসর আসে নাই। যান্ত্রিক যুগের সব চেয়ে বড় কথা হইল পাবলিসিটি। শ্লীল অশ্লীলের গোলে হরিবোলে যাহারা আলোচিত হইয়াছেন তাহারই জনসাধারণের সম্মুখে আগাইয়া আসিতে পারিয়াছেন—প্রকৃত পক্ষে প্রতিভাই তাহাদের আগাইয়া আনিয়াছে কিনা তাহাও ভাবিবার বিষয়। কাহাকেও কটাক্ষ করিয়া আমি একথা বলিতেছিনা। কারণ মানদা দেবীর আত্মচরিত, বা বড় কাকার বই যে সময় হাজার হাজার কাপি বিক্রি করিতে এক মিনিটও লাগেনা, সে সময় যদি উগ্রকাম প্রবৃত্তির ঠাস বুনানীর কোন বই বাহির হয় তাহা বিক্রি হইবেই, নিজেও আমি আধুনিক লেখক সুতরাং কথাটা ভাবিয়াই বলিলাম।

বার্ণার্ড শ'র কাম গন্ধহীন প্রেম

খ্যাতনামা ইংরাজ লেখক মিঃ মরিসের একটি জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। বইখানা লিখিয়াছেন, মিঃ মরিসের কন্যা মে মরিস। মিঃ বার্ণার্ড শ' উক্ত পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন। ভূমিকায় মিঃ বার্ণার্ড শ' মরিসের কন্যার সহিত তাঁহার "রহস্যময় বিবাহের" এক আশ্চর্য্য কাহিনী বিবৃতি করিয়াছেন।

বার্ণার্ড শ' লিখিয়াছেন :—"মরিসের বাড়ীতে বহু সুন্দর জিনিষ দেখিয়াছিলাম তাহার মধ্যে একটি হইতেছেন, মরিসের পূর্ণ যৌবনা অপরূপ সুন্দরী কন্যা"—আমি তখন কুমার—চিরকালই কুমার জীবন যাপন করিতে হইবে এমন ধারণাই তখন মনে ছিল। আমার ন্যায় দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে মরিসের কন্যার ব্যয় নির্ব্বাহ করা সম্ভব নহে—তখন আমার এক বৎসরের আয় দিয়াও বোধ হয় মরিসের কন্যার এক সপ্তাহের ব্যয় কুলানো যাইত না।

একদিন রবিবারে বক্তৃতার পর খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া হ্যামারস্মিথ ভবনের দরজায় দাঁড়াইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে যাইতেছি, তখন দেখি মরিস কন্যা ভোজন-কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। আমি তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তাঁহার মনোরম বেশভূষা, অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তিনিও আমার দিকে তাকাইলেন এবং ইচ্ছা করিয়াই এমন ইঙ্গিত করিলেন যাহাতে বুঝা গেল যে তিনি আমাকে স্বামীর পদে বরণ করিতে সম্মত আছেন। তখনই আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ভগবান আমাদের বিবাহ বন্ধন স্বীকার করিলেন ;—বাস্তব জগতের বাধা দূরীভূত হইলেই ঐ বিবাহ সম্পূর্ণ হইবে।

মিঃ বার্ণার্ড শ' তখন কিছুই বলিলেন না—বলিবার দরকারও বোধ করিলেন না। তিনি যে বড় বড় প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের সমশ্রেণীভুক্ত তাহা তখনই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কাজেই ভাগ্যচক্র যে তাঁহার ঘুরিবে, ঐ বিষয়ে তিনি স্থির নিশ্চয় ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বার্ণার্ড শ'য়ের মত একজন কমিউনিষ্ট কমরেডের পক্ষে মরিসের মেয়েকে কষ্টে ফেলাও ত ঠিক নয়! কাজেই বার্ণার্ড শ' কিছুই বলিলেন না। অতঃপর বার্ণার্ড শ' লিখিতেছেন :—"অকস্মাৎ মরিসের কন্যা একজন কমরেডকেই বিবাহ করিলেন। আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম, মরিসও নিশ্চয়ই হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন।"

'আমারই দোষে ব্যাপারটা ঘটিল। মনে মনে "স্বর্গীয় বিবাহ" প্রকৃত বিবাহ বলিয়া ধরিয়া লওয়াতে গোলমাল বাধিল। যাহা হউক—তখন আমার মনে হইয়াছিল এবং এখনও আমি মনে করি যে, মরিস-কন্যা ঐভাবে বিবাহ করিয়া প্রেমের ইতিহাসে ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়াছেন।'

এখানেই কিন্তু শেষ হইল না— অতিরিক্ত পরিশ্রমে বার্ণার্ড শ'র স্বাস্থ্য ভগ্ন হইলে মরিস-কন্যা ও তাঁহার স্বামী তাহাকে তাঁহাদের সহিত ছুটি উপভোগের জন্য অনুরোধ করিলেন। 'কিছুকাল ভালভাবেই কাটিল' বার্ণার্ড শ' লিখিতেছেন—"কিন্তু তাহার পর স্বর্গীয় বিবাহ তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল।"

"রহস্যময় স্বর্গীয় বিবাহ আমাদের তিনজনকে শান্তিতে থাকিতে দিবে না," তাহা বুঝিতে পারিলাম। নিজেকে অনেক বুঝাইলাম, কিন্তু অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া উঠিতে লাগিল, আমি সরিয়া পড়িলাম।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মরিস কন্যার স্বামীও সরিয়া পড়িলেন। কেমন করিয়া উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল তাহা অবশ্য বার্ণার্ড শ' জানেন না। মরিস কন্যা আবার পিতৃদত্ত নাম গ্রহণ করিলেন।

৪০ বৎসর পরে মোটরযোগে মিঃ বার্ণার্ড শ' মষ্টারে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তিনি দেখিতে পাইলেন যে, মরিস কন্যার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। "দরজা খুলিয়া গেল—মনে হইল আমি মাত্র দশমিনিটের জন্য ঐ বাড়ীর বাহিরে গিয়াছিলাম। মরিসের সেই সুন্দরী কন্যা আজ অবশ্য বৃদ্ধা—আমিও বৃদ্ধ হইয়াছি—আমার সঙ্গে আবার মিলন হইল। মনে হইল, এত বৎসরের মধ্যে কোন ঘটনাই ঘটে নাই।"

জয়ন্তীর খোকা

[গল্প]
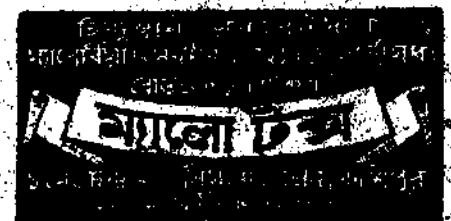
হরিদাস মুখোপাধ্যায়

মা, বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে। খোকা ঐদিকে নিবিষ্ট আরামে, মেঝের এক দোয়াত কালী ঢেলে নিজের মুখে চোখে মাখছে।

—"ও'মা, কি দুষ্টু ছেলে! সমস্ত কালিটী মুখে মেখেছ" ? মা'কে দেখে, খোকা একমুখ হেসে বল্লে—"মা, জু," ।

জয়ন্তী কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে বল্লে—"দাঁড়াও, তোমার জুজু হওয়া বের করছি" ।

খোকা হাত বাড়িয়ে মা'র দিকে এগিয়ে এল। জয়ন্তী সরে গিয়ে বল্লে—"লক্ষী ধন, এখন কোলে আসতে নেই, আগে হাত ধুইয়ে দিই" ।

এ'বার খোকা শান্ত ছেলের মত হাত দুটী বাড়িয়ে দিলে। ছেলেকে নিয়েই জয়ন্তীর সারাদিন কাটে। মুখ খানা ঘসে ঘসে লাল করে দেয়। আলতা পরা ছোট্ট পা'দুখানি লাল ফুলের মত দেখায়! চোখের কোলে কাজল পরিয়ে জয়ন্তী ডাকে—"খোকা বু" ।

খোকা ঘরের কোণে চোখ বুজে বুড়ী সাজার অভিনয় করে। জয়ন্তীও ওর সঙ্গে ছেলেমানুষের মত সমানে খেলা করে।

এইটিই জয়ন্তীর প্রথম ছেলে। সবে তিন বছর হল বিয়ে হয়েছে। কিন্তু মনে এখন গিন্নীপনার আঁচটুকুও লাগে নি। সেদিন ত বড় ননদ হেসে বল্লে—"ছেলে ত সকলেরই হয়, কিন্তু তোর মত অমন ছেলে পাগলা আর কাউকে দেখি নি" ।

খোকার কথা নিয়ে ঠাট্টা করলে জয়ন্তী সহ্য করতে পারে না। জবাব দিলে, "পাগলা কি আর সাধে হয়েছি, একদণ্ড যদি খোকা কাছে না থাকে ত বুকটা যেন খালি হয়ে' যায়" ।

বড় ননদ গালে একটা ঠোনা দিয়ে বলে—"দেখিস, ছেলের কথা ভাবতে গিয়ে ছেলের বাবাকে যেন ভুলিস নে" ।

অনঙ্গ ক'বছর হাইকোর্টে বেরুচ্ছে। বন্ধু বান্ধব যখনই দেখা করতে আসে ডায়েরী খুলে দেখায়, মোকদ্দমার ভিড়ে তার আহার নিদ্রা বন্ধ। জয়ন্তী মাঝে মাঝে তাড়া দিয়ে বলে—"যত বুড়ো হচ্ছ, মিথ্যে কথা বলাও কি বাড়ছে" ?

অনঙ্গ জবাব দেয়—"মিথ্যে কথা বলা বাড়ছে কিনা বলতে পারিনে, তবে সত্যি কথা বলা যে কমছে না এটা বেশ বুঝতে পারি" ।

শনিবার সকাল সকাল কোর্ট থেকে ফিরে অনঙ্গ বল্লে—"একটুখানি, আজ খোকাকে ফেলে থাকতে পারবে" ?

জয়ন্তী রেগে বল্লে—"আহা কথার ছিরি দেখ! খোকা যেন সারাক্ষণ আমার কাছেই থাকে" ।

অনঙ্গ বল্লে—"বল কি! থাকে না! তবে কার কাছে বিশ্বাস করে খোকাকে ছাড় ?"

জয়ন্তী বল্লে—'ন্যাকামো করো না। কি দরকার তাই বল' ।

অনঙ্গ গম্ভীর হয়ে বল্লে—'আজ রাতে আমার এক বন্ধুর বিয়ে। অনেক করে যেতে বলেছে, চল না যাই' ।

জয়ন্তী একটু চুপ করে বল্লে—'আমার যাওয়া হবে না। সকাল থেকে খোকার শরীরটে ভাল নেই। তোমার আর কি? কোন দিকেই ত চেয়ে দেখ না' ।

জয়ন্তী চলে যেতেই অনঙ্গ সেইদিকে তাকিয়ে একটু হাসলে। আচ্ছা পাগলের পাল্লাতেই পড়া গেছে। মেয়েদের সন্তান বাৎসল্য সহজাগত। কিন্তু এ যে অস্বাভাবিক।

রবিবার দিন অনেক বেলা পর্যন্ত অনঙ্গ বিছনায় পড়ে ছিল। জয়ন্তী ঠেলা দিয়ে বল্লে—'ওগো শুনছ' ?

অনঙ্গ চোখ বুজে উত্তর দিলে—'না, শুনতে পাচ্ছিনে। একটু চেঁচিয়ে বল' ।

জয়ন্তী হেসে বল্লে—'আচ্ছা, এত বেলা পর্য্যন্ত কি বলে ঘুমোও। এদিকে তোমার বন্ধুরা যে এসে ডাকাডাকি করছে' ।

অনঙ্গ পাশ ফিরে উত্তর দিলে—'করছে নাকি! বলে এস না আমি ঘুমুচ্ছি' ।

—'বয়ে গেছে আমার বলতে। তোমার বন্ধুদের সামনে আমি কোনদিন যাই দেখেছ' ?

—'না তা যাও না বটে। কিন্তু যেতে বিশেষ আপত্তি আছে বলেও মনে হয় না' ।

—'ওঃ, বুঝেছি'—জয়ন্তী বল্লে—'সে এক আধ দিন বাধ্য হয়ে বেরুতে হয়। তাছাড়া যখন বেরুই সঙ্গে কেউ একজন থাকে' ।

অনঙ্গ বল্লে—'তা'হলে, একটু আধটু ব্যতিক্রম ত হয়—'

ততক্ষণে জয়ন্তী ঘরের বাইরে চলে গেছে।

বারান্দায় আসতেই বন্ধু অবলা বল্লে—'কি রে এত পিরপিরি ছেড়ে দিলে' ?

অনঙ্গ লজ্জা পেয়ে বল্লে—'আর, বলিসনে ভাই। একটা ছেলের দাপটে এই। না' জানি আরও গুটী কতক হলে, কি হবে? খোকাকে দুধ খাওয়ান, আদর করা, তার সঙ্গে বকর বকর,—এর মধ্যে কি মানুষ ঘুমুতে পারে'?

বন্ধুরা এ ওর দিকে তাকিয়ে হাসলে। জয়ন্তীর অত্যধিক সন্তানপ্রীতি কারুর অজানা নয়।

দিন কতক পরের কথা। একদিন জয়ন্তীর সঙ্গে অনঙ্গর একটু ঝগড়া হয়ে গেল। বাড়ীতে কাউকে কিছু না বলে, অনঙ্গ খোকাকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল। ফিরে দেখে হুলস্থূল কাণ্ড। জয়ন্তী কেঁদে কেটে একশা কাণ্ড করছে। চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে। মা' না'হক দু'কথা সেদিন অনঙ্গকে শুনিয়ে দিলেন। একে ত বন্ধু বান্ধবের ঠাট্টায় ও'র মনটা খিচরে ছিল, এই কাণ্ডে ও জয়ন্তীর ও'পর রাগে আগুন হয়ে উঠল।

পরদিন আদালত থেকে ফিরে অনঙ্গ বল্লে—'আজ আমি বাইরে শোব'।

জয়ন্তী চুপ করে রইল। অনঙ্গ শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল—'মানুষের প্রাণ ত? সারাদিন আদালতে হা' পিত্যেশ; বাড়ীতে এসেও যদি একটু ঘুমুতে না পাই, বাঁচি কি করে?'

জয়ন্তীর মুখে কথা নেই। ও একমনে খোকার মাথা আঁচড়ে দিতে লাগল।

বড়দিদি বল্লেন—'হ্যাঁ রে, তুই কি বাইরে শুচ্ছিস?'

অনঙ্গ বল্লে—'হ্যাঁ, উপায় কি?'

বড়বৌদি বল্লেন—'ছোট বৌয়ের দাপটে শেষে ঘর ছাড়লে ঠাকুরপো?'

অনঙ্গ চোখ টিপে উত্তর দিলে—'তবু ত এখনও বাড়ী ছাড়ি নি।'

বড়জার ধমকানিতে জয়ন্তীর চোখ দু'টী জলে ভরে এল। বিয়ে হওয়ার পর থেকে স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্য ওর এই প্রথম। অথচ ও ভেবেই পায় না, কি ওর দোষ! বল্লে—'দিদি, সত্যি বলছি, আমার কান্না পায়। এখানে থাকতে আর আমার একবিন্দুও ইচ্ছে করে না।'

—'এই মরেছে—কাঁদছিস কেন?'

—'উনি যে রাগ করেছেন।'

—'রাগ করেছে ত কি? রাগ ভাঙ্গাবার ওষুধ তুই জানিস নে?'

জয়ন্তী হেসে ফেলে বল্লে—'দিদি, একটা কথা বলব, শুনবে?'

বড়জা ওকে কোলের কাছে টেনে নিলেন। জয়ন্তীর মত মেয়ে এ বাড়ীতে আর কেউ নেই। ও সবার চাইতে দেখতে সুন্দর, কিন্তু সবার চাইতে ছেলে-মানুষ—বাড়ীর সকলেই ওকে ভালবাসে।

জয়ন্তী চুপি চুপি বল্লে—'আমি চলে গেলে বোধ হয় ভাল হয়—'।

—'দূর বোকা মেয়ে, চলে গেলে আরও খারাপ হবে।'

জয়ন্তী ভয়ে ভয়ে থেমে গেল। বড়জা ওর দিকে সস্নেহে তাকিয়ে একটু হাসলে।

ক'দিন পরে একদিন শাশুড়ী ঘরের বারান্দায় বসে আছে। জয়ন্তী বল্লে—খোকা আমায় 'মা' বলে ডাকছে;—দেখেছেন মা'।

শাশুড়ী সস্নেহে বল্লেন—'ওমা তাই নাকি? বড় আশ্চর্য্যের কথা ত! কিন্তু তোমার চেহারা অমন হয়েছে কেন মা?'

জয়ন্তী লজ্জিত হল। মাথার চুলগুলি রুক্ষ। মুখখানি গম্ভীর। কিছুদিন ধরে স্বামীর সঙ্গে কথা নেই। মনটা বিষণ্ণ, ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। বল্লে—'কই, কিছুই ত হয় নি মা!'

—'আচ্ছা, এদিকে এস ত গায়ে হাত দিয়ে দেখি।'

জয়ন্তী কাছে আসতেই তিনি ওর কপালে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। হঠাৎ মনে হল—অনঙ্গ কি ওকে কিছু বলেছে? গম্ভীর গলায় ডাকলেন—'বড় বৌমা?'

—'ছুলো কোর্ট থেকে ফিরলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।'

জয়ন্তীকে বল্লেন—'অনেকদিন তোমার মুখে রামায়ণ শুনি নি। একটু পড়বে মা?'

জয়ন্তী ছোট্ট মেয়ের মত দৌড়ে রামায়ণ আনতে চলে গেল।

অনঙ্গ বাড়ী ফিরতেই বড় বৌদি বল্লেন—'মা তোমায় ডেকেছেন। আমাদের কথা ত শোন নি। আজ ভাল করে হবেখন।'

ওকে দেখে মা বল্লেন—'ছোট বৌমার সঙ্গে তোর কি হয়েছে রে, ক'দিন ধরে বাড়ীতে তোর টিকি দেখবার যো নেই।'

অনঙ্গ বল্লে—'কি আর হবে! ও ঘরে আমার ঘুম হয় না।'

'তা বলে কথা বন্ধ করতে হবে নাকি? ছেলের বাপ কি তুমিই একা হয়েছ? ক'দিন ধরে দেখছি বাছা আমার মুখ শুকিয়ে বেড়াচ্ছে। ও ত আমার সে রকম মেয়ে নয়। নিশ্চয়ই শক্ত কিছু বলেছিস।'

অনঙ্গ হাসবার চেষ্টা করে বল্লে—ক্ষেপেছ মা, সামান্য ব্যাপার"।

—"সামান্যই বা হবে কেন"?

মা'র মুখের সামনে কোনদিনই কেউ কথা বলতে পারেনা। পরিণত বয়সে বিধবা হবার পরেও তিনি অনেকগুলি, নাবালক ছেলেকে মানুষ করেছেন, পাঁচটী মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। এখনও, সংসারের কোন জিনিষই, তাঁকে বাদ দিয়ে হবার জো নেই।

অনঙ্গ বাইরে গিয়ে খানিক গুম হয়ে বসে রইল। ছোট বোন হেসে কি একটা কথা বলতে গিয়ে তাড়া খেয়ে ফিরে এল। মেজ বৌদি ফিস ফিস করে "জান, ঠাকুর পো, ছোট বৌ—পর্য্যন্ত বলেই, ও'র মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল। অনেকক্ষণ পরে ও ছড়ি নিয়ে বাইরে বেড়াতে চলে গেল।

গভীর রাত্রিতে ঘরে ফিরে দেখে, জয়ন্তী একা বিছানায় শুয়ে আছে। খোকা কাছে নেই। জিনিষটা এতই অস্বাভাবিক যে চোখে দেখলেও বিশ্বাস হয় না! ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করতে গিয়েই থেমে গেল, জয়ন্তী বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। অনঙ্গ আড় চোখে চেয়ে দেখলে—জয়ন্তী স্থিরভাবে শুয়ে আছে। মাথার কাপড় ঈষৎ সরে গেছে। শিয়রের খোলা জানালা দিয়ে ফুর ফুরে দখিনা হাওয়া, ঘরময় ছুটে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ পাশের ঘরে খোকা কেঁদে উঠতেই জয়ন্তী নড়ে উঠল। এতক্ষণে অনঙ্গ স্পষ্ট বুঝতে পারল—জয়ন্তী ঘুমোয় নি—জেগেই আছে। হয়ত খোকাকে কাছে না পেয়ে ওর বুক গুমরে কেঁদে উঠছে, কিন্তু স্বামীর দিক চেয়ে ছেলেকে ঘরে রাখে নি। নিঃশ্বাস ফেলে অনঙ্গ আস্তে আস্তে হাত বাড়ালে, কিন্তু পরক্ষণে কেমন যেন বাধা লাগল—পাশ ফিরে শুয়ে নিদ্রার ভাণ করলে।

সকালে বড় বৌদি বল্লেন—"কাল রাত্রে কেমন ঘুম হ'ল ঠাকুরপো; খোকা কিন্তু আমার কাছে বেশ ছিল"।

অনঙ্গ গম্ভীর ভাবে বল্লে — ভালো।

পরদিন অনঙ্গকে কি একটা জরুরী কাজের জন্যে বাইরে যেতে হল। জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা করবার অছিলায় এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, কোথাও তা'র পাত্তা নেই। মনটা ভার হয়েই রইল।

প্রায় সপ্তাহ খানেক পরে বাড়ী ফিরতেই মা বল্লেন—"বৌমার বাবার বড়
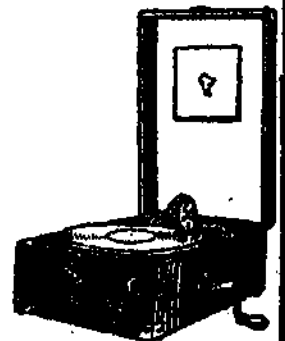
অসুখ। লোক এসেছিল নিতে। আমি ছোট বৌমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি"।

খোকা বারান্দায় ঝি'এর কোলে শুয়ে রয়েছে। অনঙ্গ সেদিকে তাকাতেই মা আবার বল্লেন—"কতবার বল্লাম, খোকাকে নিয়ে যাও। তা যদি কিছুতেই শুনবে। কি যে গোঁ। বল্লে—রোগের বাড়ী, ওর শরীর ভাল নেই। ওখানে গেলেই কষ্ট হবে। কি জানি বাছা। আমার মন মোটেই ভাল নেই। অবিশ্যি কাঁদছে না। তবুও অতটুকু ছেলে—ফিরতে যদি দুদিন দেরীই হয়!

মেজ বৌদি হেসে বললেন—ছেলে অন্ত প্রাণ; কি করে খোকাকে ফেলে বাপের বাড়ী গেল। আমরা হলে পারতাম না"।

অনঙ্গর মনে হল, সমস্ত পৃথিবী যেন অন্ধকার হয়ে গেছে। জয়ন্তী নেই, এ কথাটা নানারকমে উচ্চারণ করেও ও মনের মধ্যে শান্তি পেলে না। কাণে গেল, ইদানীং জয়ন্তী নাকি আর খোকার প্রতি ততটা আগ্রহ দেখাত না। রাত্রে সে তাকে অন্য ঘরে শোয়াবার পরে আজ অনঙ্গ খোকাকে কোলে নিল। খোকা ছোট ছোট হাত দু'খানি নেড়ে বল্লে—"বাবা, মা চ"। অনঙ্গ মা'কে বললে—"খোকা আজ আমার কাছে শোবে"।

মা বললেন—"সে কিরে? তুই ও'কে রাখতে পারবি কেন"?

"খুব পারব"।

অনঙ্গ ভাবতে লাগল—খোকাকে ছেড়ে না জানি জয়ন্তী কত কষ্টে আছে। কিন্তু কেন এ অভিমান?

সকালে উঠে মাকে বললে—"রাত্রে বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি মা। মনে করছি শ্বশুর মশাইকে একবার দেখতে যাব"।

ছেলের কর্ত্তব্য জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মা খুশীই হলেন। বললেন—"বেশ ত। দেখে আসা উচিত। সকালেই যাবি"?

অনঙ্গ মাথা চুলকে বললে—"খোকা কাল সারারাত বিরক্ত করেছে। তাই ভাবছি—"

এতক্ষণে যেন ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। মা হাসলেন—"খোকাকে নিয়ে যাবি? কিন্তু সেখানে কে কেমন আছে, কে জানে"?

বৌদিরা ঠাট্টা করতে লাগল। অনঙ্গ খোকাকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ী রওনা হল।

দরজার কাছে বড় শ্যালক দাঁড়িয়েছিলেন; অনঙ্গকে দেখে তিনি অবাক। বললেন—"কি ভাগ্যি"!

শাশুড়ী বেরিয়ে এসে খোকাকে কোলে নিলেন। বললেন—"যা নয় তাই, এ ছেলেকে ফেলে কেউ থাকতে পারে? মেয়েটা এসে পর্য্যন্ত খালি চোখ ছলছল করে বেড়াচ্ছে"!

বড় শ্যালক রহস্য করে বললেন—"যাই জয়ন্তীকে খবরটা দিইগে যে, ছেলে শুদ্ধ ছেলের বাবা এসে হাজির হয়েছে।

অনঙ্গ লজ্জা পেয়ে সরে এল। জয়ন্তী বোধ হয় এখনও সংবাদ পায় নি। কিন্তু অনঙ্গর যেন মনে হল, অনেকদিনের একটা গুরুভার তার বুকের ওপর থেকে নেমে গেছে।

———

ছায়া ও কায়া

শ্রীমধু বসু

শিল্পী সমস্যা

বাংলা ছবির পরিচালক নিয়োগ সমস্যার সমাধান এখন পর্য্যন্তও হল না। ছবির পর ছবি তোলা হচ্ছে, দু একখানা ছাড়া একখানি ছবিতেও পরিচালকের সূক্ষ্ম প্রয়োগ-কৌশলের পরিচয় পাওয়া গেল না। বাংলায় সুযোগ্য আলোকচিত্র-শিল্পীর অভাব নেই, যোগ্য শব্দ-যন্ত্রীর অভাবও তেমন নেই। দুঃখের বিষয়, শক্তিশালী প্রয়োগ-শিল্পীর অভাবই সব-চেয়ে বেশী। নীতিন বসু, যতীন দাসের মত ক্যামেরাম্যান সারা ভারতে বড় বেশী নেই, প্রবোধ দাস, শৈলেন বসু, ইউসুফ মুলজী, সুরেশ দাশ, বিমল রায় প্রভৃতি যে ভবিষ্যতে এক একজন বিশিষ্ট শিল্পীরূপে পরিচিত হবেন সে আশা খুবই করা যায়। মুকুল বসু, মধু শীল, নৃপেন পাল প্রভৃতির মত শব্দ যন্ত্রীও সারা ভারতে খুব বেশী নেই, লোকেন বসু, জগদীশ বসু, জ্যোতিষ সিংহ প্রভৃতিদের ওপরও আমরা যথেষ্ট আশা রাখি। দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া ও নীতিন বসু মাত্র এই তিনজন প্রয়োগশিল্পীরূপে বর্ত্তমানে বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছেন। বাংলার চিত্রজগতের আদিম শিল্পী ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে ডি জি ছোট ছোট কমিক চিত্র পরিচালনা করে এসেছেন, সে দিক দিয়ে তার তুলনায় আর কেউ নেই, তিনি পূর্ব[illegible] পরিচালনা করেছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার উর্দ্দু রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ চিত্র নাইট বার্ড পরিচালনায় তার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তারপর তার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এদেরই 'বিদ্রোহী' পরিচালনায়। 'বিদ্রোহী'র কাহিনী যদি ভাল হত তাহলে ধীরেন্দ্রনাথ যে দারুণ নাম করতে পারতেন তাতে আমাদের সন্দেহ মাত্র নেই। ওতে এমন কয়েকটী সূক্ষ্ম ছোঁয়াচের পরিচয় তিনি দিয়েছেন যা সত্যই শিল্পীর উচ্চাঙ্গের রসবোধের পরিচায়ক। নির্ব্বাক 'চরিত্রহীন' পরিচালনায় তিনি সুনাম যেমন হারিয়েছিলেন বর্ত্তমানে তা পুনরায় অর্জ্জন করছেন। তার পরিচয় পুনরায় পাওয়া যাবে। 'বাংলা ১৯৮৩' পরিচালনায় প্রথমেশ বড়ুয়ার নিন্দায় চতুর্দ্দিক মুখরিত হয়ে ওঠে, সবাক 'রূপলেখা'য় তার জয়গান কেউ তেমনভাবে করতে না পারলেও কেউ নিন্দা করেনি। তারপরই 'দেবদাস'! বাংলা ও হিন্দি দেবদাস পরিচালনা করে আজ তিনি সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ শিল্পীদের সমপর্য্যায়ভুক্ত হয়েছেন। চণ্ডীদাস, পুরণ ভকত, হিন্দি সীতা প্রভৃতির পরিচালক দেবকী বসু যে অপূর্ব্ব যশ অর্জ্জন করেছিলেন, আজ তার অনেকখানিই ম্লান হয়ে গেছে। 'দাইক ইক এ-ক্রেন্ডে'র মত ছবি অবাঙালীদের সহজে বোধগম্য হয় নি, [illegible] তাদের কাছে তার জনপ্রিয়তা খুব বেশী পরিমাণে কমে গেছে। আর দীর্ঘকাল তার পরিচালিত ছবি না দেখতে পেয়ে বাঙালীরাও তাকে পূর্ব্বের মত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। হিন্দি চণ্ডীদাস ও ধূপছাওর পরিচালনায় নীতিন বসু যেমন সারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তেমনি 'ভাগ্যচক্র' দেখিয়ে বাঙালীদের হৃদয়ও তিনি জয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

সে কালের খ্যাতনামা প্রয়োগশিল্পী প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিদের সুনাম দুর্নাম দুই-ই সমান। প্রফুল্ল ঘোষ, প্রফুল্ল রায়, চারু রায় প্রভৃতিদের পরিচালিত ছবির জন্য বাংলার চিত্রপ্রিয় নর-নারীগণ তেমন আগ্রহ মনের মধ্যে পোষণ করেন না। আরো কত লোককে পরিচালকরূপে দেখি, কাজে কিন্তু কারুরই সামান্যমাত্র শক্তির পরিচয় প্রকাশ পেতে দেখি না। আলোকচিত্র শিল্পী যতীন দাসের সুনামের অন্ত নেই। সম্প্রতি তিনি পরিচালকরূপে উন্নীত হয়েছেন। 'পরপারে'তে তার পরিচয় পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কয়েকজন নতুন শিল্পীদের পরিচালনায় সুযোগ দিচ্ছেন,

তন্মধ্যে নিউ থিয়েটার্সের হেমচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর অসমাপ্ত উর্দ্দু ছবি 'লালারুখ' শেষ করে তিনি এককভাবে যে উর্দ্দু ছবি 'মিলিওনিয়ার' তোলেন সম্প্রতি তার সাফল্যের সংবাদ পাওয়া গেছে। প্রবীন ও নবীন পরিচালকদ্বয় তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ও জ্যোতিষ মুখার্জ্জী অনেকগুলি ছবিই তুলেছেন, দুঃখের বিষয় একখানাতেও তাদের কৃতিত্ব প্রকাশ পায় নি। সম্প্রতি কালী ফিল্মস্ সুকুমার দাশগুপ্ত, সুশীল মজুমদার, গুণময় বন্দ্যোঃ, রাধা ফিল্মস্ ফণী বর্ম্মা, তড়িৎ বোস, হরি ভঞ্জ প্রভৃতিদের পরিচালকরূপে উন্নীত করেছেন; তাদের পরিচালিত ছবি হবে যথাক্রমে আশিয়ানা, মুক্তিস্নান, পরভৃতিকা, বিষবৃক্ষ, অভয়ের বিয়ে ও হিন্দি মানময়ী গার্লস্ স্কুল। এদের মধ্যে সুশীল মজুমদার, ফণী বর্ম্মা ও তড়িৎ বোস পূর্ব্বেই পরিচালনা করেছেন নিম্নলিখিত ছবিগুলি: যথা 'তরুবালা', 'কৃষ্ণ সুদামা' ও উর্দ্দু 'ওয়ামক এজরা'। এগুলির কোনটাই পরিচালনার দিক দিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য ছবি হয়নি।

চিত্রে যোগ্য নটনটীই বা কোথায়? একবার যদি কেউ নায়ক বা নায়িকারূপে অভিনয় করবার সুযোগ পেলেন তাতেই তার আসন স্থায়ী হয়ে গেল। ছিল এক সময় যখন দুর্গাদাস ছিল নায়ক সম্রাট, পরবর্ত্তী সময়ে বরং ২।১ জন বেশী দেখা যায়, যথা—ভানু বন্দ্যোঃ, ফণী বর্ম্মা, জীবন গাঙ্গুলী প্রভৃতি। তারপর আসেন ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, বাংলা ছবিতে নায়ক সাজাতে হলে যেন তাকে ছাড়া চলে না! চাকা ঘুরলো, জহর গাঙ্গুলী কোথা হতে এ আসন দখল করে বসলেন। আজকাল যেখানে যে ছবি দেখা যায়, নায়ক তাদের সবেই শ্রীমান জহর। দেখতে দেখতে দর্শকদের চোখ যে পচে গেল ছবির নির্ম্মাতাদের তাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই।

উমাশশী এখন উমাদেবীতে পরিবর্ত্তিত হয়েছেন। পূর্ব থিয়েটারের সেই নাচিয়ে মেয়েটিকে বোধ হয় প্রথম দেখা যায় 'বঙ্গবালাতে'। তারপর আরো কয়েকখানা নির্ব্বাক ছবিতে তার অভিনয় দেখে তার সম্বন্ধে উচ্চাশাই ধারণ করি। সবাক বিষ্ণুমায়াতে অম্বিরূপে তিনি সবাইকে হতাশ করেন—চণ্ডীদাসে রামী তাকে তৎকালে অভিনেত্রীদের শীর্ষস্থানে তুলে দেয়। তরেপর তার মীরা আমাদের (ভাগ্যচক্র) অনেকটা হতাশ করে। 'কপালকুণ্ডলা'রূপে পূর্ব্বেই তার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা হয়ে গেছিল। ড্যাম্প-এর ভূমিকাই বোধ হয় উমার উপযুক্ত। কয়েক বছর পূর্ব্বে 'পিয়ারী'তে নাম ভূমিকায় চন্দ্রাবতীকে দেখি, রূপে গুণে তিনি আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন। সবাকে সে রূপ না থাকলেও তার সম্বন্ধে উচ্চাশাই পোষণ করছি। রাণীবালা কালী ফিল্মসের অনেক ছবিতেই অভিনয় করেছেন—এখন আর নায়িকারূপে তাকে না নামানোই উচিৎ। এখন এদের নায়িকা যাঁরা—দুঃখের বিষয় ভাবপ্রকাশে সম্পূর্ণ অক্ষম এবং কথা বলায়ও অপটু। শুনছি সরলার ভূমিকায়ও নাকি তিনিই মনোনীতা হয়েছেন!

কুমারী শীলা হালদারের না আছে সুন্দর চেহারা, না আছে আবৃত্তি করবার ক্ষমতা। দুঃখের বিষয় তাকেই দেওয়া হয় নায়িকার ভূমিকা (আবর্ত্তন)। একবার যিনি অভিনয়ে অপারগ হয়েছেন শুনছি তাকেই নাকি 'মুক্তিস্নানে' নায়িকারূপে মনোনীতা করা হয়েছে। কারণ কি তা বিশ্লেষণ করে দেখলে মনে হয় 'ভদ্রতরুণী' তিনি, এই তার বড় সার্টিফিকেট। চারুবালার চেহারা নায়িকার উপযোগী মোটেই নয়, কিন্তু তাকেই মন্ত্রশক্তিতে অম্বার ভূমিকায় দেখি, তার পরই দেখা যায় মহানিশাতে মীরার ভূমিকায়। অম্বারূপে তার মনোনয়ন সম্বন্ধে বলবার কিছুই নেই। মহানিশাতে মক্ষখ্যাতা মীরার অভিনেত্রীরূপে তাকে নামানোরও কারণ পাই, কিন্তু 'রজনী'র নাম ভূমিকায় তাকে নামাবার

কোন সঙ্গত কারণই পাই না। অন্ধ হলেই কি চারুবালাকে নামাতে হবে? রজনী প্যানপ্যানে মেয়ে নয়। যেমন বাইরে সে সুন্দরী, তেমনি শরীরে শক্তিও ধরেন অসাধারণ—লাঠিভঙ্গের ব্যাপারে সে পরিচয় পাওয়া যায়। এই অপূর্ব্ব চরিত্রের শ্রীমতী যে কি রূপদান করেছেন তা পরে জানা যাবে। মন্ত্রশক্তির বাণীর ভূমিকায় নির্ব্বাচিতা হন শ্রীমতী শান্তি, আধ আধ কথায় কি ওই সুকঠিন চরিত্রে রূপ দেওয়া সম্ভবপর হয়? আর উদাহরণ দিয়ে অভিশাপ কুড়ুবো না—এখানে আর দু একটী কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

সাগরপারের দেশের অনেক খবরই এরা রাখেন। তাদের অনেক কিছুর অনুকরণ এদের করতে দেখা যায়, কিন্তু তারা কি ভাবে ভূমিকার জন্ত নট নটী সংগ্রহ করেন তা কি তারা জানেন না? কিন্তু কে ওইরূপ কষ্ট করবেন—কি দরকারই বা—যখন হাতের কাছের পরিচিত নট নটীদের দ্বারাই কাজ চলে যাচ্ছে, তখন কে সে কষ্ট স্বীকার করবে? সবাই চান একেবারে তৈরী নট নটী। বর্ত্তমানে দরকার নতুন শিল্পীর; সুখের বিষয় আমাদের এই চিৎকারের ফল ফলতে সুরু হয়েছে। অনেকেই এখন নতুন মুখের প্রতি ঝোঁক দিয়েছেন বেশী মাত্রায়।

শান্তির 'আমার কথা'

পত্রান্তরে শান্তি গুপ্তার 'আমার কথা' পড়ে খুশী হয়েছি। অভিনেত্রী যে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশের দিকে ঝোঁক না দিয়ে বেশ সরলভাবে অল্প কথায় নিজের কথা বলে গেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ন্যায়ের অত্যাচার নিয়ে তিনি যে কথা কয়টী লিখেছেন তাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ওই পত্রিকায় এর পূর্ব্বে যে অভিনেত্রী ও অভিনেতার চিঠি ও কথা প্রকাশিত হয়েছে তাতে তাদের আত্মম্ভরিতাই প্রকাশ পেয়েছিল; শান্তি সে পথে যাননি দেখে সত্যিই খুশী হয়েছি।

রাধা ফিল্মস

গত ৭ই জুলাই মঙ্গলবার সকাল ৯টায় রাধাফিল্ম ষ্টুডিওতে বহু জ্ঞানী-গুণীর সম্মেলন হয়েছিল। 'মহামেডান' বনাম কলিকাতা' শীর্ষক একটি টপিক্যাল চিত্র গ্রহণার্থ—এই ব্যবস্থা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা তথা ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েসনের সভাপতি মাননীয় সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে, সি, আই, ই, বেঙ্গল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য মাননীয় স্যার খাজা নাজিমুদ্দীন কে, সি, আই, ই, এবং মিঃ আদমজী হাজি দাউদ।

এই টপিক্যাল চিত্রটি রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত হয়েছে। গৃহীত চিত্রটি কলকাতার চিত্রগৃহগুলিতে প্রদর্শিত হবে।

শ্রীযুক্ত হরি ভঞ্জ সম্প্রতি এই চিত্র প্রতিষ্ঠানে পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন।

পরিচালক ফনি বর্ম্মার পরিচালনায় বঙ্কিমচন্দ্রের অমর-দান "বিষবৃক্ষের" কাজ দ্রুত বেগে অগ্রসর হচ্ছে।

'হিন্দি কণ্ঠহার,—যার নামকরণ হয়েছে 'খুনী কোন্'—এখন সম্পাদনাগারে দ্রুত শেষ পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

রূপবাণী

চিকিৎসকেরা নাকি বলেন যে প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারলে মানুষের জীবনী শক্তি বাড়ে। এ যদি সত্য হয় তবে হ্যারল্ড লয়েড অনেকের জীবনী শক্তি বাড়িয়ে দিচ্ছেন, একথা স্বীকার করতেই হবে। হ্যারল্ডের ছবি দেখেননি এবং দেখে হাল্কা মনে ঘরে ফিরে আসেন নি এমন চিত্ররসিক লোক আছেন বলে আমাদের জানা নেই। সম্প্রতি এই চশমাওয়ালা লোকটীর "মিল্কিওয়ে" ১৮ই
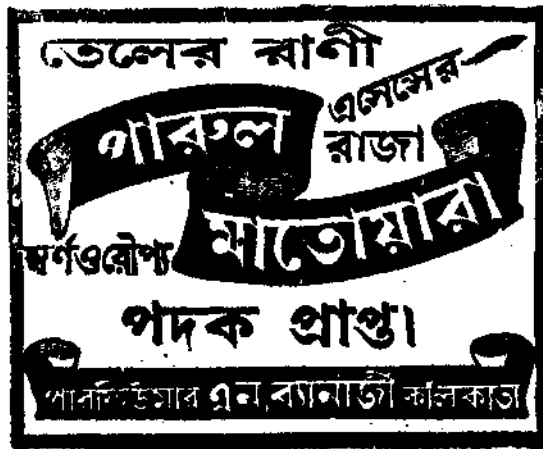
জুলাই থেকে রূপবাণীতে আসছে। ছবিখানি প্যারামাউণ্ট কোম্পানীর।

রূপবাণীর পরবর্ত্তী আকর্ষণ "ইনভিজিবল রে"। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন বরিস্ কারলফ ও বেলা লুগোসী। সুরু হবে ২৫শে জুলাই থেকে।

পরপারে

এ সংখ্যাতেও চন্দ্র ফিল্মের 'পরপারে'র সমালোচনা প্রকাশ করা সম্ভব হল না; তজ্জন্য পাঠকগণের কাছে ত্রুটি স্বীকার করছি। অবশ্য এজন্য চন্দ্র ফিল্মের কর্ত্তৃপক্ষও কম দায়ী নন, কারণ প্রদর্শনী লিপি বিতরণে তাঁদের শৈথিল্য এজন্য কতকটা দায়ী। যা হোক, আসছে বারে আমরা 'পরপারে' সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবো। এই শনিবার থেকে চিত্রায় 'পরপারে' তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করলো।

দেবদত্ত ফিল্মস্

যদিও মুক্তির তারিখ ঘোষিত হয়নি, তবু মনে হয় যে, দেবদত্ত ফিল্মের 'রজনী' আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করবে। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্ধ 'রজনী' চিত্রে কি রূপ পেয়েছে, তা দেখবার জন্য চিত্রপ্রিয়রা আগ্রহ-আকুল হয়ে আছেন। দেবদত্ত ষ্টুডিয়োতে 'রজনী'র চিত্র গ্রহণ দ্রুতগতিতে সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালনার দিক দিয়ে 'রজনী' নিখুঁৎ করবার প্রয়াস পাচ্ছেন।

দ্বীপান্তর

সকল প্রতীক্ষার অবসান করে ডি-জি পরিচালিত বাংলা বাণী চিত্র দ্বীপান্তর আগামী কাল শ্রীতে মুক্তিলাভ করবে। ডি-জি এই চিত্রে অনেক নূতনত্বের সমাবেশ করেছেন। এতে তিনি এমন কতকগুলি নতুন মুখের আমদানি করেছেন, যারা কালে চিত্রজগতে প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হবেন। ডি-জি একটি কূট চরিত্রের ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন। সেই ভূমিকায় ডি, জির একখানি আর্ট প্লেট এই সংখ্যায় মুদ্রিত হ'ল। দ্বীপান্তরের সঙ্গে শ্যামসুন্দর নামে ২রীলের একখানি পৌরাণিক রঙ্গচিত্র দেখানো হবে।

নাম জানা দুই বন্ধু মোরা

(বড় গল্প)

দিলীপ দাশগুপ্ত
মনসা চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

অরুন্ধতী তার উদাত্ত স্বরের আবৃত্তি শুনে শুধু উচ্চারণ কোরলে সুপার্ব! তারপরে একটু থেমে: তারপরের ঘটনা বলুন?

হুঁ, প্রবীর বোললে, সেই কবিতার জন্মের পর একদিন জানলুম সার্থক হোয়েছে আমার কবিতার জন্ম। এতদিন সে প্রসববেদনায় ছিলো ব্যাকুল, আর আজ যেন মাতৃত্বের হোয়েছে পূর্ণ বিকাশ।··· দিন গেল, মাস গেল, বছর ঘুরলো তারপরে আমাদের চরম মীমাংসা হোলো সমাজকে ঠেলে দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পথে বেরিয়ে পড়া। সেও এলো তার নারী হৃদয়ের সবগুলি দল আমারি জন্তে শিশিরে ভিজিয়ে, আর আমিও এলুম নিজের পুরুষকারকে মনে দৃঢ় করে বেঁধে গেঁথে। কে জানে অরুন্ধতী, কে কাকে বেশি ভালোবাসে। একই আকাশের চাঁদ আর সূর্য্য—তেজ আর দীপ্তি নিয়ে কাকে ঠকানো চলে? এবারে প্রবীর থামলে। অরুন্ধতীর হাতখানা আলগোছে এগিয়ে পোড়লো প্রবীরের গায়ে—প্রবীর তখন আবার বোলে যাচ্ছে, তারী তীর মেয়ে উৎপলা, তাই ভয় হয় কখন তাকে হারিয়ে যাই।

অরুন্ধতী কথা কইলে না, শুধু নীরবে চোখ মুছে নিলে। তার সেই অম্লান

হাতখানি তেমনি পড়ে থাকতে পারে না কি? হ্যাঁ পারে। কিন্তু—কিন্তু—ন্ ন্ ন্ না। অরুন্ধতী হাতখানা সরিয়ে নিলে। বাইরের সমস্ত পৃথিবীতে জ্যোৎস্নার ফুলে ঠাসা। তারাগুলো গুড়ি গুড়ি হোয়ে আকাশকে চকচকে কোরে তুলেছে।

আপনি এমন বিমনা হোয়ে পড়লেন কেন অরু দেবী?

কৈ না তো!

দেখুন, কুড়ুনী করাটা আপনাদের একটা দৈনন্দিন পুণ্যসঞ্চয়, নয়?

সত্যি বোলছি, বিশেষ কিছু হয়নি।

বেশতো অবিশেষটুকুনই না হয় শোনান, কি? কি জানি কেন অরুন্ধতীর কান্না পেলো। শুধু শাড়ির একটি প্রান্ত ধরে নিশ্চলা হোয়ে রইলো সে।

চলুন, চা খাওয়া যাক্। প্রবীর একরকম টানতে টানতে অরুন্ধতীকে নিয়ে এলো বারান্দা ছেড়ে ঘরে। নীচে ট্যাক্সির শব্দ শোনা গ্যালো। একরাশ খেলনা কাপড় চোপড় নিয়ে উৎপলা, রেণু, লুসি, পাপিয়া আর রীণা সবন্ধু এসে ঘরখানাকে উৎসবময় কোরে তুললে। কি জানি তারা কি বোল্‌বে।

তাখো কতো চয়েসেই জিনিষ আনলুম প্রবীরদা: উৎপলা প্রথম কথা বোলে উঠলো। লুসি শাড়িটাকে বেঁকিয়ে কল্যানী নাগের খাঁ'র মতো খেঁকিয়ে উঠে বোললে কেন, চয়েচেই জিনিসগুলি তোমারই সব কেনা? আমার কোনো যেন ওয়ার্থ নেই? ও—সিলি—নটি—গার্ল।

উৎপলা আস্তে ওর গালে একটা টোকা দিয়ে প্রবীরের কাছে এগিয়ে এলো। লুসি, পাপিয়া আর রীণা চাটু ভাষণের হাসি হেসে উঠলো ঘরখানাকে কেন্দ্র ক'রে।

প্রবীরদা: উৎপলা জিগেস্ কোরলে, তোমার কি খুব কষ্ট হয়, আমি খুব দেরী কোরে এলে? প্রবীর এর উত্তরে ওর খোঁপাটা একটু নেড়ে দিয়ে বলে—এর উত্তর পরে হবে। এখন বন্ধুনীদের আপ্যায়নে মনোনিবেশ কর।

কিন্তু ততক্ষণে স্যুটোস্ত ধরিয়ে লুসি দিব্যি মামলেট্ ভাজবার আয়োজন কোরেছে। মাগো! মেয়েটার কি যে দেখানোপনা।

তুই ভারী চটে গেছিস্ নারে অরু? উৎপলা শাড়িটাকে খুলতে খুলতে জিগগেস কোরলে।

ধোৎ:

এলি কখন?

ওঃ, বহুক্ষণ। তারপরে প্যাকেটটা খুলে রঙচঙে জিনিষগুলো বের কোরতে লাগলো।

জানলার শার্শিগুলো ঠক্‌ঠকিয়ে কেঁপে উঠলো। বাতাস গর্জ্জন কোরে উঠলো—বোধ হয় ঝড় উঠলো। সবাই ত্রস্ত হোয়ে পোড়লো, আর উৎপলা ও প্রবীর অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য তাড়াতাড়ি যা খুশী তাই কোরতে আরম্ভ কোরে দিলে অত্যন্ত অনভ্যস্ততার প্রবল তরঙ্গে পড়ে।

একখানা আধভাজা মামলেট্ মুখে পুরে দিয়ে রীণা গুণগুণ কোরে গাইলে:

"আজি উতলা বনের মাঝে
তোমারে দেখিনিগো কেন প্রিয়?"

লুসি টেবিলের কাছে কানের ঝুমকো দুটো ঠিক কোরতে কোরতে ফুঁসিয়ে উঠলো: বাই জোব, ঝড় উঠলো যে, তোরা কি এইখানেই রাত কাটাবি?

মালিনী কবিতা লেখে। সে বোল্‌লে ক্ষতি কি? শিল্পীর বাড়িতে রাত কাটানোতে আনন্দ আছে প্রচুর।

তবে মালিনী থাক্ এখানে রে। চ, আমরা পালাই। ভালো কথা, দেখিস্ মালিনী, তোর যে শুনছি কে এক তরুণ ব্যাটাচাবিয়া আছে। সে আবার প্রবীরবাবুকে ডুয়েলে ডাক্‌বেন না তো? দেখিস্। বোলে একটি ইলেকট্রিকের শকের মতো হাসির ঝিলিক্ মেরে পাপিয়া দোরে পা বাড়ালে।

রীণা এর আগেই সরে পড়েছিলো। ক্রমে ক্রমে তারা যোলাটে হোতে হোতে বাইরে মিলিয়ে গ্যালো।

অরুন্ধতীকে উৎপলা জোর করিয়ে বসিয়ে রেখে ঢুকলো বাথরুমে।

আর তক্ষুনি ঝম্ ঝম্ কোরে আকাশের মতো ছিলো জল, অশান্ত আর্তনাদের কাটলে চুড়িয়ে মুড়িয়ে পোড়তে পোড়তে তারা ঝরতে লাগলো।

একটা গান গা'ন না, অরুন্ধতী প্রবীরকে অনুরোধ কোরলে।

না, আপনিই গান ?

সেকি আপনার সামনে ?

ক্ষতি কি ? আমি কি হরিজন যে তাতে আপনার গানটারও গঙ্গাস্নান কোরতে হবে ?

এরপরে একটু মৃদু হাসি, ঘোলাটে অন্ধকার, নরম মেঘের মতো, ক্রিশান্থিমামের গন্ধের মতো শুধু গলায় অরুন্ধতী গাইলে—

কে কখন জেগে রয়
ঘুমায় কখন
কে রচে স্বপন—
জানিতে দিলে না তারে মন !

উৎপলা ভিজে ভিজে যখন ঘরে এলো তখন অরুন্ধতীর গান থেমেছে আর প্রবীরের নিঃশ্বাস যেন একটা আহত পাখীর মতো ছটফট্ কোরতে কোরতে উৎপলার মুখে গিয়ে পোড়লো।

কেশবেশ প্রসাধন কোরে তিনজনে সেই ঝিমঝিমে কান্নার ভেতরে গল্প কোরতে লাগলে।

আজ আর নাই বা গেলি অরু। কেমন ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ থেকে যান অরুদেবী। আজ আর এ ঝড় থামছেও না, আর আপনারো অতিথি হবার দুর্ভাগ্যকে দূরে ঠেলে ফেলবার অধিকার নামছে না, প্রবীর অনুরোধ কোরলে। সুতরাং অরুন্ধতীর পক্ষে এ অনুরোধকে উপেক্ষা করা চলেই না। কোনো মেয়েই পুরুষের পক্ষ থেকে সুদুর্লভ নিমন্ত্রণকে শ্যাম্পেনের মতো দূরে ঠেলে ফেল্‌তে পারে না। তারা একে একটা ফ্যাশান্ মনে করে। কি জানি অরুন্ধতী সে ধরণের মেয়ে কিনা!

মনে আছে উৎপলা, প্রবীর বোললে, যেদিন আমরা চলে আসি, সেদিনো এমনি আকাশ আমাদের আশীর্বাদ কোরেছিলো।

আর আজো আপনাকে কোরছে : অরুন্ধতী বোল্‌লে, আজো সে আপনাকে তাইই জানাচ্ছে, আপনার মনের একটা বিশিষ্ট অবস্থাকে। নয় কি ?

প্রবীর হয়তো কথাটার মানে ঠিক বুঝতে পারলে না।

জীবন দিয়ে যাকে সাধনা করা যায় না, অরুন্ধতী বোললে, সেই দুর্লভ রত্ন চল্‌তে গিয়ে পায়ে পায়ে যদি ঠেকে যায় তখন তাকে উপেক্ষা করা কাপুরুষতা নয় কি প্রবীরবাবু।

উৎপলা বোল্‌লে, কেন ?

অরুন্ধতী রুখে উঠলো : কেন ? নিজে তুই তা' জান্‌বিনে রে উৎপলা। ভালোবাসা পেয়ে পেয়ে তুই হোয়েছিস্ সার্থক। সার্থক হোয়েছে তোর মন, আর ধন্য হোয়েছে সেই প্রেম, যা তোকে অন্তের গাঢ় অন্ধকার থেকে আলোতে এনে স্নান করিয়ে দিয়েছে।

অরুন্ধতীর চোখ বেয়ে ভোরের শিশিরের মতো জল গড়িয়ে নেমে এলো। বাইরের ঝড় আর বৃষ্টি সমানে চোলেছে। এ যেন একটি পতিতা আরেকটি গৃহলক্ষীর স্বামীলাভের দুরন্ত কম্পীটিশন্।

আজকে একথা তোলা থাক অরুন্ধতী। (এই সে প্রথম এমন সম্ভাষণ কোরলে) আসুন আজ আমরা নিশি জাগরণ করি।

উৎপলা সেদিকে কান দিলে না। সে তখন ভাবছে কার বিছানা কোথায় করা সঙ্গত হবে।

কি জানি, অরুন্ধতী বোললে, আজ যদি এ আলোচনা বন্ধ হোয়ে যায় হয়তো এ সুযোগ জীবনে আর আসবে না প্রবীরবাবু। ভাবছি,—না থাক্।

কি বলুন ?

না। আজ কোনো ক্রমেই না।

প্রবীরের কাছে উৎপলা এবার এসে বোসলো। প্রবীর উৎপলার কানের ঝুমকো নাড়তে নাড়তে বোল্‌লে, উৎপলা। আজ আমার ঘুম হবে না। বোধ হয় তোমারো না। আর অরুন্ধতী আপনি নিজেই জানিয়েছেন, আপনি আজ কতো বড়ো দুঃখী। বাইরে প্রবল ঝড়, আসুন আমরা তিনজনে অক্ষয় কোরে তুলি এ মহামিলন।

ম্লান হাসি হেসে অরুন্ধতী বোল্‌লে অক্ষয় কোরে তুলবেন ?

কেন পারি না ?

পারি—খুব পারি প্রবীরবাবু, 'যদি স্বপ্নের সাধ ভেঙে না গুঁড়ো হোয়ে' পড়ে। শুনছেন তো বাইরে শব্দ?

সামনে একটা টেব্‌ল ল্যাম্প। তিন-পাশে তিনটি চেয়ারে তিনজনে গল্প করবার ছলে হৃদয় খুললে, আর উৎপলা বোকা উৎপলা, ছেলেমানুষ উৎপলা দিব্যি নির্ব্বিবাদে ট'লে পোড়লো। নরম হোয়ে সে ঘুমুলে। আর প্রবীর তাকে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিলে তার বিছানায়।

আপনি কতো জাগবেন আর? প্রবীর শুধোলে।

আপনার বুঝি ঘুম পেয়েছে খুব?

তা পেয়েছে।

প্রবীর ধীরে ধীরে অরুন্ধতীর কাছে এগিয়ে এলো।

অরুন্ধতী চোখ বুজলে। চোখ বুজলে অরুন্ধতী সেই তীব্র জ্যোতি থেকে আত্ম-প্রসাদ লাভ করবার জন্য। কিন্তু কি জ্বালা।

অরুন্ধতী!

কেন?

উৎপলার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ো।

না—না—না তুমি আমায় অমন কোরে জ্বালিও না প্রবীর, জ্বালিও না।

অরুন্ধতী প্রবীরের গায়ে আছড়ে পোড়লো।

[ক্রমশঃ]

ছন্দ আর পতন

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

হিসাব করে দেখেছি,
দেখেছি: মানুষের জীবন আর নদীর কল্লোল,
হাঁ, নদীর কল্লোল আর মানুষের জীবন
এক,
শুধু এক নয়—
নদীর উপর যেমন কালো ঢেউ
বাতাসের দোলায় যা সাদা দেখায়
মানুষের জীবনও তেমনি।
হাঁ, মানুষের জীবনও তেমনি।
ছন্দ আর পতন
শুধু ছন্দ আর পতন নিয়েই মানুষের জীবন।
সংসারে যারা ছন্দ রাখতে পারবে না
যারা সুর ফেলবে হারিয়ে
তাদের জীবনে বাতাসের দোলা লাগবে না।
দেখা দেবে না শুভ্রতার রূপ নিয়ে।
নদীর জল সাদা তাও না
তবু দেখায় সাদা
সব মানুষই যে খারাপ তাও নয়
তবু তাদের খারাপভাবে দেখি।
কারণ ছন্দ তারা ঠিক রাখতে পারে নি।

[এই কবিতাটিতে কোন বিদেশীর লেখকের ছাপ আছে।]

বিচিত্রা

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র চীন দেশে তৈয়ারী করা হয়। এই মানচিত্রটী বর্ত্তমানে প্যারিসে আছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম মোটর গাড়ীর দেখা পাইবেন জার্ম্মাণীর রাজধানী বার্লিনে। একখানি লরিগাড়ী লম্বায় ৭০ ফুট। এঞ্জিনের শক্তি একশো অশ্ব শক্তি।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হ্রদের নাম "সুপিরিয়ার"। এই হ্রদটী দৈর্ঘ্যে ৩৮০ মাইল এবং প্রস্থে ১৬০ মাইল।

হাবসী যুদ্ধের সময় এরোপ্লেন হইতে ইটালিয়ান সৈনেরা আবিসিনিয়ার পথে খালি বীয়ার. বোতল ছুড়িয়াছে অজস্র। বোতলের আঘাতে বহু সৈন্য প্রাণ দিয়াছে।

মিশরে এক ভদ্রলোকের বয়স ১৩০ বৎসর। স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে তিন মাস পূর্ব্বে। সম্প্রতি আবার বিবাহ করিয়া নব-বধূ ঘরে আনিয়াছেন। বধূর বয়স ২৫ বৎসর। পূর্ব্বে আরও ১৮ বার বিবাহ করিয়াছিলেন। সব কয়টী স্ত্রীই হাতের নোয়া লইয়া গতায়ু। ভদ্রলোকের ভূত-পূর্ব্ব পত্নীদি সম্ভূত পুত্র কন্যা আছে ২৩টী। এই বারের বিবাহে তাহারা বহু প্রতিবাদ তুলিয়াছিল। কিন্তু বৃদ্ধ বর সেই প্রতিবাদ গ্রাহ্য করেন নাই।

মার্কিণ যুক্তরাজ্যে ঘোড়দৌড় কুকুর দৌড়ের মত মৎস্য দৌড়ের বাজি খেলা সুরু হইয়াছে। এই ব্যাপারে খুব সমা-রোহ বাধিয়াছে!

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ফিল্ম-ষ্টারের দল যে পরিমাণ পারিশ্রমিক পাইয়াছেন, সম্প্রতি তাহার রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। জানেট গেনর পাইয়াছেন ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৫৬৫১২ পাউণ্ড; ওয়ার্ণার ব্যাক্সটার ৩৯৮০০ পাউণ্ড; ফ্রেডারিক মার্চ ৩১৪১২ পাউণ্ড; মরিশ শেভালিয়ে ৩০০০০; জর্জ্জ আর্লিশ ২৫০০০ পাউণ্ড; রোণাল্ড কোলম্যান ২১৬০০; লিউ এয়ারেস ২০৬৯; ওয়ালেস বেরি ২০০০০; ক্লার্ক গেব্‌ল ১৮৯৩৩; চার্লস লাফটন ১৩০০০; জন বোলস ১০৭৫০; ল্যাংলি কেয়ল ৯৯১৭, সার্লি টেম্পল ৪৬৩১।

স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ সহর হইতে ভিক্ষাবৃত্তি একেবারে উন্মূলিত করিবার উদ্দেশ্যে নূতন আইন হইয়াছে। এ আইনের বলে যে ব্যক্তি পথে ভিক্ষা দেয়, পুলিশ দেখিলে তখনি তাহাকে গ্রেপ্তার করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে জরিমানা আদায় করিয়া লয়।

— পঞ্চানন্দ পাল।

সচিত্র সাপ্তাহিক

দ্বিতীয় বর্ষ—২৪শ সংখ্যা

শুক্রবার—৮ই শ্রাবণ

১৩৪৩

২৪শে জুলাই—১৯৩৬

প্রতীক্ষা
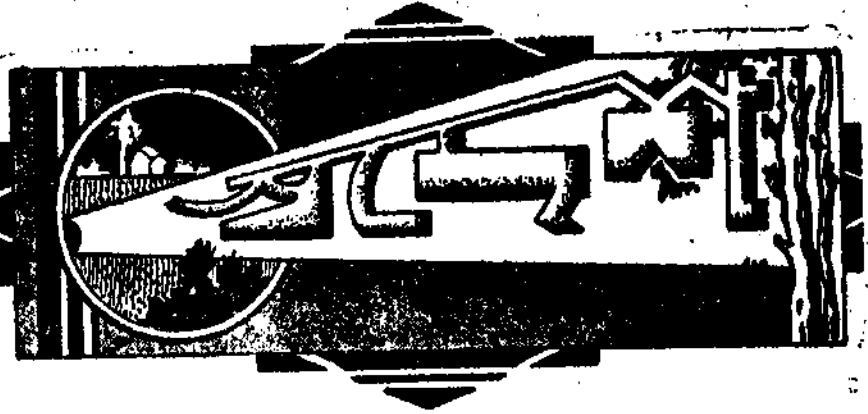
সুয়োরাণী আর দুয়োরাণী। রাষ্ট্র-নাগরের প্রণয়-চিহ্ন যখন সমানভাবে দু'য়ের উপর প্রযুক্ত না হয়ে, একদেশদর্শী সহানুভূতির প্রাবল্যে আসন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তন-ক্ষণে সুয়োরাণীকে জাগিয়ে তুলেছে, আন্দোলন-আলোচনার অন্ত নেই। কিন্তু মোহান্ধ প্রণয়ী যখন সাবেক প্রণয়িনীর প্রণয়পাশ ছিন্ন ক'রে নব-পরিণীতা তরুণী-ভার্য্যার দিকে অধিকরূপে আকৃষ্ট ও অভিভূত হয়ে ক্রমশ স্বামীপরায়ণা সাবেকটির কথা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিতে সুরু করেন, তখন হয়তো এই স্বামীত্যক্তা অভাগিনী দুয়োরাণীর সম্বলের মধ্যে থাকে অশ্রু, আর সান্ত্বনার মধ্যে বনবাস! তাই বলছিলাম, অরণ্যে রোদন ক'রে আর লাভ কি?

রাজনৈতিক প্রয়োজনে হিন্দু ও মুসলমানকে দাঁড়া ক'রে সুয়ো আর দুয়োরাণীর যে সাম্প্রদায়িক ব্যবধান রাষ্ট্র-কর্ত্তা তথা রক্ষক বা ভর্ত্তার তরফ থেকে রচনা করবার দৃঢ়তা দেখা দিয়েছে, হয়তো তার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করবার দাবী হতভাগিনী সম্প্রদায়ের নেই। কিন্তু মানুষে-মানুষে ছাড়াছাড়ি হবার এই যে অহেতুক ও ভ্রান্ত প্রণয়বাদ—এর থেকে নিজেরা-নিজেরা স্বামী-সেবার স্বত্ব নিয়ে চুলোচুলি করবার যে অন্ধ উন্মাদনা সমাজশরীরে শিকড়গাড়ী ক'রে বসাচ্ছি, সত্যিই কি তা'র সুসমাধানের পথ নেই?

'টাউন হল'-এর সভায় অস্পৃশ্যতা-সেবারত রবীন্দ্রনাথের বাণী এবং সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্রের আবেদন—বিশ্বমানবতার ইঙ্গিৎ হয়তো তার মধ্যে থেকে অনায়াসেই পাওয়া যাবে, কিন্তু সময়-বিশেষে সম্প্রদায়-বিশেষের উপর নেকনজরের লৌহকঠোর পরিবেষ্টনীকে কুসুমকোমল বাহুবন্ধনের স্বভাবসুন্দর আবেষ্টনীরূপে উপলব্ধি করবার ভরসা আর কতোটা সেখানে পাব?

সতীত্বের অগ্নিপরীক্ষা হয়তো রাঘব-পরিত্যক্তা সীতার জন্য প্রযুক্ত হবার কারণ উপস্থিত হয়েছিল, ফলে প্রাণময়ী জানকীর বিরহ স্বর্ণসীতা-প্রতিষ্ঠার মহিমায় মহিমান্বিতও হয়েছিল, কিন্তু প্রাণ ও সোনার মধ্যে যে যোজনব্যাপী দূরত্বের অন্তর্দাহ—তা'র পরিমাপ কি চিরাচরিত পথেই চিরকাল চলবে? প্রেমের স্পর্শকাঠি কি সত্য সত্যই অন্তরের বাইরে একটা কৌশলবুদ্ধির প্রেরণাকেই দেখবে বড়ো ক'রে?

জানিনা অভিশপ্ত বাঙালীকে এর সদুত্তর দিয়ে আশ্বস্ত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রপ্রমুখ বিশিষ্ট ঐক্য-পূজারীদের প্রচেষ্টা কতোটা সফল হবে! শুধু ক্ষীণ আশার দেউটি জ্বালিয়ে আমরা থাকব প্রতীক্ষায়। তা'ছাড়া কি-ই বা আর করতে পারি?

চাউম চাউম

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

মাদ্রিদে—স্পেন দেশের রাজধানীতে এবং স্থানে অস্থানে চলেছে মানুষের মুণ্ড নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলা। ফ্যাসিষ্ট দলের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট দলের চলেছিল পলিটিকাল রেস্—দেশের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার অবাধ অধিকার পাবার জন্যে। ফৌজে পল্টনে চলেছিল গুপ্ত চক্র রচনা, যে যার দলের প্রাধান্য স্থাপন করবার তোড়জোড়। হঠাৎ মাঝপথে লেগে গেল চুলোচুলি, রক্তারক্তি। রিপাবলিক গভর্ণমেণ্টের আসন উঠলো টলে—এই রাজনীতিক মেড়ার লড়াইয়ের ঠ্যালায়। ছয় সাত দিন ধরে নররক্তে হোলি খেলার পর এই আদর্শের রাসলীলা থেমে আসছে; ফ্যাসিষ্ট দলের অনেক কৃষ্ণঠাকুর নাকি আত্মঘাতী হয়ে বেঁচে গেছেন।

* * *

পশ্চিমের সভ্য দেশগুলি জুড়ে চলেছে এবম্প্রকার পলিটিকাল ইষ্টার পার্টি ম্যাচ। যার ফুটবল হচ্ছে রাষ্ট্রনায়কদের ও দলপতিদের কাঁচা মুণ্ড। এটা নাকি সভ্যতার চিহ্ন, এই অতিমাত্রায় আদর্শলোলুপতাই হচ্ছে বীফ-ভোজী জাতিদের পলিটিকাল সেলফ ডিটারমিনেশনের লক্ষণ। এই আদর্শের মোহ জাতির পর জাতিকে পেয়ে বসেছে, ছত্রিশ প্রকার ইজম্-এর জন্ম দিচ্ছে, মানুষের ঘটাচ্ছে বিপরীত বুদ্ধি। কম্যুনিজম্, ফ্যাসিজম্, রিপাবলিকানিজম্, র‍্যাডিকালিজম্—"অযুত তকত গোরা নাম নিব কত?" এই সবগুলিই হচ্ছে গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্ম, সব দলেরই আছে প্রবল দেশভক্তি—যার ঠ্যালায় তারা বিপক্ষের কাঁচা মাথাগুলোর দাম আধ পয়সার বেশী বলে মনে করে না। দেশপ্রেম ও জাতির কল্যাণ কামনার উগ্রতার অনুপাতে তাদের রক্ত পিপাসা চলেছে বেড়ে; দেশকে কচুকাটা করে নিঃক্ষত্রিয়া বসুন্ধরা না পেলে তাদের দলের মার্কামারা জাতীয় কল্যাণ হয় না।

* * *

আমাদের দেশেও পশ্চিম থেকে এই সব হিংস্র ইজম্-এর আমদানী হচ্ছে। সুভাষ সেনগুপ্ত লড়াইকে কাণা করে দেশে মাথা চাগাড় দিয়ে উঠেছে সোশ্যালিজম্, কম্যুনিজম্, ন্যাশনালিজম্, ফ্যাসিজম্। মাঝে আছে মধ্যস্বরূপে ব্রিটিশ সঙীন ও ব্রিটিশ বুলেট, নইলে এ সব ইজমের আমদানীর আগেই আমরা কোন শুভপ্রাতে দেখতে পেতাম বৌবাজার বা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে কিরণশঙ্কর ও ডক্টর রায়ের এবং তাঁদের দলের কাঁচা মাথার স্তূপ। দেশে শীঘ্রই পার্টি গভর্ণমেণ্ট ও দলো ক্যাবিনেটের আবির্ভাব হচ্ছে, সুতরাং এবম্প্রকার পুলকপ্রদ দৃশ্য দেখবার আশা আমাদের বাড়ছে বই কমছে না।

* * *

মতান্তর যখন মনান্তরে দাঁড়ায় এবং গলাবাজী ছেড়ে লাঠিবাজী ধরে, তখন দেশহিত হয়ে ওঠে পার্টি হিত, জীবকল্যাণ হয়ে দাঁড়ায় হিংস্র নরখাদক জন্তু বিশেষ। এই নরভোজী জীবকল্যাণ মন্ত্রোতে জন্মে নানা রূপে, নানা নামে সারা দুনিয়ায় পড়েছে ছড়িয়ে। এই সেদিন জাপানে এই রকম একদলই রাষ্ট্র নায়কদের পাকা মাথা কচকচিয়ে কেটেও যখন হালে পানি পায় নি তখন দধীচির মত হারিকিরি করে দেশের লাগি প্রাণ ত্যাগ করেছিল। প্রেম যে সাত্ত্বিক বস্তু, জীবকল্যাণ যে বেঁইবী ব্যাপার এ ধারণা মানুষের ক্রমশঃ বদলে আসছে। আর কিছুদিন পশ্চিমের কাছে পলিটিকাল সাগরেতি করতে পারলে দয়া ধর্ম্ম দেশ সেবা সবই আমরা বিশুদ্ধ শাস্ত্র মতে ভাই বেরাদারের রক্তেই করতে পারবো।

* * *

নতুন কনষ্টিটুশনের ধুয়া ধরে পার্টির মাদল এখনই বাজতে আরম্ভ করেছে। যতই এই মাদল, ডুগডুগি, জয়ঢাক, কাড়া নাকাড়া সশব্দে মহারোলে বাজতে থাকবে ততই জাতির বুক দুরু দুরু করে উঠবে। ল এণ্ড অর্ডার হাতে পেয়ে কম্যুনাল ও কম্যুনিষ্ট ত্রাতারা কাকে রাখবেন আর কাকে মারবেন সেটা একটা দেখবার জিনিষ হবে। এতদিনে লালবাজারে আর মোড়ের লালপাগড়ীর গায়ে পার্টির হাওয়া লাগে নাই, করপোরেশনেই সে পলিটিকাল দলো হাওয়া আবদ্ধ ছিল। এবার কিন্তু কৃষি বাণিজ্য এডুকেশন ল' অর্ডার স্বাস্থ্য শাসন শোষণ সব বিভাগেই কম্যুনাল ও পার্টি হাওয়া লাগবে। টিকি ও দাড়ীর বহরের অনুপাতে চাকরী জুটবে ও খসবে। দলের চাপরাস্ ও লেবেল দেখে দেখে আমলা ও কেরাণীর ভাগ্য পর্য্যায়ক্রমে খুলবে ও পুড়বে। দেশ যেন এই সব অতি আধুনিক সভ্যতার মার প্যাঁচের জন্য প্রস্তুত থাকেন। লালদিঘীর পাড়ের রাইটার্স বিল্ডিং-এ দলো ক্যাবিনেটের মুহুর্মুহু উত্থান পতনের তালে তালে ওখানে চাকুরে মহলে চলবে জোয়ার ও ভাটা। হায় ভারত মাতা! তোমার বরাতে এতও ছিল!

চাবুক-চুবুক

পঞ্চমুখ শর্ম্মা

নিম্নলিখিত পত্রখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে :—

ভাই কৃষ্ণেন্দু,

এবার 'স্বদেশ'-এ দেখিলাম, আমাকে স্মরণ করিয়া সম্মানিত করিয়াছ। কিন্তু তোমাদের আশঙ্কা অমূলক।

ঠাকুর-ঘরে, নিজে নিজে প্রবেশ করি নাই। অপরে প্রবেশ করাইয়াছিল। কিন্তু আসিয়া দেখিতেছি, শুধু কলাটুকুই সার; ভিতরে শাঁস নাই। কিন্তু তবু আশা ছাড়ি নাই। টালীগঞ্জের কদলী—ঋতুতে ঋতুতে তা'র রূপের ও স্বাদের তারতম্য ঘটে।

চেষ্টায় আছি, যদি তোমাদেরও কিঞ্চিৎ শাঁসের সন্ধান দিতে পারি। তবে ভয় হয়, সম্প্রতি কলায় যে রকম বীচির আধিক্য দেখা যায়—শেষ পর্য্যন্ত গলায় না আটকাইলে বাঁচি!

একদিন আসবে কী? কদলীর ক্ষেতে, রম্ভার গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য তোমার নিমন্ত্রণ রহিল। ভালবাসা নিও।

প্রীতি-প্রার্থী

সুধীরেন্দ্র সান্যাল।

আগামীবারে সান্যাল মহাশয়ের পত্রের উত্তরে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব।

• •

রবি-বাসরে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব আর শরৎচন্দ্রের আপ্যায়ন বিশেষ মনোযোগ দিয়াই পড়িলাম। জলধর দা'র স্বভাবসুন্দর ব্যবহারের মৌখিক প্রকাশও উপলব্ধি করিতে দেরি হইল না। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের আশীর্ব্বাণী পড়িয়া যাহা হইল, তেমনটি আর ইতিপূর্ব্বে হয় নাই। শরৎচন্দ্র, জলধর প্রভৃতি তরুণ সাহিত্যিকবৃন্দকে উৎসাহিত করিবার সাথে সাথে প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ বলিলেন —

"মানুষের মন মানুষের কাছ থেকে দরদ, অনুকম্পা ও নগদ বিদায় চায়, দূরের কালের উপর বরাত দিয়ে থাকার চেয়ে হাতে হাতে যা পাওয়া যায়, তাই সে চায়। সে চায় প্রীতি, অনুকম্পা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা এ-জীবনেই পে'তে। খ্যাতি প্রতিপত্তি বল সবই যদি এখানেই সে লাভ করতে পারে - সে আনন্দ ও প্রীতিই যে তার পরম লাভ। এমন লেখক কেউ পৃথিবীতে নেই, আমি স্পর্দ্ধা ক'রে বলছি না, যে চায় না তার নিজের খ্যাতি প্রতিপত্তি এ-জীবনেই লাভ করতে"।

এরূপ একটি সত্য কথা এরূপ একজন কবির মুখে শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম বটে, এবং ইহাই যে 'সাহিত্যিক জীবনের সার্থকতা'—তাহাও বুঝিয়া ফেলিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কেমন যেন শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম! সরল মনে কবি যাহা ব্যক্ত করিলেন—তাহাকে 'স্পর্দ্ধা' বলিবার স্পর্দ্ধা অবশ্য নাই, তবু—সদ্য-আগত 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদকীয় গর্দ্দা দেখিয়া শঙ্কা যেন লঙ্কাকাণ্ডের আভাষ লইয়া অচিরেই উপস্থিত হইল। 'সৎ' এবং 'চিৎ'-এ আনন্দিত কোনো ব্যক্তিকে যদি বলিতে শুনা যায়—

"আত্ম-বিজ্ঞাপনের কৌশলের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ যে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তিনি যে-বয়সে উপনীত হইয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে, তাঁহার অপ্রীতিকর সমালোচনা-কার্য্যে আমাদের ন্যায় মানুষের সঙ্কোচ বোধ করা কর্ত্তব্য, ইহা আমরা স্বীকার করি"—

তাহা হইলে স্বতঃই মনে হইবে, রবীন্দ্রনাথের কবিসুলভ সরলতা ন্যাজকাটাদিগের গরল ছড়াইবার পথে ফুল ছড়াইয়া দিয়াছে! 'বানরের গলায় মুক্তার মালা' পরাইবার ব্যর্থতা যে কবি-সম্রাট জানেন না, এমন কথা বলিবার সাহস নাই। কিন্তু শ্রীসচ্চিদানন্দ যখন পাণ্ডিত্য জাহির করিয়া বলিতেছেন—

"আমাদের মতে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা ও সাহিত্য-জগতে আজীবন আত্ম-প্রতারণা করিয়া বাঙ্গালী বহু যুবক যুবতীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন।"—

তখন জনসাধারণের মনে একটা কৌতূহল অবশ্যই জাগিয়া উঠিতে পারে, রবীন্দ্রনাথ কোন্ যুবক বা কোন্ কোন্ যুবতীর সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন? নেপথ্য-সম্পাদকের এই আস্পর্দ্ধা ও বেপরোয়া কুঁজী-বুড়ীর নীতি বা স্পষ্ট বলিবার সাহস দেখিয়া ভড়কাইয়া যাইতে যাইতে পরক্ষণেই যখন বলিতে শুনি—

"পরন্তু, তাঁহার কার্য্যে বাঙ্গালী যুবক ও যুবতী-সমাজে দলাদলির সৃষ্টি হইয়া থাকে। তিনি (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ) সমাজের উপর দাঁড়াইয়া আমাদের যুবক যুবতীগণকে লইয়া অহরহঃ যে দানবোচিত (!) নৃত্য সাধন করিয়া আসিতেছেন, তাহা বাঙ্গালী যুবক-যুবতী তাহাদের স্ব স্ব প্রাণের দায়ে আর বহুদিন সহ্য করিতে পারিবে না। একদিন ছিল,

যখন আমাদের সমাজে ঐরূপ কেহ করিলে মানুষ তাহার কর্ণচ্ছেদ পর্য্যন্ত করিয়া দিত।"—

তখন হঠাৎ চিৎ হইয়া শুইয়া মনে পড়িয়া গেল,—সত্যই তো, এমন এক-দিনও ছিল—যেদিন স্ত্রীকে অতিথি-সেবার কার্য্যে তথাকথিত ভাবে নিয়োজিত করিয়া মানুষ বেহেস্তে যাইবার পথ সুদৃঢ় করিয়া লইত! অতঃপর পুণ্য-সঞ্চয়ের 'এমন একদিনে' অতিথি-সৎকারে সহধর্ম্মিনী নিয়োগের যে ব্যবস্থা ছিল—উহা, এবং পিতাকে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করার সম্বন্ধে সচ্চিদানন্দ কি বলেন?

* *

শ্রাবণের 'শনিবারের চিঠি' পড়িয়া 'সাহানা'-সম্পাদক যে সেয়ানা ব্যক্তি, তাহা বুঝতে পারিলাম। 'সংবাদ সাহিত্য' বলিতেছেন—

"সাহানার সম্পাদক…যে এতটা সেয়ানা তাহা আমাদের জানা ছিল না, শুধু আবর্ত্তনে নয়, ভদ্রলোক (?) বলিয়া এবং না বলিয়া আ-হরণেও পটু। এবং চোর মাত্রেরই যেমন লম্বা লম্বা ঝুলি থাকে ইঁহারও (ই-এর ডগায় চন্দ্রবিন্দু দিয়া কি চোরের সহিত তামাসা করা হইতেছে?) তাহাই আছে। অথচ এখনও হাত সাফাই হয় নাই, ধরাও পড়িয়া যান।"

যিনি চুরি করিয়া হাতে নাতে ধরা পড়িয়া যান তিনি কিরূপে সেয়ানা হইলেন—বুঝিলাম না? কিন্তু ঘটিটা বাটিটা চুরি করিয়া যেমন জুতা খাইতে হয়, এই শ্রেণীর চোরেরা যে সেরূপ ব্যবস্থা হইতে মুক্ত—কেমন করিয়া তাঁহা অবশ্যই জানেন। অতএব উক্ত কর্ণে উত্তরোত্তর তিনি পাকিয়া উঠিয়া সাহানা-সম্পাদকের যোগ্যতা লাভ করিয়া যে ফাঁপিয়া ঢোল হইয়া উঠিবেন, এ-বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আচ্ছা হেমন্তবাবু কি মণে ময়রার পাড়ার লোক? ধনাধ্যক্ষ মণি বাগচি মহাশয় এবং 'অগ্রগতি'র সম্পাদক মহাশয় কি বলেন?

(মিস্) [illegible]ালিয়া চাটুয্যে যাহা বলিতেছেন—

"ভাল হোক, মন্দ হোক, প্রেমে পড়িবার সুযোগ বা দুর্য্যোগ একবার সম্মুখে আসিলে সুনীতি দুর্নীতির বিচার তুলিয়া

পদলগ্নীকৃতবাসে পুরুষকে চিরদিনই প্রেমের বেদীতে মাথা ঠেকাইতে দেখিতেছি। বলা বাহুল্য, নারীর পদপল্লবই এই প্রেমের বেদী নিজের বেলায় লোকে বলে স্বর্গ! অপরের বেলায় বলে—নরক! কিন্তু শ্রীমতী শ্যামলীমা চাটুয্যের মতে ইহা বঙ্কিমও নয়, টঙ্কিমও নয়, ইহা নোয়া বেঁকানো।"

প্রেমের দেবতা ঘনশ্যাম যখন বাঁকা, তখন নোয়া যে বাঁকিয়া যাইবে—বুঝা যাইতেছে! কিন্তু বাঁকিয়া বাঁকিয়া অবশেষে যাহা হইবে, তাহার দাওয়াই মিলিবে তো?

* *

কুমারী আহানারা চৌধুরীর সৎসাহসের কথা ইতিপূর্ব্বেই জানাইয়াছি। মহিলা-মহলের বিশেষ একটি বিষয়ে তাঁহার অজ্ঞতা লইয়া তর্ক উঠায়, ইনি নারীসুলভ গতানুগতিকতার আশ্রয় লইয়া যে বিব্রত হইয়া পড়েন নাই, বরং নিজ অজ্ঞতা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়া লইয়াই যথাযথ ভাবে আপনার গুরুদায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, নারীজাতির এই নির্ভীকতা প্রশংসনীয়। পুরুষদিগের শ্লেষোক্তি ও স্বেচ্ছাচারিতার হাত হইতে নিস্তার পাইয়া নারী যে প্রশংসনীয়ভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার স্বাবলম্ব পথে কাঁটা সরাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন, ইহাপেক্ষা গৌরবের আর আছে কি? এমতাবস্থায় আমরা জলধরদা'র কথারই প্রতিধ্বনি করি—

"আমার আশীর্ব্বাদ চেয়েছ। আমি ঐ কাজটি আর করতে পারব না, কারণ, আমার আশীর্ব্বাদের উপর ভগবানের অভিশাপ আছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে অনেক সদ্যপ্রকাশিত কাগজকে আমি আশীর্ব্বাদ করেছি। তার ফলে কি হয়েছে জান? সে সব কাগজের কোনখানি আঁতুড়েই মারা গিয়েছে, কোনখানি কষ্টেস্বষ্টে অন্নপ্রাশন অবধি বেঁচেছিল, কেউই বছর পেরুতে পারে নাই —এমনি আমার আশীর্ব্বাদের জোর।"

তবে 'সাহানা'র সম্পাদক-সম্পাদিকা যাহাতে উক্ত ফল না দর্শন করেন, আমরাও কায়মনে ইহা প্রার্থনা করি!

কিন্তু স্নেহময়ী দেবীর কবিতাটি এমন চমৎকার হওয়ায়, সম্পাদক মহাশয়ের তারিফ করিতে ইচ্ছা যাইতেছে!—

"দিবস নিশার সন্ধি নিমিষে,
স্তিমিত আলোক মাঝে।
ক্ষণিকের তরে দেখেছিনু তোমায়,
তারি সুর প্রাণে বাজে।

বেশ! বুঝিয়া লইলাম। অতএব তৃতীয় লাইনে 'ক্ষণিকের তরে দেখেছিনু তোমায়' বলিয়া যে ছন্দের বেয়াদপিতে হোঁচট খাইতেই হইবে—ইহা কেমন কথা? হেমন্তবাবু যে খোঁড়া হইয়াছেন, এমন সংবাদ আজো আমরা পাই নাই। তবে?

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের গল্প নয়, কবিতা। এবং যে-সে কবিতা নহে, অর্থাৎ—

"ধুলার উপরে পড়িয়া রয়েছে অই—
যাহার মালার ছিন্ন ফুলটি—
প্রাণের বঁধু সে কই?
জানি না কি ঘুম এসেছিল
মোর মাথাটি খেয়ে॥"

আহা! প্রেমের পেঁচোয় অবশেষে ইহাকেও পাইয়া বসিল? কিন্তু বঁধুকে নিদ্রিত দেখিয়া যে বধূ 'প'-এ আকার দেয়, তাহাকে বড় তো চিৎপুরে পাওয়া যাইতেও পারে। কারণ পুণ্য সঞ্চয়ে পুণ্যধামে যাইতে হইলে ঐ পথ পার না হইয়া উপায় নাই।

এই জন্যই বোধ হয় মিয়া সাহেবও বলিতেছেন—

"অঝোর ধারায় মেঘলা বায়ে
পরশ তোমার পেনু যে গায়ে"

ইনি একেবারে পাইয়া বসিয়াছেন এবং অবিলম্বে নাসিকা-যোগে অঙ্গ-যোগ করিয়া রোগটি যে বায়ুরোগে নহে, তাহাও প্রমাণ করিতেছেন—

"আমার বুকের ব্যাকুলতায় যে ভাবা জাগে
তার কি ছায়া তোমার গোপন হিয়ায়
লাগে!"

আহা! তাহা আর না লাগিয়া যাইবে কোথা? 'গোপন হিয়ায়' 'ছায়া'টা আর লাগিবে না!

* * *

'রূপ-রেখা'র কবি 'অমর মুহূর্ত্ত' উপলব্ধি করিয়া যাহা বলিতেছেন, 'জীবন নশ্বর' হইলেও যে তাহার মরণ নাই—ইহা বুঝা যাইতেছে। কেন না—

"বাঁচিবো না চিরদিন, মরে যাবো জানি,
স্থূল, শুষ্ক সে মুহূর্ত্ত (?), সত্য বলে মানি।
তবু ওই ওষ্ঠে-জাগা অকস্মাৎ হাসি
মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না-সম উঠিলে বিকাশি
মুগ্ধ চোখে, বাঁচি আমি সে মুহূর্ত্ত তরে,
সমগ্র চেতনা (?) মোর, সেই লয় হরে।"

'সমগ্র চেতনা' হরিয়া লইল, অথচ—

"তবু খুঁজে না পেনু সে পরশের দাম!"

এরূপ অবস্থায় সব পাওয়া যায়, আর ঐটাই পাওয়া যায় না?

———

সৎসঙ্গ আশ্রমের মামাবাড়ীর আব্দার !

পাবনার উপকণ্ঠে হিমাইৎপুর গ্রামে অনুকূল ঠাকুরের 'সৎসঙ্গ' নামক একটী 'হোয়াট-নট' আশ্রম আছে, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। সেই আশ্রমের তরফ হইতে গ্রামবাসীদিগকে উচ্ছেদ করিয়া স্থান দখলের যে চেষ্টা হইতেছে তাহাতে পাবনায় বিষম চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। সম্প্রতি তথায় একটী জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর কয়টী নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

১। গত ১১ই জুন তারিখের কলিকাতা গেজেটে সৎসঙ্গ হইতে হিমাইতপুর গ্রামের ৫০ বিঘা পরিমাণ জমি অধিকার করিবার যে নোটিশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এই সভার উপস্থিত জনগণ অত্যন্ত বিচলিত ও ভীত হইয়া পড়িয়াছে।

২। এই সভায় উপস্থিত হিমাইতপুর গ্রামের অধিবাসীগণ বহুকাল হইতে এই গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছে। যে সমুদয় জমি অধিকার করিবার নোটিশ কলিকাতা গেজেটে বাহির হইয়াছে ঐগুলি তাঁহাদের উপজীবিকা, কতকগুলি শস্যক্ষেত্র, কতকগুলির উপর বহু ফলবান ও মূল্যবান বৃক্ষাদি ও বাগ-বাগিচা ও কতকগুলির উপর বসত বাড়ী রহিয়াছে। পিতৃপিতামহগণ বহুকালের পরিশ্রমে বহু অর্থব্যয়ে ঐগুলি প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। এই সমুদয় স্থান হইতে ইহাদের উচ্ছেদ হইলে ইহারা উপজীবিকাহীন ও নিরন্ন হইবেন।

৩। সৎসঙ্গের প্রায় সমুদয় লোকই বিভিন্ন জেলার অধিবাসী। তাহাদের সহিত উপরোক্ত গ্রামবাসীদের এখনও ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। তাহাদের রীতিনীতি, আচার ব্যবহারের সহিত বর্ত্তমান সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির অত্যন্ত বিরোধ থাকার জন্য এই সব গ্রামের ব্যক্তিগণের সহিত শীঘ্র ঘনিষ্ঠতা হইবার সম্ভাবনার উপায়ও নাই বরং তাহারা গ্রামবাসীদের উপর বিদ্বেষভাবাপন্ন।

৪। সৎসঙ্গ এ কাল পর্য্যন্ত হিমাইতপুর গ্রামে অনেকের বিরুদ্ধে বহু মামলা মোকদ্দমা করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। অনেক মামলায় তাহারা হারিয়া গিয়াছে। এ সব মামলায় গ্রামের শান্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ যে সকল ব্যক্তির জমি অর্জ্জন করিবার নিমিত্ত কলিকাতা গেজেটে নোটীশ বাহির হইয়াছে তাহাদের অনেকের সহিত সৎসঙ্গের মোকদ্দমা হইয়া গুরুতর অসদ্ভাব হইয়া আছে।

৫। হিমাইতপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত অনুকূল চক্রবর্ত্তী ১৯৩৫ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ১২০০০৲ টাকা মূল্যে "সৎসঙ্গ" নাম এবং ইহার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি খরিদ করিয়া বিক্রয় কবালা রেজেষ্টারী করিয়া লইয়াছেন—কাজেই কর্পোরেট বডি হিসাবে সৎসঙ্গের এখন কোন অস্তিত্ব নাই। ইহা এখন শ্রীযুক্ত অনুকূল চক্রবর্ত্তীর ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে সৎসঙ্গের যে সমুদয় সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠান সাধারণের বলিয়া প্রকাশ ছিল উক্ত খরিদা কবালা হইবার পর তাহা ব্যক্তিগত স্বত্বে ও অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। একণে যে সকল জমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনবশতঃ সৎসঙ্গ দ্বারা অর্জিত হইবার নোটীশ হইয়াছে তাহাও পূর্ব্বের ন্যায় ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে পরিবর্ত্তিত হইবার আশঙ্কা সহজেই উদয় হইতে পারে।

৬। শিক্ষাবিভাগের অনুমোদিত সৎসঙ্গের কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাই। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তাহাতে শুধু ঠাকুরের শিষ্য ও শিষ্যানীগণ প্রাইভেট পড়িয়া প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়া থাকে। সৎসঙ্গের তপোবন নামীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। এই প্রতিষ্ঠানে স্থানীয় ছাত্র ও ছাত্রীদের শিক্ষায় কোন সুযোগ ও সুবিধা নাই। সুতরাং এই প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রসার ও উন্নতির জন্য জমি গ্রহণ এই সভা অনাবশ্যক ও সর্ব্বসাধারণের স্বার্থের প্রতিকূল বিবেচনা করেন।

পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহে এই সভা বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছে, মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর এবং ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট এই ঘটনার আনুপূর্ব্বিক তদন্ত করিয়া হিমাইতপুর ও পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের বিপন্ন ভীত অধিবাসীগণকে এই অতর্কিত বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন এবং কলিকাতা গেজেটের নোটীশ প্রত্যাহার করিয়া গ্রামবাসীগণকে আশ্বস্ত করিবেন।

শেষ প্রশ্ন

একদিন ছিল, পাঁচ জনায় মিলিয়া একজনাকে ভোগ করিবার সামাজিক নীতি সতীত্বের মহিমাকেই সুদৃঢ় করিত। পরিবারে পরিবারে তখন যৌথ-স্ত্রীর অভাব ছিল না। এবং সেই যৌথ-প্রণয়ের আধারস্বরূপা একমাত্র নারীকে সতীশিরোমণি নাম লইতেও কোনো সামাজিক বিপর্য্যয়-আশঙ্কায় অভিভূত হইতে হইত না।

কিন্তু কালের চাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। একদিন যাহা সুনীতি ছিল, আজ তাহাই দুর্নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এখন যদি পাঁচজনে মিলিয়া যৌথ-স্ত্রীর কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে চাহেন, তাহা হইলে ফলে শ্রীদাওা ও শ্রীঘরের ব্যবস্থাই বড়ো হইয়া উঠিবে! কোনো কিছুই যে অক্ষয় নহে, ক্ষয়শীল,—যতই কেননা মুখ বুজিয়া খেয়াল খুসীর গুঁতা দেখাও, উহাতে ভবী ভুলিবে না।

মানিলাম, তুমি খেয়ালী, তবু যদি মনে করিয়া থাক, 'বোবার শত্রু নাই,— তবে ভুল করিয়াছ। বুণো বিড়াল বলিয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকিয়া রেহাই পাইবার দিন আর নাই। বরং কোঁৎকা খাইয়া 'গুতার চোটে বাবা বলিয়া' ডাকিবার পূর্ব্বেই হাঁ করিলে—সুবুদ্ধির পরিচয়ই পাওয়া যাইবে। সুতরাং সময় থাকিতে ভেক বোবা হইয়া না থাকিয়া সত্য কথাটাই স্বীকার করিয়া ফেল! যাহার নুন খাইয়াছ, তাহার গুণ না গাহিতে পার, কিন্তু কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা চাহিতে দোষ নাই। অন্নদাতার নিকট ক্ষমা চাহিতে আর লজ্জা কি?

গৌরীশৃঙ্গ অভিযানকারীদের চিঠিপত্র কোথায় গেল?

কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, যাঁহারা গৌরীশঙ্কর অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন, তিন মাস ধরিয়া তাঁহারা কোন চিঠিপত্র পান নাই। অভিযানকারীরা যখন ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন সেই সময় জানিতে পারা গিয়াছিল, গত এপ্রিল, মে, জুন কিছু কম এক হাজার পত্র অভিযানকারীদিগের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একখানি চিঠিও তাহারা পায় নাই।

তাহাদিগের নামে যে সকল পত্র লেখা হইয়াছিল সে সকল পত্র চুরি হইয়াছিল, তাহার একটা আনুমানিক বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। অভিযানকারীরা এক রকম ডাকের ব্যবস্থা করিয়াছিল। গণ্টকে অভিযানকারীদিগের পোষ্টাল এজেণ্টের নিকট বহু চিঠি পৌঁছিবার কথা ছিল। ডাকের ব্যাগগুলি শীল মোহর করা থাকিত। কয়েক দিন গণ্টকে নিরাপদে ডাকের চিঠি পৌঁছিয়াছিল। পোষ্ট মাষ্টারের ষ্ট্যাম্পের হিসাব দেখিলে উহা যে সত্য তাহা প্রমাণ করিবার কারণ ছিল। গত এপ্রিল মাসে টেন্দী ড্যাং হইতে যে চিঠিগুলি যাইবার কথা ছিল, তাহাই উহাদের নামের শেষ চিঠি। এই চিঠিগুলিই অভিযানকারীরা পাইয়াছিল। ১০ই এপ্রিল হইতে জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত উহারা আর কোন চিঠিই পায় নাই। ক্রমশঃ সন্দেহ হইতে আরম্ভ হইল। সকল চিঠিই যে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল, তাহা নহে। যে সকল চিঠি রেজেষ্টারী করা ছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকখানি অভিযানকারীদিগের হস্তগত হইয়াছিল। বাকী চিঠি সব উধাও হইয়াছিল। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সাত শত হইতে এক হাজার চিঠির কোন পাত্তা মিলে নাই।

যে সকল চিঠি নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে কতক বিমান ডাকে বৃটেনের ঠিকানায় এবং বাকীগুলি ভারতে লিখিত চিঠি ছিল। বোধ হয় যাহারা এই চিঠিগুলি চুরী করিয়াছিল তাহারা অভিযানকারীর নামের রবার ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিয়াছিল। নামের রবার ষ্ট্যাম্প যে তাহারা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল তাহারও একটা সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। এবং ইহাও অবিশ্বাস করিবার কারণ হইতে পারে না যে, বড় বড় জুয়াচোর এই কাণ্ডে লিপ্ত ছিল। সকল ষ্টেশনেই যে এ কাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহাতেও সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না। সকল ষ্টেশনেই উহা ঘটিয়াছিল, অতএব বলিতে হইবে ব্যাপারটি একটি বিরাট ষড়যন্ত্র। এরূপ ষড়যন্ত্র পূর্ব্বে কখনও শুনা যায় নাই। বাঙ্গালায় পোষ্টমাষ্টার জেনারেলকে এ সকল ব্যাপার জানান হইয়াছিল, কিন্তু ডাকের চিঠিগুলি কি করিয়া নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই, সুতরাং এই ষড়যন্ত্রের কারণ নির্দ্দেশ করা আদৌ সম্ভবপর হয় নাই। অভিযানকারীরাও উহার কিছুই বুঝিতে বা ধরিতে পারে নাই।

দার্জ্জিলিংএর সংবাদে প্রকাশ, গৌরীশঙ্কর অভিযানকারী মিঃ এফ, এস, স্মাইথ, মিঃ উইন্‌হ্যাম এবং ক্যাপ্টেন শেভিল

দোভাষী কর্ণপাল এবং গাড়োয়াল পল্টনের একজন অফিসারকে সঙ্গে লইয়া ৭ই জুলাই দার্জ্জিলিংএ উপস্থিত হইয়াছিলেন। দার্জ্জিলিংএ পৌছিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিলে তথাকার সকলেই অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও চেষ্টা করিয়া চোর ধরিতে পারেন নাই।

অভিযানকারীর মিঃ সিপটন এবং আর এক ব্যক্তি কালিম্পং হইতে সরাসরি কলিকাতা অভিমুখে আগমন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে চিঠি চুরির কথাও হইয়াছিল। কিন্তু সেখানেও বিস্ময়ের উৎপত্তি হইয়াছিল।

৯ই জুলাইএর কথা। অভিযানকারীর অধিকসংখ্যক ব্যক্তি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু দলের অধিনায়ক মিঃ হিউ রাটলেজ এবং অপর দুই ব্যক্তির দার্জ্জিলিংএ কয়েক দিবস থাকিবার কথা হইয়াছিল। দার্জ্জিলিংএ থাকা কালীন চিঠি চুরি সম্বন্ধে অনেক জল্পনা কল্পনা হইয়াছিল। কিন্তু কোন সন্ধান মিলে নাই।

ডাক্তার হাম্‌ফ্রে এবং মিঃ উইন্‌হারিস ৮ই জুলাই সন্ধ্যাকালে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই চোরের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু চোর কোথায়?

১০ই জুলাই যাঁহারা দার্জ্জিলিংএ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত কথাপ্রসঙ্গে সংবাদিকসঙ্ঘের একজন প্রতিনিধি অবগত হইয়াছিলেন যে, প্রত্যাবর্ত্তনের সময় অভিযানকারীদিগের একজন প্রিয় কুলী তিব্বতের নদী পার হইবার সময় মারা পড়িয়াছিল। তাহাদিগের মূল শিবির হইতে ঐ নদীতে পৌছাইতে হইলে সাত দিবস সময় লাগে। নদীর প্রবল তরঙ্গে লোকটা ভাসিয়া গিয়াছিল। উহাকে বাঁচাইবার জন্য বহু চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই উহাকে বাঁচাইতে পারা যায় নাই। দুই একটি লোক তথায় উপস্থিত থাকিয়া এই ব্যাপার দর্শন করিয়াছিল। তারপর তাহারা পরস্পরের মধ্যে কানাকানি করিয়াছিল। কি বলিয়াছিল তাহারাই জানে, অভিযানকারীর কেহ তাহা শুনিতে পায় নাই।

এইরূপ একটি ব্যাপার মার্কিণ মুলুকেও হইয়াছিল, কিন্তু চোর ধরা পড়িয়াছিল। মার্কিণ মুলুকের যে অভিযানে এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল, সে অভিযানের নাম মিনিয়া গঙ্কার। উহারা গ্রীনল্যাণ্ড যাইবার জন্য একটি বিমান পথের অনুসন্ধান করিতেছিল।

এভারেষ্ট পার্টি কর্ত্তৃক ডাকে প্রেরিত যে সকল জিনিষের এতদিন সন্ধান মিলে নাই তাহার সম্বন্ধে দার্জ্জিলিংয়ের ডেঃ পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত এম, মিত্র সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এবং ডেঃ কমিশনারের আদেশ অনুসারে তদন্ত আরম্ভ করেন।

প্রকাশ, উক্ত পার্টির লিখিত কতকগুলি চিঠি পত্রের সন্ধান মিলিয়াছে। ঐ সকল চিঠি এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে এবং মে মাসের প্রথমভাগে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু চিঠিগুলি মাত্র গত সপ্তাহে বিলি করা হইয়াছে। চিঠিগুলির উপর গাংটক পোষ্ট অফিসের ছাপ ছিল। বিষয়টা অবিলম্বে সিকিমের পালটিকেল অফিসারকে জ্ঞাপন করা হয়। প্রকাশ, গাংটক পোষ্ট-অফিসে খানাতল্লাস করিয়া বহুদিন পূর্ব্বে এভারেষ্ট পার্টির লোকদের প্রেরিত ৪০ খানার অধিক বিমান ডাকের চিঠি অফিস গৃহের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। অবিলম্বে তথাকার বিভাগীয় তদন্তের ফলে প্রকাশ পায় যে পোষ্ট-আফিসের নগদ তহবিলে ১ সহস্র টাকা কম রহিয়াছে।

সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে যে, গাংটক পোষ্ট অফিসের ভারপ্রাপ্ত পোষ্ট মাষ্টারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গ্রাসবীর প্রত্যক্ষ পরিদর্শনাধীনে এ বিষয়ে আরও তদন্ত চলিতেছে।

নাম জানা দুই বন্ধু মোরা

(বড় গল্প)

দিলীপ দাশগুপ্ত

মনসা চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

হঠাৎ অরুন্ধতীর ঘুম ভেঙে গেল। ঝড়ের পরে দিব্যি ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল বাইরে। চকচকে জোছনার ঢেউ আর নিশ্ছিদ্র নীরবতায় ঢাকা সারা পৃথিবী। চমকে উঠে বিছানার পাশে বসলে সে। ব্লু ইস্ শেডের টেবল্ ল্যাম্পটা তখনও জলছিল। আস্তে সেখান থেকে উঠে অরুন্ধতী গিয়ে বসলে একটা চেয়ারে। তারপর হোয়াট্ নট্ থেকে এক লেখিকার একটা বাঙলা উপন্যাস বার কোরে নিলে। একঘেয়ে পচা, নোংরা বিষয় দিয়ে কতগুলো বই লিখেই এই লেখিকা মস্ত বড় লেখিকা হ'য়ে পড়েছেন। অরুন্ধতীর চোখের সামনে বইয়ের সমস্ত অক্ষরগুলো ঝলসে উঠলো। তার বুকে যেন ঝড় উঠেছে আর রক্ত উঠেছে ফেনিয়ে। কিছুই যেন ভাল লাগছে না। আস্তে অস্ফুট স্বরে ডাকলে—উৎপলা, উৎপলা! কিন্তু উৎপলা তেড়ে নরম হ'য়ে গভীর নিদ্রার কোলে এলিয়ে পড়েছে মরার মতো। তারপর নিতান্ত চুপি চুপি পাশের ঘরে অন্ধকারে প্রবীরের বিছানার কাছে এগিয়ে গেল। ভয়ে, আতঙ্কে তার বুকটা যেন একবার কেঁপে উঠলো। তবু বিছানার পাশে বসে প্রবীরের [illegible] মুখের দিকে একবার চাইতে [illegible] কিন্তু অন্ধকারের কঠিন [illegible] তার দৃষ্টির দীপ্তি। সে আর পারছে না, কিছুতেই পারছে না সে। অসহ্য! দস্তুরমতো অসহ্য! অরুন্ধতী মাতাল হ'য়ে উঠলো। আজ রাত্রির স্তব্ধতার ঘুমন্ত পৃথিবীর বুকে প্রবীরের সঙ্গে তাকে একটা বোঝা-পড়া কোরে নিতে হ'বেই। হয়তো প্রবীর তাকে ঘৃণা করবে, না-হয় ভালবাসবে। মুহূর্তে প্রবীরের মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে' আস্তে তার নাকের সঙ্গে অরুন্ধতী স্পর্শ করালে নিজের নাক। আবার চমকে উঠলো সে, ঠিক নিজেরই মনে-মনে। ইস্ প্রবীর যদি জানে, বুঝতে পারে—! তবু তার শান্তি নেই। প্রবীরের কপালে তার নরম, ঈষদুষ্ণ হাতখানা রাখলে অরুন্ধতী। তারপর তার চুলের বুকে হাত বুলাতে লাগলে। অনেকক্ষণ কাটলো এভাবে। তারপর প্রবীর ঘুমের জড়তা ঠেলে চোখ মেলে চাইতেই দেখলে, কে যেন সামনে। কিন্তু প্রবীর চিন্‌তে পারলে না। ঘুমের কাজল তখনো তার চোখে। আর অন্ধকারের পরদা সারা-ঘরে।

উৎপলা, উৎপলা? প্রবীর ডাকলে। কোন সাড়া শব্দ নেই। তারপর তাকে বুকের উপর টেনে এনে ছোট্ট একটা চুমো খেয়ে বললে: উৎপলা, তুমি এখনো জেগে? ঘুম আসছে না বুঝি?

আনন্দের তীব্রতায় অরুন্ধতীর চোখের কোল ভেঙে গড়িয়ে এলো কয়েক ফোটা জল।

প্রবীরবাবু, আজকে আমার জীবন ধন্য হ'লো। পরিপূর্ণতার আনন্দে আমি অস্থির।

অরুন্ধতীর কণ্ঠস্বর শুনে' হঠাৎ যেন নদীর ভাঙনের মুখে-বাড়ী। পড়লো প্রবীর। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে আলোটা জালিয়ে অরুন্ধতীর হাত দু'খানা ধরে' মিনতি-কাতর কণ্ঠে বলে, আমায় ক্ষমা করুন অরুদেবী! আমি বুঝতে পারিনি। শপথ করে' বলতে পারি আমি বুঝতে পারিনি। ভেবে-ছিলুম, হয়তো উৎপলা। আমার এ-ভুলের জন্য আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

আপনার ভুলে আমি আজ বেঁচে গেলুম।

আমায় ঠাট্টা কোরছেন? সত্যি আমি বুঝতে পারিনি।

সত্যি!

সত্যি।

আচ্ছা, মানলুম আপনার ভুল হয়েছে, কিন্তু ভুলে কোন মানুষকে যদি খুন করা যায়, আসামী কি রেহাই পায়?

তা' হ'লে আপনি আমার বিচার কোরতে চান?

আল্‌বাৎ।

আচ্ছা তাই হোক।

কী শাস্তি আপনি চান?

আপনি কি শাস্তি দিয়ে সুখী হ'তে পারেন?

যে-কোন শাস্তি। আমার বিধান নির্ব্বিবাদে মেনে নিতে পারবেন তো?

কেন পারবো না?

আবার চিন্তা কোরে দেখুন। এক মিনিটের সময় দিচ্ছি আপনাকে।

হ্যাঁ পারবো।

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি?

আমাকে আর একটা চুমো—এই তোমার শাস্তি। (সঙ্গে সঙ্গে অরুন্ধতী যেন তুবড়ীর মতো ফেটে পড়লো।) প্রবীর, তুমি জান না, তোমাকে কত ভালবাসি আমি। এমন রাত নেই যেদিন তোমাকে স্বপ্নে দেখি না।

প্রবীর চুপ কোরে রইলো।

আমার কী কোন উপায় কোরতে পারবে না তুমি ?

(একটু চিন্তিতভাবে) কী উপায় কোরব ?

তাও আমায় বোলে দিতে হবে ? আমার ভালোবাসার কী কোন-ই মূল্য নেই। এ অসহ্য ব্যথা, যা' পলে পলে আমাকে বিষিয়ে মারছে, শুকিয়ে ফেলছে আমার বুকের রক্ত তা' কেমন কোরে সহ্য কোরব আমি! বল, প্রবীর, বল তুমি আমাকে ভালবাসতে পারবে ? ভালবাসায় কতো ব্যথা তা' আর তোমাকে কী বোঝাব আমি। যে-ভালবাসার ব্যথা সহ্য কোরতে না-পেরে আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে পালিয়ে এসেছ।

প্রবীর মুগ্ধ হ'লো আর তার বুকে জেগে উঠলো একটা সাময়িক উন্মাদনা, শিল্পীর পক্ষে যা' স্বাভাবিক। তারপর বোল্লে, 'যাও, অরু যাও এবার শুয়ে পড়গে'।

এখানেই যদি শুয়ে থাকি, ঠিক এই বিছানায়, তোমার পাশে।

প্রবীর অরুন্ধতীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকালে। তারপর আবার—

যাও, উৎপলা একলা রয়েছে ও-ঘরে।

আমার ঘুম যে পাচ্ছে না। তুমি আর অমন করে' আমায় জ্বালিও না প্রবীর। আমার শুধু ইচ্ছা হচ্ছে তোমার কাছে বসে অই সুন্দর চোখ দু'টোর দিকে তাকিয়ে থাকি।

উৎপলা ও-ঘরে একলা শুয়ে আছে।

থাক না, আমরা তো এখানেই আছি।

না-হয় চলো ওকে তুলেই তিনজনে গল্প করা যাক।

অরুন্ধতী গোপনে তার বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছলে। কিন্তু প্রবীরের দৃষ্টি তা' এড়ায়নি।

তুমি কাঁদছো অরু ?

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে উৎপলা চেঁচিয়ে উঠলো—প্রবীরদা, প্রবীরদা ?

অরুন্ধতী আর প্রবীর ছুটে এলো।

কী রে, কী হ'লো তোর ? শুধালো অরুন্ধতী।

উৎপলার চোখ দু'টো যেন কোন ভয়ার্ত্ত পশুর মতো উদ্বেগ আর আশঙ্কায় ভরা। সে স্তব্ধ, নির্বাক। আর শরীর অবসাদের স্তূপ। আর চোখ দুটো যেন থেকে থেকেই ছুটে যাচ্ছে বাইরে, এখানে-ওখানে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তাতে সে যেন কাকে খুঁজছে, কি যেন হারিয়ে গেছে তার।

উৎপলা তুমি অমন কোরছ কেন ? জিগগেস কোরলে প্রবীর।

প্রবীরদা' প্রবীরদা' তুমি আমার গায়ে হাত দাও। আজ আমার পাশে বস তুমি।

উৎপলার বিছানার পাশে বসে প্রবীর তার বুকে-পিঠে হাত বুলুতে লাগলে, আর উৎপলা অরুন্ধতীর দিকে তাকিয়ে ভাবলে—অরুন্ধতী, হ্যাঁ এই অরুন্ধতীকেই তো সে স্বপ্নে দেখলে। না, তার তো ভুল হয়নি। এই অরুন্ধতীই প্রবীরকে তার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। কিছুতেই প্রবীর যেন যেতে চাইলে না। আপ্রাণ চেষ্টা কোরলে কিন্তু পারলে না। অরুন্ধতী তাকে নিয়ে গেল। ইস্ অরুন্ধতী, অরুন্ধতী! না, অরুন্ধতী নয়, কিছুতেই সে হ'তে পারে না। অরুন্ধতী তাকে ভালবাসে। সেই পাঠ্যাবস্থা থেকে দু'জনের ভালবাসা। কয়েক বছর দুজনের দেখা-শুনা ছিল না মোটেই। তবু তাদের ভালবাসা অম্লান, বিশুদ্ধ।......

ওদিকে পূবের আকাশ ফরসা হ'য়ে আসছে। হয়তো এখুনি [illegible]লক দিয়ে বেরিয়ে আসবে সূর্য্য আর রৌদ্রের টুকরো-গুলো ছিটিয়ে [illegible] পৃথিবীতে।

অরুদি; বল্লে উৎপলা। ভোর তো হয়েই এসেছে, কোকো তৈরি কোরে নিয়ে এসো ভাই। চা খেতে যেন আর ইচ্ছা হচ্ছে না আজকে। যাও, পাশের ঘরেই সব পাবে। স্টোভও। বুঝি বে কষ্ট হবে তোমার। আমার জন্য না-হয় এ-কষ্ট টুকু করলেই!

অরুন্ধতী চলে গেল।

তুমি কী ভয় পেয়েছ উৎপলা? প্রবীর জিগ্গেস কোরলে।

ভয় পাইনি প্রবীরদা' কিন্তু আমি মরে গেছি। আমার ঘটেছে অপমৃত্যু।

কেন কী হ'লো তোমার। অনাদী বদ্ধ কী হলো তোমার। (স্বর ব্যাকুলতায় ভরে) তারপর উৎপলাকে বুকের উপর তুলে নিলে প্রবীর।

প্রবীরদা, প্রবীরদা, প্রবীরের থুৎনি ধরে' মুখের কাছে মুখ নিয়ে জিগ্গেস কোরলে উৎপলা। বল, তুমি আমায় ভালবাস?

একথা আবার কেন উৎপলা?

হ্যাঁ, আবার জিগ্গেস করছি। আমার ভয় হয়, তুমি আমায় ছেড়ে যাবে।

উৎপলা (আরো নিবিড়ভাবে উৎপলাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে) এও কি সম্ভব।

তোমায় অবিশ্বাস কোরবার মতো শক্তি আমার নেই। কিন্তু আজ আমি যে স্বপ্ন দেখেছি—প্রবীরদা, না কিছুতেই আমি বোলতে পারবো না তা'। (অনেকক্ষণ থেমে আবার) প্রবীরদা?

বল।

ইচ্ছা হচ্ছে আমি মরে যাই, তোমার বুকের উপর। তোমার ভালবাসার পাষাণ স্তূপে আমার দম বন্ধ হ'য়ে আসুক, আর তাতেই ঘটুক আমার অপমৃত্যু। তারপর তুমি যেখানে খুসী চলে যাও। আমি কিন্তু ভালবাসার গৌরব নিয়েই মরতে পারব।

ও-সব কী বলছো উৎপলা? বল, স্বপ্নে কী দেখেছ তুমি।

প্রথম যেদিন এ-বাসায় এসে আমরা পৌঁছাই, উৎপলা বোল্তে লাগলে, সেদিন যে স্বপ্ন দেখেছিলুম কালকেও ঠিক তাই। তোমায় জড়িয়ে আছি। এমন সময় একটা নারী-মূর্ত্তি (দৃষ্টি তার তীক্ষ্ণ, ধারালো) আমার কোল থেকে তোমায় ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা কোরে বলছিল—[illegible] ছাড়। (আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে আসছিল।) ওকে ছাড়বিনে? জানিস, আমি কতো ভালবাসি ওকে। (তারপর সুরটা আরো মোলায়েম করে') ছেড়ে দে, লক্ষ্মী বোন, ওকে ছেড়ে দে।...তারপর—তারপর ভয়াবহ সমুদ্রগর্জ্জন, ফেনিল জলোচ্ছ্বাস। আর সেই ঘোর আবর্ত্তে তুমি হারিয়ে গেলে। কত খুঁজলুম, আর পেলুম না তোমাকে।...বল প্রবীরদা, বল (প্রবীরের গলা জড়িয়ে ধরে') আমায় কী ছেড়ে যাবে তুমি?

মমীর মতো হাঁ' করে উৎপলার সব কথাগুলো শুনলে প্রবীর। তারপর পাংশু হয়ে অনেকক্ষণ তারদিকে তাকিয়ে থেকে বল্লে:

সেই নারীমূর্ত্তিকে তুমি চিনতে পেরেছ উৎপলা?

হ্যাঁ, পেরেছি।

কে?

যাকে দেখেছি তার দ্বারা ও-কাজ সম্ভব হ'তে পারে না!

আ-রে ভূমিকা রেখে স্পষ্ট করে' বলোই না কে [illegible]

অরুদি। তোমার বিশ্বেস [illegible]?

মুহূর্ত্তে প্রবীর চিৎকার করে উঠে উৎপলাকে জড়িয়ে ধরে বল্লে:

হাঁ, উৎপলা, সম্ভব, খুবই সম্ভব। সত্যি, রূঢ়, কঠিন কঠোর সত্যি ও-কথা।

ঠিক সে-সময়েই অরুন্ধতী একটা ট্রেতে কোকো আর খাবার সাজিয়ে নিয়ে ঘরে এলো।

[ক্রমশঃ]

সিমলা শৈলাবাসের কাহিনী

সিমলা শৈলে যে-সরকারী-গ্রীষ্মাবাসকে ব্যয়বহুল বলিয়া সংবাদ পত্রাদিতে প্রায়ই তীব্র আলোচনা করা হইয়া থাকে, কি ভাবে সেই সিমলা শৈল আবিষ্কৃত ও সরকারী গ্রীষ্মাবাসে পরিণত হইল তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। সার জর্জ চেসনে তাঁহার "ইণ্ডিয়ান পলিসি" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, ঘটনাচক্রে পড়িয়া সিমলা শৈল সরকারী গ্রীষ্মাবাসে পরিণত হইয়াছে। প্রথম হইতে ইচ্ছা করিয়া কেহ তাহাকে গ্রীষ্মাবাসে পরিণত করেন নাই।"

বিগত ১৮১৫।১৬ সালে নেপাল যুদ্ধে সহায়তার পুরস্কার স্বরূপ পাতিয়ালার মহারাজাকে সিমলা দান করা হইয়াছিল। তখন সিমলা ছিল একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম বিশেষ। জেরার্ড নামে দুই ইংরাজ ভ্রাতাকে শতদ্রুর উপত্যকা জরিপের কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। তাঁহারাই এই গ্রামটীকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পলিটিক্যাল এজেন্ট ক্যাপ্টেন কেনেডি নাকি সিমলার সর্ব্ব প্রথম বাস গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার বাস গৃহের নাম ছিল "কেনেডি লজ"। পূর্ব্বে এই বাড়িখানি ছিল কুচবিহারের মহারাজার। যে-স্থানে পূর্ব্বে "কেনেডি লজ" ছিল বর্ত্তমানে সেই স্থানে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের বিরাট বাস ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন উহা "টম্‌কাকার ক্যাবিন" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

কেনেডি সাহেব ছিলেন যেমন দিলদরিয়া তেমনি সদানন্দচিত্ত। প্রত্যহ এক ঘণ্টার বেশী তিনি কোনদিনও কাজ করিতেন না। তাঁহার অবশিষ্ট সময় খানা-পিনা, আমোদ প্রমোদ ও খোস-খেয়াল চরিতার্থেই অতিবাহিত হইত। তিনি ছিলেন একজন গোলন্দাজ অফিসার। কিন্তু গোলন্দাজ অফিসার হইলে কি হয় তাঁহার প্রভাব ছিল অসামান্য। তিনি হিন্দু মুসলমান এবং তিব্বতীয়গণ—এমন কি রাজন্যবৃন্দকেও শাসন করিতেন। তাঁহার শাসনও ছিল বড় কড়া রকমের। কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড ব্যতীত প্রয়োজন হইলে প্রাণদণ্ড দিতেও তিনি ইতস্ততঃ করিতেন না।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের ভ্রাম্যমান প্রকৃতিতত্ত্ববিদ ভিক্টর জ্যাকডারমণ্ড একবার সিমলায় গিয়া কেনেডি সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেনেডি সাহেবের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, সাড়ে সাতটার সময় আমরা রীতিমত ভুরি ভোজনে বসিতাম। ভোজন সারিয়া উঠিতে প্রায়ই এগারটা বাজিয়া যাইত। আমি সাধারণতঃ স্যাম্পেনই খাইতাম, কিন্তু অপরাপর সকলে শৈত্যাধিক্য বশতঃ পোর্ট, শেরি, এবং মাদেরিয়া পান করিতেই ভালবাসিতেন। সিমলায় অবস্থান কালে সাতদিনের মধ্যে আমি একগণ্ডূষও জল পান করিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে না। জলাভাবে যে আমি জলপান করিতাম না তাহা নহে, প্রতিদিন সকাল ও সাঁঝে আমাদের মজলিসে এমনি ফোয়ারা ছুটিত যে জল পানের প্রয়োজন হইত না।

বড়লাটদিগের মধ্যে লর্ড আমহার্ষ্ট সর্ব্ব প্রথমে সিমলায় আগমন করেন ১৮২৭ সালে। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "চীনের সম্রাট এবং আমি পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক মানব জাতিকে যদিও শাসন করি বটে, তথাপি আমাদের প্রাতরাশের সময়ের অভাব ঘটে না।" তারপর আসিয়াছিলেন লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক। সিমলায় আসিয়া তিনি "বেণ্টিঙ্ক ক্যাসেলে" অবস্থান করিতেন। বর্ত্তমানে উহা গ্র্যাণ্ড হোটেলে রূপান্তরিত হইয়াছে।

লর্ড অকল্যাণ্ড সিমলায় আসিয়া "অক-

ল্যাণ্ড হাউসে” বাস করিতেন, আর তাঁহার কর্ম্মচারীবর্গ থাকিতেন চ্যাপ্‌সিলিতে। সে ১৮৪২ সালের কথা। অক্‌ল্যাণ্ড সাহেব যখন সিমলা পরিত্যাগ করিয়া যান তখন তিনি তাঁহার বাসভবন দুইখানি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ একজন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট-সার্জ্জনকে ১৬ হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়াছিলেন। বিখ্যাত “অক্‌-ল্যাণ্ড হাউস” ও বালিকা বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিতে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সে সময় সিমলার লাটভবনের অবস্থা ছিল অতীব শোচনীয়। মাছির উপদ্রবে অকল্যাণ্ড হাউসের বাসিন্দাগণকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত। এমন কি সময় সময় তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডিনারের সময় ছাতার আড়াল দিয়া না বসিলে ডিনার খাওয়া সম্ভব হইত না। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আজি হইতে প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগিনী তাঁহার সিমলা-শৈলের স্মৃতিতে লিখিয়াছিলেন, “আমাদের দলবল ব্যতীত সিমলায় মাত্র ৪৬ জন মহিলা ও ১২ জন ইংরাজ পুরুষ বাস করিতেন। এজন্ত আমাদের নাচের মজলিসে আমোদ তেমন জমিয়া উঠিত না।

বড় লাটদিগের মধ্যে লর্ড এলেনবরা সর্ব্ব শেষবার জাহাজ যোগে সিমলায় আগমন করেন। বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাঁহার এই নীতি অনুমোদন করেন নাই। এজন্ত দুই বৎসর কাল পরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। লর্ড মেকলে একবার কমন্সসভায় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যাঁহাদিগকে ভালবাসেন ও ভয় করেন তাঁহাদিগকেই গভর্ণররূপ ভারতে পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কোন গভর্ণর তাঁহাদের নিকট এমন উপেক্ষিত হন নাই। লর্ড এলেনবরার পর ভাইকাউণ্ট হার্ডিঞ্জ ও তাঁহার পর লর্ড ডালহৌসি সিমলায় আগমন করেন। লর্ড ডালহৌসি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় ৮৫ বৎসর পূর্ব্বে সিমলা হইতে ১৬৫ মাইল দূরবর্ত্তী “চিনি” নামক স্থানে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিতে যান। এই ১৬৫ মাইল পথ অতিক্রম করিতে প্রায় ১৪ দিন সময় লাগিয়াছিল। “চিনিতে” তখন অন্যান্য নানা জাতীয় ফল ব্যতীত এক আঙ্গুরই পাওয়া যাইত ১৮ রকমের। সেপ্টেম্বর মাসে “চিনি” পরিত্যাগ করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, “এই মনোরম উপত্যকা পরিত্যাগের কথা মনে হইলেই আমার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠে। এখানে আমি পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলাম। সিমলা হইতে এখানে আসিবার পর একদিনের জন্তও আমি কোনরূপ শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করি নাই।” চিনি হইতে সিমলায় ডাকহরকরাদের যাতায়াতে প্রায় ৮দিন সময় লাগিত।

সিমলা হইতে এত দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থান করায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আপত্তির প্রত্যুত্তরে তিনি জানাইয়াছিলেন, “চিনি বুশাহীর ষ্টেটের মধ্যে এবং সিমলা পাতিয়ালা রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং চিনিতে আমার অবস্থানে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে তাহা আমার সহজ বুদ্ধির অগম্য।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সস্ত্রীক লর্ড ক্যানিং সিমলায় আগমন করেন। তিনি ও লেডি ক্যানিং উভয়ের কেহই সিমলাকে বিশেষ পছন্দ করিতেন না। লেডি ক্যানিং বলিতেন “সিমলা অত্যন্ত জনবহুল স্থান, বিশেষতঃ মন্দ প্রকৃতির লোকের বরদাস্ত করা দুঃসাধ্য। প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে সিমলার জনবাহুল্য দেখিয়া যিনি পূর্ব্বোক্তরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, জানি না সিমলার বর্ত্তমান জনাকীর্ণ স্থান দেখিলে তিনি কি মন্তব্য করিতেন। তবে সিমলা সহর তাঁহার পছন্দ না হইলেও বনগুলিকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় লেডি ক্যানিং পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃতদেহ ব্যারাকপুর পার্কে সমাহিত করা হয়। ইহার পর বৎসরই অর্থাৎ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং লণ্ডনে প্রাণত্যাগ করেন।

১৮৬৪—৬৯ খৃষ্টাব্দে স্যর জন লরেন্স ভারতের বড়লাট ছিলেন। গ্রীষ্মকালে শৈলাবাস করিতে হইবে এই সর্ত্তে চিকিৎসকগণ তাঁহাকে লাটের চাকরী গ্রহণে সম্মতি দিয়াছিলেন। স্যর জর্জ্জ লরেন্স লিখিয়াছিলেন—“সিমলায় একদিনে

যে কার্য্য করিতে পারিব বলিয়া মনে হয় কলিকাতায় তাহা পাঁচ দিনেও সম্ভব হইবে কিনা সন্দেহ।" এমন কি সিমলায় গ্রীষ্মাবাস মঞ্জুর না করিলে তিনি পদত্যাগের ধমকি পর্য্যন্তও দেখাইয়াছিলেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, "দুই অথবা তিন জন অস্থায়ী বড়লাট ব্যতীত এমন দশজন বড়লাটের কথা জানি যাঁহারা সিমলাকে সরকারী গ্রীষ্মাবাসে পরিণত করিবার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

লর্ড ক্যানিং-এর পর লর্ড নর্থব্রুক ব্যতীত আর কোন বড়লাট সমতল ক্ষেত্রে গ্রীষ্মাতিবাহিত করেন নাই। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা ও বিহারে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় সে সময় তিনি সিমলায় শৈলাবাসে গমন না করিয়া বাঙ্গলাদেশেই অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রেকর্ডে লিখিয়াছিলেন যে, "এই একটা বৎসর গ্রীষ্মকাল সমতল ক্ষেত্রে অতিবাহিত করিতে গিয়া আমি ও আমার কর্মচারীবৃন্দকে স্বাস্থ্যের জন্য যে ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল তাহা বড় কম নহে।"

লর্ড লিটন তাঁহার ডাইরিতে লিখিয়াছিলেন, "সিমলার শৈলাবাসে প্রায় ৩০০ শত ভৃত্য ও ১০০ পাচক থাকিত।" এই জন্য তিনি ফ্রান্স হইতে যে পাচক সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহাকে বিদায় দেন। সিমলার তদানীন্তন লাটভবনটী আজিকার ন্যায় এমন বৃহদাকার ছিল না। লেডি লিটন তাঁহার ডাইরীর একস্থানে লিখিয়াছিলেন, "কাউন্সিলের সদস্যগণ এবং বিভিন্ন বিভাগের উচ্চতম কর্মচারীবৃন্দ তাঁহাদের স্ব স্ব বাসভবনেই সপ্তাহে তিনবার করিয়া উপসনা সভা আহ্বান করিতেন, আর অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিতেন পরস্পরের বিরুদ্ধে মন্তব্য লিখনে।" ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লেডি ডাফরিণ যখন সিমলায় ছিলেন সে সময় তিনিও লিখিয়াছিলেন যে, "এরূপ ক্ষুদ্র বাসভবনে তিনি জীবনে আর কোন দিন অবস্থান করিয়াছেন কিনা সন্দেহ।" পূর্ববর্ত্তী বড়লাটদিগকে সিমলার তদানীন্তন লাটভবন, কেনেডি হাউস, বেন্টিঙ্ক ক্যাসেল, (বর্ত্তমান গ্র্যাণ্ড হোটেল) অকল্যাণ্ড হাউস এবং লর্ড লিটনের বাসভবন পিটারহফ-এ কিরূপ অসুবিধার মধ্যে বসবাস করিতে হইত সে পরিচয় আপনারা পাইয়াছেন। লর্ড ডাফরিণ ভাবী রাজপ্রতিনিধিদিগের গ্রীষ্মাবাসের এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য একটী উপযুক্ত লাট প্রাসাদ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করেন। তাঁহারই আগ্রহে ১৮৮৮খৃঃ সিমলায় বর্ত্তমান লাটভবন নির্ম্মিত হয়। সিমলার এ বাসভবন নির্ম্মাণ করাইতেই লর্ড ডাফরিণের যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি ও লেডি ডাফরিণের ঐকান্তিক আগ্রহে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান লাটভবনটী নির্ম্মিত হইয়াছিল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে যখন নূতন আয় কর ধার্য্য করা হয় সে সময় সাধারণ ভারতবাসীর মনে এইরূপ এক ধারণার উদ্রেক হইয়াছিল যে বড়লাটের জন্য নূতন বাসভবন নির্ম্মাণের অর্থ সরবরাহের জন্যই সরকার এই নূতন আয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সিমলার চতুপার্শ্বস্থ স্থানগুলির উপর লর্ড ডাফরিণের বড় একটা অনুরাগ ছিল না। তিনি বলিতেন, "গাছপালা ও বন জঙ্গল অপেক্ষা জন সমাগমকেই আমার অধিক ভাল লাগে"—লেডি ডাফরিণই সিমলায় সর্ব্বপ্রথম অশ্বচালিত রিক্সা চালাইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

গাড়ীর গতি

[গল্প]

শ্রীপাঁচুগোপাল মিত্র

রমজান, ড্রাইভার—

পঞ্চাশ, পঞ্চান্ন কি তারও বেশী দ্রুত গতিতে ছুটিয়া চলে যে মেল তাহা ওরই হাতের নিশানায়। কলের কৃতিত্ব যত বেশীই থাক, ওর কৃতিত্বও নেহাৎ কম নয়।

বিস্তৃত মাঠের বুক দিয়া, ঘন অন্ধকার ঠেলিয়া সরাইয়া পাষাণের কঠিন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ইঞ্জিন লইয়া ওর অভিযান, নিত্য—দুর্দ্দাম দুরন্ত গতিতে। হু' হু' করিয়া বয়লারে কয়লা জ্বলিতেছে, সশব্দ গর্জনে ট্রেন ছুটিয়াছে, একশো, দুশো, হাজার মাইল তফাতে আসিয়া দেশ, জেলা পরের পর অতিক্রম করিতেছে…ও শুধু চাহিয়া থাকে বাহিরে মুখ দিয়া সম্মুখের প্রসারিত পথের দিকে।

ভুলিয়া যায় ওর বাড়ী ঘর, ভুলিয়া যায় বাসায় ওর একা বউ জোহরাকে—বিরহী শয্যা যার কণ্টক হইয়া উঠিয়াছে; নিশীথ রাতের বিনিদ্র নয়ন তুলিয়া চাহিয়া আছে উন্মুক্ত বাতায়নে, প্রিয়তমের সান্নিধ্য হারা বেদনায়—চোখ দিয়া তার জল ঝরিতেছে……ভুলিয়া যায় দুনিয়া, দুনিয়ার কল্লোল, কোলাহল… খালি শুধু ছুটিয়া চলে। ছুটিয়া চলে ইঞ্জিন, ইঞ্জিনের পিছনে অত বড় রেক্। যে রেকের কোন কোন কামরায় তুমি, আমি, কি আমাদের মতই আরও অনেকে দ্বিপ্রহর রাত্রের নিশ্চিন্ত শয্যা পাতি, লম্বা জায়গা জুড়িয়া সহযাত্রীর সহিত কলহ করি। আর ছুটিয়া যায় মন—যে মন জগত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিঃসঙ্গভাবে পড়িয়া আছে ওই ইঞ্জিনের কলগহ্বরের মধ্যে, যে মন নিবিষ্ট শুধু রাইট-টাইম বা লেট্ রেক্ আপ করিবার চেষ্টা লইয়া;—দেখে শুধু সিগনাল, দেখে ওধারে থ্রু-পাশ, মশাল জ্বালাইয়া লাইন-ক্লিয়ারের পিক্-আপ্। কায়ার ম্যান হুইশ্ল দেয় জোরে দীর্ঘ করিয়া, লাইন ক্লিয়ার তুলিয়া লয়, বয়লারে কয়লা মারে।

এই রমজানের জীবন। সাত বছর ধরিয়া করিতেছে। বুড়া বয়েস অবধি, রিটায়ার্ড না হওয়া পর্য্যন্ত করিয়া যাইবে। বিবাহ করিয়াছে, তরুণী পত্নী…তরুণ মনের কামনা, আকাঙ্খায় বাঞ্ছিতা, কিন্তু গৃহকোণে নির্ব্বাসিতা সে।

তিন দিন, চারদিন বাদে যেদিন ফিরিয়া আসে চোখে বিশ্বের ঘুম লইয়া। যেন ঘুমন্ত পুরীর রাজপুত্র! খালি ঘুমাইতেই জানে, যখন জাগিয়া ওঠে তখন পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়।

জহরী চাঁপা পাতাতেই চাপা থাকে, আচমকা খানিকটা গন্ধ শুধু ভাসিয়া বেড়ায়—বধূর ওই চকিতের চাহনীই সম্বল হয়, প্রাণ ভরিয়া কাছে পাইতে পায় না।

মাঝে মাঝে রমজান ভাবে। ভাবে তার ইঞ্জিনে পুরাদমে ষ্টীম দিয়া। উর্দ্ধ-শ্বাস গতিতে গাড়ী ছুটিয়া চলে, লোহার রেলের উপর গাড়ীর চাকা পিছলাইয়া যায়, তীরের মত তীব্র গতিতে সাঁ সাঁ করিয়া গাড়ী অগ্রসর হয়…তার হাতে একটা রড ধরিয়া রমজান চাহিয়া থাকে দু' পাশের চলমান জঙ্গল, মাঠ, পাহাড়ের দিকে; প্রবল বাতাস জানালায় জোরে মুখে লাগে, মাথার দীর্ঘ দীর্ঘ চুলগুলো লুটো-পুটি খায়, চোখে মুখে, কপালে ঝাপটা মারে, নিঃশ্বাস টানা দুঃসহ হইয়া ওঠে। কিন্তু সহ্য হইয়া গিয়াছে ওর, ও ওই দুরন্ত বাতাসের সাথে সংগ্রাম করিয়া বিজয় গর্বে যাত্রা করে।…জোহরার মুখ মনে পড়ে, ম্লান ব্যথাতুর মুখ। চোখের কোনে জলের উৎস। ভাবে কী শোচনীয় দাসত্ব তাহার আশা কামনার উৎস লইয়া জীবনের প্রভাতী বেলা যখন কানায় কানায় ভরপুর, দু'হাতে টুঁটি চাপিয়া জীবনকে হত্যা করিতেছে সে। এই রেলের লাইন, কল-কব্জার এই বিশ্রী আবেষ্টন, কয়লার এই অপরিচ্ছন্ন ময়লা, এই শুধু তাহার জীবনের সঙ্গী। মনের যৌবন রাগকে কালী আর ছাই মাখাইয়া মলিন করিয়া দিল।

বেচারী জোহরা! প্রাণ ভরিয়া এক-দিনও পায় না তার প্রিয়তমকে। যখন পায়, কয়দিনের পরিশ্রমে মুমূর্ষু সে। নির্জীব আত্মার ক্ষমতা কি চঞ্চল চিত্তের দাবীকে পরিপূর্ণ করিতে পারে! স্তব্ধ নিশীথে, রাতের নিঃশব্দ নির্জ্জনতায় চুপ করিয়া চাহিয়া রহে জানালার বাহিরে। মাথা ভরা চুল, খুলিয়া লুটাইয়া পড়ে বিছানার উপর, চোখ দিয়া জল ঝরে অবিশ্রান্ত, বুকের ভিতর সঞ্চিত বেদনার মৌন আর্ত্তনাদ জাগিয়া ওঠে করুণতায়, কেউ থাকেনা মুছাইয়া দিতে তার চোখের জল, কেউ থাকেনা আদর করিয়া শুনাইতে তাকে সান্ত্বনার বাণী। চাহিয়া থাকে কালো আকাশের পানে, চাহিয়া থাকে আলো-ছায়ার প্রাচীরের দিকে। চাহিয়া চাহিয়া অস্থির হইয়া ওঠে, ইচ্ছা করে জানলার গরাদের সাথে নিজের মাথাটা ঠুকিয়া দেয়।

ভাবে রমজান, ভাবিতে ভাবিতে চমকাইয়া ওঠে। সামনে কয়জন লোক, গাড়ীর গর্জনে ভ্রূক্ষেপও নাই। পৈশাচিক উল্লাসে মন নিশ পিশ করিয়া ওঠে, দিবে উহাদের শেষ করিয়া, ঐ কটা মাংসপিণ্ডকে চূর্ণ বিচূর্ণ পিষ্ট করিয়া যাইবে তাহার রথ। ওদের সুখের পর্দা দিবে ঘুচাইয়া; কিন্তু অভ্যস্ত হাত আপনা হইতেই হুইস্লের দড়ি টানে, জোরে বাঁশী বাজিয়া ওঠে, লোকগুলো ছুটিয়া সরিয়া যায়।

নিশুতি রাত, আর সেই রাতের বিশ্রী অন্ধকার। অন্ধকার এত ঘন যেন জমাট বাঁধিয়া পাহাড় হইয়া আছে। দেখা যায় না কোন কিছু, আশে পাশে সম্মুখে খালি কালো আর কালো। এই অন্ধকার ভেদ করিয়া গাড়ী ছুটিয়াছে। সুতীব্র গতিতে, যেন একটা পাগলা ঘোড়া খানিকটা মদ খাইয়া উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়াছে অনির্দিষ্ট যাত্রায়। এ পাশে রমজান নিজে, ওপাশে ফায়ার ম্যান। ইঞ্জিন ক্রুটা বয়লারে কয়লা চালাইতেছে। দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে আগুন, কী ভয়ঙ্কর তাহার রক্তশিখা, সমস্ত পৃথিবীটাকে উহার ভিতর পুরিয়া দিলে বোধ হয় গলিয়া তরল হইয়া যায়।

একটী ষ্টেশান পার হইয়া গেল। ছোট ষ্টেশান থ্রু-পাশ দেওয়া আছে। মশাল ধরিয়া পয়েন্টস্‌ম্যান দাঁড়াইয়া লাইন-ক্লিয়ার দিবে, অফিসের দরজায় গোড়ায় ছোট বাবু সবুজ বাতি হাতে। এক মিনিটেরও চের কম। তারপর আবার অন্ধকার। আবার সেই যাত্রা, সেই গর্জন। বড় ব্রীজটার ওপর বোধ হয় আসিয়া পড়িল। ব্রীজের একটা গম গম সুর থাকে। সে সুর সপ্তকে বাঁধা নাই, কিন্তু সে সুরের প্রাণ আছে, সে সুরে চেতনা জাগে। নদীর জলে একটা কল রাগিনী। ব্রীজের সুরের সাথেই যেন তার তালের সমতা। খানিকটা তফাতে নদীর বুকে কয়টা ক্ষীণ আলো; বোধ হয় জেলে ডিঙ্গী।

ব্রীজ শেষ হইয়া গেল। আবার মাঠ অন্ধকারে জানা যায় না, কিন্তু বোঝা যায় শব্দের পরিবর্ত্তনে। ফাঁকা মাঠের সুর হালকা, সে সুরে গাম্ভীর্য্য নাই। তারপর কটা আলো লাল, খালি লাল, মাঝ খানে কেবল নীচে ওপর দুইটা সবুজ, ওই দুইটাই রমজানের হাত ছানি। ওই ইসারার ওপর নির্ভর করিয়াই তাহাকে ছুটিতে হইবে অন্ধের মত চোখ বুজিয়া।

ষ্টেসান কোয়ার্টার্স। অনেকগুলো জানালাই বন্ধ, কোন কোনটা খোলা। একটার ভিতর দিয়া বাতি দেখা যায়, একটার বাতি তত উজ্জ্বল নহে, হয়তো পর্দা আছে জানালায়। রমজান ভাবে, ওরই কোনটায় হয়তো তাহারই জোহরার মত কেউ বিনিদ্র হইয়া কাটাইতেছে বিরহ রজনী। স্বামী তাহার চাকরী করিতেছে, চোখে অশ্রুর পাথার তুলিয়া সে বসিয়া আছে। আর নয়তো সৌভাগ্যবতী কেউ ঘুমাইয়া আছে স্বামীর বুকে মাথা দিয়া। সপ্তাহ পরে অবসর মিলিয়াছে, আজ তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ পরমোৎসব রাতি। অথবা হয়তো কোন কুমারী মেয়ে তার কুমারী বুকের কাতর নিবেদন ঢালিয়া চলিয়াছে ঈশ্বরের কাছে, করুণা চাহিতেছে যৌবনের দেবতার।

ষ্টেসান সরিয়া যায়, ফায়ারম্যান একটা হুইস্‌ল দেয়, সে হুইস্লে চকিত হইয়া ওঠে প্রসুপ্ত জগত, আর তাহার সঙ্গে বর্দ্ধিত হয় গাড়ীর গতি। হঠাৎ কিসে একটা ধাক্কা খাইল, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ভাবে গাড়ী দুলিয়া উঠিল, এত জোরে—যেন পড়িয়া যাইবে; কিন্তু পরক্ষণেই আবার পূর্ব্বের গতি আরম্ভ করিল। হয়তো লাইনে কেউ আত্মহত্যার জন্য শুইয়াছিল, বিচূর্ণ হইয়া গেল বিরাট নিষ্পেষণে।

ট্রেণ ছোটে, ছোটে তার সাথে

জনপদ, জঙ্গল, ছোটো পাহাড়ের ঘনশ্রেণী, ছোটো মাথার ওপরকার আকাশ। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, এ যেন অবিরত, অনিবার। অনেকক্ষণ, সুদীর্ঘ যাত্রার শেষে আসে কোন জংসন। ট্রেন দাঁড়াইয়া যায়, জল লইবে—আপ, ডাউন আর লুপ লাইনের ট্রেনে ট্রেনে মিতালী, বন্ধুর সহিত বন্ধুর সাক্ষাৎ।

যাত্রী নামে, ওঠে,—রমজান দেখে চলিষ্ণু এক একটী সংসার লইয়া ওরা যাওয়া আসা করিতেছে, কত আনন্দ, তৃপ্তির কী পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাস।

ইঞ্জিন হইতে নামিয়া আসে, সওয়া তিন ঘণ্টা একঘেয়ে বসিয়া হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন পক্ষাঘাত দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, খানিকটা তাহাদের নাড়া চাড়া দিয়া লইতে ইচ্ছা হয়। প্লাটফরমে পায়চারী সুরু করিয়া দেয়। ইঞ্জিন হইতে গরম জল লইয়া ফায়ারম্যান চা তৈয়ার করিতেছিল, রমজানকে এক পেয়ালা দেয়। প্লাটফরমের মুক্ত স্বাধীনতা, সহনীয় শীতল হাওয়ায় পরিশ্রম ক্লান্ত দেহে গরম এক পেয়ালা চা অতি সুন্দর লাগে।

ওভার ব্রীজের ঠিক নীচেটাতেই আবছা অন্ধকারের মধ্যে ছোট বিছানা পাতিয়া বসিয়া আছে একটী ছেলে আর মেয়ে। ওদের দুজনের আস্তে আস্তে কথাও বেশ সুস্পষ্ট হইয়া যায়। ছেলেটা বলে, তুমি শোও লক্ষীটি—

একগাদা লোকের সামনে, আর এই খোলা জায়গায় আমি শুতে পারবো না।

লোক কই, গাড়ী চ'লে গেলেই আর কেউ থাকবে না।

না থাকবে না, কত লোকের পায়চারীর যায়গায় এইদিক পানেই যেতে উঠবে।

দুজনেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে, তারপর ছেলেটী বলে, তবে এসো দুজনে গল্পই করি।

ঘণ্টা পড়ে, সঙ্গে সঙ্গেই গার্ডের সবুজ বাতি দেখা যায়, রমজান উঠিয়া পড়ে, ইচ্ছা করে থাকে আরও খানিকক্ষণ।

প্লাটফর্ম শেষ হইয়া যায়, শেষ সীমান্তে ছোট্ট একটী ছেলে তার মায়ের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনর্গল প্রশ্ন করিতেছে, বোধ হয় ইঞ্জিনটা কত বড়, কেন চলে, চাকাগুলো কি করে ঘোরে? এবার গিয়ে কোথায় দাঁড়াবে ইত্যাদি··· আর মা তাহার জানা অজানা সকল রকম অভিজ্ঞতা দিয়াই সম্ভবমত উত্তর দিতেছে।

রমজানের মনে আকাঙ্খা জাগে—ইচ্ছা হয় তাহার অমনি করিয়া জোহরাকে সঙ্গে লইতে, অমনি একটা শিশুর হাত ধরিয়া তাহার প্রশ্নরাশির জবাব দিতে। আকাঙ্খাই জাগে শুধু, সে আকাঙ্খা মিটিয়া যায় ঐ ঘূর্ণ্যমান চাকার তলে পিষ্ট হইয়া, বয়লারের অগ্নি কারায় বন্দী হইয়া।

আবার ছুটিয়াছে। এবার আরও বেগবতী।···অন্ধকার আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল। পুঞ্জীভূত তমিস্রার ওপর পুঞ্জীভূত কালিমা। বৎসরের সকল কয়টা অমাবস্যা যেন এক সাথে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকে, বিদ্যুত জলিয়া ওঠে, আর নামিয়া আসে বারিধারা অজস্র বর্ষণ লইয়া। প্রকৃতি আজ পাল্লা দিবে রমজানের গর্ভ আমহার্ষ্ট ইঞ্জিনের সঙ্গে। একত্রিত সংহতি লইয়া আক্রমণ করে, আর সে আক্রমণকে তুচ্ছ করিয়া নিতান্ত অবহেলাতেই ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া রমজানের ইঞ্জিন অগ্রসর হয়। একটা টানেল—আকাশে যবনিকার ঢাকা প্রেতপুরী, চোখ চাইতেও ভয় পায়। হইস্ল দিয়া সজাগ করিয়া মুহূর্ত্তে ট্রেণ পার হইয়া যায়। তারপর আর কিছু নজর হয় না।

আকাশে বারিধারা, বিদ্যুত বজ্রপাত, চারিপাশে কৃষ্ণছায়া···সিগনাল দেখা যায় না, দেখা যায় না দু'পাশের বন, মাঠ, নদী, পাহাড়, মাঠের শেষ সীমায় গ্রামের অস্পষ্ট রেখা···খালি অন্ধের মত গতি, চোখ বুজিয়া যাত্রা—খানিকটা আসিয়া ডিটোনেটারে আওয়াজ হয়, একটা, দুটো, তিনটা···রমজান বোঝে ষ্টেসান আসিয়াছে। তারপর পলকের জন্য নজরে পড়িয়া যায় মশালের আলো, চলমান ষ্টেসানের ক্ষীণ বাতি, তারপর আবার পূর্ব্বাপর। রমজান ভাবে এই তো তাহাদের অনির্দ্দিষ্ট গতি—নিজেই জানে না এ গতির সম্মুখে কোন বিপদ আছে কিনা, কিন্তু কী অসীম আশ্বাসে তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছে এই মেলের যাত্রীরা।

মনের আরামে কেহ বা তো ঘুমাইতেছে। কল্পনার নেত্রে দেখে রমজান এক জোড়া দম্পতি—শুইয়াছিল···হঠাৎ ছেলেটী উঠিয়া বলে, দূর ঘুম আসে না চা করো।

মেয়েটী বলিল, আমারও ছাই গাড়ীতে মোটেই ঘুম পায় না।

তাই তো বলচি একটু চা তৈরি করো।

এই রাত দুপুরে!

অমৃতের কি আর সময়ের মাপকাঠি আছে?

চা হইল, দুজনে দু পেয়ালা লইল। মেয়েটী টিফিন ক্যারিয়ার হইতে খাবার বাহির করিয়া নিল। খোলা জানালা দিয়া চাহিয়া মেয়েটী বলিল, বাবা কী অন্ধকার দেখো, গা শিউরে ওঠে।

আমার কিন্তু বেশ লাগে। ইচ্ছে করে ওই অন্ধকারের মধ্যে তোমায় নিয়ে হেঁটে চলি।

তোমার যত সব অনাসৃষ্টি।

ফায়ারম্যান আসিয়া ধাক্কা দিয়া বলিল, মাস্টার ড্রাইভার সাব! সামনে ইঞ্জিনের আলো। বোধ হয় টু ফর্টি ডাউন—

টুকরা টুকরা হইয়া ছিঁড়িয়া গেল কল্পনার সুতো, ক্ষিপ্তের মত লাফাইয়া উঠিয়া রমজান প্রাণপণে ট্রেণ কণ্ট্রোল করিতে লাগিল। ফায়ারম্যান একটানা সুদীর্ঘ স্বরে ডেনজার হুইস্ল দিয়া চলিল, ইঞ্জিন ক্রুটী হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া গেছে।

কিন্তু এত নিকটে তখন দুইখানি ট্রেণ পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া আসিয়াছে সহস্র চেষ্টায়ও রক্ষা পাইতে পারে না।

ক্রমেই সন্নিকট হইয়া আসিতে লাগিল দুইখানা গাড়ীর দূরত্ব। দুইখানা ইঞ্জিনের বিরাট গর্জ্জন, হুইস্লের আর্ত্তনাদ একটী বিরাট কোলাহল সৃষ্টি করিয়া তুলিল। ক্ষিপ্তের মত রমজান কলকব্জা গুলোয় ধাক্কা দেয়, টানিয়া, চাপিয়া, শক্তি থাকিলে উপড়াইয়া পর্য্যন্ত দিত যদি কোন রকমে গাড়ীখানাকে দাঁড় করাইতে পারে, কিন্তু কোন আশা নাই। আশা নাই রোধ করিবার ওই অসীম, দুর্জ্জয় গতিবেগকে, আশা নাই তাহার বাঁচিয়া থাকিবার, আর বাঁচিয়া থাকিয়া তাহার জোহরাকে লইয়া দুনিয়ার রূপ রস আলো হাওয়াকে উপভোগ করিবার। এক মিনিটই বোধ হয় আর, তারপর তাহারা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া একেবারে অন্তর্হিত হইবে—শুধু থাকিবে সাক্ষ্য দিবার জন্য ধ্বংসস্তুপ পড়িয়া। মিটিয়া গেল তাহার স্বপ্ন, তাহার কামনা তাহার অতৃপ্ত আকাঙ্খা। বার্ত্তার হাহাকার লইয়াই সে বিদায় লইল, আর দিয়া গেল জীবনব্যাপী হাহাকার জোহরাকে। এখনও সে হয়তো কাঁদিতেছে প্রতীক্ষিত প্রত্যাশায় জানালার ধারে বসিয়া। ফায়ারম্যান বলিল, এমনি মরার চেয়ে লাফাইয়া পড়া যাক, বাঁচতেও পারা যেতে পারে। জীবন··· এই ধরণী, আলো রোদ, রাত্রি সন্ধ্যা জোহরার মুখ চোখ চুল! রমজান উৎসাহিত হইয়া উঠিল, তাহাকে বাঁচিতে হইবে, সে লাফ দিবে ক্ষণেকের জন্য ঈশ্বরকে ডাকিয়া রমজান প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ফায়ারম্যান ও ক্রুটা লাফ দিল। রমজান লাফ দিবে সহসা মনে আসিয়া উঠিল তাহার ট্রেণে, অতগুলো নরনারী—সে প্রাণ লইয়া পলাইবে আর ঠেলিয়া দিয়া যাইবে তাহাদের মৃত্যু-গহ্বরে। তাহা সে পারে না। ঈশ্বরের কাছে কী কৈফিয়ৎ দিবে? তাহার চাইতে শেষ অবধি সে চেষ্টা করিবে, আর এই চেষ্টা করিতে করিতে ওই সহস্র নরনারীর অদৃষ্টে যাহা হইবে তাহাই সেও বরণ করিয়া লইবে।

রমজান ভ্যাকুম পাইপের নিকট গিয়া দাঁড়াইল; দাঁড়াইল মাত্র—মুহূর্ত্ত মধ্যেই বিপুল একটা শব্দ, তাহার পর ইঞ্জিনটা উঁচু হইয়া শূন্যে উড়িয়া চলিল।···তাহার পর রমজানের আর জ্ঞান ছিল না।

মাইল খানেক তফাতে একটা নালার ভিতর ক্ষত-বিক্ষত রমজানকে পাওয়া যায়। হাসপাতাল হইতে সারিয়া ফিরিয়াছে, কিন্তু কানা হইয়া গিয়াছে চিরদিনের মত।

———

ছায়া ও কায়া

শ্রীমধু বসু

বাংলা প্রদেশে নতুন ফিল্ম কোম্পানী প্রায়ই গড়ে উঠছে দেখে আনন্দ পাচ্ছি। এই সব কোম্পানীর নিজস্ব ষ্টুডিয়ো নেই। তারা পরের ষ্টুডিয়ো ভাড়া নিয়ে তাদের ছবি তোলেন। নিজস্ব ষ্টুডিয়ো না থাকার দরুণ তারা যা বড় কম খান না। প্রায়ই দেখা যায় তাদের ছবির শব্দ যোজনায় বেশ ত্রুটি থেকে গেছে, আলোকচিত্রও তেমন নয়নাভিরাম হয় না।

চিত্রনাট্য সমস্যা

চিত্র-নাট্য সমস্যাই বোধ হয় বাংলা ছবির বড় সমস্যা। এর সমাধান আজ পর্য্যন্ত হল না। যাদের আমরা চিত্রনাট্য রচয়িতারূপে দেখি তাদের কেউ হয়ত ক্যামেরা চালনাতেই জীবনের অর্দ্ধেক সময় কাটিয়েছেন, কেউ হয়ত ছবি ও নাটকে অভিনয় করেই জীবনের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছেন, কেউ হয়তঃ পেন্সিল নিয়ে কাগজে আঁচড় কেটে সবে জীবনযাত্রা সুরু করেছেন। চিত্রনাট্য রচনা কি এতই সহজ-সাধ্য? গল্প বা প্রবন্ধ রচনায় যাদের কোন শক্তিই কোনদিন ব্যক্ত হয়নি, তারাই হঠাৎ আবির্ভূত হন চিত্রনাট্যরচয়িতারূপে। সাধারণতঃ একই ব্যক্তিকে অনেকগুলি কাজ করতে দেখা যায়,—যেমন চিত্রনাট্য ও পরিচালনা একই ব্যক্তি লেখেন ও করেন, সময় সময় এই ব্যক্তিকে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতেও দেখা যায়, ফলে ছবি যা হয় সে পরিচয় আর কারো অজানা নেই।

পরপারে

স্বর্গীয় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম জানেন না এমন থিয়েটার ও বায়োস্কোপপ্রিয় লোক বিরল। হাসি কান্নার মধ্য দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে' আজও সারা বাঙ্গালীর অতি প্রিয়। নব গঠিত চন্দ্র ফিল্মস্ তাদের প্রথম ছবির জন্য এই 'পরপারে' মনোনীত করে বাঙ্গালীর ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। দুঃখের বিষয় দ্বিজেন্দ্রলালের এই মনোরম নাটকখানার চিত্রনাট্য তেমন ভাল হয়নি, ফলে ছবিখানা কোথাও তেমনভাবে জমে উঠতে পারে নি। কোন চরিত্রেরই পূর্ণবিকাশ হয়নি। এরূপভাবে প্রসিদ্ধ চরিত্রগুলির গলা টিপে মারার সার্থকতা কী তা আমাদের বুদ্ধিতে আসছেনা। অমন যে চরিত্র বিশ্বেশ্বর—যে বৃদ্ধ, পরোপকারী, আত্মভোলা দাদা-মশায়ের ছবি আমাদের চোখের সামনে ভাসছে তাকে পর্য্যন্ত এরা প্রাধান্য দেন নি। ফলে অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীর কৃতিত্বের পূর্ণ বিকাশ হতে পারে নি। দাদামশায়ের মৃত্যুদৃশ্যও তেমন হয়নি যেমন হত নাটকাভিনয়ে, পরপারের যাত্রী যাত্রার সময়কালীন বিষয়গুলি নাটকের বর্ণনামত অবিকৃত রাখাই উচিৎ ছিল। মহিমের চরিত্রও সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে, সরযূ সম্বন্ধেও এ অভিযোগ করা চলে। ভবানীপ্রসাদের চরিত্র এমনভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে যার দরুণ তার চরিত্রটাই একেবারে অবোধ্য হয়েছে। জেল হতে মুক্তিলাভের পর সরযূ মহিমের সঙ্গে বিশ্বেশ্বরের কাছে যাবার জন্য প্রস্থান করে, কিন্তু যে শান্তা তাদের বাঁচাল তার প্রতি সামান্য মাত্র কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করতে কাউকে দেখলাম না। শান্তা তার পিতা ভবানীপ্রসাদের স্নেহছায়ায় স্থান পায়, এ জিনিষটা দেখান খুবই উচিৎ ছিল। শান্তার শেষ পরিণতির কোন পরিচয়ই প্রকাশ পেল না। শান্তা যেখানে মহিমের রিভলভার নির্গত গুলীর দ্বারা আহত হল, সেখানে দেখা গেল ঐ গুলি ভূমির দিকে নির্গত হয়েছে অথচ ধরাশায়ী হল শান্তা। পার্ব্বতীর গৃহে শান্তার ব্যাপারে যেরূপ মারামারি বা ধস্তাধস্তি হতে দেখা গেল তা বড় বেশী হওয়ায় স্বাভাবিকতার গণ্ডি অতিক্রম করেছে। ছবির প্রথমেই বালক মহিম ও তার মাতা করুণাময়ীকে দুএকটি কথা বলতে দেখা গেল এবং এর বাল্য জীবনের অবতারণায় দেখা গেল কতকগুলি বালক বালিকা পুকুরে সাঁতার কাটছে। সাঁতারে নাম করেছে সেই সাবিত্রী যে বিশিষ্ট সাঁতারু তার কোন নিদর্শনই পাওয়া গেল না। পরিচালনা মন্দ নয়, চিত্রনাট্য যদি ভাল হত তাহলে পরিচালক যতীন দাস অধিকতর কৃতিত্ব প্রকাশের সুযোগ পেতেন। আলোকচিত্র মোটের ওপর ভাল হয়েছে। শব্দ-যন্ত্রী জ্যোতিষ সিংহের কাজ দেখে খুসী হতে পারি নি, প্রথমদিকের শব্দ যোজনা বিশ্রি হয়েছে, মাঝে মাঝে খারাপ শব্দ শ্রুত হয়েছে, তবে মোটামুটি মন্দ নয়। সুরশিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র যে সবচেয়ে হতাশ করেছেন।

অভিনয়ে সব চেয়ে প্রশংসারযোগ্য অহীন্দ্র চৌধুরীর বিশ্বেশ্বর। তাঁর অভিনয় আগাগোড়াই ভাল হয়েছে। মিনার্ভার এ ভূমিকায় তাকে যে চমৎকার অভিনয় করতে দেখেছিলাম, চিত্রেও তা অব্যাহত আছে। তাঁর রূপসজ্জারও প্রশংসা করি। নায়ক মহিমের ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শেষের দিকে ছাড়া কোথাও সুবিধা করতে পারেন নি। পরচুল পরাতে তাকে ভাল মানায় নি। এবার বোঝা যাচ্ছে নায়ক সাজবার দিন তার ফুরিয়ে এসেছে। নির্মলেন্দু লাহিড়ী পার্বতীর ভূমিকায় মন্দ অভিনয় করেন নি, তবে তার মুখে অভিব্যক্তির বড়ই অভাব দেখা গেল।

সন্তোষ সিংহের পরেশ, শৈলেন চৌধুরীর কালীচরণ, ভূমেন রায়ের প্রত্যেক সুঅভিনীত হয়েছে। দয়ালের মত ছোট এবং অপ্রধান ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যকে নামাবার সার্থকতা বুঝলাম না। অন্যান্য ভূমিকাগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। অনুপম ঘটকের ভবানী বিশ্রি, তার গান কখানা মোটেই ভাল হয়নি।

সরযূর ভূমিকায় জ্যোৎস্না গুপ্তা মন্দ নন। শান্তার মত কঠিন চরিত্রে বীণাকে যারা মনোনীত করেছিলেন তাদের মনোনয়নের কোনই প্রশংসা করতে পারা গেল না। তবে বীণা এদানিং অন্য দুখানা ছবিতে যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তার চেয়ে উন্নত অভিনয় 'পরপারে'তে করেছেন। তাকে দিয়ে অতগুলি গান গাওয়ানোর কারণ বোঝা দুষ্কর, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলা যার অভ্যাস তার মুখে গান যে কিরূপ শোনায়, তা যারা এই গান শুনেছেন তারাই জেনেছেন। নিভাননীর হিরন্ময়ী স্ত্রী ভূমিকাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানলাভের যোগ্য। নগেন্দ্রবালার করুণাময়ী অতি উচ্চাঙ্গের হলেও তাকে কিছুদিন চিত্রজগতে না দেখলেই সবাই খুশী হবেন, কারণ তার অভিব্যক্তি ও বাচনে একঘেয়েমী এসে গেছে।

দৃশ্যশিল্পী বটু সেন উচ্চপ্রশংসা পাবার অধিকারী। 'পরপারে'র দৃশ্যগুলি হয়েছে চমৎকার, এখন ব্যয়বহুল বাংলা চিত্র খুব কমই দেখা গেছে। ছবিখানা চিত্রায় চলছে।

যাহোক্ বাংলার রঙ্গালয় ও চিত্রজগতের এতগুলি বিখ্যাত নট-নটীর একত্র সমাবেশে দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে'র যে চিত্ররূপ হয়েছে তা দেখতে যে সবাই ছুটে আসছেন তা অতি সত্য কথা।

দ্বীপান্তর

ডি জি টকিজ নবপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানী —বাংলার চিত্র রাজ্যের সুপরিচিত শিল্পী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এর কর্ণধার। তার পরিচালনায় গৃহীত প্রথম চিত্র দ্বীপান্তর গত ১৮ই জুলাই থেকে শ্রীতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

সম্ভবতঃ যাদের খোসামোদ করে বেড়ানো অভ্যাস, সেই শ্রেণীর কোন অকালপক্ক লেখকের লেখা ডি জি গ্রহণ করেছেন। গল্প নির্বাচনের তীব্র নিন্দা করি। এত টাকা ছবির জন্য ব্যয়িত হয়, যদি নতুন গল্প লিখিয়ে নেবার যোগ্য লোক না পাওয়া যায়, তা হলে কোন প্রসিদ্ধ উপন্যাস বা নাটক নিলেই তো চলে। এ জন্য উর্দ্ধ হাজার খানেক টাকার মায়ায় প্রোডিউসারেরা যে যে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হন তার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গেছে।

'দ্বীপান্তর' নামটা এতই সুন্দর যার জন্যই হয়ত অনেকে ছবি দেখতে ছুটছেন বা ছুটবেন। যতদূর সম্ভবপর হয়েছে ডি জি গল্পটীকে চালাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল এরূপ পণ্ডশ্রম করার? ছবিখানার প্রথমার্দ্ধ মন্দ লাগল না, কিন্তু তারপর রহস্যময় ঘটনা হতে গল্পকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হল এবং নায়িকাকে অস্বাভাবিকভাবে প্রেমে পড়তে দেখা গেল। নায়িকা অনবরত মোটরে এখানে সেখানে যাচ্ছেন—মানে বোঝা দায় যে কোথা হতে এরূপ প্রণয়ের উৎপত্তি হল। শেষ দৃশ্যে

হঠাৎ দেখান হল নায়িকা কয়েদী গাড়ীর পাদানীর কাছে এক টুকরো কাপড় ধরে রয়েছেন, গাড়ী তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। শুনলাম, আসামীর কাপড়ের অংশবিশেষ নাকি বেরিয়েছিল, নায়িকা তাই ধরেছেন। আসামীকে সম্মুখদিকে বসান হয়, দরজার কাছে পুলিশ বসে থাকে, দরজা বন্ধ থাকে। সুতরাং ওই টুকরো আসামীর কাপড়ের অংশবিশেষ এ যুক্তির কোনই সার্থকতা নেই। জন গিলবার্ট ও রেণী এডোরী অভিনীত 'বিগ প্যারেডের' ছায়া বোধ হয় নিতে গেছিলেন, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যের কাছাকাছিও যায় নি, অথচ এ দৃশ্যটী অন্য যে কোন ভাবেই দেখান যেত। শেষ দৃশ্যে নায়কের মাতাকেও হঠাৎ উন্মাদিনীরূপে মূর্চ্ছিতা হতে দেখলাম। রাত্রের অন্ধকারে 'দ্বীপান্তর'গামী জাহাজ চলার দৃশ্যটী বেশ সুন্দর লাগল।

পরিচালনার প্রশংসা করা যায়। এমন বিশ্রি গল্পকে ডি জি যতদূর সম্ভব ভাল করবার চেষ্টা করেছেন এবং তা একমাত্র ডি জিতেই সম্ভব। ছবিখানা মোটের উপর মন্দ হয় নি বলা যেতে পারে। নতুন শিল্পীদের কাছ হতে পরিচালক যেভাবে কাজ আদায় করেছেন তার প্রশংসা করি। আশা করি, ভবিষ্যতে ডি জি ভাল গল্পের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। এই খারাপ গল্পের দরুণই তিনি 'বিদ্রোহী'তে যতটা যশ পাওয়া উচিৎ ছিল তা পান নি।

মধু শীলের শব্দ যোজনা ভাল হয়েছে, ননী সান্যালের আলোকচিত্র সর্ব্বত্র ভাল না হলেও মোটামুটিভাবে বিচার করলে ভাল বলা চলে। সুরসংযোজক সত্যানন্দ দাসকে এ জগৎ হতে বলপূর্ব্বক বিদায় নিতে বলছি—মুক্তাশিকর বোলের হাতের কাজ ভালই, তবে ওই আস্তানায় তাদের এ কয়েদের নাচ বোধ হয় সময়োপযোগী হয় নি। রসায়নাগারধ্যক্ষ কৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের কাজে নিন্দনীয় কিছু নেই। পটশিল্পী পরেশ বসু প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।

নায়ক লোকেনের ভূমিকায় নতুন অভিনেতা মোহন রায়ের মুখে অভিব্যক্তির বিকাশ মোটেই হয় না। তার কথায় যেন কিরূপ টান আছে। নায়িকা মমতার ভূমিকায় উষা মন্দ অভিনয় করেন নি। সর্দ্দারের ভূমিকায় ডি জি চমৎকার করেছেন, তার কণ্ঠস্বর আর একটু ভারী হলে ভাল হত। বর ও মাতালের ভূমিকায় বোধ হয় একই অভিনেতা নেমেছিলেন—উপভোগ্য হয়েছে এর অভিনয় ও গান। হরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপেন মন্দ নয়, ম্যানেজাররূপী পুলিন বসাক যদি "কি বিপদ" কথাটা একটু কম ব্যবহার করতেন তাহলে তার অভিনয় বেশ স্বাভাবিক হত। মাষ্টার রূপলালের বাদল চমৎকার।

মালতীর ভূমিকায় নীলিমা ব্যানার্জ্জীর চিত্রজগতে এই প্রথম অভিনয়, মন্দ লাগল না। রুবির ভূমিকাভিনেত্রী করুণা বোস সম্বন্ধেও তা বলা যায়। নর্ত্তকীর গান দুখানা মন্দ নয়, কিন্তু নাচ ভাল নয়। প্রবীণা অভিনেত্রী কুসুমকুমারীর লোকেনের মাতা ছোটর মধ্যে ভালই।

'শ্যামসুন্দর' নামে যে ছোট কৌতুক-চিত্রখানা প্রদর্শিত হচ্ছে তা দেখে আমরা খুবই খুশী হয়েছি। হাসির উপাদান খুব না থাকলেও সমস্ত দিক দিয়ে বিবেচনা করে দেখলে এ ছবির সার্থকতা আছে তা স্বীকার করি। গোবর্দ্ধন বৃন্দাবনে উপস্থিত হল, 'শ্যামসুন্দরের' গয়না চুরি করে ধনী হবে বলে। তার দেখাও সে পেল, গয়নাও হস্তগত হল কিন্তু পরে দেখা গেল গয়নাগুলি ভস্মে পরিণত হয়েছে।

পরিচালনা করেছেন হেম গুপ্ত, বেশ প্রশংসার যোগ্য। নাম ভূমিকায় শেফালী নামে মেয়েটী মন্দ গান করে নি এবং কথা কয়টীও ভাল হয়েছে। গোবর্দ্ধনের ভূমিকায় মুরারী মুখার্জ্জীর (বাণী) অভিনয় উপভোগ্য হয়েছে। কথকঠাকুরের ভূমিকায় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য অতি সুন্দর অভিনয়
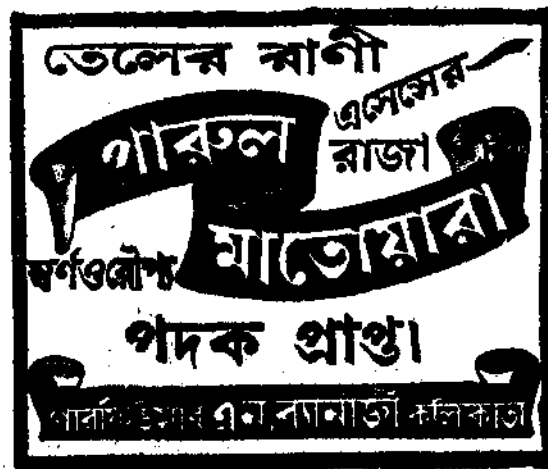
করেছেন। মধু শীলের শব্দযোজনা প্রশংসার যোগ্য। সুরেশ দাশের আলোকচিত্র মন্দ নয়। ছবিখানা উপভোগ্য।

'শিশিরে'র জ্বালা

সহযোগী সচিত্র 'শিশিরে'র জ্বালা যে কতদূর হয়েছে তার প্রমাণ তাদের ১৮ই জুলাইয়ের সংখ্যায় পাওয়া গেছে। অভিনেতৃদের আত্মস্মৃতি নিয়ে সচিত্র শিশির যেভাবে বাজারে চলতে চাইছেন তা দেখে আমাদের ঘেন্না জন্মে গেছে। কাদের নিয়ে তারা আরম্ভ করেছেন দেখুন—(১) চারুবালা, (২) যতীন বন্দ্যোঃ, (৩) শান্তি গুপ্তা, (৪) কৃষ্ণধন মুখোঃ। বাজারে এই সব অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে একজনও প্রথম শ্রেণীর শিল্পীরূপে পরিচিত নন এবং কোনদিনও যে হবেন বলে আশা করা যায় না। আমরা বলতে চেয়েছিলাম যে এই শ্রেণীর নট বা নটীদের স্মৃতি কাহিনী ভেঙ্গে কি আজ শিশিরকে বেঁচে থাকতে হবে? হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গতে চাইনা নচেৎ চারুবালার আত্মস্মৃতির লেখক যে কে তা জানিয়ে দিতাম।

রূপবাণী

এক ভয়ঙ্কর কল্পিত কাহিনীকে ভিত্তি করে ইউনিভার্স্যাল কোম্পানী একখানি রোমাঞ্চকর চিত্র তৈরী করেছেন, তাতে এক সঙ্গে দেখা যাবে বরিশ কারলফ এবং বেলা লুগোসীকে। ভয়ঙ্করকে যারা আরো ভীতিপ্রদ করে তুলতে পারেন তাদের নাম বরিস কারলফ ও বেলা লুগোসী। আলোচ্য চিত্র "ইনভিজিবল রে"তে এরা দুজন আরও ভীষণাকার হয়ে দেখা দেবেন। ছবিখানি ২৫শে জুলাই থেকে রূপবাণীতে প্রদর্শিত হবে। এই প্রতিষ্ঠানের পরবর্ত্তী চিত্র মেট্রোর "বোহেমিয়ান গার্ল"—শ্রেষ্ঠাংশে লরেল হার্ডি। সুরু হবে শনিবার ১লা আগষ্ট।

কায়া জগৎ

সম্ভবতঃ আগামী ৮ই আগষ্ট রঙমহলে 'নন্দরাণীর সংসার' এবং ওই তারিখেই নব নাট্যমন্দিরে 'অচলা' অভিনীত হবে।

২৯শে জুলাই নাট্যনিকেতনে 'আলাদীন' অভিনীত হবে। এই নাটকের কাহিনী লিখেছেন সুধীন্দ্র রাহা, প্রযোজক সুধীর গুহের নির্দ্দেশ মত। গানে সুর দিচ্ছেন কাজী নজরুল ইসলাম।

কে বেশী সুন্দর!

শ্রীযুত বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় নামে জনৈক পত্র প্রেরক লিখছেন—

বাঙ্গলা দীপালীর ২৯শ সংখ্যায় পত্র-লেখা স্তম্ভে দেখলাম—এক কমলা দেবী আর এক কমলাকে (শিশু) পরীক্ষা করছেন, কতটা পটু সে হ'ল, কোন ক্লাশের সে উপযুক্ত। ব্যাপারটা বড়ই সুন্দর ব'লে মনে হ'ল—অত্যন্ত উপভোগ্য। এই যে নিরপেক্ষ বিচার স্বজাত হ'লেও ত্রুটীর রেহাই নাই, এজিনিষটা বড়ই শ্রদ্ধাকর্ষক। সম্পাদককুল যে এতকাল ধরে পক্ষপাতিত্ব করে আসছেন, অনুত্তীর্ণা ছাত্রীকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়ে আসছেন, এটা—আশ্চর্য্য জনক। বিলাসিনী সম্বন্ধে বলবার কিছুই নাই। 'ব্যথার দানে' গীতাকে (অভিনেত্রী শিশুবালা), কেমন করে সম্পাদককুল-প্রত্যেক চলচ্চিত্র সংবাদ-পত্র বললেন, বেশ, তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। সংবাদপত্র সমালোচক কি সব ভুয়ো, তারা কি তবে কিছুই বোঝেন না? সম্পাদকদের মতই দেখছি আজ কাল চিত্র শিল্পীরাও হয়েছেন কানা! যত কদাকার দর্শন—ঠোঁট পুরু—নাক থাঁদা—চোখ ছোট মডেল নিয়ে তাঁরা ছবি এঁকে যশ অর্জ্জন করছেন। লাহা মহাশয়, কোন চোখে দেখে এ শিশু মডেলটীকে ঠিক করলেন? যার মোটেই রূপ নাই?
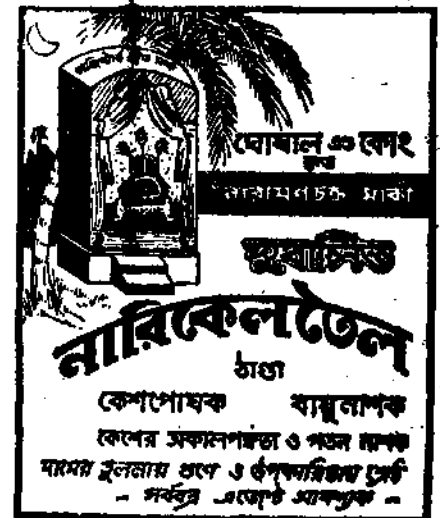
এ-কথা সকলেরই কথা

আমরা বহু প্রাচীন দেশের লোক; তাই পৃথিবীর অনেক নতুন জিনিষই আমাদের কাছে পুরানো। চা'র কথাই ধরুন না! পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা চা'র কথা সম্প্রতি জানলেও আমরা জেনেছি বহুকাল;—যদিও 'আনন্দের পাত্র' হিসেবে নয়।

একশ' বছর আগেও এ রকম ভাবে চায়ের ব্যবহার এ দেশে হোতো না। তখন লোকে জানত চা এক প্রকারের সব্জী জাতীয় খাদ্য; আর এর নাম ছিল "মিয়াং লেট্‌পেট্" বা চায়ের চাটনি। পরে এক ধরণের ঝোল হিসেবেও চা লোকের খুব প্রিয় হয়ে ওঠে। এ জিনিষটা ছিল অনেকটা তিব্বতী মাখন দেওয়া চায়ের মত।

চা বাণিজ্যের উপযোগী পণ্য হয়ে ওঠ্‌বার পরও কিন্তু আমাদের দেশে উৎপন্ন চায়ের বিশেষ আদর হয় নি। আগেকার ইংরেজ, ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজ বণিকরা মনে করতো চীন থেকে চায়ের বীজ বা চারাগাছ এনে ভারতবর্ষে লাগানো ছাড়া আর উপায় নেই।

এমনি আঁকা বাঁকা ভুল পথেই তারা সুরু করেছিল চায়ের অভিযান। তবু আজ এটুকুর জন্যেও তাদেরই কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কারণ, সেদিন "পবিত্র চা গাছ" এর পসারকে আমাদের সাগর-কূলে এনে দিয়েছিল তাদেরই বিচিত্র জাহাজগুলি বহু সমুদ্রের ঢেউয়ে আন্দোলিত হয়ে; আর তাদেরই অসম-সাহসিক উদ্যম—যা কোনো বাধার বন্ধনকেই স্বীকার করে নি। তা না হলে আজও হয়তো উদ্ভিদের বিশেষজ্ঞরা চাকে 'ক্যামেলিয়া' শ্রেণীর একটি অদ্ভুত গাছ বলেই মনে করতেন।

সম্প্রতি চা সম্বন্ধে একখানা বই বেরিয়েছে; চায়ের বিষয় এমন কোনো জ্ঞাতব্য কথা নেই, যা এতে স্থান পায়নি। বইখানা লিখেছেন উইলিয়ম্ ইউকার্স্। চায়ের ইতিবৃত্ত আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখ্‌ছেন:

"১৭৮০ খৃষ্টাব্দের কথা। ইংরেজী ইস্‌ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্যাপ্টেনরা ক্যান্টন থেকে কিছু চীনা চায়ের বীজ কল্‌কাতায় নিয়ে আসে। তখনকার বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস্ তার থেকে কতকগুলো বীজ ভুটানে জর্জ বয়েলের কাছে পাঠিয়ে দেন। আর বাকীগুলো বেঙ্গল ইন্‌ফ্যান্ট্রির লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল রবার্ট কিড্ কলকাতায় শিবপুরে তাঁর নিজের বাগানে লাগান। কি করে এ গুলির যত্ন কর্‌তে হয় কিছুই তখন জানা ছিল না; তবু বেশ ভালোভাবেই চারাগুলি বেড়ে উঠ্‌লো। ইস্‌ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসিত ভারতবর্ষে এ-ই প্রথম চায়ের চাষ।"

সে সময়ে চা গাছ এ দেশের জিনিষ কিনা তাই নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় নি। বরং কি ভাবে এই চীনে গাছের আবাদ এ দেশে চল্‌তে পারে তাই ছিল লোকের চেষ্টা।

পুরোনো কাগজ পত্রে দেখা যায়, বিখ্যাত ইংরেজ প্রকৃতিবিদ্ পণ্ডিত স্যার যোসেফ ব্যাঙ্ক্‌স্ কি ভাবে ভারতবর্ষে নতুন নতুন শস্যের চাষ হতে পারে সে সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। তার মধ্যে তিনি এ-ও বলেছিলেন যে বিহার, রংপুর কুচ্‌বিহারে চায়ের চাষ চল্‌তে পারে।

এ দেশে যে চা জন্মায়—১৮২৩ খৃষ্টাব্দের আগে সে কথা এক রকম জানাই ছিল না। সেই বছরে মেজর রবার্ট ব্রুস্ তখনকার ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্ব সীমান্ত ছাড়িয়ে বর্ম্মা-আসামে এক বাণিজ্যের অভিযান নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে তিনি দেখলেন, শিবসাগরের কাছে পাহাড়ের ওপর আপনা থেকেই চায়ের ঝোপ জন্মেছে। ফিরে আস্‌বার আগে তিনি সেখানকার সিংফো সর্দ্দারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলেন, সে চায়ের গাছ আর বীজ পাঠিয়ে দেবে!

বল্‌তে গেলে সেইদিন থেকেই কল্‌কাতার ব্যবসায়ীরা চায়ের সম্বন্ধে ক্রমশঃ বেশী উৎসাহ নিতে আরম্ভ করলে। বড় বড় সওদাগরেরা কিন্তু তখনো চায়ের অস্তিত্ব ভালো করে স্বীকার করে নি। একশ' বছর আগে যদি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক অধুনা-বিখ্যাত চা-সমিতি স্থাপিত না কর্‌তেন তা হলে হয়তো লোকের অবিশ্বাসেই এ দেশে চায়ের ব্যবসার মৃত্যু ঘট্‌তো। এই সমিতির চেষ্টাতেই শেষে স্থির সিদ্ধান্ত হয় যে আসামে চা জন্মায়।

গত একশ' বছরের ভেতরে ভারতের চায়ের কথা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আজ চা-ই বিদেশে ভারতের দূত-স্বরূপ। আজ ভারতীয় চায়ের ব্যবসাতে একশ' কোটিরও বেশী টাকা খাটছে। ভারতবর্ষে এখন আট লক্ষ

সনেট্

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

এ শ্যামলী ধরণীর রন্ধ্রতলে যারা করে বাস,
বৃহৎ নীলিমা ছেড়ে যারা থাকে মাটির ভিতর,
চাইনা তাদেরে আমি তারা শুধু নিস্পন্দ নিথর,
স্তম্ভিত জীবন চাপে মুহুর্মুহুঃ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস!
অগ্রগতি আত্মা সাথে বেঁধে চলে আমার উল্লাস
অনাদি স্বরগ-লোকে; স্থির নহি আমি, নহি জড়;
যৌবনের খরস্রোতে প্রাণ মোর কাঁপে থর থর;—
চলেছি কল্পনা-লোকে—পথে জাগে—তন্দ্রার বিলাস!
চিরদিন চাহিনাকো অমরত্ব, স্বর্গ-কারাবাস
এখানে থাকি না আমি, হিংসাভরা এই পৃথিবীতে,
আত্মা মোর ধেয়ে চলে—আমাদের সুখ দুঃখ গীতে
সুদুর্গাহ সিন্ধু মথি'—লঙ্ঘিবারে অনন্ত আকাশ।
তাই চাহি অন্ধকার, প্রস্ফুটিত আলোক বিকাশ
মোর গীতি গাহিবারে- মৃত্যুশিহরণ আসে চিত্তে।

বিচিত্রা

শ্রীমতী প্যাটরিথ কালসের বয়স ২৮ বৎসর, থাকেন মার্কিণ মুলুকে শ্রেভপোর্টে। তাঁহার দেহখানির ওজন এখন ছ'মণ বত্রিশ সের; স্বামী শ্রীযুত ক্লিফ কার্লসের ওজন তিন মণ চৌত্রিশ সের। সম্প্রতি শ্রীমতী একটি কন্যাপ্রসব করিয়াছেন; দাঁড়িপাল্লায় সে কন্যার ওজন দেখা যাইতেছে পৌনে পাঁচ সের।

—

রাশিয়ার শার্দ্দিলভস্ক সহরে আছে কিৰ্ঘিজিয়োন মিউজিয়াম। এই মিউজিয়ামে একটি ঘড়ি আছে। ঘড়িটীর বয়স ২৩৪ বৎসর। ঘড়িতে সময় ভিন্ন মাস, তারিখ ও শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষের যথারীতি সঙ্কেত নির্দ্দেশ হয়। ঘড়িটী আজও চলিতেছে, টাইম দিতেছে কাঁটায় কাঁটায়।

—

বিলাতের ওয়েষ্ট সাশেক্সে শিক্ষাবিভাগ হইতে মাহিনা করা কজন দন্ত চিকিৎসক নিয়োজিত হইয়াছেন। তাঁদের কাজ স্কুলের সমস্ত ছাত্র ছাত্রীর দন্ত পরীক্ষা করিয়া বেড়াইবেন, ছাত্র ছাত্রীদের কষ্ট করিয়া দন্তচিকিৎসকের গৃহে যাইতে হইবে না। তাঁর সঙ্গে যন্ত্রপাতি আর বৈদ্যুতিক চেয়ার প্রভৃতি সব সরঞ্জাম থাকে। ত্রি-চক্র গাড়ীতে এ সব সরঞ্জাম বহন করা হয়। এ কাজে ওখানকার মিউনিসিপালিটিরও অর্থ সাহায্য সম্মিলিত হইয়াছে।

—

মস্কো সহরে সম্প্রতি একটি নূতন সিনেমা গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে—এটিতে দর্শকদের আসন আছে ১৫ হাজার। যে পর্দ্দার গায়ে ছবি পড়িবে, সে পর্দ্দার মাপ পাকা ১ হাজার ৮ শত বর্গফুট। লণ্ডনে যেটি সবচেয়ে বড় সিনেমা হাউস তাহাতে দর্শকের আসন আছে ৩ হাজার ২ শত।

শ্রীপঞ্চানন্দ পাল

সচিত্র সাপ্তাহিক

দ্বিতীয় বর্ষ—২৬শ সংখ্যা

শুক্রবার—২২শে শ্রাবণ

১৩৪৩

৭ই আগষ্ট—১৯৩৬
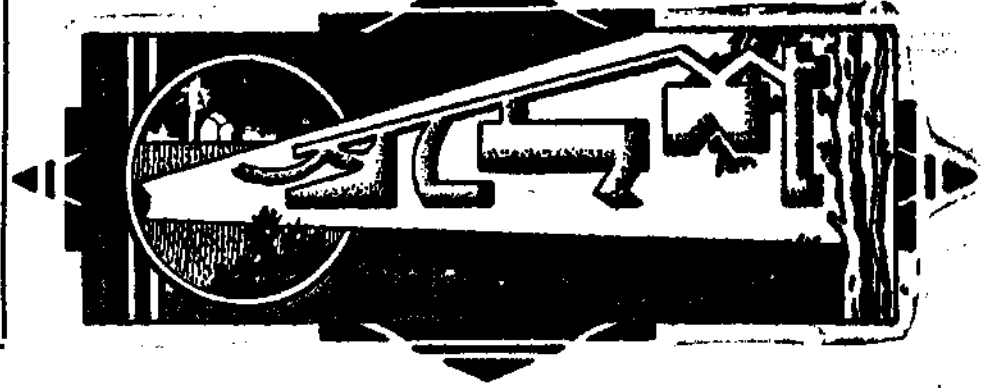
অভিশাপ

জগৎ-চেতনায় আত্মভোলা যে মানুষ—সুখে-দুঃখে পারিপার্শ্বিক সহানুভূতি ও ঘৃণা-অবহেলার মধ্যে সে চলে এগিয়ে,—উন্মাদের মত নির্ভীক আর অটল তার গতি। তার চলার পথে হয় তো সহানুভূতির অভিশাপই হয়ে ওঠে বড়ো। চারিদিক থেকে চলে এক দুর্দ্দমনীয় আসুরিক শক্তির ষড়যন্ত্র,—আসে রত্নাকর, আসে কালাপাহাড়, আসে কত শত জগাই আর মাধাই! কিন্তু পারে কি? স্বতঃ-উৎসারিত প্রাণ-তটিনীর প্রান্তরভেদী হৃদয়স্পন্দনকে সমুদ্রের মহামিলন হ'তে দূরে সরিয়ে রেখে বিচ্ছেদ-ব্যবধানের সীমারেখা টানতে পারে কৈ? সাধকের সাধনা এতে সময়-সাপেক্ষ হলেও—হয় না ব্যর্থ! অচিরেই হয় তার ইষ্টলাভে হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা! পারিপার্শ্বিকের প্রভাব তার একনিষ্ঠ অন্তরের কেশাগ্রও পারে না স্পর্শ করতে!

সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রেও দেখি তাই। ঘৃণার, অবহেলার পাষাণ-স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে তিল তিল ক'রে সে তার রক্ত দান ক'রে যায়। তাতে নেই তার এতটুকু অবসাদ, এতটুকু দুঃখের অনুভূতি! লাঞ্ছনাই যে হয় জীবন পথের পাথেয়! আপনার কঙ্কাল, আপনারই হাতে-গড়া সমাধির উপর আপনি দাঁড়িয়ে—নিজেকেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফুলের মত টুকরো টুকরো ক'রে ঝরিয়ে—ছড়িয়ে দিয়ে তাই সে জপে তার সাধনার মন্ত্র! সে মরে না বন্ধু! মৃত্যুর সমাধি'পরে হয় তার অমর-জীবনের সূচনা। এই অবহেলার ধ্বংসস্তূপ হ'তেই হয় তার চিরন্তনী উন্মেষ, আর বাঁচে সে চিরকালের শাশ্বত বাঁচা!

সাহিত্য-সেবার ক্ষেত্রে তরুণ ব্রতীদের প্রতি তোমরা যে সহানুভূতির চোখে চাইতে শেখো নি বন্ধু—সে জন্যে তোমাদের দোষ দেব না। সাধনার ক্ষেত্রে যুগে যুগে এই অত্যাচার-অবহেলাই তার প্রাণশক্তিকে দৃঢ়ীভূত করে—

"মরণ রে তুহু মম শ্যাম সমান"—ব'লে আলিঙ্গন করবারই উৎসাহ দিয়ে এসেছে। সে চায় না তাই সহানুভূতির দীনতা স্বীকার করতে, চায় না স্নেহের দাবীর হীনতা মেনে নিতে, ধারে না সে তোমাদের নির্লজ্জতাটুকুও সপ্রমাণ করতে!

কিন্তু বন্ধু—তোমরা যে দেশ আর দশকে বাঁচাবার জন্যে এদেরকে করবে দাবী, বলবে,—যে-সাহিত্য দেশকে পারে না বাঁচাতে, জাতিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে গ'ড়ে তুলতেও পারে না—সে-সাহিত্যে প্রয়োজন কি? সত্যিকারের যে সাহিত্য—এদের হাত দিয়ে তা বেরুচ্ছে কৈ? তখন তোমাদেরও এই নির্লজ্জ উক্তি ও শ্লেষের ধার যে দিতে হবে কমিয়ে! দেশ ও দশের কল্যাণ-কামনা যাদের লেখনীর উপর নির্ভর করছে বলে তোমরা করো চীৎকার—তাদের বাঁচবার পথ যখন হাতে নেই, মিছে তাদের অভিশাপ করবার অধিকারই বা তোমাদের দিলে কে?

চাতিম চাতিম

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

একদিন বাঙালীর ছেলে মেয়েদের সামনে দেশের জন্যে প্রাণ দেওয়াই বড় হয়ে উঠেছিল। "ভীরু কাপুরুষ" এই কলঙ্ক ঘোচাবার জন্যে বাঙালীর কবিরা পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন, বক্তৃতা-মঞ্চে মঞ্চে নেতারা হয়ে উঠেছিলেন মোরিয়া, গানের আসরে আসরে গায়করা হয়ে উঠেছিলেন ভাবে ডগমগ - মৃত্যু-দেবতার স্তুতিতে। ভারতমাতার জন্যে কি করে সস্তায় মরা যায় তার উপায় উদ্ভাবনে নেতাদের চক্ষে নিদ্রা ছিল না। বাঙলা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি ঐক্যতানে সুর উঠেছিল—

"মরিব মরিব সখি
নিশ্চয় মরিব।"

* * *

ফাঁসী কাঠে, রোগ শয্যায়, অনাহারে, পুলিশের গুঁতায়, দেশের লাগি হা-হুতাশ করতে করতে, ভিড়ে চাপা পড়ে, টি বি বা কালাজ্বরে, বন্দী দশায় যে কোন প্রকারে একবার মরতে পারলেই তখন অমর কর্মীর নামে দেশময় ঢ্যাঁড়রা পিটে যেতো। এই মরণ-ম্যানিয়া বা জীবন-ফোবিয়ার জন্যে আমরাই প্রধানতঃ ছিলাম দায়ী, যুগান্তরের কলমে প্রবন্ধে কবিতায় "দেশের লাগি" মহিষ-বাহনের পূজা করতে শিখিয়েছিলাম আমরাই। তার ফলে বাঙালীর "কাপুরুষ" নাম ঘুচলো বটে, কিন্তু বাতিক গেল না। মরণের প্রচেষ্টা গিয়ে দাঁড়াল একটা বদ অভ্যাসে।

* * *

সে দিন কিংসলীর একটা নভেলে পড়ছিলাম, নায়ক জিজ্ঞেস করেছেন, "দেশ-বাসীর জন্যে মরার চেয়ে বড় আর কি আছে?" তার উত্তরে আর এক জন বলছে, "তাদের জন্যে বাঁচা।" এ যে কত বড় সত্যি কথা তা' আমাদের সেন্টি-মেন্টাল ছেলেদের বোঝবার দিন এসেছে। এই মড়ক, মহামারী, কম্যুনাল দাঙ্গা আর পলিটিকাল বোমার দেশে মরাটা খুবই সুলভ এবং ও কার্য্যটা চট করে সারা যায়। কিন্তু দেশের দুঃখ দৈন্য দূর করবার জন্যে তাকে ধনে ধান্যে স্বাস্থ্যে সম্পদে গড়ে তোলবার কাজে বেঁচে থাকাটা অত চট করে এক নিঃশ্বাসে সারা যায় না। ঐ কার্য্যটি বেজায় লম্বা, বেজায় কণ্টকাকীর্ণ বলে খুবই মহৎ।

* * *

পলিটিক্যালি আমরা ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক করে মরে দেখেছি,—তা' কি কবিতায় ও ছন্দে আর কি হাতে-কলমে, তা'তে দেশ বেটা একপাও এগোয় নি স্বরাজরূপ দুর্গম লক্ষ্যের দিকে। আমরা না খেয়ে প্রায়োপবেশনে অবধি মরেছি এবং দেশবাসী হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে সেই মজা নিয়ে তমাশের ছালে ঝুলিয়েও দেখেছে; স্বরাজ তা'তে আসে নি। দু' চারটে লোক ইতস্ততঃ প্রাণ দিলে যদি স্বরাজ আসতো, দেশের আধিব্যাধি, দুঃখ-দৈন্য ঘুচতো, তা' হলে আর কোন দেশই পলিটিক্যালি বা ইকনমিক্যালি চিৎপাত হয়ে থাকতো না; এটা অবধারিত সত্য।

* * *

তা' হলে দেখা যাচ্ছে, বেঁচে থেকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, তিলে তিলে রক্ত-মোক্ষণ করেই লোককে গড়ে তুলতে হয়, সেই গঠনই হয় স্বরাজের পাকা ভিত। এই জ্ঞান কিঞ্চিৎ পরিমাণ যখন কীর্ত্তনে বাঙালীর গজালো, তখন সে হতাশ হয়ে গেয়ে উঠলো,

"আমার মরা হলো না,—
(সখি) মরিতে মরিতে আমার মরা
হলো না।"
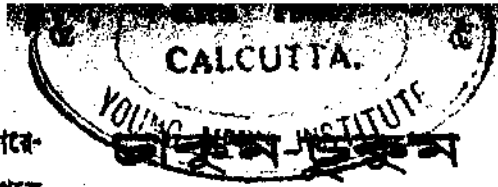
তখনই আরম্ভ হলো নন-কো-অপারে-শনী প্যাঁচ, অর্থাৎ কি না বেঁচে থেকে ম্যারে খেলা,—নট কাইন্ড টু স্বরাজ! মান্ অভিমান করে, চোখ রাঙিয়ে, না খেয়ে চিঁ চিঁ করে, তাল গাছ কেটে, আদুনী খেয়ে, কাছা খুলে, লেংটি এঁটে, খিলাফতের চোঁয়া গলি মাড়িয়ে কিছুতেই যখন স্বরাজ পাওয়া গেল না, তখনই আমাদের মনে পড়লো কাজের কথা। যে জীর্ণ পল্লীর দুঃখে আমাদের দেশবন্ধু কেঁদে গিয়েছেন, সেই পল্লীর সংগঠনে তাঁর কুটির শিল্পের পুণরুদ্ধারে এতদিনে মহাত্মাজী অবধি গেলে গেছেন।

*   *   *

এত দিনে কালের চাকা বোধ হয় ব্যর্থ মরা থেকে সার্থক বাঁচার দিকে ঘুরে গেল। কারণ এখন মিনিষ্টারী নিতে হ'লেও লম্বা লম্বা গঠনের ফিরিস্তি দিতে হয়, পলিটিকাল পার্টি গড়তে গেলেও তথৈবচ। যে যত রকম-বেরকম কাজের প্রতিশ্রুতি দিতে পারে সেই তত বড় নেতা, কারণ প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের নালিশ এ আদালতে নাই। কালের চাকা যে সত্য সত্যই ঘুরেছে তা'র সব চেয়ে বড় লক্ষণ এই, যে, ম্যাজিস্ট্রেটিক গভর্ণমেন্টও কোটি টাকা ঢালছেন গঠনের কাজে। গঠন না করে আর কারু দিন চলছে না। আর চাঁদার গঠন, প্রাইভেট দাতার ক্যাপিটাল গঠন যে দিন পেটোয় পেয়ে মারা যাবে, রাষ্ট্রের বিধিব্যবস্থার দেশব্যাপী গঠন যেদিন আরম্ভ হবে সেই দিনই কালের চাকা জীবনমুখো হয়ে হনহন্ করে ঘুরবে। কারণ সত্যকার গঠন এক রাষ্ট্র বা ষ্টেটই করতে পারে, যে কালে তারই হাতে আছে আইনের কলকাঠি আর তোষা-খানার চাবি।

[illegible]

পঞ্চমুখ শর্ম্মা

বাঙালী দু'বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পায় না। কিন্তু প্রেম বা সাহিত্যচর্চ্চার ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা বিশ্বাস হয় কৈ? তবু যখন সত্যই দেখিতে পাই—বাঙালী অনাহারী, তৎসঙ্গে সাহিত্য ও প্রেমচর্চ্চার ক্ষেত্রে শিরদাঁড়া বাহির হওয়া সত্বেও সে হল-কর্ষণে পরাঙ্মুখ হইতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে তাহার প্রাণ নেহাৎই কৈ-মাছের প্রাণ! এই জন্তই উদর খালি রাখিয়াও সে সাহিত্যের বিবর আবহমান-কাল ভর্ত্তি করিয়াই চলিয়াছে। উক্ত বিবরে সংরক্ষিত ধন দ্বারাই সে অনাহারী, অর্দ্ধাহারী হইয়াও জগৎ-সভায় আসন পাতিয়াও লইয়াছে! অদ্ভুত তাহার সাধনা, অপরিমেয় তার ধৈর্য্য, অপূর্ব্ব তাহার সাহস!

উল্লিখিত কথাগুলি পড়িয়া পাঠকগণ হয়তো ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিবেন। ভাবিবেন, হয়তো 'বিশ্বে বাঙালীর স্থান'-শীর্ষক এক প্রবন্ধ ফাঁদিবার আয়োজন করিতেছি! কিন্তু সত্যই তাহা নহে। বলিতেছি সাপ্তাহিক 'বিবর্দ্ধন'-এর কথা। বাঙালার সাহিত্য-বিবরে এত ধন সঞ্চিত থাকিতেও 'বিবর্দ্ধন' 'সংসঙ্গী'র অঙ্গীভূত হইয়া পগার পার হইয়া যাইতেছে, 'বিশেষ সংখ্যা'র এই বিশেষ খবরটি পাইলাম। ইহা অবশ্যই আনন্দের কথা। অঙ্গীকৃত 'বিবর্দ্ধন' অতঃপর বৃহদাকারে বাহির হইয়া সাধারণের তৃপ্তিসাধনে কৃতকার্য্য হইলে আরো পুলকিত হইব!

যাহা হউক, বিশেষসংখ্যা 'বিবর-ধন'-এ বাঙালার সাহিত্য-বিবর যে একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে, দেখিতে পাইলাম! 'সাহিত্য সংসদ'-এর সাধারণ অধিবেশনের মাল মশলা এবং ইত্যাদি লইয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে, আর ইহাতে না লিখিয়াছেন হেন লেখক নাই! বহুদিন পরে একটি সাহিত্য-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা দেখিয়া সত্য সত্যই বিশেষ তৃপ্তি পাইলাম!

তবে একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম না। 'বিবর্দ্ধন'-এর শ্রীকপালে জলপটি মারা হইয়াছে। 'সাহিত্য সংসদ সংখ্যা'র উপরে 'বিবর্দ্ধন বিশেষ সংখ্যা'র পটি মারিয়া যে হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে, একজন্ম স্থূল বুদ্ধির তারিফ না করিয়া উপায় কি? ইহাই কি সান্নিপাতের লক্ষণ? এবং এই বুদ্ধি লইয়াও মানুষে কাগজ চালাইয়া যায়? তাজ্জব ব্যাপার!

চুলোয় যাউক! কাহার বুদ্ধি মোটা, এবং কাহার পাতলা—ইহা লইয়া মাথা ঘামাইয়া লাভ নাই। উহা যাহার মোটা তাহার পাতলা হইবার দাওয়াই বারানসী ধাম ছাড়া হয়তো মিলিবে না, এবং ইহাই হইয়াছে সর্ব্বাধিক সমস্যার কথা। আহা কাশীশ্বর ভোলানাথের 'কি বা মহিমা!'

শ্রদ্ধেয় শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিতেছেন—

"বাংলা দেশে অনেকগুলি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু কাজের দিক দিয়ে সেগুলো বেশী এগিয়ে চলে না। সেখানে সাহিত্য-সভা বসলেও মুখ্যতঃ সকলে আহার নিয়ে ব্যস্ত। সাধারণ সভাসমিতিতে যেমন হয়, গল্প-গুজব, ভুরি-ভোজন ইত্যাদি—এগুলোতেও সেই সবের ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই হয় না।"

গত রবিবারে 'সাহিত্য সেবক সমিতি'র অধিবেশনে হাজির হইয়া কিন্তু উল্টা দেখিলাম। উক্ত সমিতির সহ-সম্পাদক এক প্রবন্ধ (অবশ্য উহার নাম দেওয়া হইয়াছে—কবিতা।) পাঠ করিলেন, এরূপ অপূর্ব্ব পঠনভঙ্গী যে মুগ্ধ হইয়া গেলাম! আর একজনের 'দেবতার প্রাণ' আবৃত্তি শুনিয়া মনে হইল, ইনি দানীবাবুর পরিচিত লোক নিশ্চয়ই! তাহা না হইলে মানুষ এমন সুন্দর আবৃত্তিও করিতে পারে ?। ইত্যাদি দেখিয়া মনে হইল, এস্থানে শুধু চা-সিঙাড়ার শ্রাদ্ধই হয় না, সত্যকার সাহিত্য-সভাও পরিচালিত হয়!

যাহা হউক, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় যে 'ঝিলুল নদীর কূলে' বসিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই, 'মরুভূর নিরালায়'-ও পা বাড়াইয়া দিয়াছেন—ইহাতে কবির অনুসন্ধিৎসা বেশ প্রবল বলিয়াই বোধ হইল! কবি বলিতেছেন—

"ওগো কালো মেয়ে,—
তোমার চোখের শুভ দৃষ্টির সাথে
কতদিন আগে অতর্কিতে যে
হয়েছিল পরিচয়,
সেদিন বুঝিনি তুমিই বন্ধু,
বন্ধুবিহীন রাতে ;—"

আহা! যেদিন 'কালো মেয়ের' 'চোখের শুভদৃষ্টির সাথে' সম্পূর্ণ 'অতর্কিতে' 'পরিচয়' হইয়াছিল—কবি সেদিন বুঝিতে পারেন নাই যে 'বন্ধুবিহীন রাতে' এই মেয়েটাই হইবে তাঁহার বিশেষ একটি বন্ধু! আচ্ছা, তাহা বুঝিতে পারিলে হইত কি ? যাহা হইবার—তাহা তো হইয়াই গিয়াছে! তবে 'ছেদহীন কাঁদা' ? ওতো একটু আধটু উঠিবেই। আলবাৎ উঠিবে।

আশুতোষ সান্যাল এম-এ যাহা লিখিতেছেন, পড়িলে মুখ দিয়া আপনিই 'আহা' বাহির হইয়া আসে! ইনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া 'রাতের পরী'কে বাহির করিয়া বলিতেছেন—

"রাতের স্বরগ-পরী
গোপনচারিণী
দুগ্ধধবল অমল-কোমল
দুকূলধারিণী।"

দু'কূল ধারণ না করিয়া তটিনীর যেমন উপায় নাই, তেমনি দশা 'রাতের পরী'রও হইয়াছে দেখিতেছি!

সুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও 'দুটি লঘু ডানা' লইয়া সন্ধ্যায় পড়িয়া গিয়াছেন। এই জন্যই হয়তো ইনি উপলব্ধি করিতেছেন—

"দীঘির নিবিড় ছায়া কী গভীর স্নেহে
অবনত
অর্দ্ধেক মুদিত চোখে!"

তাহা যেন হইল! কিন্তু—

"স্ফুরিত অধরে তার রচিলাম
পুরাণো কাহিনী" ?

কেন ? ভারতবর্ষের ইতিহাসও তো রচনা করা যাইত!

শ্রীমান বীরেন্দ্রকুমারও মন্দ যাইতেছেন না।—

"সিন্ধু-বক্ষে উর্ম্মিস্পন্দে হেরিলাম
তট-সীমান্তের
পার্শ্বে আমি, মগ্নবিমগ্ন
কেঁপে উঠলো নিশ্বাস।"

সিন্ধু-বক্ষে কত কাণ্ডই না হইতেছে!

নির্ব্বাণ চক্রোত্তি কহিতেছেন—

"বধূর গলে বাহু-ডোর জড়াতে হিয়া চায়।"

উহা না থাকিতেই এইরূপ হইতেছে, থাকিলে না জানি আরো কিরূপ হইত! অগত্যা 'বাদল বীণার' 'ঝিণি ঝিণি' শুনিয়াই দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইতে হইতেছে। আহা!

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মেয়েদের উপর খাপ্পা হইয়া উঠিতেছেন। অর্থাৎ—

"পুরুষের চেয়ে

মেয়েরা বেশী

ঝগড়া করে কেন?"—

তাহা বলিতে চাহিয়াছেন। ইনি অবশ্যই বহুদর্শী ব্যক্তি!

সেদিন রবীন্দ্রকুমার বসু মশায়কে—

"ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহে এবং মনে 'বাণীর পূজা' মাসিক পত্রিকার অফিস হইতে ধীরে ধীরে হাটিয়া বাড়ীর দিকেই ফিরিতেছিলাম।"—

বলিয়া বিকট চীৎকার করিতে দেখিয়াছি। 'কবিবর' যদি চীৎকার করেন—তাহা অবশ্যই মৌন-চীৎকার হইবে! উহাই মৌলিকতা। কিন্তু রবীন্দ্রকুমার নিজে একজন জলজ্যান্ত গায়িক! ইহাই বুঝি নিয়ম?

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'বৈশোবিকা'র পরিচয় পাইলাম। তাহাকে লইয়া তিনি যাহা করিতেছেন—

"আমার বাসনা দিয়ে আমি যারে

করেছি সুন্দর—

পরায়ে দিয়েছি গলে গান দিয়ে

গাঁথা মালাখানি,

আজো সে মাটির ঘরে সুখে দুঃখে

বেঁচে আছে জানি

জানি সে দারিদ্র্য-দুঃখে একা একা

যাপিছে প্রহর।"

[illegible] যে 'দারিদ্র্য-দুঃখে' পতিত হইয়াও 'একা একা' প্রহর যাপিয়া যাইতেছে, শ্রীভগবান তাহাকে ধৈর্য্য ধরিবার শক্তি দিন! তাহা না হইলে সে 'সুখে-দুঃখে'ও কিরূপে বাঁচিয়া থাকিবে?

এতদিন পরে 'শান্তি'তে একটা কবিতা পড়িলাম। শ্রীপারুল লাহিড়ী দেবীর 'সাধ' মন্দ হয় নাই! কারণ—

"ভিক্ষু, আমার ভিক্ষু, কেন অমন করে

বারে বারে দ্বারে আঘাত কর

কিছুই আমার নাহি তো আর দেবার তরে

ঝুলিখানি খুলে শুধুই ধর।"

আচ্ছা বেয়াড়া ভিক্ষু তো! যে দিবে—সে-ই যখন বলিতেছে, তাহার 'দেবার তরে' একেবারে 'কিছুই' নাই, তবুও 'ঝুলিখানি' খুলিয়া ধরা হইতেছে? যে দিয়া দিয়া সত্যই ফতুর হইয়া গিয়াছে, তাহার নিকট এই মামাশগুড়ীর আব্দার কেন বাপু! ঠেঙাইয়া বিষ ঝাড়িয়া দিতে ইচ্ছা করে! হাঁ! ইহার উপরও আবার 'দ্বারে আঘাত' করে?

এইজন্য বিরক্ত হইয়াই বুঝি দাতা বলিতেছেন—

"ছিল তোমার যাহা কিছু সবই দিনু

শূন্য এবে আমার দুটি ফুল (!)

কাঙাল তবু তৃপ্ত তোমায় না দেখিনু

ভ্রান্ত বল একি তোমার ভুল?"

কিন্তু কাঙাল যদি ভ্রমর হয়, তাহাকে 'দুটি ফুল' শূন্য করিয়া দিলেও তাহার হ্যাংলামি যাইবে না। যে-ফুলে হুল ফুটাইয়া সে মধু-আহরণ করে—তাহা একটিই হউক আর দুইটিই হউক, চোখে পড়িলে আর রক্ষা নাই! অতএব সাবধানে না রাখিলে উপায় কি?

কুমীরা জাহান্-আরা চৌধুরী অর্থাৎ 'সাহানা'র 'মহিলা মহল'-সম্পাদিকা যাহা বলিতেছেন—

"'সাহানা'কে উদ্দেশ করে' কতকগুলি সাপ্তাহিক কাগজ নীচতায় মাত্রা ছাড়িয়ে কটূক্তি প্রচার করেছেন। সে সবের প্রতিবাদ করার কোনও সার্থকতা নেই (কেন?), শুধু পাঠক পাঠিকার সময় ও ধৈর্য্য নষ্ট। কেহ সমালোচনা করলে তার প্রত্যুত্তর আমরা দিতে পারি, কিন্তু কটূক্তিকে গ্রাহ্য করতে আমরা অক্ষম।"—

তাহা না বলিলেও চলিত। কারণ সাহিত্যিক চৌর্য্যবৃত্তি ও ইত্যাদির যে দৌড় 'সাহানা'র দেখিতেছি—তাহাতে সাধারণেরও ঘেন্না ধরিয়া গিয়াছে। চোরকে 'চোর' বলিয়া গালাগালি না দিয়া বরং বাবা-বাছা বলিয়া ফিরাইবার চেষ্টাই করা উচিৎ! এবং এই জন্যই আমরা গুপ্ত-প্রশংসা এই সপ্তাহ হইতেই আরম্ভ করিব বলিয়া ভাবিতেছি।

কিন্তু একটা ব্যাপার দেখিয়া যে হতভম্ব হইয়া গেলাম প্রভু! হেমন্ত গুপ্ত রচিত 'হনলুলু ট্রেডিং কোম্পানী', তাহারও আবার ছায়া? আর তাহাই কিনা অবলম্বন করিয়া কোথাকার কে এক শর্ম্মা 'ব্যঙ্গচিত্র'ও ফাঁদিয়া ফেলিল? কিন্তু খোলনলচে যে দুই-ই ঠিক আছে। 'দীপালী' কি বলেন?

সুধীরেন্দ্র সান্যাল মশয়ের একটা বিশেষ প্রবন্ধ নজর এড়াইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"ভদ্র ঘরের কত নারী, কত অজানা, অচেনা আর্টিষ্টদের সহিত টেলিফোন যোগে, প্রথম পরিচয়ের ব্যবধান কাটাইতে প্রয়াসী, কয়জন তাহার হদিশ জানেন? আমি জানি, মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে এক নবাবের কন্যা বাঙলা দেশের একজন জনপ্রিয় অভিনেতাকে একবার মাত্র চাক্ষুষ দেখিবার জন্য, ঢাকা হইতে ট্রেনযোগে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।"

অবশ্য খবরটি পড়িয়া আমাদের অভিজ্ঞতা বাড়িল। কিন্তু ঢাকার এক নবাবকন্যার সম্বন্ধে হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়া সান্যাল মহাশয় ভালো করেন নাই। কারণ নবাব-কন্যাকে যত সহজে চিনিয়া ফেলিতে পারা যাইবে, রামা-শ্যামার কন্যাকে তো আর তাহা যাইবে না! সুতরাং, এরূপ গোপনীয় ব্যাপার গোপন থাকিলেই ভালো হইত!

———

মরণ দশা

ঝাঁঝাকুড়ে যাহার বসতি, তাহাকে যদি সহসা 'গ্রীণ-রুম'-এ আনিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহাকে হয় তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া যাইবে, না হয়—অচিরে দম আটকাইয়া পটল উত্তোলনই হইবে তাহার চরম পরিণতি! তোমারও হইয়াছে তাই।

তোমার মরণ দশা দেখিয়া যাঁহারা সহানুভূতির সহিত তোমাকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন, তুমি এখন 'গ্রীন-রুম'-এর দাওয়ায় বসিয়া তাঁহাদেরই পৃষ্ঠদেশে হুল ফুটাইয়া ফুটাইয়া এমন বদ্‌-খেয়ালী হইয়া উঠিয়াছ, যে অচিরে কিঞ্চিৎ উপযুক্ত দাওয়াই প্রয়োজন। কিন্তু ভাবিতেছি, কোন ঔষধ তোমার উপর ক্রিয়া করিবে?

মুখ বুঁজিয়া বসিয়া থাকিয়া বিপদ্ আরো বাড়াইয়া না তুলিয়া—সোজাসুজি তোমার রোগের উপসর্গগুলি যদি খুলিয়া বলিতে, তাহা হইলে হয়তো দাওয়াই এখনো মিলিতেও পারিত! আর—কচি খোকাটি নও, যে নাক টিপিলেই দুধ বাহির হইবে! দিব্য লায়েক বনিয়া গিয়াছ, এবং সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল-মাফিক সহরের আনাচে-কানাচে গুঁড়ি মারিয়া ঘোরাফেরা করিয়াও বেড়াইতেছ, আর পরের গণ্ডায় আণ্ডা মিলাইয়া ভাসিতে শিখিয়াছ,—'হাম কেয়া হনু রে!' কিন্তু তুমি যেই কিষ্কিন্ধ্যার হনু—সেই হনুই রহিয়া গিয়াছ—এমন সহজ কথটা আর তোমার মগজে ঢুকিতে চাহিতেছে না! আর এইখানেই তোমার বিপদ বাড়িয়াছে সমধিক—যেমন নাকি ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়াকাকের বেলায় হইয়াছিল!

তাই বলিতেছিলাম, তোমার মরণদশা একদিনে ষোলো-কলা ডিঙাইয়া আরো দুই কলা আগাইয়া চলিয়া গিয়াছে। আর ভাগ্যদোষে সে-কলা বর্ত্তমান না হইয়া—বীচিতে-বীচিতে গিজ গিজ করিতেছে! এই বীচে-কলা-গলায় আটকাইয়া তবলিঙ্ক পার হইবার পূর্ব্বেই যদি পালক পিতাদের শরণাপন্ন হইতে, আর হাতে পায়ে ধরিয়া কোনোক্রমে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে, তবে হয় তো আখেরে ভালই হইত। কিন্তু হায়, তোমার দশা দেখিয়া দুঃখ, হইতেছে! জীব বিশেষের মত তোমার শরীরে যে গোঁ পাইয়া বসিয়াছে, এক সময়ে নীলবর্ণ শৃগালের অবস্থাও ঐরূপ হইয়াছিল!

আহা, 'খেয়াল'-এর পাল্লায় পড়িয়া বাছার শেষ দশা যখন অচিরেই আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন হনুমতীর মস্তকের সিন্দুর আর হাতের নোয়া কে বজায় রাখিবে? উঁঃ! এ দুঃখ রাখিবার যে আর জায়গা নাই!

কর্পোরেশনী কাবাব

গত সপ্তাহে আমরা কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তাদিগের কয়েকটী গুপ্ত-লীলা খেলার সংবাদ পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিয়াছি। সম্প্রতি আরও কয়েকটী গুপ্ততথ্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। নব গঠিত কর্পোরেশনে অনাচার ও দুর্নীতি দমন হওয়া দূরে থাক, বরং তাহা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে, আমাদের সংগৃহীত তথ্যগুলি পাঠ করিলেই করদাতাগণ তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

* * *

কথায় আছে 'কাণা ঘোঁড়া একগুণ বাড়া'। কিন্তু কালার সেইরূপ কোন খ্যাতি আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। কর্পোরেশনের কর্ম্ম কর্ত্তাদের অতিরিক্ত শক্তির প্রভাব কিঞ্চিৎ অধিক। কাজেই তাঁহারা হয়ত গোবরেও পদ্মফুল দেখিতে পারেন। সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনে একজন জুনিয়র ল—অফিসার নিয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। এই ভাগ্যবানটী কে? লোকে ত বলে, ইনি নাকি শ্রীযুক্ত সুধাংশু মিত্র মহাশয়ের বড় কুটুম। যে পদে তাঁহাকে বহাল করা হইয়াছে সে পদে তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। তবে তাঁহার একটা বিশেষ গুণ আছে এই যে, তিনি নাকি কাণে শুনেন না। কর্পোরেশনের কর্ম্ম-কর্ত্তারা কি এই গুণেই তাঁহাকে ঐ পদের যোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন? হঠাৎ পয়সা দিয়া [illegible] বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে ল—অফিসার নিয়োগের কি কারণ থাকিতে পারে?

* * *

কলিকাতা কর্পোরেশনটা কি তবে সত্য সত্যই বড় কুটুম্বদের আস্তানা হইয়া দাঁড়াইল? কিছুদিন পূর্ব্বে অমৃত বাজার সম্পাদকের বি, এ পাশ বড় কুটুম্বকে কর্পোরেশনে এক মোটা বেতনের চাকুরী দেওয়ায় সংবাদপত্র গুলি নানারূপ টীকা টিপ্পনী করিয়াছিলেন। তাহার জের মিটিতে না মিটিতেই মিত্র মহাশয়ের বড় কুটুম্বের আবির্ভাব ঘটিল। সাধে কি আর লোকে মুন্সিপ্যালকে পুষ্যি পালনের আস্তানা বলে! করদাতা বান্ধব সঙ্ঘের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কুমার কৃষ্ণ মিত্র ও সঙ্ঘের মনোনীত কাউন্সিলার কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র এই সহকারী ল—অফিসার নিয়োগের সংবাদ রাখেন কি? রাখিলে এ বিষয়ে তাঁহারা কি করেন তাহা দেখিবার জন্ম আমরা উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

* * *

আপনারা সরবোস এণ্ড কোম্পানী বলিয়া কোন কোম্পানীর নাম শুনিয়াছেন? কে এক রসিকলাল গুপ্ত নামে একজন ঠিকাদারকে কর্পোরেশনের একখানা দোকান ঘর ভাড়া দেওয়া হয়। কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী-দিগের অবহেলায় এই রসিক লালের অনেকগুলি টাকা ভাড়া বাকী পড়ে, শেষে কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীরা একদিন রসিক-লালের ভাড়া আদায় করিতে গিয়া দেখে যে শিকার পলাইয়াছে। রসিক লালের নিকট প্রাপ্য ভাড়ার যদিও সঠিক কোন হদিস পাওয়া যায় নাই, তবে তাহা যে নেহাৎ কম নহে ইহা বলাই বাহুল্য। পরে অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে রসিকলাল বলিয়া কোন লোকই ভাড়াটিয়া ছিল না। তবে কর্পোরেশনের হাতে কে আসিয়া গাঁজা খাইয়া গেল?

* * *

শুনা যায়, পলাতক রসিকলালের পক্ষে মিঃ সরকার নামে একজন উকিল প্রায়ই কর্পোরেশনে যাতায়াত করিয়া এ বিষয়ের তদ্বির করিতেন। ইনি নাকি সেণ্ট্রাল কলিকাতার শ্রীযুক্ত বিনয় বসুর সহিত নূতন এক কোম্পানী খুলিয়া ঐ কোম্পানীর নাম দিয়াছেন সরবোস এণ্ড কোম্পানী। ইঁহারা নাকি রসিকলালের নিকট হইতে অনাদায়ী ভাড়ার খেসারত স্বরূপ কর্পোরেশনকে দুই হাজার টাকা সেলামী দিয়া অল্প ভাড়ায় সেই দোকানখানি ভাড়া লইতে চাহেন। এই লইয়া কর্পোরেশনে অনেক গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে এবং চুনোপুঁটি হইতে রুই কাতলা পর্য্যন্ত অনেক কর্ম্মচারী রসিকলালের এই রহস্য-জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন—একথা কি সত্য? সরবোস কোম্পানীর অংশীদার ন্যাশনাল লীডার মিঃ বসু কি বলেন?

* * *

কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনিয়ারের বেতন বৃদ্ধি লইয়া ভিতরে ভিতরে যে গোপন চক্রান্ত চলিতেছে, তাহারও কিছু কিছু তথ্য আমাদের দপ্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বেতন বৃদ্ধির অধিকারীগণ যদি মনে করিয়া থাকেন যে ডুবিয়া জল খাইলে একাদশীর বাবাও টের পায় না তাহা হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া

ঢাকেশ্বরীর ঢাকা

ঢাকেশ্বরীর ব্যাপারে ঢাকা খুলিয়াছে— ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের আর জেল খাটিতে হইবে না—কেবল পাঁচ শত হাজার টাকা জরিমানা দিয়াই এ যাত্রা অব্যাহতি। ইহাই সপার্ষদ গভর্ণরের আদেশ। এখন কথা—অংশীদাররা কি করিবেন? যাঁহারা একবার এইরূপে দাগা পাইলেন, তাঁহারা না হইলে কি ঢাকেশ্বরীর গোকুলপুরী আঁধার হইয়া যাইবে? গভর্ণরের দয়া অধিকার যখন আইনে আছে, তখন তিনি অবশ্যই দয়া করিতে পারেন, করিয়াছেনও। কিন্তু তাঁহার আদেশের সম্বন্ধে একটা কথা আমরা না বলিয়া পারি না। ঢাকেশ্বরীর টাকা যে নষ্ট হয় নাই, সে কথা ত হাইকোর্টের রায়েও দেখিলাম। সুতরাং আর কোন তিন জন ম্যানেজিং ডিরেক্টার হইয়াও কাজ চালাইতে পারিতেন না, এমন মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? আর ঢাকেশ্বরীর তিন তিন জন ডিরেক্টার যদি ৩ মাস সরকারের অতিথি হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলেই কি বাঙ্গলার শিল্পের মাথায় বাজ পড়িত? বঙ্গলক্ষ্মীর লাহিড়ী যে বঙ্গলক্ষ্মীর অনেক টাকা নষ্ট করিয়া রাজার আতিথ্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে কি বাঙ্গালায় আর কাপড়ের কল হয় নাই বা হইবে না? বঙ্গেশ্বরী, বাসন্তী—এ সবই ত তাহার পরে হইয়াছে। সুতরাং যে যুক্তি দেখান হইয়াছে, তাহা বিচার সহ কিনা, তাহাই ভাবিবার বিষয়। আমাদের মনে হয়—গভর্ণর যখন দয়াই করিলেন, তখন যুক্তি না দিলেও পারিতেন। আর দাগা ত মুছিল না!

ঢাকেশ্বরীর ডিরেক্টাররা নিশ্চয়ই এখন হইতে সাবধান হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা সহযোগী 'অমৃতবাজার'কেও সাবধান হইতে বলিব। রবিবারে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, সোমবারে তাহা পাল্টান যে 'অমৃতবাজারের' মত পত্রের পক্ষে প্রশংসার কথা নহে, তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? যখন শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার বসু ডিরেক্টারদের পক্ষে মামলা করিয়াছিলেন—আর নরেন্দ্র বাবু 'পত্রিকার' খুবই পরিচিত, তখন নরেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই কি—কোন সব-এডিটার শনিবার রাত্রিযোগে রবিবারের প্রবন্ধটি লিখিয়া দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুর বাড়ী গিয়াছিলেন? 'পত্রিকার' সম্ভ্রমহানি সকলেরই কাছে বেদনাদায়ক।

আগামীবারে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। তখন যে অনেকের মুখে চুণ কালি পড়িবে তাহা বলাই বাহুল্য। কাজেই বলিতেছি, চক্রান্তকারীগণ হুঁসিয়ার!

রজনী-বিভ্রাট

পাঠক ভুল করিবেন না, এ কাহারও নৈশ বিপদের কাহিনী নহে। ব্যাপারটি দেবদত্ত ফিল্মের প্রযোজিত রজনী চিত্র লইয়া। আমরা শেষ মুহূর্তে খবর পাইলাম যে, জে, এফ, ম্যাডান কোম্পানী রূপবাণীর কর্তৃপক্ষের উপর ইঞ্জাংসন জারী করিয়া রজনী দেখানো স্থগিদ রাখিবার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করিয়াছেন। রজনীর স্বত্ব লইয়া মামলার বিচার সাপেক্ষে হাইকোর্ট এই আবেদন মঞ্জুর করিয়া ইঞ্জাংসন জারীর আদেশ দিয়াছেন। ম্যাডান কোম্পানী বলিয়াছেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের সকল গ্রন্থের অভিনয় ও চিত্রস্বত্ব তাহারা শ্রীযুত ব্রজেন্দ্র সুন্দর বন্দোপাধ্যায়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।' তবে নিউ থিয়েটার্স বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র সবাকচিত্র কিরূপে তুলিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না। নির্ব্বাক ছবি অবশ্য ম্যাডান কোম্পানীই তুলিয়াছিলেন। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য দৌহিত্রগণ বসুমতী ও ব্রজেন্দ্রবাবুর নামে মামলা করিয়াছিলেন। দেখা যাক্ কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়ায়। রূপবাণীতে ৮ই আগষ্ট তারিখে রজনীর মুক্তির দিন—তবে রজনী অন্ধ—তার কিবা রাত্রি কিবা দিন। আমরা আগামীবারে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

গল্প

[গল্প]

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

কদিন ধরে ক্রমাগতই ভাবছি একটা গল্প লিখতে হবে; সুন্দর নিটোল, সর্বাঙ্গ সুন্দর একটি গল্প। যে গল্পের মধ্যে সুরের লাবণ্য উঠবে উপচে—রামধনুর মত শোভাময়ী নানান রঙের উঠবে বিকশিত বাহার। হ্যাঁ কদিন ধরেই এমনি ভাবছি। ছোট্ট একটি গল্প লিখতে হবে—কুমারী মেয়ের মত ব্রীড়ানত, কিন্তু যৌবনের আর তারুণ্যের লাবণ্যে কমনীয় একটি গল্প।

রোজকার মত আজো চেষ্টা-চরিত্র করে লিখতে বসেছিলাম গল্পটা। কিছুতেই যেন এগুতে চায় না লেখা। রচনা যেন কেমন বিমর্ষ হয়ে উঠে, যেন এক মর-ণোন্মুখ রোগীকে নিয়ে প্রসাধন চলেছে। কিছুতেই আর এগোতে চায় না। অথচ একটা গল্প লেখা চাই-ই। আজকেই লিখতে হবে। কিন্তু মাথার ভিতর একটা প্লটও নেই—সব প্লট যেন পালিয়ে গেছে কোন দূর সীমান্তে—নদীর অতলে যেন নেমেছে অবগাহনের জন্যে।

কিছুতেই লিখতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু না লিখলেও নিষ্কৃতি নেই। লেখক-দের এমনি দুর্ভাগ্য যে তারা ইচ্ছে করলেই না লিখে চুপ করে থাকতে পারে না। লেখা তাদের টেনে নিয়ে আসে টেবিলের সামনে। সেই উচ্ছ্বাসের যখন চরম অভিব্যক্তি তখনই নেমে আসে রাশি রাশি রচনা—গল্প আর কবিতা।

কিন্তু আজ আমার মন নেই একটুকুও লিখতে। শরীরটা যেন অবসন্ন হয়ে উঠেছে, মনে যেন এসেছে ক্লান্তি। কলম হাতে নিয়ে চুপ করে বসে পাতায় হিজি-বিজি কাটতে আরম্ভ করলাম। হিমানীর কথা মনে আসতে লাগলো, হিমানী আমার বৌদির বোন—মানে দাদার শালী। কদিন হ'ল ওরা এসেছে এখানে বেড়াতে, আমাদের এখানেই আছে। কলেজে পড়ে, কিন্তু বেশ মেয়ে। মনে আসতে লাগলো তার কথা। সামনের বিস্তৃত আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম—গল্পের প্লটের জন্যে, কিন্তু কী যে হয়েছে, একটা লাইনও বেশ লিখবার মতো নেই। কলম নিয়ে তবু বসলাম,—না, হিমানী আধুনিক মেয়ে হলেও বেশ মেয়ে, চমৎকার। এমন মেয়েই ত চাই। মেয়েরা যদি লেখাপড়া শিখে পুরুষই হয়ে গেল তবে আর মেয়েত্ব রইলো কোথায়? পড়ছো, পড়না—তাই বলে হাটে-বাজারে, ট্রামে-ট্যাক্সীতে, গাড়ী-ঘোড়ায় অমন উপুড় হয়ে না চললে কি আর হয় না। মেয়ে, মেয়ের মত থাক। হিমানী কিন্তু বেশ মেয়ে—

ছোট বোন টুলু বাগানে কি করছিল। ডাকলাম তাকে: ওরে শোন।

বেণী দোলাতে দোলাতে টুলু এলো: ডেকেছ?

হ্যাঁ। আচ্ছা তুই কলি কি টুলু, বড় ভাইয়ের অভিভাবকত্ব বজায় রাখবার মত করে বলতে লাগলাম, হলি কি তুই, আজ বাদে কাল তোর পরীক্ষা আর—

টুলু আর শেষ করতে দিলে না। বলল—বা এইত পড়ে এলাম। হিমানী দি আমায় এখন রোজ পড়াচ্ছে।

তবে আর কি, বলতে লাগলাম, হিমানী দি পড়াচ্ছে তবে আর কি—, এবার একটু সুর চড়িয়ে সুর করলাম—কি জানে তোর হিমানী দি যে পড়াবে, মেয়েরা আবার জানে কি?

টুলু পড়ে একটা মেয়ে স্কুলের-সেকেণ্ড-ক্লাশে। সেও দমলোনা, বলল: হয়েছে, মেয়েদের অতো ছোট করে দেখোনা, তোমাদের চেয়ে কম কিসে আমরা? আমরাই ত এখন য়ুনিভার্সিটির মেডেল পাচ্ছি।

মানতেই হ'ল। উপায় নেই। আজ-কালকার ছেলে আর মেয়ে কেউই কম নয়। টুলুটা, এই সেদিনকার টুলুটা পর্য্যন্ত—থাক—কথার মোড় ফিরিয়ে বললাম—বেশ, তোর হিমানী দি কি করছে রে এখন? কোথায় রে?

বা তুমি কি চোখে দেখতে পাওনা নাকি, টুলু বলতে লাগলো, ঐ তো বসে আছে বাগানে।

একেবারে বেকুব হয়ে গেলাম। যেখানে তিনি বসে আছেন, সে স্থানটা এখান হতে খুবই নিকট। নিশ্চয়ই কথা-গুলি ও শুনতে পেয়েছে।

টুলু বলল: ডাকবো হিমানী দিকে—ও হিমানীদি এসো। দাদা ডাকছে।

ইস, টুম্পটা কী পাজী মেয়ে, ছিঃ। কিন্তু হিমানী সত্যি এসে উপস্থিত হয়েছে। হাত তুলে নমস্কার করে হেসে বলল: ডেকেছেন।

হাঁ, না গোছের জবাব দিয়ে বললাম—বসুন।

হিমানী বসল না, বলল: এই ত বেশ আছি। কিন্তু কদিন হ'ল এসেছি অথচ আপানার সঙ্গে আলাপ আর হল না।

আমতা আমতা করে বললাম—এই নানা কাযে—

হেসে হিমানী বলল: আপনার গল্প অনেক পড়েছি। বেশ লাগে—

খুশী হয়েছি অথচ কেমনতরো একটা উদ্বেগ যেন মনের মধ্যে এসেছে—বললাম: কী যে বলেন, কী আর লিখি এমন—এই, যখন একটু সময় হয়—

হিমানী কথা বলল না। চুপ করে রইলো। কিছুক্ষণ তেমনি করে থেকে বলল: কি লিখছেন এখন?

কিছুই এতোক্ষণ লিখিনি, কিন্তু সেকথা বললাম না। বললাম: ভাবছি কি লেখা যায়।

হিমানী হাসলো: কেন প্লটের জন্যে আজকালকার লেখকদের আবার আটকায় নাকি?

তার দিকে তাকালাম।

হিমানী বললো: টান দিয়ে কোনখান থেকে একটা ছেলেকে আর মেয়েকে খাড়া করুন না।

বলে হো-হো করে হাসতে লাগলো।

দমে গেলাম। বললাম: কেন?

তা, না হলে আধুনিক গল্প হবে কি করে?

হিমানী বলতে লাগলো, না হলে সে তো পুরোনো লেখকদের মতো হয়ে উঠবেন। মেয়ে আনুন—

তারপর?

তারপর রঙ দিয়ে দিয়ে যাহোক একটা কিছু খাড়া করলেই ত হলো।

আবার তার দিকে তাকালাম।

—হিমানী বলতে লাগলো—একলা তাদের নিয়ে যান লেকের ধারে বা পার্কে তারপর—তারপর পর্য্যন্ত থেমে হিমানী হো হো করে করে হাসতে লাগলো।

আমি আধুনিকদের পথ সমর্থন করলাম: কেন সব লেখকরাই ত তা করেন না।

হিমানী ধীরভাবে বলতে লাগলো, তা করে না, করে না বলেই ত এখনও সাহিত্য বেঁচে আছে। কিন্তু যারা তা করে না তাদের অবস্থা দেখেছেন ত?

না।

তাদের কোন স্থান নাই। ভাল ভাল কাগজে যারা ভাল বিষয় লেখে তাদের তা কে চেনে বলুন। তাদের নিয়ে আলোচনা হয় না। বর্ত্তমানকালের এটাই হলো নিয়ম—যেমন করে হোক লোকের সামনে আসতে হবে—কিন্তু ভাল ভাবে আসা বিপজ্জনক। এই ধরুন আপনিই ত লিখছেন কতকাল ধরে, কতটুকু নাম আর হয়েছে আপনার?

চুপ করে রইলাম—

তার চেয়ে যদি এতোদিনে মন-দেয়া-নেয়া গোছের একটাও কিছু লিখতেন, হুলুস্থুলু পড়ে যেত আপনাকে নিয়ে, বলে হিমানী হাসতে লাগলো।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর বলতে লাগলাম—তাই বলে ভাল যা তাই লেখাই ত ভাল।

নিশ্চয়, হিমানী বলতে লাগলো, যা ভালো, যা চিরকালের, তার স্থান চিরকালই উচ্চে। মানুষে তাদের অন্ততঃ সম্মান করে মনে মনে। কিন্তু এবার যাই আপনার সাথে আর একদিন আলাপ করা যাবে, বলে হিমানী হেসে চলে গেল।

বসে বসে ভাবতে লাগলাম—ছাই গল্পটা আর আজ লেখা হল না।

ওদিকে ধীরে ধীরে হিমানী বাগানে গিয়ে বসলো। এখান হতেও তাকে দেখা যাচ্ছে।

বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমাচার
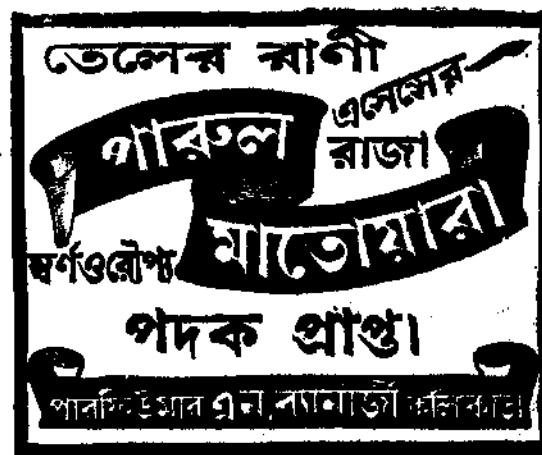
বেকার সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা

বিগত ৬ই জুলাই জেনেভাতে শিক্ষা, সমাজ মঙ্গল, ধর্ম, সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে দান, স্ত্রী-স্বাধীনতা ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন ৩২টী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের একটী সভা হইয়াছে। তাহাতে সুধীজনদের ভিতর বেকার সমস্যা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিবিধ বিষয় আলোচনা হইয়াছে।

মেস্তারেও ভুকেয়া, আন্তর্জাতিক শ্রমিক অফিস ও আন্তর্জাতিক সুধী সহকারিতা প্রতিষ্ঠানের সহযোগে বেকার সমস্যা সম্বন্ধে যে বিবৃতির খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন, সভাতে তাহার আলোচনা হয়। বিবৃতিতে বেকার সমস্যার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে, যে ইহা সমাধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংখ্যা সংগ্রহের অফিস খোলা প্রয়োজন। আরও বলা হইয়াছে যে, ছাত্রগণ যাহাতে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে না যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার সংশোধন করা কর্ত্তব্য। ইহা ছাড়া, কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের বয়স কমাইবার কথা, সুধীদের জীবিকার জন্য সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয়ে প্রবেশের বয়স বৃদ্ধি করা ও নূতন নিয়োগের ব্যবস্থার বিষয়ও লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত নিয়া সভাতে যে সকল তর্কবিতর্ক হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকদের বেকার সমস্যার দরুণ যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে সে বিষয়ে সকলেই সচেতন।

সুধীজন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদিগের ভিতর বেকার সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার জন্য সভাতে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কেননা, সভা সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, বর্ত্তমানে দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত নূতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্মুখীন হইয়াছে তাহার সহিত আধুনিক সমাজ খাপ খাওয়াইতে পারে নাই বলিয়াই এই বেকার সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এই সঙ্কট নিরাময়ের জন্য সুধীদিগের কার্য্যের সমন্বয় করিয়া কোন না কোনরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন করা প্রয়োজন এবং বেকার সমস্যার আসল প্রকৃতি জানিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য জীবিকা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে সংখ্যা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা সমীচীন। এ ছাড়া সর্ব্বত্র জীবিকা খুঁজিয়া দিবার জন্য ছাত্র প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগিতায় বিভিন্ন অফিস খোলা দরকার। এই কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য সভা রাষ্ট্রসঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আফিস এবং আন্তর্জাতিক সুধী সহকারিতা প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছে।

অন্যান্য বিবিধ সমস্যার আলোচনাও সভাতে হইয়াছে। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে সামাজিক কাজের অনুষ্ঠান, আধুনিক জীবনে শান্তির আদর্শ প্রচার ও শিক্ষাদানে সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য এবং আগামী ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রিদ্ সহরে যে ইতিহাস শিক্ষাদান সম্বন্ধে মহাসভা হইবে সে বিষয়েও আলোচনা করার পর অধিবেশন শেষ হয়।

আশ্রম বিতাড়িত যুবতীর জীবনকাহিনী

—শ্রীনীলকণ্ঠ—

[গল্প]

(শেষার্দ্ধ)

সুমতি দেখলে আশ্রমে আর তার স্থান নাই। (তার মত এমনি অনাদৃত হয়ে অনেক মেয়েই এর আগে বিতাড়িত হয়েছে এ খবর তার বিদিত।) চোখের জল মুছে সুমতি নিজের ভবিষ্যতের জন্ত প্রস্তুত হতে লাগল—মানে, প্রস্তুত হওয়া ছাড়া অন্ত কোনো পথ তার আর রইলো না।

সৌভাগ্য ওর—হ্যাঁ সৌভাগ্য বৈকি। ঠিক ওই দুঃসময়েই সে সহসা সংবাদ পেলে সহরে স্থানীয় মেয়েদের হাইস্কুলে একটা চাকরি খালি আছে, নানান জনকে ধরাধরি করলে চাকরীটা তার হতেও পারে। এবং শেষ অবধি হলোও তাই; মাসিক চল্লিশটাকা বেতনে সে মাষ্টারণী নিযুক্ত হয়ে গেল। আশ্রমের শ্রীদাদাদের এবং শ্রীঠাকুরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সে এসে চাকুরী গ্রহণ করলে এবং কর্ত্তৃপক্ষের নিয়ম অনুযায়ী বোর্ডিংয়ে এসে বাসা বাঁধলে।

সুমতি দেখলে তার জীবনের কামনা এতদিনে পূর্ণ হয়েছে। সে স্বাধীন—এতদিনে সে স্বাধীন !!

আশ্রমের বন্ধুরা ওর কাছে হয়েছিলো পুরাণো; শুধু নিরুপায় হয়েই এতদিন তাদের সে মন জুগিয়ে এসেছে। এখানে এসে সহরের কতকগুলো নতুন বন্ধুকে সে যোগাড় করে নিলে। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোককে ফাঁদে ফেলা কঠিন, কিন্তু নারী যদি ইচ্ছা করে তবে যে কোনো বয়সের যে কোনো পছন্দ লোককে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে পারে। সুমতি দেখতে যত কুৎসিত হোক না কেন, সে এখনও কুমারী—বি-সএ-সি পর্য্যন্ত পড়েছে, স্থানীয় স্কুলের মাষ্টারণী, ব্রাহ্ম প্যাটার্ণে ঘুরিয়া কাপড় পড়ে—ইত্যাদি মিলে যে-কোন লোকের মনে মোহ সৃষ্টি করে।

সহরের অল্পবয়সী কলেজ ইস্কুলের ছেলেদের নিয়ে সে মেতে উঠলো। সকাল সন্ধ্যায় এর বাড়ী ওর ঘুরে বেড়ানো ওর নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় সে বাইরে বেরিয়ে যেত—বোর্ডিংয়ে ফিরতে রাত হয়ে যেত।

ইস্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীও থাকতেন বোর্ডিংয়ে—গুজব শোনা যায় তিনিও নাকি ওর মতনই। প্রধানা শিক্ষয়িত্রী দেখলেন—সুমতি তার বিপদ ঘটাবে। গোপনে তিনি এতকাল যা করে এসেছেন তা সুমতির জন্তে প্রকাশ হতে দেরী হবে না। এই ব্যাপার উপলক্ষ্য করে দু'জনের মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘর্ষও চলতে লাগলো। তিনি সুমতিকে তাড়ানোর জন্তে মনে মনে সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

এমনি করে' ছ'মাস। সুমতির কাণে সহসা একদিন একটা কথা ভেসে এলো। 'এতকাল আশ্রমে ছিলো বলে সে আই এস সি. পাশ দিতে পেরেছিলো, আশ্রম থেকে বিতাড়িত হয়ে বি এস সি. পড়া তো তার সাধ্যে হলো না।' অপমান, দস্তুর মতন অপমান। গার্লস স্কুলের নব নিযুক্তা টিচারের পক্ষে যথেষ্ট মান হানিকর উক্তি। কথাটা ওর পড়িল ঘোলাটে ঢের মনের ওপরে চাবুক কষলে। সে স্থির করলে ছ'মাসের ছুটি নিয়ে পরীক্ষাটা দিয়ে দেবে। কত গাধা-হাবল পাশ হচ্ছে, আর সে তো গার্লস স্কুলের অণ্ডার গ্রাজুয়েট মাষ্টারণী।

মন স্থির করে' ছ'মাসের ছুটির একটা দরখাস্ত অফিসে জমা দিয়ে সুমতি বোর্ডিংয়ের বাস তুলে রাধানাথপুরে মাসীর বাড়ীতে ফিরে এলো। এই বাড়ীতে থেকেই বছর বারো আগে সুমতি ঐ গার্লস স্কুলেই পড়েছে। এখানে এসেই সর্ব্বপ্রথম খোঁজ করলো তাকে, যাকে নিয়ে জীবনে সে প্রথম প্রণয় সুরু করেছিল। সবে কৈশোর উত্তীর্ণ একটি তরুণ—যাকে আপনা হতে সে সর্ব্ব প্রথমে প্রণয় পত্র লিখেছিল। এক মাথের মাঝে বুকের সেমিজের ভেতর থেকে সেই চিঠিটা বের করে' তার হাতে দিয়েছিলো।

আজ সে চলে এসেছে তার বছর বারো পূর্ব্বের পরিত্যক্ত স্থানে। যার ভরসা ওর মনে ছিলো চির জাগরুক, যার আশায় সে বুক বেঁধে এসেছিলো সে তখন চলে গেছে দূরে। সে তরুণ আজ দীর সমাজে সংসারে [illegible] [illegible] প্রতিভায় মর্য্যাদায় [illegible]। [illegible]

যৌবনের রাঙা ইন্দ্রধনু তার মন হতে গেছে মুছে, কঠিন দৃষ্টি দিয়ে আজ পৃথিবীকে যাচাই করতে সে শিখেছে। মেকি জিনিষে আজ তার মন ভরে না। একদা তারুণ্যের দুর্বলতায় হয় তো নিজেকে সে সুমতির গচ্ছিত করেছিলো কিন্তু আজ সে প্রস্তরের মত নির্মম। সুমতি তার কলঙ্কিত জীবন নিয়ে রাধানাথপুরে এসে তার প্রথম প্রণয়ীকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলে। কিন্তু হায় সকলি বৃথা। যে সুমতি একদিন মোহাবিষ্ট মনে তাকে বলেছিলো ‘তুমি-ই আমার পূর্ব্ব জন্মের স্বামী—তাই এ জন্মে তোমাকে পেয়েছি। তোমাকে ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষের স্থান আমার জীবনে নাই।’ কিন্তু হায় কী নিদারুণ মিথ্যা—ধোঁয়ার মতন মিথ্যা এই উক্তি।

তার প্রথম প্রণয়ী তাকে চায় না। সে এখন একজন সুপরিচিত সাহিত্যিক। সে আজ সত্যই বিস্মিত হয়ে ভাবে সুমতির মধ্যে কী দেখে সে দিন সে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। রূপের মধ্যে দুটো ড্যাবডেবে গোল গোল চোখ, থ্যাবড়া নাক, গোলপানা মুখ কাফ্রিদের মতন দুটো পুরু ঠোঁট, প্রশস্ত চোয়াল, শ্রীহীন মত মোটা কোঁকড়ানো চুল ইত্যাদি মিলে তার সুচারু দেহ গঠিত।… সেই সুমতি—দেবতার নির্মাল্যের মত পবিত্র সুমতি আজ কলঙ্কিতা হয়ে ফিরে এসেছে। প্রতিদানে পুরস্কার পেয়েছে কিঞ্চিৎ লেখাপড়া। ওর পানে চেয়ে আজ দুঃখের অবধি নাই, বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা সীমা অতিক্রম করে’ গেছে। প্রেমের মুকুরে আজ সে অতৃপ্তার খোয়া।

সুমতি যখন দেখলে যে তার জালবিস্তার হলো ব্যর্থ, ফাঁদে সে পা দিলে না—আহত ভুজঙ্গের মতো সে ফুলে উঠলো—গর্জ্জে উঠলো! এত বড়ো স্পর্দ্ধা—একটা নারী স্বেচ্ছায় তাকে আত্মসমর্পণ করলে—সে তার মর্য্যাদা না দিয়ে অনায়াসে তাকে ফিরিয়ে দিলে। অপমান—তার নারীত্বের অপমান। সুমতি রাগে দুঃখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সে চরিত্রহীনা! এ অপবাদ সুমতির হয়েছে শুধু তাকে দিয়েই, এ কথা সর্ব্বজন বিদিত। সে তাকে সেই দোষে আজ প্রত্যাখ্যান করলে। অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাসের কথা স্মরণ করে নীরব অন্ধকার ঘরে সুমতি অশ্রু বিসর্জ্জন করলে। সে মনে মনে সঙ্কল্প করলে, সবাইকে দেখাবে—তাকে দেখাবে, ছোটো বড়ো কোনো কিছুর বাচবিচার তার কাছে আর থাকবে না; নিজের যৌবনের উদ্দাম স্রোতে সবাইকে তুচ্ছ তৃণ খণ্ডের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বালক, যুবক বৃদ্ধ সবাইকে তার পছন্দ; আজকের দিনে সকলেই তার প্রেমাস্পদ। সে নারী,—যে-কোনো পুরুষকে জয় করতে চোখের একটা ইঙ্গিতের অপেক্ষা মাত্র।

করোনার্ভ কলেজের তরুণ প্রফেসার বীরেশ্বর (শুনেছি, তিনি আজও ব্যাচেলার) তাকে শিক্ষাদানে অতঃপর ব্যাপৃত হলো। অর্থাৎ ব্যাপৃত হবার অনুকূল আবহাওয়া সুমতি সৃষ্টি করে তার কাছে হাজির হলো। বেচারী বীরেশ্বর তো মেসের ঘরে একা পড়ে কড়িকাঠ গুনছিল, সুমতিকে পেয়ে সে প্রচণ্ড একটা আনন্দের নিশ্বাস ত্যাগ করলে। তার জীবন-কুঞ্জে শত শিখ একত্রে যেন ডেকে উঠলো, লক্ষ্যপদ্ম ফুল এক নিমিষে দল বিস্তার করে জেগে উঠলো। সুমতিকে শিক্ষা দানের স্থান নির্দিষ্ট হলো কলেজের প্রফেসার হোষ্টেলের এক নির্জ্জন কক্ষ। কাল—সন্ধ্যার পর হইতে যতটা রাত্রিই হউক না। শীতকালের অজুহাতে ঘরের দরজা জানালা নিরন্ধ্র ভাবে—নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ভাবে বন্ধ।

প্রফেসার বীরেশ্বর এবং সেই সঙ্গে কলেজের ছোকড়ারাও হ’ল তার সহচর। কোনো ছোকড়া বি-এ, কেউ আই-এ পড়ে। বিচিত্র রকমের যুবকদের নিয়ে চললো ওর বন্ধুত্ব। এরা সুমতির সাথে কথা বলার কাঙাল—ওর মুখের একটুকু হাসিকে ওরা দুর্ভিক্ষের দেশের লোকের মত লুফে নেয়। ওর ঠোঁট থেকে এক কথা বের হতে না হতে প্রতিযোগিতা চলে কে আগে আদেশ পালন করে ধন্য হবে—কৃতার্থ হবে—অনুগ্রহ লাভ করবে।… ছেলের অভিভাবকেরা মনে করতে লাগল, একটা শিক্ষিতা ভদ্রবংশের মেয়েরই সঙ্গে ছেলেরা মিশছে এতে আর খারাপ কী আছে—এতে বরঞ্চ তাদের উপকারই হচ্ছে। ওই টুকুই বাহিরাবরণ—ওই টুকুই মোহ, আশ্রমের ধার করা মুখোস। ওরই অন্তরালে যা আছে তার কদর্য্যতার দিকে চাইলে শিউরে উঠতে হবে ভয়ে ঘৃণায়।…এই ছেলেরা সবাই ছাত্র—সুতরাং এদের হাতে বিশেষ রস নাই—শুধু ছোকড়া মাত্র সার। এদের করলে সে ইঙ্গিতের দাস—কৃপার পাত্র। এরা রইলো তার আদেশ পালনের অপেক্ষায়।

যে-সব পরিবারের লোকেরা সুমতির সঙ্গে কথা বলতে একদা ঘৃণা বোধ করতো তারা আজকাল তাদের বাড়ীতে সুমতির

উপস্থিতি বিশেষ আপত্তির চক্ষে দেখে না। কারণ সে আণ্ডার গ্রাজুয়েট—অধিকন্তু মাষ্টারণী। কিন্তু তারা জানে না (ঈশ্বর তাদের বোঝবার সুবুদ্ধি দিন)—যে কোনো দুষ্কার্য্য তার দ্বারা সংঘটিত হতে পারে।

শহর থেকে একটা যুবকের সম্প্রতি আমদানী হয়েছে ওদের বাড়ীতে। ওর ছোটো ভাইএর বন্ধুরূপে পরিচিত হয়ে দিদির প্রণয়াস্পদের স্থান দখল করেছে। সেই আজকাল হিতমপুর থেকে তাকে রাধানাথপুরে নিয়ে আসে। দু'জনে যখন রাস্তা দিয়ে চলে মনে হয় মাণিক-জোড়, এক বৃন্তে দুটি ফুল। তাকে না হলে সুমতির একদণ্ড চলে না। অধুনা থিয়েটার, বায়স্কোপ ইত্যাদিতে নিয়ে যাবার সেই একমাত্র সঙ্গী। রাধানাথপুরের বাড়ীতে 'রামায়ণ গান', কেষ্ট যাত্রা' হলো এই যুবকটির প্রদত্ত অর্থে,—নাম হলো সুমতির। সকলে ধন্য ধন্য করলে সুমতিকে। সে এনে দিলে কাপড়—সুমতি সেই কাপড় বখসিস্ দিয়ে সকলের জয়ধ্বনি লাভ করলে। সেই আজকাল সুমতির অর্থের বাহক।

সুমতি বি এস-সি পরীক্ষা দিয়ে হাঁপ ছাড়লে। মনে তার খুসির সপ্ত সাগর, এবার আশ্রমবাসীদের দেখিয়ে দেবে তার অপরাজেয় শক্তি।

ছ'মাস ছুটি। দেখতে দেখতে ছুটির কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেল। সুমতি যথা দিনে চাকরীতে হাজির হয়ে সাশ্চর্য্যে দেখতে পেলে তার স্থানে একজন পুরুষ শিক্ষক নিযুক্ত হয়ে কাজ করছে। হেড মিষ্ট্রেস্ বুদ্ধিমতীর মত কাজ করেছেন। বোর্ডিং ছেড়ে রাত্রিতে বাইরে বাইরে অনাত্মীয় যুবকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর নজির দেখিয়ে তিনি উপরওয়ালাদের কাছে লিখে সুমতির স্থানে পুরুষ শিক্ষক নিযুক্ত করিয়েছেন। কারণ, পুরুষ শিক্ষকের বোর্ডিংে থাকবার প্রয়োজন হবে না এবং তাতে দু জনের মধ্যে মনোমালিন্যেরও কারণ ঘটবে না—ইহাতে ভবিষ্যতে হেড্-মিষ্ট্রেসের নিজের চাকুরিটি নিরাপদ হয়ে রইলো।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। কলেজ ইস্কুলের তখনও গ্রীষ্মাবকাশ চলছে। প্রফেসার বীরেশ্বর—অধ্যাপক বীরেশ্বর—বেচারী বীরেশ্বর ছুটিতে কলকাতায় এসে অবধি সুমতির বিরহে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হায় মন্দভাগ্য অধ্যাপক, তুমি তো জানো না, সুমতির জীবনে তুমি একা এবং অদ্বিতীয় নও।

নির্বোধ বীরেশ্বর সুমতির জন্যে শেষ অবধি প্রায় পাগল হবার মতন হয়ে উঠলো। তার এই অবকাশ দিলে তাকে চাই-ই। সে জানতো সুমতির এখন

বেকার জীবন, সুতরাং চাকরীর লোভ দিলে সহজেই কার্য্যসিদ্ধ হবে। সুতরাং সেই ফন্দি করে একটা চিঠি লিখে ওকে আহ্বান জানালো। প্রেমিক বীরেশ্বর—ব্যাচেলার বীরেশ্বরকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

কর্ণোয়ালিস কলেজের প্রফেসারদের সঙ্গে সুমতির এইবার প্রথম প্রেম নয়। এর আগে আই এস-সি পড়বার সময়ে কোন্ এক ডিমনস্ট্রেটার নাকি তার রূপে মুগ্ধ হয়ে একটা প্রেমপত্র ওকে লক্ষ্য করে লিখেছিল এবং মনের উত্তেজনায় ওকে নাকি দিয়েই দিয়েছিলো। চিঠিটা অবশ্য সুমতি হজম করে ফেলতো যদি না ওর কোনো সঙ্গিনী সেটা দেখে ফেলতো। সেই চিঠিটা নিয়ে ছেলেদের আর মেয়েদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের ভাব দেখা গেল। একটা গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় দেখে ঐ কলেজেরই একজন বিশজ্ঞীক পি এইচ ডি অধ্যাপক তাকে বিয়ে করতেও রাজী হয়েছিলেন, কিন্তু সুমতি দেখলে বেগতিক, বিয়ে করলে তার স্বাধীনতা হবে খর্ব্ব। মন্দভাগ্য সুমতি—নিতান্ত ওর সহপাঠিনী বন্ধু দেখে ফেলেছিল তাই সে দায়ে পড়ে চিঠির কথাটা প্রকাশ করতে বাধ্য হলো, তা না হলে মেস-প্রবাসী ডিমনস্ট্রেটারের মতন শিকারটা সে কিছুতেই হাত ছাড়া হতে দিত না। বাইরে মোরালিষ্ট মেয়েদের মতন ও অভিনয় করলে বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ওর অনুতাপের অবধি রইলো না। এ দিকে পি এইচ-ডি মহাশয় সুমতির অতীত জীবনের কাহিনী শুনে শেষ অবধি পিছিয়ে গেলেন।

অধ্যাপক বীরেশ্বরের চিঠি পেয়ে সুমতি তার ছোট ভাই চিত্তমোহনকে সঙ্গে নিয়ে হ্যারিসন রোডের একটা হোটেলে এসে উঠলো। বীরেশ্বর আর সুমতি পরামর্শ করে একদিন পরে চিত্তকে দেশে পাঠিয়ে দিলে।

এখন রইলো শুধু বীরেশ্বর আর সুমতি—একা একা দুইজন (!) দুইটি কুমার কুমারীর 'কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব।' আপনারা হয় তো বলবেন, এতে দোষ কী হতে পারে? আমরাও বলি এতে অপরাধ কিছুমাত্র নাই।

ইতিমধ্যে সিনেট হাউসে বি-এস-সির রেজাল্ট টাঙিয়ে দিলে। সুমতির কৃতকার্য্য হবার খবর তাতে নেই জানতে পারা গেল। চাকরিটা যাওয়ায় ওর চিত্তটা পূর্ব্বাবধিই ক্ষুণ্ণ ছিলো, এক্ষণে ফেল হয়ে নিরাশায় ক্ষোভে যেন ফেটে পড়বার মতন হলো। অতিকষ্টে অশ্রু সম্বরণ করে বীরেশ্বরকে বললে, "বন্ধু, এবার আমি দেশে যাবো।"

বীরেশ্বর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অতি আধুনিক কায়দায় সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে, "প্রেয়সী, প্রিয়তমা নীতি তোমাকে যে বিদায় দিতে মন চায় না। আমি ভেবেছিলুম কলেজ না খোলা পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাকবে। কলেজ খুললে তোমাকে সাথে নিয়ে একত্রই যাবো। আর কটা দিন অপেক্ষা করো না।"

সুমতি ব্যথাতুর কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করলে, "আমার কি অনিচ্ছা বলো। চিত্তমোহন আজ প্রায় অনেক দিন বাড়ী গেছে, এদিকে চাকরী যদি যোগাড় হতো তা' নয় থাকা যেত। বাড়ীর সকলে জিজ্ঞাসা করলে কী বলবো। তা থাকুক, আজকেই রাত্রের গাড়ীতে আমি বাড়ী যাই।"

"যাবেই? তুমি যাবেই? হায় নিষ্ঠুরা নারী (রীতিমত নাটকীয় কায়দায়) তা-ও আবার আজকেই! আজকের রাত্রিটা অন্ততঃ থাকো, মধু-যামিনী যাপন করি। তুমি গেলে দিন গোণা সুরু হবে আমার।" বলে বিহ্বল সুমতিকে দু' হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে' দুটি কপোল চুমোয় চুমোয় আচ্ছন্ন করে ফেললে।

এর দুদিন পরে বাড়ী ফিরে সুমতি বললে, "হাঁ, ঐ চাকরীর জন্যে উনি আবার চিঠি লিখেছিলেন! অত কম মাইনের চাকরী কেউ করে নাকি! মাত্তর নব্বই
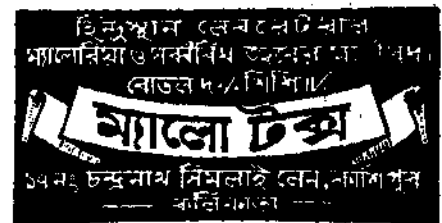
টাকা—এই কটা টাকার বিদেশে থাকা কি যায় কখনো! ইস্কুলের সেক্রেটারী বীরুবাবুর বন্ধু কিনা, অনেক সাধাসাধি—তোমাদের ছেড়ে ঐ বিদেশে থাকতে হবে মনে করতেই চোখে জল এলো মেজ মাসিমা। উনি যত সাধাসাধি করেন—তোমাদের কথা তত আমার মনে পড়ে। শেষ অবধি বললেন যে, এখন একশো টাকা অবধি দিতে পারেন, পরে বেশি করে দেবেন। আমি কিন্তু একেবারে স্পষ্ট জবাব দিয়ে এসেছি। চাকরি করতে হলে এই জেলার বাইরে আমার পোষাবে না, তা তোমাকে বলে রাখলুম মাসিমা!"

মাসিমা বললেন, "সে তো সত্যিই, তোর মতন একটা মেয়ে কলকাতেই বেশি আছে নাকি! এদিকে যেমন তেমন কিছু যোগাড় করে মনে যা আছে করিস্। হেড মিস্ট্রেস্ যেমন তোর চাকরি নষ্ট করেছে তেমনি তারটাও তুই ছাড়াবি—জানলি। তা এখানে একটা মাষ্টারী খালি আছে। রাধানাথপুর ইস্কুলে সকাল বেলার দিকে ওরা মেয়েদের একটা ক্লাস খুলেছে সে কথা তো জানিস্। ওরা বলছিলো তোর কথা, তুই কি করবি?"

"ও! ইয়েস্ এক্ষুনি। উপস্থিত কত দেবে?"

"সবে আরম্ভ করেছে—এখন চোদ্দ পনেরো টাকা দিতে পারে—ছাত্রী বেশি হলে মাইনে বাড়াবে।"

"বেশ, তুমি এক্ষুণি সেক্রেটারীর বাড়ী একবার যাও মাসিমা, আমি রাজী।

এইখানেই আশ্রম বিতাড়িত নারীর জীবনের একটা যবনিকাপাত করা যাক্।

গোড়ায় গলদ

ডাঃ কালিপদ মুখার্জ্জি

বাঙালীর শারীরিক দুর্ব্বলতার কথা আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমে মনে হয়—এ রোগের গোড়া কোথায়? রুগ্ন, রোগক্লিষ্ট মাতার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই শিশু যে আবেষ্টন আবহাওয়ার মধ্যে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহাতে নবজাত শিশুর শরীর পুষ্টির প্রচুর অভাব ঘটে। এই অভাবের জন্য বাহিরের সহস্র সহস্র রোগবীজাণু ঐ দুর্ব্বল দেহের মধ্যে সহজে প্রবেশ লাভ করে, এবং সময় মত আত্মপ্রকাশ করিয়া শিশুকে মৃত্যুর দ্বারে লইয়া যায়। রুগ্ন মাতার শুষ্ক স্তনে যথেষ্ট দুধের অভাব বশতঃ শিশু আহার্য্য পায় না। দিনে দিনে শিশুর ত্বক শুষ্ক ও কুঞ্চিত হয় দেহ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে, অস্থি শক্ত হয় না বলিয়া শিশু দাঁড়াইতে পারে না, দাঁত উঠিতে বিলম্ব হয়, কথা বলিতে আড়ষ্টতা আসে। শৈশবেই যদি শিশু এই সকল স্বাস্থ্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হয়, তবে কি করিয়া সে যৌবনে স্বাস্থ্যবান ও উপার্জ্জনক্ষম হইবে? মাতার নিজ স্বাস্থ্য অবহেলার জন্য শিশুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল।

জীবনের প্রতি পদে শত সহস্র ভীষণ রোগবীজাণুর সহিত প্রতিনিয়ত মানব-দেহের যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার অন্ত নাই। এই সমস্ত বীজাণু, লোকের অগোচরে দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ইহা জয় করিতে হইলে দরকার শুধু অধিক সতেজ রক্তকণা, ইস্পাতের মতন দৃঢ় স্নায়ুমণ্ডলী, আর সবল দেহ। রোগ নিপীড়িত বাঙালী জাতিকে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সমকক্ষ হইতে হইলে প্রথম ও সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় জিনিষ এই স্বাস্থ্যসম্পদ। বর্ত্তকালে প্রতিবৎসরে বিশেষতঃ ম্যালেরিয়ার প্রাবল্যহেতু রোগীরা রক্তহীন, অকর্ম্মণ্য ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

বহু বৎসর গবেষণার ফলে 'রচিটোনের' আবিষ্কার হইয়াছে। 'রচিটোন' ম্যালেরিয়ার পুনরাক্রমণকে দমন তো করেই, অধিকন্তু মাতাকে সবল করে, স্বাস্থ্যের পুনর্গঠন করে, স্তন্যদুগ্ধ বৃদ্ধি করিয়া শিশুকে প্রচুর আহার যোগায় এবং দেহে নব জীবনীশক্তি আনিয়া দেয়। 'রচিটোনের' উপাদানগুলির অদ্ভুত ক্রিয়াশক্তিতে নূতন রক্তকণার সৃষ্টি হয়, স্নায়ুমণ্ডলী পুষ্ট ও সতেজ হয়। অদ্ভুত ও চমকপ্রদ অথচ দ্রুত কার্য্যকারিতা হিসাবে 'রচিটোনের' সমকক্ষ টনিক আর নাই।

ছায়া ও কায়া

শ্রীমধু বসু

স্টার নাট্য মন্দির

শরৎচন্দ্রের অচলার সম্ভবতঃ সঠিক ভূমিকালিপির পরিচয় এবার দিতে পারলাম, যথা—

কেদার—শিশির ভাদুড়ী, সুরেশ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, মহিম—শৈলেন চৌধুরী, মৃণালের স্বামী—হীরালাল দত্ত, রামবাবু শীতল পাল, বদু—পঞ্চানন বন্দ্যোঃ অচলা—কঙ্কা, মৃণাল—রাণীবালা, হরির মা—রাধারাণী প্রভৃতি। ভাদুড়ী মশায় শেষ পর্য্যন্ত কেদারকেই বেছে নিয়েছেন দেখে সুখী হলাম।

নাট্য নিকেতন

গত ৫ই আগষ্ট 'আলাদীন' অভিনীত হয়ে গেছে, বারান্তরে বিস্তারিত বিবরণ জানাব।

রঙমহল

অনেক কথাই এদের সম্বন্ধে শোনা যাচ্ছে—সঠিক না জেনে চুপ করে থাকাই সঙ্গত মনে করি। 'নন্দরাণীর সংসার' কোন পর্য্যন্ত যে অভিনীত হবে তা কপি লেখার সময়েও ঠিক জানি না। ভূমিকালিপির কিন্তু অদল বদল হয়েছে—আশা করা যায় বইখানা ভালই হবে। প্রযোজনা করেছেন মিঃ সতু সেন।

মিনার্ভা

চন্দ্রগুপ্তর শততম অভিনয় রজনী গত বৃহস্পতিবার ৩০শে জুলাই পূর্ণ হয়ে গেছে। বন্যার জনপ্রিয়তার পরিচয় এথেকেই পাওয়া যাচ্ছে। মহাপূজার পূর্ব্বে এখানে নতুন নাটক অভিনীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

রূপ মহল

হঠাৎ বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল রূপমহলে 'নারী প্রগতি' ১লা আগষ্ট অভিনীত হবে। ঐ তারিখে অভিনীত হয়ে গেছে কিনা তা জানান গেল না—হয় যদি তো সবই জানাব।

দায়ী কারা?

গত সপ্তাহে এ সম্বন্ধে যা লিখেছি তা নিয়ে ইতি মধ্যেই বেশ আলোচনা সুরু হয়ে গেছে। কেউ কেউ জানিয়েছেন—এজন্য কি দর্শকেরাই দায়ী নন? আমরা তো দর্শকদের দোষ নয় তা বলিনি, দর্শকেরা যদি প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ নট-নটীদের শক্তির বিকাশ দেখতে চান অল্প বয়স্ক পাত্র পাত্রীদের মধ্য দিয়ে তাহলে কর্তৃপক্ষদের দোষ কোথায়? বঙ্গ রঙ্গালয়ে আজ নতুন এমন একটী শিল্পীও চোখে পড়ে না যাদের নামে দর্শকগণ ছুটবেন—সেই ভূতপূর্ব্ব আর্ট থিয়েটার ও নাট্যমন্দির হতে যে কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রী নাম করেছিলেন তাদের নিয়েই এ পর্য্যন্ত চলে আসছে—সেই নাট্যাচার্য্য শিশির ভাদুড়ী আজও নিয়মিত ভাবে অভিনয় করে যাচ্ছেন, কিন্তু তার সেই অভ্যাচার্য্য শিক্ষাদানের ক্ষমতা আজ হয়তঃ নিঃশেষ হয়ে গেছে। যাঁর কাছ হতে বিশ্বনাথ, রবি রায়, মনোরঞ্জন, শৈলেন, তুলসী বন্দ্যোঃ, প্রভা, নব চংয়ে শিক্ষিতা স্বর্গীয়া কৃষ্ণভামিনী ও চারুশীলা শিক্ষালাভ করে দারুণ জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন সেই শিল্পী স্রষ্টা আজ কোথায়? এই যে নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবার যোগ্য অভিনেতৃর এত অভাব এ সময় কি তাঁর কাছে দাবী করবার কিছুই নেই? নতুন কাউকে তৈরি করবার প্রতি তার কোন দৃষ্টিই নেই। তিনি হয় নিজে না হয়ত প্রিয় শিষ্য-শিষ্যাদের এই সব ভূমিকা দিয়েই নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটিয়ে চলেছেন। অভিনেতৃর এত অভাব আর কখনও হয়েছে বলে স্মরণ হয় না।

ফিল্ম-জগতও এভাবেই চলেছে—রঙ্গমঞ্চের নট-নটীদের নিয়েই চিত্র কর্ত্তারা কোন মতে চালিয়ে নিচ্ছেন। এক সময় দেখা গেছিল সুদর্শন ধীরাজ ভট্টাচার্য্য ছাড়া আর যেন কেউই নেই। ধীরাজের চেহারা তবু ভাল ছিল—দুলালের মুখশ্রী মোটেই দৃষ্টি সুখকর নয়। তবু এদেরই নামাতে হবে।

তবে মনে হচ্ছে হাওয়া বদলাচ্ছে, অন্ততঃ তার পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যাচ্ছে। রঙ্গালয়গুলির মধ্যে এ বিষয়ে নাট্য-নিকেতন সব চেয়ে অগ্রণী—তাদের বর্ত্তমান প্রযোজক শ্রীসুধীর গুহের নতুন শিল্পী সংগ্রহের চেষ্টার অন্ত নেই—নামজাদা শিল্পী সংগ্রহে তিনি যেমন সিদ্ধহস্ত নতুন মুখের সহিত পরিচয় করাতেও তার চেষ্টার অন্ত নেই। দুঃখের বিষয় এই সব নবাগতদের মধ্যে এমন একজনও চোখে পড়ে নি যার ভবিষ্যত উজ্জ্বল বলে ধারণায় আসতে পারে। এজন্য দায়ী এই সব কর্তৃপক্ষেরাই—কারণ তাদের নির্ব্বাচন

প্রায় সময়েই যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখে হয় না বলে শোনা যায়। আমরা কোন-মতেই বিশ্বাস করতে পারি না যে বাংলা দেশে প্রতিভাবান নট বা নটীর অভাব হয়েছে।

নিউ থিয়েটার্স

হিন্দি 'মঞ্জিল' গত ৩১শে জুলাই হতে উত্তর ভারতের কয়েকটী হাউসে প্রদর্শিত হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের এই উপন্যাসটীর চিত্ররূপ ওদের দর্শকদের কাছে সমাদৃত হবে বলেই আশা করি।

শৈলজানন্দের গতি হয়েছে, তবে শুনলাম তার অনাথ আশ্রমের শুধু কাঠা-মোটুকুই রাখা হয়েছে আর সবই ঢেলে সাজা হয়েছে। সেজেছেন তরুণ প্রয়োগ-শিল্পী হেমচন্দ্র চন্দ্র। বইখানা উত্তর ভাষায় চিত্রান্তরিত হবে, ভূমিকায় নিউ থিয়েটার্সের নামজাদা নট-নটীরা সবাই নামবেন। হিন্দি খানার কাজ নাকি আগে আরম্ভ হবে, তার পর হবে বাংলা সংস্করণ।

হেমচন্দ্রের প্রথম ছবি হিন্দি 'ক্রোড়-পতি' আগামীকাল হতে নিউ সিনেমায় প্রদর্শিত হবে। ছবিখানি উত্তর ভারতে আশাতীত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গানগুলি নাকি এর সম্পদ। যাহোক পারি তো বিস্তারিত বিবরণ আগামীবারই জানাবার চেষ্টা করবো।

পরিচালক প্রফুল্ল রায় সুস্থ হয়ে পুন-রায় ষ্টুডিয়োতে ফিরে এসেছেন। নতুন ছবির জন্ত তিনি মাথা ঘামাতে সুরু করে দিয়েছেন। তার 'পূজারিণ' নাকি সর্ব্বত্রই প্রশংসা লাভে সমর্থন হচ্ছে।

'গৃহদাহ' সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে চিত্রায় দেখবার ব্যবস্থা হচ্ছে। ছবিখানা ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্যের সঞ্চার করেছে।

প্রফুল্ল পিকচার্স

বাংলা 'মা'র হিন্দিরূপ পাইওনীয়র ষ্টুডি-য়োতে গৃহীত হয়েছে। পরিচালক প্রফুল্ল ঘোষ এর স্বত্বাধিকারী বলে শোনা যাচ্ছে। ইনিই বাংলাখানারও পরিচালনা করেছি-লেন—আশা করা যায়, হিন্দিখানা বাংলার চেয়ে ভাল হবে। এর ভূমিকা নির্ব্বাচন অতি চিত্তাকর্ষক ভাবে হয়েছে। যথা—অরবিন্দ ও অজিত—জাল মার্চ্চেণ্ট, মনোরমা—জুবেদা, ব্রজরাণী—কাননবালা। প্রত্যেকটী শিল্পী সারাভারতে জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়েছেন, সুতরাং ভাল হবে বলে আশা করা অন্যায় হবে না। পিতা অরবিন্দ ও পুত্র অজিতের দ্বৈত ভূমিকায় বিখ্যাত সুদর্শন পার্শী নট জাল মার্চ্চেণ্ট নেমেছেন—এরূপ ব্যাপার উল্লেখ-যোগ্য নিশ্চয় যদি ক্যামেরাম্যান যোগ্য-ভাবে ছবি নিতে পারেন।

কালী ফিল্মস্

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর নিজস্ব তত্বাবধানে কালী ফিল্মসের পরবর্ত্তী বাংলা চিত্র 'টকী অব টকীজে'র চিত্র গ্রহণ আরম্ভ হয়ে গেছে। গত ১৯শে জুলাই তারিখে এই ছবি তোলবার জন্ত ক্যামেরার হাতল প্রথম ঘুরেছে, কারণ ঐদিন নাকি শুভদিন ছিল। গাঙ্গুলী মশায় আগষ্ট মাসের শেষেই ছবিখানি সাধারণ্যে দেখাবেন বলে স্থির করেছেন। এই জন্তে গাঙ্গুলী মশায় এখন অন্ত সব কাজ বন্ধ রেখে রোজ 'টকী অব টকীজে'র ছবি তোলাচ্ছেন।

এবারকার আই, এফ, এ শীল্ডের সেমী-ফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলার ছবি তোলার স্বত্ব এরাই নিয়েছেন। এ বছর 'চীনা বনাম ভারত' আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচের ছবি এরা দেখিয়েছেন। এইবার এরা আই, এফ, এর সেমী ফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলার টপিক্যালও দেখাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

ভারতলক্ষ্মীর "বাঙ্গালী"

বহু প্রতীক্ষার অবসান করে এবার 'বাঙ্গালী' সত্য সত্যই মুক্তিলাভ করছে। আগামী ১৫ই আগষ্ট শনিবার উত্তরায় শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের করুণ রসাত্মক চিত্র বাঙ্গালী মুক্তিলাভ করবে। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীযুত চারু রায় এবং ভূমিকায় আছেন শ্রীযুত মনোরঞ্জন ভট্ট, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, তুলসী লাহিড়ী, শরৎ চট্টোঃ, মণি ঘোষ, সুবোধ মুখার্জ্জি, ভানু রায়, সমর রায়, কার্ত্তিক রায়, মীরা দত্ত, কমলা (ঝরিয়া), চারুবালা, মনোরমা, পদ্মাবতী, মালকাজান প্রভৃতি। এই সঙ্গে দেখানো হবে হাস্যরসাত্মক ছবি "বেজায় রগড়"। পরিচালনা করেছেন তুলসী লাহিড়ী এবং অভিনয় করেছেন, তুলসী লাহিড়ী, কৃষ্ণধন, নগেন্দ্রবালা, উষাবতী (পটল)।

ওরিয়েন্টাল কিনেমেটোন আর্টিস্

আর কয়েকদিনের মধ্যেই এদের রামকান্তের শুটিং শেষ হয়ে যাবে। রামকান্তের ভূমিকালিপি এইরূপ:—রামকান্ত—ফণি বিদ্যাবিনোদ, মিঃ গ্রাল্প—রাধিকানন্দ মুখোঃ, পুরোহিত—তুলসী বন্দ্যোঃ, উড়িয়া রামকান্ত—আশু বসু, উড়িয়া ভগবান—তারক বাগচী, হীরা—প্রফুল্ল দাস, মাণিক—অনাথ চক্রবর্ত্তী, জহর—জিতেন চৌধুরী, দস্যু সর্দার—ধীরেন পাত্র, দস্যু—প্রকাশ মিত্র, চরণ-দাস—তিনকড়ি ভট্টাচার্য্য, পটলী—শ্রীমতী সুরমা, সাবিত্রী—শ্রীমতী প্রভাবতী (বেবিও), ঝি—উষারাণী, মিসেস গ্রাল্প—রোজি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান মিঃ কৃষ্ণগোপাল বি, এস, সি, সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়ায় যোগদান করেছেন। তিনি বর্ত্তমানে ভীম 'প্রতিজ্ঞা' নামে শালেমের শালেম ফিল্মস্ লিঃ-এর তামিল ছবি তুলেছেন—ছবিখানি এই ষ্টুডিয়োতে তোলা হচ্ছে।

চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় ক্যামেরাম্যান প্রবোধ দাস এই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। প্রবোধবাবু অল্পদিনের মধ্যেই যেরূপ সুনাম অর্জ্জন করেছেন, তাতে তাঁকে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ভবিষ্যৎ উন্নতি করতে দেখলে আমরা খুশী হবো।

স্বত্বাধিকারী এবং জেনারেল ম্যানেজার মিঃ গোস্বামীর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে 'সোনার সংসারে'র চিত্র গ্রহণ কার্য্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। গত সপ্তাহে একটা বড় হাসপাতালে নার্সিং হোমের একটী দৃশ্য সুষ্ঠুভাবে তোলা হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কৃষ্ণচন্দ্র দে খুব মাথা ঘামাচ্ছেন এবং তিনি পশ্চাৎপট সঙ্গীতে অভিনবত্ব সঞ্চারের চেষ্টা করছেন।

রজনী

এ সপ্তাহের আকর্ষণ রূপবাণীতে—রজনী। দেবদত্ত ফিল্মসের প্রথম বাংলা ছবি রজনী—বঙ্কিমচন্দ্রের অন্ধ মানস কন্যা রজনী ৮ই আগষ্ট তারিখে রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করবে। রজনী ইতিমধ্যেই সর্ব্বত্র আগ্রহের সঞ্চার করেছে। রজনী পরিচালনা করেছেন—জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভূমিকায় আছেন, অহীন্দ্র চৌধুরী, রবি রায়, মৃণাল ঘোষ, চারুবালা, রেণুকা রায়, ইলা দাস প্রভৃতি। আলোকশিল্পী—গীতা ঘোষ এবং শব্দযন্ত্রী—সমর ঘোষ।

—————

"সুধার সাথে গরল-উগারী তোমরা নারী"

[বড় গল্প]

শ্রীরামেন্দ্র কুমার দেশমুখ্য

অপ্রকাশ বস্তুতান্ত্রিক নয় ; সে কবি—কাব্য রচনা করে। কাজেই সেণ্টিমেণ্টাল। ওর কাব্যের আইডিয়া নাকি কারো ছাঁচে গড়া নয় ; তা'তে আছ স্বাতন্ত্র্য, নূতনত্ব। কাজেকাজেই সে এক হিসেবে স্রষ্টা।

আকাশে মেঘের পর মেঘ, নিরন্ধ্র ওরা মারণ-মন্ত্র জপ্‌ছে। সে জপ্ শুধু মর্ত্ত্যলোকের অধিবাসীদের জন্যে নয় শূন্যলোকের অচঞ্চল সূর্য্যের জন্যেও। সূর্য্যের নিকট বাণী যদিও পৌঁছাচ্ছিল,—"ভেদ করো, ভেদ করো এই পুঞ্জীভূত মৃত্যু" ; তবু সত্যিকার ভেদকরা তখনকার মত সূর্য্যের নিকট অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পদ্মপত্রির তাই হয়ত মৃত্যুর মত মেঘান্তরালের রহস্যময় সেই অন্ধকারায় বসে লুকিয়ে কাঁদা বা দুশ্চিন্তার অন্ত ছিলনা।

অপ্রকাশ ওর স্বতন্ত্র কোঠায় বসে জানালার মধ্য দিয়ে সূর্য্যের এই জীবনযুদ্ধ দেখছিলো। টেবিলের ওপর একখানা অলস হাত রেখে সে চুপ করে বসে রয়েছিল। অন্তরে হয়ত নানা ছন্দে গান জেগে উঠছিলো, কিন্তু সে সব বাণী পাচ্ছিল না। জলের নীচেকার শব্দের মতই ওরা পথ না পেয়ে ভেতরে ভেতরে গুমরে মরছিল। হাতখানা এক অবস্থায় থাকতে থাকতে অবশ হয়ে পড়েছিল। অপ্রকাশ সেটী একবার তুলে ধর্ত্তে চাইলে, কিন্তু পারলে না।

ট্রে'তে করে তিনকাপ চা নিয়ে ছোট বোন রাকা এসে ঘরে ঢুকলো। অপ্রকাশ একবার চেয়ে দেখলে শুধু, তারপরই আবার জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। অসতর্ক মুহূর্ত্তে হয়ত অন্তর মথিত করে দীর্ঘশ্বাস প্রকাশ পেল। রাকা টেবিলের ওপর চা রেখে ডাকল,—দাদা। বেদনা-ক্লিষ্ট মুখখানি ফিরিয়ে অপ্রকাশ ওর দিকে সোৎসুক দৃষ্টি প্রেরণ কর্লে।

—আচ্ছা, দাদা, তুমি ত' দিনদিনই শুকিয়ে যাচ্ছ, একবার চেঞ্জে যাও না কেন ?

অপ্রকাশ কোন উত্তর দিলে না।

—চেঞ্জে যদি না যাও, যেওনা ; কিন্তু কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওনা কেন ? এখানকার রুদ্ধ বাতাস, আবেষ্টনীর কৃত্রিমতা তোমাকে এমনধারা কাহিল করে তুলেছে হয়ত'। অন্য কোথাও, যেখানটায় কলকাতার মত এমন করে বন্ধুর প্রাচীরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রাণ নিষ্পেষিত হয়না, সেখানে যাওনা কেন ? ভালকথা, সেদিন তো মাসীমা চিঠি দিয়েছেন ওর ওখানে যেতে। ঘুরে এসো না একবার সেই সিলেট থেকে। সেখানে যেতে তো কোন আপত্তি নেই তোমার ?

অপ্রকাশ বল্লে,—না।

আনন্দ ঘন দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রাকা বল্লে,—তা'হলে বেশ হ'বে দাদা। সেখানেই তুমি দিন কয়েকের জন্যে যাও। মাসীমারও কথা রইল, আর তোমারও স্বাস্থ্যের কিছু পরিবর্ত্তন হ'বে নিশ্চয়। তারপর হঠাৎ চমকে ওঠে বল্লে,—বা-রে চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল; আমি যে কী হয়ে উঠেছি দাদা, কিছুই মনে থাকে না।

অপ্রকাশ একটু ধীরে হেসে বল্লে,—আচ্ছা, আপাততঃ এখন পরিবেশন এবং ভাগাভাগির কায শেষ করে নে।

রাকা সস্মিত বদনে হু'কাপ চা এগিয়ে দিয়ে তৃতীয়টী নিজের জন্যে রেখে দিল।

অপ্রকাশ হেসে বল্লে,—আনুসঙ্গিক কিছু নেই নাকি রে?

রাকা বল্লে,—বা-রে তুমিই ত' বলেছ, বাদলাদিনে একমাত্র চা ছাড়া অন্যকিছুই উপভোগ্য নয়?

অপ্রকাশ স্মিতমুখে বল্লে,—হ্যাঁ, ঠিক!

* . *

—অপ্রকাশ একদিন মাসীমা বা মেসো মশায়কে না জানিয়েই অতর্কিতে সিলেট এসে পৌঁছল। কোর্টের কিনারেই ওর মাসীমার বাসা। স্থান সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকায় অনেক বেগ পেতে হ'ল বাসা খুঁজে বের কর্ত্তে।

পরের দিন বিকেলের দিকে অপ্রকাশ ড্রইং রুমে বসে আছে। দলে দলে ছেলে মেয়েরা রাস্তা দিয়ে বেড়াতে চলেছে। বয়োজ্যেষ্ঠদেরও সংখ্যার অভাব নেই। তবে কমবয়সীদের দলই ভারী। অপ্রকাশের আশ্চর্য্য লাগল ওদের ভ্রমণকালীন বেশ-ভূষা দেখে। সে তো চিরদিনই ঢিলা জামা গায়ে দিয়ে বেড়িয়ে আসছে; আর এখানটায় এসে কি দেখলে, সার্ট, কোট মায় ভারী চাদর পর্য্যন্ত গায়ে জড়িয়ে হাওয়া লাগানো। যে বাতাস ওরা সেবন কর্ত্তে চলেছে, তা'কে-পাওয়া এমতাবস্থায় অসম্ভাব্য নয় কি? অপ্রকাশের মনে হ'ল, ছেলেবেলায় সুদূর এক পল্লীঅঞ্চলে দেখে এসেছিল হাস্যোদ্রেকী এক ব্যাপার। তারা পুকুর খুব কম করে খুঁড়েই (বলা চলে একরূপ না খুঁড়েই) গঙ্গা-আবাহন সুরু করে দিয়েছিল। আসবার পথ না দিয়ে শত আবাহন করাতেও গঙ্গা উত্থিতা হলেন না। অপ্রকাশের মনে হ'ল এখানেও প্রায় সেই অবস্থা। বাতাস আস্‌বার পথ বন্ধ করে ওকে পাওয়ার কামনা।

অপ্রকাশ চিন্তার খেই হারিয়ে ফেল্লে আচমকা, মেয়েদের হাসির শব্দে। সে চমকে ওঠে দেখলে মন্থর গতিতে অল্প অল্প দোল খেতে খেতে একদল মেয়ে এগিয়ে চলেছে। অপ্রকাশের দিকে কেমন করে বড় মেয়েটীর দৃষ্টি মিলে গেল। কাহিল, বেচারা আরো কাহিল হয়ে উঠল, যখন এক ঝলক হাসি বেরিয়ে এল মেয়েটীর অন্দর হ'তে দাঁতের চত্বর পেরিয়ে ঠোঁটের তোরণ বেয়ে।

মেয়েরা চলে গেল। অপ্রকাশ বাইরে এসে দাঁড়াল। ডা-করা চোখ দুটা দিয়ে ভাল করে চেয়ে দেখলে ওরা পথ বেয়ে সুধীরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। অপ্রকাশের অন্তর হ'তে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। অপ্রকাশ বস্তুতান্ত্রিক নয়, সে কবি—কাব্য রচনা করে। কাজেই সেন্টিমেন্টাল, ওর কাব্যের আইডিয়া নাকি কারো হাতে গড়া নয়। সে ওর আইডিয়ার জোরে হাসি-টাকে তুলনা দিলে গোমুখী-নিঃসৃত গঙ্গার সদ্যজাত ধারার ন্যায়। ও হাসির মধ্যে, যে গঙ্গার আজ উৎপত্তি হ'ল (বা হ'বে) তা' সমস্ত জনপদকে না হোক অন্ততঃ ওর প্রাণ শীতল এবং উর্ব্বর করে দেবে।

সন্ধ্যে হয়ে এল। অপ্রকাশ আর বাসার ভেতর গেল না। সে বাইরে রইল দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণপক্ষের প্রথমদিকটা। তাই সন্ধ্যের সময় চাঁদ উঠল না। ইলেকট্রিক আলোর তরঙ্গ দূর থেকে যা ভেসে আসছিল, অন্ধকারকে তরল করার পক্ষে তাই ছিল যথেষ্ট। অপ্রকাশের মনটা বেশ লাগল। রোমান্সের সাধনার জন্যে ওর মন প্রাণ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। সে ভেবে রাখলে যতবড় এবং কঠিনই হোক না কেন সাধনা—সে করবেই কর্বে।

ওরা ফিরে এল। নীলাকাশের বুকে দূরে-যাওয়া বলাকাশ্রেণী যেন ওরা।

আকাশে বাতাসে তরঙ্গ তুলে নীড় প্রত্যাগত হ'বার জন্তে ওদের যত প্রয়োজন এবং আয়োজন। অপ্রকাশ ওদের গতি-ভঙ্গি দেখে মুগ্ধ হ'ল এবং আশ্চর্য্যও হ'ল অনেকখানি। মনে সে খুবই আরাম পেলে যখন দেখলে ওরা ওর পাশের বাসায়ই গিয়ে ঢুকল। অপ্রকাশের মনটা হয়ে উঠল মেঘমুক্ত আকাশের মত হাল্কা। ইতস্ততঃ পাদচারণা গুটিয়ে নিয়ে সে আপন আবাসে ফিরলে।

রাত্রিতে মাসীমাকে জানিয়ে দিলে জায়গাটা ওর বেশ পছন্দ হয়েছে। দেহ এবং মন উভয়ই এর সঙ্গে খাপ খেয়ে যাচ্ছে। কাজেকাজেই মাসখানেক অন্ততঃ এখানে রয়ে যাবে সে।

মাসীমা আশ্বস্ত এবং আনন্দিত হ'লেন। রাত্রিরেই একসময় ওর মাস্তুতো ভা'য়ের নিকট থেকে জেনে নিল ওদের পরিচয়। কলেজে পড়ে বড়টী, আর ওরা স্কুলের রাস্তাতেই এখনো পথ হাঁটছে।

বিছানায় শুয়ে অপ্রকাশ অনুভব কর্ল্লে রাতারাতিই সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাচ্ছে।

পরের দিন সকাল বেলা। রোদ এখনোও ওঠেনি। চারদিক তবুও পরিষ্কার হয়ে গেছে। ঘর থেকে বাইরে এসে সে দাঁড়ালে। সামনে দেখে ওর বর্ত্তমান আনন্দের উৎসকে। সে চোখ বুজে হাতজোড় করে নমস্কার জানালে। প্রনীতি শুধু হাসলে প্রত্যুত্তরে। তারপর 'রাইট টার্ণ' দিয়ে চলে গেল।

সেই হাসিই হ'ল অপ্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট। মেঘ যখন ডাকে, ময়ূর ময়ূরী তখন বনের মধ্যে বর্ণমণ্ডিত পুচ্ছ মেলে নৃত্য করে। অপ্রকাশের মনেও নাচবার ইচ্ছে হ'ল প্রবল। কিন্তু শেষপর্য্যন্ত সে নাচলনা। পেছে হয়ত লোকে বলবে পাগল। বিদেশে এসে এমনধারা অপবাদ মাথায় নিতে সে রাজী হ'লনা।

(২)

অনিমেষ গুপ্ত ছিল অপ্রকাশের বন্ধু। কলকাতায় বি, এ পড়তে ওর সঙ্গে সখ্য-স্থাপন হয়। চিঠির আদান প্রদানে অপ্রকাশ জানত সম্প্রতি সে এই মফঃস্বলের সহরেই আছে। ইচ্ছে হ'ল পুরোণ দিনের বন্ধুকে সহায়স্বরূপে পাশে পায়। অদূর অতীতের স্মৃতি যে আজো তার বুকে নিবিড় হয়ে জাগছে! বন্ধু যে আর ছিলনা—তেমন নয়। কিন্তু অনিমেষ ছিল অন্তরতম বন্ধু। আজ প্রবাসে এসে ওর কথা মনে পড়তেই সে সঙ্কল্প করলে গিয়ে দেখা কর্ব্বে। ঠিকানা জানাই ছিলো। সন্ধ্যার পর খুঁজে খুঁজে গিয়ে সে সেখানে উপস্থিত হ'ল। অনেক ডাকাডাকির পর দোর খুলে গেল। দোর দিয়ে প্রবেশ কর্ত্তেই অনুভব কর্ল্লে—কে একজন পর্দ্দা তুলে তীরের গতিতে পাশের কোঠায় চলে গেল। অপ্রকাশ না দাঁড়িয়ে সামনের কেদারাটায় বসে পড়ল। খানিক-ক্ষণ কেটে গেল নীরবে। আগন্তুক হয়ত' এখনো দাঁড়িয়ে আছে ভেবে নারীকণ্ঠে ভেতর থেকে অনুরোধ এল,—দাঁড়িয়ে রয়েছেন বুঝি বসে পড়ুন,—তিনি এক্ষুণি আসবেন।

অপ্রকাশ একটু হেসে বল্লে,—অনিমেষ কোথায় বলতে পারেন?

নারীকণ্ঠে উত্তর এল,—টুইশানিতে। আধঘন্টার মধ্যেই ফিরবেন। তারপর খানিকক্ষণ চুপ থেকে আবার বল্লেন,—চা তো চলে আপনার?

—না চলবার কোনও কারণ এখনও খুঁজে পাইনি। পি, সি, রায় অবিশ্যি বারণ দিচ্ছেন। কিন্তু ওর বারণ আমি শুনলেও মন শোনেনা।

অপ্রকাশ শাড়ীর খস্‌খসানি শব্দে অনুভব কর্ল্লে—ভেতরের মহীয়সী যিনি, তিনি চলে যাচ্ছেন আরোও ভেতরের দিকে। সে তাই কথা থামিয়ে দিলে।

আধঘণ্টার পর ঘণ্টাখানেক উৎরে গেল। অনিমেষের দেখাই নাই। অপ্রকাশ ভাবলে এবার ওঠা যাক। এর মধ্যে সে দু'কাপ চা ও পান করে নিয়েছিল। অবিশ্যি মেয়েদের হাতের বহন-করা চা নয়। ঠাকুরের এনে দেওয়া।

অবশেষে প্রতীক্ষায় যবনিকা টেনে দিয়ে অনিমেষ এসে ঘরে ঢুকলে। প্রথমে অনিমেষ চিন্তেই পার্লেনা। পরে যখন চিন্‌ল, তখন আনন্দের বান এল উভয়ের মধ্যে।

অনিমেষ সব শুনলে। হেসে বল্লে,—কলঙ্কের ভয় যে'খানে—সে'খানে এক পা'ও এগুবনা। তবে জেনে রাখিস—সত্যি, সত্যিই যদি কোনদিন বিপদে পড়িস, তখন আপ্রাণ চেষ্টা কর্ব্ব, তোকে রক্ষা কর্ব্বার জন্তে।

অপ্রকাশ বল্লে,—তা হ'লে—?

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অনিমেষ বল্লে,—তা হ'লে আর কিছুই নয়' মানে ও সব ছেড়ে দে।

অধ্রুব ছেড়ে আমার সঙ্গে আয় ধ্রুবের পেছনে তোকে ধাবন করিয়ে দি। আমার শালী আছেন একজন। ইনিও কলেজে পড়েন। আধুনিকতায় আর অন্ত নেই।

আমার বাসায়ই আছেন বর্ত্তমানে। তবে যা গণ্ডগোল, তিনি কোন পুরুষকেই সুনজরে দেখতে পারেন না। 'প্রেম' জিনিষটিকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করেন।

পুরুষদের সাহচর্য্য নাকি জীবনে তিনি কোনদিনই বরণ কর্ব্বেন না—বলে বেড়িয়ে থাকেন। তা'কে যদি বাগিয়ে নিতে পারিস, তবেই বেশ হয়। সাহায্য চাইলে তা'ও দিতে পারি।

অপ্রকাশ বল্লে,—চেষ্টা করব। আচ্ছা এখন চল্লুম। দু'তিন দিনের মধ্যেই আবার তোর এখানে আসব।

অনিমেষ বল্লে,—দু'তিন দিনের মধ্যে নয় ভাই। রোজ রোজ আসতে চেষ্টা করিস। সাহায্য কর্ত্তে পেছ পা' হয়েছি বলে বিরক্ত হোসনে।

কোন উত্তর না দিয়ে অপ্রকাশ বেরিয়ে এল রাস্তায়। পরের দিনও কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে প্রণীতির সঙ্গে অপ্রকাশের আবার হ'ল দেখা। এক ঝলক সোনালী হাসি এল ও পক্ষ থেকে। অপ্রকাশও হাসলে। সন্ধ্যের সময় অপ্রকাশ বৈঠকখানায় বসে হারমনিয়াম নিয়ে গান ধরলে—আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি—ইত্যাদি। রাত্তিরে বসে সে রাকার নিকট পত্র লিখলে—

স্নেহের বোন, তোর কথাই ঠিক। শিলেটে এসে আমার স্বাস্থ্যের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। বেশ ভালো লাগছে এ জায়গা। মাসখানেক পরেই তোদের ওখানে ফিরে যাব। ভালবাসা নিস—

ইতি—তোর দাদা।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা। অপ্রকাশ খুবই আশ্চর্য্য হ'ল যখন সে শুনলে ওপক্ষ থেকে গান জাগছে :—

'ওহে অন্তর তম,
মিটিবে কি তব সকল তিয়াস,
আসি অন্তরে মম'। ইত্যাদি।

অপ্রকাশ গান শুনে মনের মধ্যে অনেকখানি সাহস পেলে।

(৩)

মানুষের উৎসাহ যখন হয় প্রবল, তখন সে কাজ করে পূর্ণোদ্যমে; তেমি অবস্থা হ'ল অপ্রকাশেরও। এতদিন সে প্রেম জানানোর কাজটীকে অত্যন্ত সঙ্গোপনে করে আসছিল, আজ যে মুহূর্ত্তে ও পক্ষের এমন ধারা গান শুনল, সে মুহূর্ত্তেই সে অনুভব কর্লে—,ওর যেন শরীরে অনেকখানি বল এসে গিয়েছে। ওর শ্লথভাব দ্রুততায় পরিণত হ'ল।

পরের দিন,—সকাল বেলা। ঘুম থেকে ওঠে ড্রইং রুমে গিয়ে সে বসেছে;—ও বাসার সবচেয়ে ছোট মেয়েটী এসে ঘরের ভেতর ঢুকলে, বল্লে,—দিদি বলেছেন, আপনাকে একবার আমাদের বাসায় যেতে।

অপ্রকাশ কিছু ভীত হ'ল—কি জানি শেষ বেলায় যদি কোন বিপদ ঘটে ওখানে গিয়ে। সে চিন্তা কর্ত্তে লাগল।

অপ্রকাশ বল্লে,—তুমি যাও, আমি হাত মুখ ধুয়ে এক্ষুণি এই এলুম বলে।

মেয়েটী চলে গেল। তারপর মিনিট পাঁচেক পরে আবার ফিরে এসে, অপ্রকাশকে ওদবস্থায় দেখে বল্লে,—দিদি বলেছেন,—হাত মুখ ধুয়ে আপনি এক্ষুণি আসবেন। চা আমাদের ওখানেই খাবেন।

অপ্রকাশ হাত মুখ ধুয়ে সিল—সীপ্গির করে। তারপর পা বাড়ালে ওবাসাকে ডেষ্টিনেসান্ রেখে।

গন্তব্যে গিয়ে যখন পৌঁছল, তখন দেখা গেল—ঘরের ভেতর সব ক'টী মেয়েই বসে আছে। নমস্কারের পর্ব্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চা এসে পৌঁছল। অপ্রকাশ চা পান কর্লে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত। ওর সঙ্কোচের কারণ ছিল—এ পর্য্যন্ত—জীবনে কখনই এমন ধারা সে মরাল মণ্ডলীর মধ্যে বকের একথা দশা প্রাপ্ত হয়নি।

গান পর্ব্বের সমাপ্তি হ'লে পর কলেজে পড়া মেয়েটী অনুরোধ জানালে,—'প্রকাশ বাবু, আপনি শুনেছি—গীতবাদ্য এবং কবিতা রচনায় অতিরকমের সুনিপুণ, তাই যদি হয় তবে আমাদের

সকলের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি—স্বরচিত একখানা গান শুনিয়ে দিয়ে আমাদের তৃষিত শ্রবণ কৃতার্থ করে দিন।

অপ্রকাশ ব্রীড়াবনতার মত হয়ে জানালে যে সে ঐ আর্ট দু'টীর একটীতেও কুশলী নহে, অতএব যদি ওরা তা'কে দয়া করে ক্ষমা করেন।

ছোট বোন পরিণতি ছিল রেসিটে-শানের দিকে পক্ষপাতী;—ধীরে সে বল্লে,—বেশ তাই হ'বে। আচ্ছা এখন যদি না পারেন, তবে বিকেলের দিকে একখানা কবিতা অবৃত্তি করে শুনিয়ে দেবেন।

প্রণীতি কিঞ্চিৎ অনিচ্ছার সুরে বল্লে,—তবে আর কি করা যায়, তাই হ'বে। বিকেলের দিকে আসবেন। চায়ের নেমন্তন্ন রইল। দেখবেন কিন্তু ভুলে যাবেন না। পুরুষরা সাধারণতঃ ভুলেই থাকে সব কিছু। (পুরুষ) শব্দের 'ভোলানাথ' নাম ধারণের শব্দগত অর্থের সার্থকতা ছিল এখানেই।

অপ্রকাশ শুধু শুধু হাসলে।

বিকেলের দিকে অপ্রকাশ যখন ওদের বাসায় গিয়ে পৌছল, তখন সেখানে প্রণীতি আর পরিণতি ছাড়া কেউ ছিলনা। প্রকাশ তৈরী হয়েই এসেছিল। অনুরোধের অপেক্ষা রইবার আগেই সে সুরু করে দিলে:

'বহুদিন হ'ল কোন ফাল্গুনে
ছিনু তব ভরসায়—
আজি এলে তুমি বরষায়। ইত্যাদি

আবৃত্তি শেষ হ'বার আগেই ওরা দু'জনে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল। অপ্রকাশ হয়ত কিছু বুঝলে কিছু বুঝলেনা, তবে আবৃত্তি থামিয়ে দিয়ে ওদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

প্রণীতি প্রথমেই কথা বল্লে,—প্রকাশ বাবু আপনার সুরলালিত্য, স্বরকম্পন, এবং নির্ভুলতার জন্যে খুসী হয়েছি অনেকখানি। রবিবাবুর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এই বলে যে, শতকরা নব্বুইটী গ্রামোফোন রেকর্ডের মত করে বিশ্রী করে তোলেননি আবৃত্তিটী। কিলিংস সত্যিই খুব করে আপনি এনেছেন এবং পেয়েছেন নিজেও খুব বেশী করে। কি বলেন?

অপ্রকাশ দমকা হাওয়ায় সুপুরীগাছের মত ঘাড় বক্র কর্লে অনেকখানি।

—পরের দিন বিকেলের দিকে প্রণীতি পরিণতির সঙ্গে অপ্রকাশ গেল বেড়াতে। একটী ছোট টিলার মোড় ঘুরে যেখানে একটী ঝাউ গাছ দাঁড়িয়ে আছে, ছোট্ট বেতস-কুঞ্জ একটীকে পাশে রেখে, সেখানে এসে ওরা বসলে। দূরে প্রায় হাত পঞ্চাশেক দূরে আর একদল মেয়ে দাঁড়িয়েছিল;—ওরা পরিণতিকে চিনত বোধ করি। ওদেরই একজন তাই উঠে পরিণতিকে তা'দের পাশে যাবার জন্যে ডাক দিলে। প্রথমটায় হয়ত পরিণতি রাজী ছিলনা যেতে, কিন্তু শেষপর্য্যন্ত যেতেই হ'ল তা'কে। কী জানি শেষে রাগ করে যদি ওরা ডোণ্ট-স্পিক করে।

প্রণীতি রইল একা অপ্রকাশের সঙ্গে। অপ্রকাশের মনে হ'ল অধুনা যে সব মণি-পান্নার মুহূর্ত্ত সব ব'য়ে যাচ্ছে, জীবনে হয়ত সে সব আর আসবে না। তাই সে পাশে-বসা মেয়েটিকে স্পর্শ কর্লে অতি সোহাগের ভাবে। মেয়েটীর বিরক্তির লক্ষণ প্রকাশ পেলনা মোটেই। বরং একটু হেসে বল্লে,—প্রকাশবাবু, যেদিন যে মুহূর্তে আপনাকে দেখেছি, সে মুহূর্ত্তেই আপনাকে খুব ভালো লেগেছিল। কেন যে লেগেছিল—সে কথা জানতে চাইবেন না। সেই ভাল-লাগা যে এতদিনে ভাল-বাসায় পরিণত হয়েছে, তা' আমার চেয়ে বোধ করি আপনি বেশী জানেন।

অপ্রকাশ ধীরে বল্ল,—মানবী নন, আপনি দেবি, আপনি যে অযাচিত অনুগ্রহ প্রকাশ কর্চ্ছেন, তা' নেবার মত যোগ্য পাত্র আমি নই, তবুও বুভুক্ষু যখন, তখন নিতেই হচ্ছে। ধন্যবাদ দেবার ভাষা পাচ্ছিনে বলে ক্রোধান্বিত হবেন না। আমার হৃদয় নিশ্চয়ই চুরি করেছেন আপনি, ব্যবস্থা যা প্রয়োজন, তাই করুন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

গান

শ্রীমন্মথনাথ বিদ্যাভূষণ

রূপের আলোক ঝলমলিয়ে
আমায় চোখে চাও।
দেখার চোখে ঘুম ভাঙিয়ে
বাঁধন খুলে দাও॥
মানস-প্রিয়া স্বপন-রাণী
কর উতল আবেশ আনি
সাথে সাথে তোমার পাশে
আকুল আমায় নাও।
পারের আলো উজল জলে
কালো আঁধার ছায়ার তলে।
চেয়ে দেখি পাই না দেখা
অলসে নয়ন যাও॥

সুহৃদ সঙ্ঘ

আগামী ৯ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ন ৩॥০ ঘটিকার সময় ২১৭।এ, পিয়ারীমোহন সুর লেন 'বঙ্গীয় সম্মোপ সভা' হলে সুহৃদ সঙ্ঘের (গোয়াবাগান) সপ্তম বার্ষিক সাধারণ সভা হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

বীমা প্রসঙ্গ

মিথ্যা গুজব

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি যে কোন সাপ্তাহিক স্বার্থান্ধ হইয়া ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বোম্বে মিউচুয়াল কোম্পানীর বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা গুজব রটাইয়াছে। এই সাপ্তাহিকের এইরূপ হীন মনোভাবের পরিচয় পাঠকগণ বহুবার পাইয়াছেন। কোন কোম্পানী বিজ্ঞাপন না দিলেই তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা গুজব রটনা করিয়া তাহাকে জনসাধারণের চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিতে হইবে এইরূপ জঘন্য মনোবৃত্তি যাদের তাহাদের স্থান ভদ্রসমাজে নহে।

কিছুদিন পূর্ব্বে— নলিনীরঞ্জন সরকারের বিলাত যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই পত্রিকাখানি সরকারের বাহবা পাইবার জন্য একটী সুদীর্ঘ এবং বড় বড় টাইপ যুক্ত একটী "প্রশস্তি" লিখিয়া ফেলে, "হিন্দুস্থানে"র এই দুর্দ্দিনে একটু সাহায্য করিতে পারিলে সরকারের আদর এবং সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর বিজ্ঞাপনটাও যদি মিলিয়া যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সম্পাদক মহাশয় এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে কখন কয়েকটা বেফাঁস কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে তাহা তিনি বুঝিতেই পারেন নাই এবং "ক্লাইম্যাক্সে" উঠিয়া তিনি লিখিলেন—মিঃ সরকার আর মৃত—নতুবা···।" শ্রীমানের ভাগ্যে অর্দ্ধচন্দ্র জুটে আর কি! তাড়াতাড়ি পরবর্ত্তী সংখ্যায় ভুল সংশোধন করিয়া শ্রীমান রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু বিজ্ঞাপন আর জুটিল না।

ভারতীয় বীমা সংরক্ষণ

কিছুদিন পূর্ব্বেকার এক সংবাদে প্রকাশ যে বোম্বাইয়ের কতকগুলি ভারতীয় বীমা কোম্পানীর কতিপয় কর্ম্মকর্ত্তা ভারত সরকারের আইন সচিব স্যার এন্, এন্, সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ভারতীয় বীমা আইন সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন উত্থাপন করেন। স্যার নৃপেন তাঁহাদিগকে জানান যে, ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনের পূর্ব্বে সরকার বীমা আইন সংশোধন বিল উত্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন না। কারণ বীমা আইনের পূর্ব্বে কোম্পানী আইন সংশোধন শেষ করিতে হইবে। ইতিমধ্যে বীমা আইন সংশোধন সম্বন্ধে স্পেশাল অফিসারের প্রস্তাবগুলি বিবেচনার জন্য একটী কমিটি গঠন করা হইবে। আগামী এপ্রিল মাসে নূতন ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট প্রবর্ত্তিত হইবে। সংস্কৃত নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে পড়িলে এই ভারতীয় বীমা আইন সংশোধিত হইবে কি প্রকারে? ভারতবাসীগণ এতদিন যাবৎ বিদেশীয় বীমা কোম্পানীর প্রতিযোগীতা হইতে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য যে দাবী করিয়া ভারত সরকারকে জানাইয়াছিল এবং যাহার জন্য এই সংশোধিত বীমা আইনের হেতু তাহা কি নূতন শাসনতন্ত্রের আমলে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে না? নূতন শাসনতন্ত্র এদেশে প্রণয়ন করা হইলে বৃটিশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক কোন আইন ভারত সরকার মোটেই পাশ করিবেন না—সুতরাং ভারতবাসীগণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যাইবে। এদেশের ন্যায্য দাবী যাহাতে ভারত সরকার উপেক্ষা করিতে না পারেন তজ্জন্য এদেশে সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে।

ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী

গত ১৬ই জুলাই লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আদেশ ক্রমে হাইকোর্ট কর্ত্তৃক লালা হরকিষণ লালের নামে ভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে যে ৫,১৯৫ টী শেয়ার ছিল তাহা সাধারণ নিলামে বিক্রীত হয়। এই শেয়ারের শেষ ডাক ১১ লক্ষ টাকা উঠে এবং এই টাকা দিয়া শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া এই শেয়ারগুলি ক্রয় করেন।

এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া

প্রকাশ, এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া "ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিসেস এসোসিয়েশন" এর সভ্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। এম্পায়ার অব্ ইণ্ডিয়া উক্ত এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হইতে ইহার সভ্য ছিলেন। কোম্পানীর সভ্য পদত্যাগে এসোসিয়েশনের বিশেষ ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই।
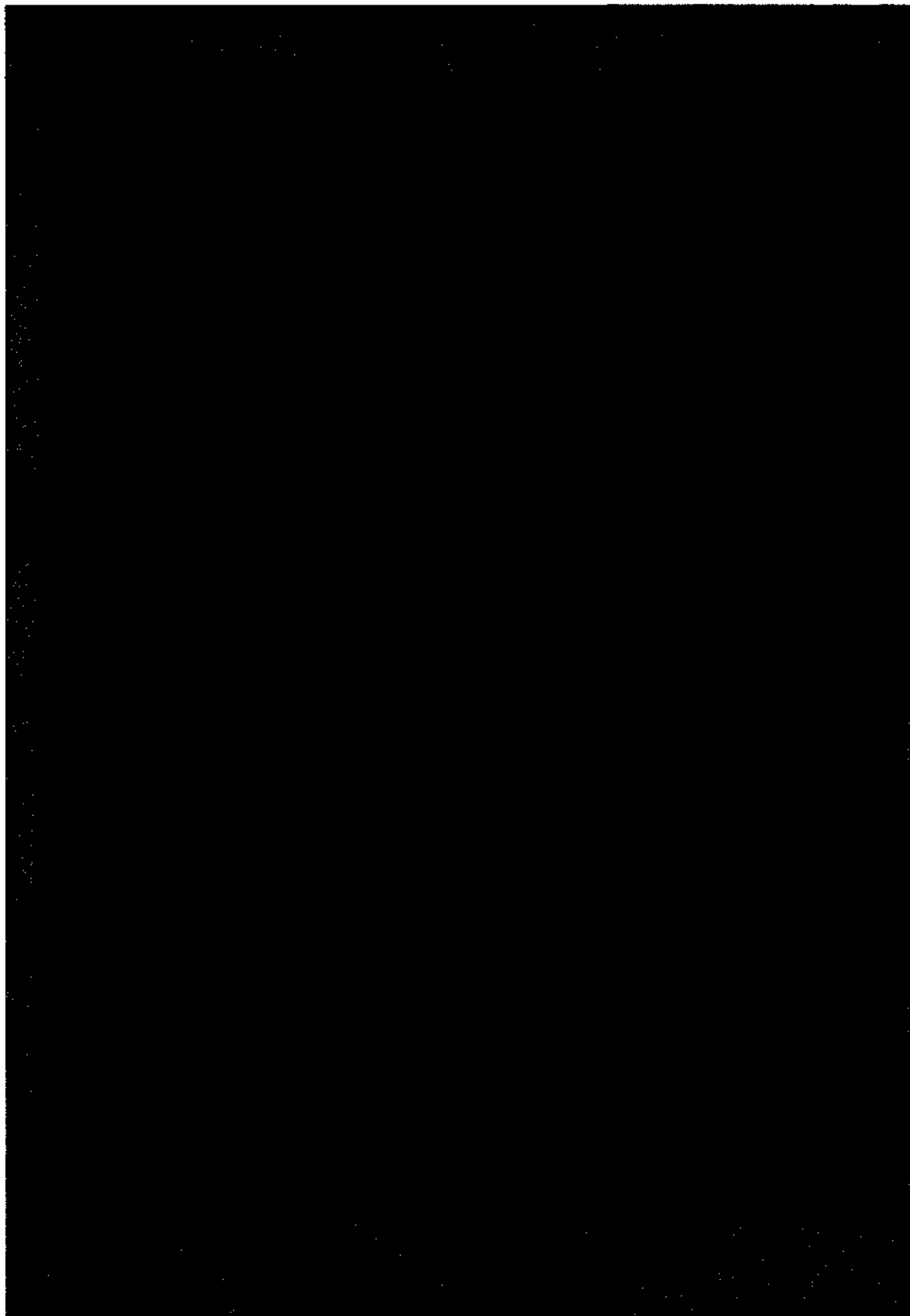
সচিত্র সাপ্তাহিক

দ্বিতীয় বর্ষ—২৮শ সংখ্যা

শুক্রবার—৫ই ভাদ্র

১৩৪৩

২১শে আগষ্ট—১৯৩৬

সাধনা
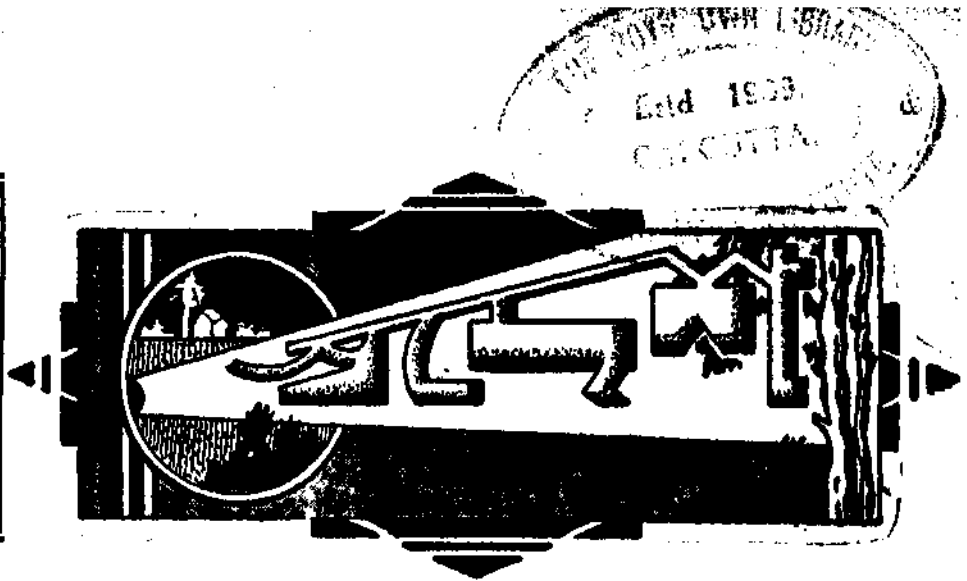
সাধনার ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। নিত্য নূতন অতিথি, নবাগত পূজারী ও পূজারিণীদের কল-কোলাহলে মন্দির-প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ—ধূপে-দীপে, চন্দনে-পুষ্পে, প্রাণে-স্পন্দনে বাণী মন্দিরের অলিন্দে-অলিন্দে মঙ্গলারতির চেতনা-চাঞ্চল্য—ভাবাবেগের গভীরতায়, সুন্দরের প্রেমোদ্দীপনায় দৃষ্টির স্থৈর্য্যে, আবেশের স্নিগ্ধতায় হ'য়ে উঠছে স্তব্ধ, প্রশান্ত, ভরপুর! তৃপ্তির গর্ব্বে, সৃষ্টির ব্যথায়, মৃত্যুর আনন্দে যে কালজয়ী প্রেরণায় পাঞ্চজন্যে জাগছে মিলনের আহ্বান, তারই রতি-প্লাবিত রস ও মাধুর্য্যে প্রকৃতির প্রাণ-পাত্রে শিহরণ-সঞ্চারে হচ্ছে বিভিন্নমুখী জ্ঞান-গরিমার উন্মেষ, যেমন ক'রে বনে ফোটে ফুল, যেমন করে প্রান্তরে চলে নদী, যেমন ক'রে আকাশে জমে মেঘ—ধরায় নামে ধারা! এই জন্যই আত্মহারা সাধক, ভাবোন্মাদ কবি আর দার্শনিক, জ্ঞানোদ্দীপ্ত সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক। তাই সত্যকারের পূজারী যে, সাধক যে, সেবক যে—একমাত্র তারই আছে দেবী-পূজার অধিকার। বাণীর সেবায় ভণ্ডের, কপটের, বিলাসীর নেই কোনো অধিকার, নেই দাবী, নেই ঠাঁই।

কিন্তু বর্ত্তমানে কি সাধনার ক্ষেত্রে, কি সেবার প্রাঙ্গণে, কি মিলনের তীর্থে—সর্ব্বত্রই হয়েছে কপটাচারী একদল স্বার্থলোলুপ বিলাসীর অভ্যুত্থান! এদের প্রাণে নেই সত্যের উপলব্ধি, হৃদয়ে নেই ত্যাগের ঔজ্জ্বল্য, মনে নেই নির্ভরতার ছোঁয়া। সাহিত্য-সেবার ক্ষেত্রে স্বার্থসর্ব্বস্ব এই যে হীনতার প্রাবল্য মাত্র আত্মম্ভরিতায় ঠুনকো কাঠামোতে ভর দিয়ে বাণী-মূর্ত্তির মাটি-লেপনে, চক্ষুদানে আর প্রাণপ্রতিষ্ঠায় প্রকটিত হ'য়ে উঠছে, সত্যকার দরদী-শিল্পীর ধ্যানের আনন্দ হয়তো এ'তে হচ্ছে কিছু ব্যাহত, ক্ষণিকের এই বিলাস-আড়ম্বড়ে হয়তো তা'র চিরন্তনী দেবীর আরাধনায় আনছে কিছু ব্যাঘাত! কিন্তু এর মধ্যে থেকেই যে দুর্ব্বার ধৈর্য্য ও সাধনার আত্মশক্তি তা'কে তা'র আরাধ্য-বস্তুর সেবায় উৎসর্গের ঔদার্য্যে অদমনীয় ও অটল ক'রে তুলছে গ'ড়ে—শত কৌশলীর কৌশল-জাল ভেদ ক'রে একদিন এই থেকেই জে'গে উঠবে তা'র বরাভয়ের ইঙ্গিৎ, হ'য়ে উঠবে সে ধ্যানযোগী বাল্মিকী! প্রাণের আহ্বানে প্রাণের পাবে সাড়া! আত্মায় হবে প্রতিষ্ঠা!

তবু দুঃখ হয়। সাহিত্য-সেবাকে যাঁ'রা মনে করে কালহরণের একটা অবলম্বন, নেহাৎ সময়-কর্ত্তনের একটি সাধারণ ব্যবস্থা, তাঁ'দেরকে হয়তো বলবার কিছু না

চাভিম চাভিম

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

"আর একবার সাধিলেই খাইব" অভিমানী জামাইয়ের এই যে মনোবৃত্তি এই হচ্ছে আমাদের আধুনিক নয়া কনষ্টিটিউশনী আমলের রাজনীতি। গরম থেকে নরম অবধি হরেক রকম পলিটিশিয়ানের প্রাণের কথাটি এই। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে কর্ত্তা গলায় চাদর নিয়ে জোড় হাতে স্মিত হাস্যে আহুত অনাহুত রবাহুত সবাইকে সাদর আপ্যায়নে তুষ্ট করছেন। কোমরে কাপড় বেঁধে পরিবেশনকারীর দল ধামায় ধামায় লুচী কালিয়া সন্দেশ নিয়ে করছে ছুটাছুটি। এ রকম দিগ্‌ভ্রাং ভূরিভোজ্য-ভাণ্ডারের আসরে যে একটু মান করে দর বাড়ায় তারই খাঁই সব চেয়ে বেশি।

* * *

পরম নিশ্চিন্ত মনে সরকার বাহাদুর এই নয়া কনষ্টিটিউশনের অন্নসত্র খুলেছেন, কারণ তাঁরা বিলক্ষণ জানেন দেশজোড়া বুভুক্ষিতের দল কি চায়। সার সুরেন্দ্রনাথ মারফৎ কর্পোরেশনী লাড্ডু পরিবেশন করবার সময় এই কাঙালের কাড়াকাড়ি এঁরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দেশবন্ধু দাস বেঁচে থাকতে চক্ষু লজ্জার খাতিরে যে টুঁটি ছেঁড়াছিঁড়িটা হতে পারে নি, তিনি চক্ষু মুদবার পরই তা' পত্রপাঠ আরম্ভ হয়ে গেল। এতদিন সেই কংগ্রেসী কর্পোরেশনের দলো প্রেমের ফাটা দেয়ালে কতবার যে টুকিটাকি মেরামত ও চূণকাম হলো তার হিসাব পাঠকবর্গ অবগত আছেন। আবার এই দু'দিন আগে ফাটা প্রেম জোড়া দেবার প্রচেষ্টা হয়ে চুকেছে, দেখা যাক ঐ ফাটলের দাগে দাগে পূর্ব্ব চিড় আবার কার্য্যকালে দেখা দেয় কিনা।

* * *

ভাগ্যক্রমে ঢাকার নবাব সাহেবের নাজিমুদ্দিনী জুড়ো ছিল তাই তাড়াতাড়ি কংগ্রেস পার্টিকে একটা গোঁজামিলের ভুয়া লোক দেখানো মিলন খাড়া করতেই হয়েছে। এখন জিন্না সাহেব এসে সেই নাজিমুদ্দিনী ও ফজলুল হকী দু'দলকে আবার এক করবার প্রচেষ্টায় আছেন। এবার সুতরাং সামাল সামাল ডাক ছাড়িয়ে তবে ছাড়বে। এই দল বেদলের জোর মাদলের আসরে কি সাম্যবাদী কংগ্রেস আর কি ভাবী প্রজার দরদী মুসলীম দল দু'পক্ষকেই আমাদের একটু সরল বক্তব্য আছে। গরম বুলি ক্ষেত্র বিশেষে উৎকৃষ্ট দাওয়াই সন্দেহ নাই; কিন্তু ভোটের লোভে ঐ বিষবড়ি অজ্ঞ প্রজাকুলের পাতে পরিবেশন করার পরিণাম বড় ভয়াবহ। আজ প্রজার দুঃখে যাঁরা কেঁদে ভুকরে আসর জমাচ্ছেন, কাল তাঁদেরই আমীরী অচল হবে প্রবুদ্ধ প্রজা যখন ট্যাক্সো বন্ধ করবে।

* * *

সনাতন সমাজ ব্যবস্থায় জমিদার ধনিক আমলা বণিক বলে জীব বিশেষের সৃষ্টি যে হয়েছিল, যাদের ওপর আজ আমরা কালধর্ম্মের বশে এত খাপ্পা, তাদের সৃষ্টির জন্য আমরাই তো দায়ী। আমরাই কল্যাণকর বলে ঐ ব্যবস্থায় ভিটো দিয়ে ওটাকে এতদিন বজায় রেখেছিলাম; পরম সমাদরে ধনিক বণিক জমিদার মহাজনকে বসবার ইষ্ট পরিবেশন করেছিলাম এবং তাদের দ্বারা নিজেদের দিনগত পাপক্ষয় করে নিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ তাদের বিনা নোটিশে জবাব দিলে তারা যায় কোথায়? তারা শুধু সমাজের অংশ বিশেষই নয়, আমাদের এত দিনের কালচার সভ্যতা সাহিত্য কলার বাহন। বাংলায় ও ভারতে আজ এত যে জাগরণ-জমের ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ী চাগাড় দিয়েছে তাতে এই ধনিক ও বণিককুলের সাহায্য ও হাত কি ছিল না? আজকের যত সব বড় বড় লিডার রাজনীতি ক্ষেত্রে হয়ে থাকেন তাদের হাজারকরা নয়-শ নিরানব্বই জনই কি ঐ ধনিক ও বণিক শ্রেণীর উত্তরপুরুষ নন?

* * *

থাকতেও পারে, কিন্তু তা'দেরকে চেনবার এবং চেনাবার প্রয়োজন আজ যে একটা বড়ো প্রয়োজন হিসেবেই দেখা দিয়েছে—তাতে নেই বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ। সমাজ-শরীরে যখন পাপের প্রসারতাকে সংযত ক'রে সুনিয়ন্ত্রণের গঠনশীল প্রচেষ্টা রাষ্ট্র নিয়েছেন আপনার হাতে, তখন যা'র উপর দেশ ও জাতির কল্যাণ করে সর্ব্বাধিক নির্ভর—সেই সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্র হ'তেও পাপ দূরীকরণের প্রচেষ্টা কি আজও রাষ্ট্রের দৃষ্টি-আকর্ষণের যোগ্যতার দিক্ দিয়ে বিচার ক'রে দেখবার সময় আমাদের আসে নি? দেবী-মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে কণ্টকাকীর্ণ আগাছা তোলবার সময় কি হয় নি আজও! আসে নি তা'র প্রয়োজন? ভাবনার অবসর? জাগরণ?
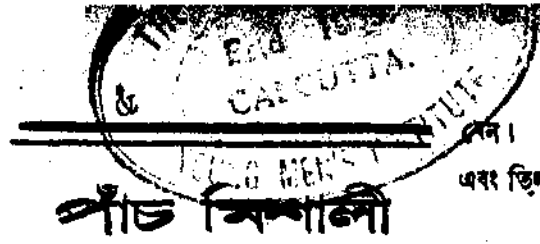
পুরাতন ইমারৎ ক্রমশঃ ভাঙ্গা এবং ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন করা যেতেও তো পারে? পুরাতন ইমারতের নীচে চোরাগোপ্তা ডিনামাইট দিয়ে বিনা নোটিশে হঠাৎ উড়িয়ে দিলে তার মাঝে ও ধারে পাশে নিরীহ প্রাণীকুল যারা বাস করছে তারা যে ধনে প্রাণে মারা যায়! সে চেষ্টার ভয়াবহ দৃশ্য আজ স্পেনের শিশু ও নারী বধ যজ্ঞে বেশ প্রকট হয়ে উঠেছে। "তোমার মতে আমার মত মেলে না সুতরাং মায় ধাড়ী বাচ্চা তোমায় কচু কাটা করবো" এ যুক্তি পশু রাজ্যেও নাই, পিশাচ রাজ্যে আছে কিনা জানি নে। দু'টো ভোটের লোভে আজ যাঁরা গরম প্রজাপ্রেমের ও নরঘাদক সাম্য-নীতির বুলি কাটেন, তাঁরা দু'টো ভোট হয় তো পাবেন, কিন্তু মানব প্রকৃতির তলায় যে সুপ্ত ভিসুভিয়াস্ আছে তাকে উস্কে দেবার দায়িত্ব এঁদেরই। কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ লাহোরের রাজপথ কাল বা পরশু যদি শিশু নারী ও বৃদ্ধের রক্তে পিছল হয়ে ওঠে তখন ফজলল হক সাহেব ও জোয়াহির লালজী ম্যাও ধরবেন তো? জোয়াহির লালজীর ধাতে এখনই লাল ঝণ্ডা অসহ্য হয়েছে, ভায়োলেন্স-কে তিনি এথমিনেশন বলে গালিও দিয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের সকলের সমবেত উস্কানীর চোটে যখন সমাজের স্তূপস্তর ভেদ করে ভিসুভিয়াস্ গলিত অগ্নিধারা বমন করবে তখন তাঁদের এত সাধের ইভলিউসনারি সোসিয়ালিজম্ থাকবে কোথা? গীতায় কি সাধে বলেছে—

ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।

পাঁচ মিশালী

মিঃ বিজয় কুমার বসুর মেয়রী লীলার অবসান হইল। এবার আর তাঁহার দেবতা শির্ণী খাইবেন না। স্যর ব্রজেন্দ্র লাল মিত্র ফিরিয়া আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। সুতরাং ৬৪ হাজারের এক তৃতীয়াংশ ট্যাঁকে গুঁজিয়া মিষ্টার বিজয়কুমার আবার গনেশচন্দ্রের অফিসে কনভেয়ান্স ও মর্টগেজ দলিল লিখিতে

মনোযোগ দিলেন। যাহা চিরস্থায়ী তাহা লইয়া থাকায় আর দুঃখ কি? যদি অকালে সুরেন্দ্র নাথ মল্লিকের মৃত্যু না হইত তবে ত' বিজয়কুমারের ঐ পদ লাভের চেষ্টায় কাদা মাখাই সার হইত! এ ত তবুও যে টাকা ঘরে আসিল, তাহাতে দাদার বালীগঞ্জের বাড়ী পুনরায় অধিকার করা সম্ভবপর হইবে। ইহার পর অবশ্য সিমলা যাত্রা। হয়তো অদৃষ্টে কিছু ফলি-লেও ফলিতে পারে। এদিকে বন্ধুবর চারুচন্দ্র বিশ্বাস যখন বিলাতে পাড়ি জমাই-লেন, তখন করপোরেশনে একটা দলের জোটও তিনিই নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি-দেন। সুতরাং কাজের অভাব হইবে না এবং ত্রিল কুড়াইয়াই ভাল হয়।

—

বাঙ্গলায় কংগ্রেসের দুই দলে নাকি মিলন হইয়াছে। যখন মনের মিলন হয় না, তখন এরূপ মিলন যে কখনও স্থায়ী হইতে পারে না, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এই মিলন কতদিন টেঁকে, তাহাই দেখিবার বিষয়। কিন্তু দুই দলে এমন কি একটা বাঁধন আছে যে, তাহা ছিড়িলেই আবার নূতন করিয়া গেরো দিতে হয়? যে স্থলে একদল মন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত এবং অন্য দল মন্ত্রীত্ব গ্রহণের বিরোধী, সে স্থলে মিলনের ভিত্তি কি হইবে বোঝা যায় না। এরূপ মিলন যখন অস্থায়ী তখন ইহার জন্য ব্যস্ত হইবারই বা কি প্রয়োজন! বাঙ্গলা যে প্রস্তাবিত শাসন ব্যবস্থা কোনরূপেই সমর্থন করিতে পারে না, সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ নাকচ না হইলে যে বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে ব্যবস্থা-পক সভায় প্রবেশ অকারণ, তাহাতে যখন কোন সন্দেহ নাই, তখন যে দল কোনরূপে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ ও মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে পারিলে জীবন সার্থক মনে করেন, সে দলের সহিত মিলনে যে বাঙ্গলার কোন উপকার হইতে পারে, ইহা আমরা মনে করি না।

—

মিঃ জিন্না কলিকাতায় আসিয়াছেন। বাঙ্গলায় মুসলমানদের যে আধ ডজন দল হইয়াছে, সেই সব দলই তাঁকে লইয়া টানা-টানি করিতেছে। কথায় বলে, মহিষের শিং বাঁকা, কিন্তু জোঝবার বেলায় একা। হিন্দুদিগকে অধিকারচ্যুত করিবার বেলায় মুসলমানদের সব দল এক হইলেও অন্য

চাকুম-চুকুম

পঞ্চমুখ শর্ম্মা

সকলেই কবিতা লিখিতেছে। তাই শ্রীবিমলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও লিখিতেছেন। যথা—

"বিদায় বেলার—
লঘুপক্ষ বলাকার মত
চকিতে ভাসিয়া যায়
ব্যথাহত মুহূর্ত্তের মালা।"

আহা! যখন বিশেষ একজনের (তা' তিনি অমুকই হউন আর তমুকই হউন) সহিত বিশেষ অবস্থায় বিদায়-মুহূর্ত্ত ঘনাইয়া আসিতেছে, তখন উক্ত 'ব্যথাহত মুহূর্ত্তের মালা, যদি 'লঘুপক্ষ বলাকার মত' অমন 'চকিতে ভাসিয়া' না যাইত—তাহা হইলে এমন কবিতা আর লিখিত কে?

সম্প্রতি আপনাদের মধ্যে ঝগড়ার অন্ত নাই। ঝগড়ার মূল, কে কে মন্ত্রী হইবেন। খাজা-স্যার নাজিমুদ্দিন নাকি নিশ্চয় করিয়া আছেন, তাঁহার প্রধান মন্ত্রীত্ব কেহ রদ করিতে পারিবে না। নবাব ফারোকী সাহেব তাঁহার আশার বহর দেখিয়া হাসিতেছেন। আর ওদিকে ফজলুল হক সাহেব প্রজা পার্টির নেতা সাজিয়া আপনার দাবী প্রবল করিবার চেষ্টা করিতেছেন। খাজা স্যর নাজিমুদ্দিনের ইংরাজ দলের সহিত মিতালীর কারণও আর কিছু নহে। কিন্তু শেষ অবধি যে কি দাঁড়াইবে, তাহা কেহই বলিতে পারেন না।

তবে দুঃখ এই যে কবির—

"অকথিত সব থেকে যায়—
অসহ অক্ষম এ কি জ্বালা!"

সকথিত হইবার মত ভাগ্য যখন একেবারেই নাই, 'অসহ অক্ষম' 'জ্বালা' একটু হইবেই। জ্বালা হইলেই হইবে সৃষ্টি, এবং সে-সৃষ্টি যেমন-তেমন সৃষ্টি নহে—একেবারে কবিতা! যাহা হউক, কবি যে সঙ্গে সঙ্গেই হাত মক্সো করিবার ক্ষেত্র পাইয়াছেন, ইহাতে 'প্রশ্নময় দৃষ্টির উত্তর' আর 'তব হৃদয়ের মাঝে' না খুঁজিলেও দিব্য চলিয়া যাইবে!

মধ্য-পদ-লোপী সমাস নহে, শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন আজ মদলোভী গুরুতর 'দ্বন্দ্ব' বাধাইয়া বসিয়াছেন! কারণ—

"মিনতি করিয়া তারে দ্বার হ'তে
ফিরাই গোপনে
ক'ষরে তাহারি তরে পাতা থাকে
মনের আসন;
মন চায়, দেহ চায় একান্ত মিলন
তারই সনে
না গেলে শুনাই তারে স্বপ্নাভরে'
নিষ্ঠুর ভাষণ।"

যখন একের সহিত অপরের একটু সমাজাতিরিক্ত এমন-তেমন হইয়া গিয়াছে, তখন অবশ্য 'একান্ত মিলন'-এর পিপাসা ঐরূপই হইয়া থাকে। 'অন্তরে' যাহার জন্ত 'মনের আসন' পাতা হইয়াছে, শুধু মন নহে—দেহও যাহাকে চাহিতেছে—তাহাকে যে 'মিনতি করিয়া' 'দ্বার হ'তে' ফিরাইয়া আনা হইবে—তাহাতে ভুল নাই! অথচ আক্ষেপ এই, এত করিয়া যাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইতেছে—চৌকাঠ পার হইতে না-হইতেই তাহাকেই আবার "স্বপ্নভরে' 'নিষ্ঠুর ভাষণ' দ্বারা চৌকাঠ পার করিয়াও দিতে হইতেছে! উঃ! নিষ্ঠুর সমাজ! নির্ম্মম বিধাতা! কঠোর পরিহাস! এই জন্তই তো—

"সে যদি ফিরিয়া আসে, ম্লানমুখে
সম্মুখে দাঁড়ায়,
সহিতে পারি না তবু, মুখে আনি
বিদ্রূপের হাসি;
নিজেরে ছলনা করি' সহিষ্ণুতা
সীমানা ছাড়ায়'
বলিতে পারি না তবু প্রাণ দিয়ে
তারে ভালবাসি।"

যাহার অবস্থা এইরূপ হইয়াছে, তাহাকে 'বাহা'! বলিয়া প্রবোধ দেওয়া

ছাড়া—কিছুই বা আর করিতে পারা যায় ?

শ্রীহাসিরাশি দেবী লিখিতেছেন—

"চলার-পথে রইল তোমার—
আমার আঁখির জল,
বুকের মাঝে ফুটল ব্যথার
সোনার শতদল।"

সত্যই তাই। দেখা গিয়াছে, বুকের মাঝে যেস্থানেই 'সোনার শতদল' ফুটুক না কেন, উহার মূলে—হয় 'তোমার আমার আঁখির জল', নিবেদন পক্ষে ব্যথার কাঁটা—একটা-না-একটা রহিয়াছেই। যেস্থানে উহার একটাও নাই, তথায় 'শতদল' ফুটা তো চুলোয় যাউক, একটি গাঁদা-ফুলও ফুটিবে না। বিচিত্র নিয়ম!

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী মহাশয় লিখিতেছেন—

"কেন বা কিসের একটা আকর্ষণ বোধ করতে লাগলাম। একটা অজানা টানেই যেন টর্চ্চটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পণ্ডিতজীর বিলে যাবার মাঠের মধ্যকার সোজা রাস্তা ধরে। হেমন্তের হিম-সিম আঠালো মাটির পিচ্ছল রাস্তায় পা টিপে টিপে চলেছি। আধা-আধি যেতেই মনে হ'ল—কি যেন একটু দূরে রাস্তা হ'তে ক্ষেতের মাঝে স'রে গেল। সোজাসুজি গিয়ে 'ফোকাস' করতেই দেখি—"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই ভাবিলাম, হয়তো দেখিলেন ভূত এবং উহা দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়া মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম করিলেন, এমন সময় 'কপালকুণ্ডলা' নাচিতে নাচিতে আসিয়া সহসা উপস্থিত হইয়াই তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া অবশেষে বলিল,—"পথিক! তুমি কি পথ হারাইয়াছ?" ক্রমে একটা অজানা টানেই …টর্চ্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়া সার্থক হইয়া

উঠিল! কিন্তু সবিস্ময়ে পড়িয়া দেখিলাম রোমাঞ্চের নামগন্ধও নাই! কারণ তাহার পর যাহা দেখিলেন, তাহা 'কপালকুণ্ডলা' তো নহেই, একটি 'মিনি বেড়াল'ও নহে। শ্রেফ—"হাত পাঁচ ছয় দূরে পীর সাহেব দাঁড়িয়ে।"

ধোৎ! নেহাৎ একজন 'পীর সাহেব'-এর জন্ম একজন যুবক এতকাণ্ডও করিতে পারে!

শ্রীমান অরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীও বেশ লিখিতেছেন দেখি—

"যে কথা হয় নি বলা বলি বলি করি,
নিরুপায় ফিরে' গেছি কত শত বার—
সেই অকথিত বাণী—দিবস-শর্ব্বরী
জাগিছে প্রণয় ভীরু অন্তরে আমার।"

সেই 'অকথিত বাণী'! যত ব্যাপার কি উহা হইয়াই হইতেছে? বাণীটি এমন কিছু মারাত্মক নহে, যথা—

"সেই সুগোপন কথা—শোন শোন, প্রিয়া,
তোমারে বেসেছি ভাল—এ জীবন দিয়া।"

অথচ ইহা বলিতেও এত লজ্জা হইতেছে? দু' এক ঘা' পৃষ্ঠে পড়িলেও, বলিয়া ফেলাই কিন্তু ছিল ভাল!

কুমারী নমিতা মজুমদারের 'বাঁধন' সত্য সত্যই যে 'ভার' হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যেহেতু—

"বাঁধন আমার মনের বাঁধন
ভার (?) হ'ল;
এবার, আপন হাতে বাঁধন খোল।"

তবে ইহা যে 'বাহর বাঁধন' নহে—তাহা বুঝা গেল। ক্ষেত্র বিশেষে দেখা গিয়াছে, 'মনের বাঁধন' খুলিতে হইলে 'বাহুর বাঁধন' শুরু করিতে হয়। কিন্তু উহা ছাড়াও যে কাহাকেও 'আপন হাতে' 'মনের বাঁধন' খুলিবার জন্ম আহ্বান করা যাইতে পারে, তাহা এই সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাইলাম। সুতরাং এইরূপ অবস্থায় যদি আরো দেখা যায় যে—

"ঘনিয়ে গেছে আঁধার চোখে,
ত্রিভুবন দুঃখে, শোকে;
ব্যথার রূপে আসছে মরণ—
ওই এল,"

তাহা হইলে—

"এই কালোর মাঝে হারিয়ে দিলাম
আপনাকে
হারিয়ে দিলাম সুন্দরে;"—

ইহা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে! কেন না, এ ক্ষেত্রে 'বাঁকা শ্যাম' অর্থাৎ মদনমোহনই একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা!

* * *

বর্ত্তমানে সাহিত্য-ক্ষেত্রে ব্যভিচারীর সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে, কালে কালে তাহা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে কে জানে? ভাগ্যগুণে পূর্ব্বপুরুষের কষ্টে সঞ্চিত অর্থ ও অট্টালিকা লাভ করিয়া জুতার দোকান হইতে ঘর ভাড়া আদায় করিতে ও বাড়ীওয়ালা হইতে পারা যায়, এবং এ-হেন ব্যক্তি যখন মাসিক পত্রিকার ছাপাখানা হইতে বই ছাপাইয়া এবং সাহিত্যসভার সাহিত্য-সম্রাটের গলায় মাল্যদান করিয়া সাহিত্যিক বনিতে চায়, তখন উহা না হয় সহ্য করা যায়। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত কবি ও সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত কাহিনী লইয়া যে গল্প লিখিয়া তাহার বাহাদুরী প্রকাশ করিতে চায়, উক্ত সাহিত্যিকের পদ-নখের ক্ষমতাও যে তাহার নাই—এ বুদ্ধি হয় তো তাহার না থাকিতেও পারে, কিন্তু 'গোল দীঘির জলে' কলসী ও দড়ির মহিমা তাহার উপলব্ধি করার প্রয়োজন যে অচিরেই উপস্থিত হইয়াছে—তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই। নব-বিবাহিত স্ত্রীর অকস্মাতে ভবানীপুর যাওয়া আসা যত সহজ, সাহিত্য-সেবা যে ততটা নহে—তাহার মগজে তাহা অবশ্য প্রবেশ করিবে না। অভিশাপ এই যে বাণীর মন্দিরে এই সব অস্পৃশ্য চামার-শ্রেণীর জীবরাও মাথা গলাইতে সাহস করে।

ত্রুটী স্বীকার

গত ১৫ই শ্রাবণ তারিখের স্বদেশে 'করপোরেশন প্রসঙ্গে' কতকগুলি বিষয়ের আলোচনাক্রমে শ্রীযুত টুটু ঘোষ ও তাহার পত্নী শ্রীযুক্তা শান্তি ঘোষের নাম যেভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তজ্জন্ম আমরা লজ্জিত ও দুঃখিত। প্রকাশ, করপোরেশন হইতে ৫৫খানি মোটরগাড়ী ক্রয়ের কথাবার্ত্তা চলিতেছে এবং চীফ্ ইঞ্জিনিয়ারের নাকি ইচ্ছা যে ডজ গাড়ীই কেনা হয়। এই প্রসঙ্গে ফ্রেঞ্চ মোটরকার কোম্পানীর প্রতিনিধি টুটু ঘোষ এবং তাহার পত্নীর নাম উল্লিখিত হয়েছে। ভদ্র মহিলার নাম এইভাবে উল্লিখিত হওয়ায় আমরা এজন্ম আন্তরিক দুঃখিত।

সংসঙ্ঘ কি জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান ?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়

অন্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় অথবা পত্তনিদং কার্য্যকালে সংসঙ্ঘটী রেজিষ্ট্রীকৃত করপোরেট বডি। ইহার মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েসনে লিখিত উদ্দেশ্যগুলি সম্পাদন করিবার জন্ত সংসঙ্ঘ আজ কয়েক বৎসর হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। দেশের দুরবস্থা হেতু জনসাধারণের নিকট হইতে কোন প্রকার অর্থ সাহায্য না পাওয়ায় সংসঙ্ঘ বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে ঋণ করিয়া সংসঙ্ঘের কর্ম্ম প্রতিষ্ঠানগুলি গঠন করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। ভাবিয়াছিল দেশের সুদিন আসিলেই অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবে। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর দেশের মধ্যে যে দুরবস্থা আসিতেছে তাহাতে সে আশা সুদূর পরাহত হইয়া পড়িয়াছে। সংসঙ্ঘের পাওনাদারগণ ঋণ পরিশোধের জন্ত বিশেষ ভাবে তাগিদ করিতেছেন। সুদের ভারও ক্রমেই বেশী হইয়া পড়িতেছে এবং মূলধন অভাবে কোন কার্য্য চলিতেছে না। এই সমস্ত কারণে সংসঙ্ঘ তাহার কর্ম্ম প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনে একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছে। তদুপরি তপশীলের লিখিত বাড়ী ঘর দুয়ার ও মালপত্র সমস্ত অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া থাকায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় ভবিষ্যতে ইহার কোনই মূল্য থাকিবেনা এবং পাওনাদারগণের টাকাও নষ্ট হইবে বিধায় সংসঙ্ঘের বিশেষ সাধারণ সভা গত ১৯৩৪ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধের আদেশ দেওয়ায় এবং সংসঙ্ঘের

কাউনসিলারগণের উপর বিক্রয় করিবার ক্ষমতা এবং খোষ কবলা সম্পাদন করিয়া দিবার ক্ষমতা দেওয়ায় সংসদের কাউন-সিলারগণ তপসীলের সম্পত্তি বিক্রয় করিবার ঘোষণা করায় আপনি তপসীল লিখিত সমস্ত সম্পত্তি ও তৎসহে "সংসদ" এই নাম ব্যবহার করিবার অনুমতি বা সংসদের গুড্-উইল সর্ব্বোচ্চ মূল্য ১২০০০৲ বার হাজার টাকা খরিদ করি-বার জন্য স্বীকার করায় আমরা তাহাতে সম্মত হইয়া মূল্যের ১২০০০৲ টাকা আপনার তহবিল হইতে আপনার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রভাস চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে নগদ বুঝিয়া পাইয়া নিম্নের বর্ণিত তপসীল হারের সমস্ত সম্পত্তির এই বিক্রয়ের খোষ কবলা লিখিয়া দিয়া অঙ্গী-কার করিতেছি যে আপনি অদ্যকার তারিখ হইতে সংসদের যাবতীয় স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলকার হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারীশান ও স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে দান বিক্রয় বয়হেবা কট রেহান অধীন বন্দোবস্ত সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা সূত্রে যথেচ্ছামত ভোগ দখল করিতে থাকুন, তাহাতে সংসদ পক্ষে কেহ কোন প্রকার ওজর আপত্য বা দাবী দাওয়া করিতে পারিবে না। করিলে তাহা আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে না। এই বিক্রীত সম্পত্তি ইতিপূর্ব্বে সংসদ অন্য কাহারও নিকট দান বিক্রয় বয়হেবা কট কি রেহান কি অধীন বন্দোবস্ত কোনও প্রকার দায়াবদ্ধ বা হস্তান্তর করে নাই। যদি তাহা প্রকাশ পাইয়া আপনার স্বত্ব দখলের ব্যাঘাত বা ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিতে সংসদ বাধ্য থাকিল এতদর্থে আমরা সংসদের কাউনসিলারগণ সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে বিনা জোর জবরে সংসদ পক্ষে এই স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের খোষ কবলা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩৪১ সাল ২১শে অগ্রহায়ণ ইং ৭।১২।১৯৩৪।

বলা বাহুল্য শ্রীঅনুকূল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই বিক্রয় কবলা মূলে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন। আমরা ভাবিতেছি—"ফুরাল গাছের আম, কি খাবিরে হনুমান।" মূলধন হীন "সংসদ" এখন কি চুষিবেন তাহার কোন হদিস আমরা খুঁজিয়া পাইতেছিনা। ঠাকুরের তহবিলটিও বেশ মোটাই দেখা যাইতেছে। এক লহমায় তিনি ১২০০০৲ বার হাজার টাকা গুণিয়া দিলেন। ঋণ দাতাগণ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। আমরা যে অন্ধকারে ছিলাম সেই অন্ধকারেই থাকিয়া গেলাম।
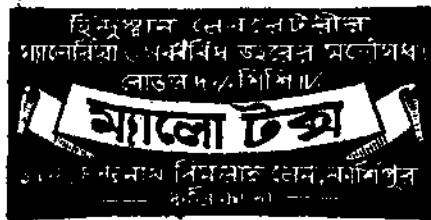
বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেট

গত ১৬ই আগষ্ট তারিখ বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেটের সাধারণ বার্ষিক সভায় কলি-কাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র মৌলবী ফজলুল হক এম, এল, এ সিণ্ডিকেটের ১৯৩৬-৩৭ বর্ষের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ হক প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হওয়ায় জনসাধারণ আমাদের ন্যায়ই আনন্দানুভব করিবেন এবং তাঁহার ন্যায় লোক পাইয়া সিণ্ডিকেটও গৌরবানুভব করিবেন। এখন আমাদের বক্তব্য এই, অবাঙ্গালী অধ্যুষিত এই বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেটের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীদের বহু অভিযোগ আছে। আশা করি, মিঃ হক তাহার প্রতিকারে মনোযোগ দিবেন এবং ভূতপূর্ব্ব প্রেসি-ডেন্ট মিঃ পি, ব্যানার্জ্জির মত পাইয়া-দের হাতের ক্রীড়ণ হইবেন না। বাসের অবাঙ্গালী চালক ও কণ্ডাক্টরদের আচরণ বাঙ্গালী মাত্রেই হাড়ে হাড়ে উপভোগ করিয়া থাকেন এবং মিঃ হকও যে তাহাদের আচরণের কিছু বিবরণ সংবাদপত্র মারফৎ অবগত নহেন, এমন নহে। এমতাবস্থায়, আমরা আশা করি, মিঃ হক সর্ব্বাগ্রে বাস চালক ও কণ্ডাক্টর-দের আচরণ সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া বাস আরোহীদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

আমারে বিদায় দাও

(গল্প)

শ্রীজীবানন্দ ঘোষ

ইডেন্‌-গার্ডেন্‌-এর একটা গেট দিয়ে রুণার হাত ধরে' বেরুতে-বেরুতে রঞ্জন আবার বললো, বল রুণা, তুমি আমাকে ভালবাসো। আবেগে তার কণ্ঠ কেঁপে উঠলো।

রুণা আগের ক'বারেরই মত এবারও একটু হাস্‌লো,—অবোধ্য সে-হাসি। সে-হাসি লোহার প্রাচীরের মত কঠিনও হ'তে পারে, আবার জলের মত স্বচ্ছও হ'তে পারে।

রঞ্জন এবার রুণার হাতখানি একটু জোরে চাপ দিয়ে তেমনি আবেগভরেই বল্‌লো, তাহ'লে তুমি কি আমার সঙ্গে এতোদিন ছিনিমিনিই খেললে, রুণা? ইডেন গার্ডেন-এর ভেতর যে-আমোদ এতক্ষণ করলে তা'ও কি একটা নতুন বইয়ের মহলারই মত হ'ল? তুমি কথা কও, আমাকে বুঝতে দাও, রুণা! আজ তোমাকে না সম্পূর্ণ করে' পেলে আকাশের ওই বড় চাঁদ আমাকে পাগল করবে। একটা বছর—একটা বছর প্রতীক্ষা করে' এসেছি—কথা কও!

ছি, লোকজন যাওয়া-আসা করছে, তা'র মধ্যে তুমি কি পাগ্‌লামি করছো, রঞ্জন? বল্লে রুণা।

পাগলামি! রুণার হাত থেকে রঞ্জনের হাতখানা পড়ে' গেল। একটা নিশ্বাস ছেড়ে সে বল্‌লো, পাগলামি!… বুঝেছি!…রুণা, জীবনে তুমি কখনো প্রেমে পড়োনি।

কি করে' বুঝলে? রুণা একটু হেসেই বল্‌লো রঞ্জনের দিকে চেয়ে।—কারণ, তোমার চোখে এটা ঠেকলো পাগলামি বলে'।…উঃ, কি কঠোর তুমি, রুণা! এত দিন তুমি—

ট্যাক্সিটাকে ডাকোতো! বাধা দিয়ে রুণা একখানি ট্যাক্সি দেখিয়ে রঞ্জনকে বল্‌লো।

রঞ্জন ট্যাক্সিটাকে ডাক্‌লো। দু'জনে তারপর উঠে ভেতরে বসলো।

শুন্‌বে রঞ্জন, রুণা খানিকপরে বললো, প্রেম খেলনা নয়। মানুষ তা'র জীবনে প্রেমে একবারই পড়ে এবং একজনেরই সঙ্গে। স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি ওগুলো অন্য-জাতের। ওদের সতবার ইচ্ছে যা'কে তা'কে দিয়ে তুমি নাম কিনে বেড়াতে পারো,—কিন্তু প্রেমের বেলা কেবল একবারই। ওর নকল নেই, ও চিরকালই আসল, খাঁটি। একবারেই ও নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়,—ওর নকল করা যায় না রঞ্জন। একটা গল্প মনে পড়ে' গেল। শুন্‌বে?

ট্যাক্সি চলেছে। নিস্তেজ কণ্ঠে রঞ্জন ছোট্ট করে' কেবল বললো, বল!

সত্যি, দুঃখ্‌ হয় রঞ্জন তোমার অবস্থা দেখে! রুণা বল্‌লো, থাক্‌গে, গল্প শোনো:

একটা মেয়ের সঙ্গে—আচ্ছা নামটা কি দেওয়া যায়? ধর,…ধর, শান্তি! শান্তির যখন, বয়স সতেরো, তখন তা'র সঙ্গে একটা ছেলে প্রেমে পড়লো। ছেলেটার নাম হ'ল ধরে' নাও, প্রশান্ত! শান্তিও প্রেম করবার পেলো এই প্রথম সুযোগ আর প্রশান্তও তাই। তা'দের প্রেমের অধ্যায়ের প্রথম জীবন নিয়ে দু'জনেই পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় করে' প্রেমে পড়ে' গেল। খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠতে থাকলো তা'দের দু'টো জীবন। শান্তির একটা ছেলে-মানুষির কথা শুন্‌বে, রঞ্জন? একবার, তা'দের বাড়ীর কাছাকাছি খুব কলেরার আমদানি হয়, তাতে প্রশান্তও আক্রান্ত হ'ল। তখন শান্তির, সে কি রাত জেগে সেবার কাজ! মা শীতলার কাছে তো পাঁচটাকা মানসিকই করে' বসেছিল শান্তি। প্রশান্ত ভালো হ'য়ে তাই, না শুনে হেসেই আকুল। শান্তিকে সে অপবাদ দিল ছেলে মানুষ বলে'।…

এমনি ভাবে চলে তা'দের দু'টো জীবন। জীবনের প্রথম প্রেম তা'দের সার্থক হোক্‌,—তা'দের দেখে অনেক শত্রু-মিত্র এ-কামনা করেছিল।

আঠারো বছর বয়সে, শান্তি ম্যাট্রিক পাশ করলো। প্রশান্ত তা'কে ভর্ত্তি করালো নিজেদের কলেজে লেডিস্‌ ডিপার্টমেন্ট-এ। কলেজে যেতো তা'রা একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে', লিজার টাইমএ তা'রা মিল্‌তো একসঙ্গে, ছুটি হ'লে আবার যেতো একসঙ্গে। দেখে কারুর ঈর্ষা হ'ত, কেউ হাস্‌তো, কেউ আবার শুভ-কামনাও করতো।

সত্যি, দু'জনের কাছে দু'জন, যেন একেবারে নিঃশেষ করে' হারিয়ে ফেলেছিল। সুন্দর, কি সুন্দর করেই না প্রশান্ত ডাক্‌তো শান্তিকে। আর শান্তি ডাকতো তার চেয়ে আরো মিষ্টি করে: প্রশান্ত-দা!…আকাশের অগণিত তারার নীচে বসে তারা কতদিন কত রকম করে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আলপনা দিয়েছে। প্রশান্তদের বাগানে সবুজ

ঘাসের ওপর বসে শান্তি কতদিন চুমো নিয়েছে প্রশান্তর কাছ থেকে। পূর্ণিমার রাতে কতদিন তারা শিউলি ফুলের গাছ-টার গোড়ায় হাতে হাত রেখে চুপচাপ করে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছে।

শান্তিরা খুব বড়লোক; কিন্তু সেই অনুপাতে তার একমাত্র বিধবা মা ছাড়া আর কেউই ছিলেন না।

প্রশান্তর কিন্তু সব কিছুই ছিল।

ক্রমে প্রশান্ত ইচ্ছে হ'ল, শান্তির সঙ্গে সে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবে। শান্তিও রাজী হ'ল এতে এবং সর্বান্তঃকরণে, কারণ সে জানতে পেরেছিল, এ-বিয়েতে পূর্ণতা লাভ করবে সে এবং তার প্রেম।

এর পর একটা বছর,—ঠিক একটা বছর কেটে গেল। দেখা গেল, তাদের বিয়ে তখনো হয়নি,…রঞ্জন, তারপর আর বল্‌বো না। এরপর শান্তির প্রেম হবে হত,—সে নিজে যাবে ব্যথায় ভেঙে।

না, তুমি সবটাই বল, রুণা—শুন্‌তে ভালো লাগছে। তেমনি নিজের ভাবেই রঞ্জন বললো।

তারপর কি জানো, রঞ্জন—। রুণা হঠাৎ মুখে হাতচাপা দিয়ে কেঁদে উঠলো।

অবাক্ হ'য়ে জিজ্ঞেস করলো রঞ্জন, কাঁদছো কেন রুণা?

রুণা চুপ করতে চেষ্টা করলো। চোখের জল মুছে বল্‌লো, না ঠিক কাঁদিনি, শান্তির দুঃখের কথা মনে হ'তে মনটা যেন কি রকম করে' উঠলো।…হ্যাঁ, তারপর তিন দিনের জ্বরে—কেবল তিনটি দিন বিছানায় পড়ে থেকে প্রশান্ত ফাঁকি দিয়ে চলে গেল শান্তির কাছ থেকে। এবারেও সে অনেক সেবা করেছিল তাঁ'র, তেমনি ঠাকুর-দেবতার কাছে মানসিকও করেছিল; কিন্তু প্রশান্ত বাঁচলো না—শান্তি তাঁকে বাঁচাতে পারলো না।

মরবার সময় শান্তির মাথাটাকে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে প্রশান্ত বলেছিল, আচ্ছা শান্তি বলতো, কি অপ-রাধ আমি ভগবানের কাছে করেছি যে, তোমার কাছ থেকে তিনি আমায় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন;…শান্তি, আমি মরতে চাই না! না না, শান্তি আমাকে তুমি বাঁচিয়ে তোলো। আমি তোমাকে ছেড়ে…শান্তি, বাঁচিয়ে রাখো আমায় দয়া করে'।

শান্তি তখন হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে প্রশান্তর গালের ওপর তার গালটা মিশিয়ে বলেছিল, মরতে আমি তোমায় দেবো না, প্রশান্ত-দা! আর তিনদিনের জ্বরেই বুঝি কেউ মরে? তুমি অমন কথা বোলো না প্রশান্ত-দা!

তারপর মরবার ঠিক পূর্বে প্রশান্ত আবার বলেছিল শান্তিকে, কিন্তু শান্তি তুমি আমাকে বাঁচাতে পারলে না। যাক্, তুমি পারো তো আমাকে ক্ষমা করো! তোমাকে আমি বড় দুঃখ দিয়ে গেলাম। দেখতে পাচ্ছি, সারাজীবনই তুমি বুক-ভরা ব্যথা নিয়ে বেঁচে থাক্‌বে, কিন্তু কি করবো শান্তি, উপায় নেই আমাকে যে তুমি বাঁচাতে পারলে না!

আর তারপর শান্তির অভিশপ্ত জীবন সত্যিই আচ্ছন্ন হ'ল ব্যথার বন্যা দিয়ে।… প্রশান্ত মরে যেতেই সে সেখান থেকে পালিয়ে গেল,—পালিয়ে গেল বহুদূরে। কি করে সে থাক্‌বে নিজের সেই বাড়ীতে?…সেখানে—সেই দূর দেশে গিয়ে এক হাসপাতালে সে একটা মরা ছেলে—।…ট্যাক্সি থামো!…আচ্ছা, আমি আসি রঞ্জন!

তারপর গল্পের শেষটা কি হ'ল? এবার একটু ব্যস্ত হ'য়েই রঞ্জন বল্‌লো।

শেষটা? ট্যাক্সির দরজাটা খুলতে-খুলতে রূপা বল্‌লো, শেষটা না শুন্‌লেও চলে। তারপর ট্যাক্সি থেকে নেমে: তা'র কারণ, শেষটায় শোনবার মতো আর কিছুই নেই বলে। শান্তি তারপর টিচারীর কাজ করতে লাগল একটা মেয়ে স্কুলে, আর সকাল-বিকেলে টিউশনিও করতে থাক্‌লো। আর তার পরেরটা তোমরা জানো।

আমরা জানি মানে?

জানো, যেহেতু—শান্তির আর এক নাম রূপা!—

এঁ্যা! দস্তুর মত চম্‌কে উঠলো রঞ্জন: এঁ্যা, তুমিই শান্তি?

হ্যাঁ রঞ্জন, আমিই শান্তি। তাই বলছিলুম, সব জিনিষ নিয়েই ছেলে-খেলা চলে, কিন্তু চলে না কেবল ভালোবাসা নিয়ে।...আচ্ছা, গুড নাইট, আর গুড নাইট্ নয় এবার, কারণ কাল থেকে শান্তি বল আর রূপাই বল—তা'কে তোমরা এখানে কেউ দেখতে পাবে না। সে আবার পালাবে এ-দেশ ছেড়ে। প্রশান্তকে সে একদণ্ডও ভুলে থাকতে পারে না, রঞ্জন। ভুলতে সে অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারে না।...আচ্ছা, চল্‌লুম!—বলেই সে চলে গেল এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করে।

রঞ্জন কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলতে পারলো না। কথা তার বন্ধ হয়ে এলো, শরীর এলো অবশ হয়ে।

ট্যাক্সি তারপর জোরে একবার হর্ণ বাজিয়ে সামনের মোড়টা ঘুরলো।

হলিউডের রূপসী

হলিউড সারা বিশ্বের চোখে বিভ্রম ও বিস্ময়ের দেশ। সে যেন রূপযৌবনের রাজ্য। সেখানে ঘর নাই, সংসার নাই স্বামী নাই, স্ত্রী নাই, বোন নাই—আছে শুধু নাচ, গান, হাসি, গল্প, নায়ক, নায়িকা, রূপ আর যৌবন!

কিন্তু আমেরিকার রূপ-এক্সপার্ট বলিতেছেন, না, তা নয়। হলিউডে রূপ আছে, যৌবন আছে;—স্নেহ মায়া প্রীতি প্রেমও আছে। তিনি বলিতেছেন, এ কথা সত্য, এখানে কিশোর বয়সের মেয়েরা রূপ সাধনা করে খুব অধ্যবসায় সহকারে। দেহে রূপ-যৌবনকে চিরন্তন করিয়া রাখিতে তাদের সাধনা তপস্যার মত। তারা বলে, রূপযৌবনের মাধুরী বিধাতার আদরের; বিধাতাকে আমরা চিরকিশোর ও সুন্দর বলিয়া কল্পনা করি, অতএব রূপযৌবনের সাধনায় আমরাই বা কেন বীতরাগ হইব?

এই রূপযৌবনের সাধনার জন্য সংসারকে তাঁরা অবহেলা বা উপেক্ষা করেন না। আমার কাছে যাঁরা রূপ-সাধনার জন্য আসেন, তাঁরা বয়সে কিশোরী বা তরুণী—তাঁরা বিবাহিতা; স্বামীর উপরে তাঁদের ভালবাসা বেশ গভীর—প্রেম নৈষ্ঠিক। রূপযৌবনের দৌলতে তাঁরা ধনী স্বামী শিকার করিয়া বেড়ান, এ ধারণা যদি কাহারও থাকে ত তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। অনেকেই অতি সাধারণ গৃহস্থ বা দরিদ্র স্বামীর ঘরণী। স্বামী কাজকর্ম করিবে ইহাই তারা চায়; তা সে কাজ কেরাণীগিরি হোক কিম্বা চাষের হোক—শুধু স্বামীর ভালবাসার কাঙাল তারা। স্বামীপ্রেমে পরম সুখ উপভোগিনী—বিলাস চান না, মোটরগাড়ী চান না—এ কথা বিশ্বাস করিবেন কি?

রূপ-এক্সপার্ট বলিতেছেন, এরা বলেন, গৃহ সংসার ছাড়া মেয়ে জাতের সুখ বা আনন্দ আর কোথাও মিলিবে না। তাঁদের জীবনের মন্ত্র—সমস্ত পৃথিবী হোক এক দিকে অপর দিকে আমি ও স্বামী। আমরা দু'জনে নির্ভয়ে আনন্দে জীবনতরী বাহিয়া চলিব।

যাঁহাদিগের সন্তান হইয়াছে, তাঁরা শিশুকে আমার কাছে আসেন। শিশু কেমন সুন্দর—কেমন হাসে—তার তারিফ করিতে সহস্র মুখ হইয়া উঠেন। তাঁরা বলেন, দু'পয়সার সাশ্রয় যদি হয়, তাহা হইলে ফিল্মে নামিব না কেন? বলা বাহুল্য, এ সব ছাত্রীর মধ্যে ফিল্ম ষ্টার কেহ নাই—সকলে সাজেন সখী বা নর্ত্তকী সজ্জে।

ফিল্মে খ্যাতিলাভ অনেকের মনের বাসনা,—প্রথমে তাদের মুখে অনেক কথা শুনি,—না, বিবাহ করিব না। ফিল্মে জীবনমন অর্পণ করিব। তারপর দেখিয়াছি, মনোমত পাত্রে জীবনমন সমর্পণ করিয়াছেন। বিবাহান্তে ফিল্মখ্যাতি বা অর্থ উপার্জ্জনে বাধা ঘটে না।

এভলিন বকলির কথা বলি। মেয়েটির বয়স ২১ বৎসর। সে বলিয়াছিল—না—বিয়ে পরে হতে পারবে,—আমি চাই ফিল্মখ্যাতি। তারপর বিবাহ করিতে কি আনন্দ এবং তার নিজের সুখের কথা, খ্যাতির বিনিময়ে বিবাহিত জীবনের সুখ ও আরাম ত্যাগ করিতে পারিব না।

আর্ণেষ্টিন এণ্ডারসন—অপরূপ রূপসী—বয়স বিশ বৎসর। প্রথমে বলিতেন,—আমি চাই স্বাধীনতা। ফিল্ম-অভিনয় কি উত্তেজনাময়—আমি তাহা করিব জীবনের

সাধনা। পরে ইনিও বিবাহ করিয়াছেন। কনষ্টান্স ডর্জান বলিয়াছিলেন—বিবাহ করিব নিশ্চয়।

যে সব ছাত্রী আমাদের কাছে রূপ-সাধনা করেন,—তাঁদের সাজসজ্জা খুব সাদাসিধে—জবড়জং পোষাক পরেন না। মুখশ্রী ও দেহের ছাঁদ—এই দিকেই থাকে তাঁদের লক্ষ্য। রুজ মাখিয়া বা বিচিত্র পোষাক আঁটিয়া তাঁরা সাজিতে চান না। সকলেই শিক্ষিতা—সকলেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুব হুসিয়ার। সকলেরই গ্রেশ, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব বেশ সুপরিস্ফুট। রূপ-এক্সপার্ট বলিতেছেন—আমাদের ছাত্রীদের সম্বন্ধে হলিউডের বিখ্যাত ষ্টুডিও কর্তৃপক্ষ বলেন,—মেয়েগুলির দিকে চাহিলে চোখ জুড়ায়। যেমন মুখ, তেমনই ছন্দে রচা দেহ।

মেয়েদের রূপের আদর্শ সম্বন্ধে হলিউডের মত নারী থাকেন প্রথম দর্শনেই নয়নরঞ্জিনী। রঙ মাখায় রূপ বা সৌন্দর্য্য খোলে না। গঠন রূপের মূলীভূত আদর্শ।

আইরিশ লাক্সাইার বলিয়াছিলেন—আমি বিবাহ করিব না। গ্রেটা গার্বো ও ক্যাথারিণ হেপবার্ণের মত আমি হ'ব ফিল্ম-সাধিকা। বিবাহ করিব না।

মেয়েটি ফিল্মে অভিনয় করিতে যান। ছ'মাস পরে তিনি হইলেন গম্ভীর—প্রেমার্ত্তা। ষ্টুডিয়োর প্রেম নয়—কোন ষ্টারকে ভালবাসেন নাই—ভালবাসিলেন প্রতিবেশী এক যুবককে। পাত্রটি কোন অফিসে মেকানিকের কাজ করে। শেষে তাকেই বিবাহ করিয়া বসিলেন আইরিশ। বিবাহ করিয়া চরম সুখভোগ করিতেছেন।

চিঠি

(গল্প)

আইজাক ব্যাবেল

আমাদের সৈন্য-বিভাগে কুরডিয়াক নামে এক যুবক এই চিঠিখানি বাড়ীতে তাহার মার কাছে লিখিয়াছিল। চিঠিখানি মনে করিয়া রাখিবার মত। আমিই তাহার হইয়া ইহা লিখিয়াছিলাম। সে যেমন বলিয়াছিল, আমি তেমনই লিখিয়াছিলাম। কোথাও কোনরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া ঠিক যেমনটি লিখিয়াছিলাম, অবিকল সেইরূপ উদ্ধৃত করিতেছি।

"মা,

গোড়াতেই তোমাকে জানাইতেছি, ভগবানের কৃপায় আমি এখন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছি ও শারীরিক কুশলেই আছি। ইচ্ছা হয়, যদি তোমার নিকট হইতেও তাই শুনিতে পাইতাম! আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি—তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর······

[এখানে কয়েকজন আত্মীয় স্বজনের নাম ছিল। আমরা সে গুলি বাদ দিয়া পরের অনুচ্ছেদে যাহা আছে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম]

মা, বর্ত্তমানে আমি কমরেড বুডেনির "লাল সওয়ারের" দলে আছি। নিকন ভাসিলিচও এই দলে আছেন। তিনি এখন লাল পল্টনের একজন খ্যাতনামা সৈনিক। আমি পোলিটোডেল অভিযানে যোগ দিয়াছি। সেখানে আমরা আমাদের অধিকৃত স্থানে বিবিধ সাহিত্য ও সংবাদ পত্র প্রেরণ করি—মস্কোর ইস্তেস্‌ডিয়া প্রাভদা ও আমাদের নিজেদের 'রেড ক্যাভালরিম্যান' (লাল সওয়ার) রণক্ষেত্রের প্রত্যেক সৈনিক এগুলি পড়িতে ভালবাসে। মোটের উপর নিকল ভাসিলিচের সঙ্গে আমি চমৎকার আছি।

মা, তোমার ক্ষমতায় কুলায় এমন কিছু আমাকে পাঠাইবে। আমার অনুরোধ, তুমি আমাদের সেই রংবেরঙের শুয়োরটাকে মারিয়া পার্শেল করিয়া ভাসিলি কুরডিয়াকভ এই নামে কমরেড বুডেনির পোলিটোডেল পাঠাইয়া দিও। প্রতি রাত্রে আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়া শুইতে যাই। গায়ে দিবার জন্য একটা কম্বল নাই,
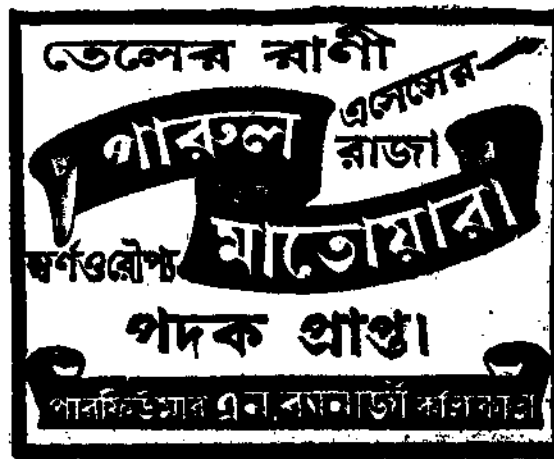
সেজন্ম শীতে বড় কষ্ট হয়। আমার ঘোড়া বাঁচিয়া আছে কিনা জানাইও। তার সম্বন্ধে সব খবর দিও—এখনো সে চলিতে গিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটে কি না, তার সামনের পা দুটার এখনো পাঁচড়া আছে কি না, তাকে লাল-বন্দী করা হইয়াছে কি না—সমস্তই আমাকে জানাইও। আমার অনুরোধ, তার সামনের পা দুটো প্রত্যহ সাবান দিয়া ধুইয়া দিও—ইহাতে যেন অন্যথা না হয়। সাবানটা আমি পুতুলগুলির পিছনে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। বাবা যদি সেটা খরচ করিয়া ফেলিয়া থাকেন, তবে ক্রাসনোডার থেকে একটা কিনিয়া লইও।

আমরা যেখানে আছি সে দেশ বড়ই গরীব। এখানকার চাষীরা সকলেই তাহাদের ঘোড়াগুলি লইয়া লাল সৈনিকের নজর এড়াইবার জন্য বনে লুকাইয়া আছে। গম শস্য বড় দেখা যায় না। যা দেখা যায় তাও এত ছোট যে দেখিলে হাসি পায়। এদেশের জমির মালিকেরা গম ও যব একসঙ্গে বোনে। তাছাড়া এখানে "হপ" নামক এক প্রকার লতা জন্মে, সেগুলি দেখিতে বেশ সুবিন্যস্ত বলিয়া মনে হয়! এই লতা হইতে এখানকার লোকেরা এক প্রকার বে-আইনী মদ তৈয়ার করে।

এইবার আমি বাবার সম্বন্ধে কিছু বলিব, অর্থাৎ প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি কিভাবে কিডর টিমোফিচ কুরডিয়াকভ্‌কে খুন করিয়াছিলেন তাহা তোমাকে জানাই। আমাদের দলে যখন বিশ্বাসঘাতকতা দেখা দেয় সে সময় কমরেড পাভলিচেনকোর অধীনস্থ লাল পল্টন দুর্দ্দমনীয় আক্রমণ করিয়াছিল। বাবা সে সময় ডেনিকিনের ফৌজে একটি সৈন্য বিভাগের সেনাপতি ছিলেন। যারা দেখিয়াছে তারা বলিত, পুরাতন গবর্ণমেন্টের আমলে যে ভাবে মেডেল পরা হইত, তারা নাকি সেইভাবে মেডেল পরিত। এই বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য আমাদের সকলকে বন্দী করা হয়। তখনই ভাই কিডরের উপর বাবার নজর পড়ে। কিডরকে দেখিবা মাত্রই বাবা তাহাকে ধরিয়া কুচি কুচি করিয়া কাটিতে আরম্ভ করেন ও অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে থাকেন। সন্ধ্যা বেলা তাহার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে নৃশংসভাবে কাটা হয়। আমি তখন তোমাকে চিঠি লিখিয়াছিলাম—তাহাতে জানাইয়াছিলাম, কিডরের কবরের উপর ফুল না দিয়া তাহাকে মাটীর নীচে প্রোথিত করা হইয়াছে। কিন্তু বাবা সে চিঠি ধরিয়া ফেলেন ও বলেন—"তোরা ত তোদের মায়েরই সন্তান, তোদের শিরায় ত তারই রক্ত। সে একটা ছাবলা স্ত্রীলোক। তোরা আর বেশী ভাল কি করে হবি। আমার জীবন ত গেছেই। তোদেরও আমি আস্ত রাখবনা। তোদের হাতে আমাকে যীশুখ্রীষ্টের মত যন্ত্রণা পেতে হয়েছে।" আমি তাড়াতাড়ি বাবার নিকট হইতে পালাইয়া কোন প্রকারে কমরেড পাভলিচেনকোর বিভাগে পৌঁছিলাম। আমাদের পল্টনের উপর ভোরোনেজ সহরে যাইবার হুকুম হইল। আমরা সেখানে গেলাম। আমরা কয়েকটা ঘোড়া, কিটব্যাগ, রিভলভার ও অন্যান্য যা কিছু দরকার সমস্তই পাইলাম। ভোরোনেজ সহরটী ছোট হইলেও বেশ সুন্দর। ক্রাসনোডারের চেয়ে আয়তনে বড়। সেখানকার অধিবাসীরা দেখিতে খুবই সুন্দর। যে নদীটা ইহার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত, সেটাও স্নান করিবার পক্ষে চমৎকার। সেখানে আমাদের ভাগ্যে প্রতিদিন দুই পাউণ্ড করিয়া রুটী, আধ পাউণ্ড মাংস ও যথেষ্ট পরিমাণ চিনি জুটিত। সকাল বেলা উঠিয়া আমরা মিষ্টি চা খাইতাম, বিকাল বেলাও তাই পান করিতাম। ক্ষুধা যে কি জিনিষ সে কথা—ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। রাত্রের খাবারের বেলা মাংসপো আর শিক কাবাবের জন্য ভাই সেমিয়ন টিমোফেচ এর কাছে যাইতাম। তারপর শুইতে যাইতাম। এই সময় সেমিয়ন টিমোফেচের অসীম সাহসে মুগ্ধ হইয়া পল্টনের সকলেই তাহাকে সেনাপতিরূপে চায়। কমরেড বুডেনিও সে আদেশ দেন। ফলে সে দুইটা ঘোড়া, চমৎকার জামা কাপড়, আসবাবপত্রের জন্য একটা গাড়ী ও মেডেল পায়। আর আমি যে তার ভাই সে কথাও সকলে জানিত। সেমিয়ন টেমোফিচের এখন এত ক্ষমতা যে কোন প্রতিবেশী তোমাকে এখন বিরক্ত করিলে সে তা হলে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে পারে,—সে অধিকার তার আছে। তারপর আমরা জেনারেল ডেনিকিনের পশ্চাদ্ধাবন করিতে আরম্ভ করি এবং তাহাকে তাড়াইয়া সোজা কৃষ্ণ সাগর পর্য্যন্ত লইয়া যাই। কিন্তু বাবাকে কোথাও দেখিতে পাই নাই। সেমিয়ন টেমোফেচ ভাই কিডরের অভাব বড়ই অনুভব করিত, সেজন্য সে বাবাকে সর্ব্বত্র পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়াছিল। মা, তোমার ধারণা বাবা একজন একগুঁয়ে প্রকৃতির লোক। কিন্তু তিনি কি করিলেন জানো? তিনি মাইকপ সহরে সামরিক পোষাক ছাড়িয়া নির্লজ্জের মত নিজের লাল দাড়ি রাঙাইয়া কালো করিলেন,

সহরের কেউ জানিতেও পারিল না—যে তিনি পুরাতন গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ একজন পুলিশের কর্মচারী। কিন্তু এরূপভাবে আত্মগোপন করিয়া আর কয়দিন থাকা চলে! সত্যের হাত হইতে ত আর নিষ্কৃতি নাই। তোমার ধর্মপিতা নিকল জানিলিচ একদিন দৈবাৎ তাহাকে সহরের জনৈক বাসিন্দার কুটীরে দেখিতে পাইয়া চিঠি দিয়া সেকথা সেমিয়ন টিমোফেচকে জানাইয়া দেন। আমরা ঘোড়া ছুটাইয়া দুই শত মাইল চলিয়া আসিলাম—আমি, ভাই সেমিয়ন, আরেকজন ছোকরা।—সেও এই আমোদে যোগ দিতে চাহিয়াছিল।

মাইকপ সহরে আমরা কি দেখিলাম জান? দেখিলাম যে সকল লস্কর পার্শ্বরক্ষক ছিল রণক্ষেত্রবর্ত্তী সৈন্যদের প্রতি তাহাদের কোন সহানুভূতি নাই। শুধু তাই নয়, দেখিলাম সহরের সর্ব্বত্র পুরাতন আমলের মত কেবলই বিশ্বাসঘাতকতা আর ইহুদীর দল! সেমিয়ন ইহুদীদের সঙ্গে অনেক বচসা করিল। কিন্তু ইহুদীরা বাবাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিবে না। তারা তাহাকে জেলখানার তালা চাবি দিয়া বন্দী করিয়া রাখিল।—বলিল, কমরেড ট্রট্স্কীর নিকট হইতে আদেশ আসিয়াছে যেন কোন বন্দীকে হত্যা করা না হয়। আপত্তি ক'রোনা, আমরাই তার বিচার করব। তার যে শাস্তি প্রাপ্য তাই তাকে দেওয়া হবে। কিন্তু অবশেষে সেমিয়নেরই জয় হইল। সে প্রমাণ করিল, সে পল্টনের সেনাপতি, কমরেড বুডেনির নিকট হইতে সে সমস্ত ক্ষমতা পাইয়াছে। যারা বাবাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, যারা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে রাজী হয় নাই, সে তাহাদের সকলকেই বন্দী করিবার ভয় দেখাইল। আমাদের দলের অন্যান্য যুবকরাও ইহাতে তাহার সহিত সায় দিল। সেমিয়ন বাবাকে নিজের হাতে পাওয়া মাত্র তাহার সর্ব্বাঙ্গে চাবুক মারিয়া আঘাত করিতে লাগিল এবং তাহার যে সকল অনুচর ছিল তাহাদিগকে চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করাইল। তারপর সে বাবার গায়ে খানিকটা জল ছিটাইয়া দিল। সে জল রক্ত লাগিয়া লাল হইয়া তাহার দাড়ি বহিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সেমিয়ন প্রশ্ন করিল—

"আমার হাতে থাকা কেমন লাগছে বাবা?"

"মোটেই ভাল লাগছে না।"

"তুমি যখন ফিডয়কে কুচি কুচি করে কেটেছিলে তখন কি তার ভাল লেগেছিল?"

"না, তা লাগেনি।"

"তখন কি মনে হয়েছিল তোমারও পালা আসবে?"

"না, আমার পালাও যে আসবে ভাবিনি।"

তখন সেমিয়ন জনতার দিকে ফিরিয়া বলিল—

"আমার মনে হয় আমি যদি তোমাদের হাতে পড়ি, আমার প্রতি কোন দয়া দেখান হবে না। বাবা, এবার আমরা আপনার জীবনের অবসান ঘটাব···"

এই কথা শুনিয়া বাবা নিতান্ত উদ্ধত-ভাবে সেমিয়নকে মা তুলিয়া গালাগাল ও অভিশাপ দিতে লাগিলেন। তিনি সেমি-য়নের চোয়ালে সজোরে চপেটাঘাত করি-লেন। সেমিয়ন আমাকে প্রাঙ্গন হইতে সরিয়া যাইতে বলিল। তাহার কথামত আমি সরিয়া গেলাম, কাজেই বাবাকে কি ভাবে হত্যা করা হইল আমি তাহা বলিতে পারিব না।

তারপর আমরা নভোরোসিস্ক সহরে ছাউনি ফেলিলাম। এই সহরটীর বাইরে কোন জমি নাই, আছে শুধু কৃষ্ণ সাগরের বিস্তীর্ণ জলরাশি। আমরা মে মাস পর্য্যন্ত সেখানে ছিলাম। সেখান হইতে আমরা পোলাণ্ডের যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছি এবং পোলদিগকে যথাযোগ্য শিক্ষা দিয়াছি।

এই কুরডিয়াকভের চিঠি। চিঠিখানা লেখা শেষ হইলে কাগজখানা সে তাহার হাতে লইয়া বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

আমি প্রশ্ন করিলাম—"কুরডিয়াকভ, তোমার বাবা কি খারাপ লোক ছিলেন?"

সে অপ্রসন্ন ভাবে উত্তর দিল—"বাবার কথা বলোনা, তিনি একটা পশু ছিলেন।"

"তোমার মা—?"

"তার সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নেই। এই আমাদের পরিবারের ফটো, দেখলে দেখতে পার···"

সে একটা ভাঙ্গা ফটোগ্রাফ আমার হাতে দিল। তাহাতে টিমোফি কুরডিয়া-কভের প্রতিকৃতি দেখিলাম—প্রশস্ত স্কন্ধ, ইউনিফর্ম্ম পরিহিত পুলিশ অফিসার, দাড়ি সুন্দর করিয়া আঁচড়ান, উন্নত কপোল ফলক, নির্ম্মল ফিকে চক্ষু দুইটীতে এক-প্রকার দ্যুতি। তাহার পার্শ্বে বাঁশের চেয়ারে ঢিলা ব্লাউজ পরা একদল ক্ষুদ্রাকৃতি কৃষক রমণী,—কৃশ, উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ চেহারা, দেয়ালের সম্মুখে, কতকগুলি ফুল ও পায়-রার পট ভূমিকার উপর দুইজন যুবকের মূর্ত্তি—বৃহৎ বপু, বিশাল স্কন্ধ, বোকাটে ভাব, তারার মতন চক্ষু দুইটি স্ফূর্ত্তিহীন, যেন পাঠাভ্যাস করিতেছে। ইহাদের একজন ফিডর, অপর জন সেমিয়ন।

(অনুবাদ)

স্বপ্নে

—শ্রীরসময় দাশ

জেগে দেখায় অনেক বাধা
 স্বপ্নে বাধা কিছুই নাই,
ঘুমের ঘোরে তোমার সাথে
 মিলন আমার সর্ব্বদাই।
দিনের বেলা মুখের পানে
চাইতে নারি স্থির নয়নে,
লজ্জা এসে নষ্ট করে
 মনের সকল আশাটাই!
রাত্রে যবে নীরব ধরা
 শুক দিনের কোলাহল,
নিদ্রাপরী স্বপ্ন পুরীর
 দেয়গো খুলে সব আগল।
তখন হঠাৎ কেমন ক'রে
ঝাঁপিয়ে পড়ি বুকের 'পরে;
লজ্জা ত নেই, মুখের পানে
 চেয়েই থাকি অবিরল।
দিনের বেলা কইনে কথা
 কেউ যদিবা মন্দ কয়,
গাঁয়ের লোকের নিয়ম কানুন
 তাও ত কিছু মান্‌তে হয়!
বল্‌তে কি আর, এটাও ভাবি,
পাছে আমার অধিক দাবী
তোমার করুণ স্নেহের মাঝে
 ঘটায় বিষম বিপর্য্যয়!
রাত্রি আমার ধৈর্য্যময়ী
 নিদ্রা সুধা সান্ত্বনায়,
স্বপ্নে যদি মিলন ঘটে
 বল্‌বে না কেউ মন্দ আর!
নিশযোগে ঘুমের ঘোরে
নীরবে মোর অধর 'পরে
নিত্য ঝরে ফুলের মত—
 থাক্, বেশী না বল্‌বো আর!

'রাঙ্গা দি'র থলে

আশ্রমের সকল দিদির সেরা রাঙ্গা দিদি। সংসারে অরুচি রোগ ধরায় সহজ মীমাংসার পথ নদীর তীরের সেই নিকট পোলটায় এসে স্থায়ী বাসাড়ে হয়েছেন। নীলাম্বরীতে অঙ্গখানি ঘেরা। বেদাগ কুলীন মুখুয্যে মশায় কোথায় যেন ঘর জামাই ছিলেন। ব্যবসায় হাত পাকিয়ে এখানে এসে ঘর জামাই হয়েছেন। খুব হুঁসিয়ার আদমী। কঠোর সত্যের সাধক। খাটি-খালে বিশেষ অরুচি দেখা যায় না। সকলে ঠাট্টা করিয়া বলে, 'রাঙ্গাদির থলে।' এর অর্থ বুঝতে হলে কিছুটা গবেষণার দরকার। কিন্তু সেটা অন্তকার করণীয় কার্য্য নয়। সেদিন দেখি কুলীনদা বিলক্ষণ বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। রাঙ্গাদি তীর বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। গুটি গুটি অগ্রসর হয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি দাদা! দিন পুরো হয়ে গেছে নাকি! দাদা হাসিয়া উত্তর করিলেন, এ সেরেস্তায় আর মাথা গলাবার লোক নাই ভায়া। মারকৎদার রূপে আমিই যা কিছু কামিয়ে নিচ্ছি। খসড়াটা আর বিশেষ কারো দেখবার প্রয়োজন্ হবে না। মজলিসের দিনটা ওর মাটি নিয়েছে। তাই সভার শেষ হবার জন্ত খানিকটা পোষাকী হয়েছেন। এ বস্তুর কদর করবার আমি ছাড়া আর "চ্যাপটার-টু" নাই। হাসিয়া বলিলাম, তা'হলে রাঙ্গাদি আপনার রুপদানী। তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, কিছুটা কাছিয়েছে ভাই। হারু খুড়ো কিছু বলবার জন্তে ফাঁক খুঁজছিলেন। চট্ করে প্রশ্ন করে বসলেন, 'নির্জ্জলা প্রেমটা তাহলে বিগড়ালো কেন? কুলীনদা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, খোকটা এখনও যায় নি খুড়ো। কড়া মশলা যে পেটে সইবে না, এই বেঁকে-পড়া নলচেটাতেই যে তামাকু টানতে হবে এ কথা তোমায় হলপ করে বলে রাখছি। তবে কি জান, ঐ যে কথায় বলে, 'এর ঘরে ঘর করতে গেলে'।—কুলীনদার অৰ্দ্ধস্ফুট কবিতাটা এইখানেই ধামা চাপা পড়িয়া গেল সহসা রাঙ্গাদির পালোয়ানী আবির্ভাবে। মনে হল যেন কাল-বৈশাখীর একটা ক্ষিপ্ত দানা অকস্মাৎ ঝাপাইয়া পড়িল। দু'চারটা তর-বেতর মোগল বাদশাই চালিয়ে রাঙ্গাদি বলে উঠলেন, কেন আমার জন্ত মনোকষ্ট পাও ভদ্রলোক। বলি তুমি যে আমার পুং সতীন তাকি মিছে?

"যত তরুণীর হয়েছ পাণ্ডা
বৃদ্ধ আফিম-খোর"।

লজ্জাও একটু বাধা দিল না। কথাটা যখন ফাঁসই হয়ে গেছে বলে ফেলি। রাখালীর ঘরে যে তোমার এত ঘন ঘন যাতায়াত কোন পাওনা-গণ্ডার জন্ত বল দেখি? আর ঐ যে সেদিন বরুণাকে নিয়ে গঙ্গায় স্নান করতে গেলে তারই বা মানে কি? ঠাকুর কি তোমার জন্ত এখানে শ্বশুরবাড়ী বানিয়ে রেখেছেন যে একবার এ ঘরে একবার ও ঘরে উড়ে উড়ে বেড়াবে। ঠাকুর না হয় আড়তদারী ব্যবসা করেন। তোমার ঘটেও ত অন্ততঃ কিছু বুদ্ধি থাকা দরকার।

"সব তেলটুকু যার গেছে পুড়ে
সে চায় জ্বালাতে বাত্তি"।

দেখে হাসিও আসে আবার কান্নাও পায়। শিকায়ে না হয় সিদ্ধহস্তই আছ। দু'চারটা বাৎচিৎও যে না জান তা নয়। তাই বলে এত বড় সম্পর্কের সাহস নিয়ে মেয়েদের সামনে দাঁড়াবার তোমার না আছে বয়স না আছে পুঁজি। একি, আমি মিছামিছি খুট খুঁজে বেড়াচ্ছি। বুকে বেঁধে বলেই এ সব কথা বলা। সেদিন এসে জঙ্গলীদি বলে গেল, তোমার থলেটিকে একটু সামলে রেখ রাঙ্গাদি। কথাটা অবশ্য একটু গোপনেই বলেছিল। কিন্তু এ সব সুখবর ত চাপা থাকে না মশায়। পিছন থেকে দেশরাণীদি শুনে বলল, থলেটির ত দেখি দুঃসাহসের অন্ত নেই। ফরিদপুরের সেই কচি মেয়েটা ওজন করলে এক কাঁচ্চা হবে কিনা সন্দেহ, উনি পোনের ছটাক হয়ে তার বুকের কাছে চেপে বসলেন। চক্ষু বুজে ত আর কেউ ছিল না। সবই দেখলে। তোদের কি কথা হচ্ছে লা বলে কমলাও এসে আস্তে আস্তে দাঁড়াল। তারপর এল অলকা। সবাই শুনল। রাঙ্গাদি বলিতে বলিতে এতটাই উত্তেজিত হয়েছিল যে অবশেষে দেখা গেল দিদি ঠাকুরাণীর দাঁত আর তার থলেটীর গালের ব্যবধানে, 'তিল ঠাই আর নাহি রে'। কুলীনদা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। হারুখুড়ো সপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কামড়টা কি বড্ড লাগল মুখুয্যে মশায়?

ছায়া ও কায়া

শ্রীমধু বসু

রঙমহলে প্রভা

"একে একে নিভিছে দেউটী! বাংলার খ্যাতনামা নাট্যাচার্য্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী সম্প্রতি এমন একজন অভিনেত্রীকে হারালেন যে অভিনেত্রী সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষ যাবৎ তাঁরই দলে কাটিয়ে এসেছেন। আপদে বিপদেও যে অভিনেত্রী তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র যান নি, অর্থের দিক দিয়ে যিনি ক্ষতিগ্রস্তা হয়েও তাঁরই দলে পড়ে ছিলেন, অসুস্থ শরীর নিয়েও যিনি কঠিন কঠিন অংশগুলিতে অবতীর্ণ হয়ে দলের ইজ্জৎ বাঁচিয়ে এসেছিলেন সেই অভিনেত্রী বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রভা অকস্মাৎ শিশির সম্প্রদায় পরিত্যাগ করে রঙমহলে যোগদান করেছেন কেন?

রঙ্‌মহল

আজ এখানে নতুন সামাজিক নাটক 'কমলাণীর সংসার' প্রথম অভিনীত হবে। কোন বিদেশী নাট্যকারের রচনা হতে উপাদান সংগ্রহ করে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এখানা রচনা করেছেন। শুনেছি, নাটকখানা ভাল হয়েছে এবং আশা করি নাট্যকারের খ্যাতি এর জন্য আরো বর্দ্ধিত হবে। মিঃ সতু সেন এককভাবে যে কয়খানা নাটক প্রযোজনা করেছেন তার একখানাও সাফল্যমণ্ডিত হয় নি, কারণ [illegible] নিকৃষ্ট ছিল। এবার তিনি [illegible] যদি যোগ্য নাটক পান তাহলে নিশ্চয় অসামান্য কৃতিত্ব দেখাতে পারবেন বলে আশা করি। এর গানে সুর দিয়েছেন কাজী নজরুল ইস্‌লাম,—সুতরাং গানগুলি নিশ্চয়ই শ্রুতি সুখকর হবে। ভূমিকায় নামছেন সম্প্রদায়ের সমস্ত কুশলী নটনটীগণ, তার ওপর নামছেন শ্রীমতী প্রভা।

নব নাট্যমন্দির

শরৎচন্দ্রের 'অচলা' সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে মঞ্চস্থ হবে। ভূমিকালিপি সম্ভবতঃ এইরূপ হবে, যথা—কেদার শিশিরকুমার, সুরেশ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, মহিম—শৈলেন চৌধুরী, রামবাবু—শীতল পাল, অচলা—কঙ্কা, মৃণাল—রাণীবালা প্রভৃতি।

কাণে এল কোন প্রসিদ্ধা সুন্দরী ছায়াচিত্রাভিনেত্রীকে সম্প্রদায়ভুক্তা করবার চেষ্টা চলছে। ইনি কি কঙ্কাবতীর সহোদরা চন্দ্রাবতী?

নাট্য-নিকেতন

'আলাদীন' পূর্ব্বাপেক্ষা জমাট হয়েছে। নৃত্য-গীত এবং অভিনব দৃশ্যপট দেখতে যারা ভালবাসেন তারা এখানা দেখতে যেন বিলম্ব না করেন। কেদার রায় পূজার বাজারও সরগরম রাখতে পারবে বলে কর্ত্তারা আশা রাখেন, সুতরাং ও সময় এখানে নতুন নাটকাভিনয়ের সম্ভাবনা নেই। গত সপ্তাহে নাট্যনিকেতন [illegible] আহূত হয়েছিলেন।

মিনার্ভা

'দস্যু' এখনও সাফল্যের সহিত চলছে। মিনার্ভার খ্যাতনামা প্রযোজক প্রসিদ্ধ চিত্র-পরিচালক শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষ ঘোষের আকর্ষণ কাটিয়ে এখানেই রয়ে গেছেন।

পূজার সময়ে নতুন নাটক এরা মঞ্চস্থ করবেন কি না জানা যায় নি, তবে তার সম্ভাবনা কম, কারণ 'দস্যু'ই সে সময় বাজার সরগরম করে রাখবে।

রূপমহল

অভিনেতৃ সঙ্ঘ পুনরায় চিত্রা রঙ্গালয়ে নিয়মিতভাবে অভিনয় করছেন। তাদের নতুন নাটক শুনছি শিগগিরই খোলা হবে। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও এদের প্রযোজক ও প্রধান নটরূপে আছেন। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ রঙ্গাভিনেতাদ্বয় ললিত মিত্র ও আশু বোস পুনরায় নাট্যনিকেতনে যোগ দিয়েছেন—তাঁরাই অভিনেতৃ সঙ্ঘ গঠন করেছিলেন—এখন কেন যে ছাড়ছেন তা বোঝা দায়।

'রজনী'—রূপবাণী

সাহিত্য সম্রাট ৺বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী'র কথা জানেন না এমন বাঙ্গালী আছে কি? সেই অন্ধ ফুলওয়ালী যুবতীর জন্য সহানুভূতি কার না আছে—কে না তাকে ভালবাসে? 'রজনী'র নাট্যরূপ কয়েক বছর পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব আর্ট থিয়েটারে (ষ্টারে) অভিনীত হতে দেখেছিলাম—নাট্যরূপদাতা ছিলেন স্বর্গীয় নট-নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই রূপ হয়েছিল অনবদ্য; সে নাট্যরূপের কথা আজও মনে আছে। যেমন চমৎকার রূপ—তেমনি হয়েছিল তার প্রযোজনা—অভিনেতৃবর্গও অভিনয় করেছিলেন প্রাণ ঢেলে। যেদিন যাঁরা ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার প্রতিটিও

যতদূর মনে আছে দিলাম, যথা—অমরনাথ—অহীন্দ্র চৌধুরী, হীরালাল—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, রামসদয়—কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, শচীন্দ্র—সন্তোষ সিংহ, লবঙ্গলতা—নীহারবালা, রজনী—সুশীলা (ছোট), চাঁপা—সরস্বতী প্রভৃতি। প্রত্যেকটী চরিত্রের অভিনয় হয়েছিল উচ্চ শ্রেণীর, তন্মধ্যে সবাইকে ছাপিয়ে গেছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য—তাঁর হীরালাল যারা দেখেছিলেন তারাই অসঙ্কোচে স্বীকার করবেন এই হীরালাল একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি। স্বর্গীয়া অভিনেত্রী সরস্বতীর চাঁপাও হয়েছিল অনবদ্য। সেই অভিনয় কি চিত্র পরিচালক জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেন নি ?

নির্ব্বাক ছবি রজনীও দেখা গেল—ভাল লাগে নি—বোধ হয় এই জ্যোতিষ চন্দ্রই পরিচালক ছিলেন। ভূমিকায় নেমেছিলেন—হীরালাল—দুর্গাদাস বন্দ্যোঃ, শচীন্দ্র—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, অমরনাথ—একজন অবাঙ্গালী নট, লবঙ্গ—লাইট, রজনী—লীলাবতী (কাশ্মিরী)।

সেই 'রজনী'র সবাক রূপ হল—দেবদত্ত ফিল্মস এই রূপদাতা। নতুন ষ্টুডিয়ো, সে হিসাবে এদের টেক্‌নিক্যাল দিকটা খারাপ তেমন হয় নি। আসলে ক্ষতি যা হয়েছে তার জন্ম সম্পূর্ণরূপে যিনি দায়ী তিনি হচ্ছেন বাংলা চিত্রজগতের অন্যতম ঘুঘু শিল্পী শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্র-নাট্যকাররূপে তিনি যে রচনার পরিচয় দিয়েছেন তাতেই যে ছবির সব নষ্ট হয়ে গেছে এ কথা কে অস্বীকার করবে ? যদি চিত্রনাট্য ভাল হত তাহলে হয়তঃ 'রজনী' প্রশংসা লাভে সমর্থ হত। মূল উপন্যাসকে সামনে না রেখে জ্যোতিষচন্দ্র যদি অপরেশচন্দ্রের নাট্যরূপ অবলম্বন করে চিত্রনাট্য রচনা করতেন তাহলে 'রজনী' এতটা খারাপ হত না। প্রায় স্থানেই দেখা গেল কোন পাত্র বা পাত্রী অতীতের কিছু বর্ণনা করছেন অমনি সেই বিষয়ের ছবি পটে ভেসে উঠল—চিত্রনাট্য রচয়িতার শক্তি যে কত কম তার পরিচয় পাওয়া গেল।

জ্যোতিষচন্দ্র দেখান নি কি জন্ম শচীন্দ্র রজনীকে বিবাহে রাজী নন—তাদের অতুল বিষয় সম্পত্তি হারাবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও। হীরালালের চরিত্রটীও পূর্ণরূপে চিত্রিত হয় নি—লেখক একে দিয়েই হাস্যরসের পরিবেশন করতে পারতেন—তা না করে তিনি কোথা হতে গোপাল চাঁপার দ্বৈত গীত দিয়ে, পরিচারক পরিচারিকার বিশ্রি চরিত্র সৃষ্টি করে, পরিচারিকার মুখে কুশ্রাব্য কথা দিয়ে দর্শকদের জোর করে হাসাতে চেয়েছেন। বঙ্কিম চন্দ্রের গল্পে এ সব তিনি প্রবেশ করিয়েছেন। রজনীকে পরিচালক কেবল কাঁদিয়েছেন—অথচ মূল চরিত্র ভিন্নরূপ। রজনী জন্মান্ধ, কিন্তু তাকে দেখলে অন্ধ বলে মোটেই বোঝায় না। চমৎকার সুন্দরী সে। চিত্রনাট্য নিয়ে বেশী কিছু আলোচনা করে লাভ কি—সকলেই মূল কাহিনীর সহিত পরিচিত আছেন। অপহৃতা রজনীর উদ্ধার সময়ের দৃশুটী সংক্ষিপ্ত করা দরকার, শচীন্দ্র কেন 'ধীরে রজনী, ধীরে' বলে তাও বিশ্লেষণ করে দেখান উচিৎ—রজনীকে বিবাহে স্বীকৃত করবার জন্ম ব্রহ্মচারী তান্ত্রিকমতে ব্যবস্থা করে, রজনী পরমা সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও শচীন তাকে বিয়ে কর্ত্তে চায় না, কারণ তার দৃষ্টিতে মোহ নেই- হীরালাল চাঁপার বছর খেড়েকের ছোট—অমরনাথের চরিত্র যোগ্যভাবে ফুটে উঠতে পারে নি, শেষে যে রজনী দৃষ্টিশক্তি লাভ করে তা এতে দেখান হয় নি। মৃণাল ঘোষ কৌতুকরসাত্মক ভূমিকায় মন্দ অভিনয় করেন না এবং তিনি একজন জনপ্রিয়

গায়ক—তাকে দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে কঠিন ভূমিকা অমরনাথ, ফলে যখন মৃণাল মর্মান্তিক উক্তি করে, 'আমি সন্ন্যাসী হব' তখন প্রেক্ষাগৃহে হাসির স্রোত বয়ে যায়। পরিচালনায়ও জ্যোতিষচন্দ্র কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। তার কাজ হয়েছে অতি সাধারণ শ্রেণীর।

সম্পাদনা করেছেন ভোলানাথ আঢ্য—তিনি আমাদের সব দিক দিয়েই নিরাশ করেছেন। যেগুলি বাদ দেওয়া উচিৎ সে সব রেখে যা বাদ দিলে ছবির অঙ্গহানি হয় তার কিছু বাদ দিয়েছেন।

আলোকিচিত্র তুলেছেন গীতা ঘোষ, প্রথমার্ধে মন্দ নয়, শেষার্ধে তেমন উল্লেখ যোগ্য না হলেও মন্দ হয় নি।

শব্দ-যোজনা করেছেন সমর ঘোষ, নতুন ষ্টুডিয়োর প্রথম ছবির শব্দ মন্দ দেন নি। মোটের ওপর আলোকচিত্র ও শব্দ যোজনায় আমরা খুশীই হয়েছি, কারণ এর চেয়ে ভাল হবে বলে পূর্ব্বে ধারণা ছিল না। রসায়নাগারের কাজ আশাপ্রদ হয় নি। সুর-সংযোজনা বিশেষত্বহীন। মূল ছবির একটী গান ভাল লেগেছে—গেয়েছেন রাধারাণী। তাঁর কীর্ত্তনখানা সত্যিই শ্রুতিমধুর। অন্ধগায়ক সত্যেন চক্রবর্ত্তীর গান ভাল লাগে নি, শব্দ যোজনাও খারাপ হয়েছে। চারুর গানও আনন্দদায়ক হয় নি। কোথা হতে এক রাস্তার ভিখারিণীকে যোগাড় করে গাওয়ান হয়েছে—সার্থকতা বোঝা গেল না।

চারুর অভিনয় মন্দ লাগল না, মহানিশার ধীরারই আরেক সংস্করণ। রেণুকা রায়ের লবঙ্গলতা প্রশংসনীয় হয়েছে, অভিনেত্রীকে মানিয়েছে চমৎকার। ছায়ার পরিচারিকা বাজারের কোন নারীর সহিত তুলনীয়া। ইলা দাস বা জ্যোতির চাঁপা মন্দ নয়। সুবাসিনীর রজনীর মাতা অচল।

অহীন চৌধুরীর হীরালাল প্রশংসার যোগ্য। রবি রায়ের রামসদয় খুবই ভাল হয়েছে। শচীন্দ্রের ভূমিকায় অমিয় গোস্বামীকে নাকি কারোই ভাল লাগেনি- 'ধীরে রজনী, ধীরে' এই কথাগুলি বলা হয়েছে বিশ্রি, নচেৎ তাকে আমার মন্দ লাগেনি। অভিনেতা বেশ সাবলীল—যোগ্য পরিচালকের হাতে পড়লে হয়তঃ সুনাম অর্জ্জন করতেও পারেন। মৃণাল ঘোষের অমরনাথ অচল—শেষে ডুবার গেয়েছেন ভালই। বীরেন বলের গোপাল বিশ্রি, সরোজ বাগচির দুর্বৃত্ত ভালই। গত ৮ই আগষ্ট হতে 'রজনী' রূপবাণীতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

'ধুপ-ছাঁওনের' জনপ্রিয়তা

নিউ থিয়েটার্সের হিন্দি 'ভাগ্যচক্র' বা 'ধূপ-ছাঁওন' কি দারুণভাবে সমাদৃত হয়েছে তার পরিচয় আমাদের পাঠকদের দিলাম। বোম্বের একমাত্র 'মিনার্ভা টকিজ' চিত্রগৃহে এ ছবিখানা একাদিক্রমে বিশ হপ্তা যাবৎ চলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। আরো কয়েক সপ্তাহ হয়তঃ চলতো, কিন্তু 'মিলিওনেয়ার' দেখাবার কথা থাকাতে বাধ্য হয়ে তাকে স্থানচ্যুত করা হয়েছে। প্রথম সপ্তাহে টিকিট বিক্রয় হয় ১০, ১২৯ টাকা এবং বিংশ বা শেষ সপ্তাহের বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ ৩, ৭০৯ টাকা। আমোদকর বাদ দিয়ে এ অঙ্ক ধরা হয়েছে। ঐ চিত্রগৃহে মোট ১, ০৬, ২৮১ টাকা খরচ খরচা বাদে পাওয়া যায়—এ হতে ৫৫০০০ টাকার অধিক নিউ থিয়েটার্সকে দেওয়া হয়। বোম্বে বিভাগ হতেই নিউ থিয়েটার্স প্রায় ২,৫০,০০০ টাকা পেয়েছেন। এছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হতেও এ ছবির দ্বারা যথেষ্ট টাকা পাওয়া গেছে। সমস্ত অর্থের পরিমাণ খরচ খরচাবাদে নিউ থিয়েটার্সের ভাণ্ডারে এসেছে প্রায় তিন লক্ষ টাকা। এখনও ছবি চলছে—সুতরাং আয়ের আরো আশা আছে।

ওরিয়েণ্টাল কিনেটোন আর্টস

নায়িকা শ্রীমতী সুরমার অসুস্থতার জন্য মন্দির দৃশ্যের যে কয়েকটী অংশ তোলা বাকী ছিল—এবার তা তোলা হবে। বৃষ্টির জন্য যে কাজ বন্ধ ছিল তা আবার আরম্ভ হয়েছে। আশা করা যায় ছবির কার্য্য শীঘ্রই শেষ হবে এবং সেপ্টেম্বরের প্রথমেই চিত্রপটে "রামকান্ত"কে দেখা যাবে। ব্যবস্থাপক জিতেন চৌধুরীর যেরূপ দৌড়ঝাঁপ তাহাতে ছবিখানি শীঘ্রই মুক্তি পেলেও আমরা বিস্মিত হব না।

"বাঙ্গালী"

অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের নূতন বাংলা ছবি 'বাঙ্গালী' ও 'বেজার ঝগড়' গত শনিবারে উত্তরায় মুক্তিলাভ করেছে। অনেকের মুখেই প্রশ্ন—বাঙ্গালী কেমন হয়েছে? বেশ ছবি হয়েছে। আমরা গত মঙ্গলবারে ছবিখানা দেখে এসেছি। ছবি আমাদের মন্দ লাগেনি, নীচের দর্শকদেরও ভিজে চোখে বাড়ী ফিরতে দেখেছি। 'বাঙ্গালী'র করুণ কাহিনীর সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। নাটকখানি বহুদিন মিনার্ভায় অভিনীত হয়েছে। বাঙ্গালী পরিবারের দুঃখ দুর্দ্দশার কাহিনী ছবিতেও বেশ পরিস্ফুট হয়েছে। এবার স্থানাভাব, আসছে সপ্তাহে আমরা বিস্তৃতভাবে ছবির আলোচনা করবো।

মিনতি রাখো

(গান)

মন্মে আজ্জী মিয়া

প্রিয়তম শোন কথা
মিনতি রাখো
এমন বাদল রাতে
যেয়ো নাকো।

একেলা ঘরে মোর ভালো না লাগে
তোমার লাগি প্রিয় পরাণ জাগে
বিরহ শয়নে মোর
পাশেতে থাকো ॥

নারীর মন যে তুমি
বোঝনা হায়
যাহারে চাহি আমি
সেই যে কাঁদায়

কুসুম ছড়ায়ে দেবো তোমার গায়ে
যৌবন দেবো সঁপে তোমার পায়ে
আজিকার রাতি ফিরে
আসিবে নাকো ॥*

*গানটি মিস্ জয়ন্তী গুপ্তা কর্ত্তৃক রেকর্ড করা হয়েছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

ইতিমধ্যে সোনার সংসারের কাজ আরো খানিকটা এগিয়েছে। গভীর রাত্রে দস্যুদলের হানার দৃশ্য সম্পূর্ণভাবে তোলা হয়েছে। প্রতিহিংসাপরায়ণ জমিদারের ভূমিকায় রাধিকানন্দ ও বেণী সুন্দর অভিনয় করেছেন।

এক বৃন্তে দু'টী ফুল

ডেসী ও ভায়োলেট দুই যমজ বোন, শুধু যমজ নয় যুগ্ম। কাঁধ হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত দুটীতে জোড়া ঠিক যেন এক বৃন্তে দুটী ফোটা ফুলের মত। বিধাতার রাজ্যে তারা যেমন বিচিত্র সৃষ্টি, তাদের জীবনও তেমনি বৈচিত্র্যময়। সম্প্রতি ভায়োলেট বিবাহ করেছে কিন্তু ডেসী এখনও কুমারী জীবন যাপন করছে। ভায়োলেট তার বিবাহের সঙ্কল্প প্রকাশের পর মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষ তাতে আপত্তি করেন। তাঁদের মতে এরূপ বিবাহ সাধারণের নৈতিক চরিত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। ভায়োলেটের এই বিবাহ সমস্যা নিয়ে শুধু মার্কিণ নয় অন্যান্য দেশের সংবাদপত্রাদিতেও যথেষ্ট আলোচনা চলেছিল। তারা দুই বোন এবং ভায়োলেটের প্রণয়ী মার্কিণ যুবকও তীব্রভাবে এই আপত্তির প্রতিবাদ করেন।

যাই হোক, অবশেষে ভায়োলেটের কুমারী জীবন তার বাঞ্ছিতকে লাভ করে সার্থক হয়েছে। সম্প্রতি তার বিবাহের লাইসেন্স্ মঞ্জুর হয়েছে।

দুইটী যমজ ও যুগ্ম ভগ্নী, একটী বিবাহিতা, অথচ অপরটী কুমারী। এমন কি ভায়োলেট যার গলায় বরমাল্য অর্পণ করেছে ডেসী তাকে আদৌ পছন্দ করে না। এ অবস্থায় ভায়োলেট কিভাবে তার বিবাহিত জীবন যাপন করবে এই নিয়ে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে বলেন; যে যুবকটী ভায়োলেটকে বিবাহ করেছে ডেসীকেও বিবাহ করা তার উচিৎ, তা হলেই ত সব সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু ডেসী তাকে বিবাহ করতে নারাজ। সমস্যা ত এইখানেই।

এই যুগ্ম ভগ্নীদ্বয়ের বিচিত্র জীবন যাপন প্রণালী জানবার জন্যে আপনাদের একটা কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক। সে কৌতুহল নিবারণের জন্য আমরা তাদেরই বর্ণিত জীবন কাহিনী আপনাদের শোনাচ্ছি।
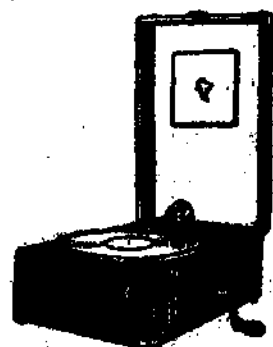
তারা বলে, '১৯০৮ সালে ব্রাইটনে আমাদের জন্ম হয়। আমাদের মা কোন বারে পরিচারিকার কাজ করতেন। ভূমিষ্ঠ হবার পর তিনি দেখেন যে, দুইটী যুগ্ম শিশু পাশাপাশি পড়ে আছে, সে দৃশ্য দেখে তিনি নাকি চমকে উঠেছিলেন। আমাদের নিয়ে তিনি কি করবেন, এই জন্য তাঁর বিষম দুর্ভাবনা।

অতঃপর ডেজী বলে, প্রসবের পর মা উঠতে পেরে আমাদের দুই বোনকে তাঁর কোল থেকে নেবার জন্যে কাহারও আগমন প্রতীক্ষায় চারিদিকে দৃষ্টিপাত করেন। এমন সময় অপর একটী রমণী সেখানে উপস্থিত হয়। মা জন্মের মত আমাদের উপর তাঁর সকল অধিকার পরিত্যাগ করে সেই স্ত্রীলোকটীর হাতে সমর্পণ করেন।

সেই হতেই আমাদের সাধারণ জীবন যাত্রা সুরু হয়। প্রথমে একটা আশ্চর্য্য দ্রষ্টব্য রূপে আমাদিগকে ব্রাইটনের কোন প্রকাণ্ড গৃহে দর্শকদিগকে দর্শনী নিয়ে দেখান হয়। আমরা যে যুগ্ম বাহির থেকে দেখে ইহা সংস্কে কেহ বিশ্বাস করত না। তাদের কৌতুহল চরিতার্থের জন্য আমাদের জামা তুলে দেখতো, সত্যই আমরা যুগ্ম কিনা। আমাদের বয়স যখন চার বৎসর, সেই সময় এ স্থান ত্যাগ করি। কিন্তু এখানকার স্মৃতি আমরা জীবনে কোনদিনও ভুলতে পারব না।

তারপর এক ভ্রাম্যমান প্রদর্শকের নিকট আমাদের ভাড়া দেওয়া হয়। পাশ্চাত্যের নানাদেশে সে আমাদের দুই বোনকে দেখিয়ে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। পরে আমরা অভিযান যাই। [illegible]

[illegible]দেশীয় প্রসিদ্ধ যমজ ভগিনী মিস্ ভায়োলেট হিল্টন ও মিস ডেজী হিল্টন। দুই বোন দেহে এক, মন দুই। এক নর্তকের সঙ্গে ভায়োলেটের বিবাহ হয়েছে।

দ্রষ্টব্য বস্তুরূপে আমরা বেশ রীতিমত কিছু রোজগার করি।

আট বছর বয়সের সময় আমরা আমেরিকায় যাই। সেখানে প্রথমটা আমাদের যেমন অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল তেমনি সাফল্যলাভও হয়েছিল যথেষ্ট। আমাদিগকে দিয়ে আমাদের অভিভাবক ও প্রদর্শনাগারের ম্যানেজারগণ প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। সে সময় আমাদের সাপ্তাহিক রোজগারের পরিমাণ ছিল ৫ শত হইতে ৭৩০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত।

২৩ বৎসর বয়সের সময় আমরা কন্ট্রাক্টরদের চুক্তি বন্ধন থেকে অতি কষ্টে অব্যাহতি পাই। এজন্য আমাদিগকে বহুদিন ধরে মামলা-মোকদ্দমা করতে হয়েছিল।

আমেরিকা থেকে আমরা যাই জার্ম্মানীতে। সেখানে চিকিৎসকেরা আমাদিগকে পরীক্ষা করেন। একবার পরীক্ষার সময় আমরা সর্দ্দিতে আক্রান্ত হই। তার ফলে কয়েক সপ্তাহ যাবৎ আমরা পীড়িত ছিলাম, কিন্তু চিকিৎসকেরা আমাদের চিকিৎসার কোনই ব্যবস্থা করেন নাই।

অনেক চিকিৎসকই আমাদিগকে পৃথক করে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমরা তাতে সম্মত হই নি কারণ আমাদের উভয়েরই ধারণা এই যে, পৃথক হ'লে আমরা সুখী হ'তে পারব না। দুনিয়ার আর দশজনে যেমন সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটায়, আমরাও ঠিক তেমনি স্বচ্ছন্দেই জীবন যাপন করি, যুগ্ম বলে আমাদের কোন অসুবিধাই নেই। অন্যান্য লোকজনের মত আমরাও সব কাজ করতে পারি, আমরাও আপন আপন সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারি। অস্ত্রোপচারের ফলে একটা গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা আছে।

অবশ্য আমাদের নিজের নিজের ব্যক্তিগত কতকগুলি বিশেষ সমস্যাও যে না আছে এমন নয়। আমরা ঘৃণা করতে জানি, নিজকে সুখী করতেও জানি। জন্ম হ'তে যুগ্ম হ'লেও আমরা আমাদের যে যার সমস্যাগুলি নিজে নিজে সমাধান করে নিই। আমাদের হৃদয়ে স্নেহ, দয়া ও ভালোবাসা আছে। কোন দিকেই এ পর্য্যন্ত যখন আমরা কোন অসুবিধা ভোগ করি নেই, তখন কেন আমরা স্বতন্ত্র হ'তে যাবো, আর হয়েই বা আমাদের লাভ কি? তার চেয়ে আমরা ভালই আছি।

আমাদের রীতি প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেকেই কৌতূহলী হয়ে অনেক প্রশ্ন করেছেন। আমরা কেবল দেহেই যুগ্ম নই, অন্তরেও এক, এরূপ ধারণা কেহ যদি করেন তবে বিষম ভুল করবেন। কারণ দেহ যদিও আমাদের পরস্পরের অধীন বটে, কিন্তু মন অধীন নয়। অনেক সময় আমরা দুজনে খুব ঝগড়া করি তারপর ভাব হ'তেও আমাদের বড় বেশী সময় লাগে না।

সে বড় বেশীদিনের কথা নয়, আমার (ভায়োলেটের) একবার খুব সর্দ্দি, কাশি হয়। আমি প্রায়ই দিনরাত কাশিতাম, কিন্তু সেজন্য ডেসী কোনদিন অশোয়াস্তি বোধ করে নি কিম্বা বিরক্তও হয় নি।

ছেলেবেলায় আমাদের কাজের মধ্যেও কখনও সামঞ্জস্য ছিল না। ডেসী যখন খেলা করত তখন আমি পড়তাম না হয় ছবি দেখতাম। তবে একটা বিষয়ে আমাদের উভয়ের সামঞ্জস্য ছিল। আমরা কখনও কোন কিছু বা কারো উপর

বিরক্তি ভাব প্রকাশ করতাম না। আমাদের পরস্পরের কার্য্যেও আমরা কোনদিন বিরক্ত হই নি। আমাদের দুজনের রুচি বিভিন্ন রকমের, পছন্দও ঠিক তাই। দুজনে কখনও আমরা একই খাবার খেতে কিম্বা সাজপোষাক পরতে ভালোবাসি না। জেমী সিগারেট খায়, কিন্তু আমি ধূমপান পছন্দ করি না।

জেমী বলে, ভায়োলেটের একটু চিত্ত দৌর্ব্বল্য আছে। অল্পতেই সে চটে যায় এবং রাগ হলে তার জ্ঞান থাকে না, তবে রাগ পড়তেও বড় বেশী দেরী হয় না। তার স্বভাব বড় মধুর, ব্যবহার মনোমুগ্ধকর। অনেকেই বলেন, আমার চেয়ে ভায়োলেটের মধ্যে প্রেমিকার লক্ষণগুলি অধিকতর বিদ্যমান।

ভায়োলেট যাকে বিবাহ করেছে, পাঁচ বৎসর আগে তার সঙ্গে তার আলাপ হয়। ভায়োলেট বলে, তার চেয়ে সুন্দর পুরুষ সে জগতে আর কাউকে দেখেনি। প্রেমিকার চোখে প্রণয়ী অবশ্যই সুন্দর, কিন্তু আমার চোখে তাকে ভালো লাগে না। কিন্তু তাই বলে আমি কোনদিন তার প্রেমের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে চাই না। ভায়োলেটের বিবাহিত জীবন মধুময় হোক এই আমি চাই।

অন্যান্য স্বামী-স্ত্রীর মতো তাদের মধ্যেও হয়তো মাঝে মাঝে দাম্পত্য-কলহ হ'তে পারে, তবে দাম্পত্য-কলহের যা চিরন্তন রীতি অর্থাৎ তা মিটতেও বড় বেশী সময় লাগবে না। তাদের মনে কোন সময় গরমিল হলেও আমার মন কিন্তু ঠিকই থাকবে। তাদের দাম্পত্যজীবন উপভোগের পথে আমি কোনদিন কাঁটা হ'তে চাই না, হ'বোও না।

আপনার, আমার, সবারই জন্য

কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত এ দেশের সকলেরই জীবনযাত্রায় চা আজ একটি বিশেষ উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই যে 'আনন্দের পাত্র', যা রোজ আমাদের না হলেই চলে না, কোত্থেকে তা' এলো সে কথা জানতে কার না ইচ্ছে হয়?

চাকে আমরা প্রত্যহ পাই সহজে—আমাদের পুরোনো বন্ধুর মত; কিন্তু এর পেছনে কত দীর্ঘদিনের যত্ন ও পরিশ্রমের ইতিহাস আছে, দুঃখের বিষয় আমরা অনেকেই বোধ হয় তা জানিনে। চায়ের সেই প্রচ্ছন্ন বিচিত্র ইতিহাসে একবার উঁকি দেওয়া যাক্।

চায়ের চাষের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল হচ্ছে ভেজা আবহাওয়া আর সারা বছর ধরে প্রচুর বৃষ্টি। বছরে ৮০।৯০ ইঞ্চি বৃষ্টি হ'লে খুব ভালোই হয়। এদেশে বর্ষা যে পরিমাণ জল দেয়, তাতে চা গাছের শিকড় সহজেই মাটি থেকে যথেষ্ট রস পায়, এবং শিগগিরই পুষ্ট হয়ে ওঠে।

নতুন জমিতে চায়ের আবাদ করতে হ'লে যথেষ্ট কষ্ট করে' সে জমি চায়ের চাষের উপযুক্ত করে' নিতে হয়। সব ঝোপ ঝাড় কেটে আর শিকড়শুদ্ধ গাছের গুড়ি ভালো করে' তুলে ফেলা দরকার। কেবল এমন দু-একটা গাছ রেখে দেওয়া দরকার, যার শিকড় থেকে মাটি নাইট্রোজেন পেতে পারে। এতে মাটিরও ভালো হয়, একটু ছায়াও হয়।

অধিকাংশ চা বাগানেই, খানিকটা জমি কেবল বীজ থেকে চারা তৈরী করবার জন্যই আলাদা করে রাখা থাকে। সে জমিতে মাটির এক তলায়, চার থেকে নয় ইঞ্চি তফাতে বীজগুলি রোপণ করা হয়। কিছুকাল পরে চারা লাগানো আরম্ভ হয়। বীজ থেকে যে অঙ্কুরগুলো জন্মায়, সেগুলিকে তুলে নিয়ে চার থেকে ছ'ফুট করে তফাতে বাগানে লাগিয়ে দেওয়া হয়।

এই চারাগুলি যাতে সহজে রস টান্‌তে পারে, সেজন্তে ক্রমাগত খুপিয়ে আর নিড়িয়ে মাটিটাকে আগে থেকেই ঝুরঝুরে করে' রাখা হয়। বর্ষার সময় চা বাগানে এত আগাছা জন্মায় যে ভারতবর্ষের কোথাও কোথাও সেগুলো প্রায়ই তুলে ফেল্‌তে হয়। তার ফলে আগাছা আর বেশী জন্মাতে পারে না।

চারাগুলো যখন বেশ খানিকটা বড় হয়ে ওঠে, তখন বাঁকানো কাঁচি দিয়ে সেগুলিকে ছাঁটতে হয়। কোনো কোনো বাগানে বেশ শিগগিরই ছাঁটা হয়ে যায়, আবার কোথাও বা তিন বচ্ছর পরেও হয়ে থাকে। গাছ কি রকম বেড়ে উঠছে, তাই দেখেই স্থির করা হয় প্রথমবারের ছাঁটাই কখন করা হবে।

প্রথমবারে সাধারণত মাটী থেকে ৬ কি ৯ ইঞ্চি ওপরে চা-গাছের একেবারে আসল কাণ্ডটাকেই কেটে ফেল্‌তে হয়। অবশ্য যেখানটা কাটা হয় তার নিচে যথেষ্ট ডাল পালা থাকা দরকার। এর পর প্রত্যেকবারই আগের বারের চেয়ে দু' এক ইঞ্চি ওপরে ছাঁটতে হয়। এ রকম-ভাবে চারাগাছগুলি ক্রমশ এক একটা ঝোপ হয়ে দাঁড়ায়।

মার্চ্চ মাসে যখন বসন্তের কিশলয়গুলি সবুজ রঙে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তখন সেই দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ বাগানের দিকে তাকিয়ে চা বাগানের মালিকের মন আশায় আনন্দে ভরে' ওঠে। ঐ মাসে অথবা এপ্রিল মাসের গোড়ায় থেকে চা তোলা সুরু হয়, আর বছরের শেষ অবধি চল্‌তে থাকে।

এ-কটা মাস এত তাড়াতাড়ি নতুন পাতা গজাতে থাকে যে এক টুকরো জমিতেই সপ্তাহে অন্তত একবার চা তোলা দরকার হয়। যখন একটা জায়গার কচিপাতা সব তোলা হয়ে যায়, তখন যারা চা তোলে তারা অন্য জায়গায় গিয়ে চা তুলতে আরম্ভ করে। এই রকম ভাবে আবাদের সমস্ত জমির পাতা সারা পাতা গজাবার সময়টা ধরে তুলে শেষ করা হয়। চা তুলবার সময় মেয়েরা যে গল্প গুজব আর পরচর্চ্চা করে, সেটা বাস্তবিকই উপভোগ করবার জিনিষ।

যদিও ভারতবর্ষ চায়ের ব্যবসাতে নেমেছে মাত্র অল্পদিন, তা হলেও সে আজ পৃথিবীর চা উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে কেবল তা'র চায়ের উৎকর্ষের জন্য।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে মাত্র ৫০০,৪৫০ একর জমিতে চায়ের চাষ হতো এবং তার থেকে চা উৎপন্ন হতো ১৫৭,২৫১,০০০ পাউণ্ড। কুড়ি বছর পরে, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে চায়ের চাষ চলেছিল মোট ৬০৫,৭১৮ একর জমিতে, আর উৎপন্ন হয়েছিল ৩৮০,৩৪৮,০০০ পাউণ্ড চা। ১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষে মোট ৮১৬,০২৪ একর জমিতে ৩৮৩,২৬৪,১১৫ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়েছিল—তার মধ্যে ৬০০,০০০ একর জমিই ছিল বাংলাদেশে।

ভারতবর্ষ এখন প্রত্যেক বছর ৪০ কোটী পাউণ্ড চা উৎপন্ন করে; তার মানে জগতে যত চা জন্মায় তার প্রায় অর্দ্ধেক চা-ই জন্মে ভারতবর্ষে। অবশ্য এ হিসেব থেকে চীন দেশকে বাদ দিতে হবে, কারণ সে দেশের কোনো ঠিক খবর পাওয়া সম্ভব নয়।

এটা বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ভারতবর্ষে চায়ের চাষ যে এত বেড়েছে, তার কারণ হচ্ছে সঙ্ঘবদ্ধভাবে চায়ের প্রচার। সম্প্রতি আপনাকেও তাতে যোগ দিতে আহ্বান করা হচ্ছে। আপনি যে সাড়া দিচ্ছেন—তা আশাপ্রদ। ভারতবর্ষকে চা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবার চেষ্টায় আমরা যতই অগ্রসর হবো, ততই আপনার সাহায্য আমরা বেশী আশা করবো।

মনে রাখবেন "ভারতীয় চা আপনার নিজের পক্ষেও যেমন ভালো, অন্যের পক্ষেও তাই।"

কলিকাতা কর্পোরেশন

নোটিশ

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, কর্পোরেশনের সভায় যথাক্রমে গত ১৭ই জুন এবং ৫ই আগষ্ট তারিখে গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী (১) মোটর এম্বুল্যান্সের ব্যবহার এবং (২) ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী সমূহ এবং ঐগুলির সাবকমিটী সমূহের এবং স্পেশাল কমিটী সমূহেরও সভাধিবেশনে কর্ম্ম পদ্ধতি পরিচালনা নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশোধিত নিয়মাবলীর কপিসমূহ (নকল) নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে অফিস খোলা থাকার সময় দেখিতে পাওয়া যাইবে। ২২শে আগষ্ট তারিখের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট দেখিলেও কাজ হইবে, কারণ এই সব নিয়মাবলী বিস্তৃত-ভাবে ঐ তারিখের গেজেটে প্রকাশিত হইবে।

ভাস্কর মুখার্জ্জি

বি, এ (ক্যান্টাব), বি, এল-সি (কলিঃ)

অফিসিয়েটিং সেক্রেটারী

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস।

১৩ই আগষ্ট, ১৯৩৬।

সচিত্র সাপ্তাহিক
দ্বিতীয় বর্ষ—২৯শ সংখ্যা
শুক্রবার—১১ই ভাদ্র
১৩৪৩
২৮শে আগষ্ট—১৯৩৬

স্বাধীনতা

মানুষ করে স্বাধীনতার বড়াই। হ'তে চায় সে মুক্ত, বিহগের মত অনাহত অনিরুদ্ধ গতিই সে চায়, আর চায় স্বাবলম্বী হ'তে! আকাশের ঔদার্য্য, সমুদ্রের প্রশান্তি, বাতাসের স্বাচ্ছন্দ্য—সবের মধ্যে সে পায় যে মুক্তির আভাষ, নিজের জীবনে তাকেই চায় সে সর্ব্বতোভাবে নিবিড় আলিঙ্গনে প্রতিফলিত ক'রে নিয়ে জয়যাত্রার পথে এগিয়ে যেতে! এই অবারিত অপ্রতিহত গতি-পথের পারিপার্শ্বিক বাধা-বিপত্তিকে এড়িয়ে চলবার অদম্য উৎসাহে মৃত্যুঞ্জয়ী হবার যে সাধ, মানুষের মধ্যে তারই অনুশীলনীর উৎকট প্রাবল্য—স্বাধীনতার দাবী, মুক্তির গর্ব্ব, অব্যাহতির অহঙ্কার!

কিন্তু কৈ? মানুষ স্বাধীন হ'ল কৈ? কতোটা? এ প্রশ্নের উত্তর হয় তো মিলবে। রাষ্ট্র-স্বাধীনতার আস্ফালনে উদ্ধত এক একটি স্বাধীন জাতি হয় তো আসবে এগিয়ে, বীরত্বের উন্মাদনায় বৈজ্ঞানিক নির্ভরতার দম্ভে বক্ষ প্রসারিত ক'রে হুঙ্কার দিয়ে উঠবে, আর বজ্রনির্ঘোষে জানাবে তার প্রতিবাদ। বলবে,—'কেন? এই ত আমরা স্বাধীন, আমরা বীর, আমরা মুক্ত'! হয় তো আরো বলবে,—'আমরা শিক্ষিত, সভ্য, জ্ঞানী'! আরো বলবে,—'আমরা স্রষ্টা'!

বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যে নিত্য-নূতন আবিষ্কারের আলোকে উদ্ভাসিত বিজয়-টীকা শিরে ধারণ ক'রে তৃপ্তির আনন্দে উদ্বেলিত আত্মহারা হয়ে উঠেছে, এই নব নব উদ্ভাবনী-শক্তির প্রয়োগ-কৌশলে সে যেমন নিত্য-নূতন জাতি, নূতন নূতন মানুষগোষ্ঠীকে পদানত, পদদলিত ক'রে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীনে সক্ষম হ'য়ে উঠেছে—এ বীরত্বে, এই সৃষ্টির অন্তরালে আত্মমুখী ধ্বংসলীলার মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য তার নজরে প'ড়েও যেমন পড়ছে না, তেমন বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে এই বীরত্ব, এই সভ্যতার অহঙ্কার সমুদ্রে বুদ্বুদের মতই অবলোকিত—উপলব্ধ হচ্ছে! তার মধ্য থেকেই আবার জাগছে সেই একই নিদারুণ প্রশ্ন—'কৈ? মানুষ স্বাধীন হ'ল কৈ! কতোটা?'

বিধাতার বিচিত্র নিয়মে বিভিন্ন ক্ষেত্রে—ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আমরা, আমাদের সভ্যতা, আমাদের কৃষ্টি, আমাদের বীরত্ব—একি শুধু মানুষ হ'য়ে মানুষ-খাওয়ার নীতির উপরেই হ'বে প্রতিষ্ঠিত? আর আমরা মানুষ, আমরা করবো স্বাধীনতার বড়াই, সভ্যতার দাবী, কৃষ্টির গর্ব্ব!

মানুষে মানুষ-খাওয়ার এই আত্মদলনী সভ্যতা যতদিন থাকবে, ততদিন মানুষ থাকবে বর্ব্বর। এই বর্ব্বরতার সমাধিস্তূপের উপর আবার যেদিন নিষ্পেষিত মানবাত্মা—বিশ্বের আর্ত্তকণ্ঠে উঠবে মহামিলনের নব আহ্বান, গগনে-পবনে উচ্ছ্বসিত মুখরিত হয়ে ছুটবে সেই বিশ্বজয়ী বাণী—সেদিন সত্যই আবার মানুষ হবে মানুষ। তার বীরত্বের, তার সভ্যতার, তার মুক্তির সেই দিনই হবে সত্যকার উন্মেষ! হবে মিলন! সত্যকার স্বাধীনতা উঠবে জেগে।

চাতিম চাতিম

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার রায় বেরিয়েছে, এই নিয়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলা টলমল। বাংলা দেশ স্বরাজ পেলে ঢাকা নগরী অতখানি বোধ হয় উচাটন হতো না যা' এই অর্দ্ধ-শিক্ষিত জমিদার সন্তানের জন্যে হয়েছে। আদালতের প্রাঙ্গণে নর মুণ্ডের বাণ ডেকেছিল, গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মানুষের আহার নিদ্রা আদি জীবধর্ম্ম কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়ে গিয়েছিল। এই নিক্তির কাঁটার দ্বারাই সূচিত হয় সচরাচর শিক্ষিত ও অশিক্ষিত 'মবের' মন কোন পাঁদাড়ে চরে। দার্জ্জিলিং থেকে চব্বিশ পরগণা অবধি সারা বাংলা দেশে ঘরে ঘরে হাটে মাঠে, আড্ডায় অড্ডায়, কাফে রেস্তোঁরায় এই কথা—"কানু বিনা গীত নাই।"

*　　　*　　　*

সংসারে দু' দশজন মানুষের মনই উর্দ্ধে আকাশে চরে, বাকি নব্বই পঁচানব্বই জনের মন কেঁচোর মত পাঁকে চরে। সেনসেশন তাদের খাদ্য, থ্রিল্ তাদের সকাল সন্ধ্যের তামাক টানার মত অত্যাবশ্যক ব্যাপার। মনটা যাদের উঁচু গ্রামে বাঁধা থাকে না, তাদের জীবন ধারণের জন্য সস্তা থ্রিল না হলে দিন-গত পাপক্ষয় করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। নইলে এ সংসারে ভাই কাকা মামা পাড়া পড়সী আত্মীয় প্রতিবাসীর টাকা-কড়ি বিষয় আশয় সর্ব্বত্রই অহরহ ঠকিয়ে নিচ্ছে। এটা এমন কিছু অভাবনীয় ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার নয়, যে, তার জন্যে মানুষের ধাঁদি লেগে যাবে, আহার নিদ্রা ছুটে যাবে।

*　　　*　　　*

আমাদের এই সেনসেশন মঙ্গারিং বদ অভ্যাসের ঠেলায় ভাওয়াল সন্ন্যাসী আজ দেশবন্ধু ও মহাত্মাজীর মাথায় উঠেছেন। অথচ তিনি নিতান্তই সাধারণ থাকের মানুষ, ভাওয়ালের কুল অলঙ্কৃত না করলে এবং হঠাৎ সত্যবাবুর প্রসাদাৎ মরে বেঁচে না উঠলে ইনি সন্দেহজনক ক্লাসের নারী ছাড়া আর কারু দৃষ্টি কখনও আকর্ষণ করতেন কিনা সন্দেহ। বালার দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে ছলনা, দৈন্য ও সামাজিক উৎপীড়নের মর্ম্মন্তুদ চিত্র আমাদের এমনই গা সওয়া হয়ে গেছে, যে, তার জন্য এই রকম মস্তিষ্ক বিকৃতি ও ডিলিরিয়াম তো হয়ই না, বরঞ্চ আমরা ওটাকে স্বাভাবিক অনিবার্য্য জীবন যাত্রার অঙ্গ বলে ধরে নিই। রাজার দুঃখে দুনিয়া কাঁদে, চাষা ব্যাটার দুঃখে গিন্নিটিও কাঁদে না, অথচ দুঃখটা দু'জনেরই সমান।

*　　　*　　　*

স্যাটানিক বিদেশী সরকার বাহাদুর যখন কৃষি ঋণ, জমসেবা ম্যালেরিয়া ও কচুরী পানা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত তখন আমরা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছুটছি ভাওয়াল সন্ন্যাসীর পশ্চাতে, নলিনী সরকারের উড়েনীর পশ্চাতে, দেশের শিক্ষিতা প্রগতি পন্থীলা মেয়েদের বস্ত্র হরণ প্রয়াসের পশ্চাতে। আমাদের দেশে এই শ্রেণীর সেনসেশন লুব্ধের দলই পণ্ডিতার আস্থ কথার ক্রেতা, অবতারের গ্রাহক। বাংলা কংগ্রেসের মুখপত্র আনন্দবাজার তাই এদেশে এবম্প্রকার কুৎসা ও থ্রিল বেচে দিন গুজরাণ করে। বারীন ঘোষের বিয়ের টিটকারী বেচে তাদের এক দিনের অফিস খরচ চলে, তারপর "বকঃ পরম ধার্ম্মিক" সেজে পুনরপি হঠাৎ মৌন গাম্ভীর্য্যে কাগজখানি শরৎগুণ গানে ও চীপ দেশ উদ্ধারে মনোনিবেশ করে। এই যে পাঁক বেচে দু'পয়সা করে নেবার প্রবৃত্তি এটাতে কাগজ চাউস আকার ধরতে পারে, কিন্তু দেশের বা জাতির মুখ উজ্জ্বল হয় না।

*　　　*　　　*

ধাপে ধাপে জীবনের উঁচু গ্রামে থেকে স্খলিত হয়ে আমরা কোথায় চলেছি সেটা ভাববার দিন এসেছে। দেশের রাজনীতি নেতার শুক-সারী সংবাদে পরিণত করেছে কারা, দেশের ছাত্রদের অমল উঁচু সুরে বাঁধা মন কংগ্রেসের রাজনৈতিক গুণ্ডাগিরিতে নামিয়েছে কারা, সস্তা থ্রিল ও কামশাস্ত্র পরিবেশন করে করে বাঙালীর অনাহত পদ্মের মনটিকে মূলাধারে নামিয়েছে কারা, ব্যক্তিগত কলহের মেছোহাটা জমিয়ে বাঙালীকে পরশ্রী কাতরতা শিখিয়েছে কারা, তার হিসাব করার দিন আসছে। দেশে যাঁরা মোড়লী করেন, যাঁরা কাগজ বেচে খান, যাঁরা সিনেমা থিয়েটার চালান, তাঁদের ওপর হিটলারী দাওয়াই প্রয়োগের একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

*　　　*　　　*

অন্য দেশেও এই রকম সস্তা সেনসেশ-নের স্থান বড় মেন্টালিটিতে প্রচুর আছে। কিন্তু তারা জীবন্ত রাজসিক জাত বলে এই খেলো মদের পাঁকে মাতাল হয় না, দশটা উঁচু জিনিষের সঙ্গে দু'টো বাজে জিনিষের চর্চ্চা করলেই তারা এমন করে বখে উচ্ছন্নে যায় না। যে সব দেশের রিয়ালিষ্টিক সাহিত্যের নকল করে আমরা বস্তি সাহিত্যের কীট বনে যাই, সে সব দেশে কিন্তু মানুষ এমন করে আদি রসের বিকারে এমন করে অধঃপাতে যায় নি। আমাদের সমস্ত জীবনটাকেই উঁচু গ্রামে বেঁধে নেবার দিন এসেছে। এ যুগের ছেলে পুলে এই বস্তি সাহিত্য, খেলো হুজুগ, মেছোবাজারী রাজনীতি, মায়বিক বিকৃতি জনিত সিনেমা ও থিয়ে-টারের আবহাওয়ায় মানুষ হ'লে বাংলা দেশের স্থান মানুষ হিসাবে কোথায় দাঁড়াবে নেতাদের সে কথা চিন্তা করবার দিন কি আসে নাই? এই দ্রুত অধো-গতি আর কোন উপায়ে রোধ না করতে পারলে অগত্যা রাজদণ্ড ও আই-নের প্যাঁচে তা' করতে হবে। সেই জন্য ব্যবস্থাপক সভায় সভায় চাই দেশের সু সন্তানদের আসন যাদের ধ্যান জ্ঞান ও সকল চেষ্টা দেশের কল্যাণে নিয়োজিত। বাংলার সব চেয়ে বড় দুর্দ্দিন সেই দিন এসেছে যে দিন দেশবন্ধু অকালে চলে গিয়ে দেশের নেতৃত্ব এলো উপ-নেতার হাতে। কাল ক্রমে কলহ বিবাদে ক্রমশঃ তাঁরাও গা ঢাকা দিচ্ছেন, তাদের স্থান নিচ্ছে অপনেতার দল। তাই দেশ চলেছে দ্রুত বেগে অধঃপাতের পথে।

পাঁচ মিশালী

খোর্দ্দ-গোবিন্দপুর

খোর্দ্দ-গোবিন্দপুরের মুসলমানদিগের মামলার পুনর্ব্বিচার শেষ হইয়াছে। যে গ্রামে ১৫০ ঘর লোকের বাস এবং তাহার মধ্যে ২৫ ঘর মাত্র হিন্দু, তথায় মুসলমানরা দলবদ্ধ হইয়া একটী হিন্দু পরিবারের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে তাহার লোম হর্ষণ কাহিনী কাহারও অবিদিত নাই। ঘটনাস্থল রাজসাহী জেলায়। তথায় বিচারে ৪২ জন আসামীর মধ্যে ৪০জন দণ্ডিত হয়—৮জনের যাবজ্জীন দ্বীপান্তর এবং অবশিষ্ট ৩২ জনের দশবৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড প্রদত্ত হইয়াছিল। হাইকোর্টের নির্দ্দেশানুসারে জলপাইগুড়ীতে জুরীর পরিবর্ত্তে এসেসর লইয়া একজন ইংরেজ জজ পুনর্ব্বিচার শেষ করিয়া-ছেন। তাঁহার বিচারে ২ জন আসামীর ৪ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাবাস, ৬জন খালাস এবং অবশিষ্ট আসামীদিগের ৬মাস হইতে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। দণ্ড যে অপরাধের তুলনায় অতি অল্পই হইয়াছে, ইহাই আমাদের মত। এই পুনর্ব্বিচারেও দেখা গেল, ৩২ জন মুসলমান দলবদ্ধ হইয়া এই হিন্দু-পরিবারের উপর অত্যাচার করে। অত্যাচারের কারণ—তাহাদের মনে হই-য়াছে, ঐ হিন্দু পরিবারের গৃহস্বামীর পুত্র ছয় ছেলের মা মফিজন নাম্নী এক মুসলমান বিধবার সহিত অবৈধ সম্বন্ধে লিপ্ত হইয়া-ছিল। যদি এই অপরাধ সত্যও হয়, তথাপি যে মুসলমানদিগের পক্ষে যথেচ্ছাচার করিবার কোন কারণ বা অধিকার ছিল না, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। অপরাধ হিন্দু যুবকের অধিক, কি মফি-জনের অধিক তাহাও বিবেচ্য। এইরূপ কারণে যদি গ্রামস্থ মুসলমানরা দলবদ্ধ হইয়া হিন্দু পরিবারের উপর অত্যাচার করে, তবে এমন মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না যে অপরাধ প্রকৃতই হউক, আর কল্পিতই হউক, তাহা উপলক্ষ মাত্র। এরূপ অবস্থায় মুসলমান নেতারা যদি মুসলমান জনসাধারণকে সংযত না করেন, এবং প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে তাহাদের কাজের সমর্থন করেন, তবে বাঙ্গালায় যে সমস্যার সমুদ্ভব হইবে, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে-রই বিশেষ ক্ষতি, এমন কি সর্ব্বনাশও সংঘটিত হইতে পারে।

হিন্দুস্থানের শেয়ার

হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর কথা সত্য সত্যই কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায় রে! সম্প্রতি হিন্দুস্থানের যে শেয়ার কিছুদিন পূর্ব্বেও কেহ কিনিত না, তাহারই দাম একশত টাকায় উঠিয়াছিল। সহসা কেন এমন হইয়াছিল, সে রহস্য ভেদের চেষ্টা আজ আর আমরা করিব না। কিন্তু এই সময়—অর্থাৎ যখন শেয়ারের মূল্য বাজারে একশত টাকা তখনই কোন মহিলা অংশীদার দূর গ্রাম হইতে তাঁহার একখানি শেয়ার বিক্রয়ের জন্য হিন্দুস্থান অফিসে পত্র লিখিলে নবীন অস্থায়ী ম্যানেজার তাহার যে উত্তর লিখিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম:—

হিন্দুস্থান সমবায় বীমামণ্ডলী
লিমিটেড।

নং শেয়ার। ১৯১৪০

কলিকাতা ১৩।১৪ জুলাই, ১৯৩৬

মহাশয়া,

রিঃ শেয়ার নং······

আপনার ২রা জুলাই তারিখের পত্রো-ত্তরে দেখা যাইতেছে, উপরোক্ত শেয়ারে মোট ৫টি 'কলে' একুনে ২৫ টাকা দেওয়া হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমানে আর কোন 'কলে' টাকা লইতেছি না; সুতরাং আমরা না চাওয়া পর্য্যন্ত আর টাকা দিবার প্রয়োজন নাই।

আমাদিগের খাতাপত্রে আপনার নাম সুবর্ণপ্রভার পরিবর্ত্তে স্বর্ণপ্রভা দেখা যাই-তেছে। সুতরাং এই অসামঞ্জস্যের কারণ জানিতে চাহি।

উপরের ঠিকানাই আমাদিগের পুস্তকে লিখিয়া লওয়া হইবে কি না, অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।

(শেয়ার) বিক্রয় সম্বন্ধে বক্তব্য—দুঃখের বিষয় আইনতঃ কোম্পানী নিজ

চাকুম-চুকুম

পঞ্চমুখ শর্ম্মা

রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট্ অতঃপর গল্প লিখিয়াছেন। পল্লী-রাণীর স্নিগ্ধ-শ্যামল বুকে যে-কবিতা আত্মগোপন করিয়া আছে, জানিতাম রায় বাহাদুর তাহার একজন রসগ্রাহী ভক্ত। 'বঙ্গলক্ষ্মী'র বহু লুকানো সম্পদ তিনি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। অতএব মুগ্ধবিস্ময়ে তাঁহার 'যূথিকা'র আদ্যোপান্ত অবলোকন করিয়া তন্ময় হইয়া গেলাম! একটি পল্লী-বালিকার মধ্যে জনৈক পল্লী-বালকের যে আঁচ কৈশোরেই লাগিয়াছিল, ক্রমান্বয়ে পল্লী-বৃদ্ধা ও পল্লী-বৃদ্ধ অবস্থায় উন্নীত হইয়াও যে তাহার তেজ কিরূপ করুণমধুর ট্রাজিডির ছাপ মারিয়া গেল—তাহা উপলব্ধি করিয়া যে-কোন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার চক্ষুতে বান ডাকিয়া যাইবে। কিশোরী 'যূথিকা'র দেহে যখন যৌবন আসিতেছে, দীনেশবাবু লিখিতেছেন—

"যৌবন তাহার দেহে আসিয়াছিল। বন্যা যেমন নদীর পাড় ভাঙ্গিয়া দুর্দমনীয় বেগে আসে, তাহার দেহে যৌবন-আগম তেমনই আকস্মিক, তেমনই বৈপ্লবিক (?) হইয়াছিল, কোথায় গেল সেই কৈশোরের "চুরি ক'রে চাওয়া," সেই মৃদু কল-কাকলী, সেই লাজ-রক্ত গণ্ডে হাসির ছটা, সেই অবাধ মেলা-মেশা! তাহার স্থলে দেহে আসিল একটা পূর্ণতা, সহজ কথা বলতে বাধ-বাধ ভাব, একটা অহেতুক কুণ্ঠা, অঙ্গ ঢাকিতে সতর্কতা ও বাড়াবাড়ি রকমের লজ্জাশীলতা, এই সমস্তই বুঝাইল যে আমার কিশোরী দেবীকে আমি হারাইয়াছি।"

বাস্তবিক, মেয়েদের কিন্তু এইটি কেমন স্বভাব! 'অঙ্গ ঢাকিতে সতর্কতা ও বাড়াবাড়ি রকমের লজ্জাশীলতা' আবার কেন? উহাই বুঝি টোপ গাঁথিবার কৌশল?

স্বর্ণপ্রভা দেবীর ভ্রমণকাহিনীটি বেশ উপভোগ করিলাম। বাস্তবিকই উহা সুলিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ—

"হঠাৎ একটি আলোর নীচে এসে দেখলুম, অদূরে পাইন গাছের ছায়ায় ব'সে একটি মুসলমান ছেলে বাঁশী বাজাচ্ছে। এমন লোক পথে ঘাটে খুব কমই চোখে পড়ে, যারা রাস্তায় মেয়েদের দিকে ভুলেও একবার চেয়ে দেখে না। কিন্তু ও ছেলেটী একটু ভিন্ন প্রকৃতির।"

লেখিকা সত্য কথাই বলিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, ছেলেটী কেবল 'ভিন্ন প্রকৃতির'ই নহে, ভিন্ন জাতিরও বটে!

তাহার পর দেখিলাম 'চাহি প্রাচীন যুগের পানে' জনৈক কবি পুরা একটি পৃষ্ঠা নষ্ট করিয়াছেন। ঐ স্থানে শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের একটা যা-হোক

শেয়ার কিনিতে পারেন না। তবে আপনি যদি মাত্র ২০ টাকায় ঐ শেয়ার বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকেন, তবে আমরা—সর্ব্বদাই উহার ক্রেতা দেখিয়া দিতে আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। আপনার উত্তর পাইলে আমরা কার্য্যে অগ্রসর হইব।

আপনার বিশ্বস্ত
(স্বাক্ষর)
অ্যাকটিং জেনারল ম্যানেজার।

এই নূতন অস্থায়ী ম্যানেজারই কি সম্প্রতি তাঁহার কন্যার সম্পর্কে খাস জেনারেল ম্যানেজারের কুটুম্বে পরিণত হইয়াছেন? জিজ্ঞাস্য এই, যে শেয়ারের দর বাজারে একশত টাকা, তাহা যে এই ম্যানেজার ২০্ টাকায় বিক্রয় করিয়া দিতে চাহিয়াছেন, ইহাতে কে লাভবান হইত? অবশিষ্ট ৮০্ টাকা অবশ্যই কোম্পানীর তহবিলে যাইত না। কেননা, পত্রেই লিখিত আছে, আইনতঃ কোম্পানী আপনার শেয়ার কিনিতে পারে না। তাহা হইলে এই অবশিষ্ট ৮০্ টাকা কে পাইতেন তাহাই আমাদিগের জিজ্ঞাস্য। এ সম্বন্ধে লোকের মনে যে সন্দেহের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা কোনরূপে দূর করা সম্ভব হইবে কি?

কিছু দিলে বরং পত্রিকার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইত।

কথাটা এইজন্য বলিলাম, পত্রিকাটিকে যিনি মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর আপনার লেখনী দিয়া আগা-গোড়া ভরাট করিয়া যাইতেছেন, সেই ঘোষ মহাশয় হয়তো 'পাওয়াপুর'-এর সঙ্গে নিদেন 'হাওয়াপুর'ও একটা অবিলম্বেই লিখিতে পারিতেন! এবং লিখিলে তাহা অবশ্যই ছাপা হইত! কারণ জ্যোতিশ বাবুর ন্যায় বিশ্বগ্রাসী প্রতিভা আমরা খুব কমই দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

জনৈক কবির 'বিরহে' আমরা মর্মাহত হইয়াছি। কবির রাধাভাব অবলোকন করিয়া ভাবিলাম, নিশ্চয়ই সাময়িকভাবে তাঁহার মধ্যে 'সেক্সুয়াল মেটামরফসিস্' সংঘটিত হইয়াছে। অবশ্য উহা দৈহিক নহে, মানসিক। যথা—

"বেসেছিনু ভালো শ্যামসুন্দরে
বকুলের কুলবনে,
তনুমন্দিরে (?) বন্দনারতি
করেছিনু নিরজনে—"

অতএব—

"প্রেমের আগুন ধিকি ধিকি জলে,
কাহারে জানাব সই!"

আহা! 'বকুলের কুলবনে' 'শ্যামসুন্দরে' যে দেখিয়াছে, এবং নিবিড় করিয়াই দেখিয়াছে, সে হয়তো শালুক-বনে ভালুক কখনো দেখে নাই! কিন্তু উক্ত 'তনু-মন্দিরের' চূড়া হইতে দেখিলে বেশ দেখা যাইত, ভালুক কিরূপে শাঁকালু খাইতেছে! এবং তাহা হইলেই 'প্রেমের আগুন' আর 'ধিকি ধিকি' করিয়া না জলিয়া দেখ দাউ দাউ করিয়া উঠিত!

'খেয়ালী'র ভনি নিত্য ক্ষারী সুন্দর গল্প লিখিয়াছেন। লিখিয়াছেন—

"মুনেরীকুঃসিং ভীলবের মেয়ে রূপালি—। এত রূপ ওদের ঘরে মানায় না,···সবাই ওর সঙ্গ কামনা করে, কিন্তু ওর ভাল লাগে সবচেয়ে মজনুকে—।"

কারণ—

"···রূপালির ভালো লাগে এই কালো ডানপিটে কঠিন (!) ছেলেটিকে।"

উক্ত গল্প পাঠ করিবার পর যদি 'কালো ডানপিটে কঠিন ছেলে'দের সহিত 'ফর্সা মিনমিনে কোমল ছেলেদের' ডুয়েল বাধিয়া যায়, তাহা হইলে দায়ী হইবে কে?

* * *

সদ্যপ্রকাশিত সাপ্তাহিক 'গায়ত্রী'র দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীমতী লীলা শীল লিখিয়াছেন—"আমার বুক জ্বালা করে ও ঘুম হয় না।" বর্তমানকালের অনেকের পক্ষেই যে তাঁহার প্রশ্নটি, যথা—

"কিছুদিন হ'ল মধ্যে মধ্যে আমার বুক জ্বালা করে। সমস্ত শরীরে অস্বস্তি বোধ হয়, অনেক সময় রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। এর কারণ এবং প্রতিকার কি?"—

এবং ইহার উত্তর বিশেষ উপকারে আসিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা উহা সকলকেই পাঠ করিতে বলি!

* * *

'উত্তরায়ণ'-এ শ্রীবিষ্ণু লিখিতেছেন—

"রাজগঞ্জের ষ্টীমারের ডেকে বেসেছি
ভালো
সে কথা কি আজ শ্যামলছায়ায় গিয়াছ
ভুলে'?"

ভালো না হয় 'রাজগঞ্জের ষ্টীমারের ডেক'—এই বাসা হইল, কিন্তু মায়া হইল কোথায়? ভজাঘাটে? তাহা না হইলে 'আজ শ্যামলছায়া'ই কি আর ভুলিয়া যাইত? যাহা হউক—

"তোমার গলা যেন ঘুমভাঙা ভোরে
প্রাসাদ তোরণের ঘণ্টা,"—

ইহা বলিয়া কবি হয়তো সামাল দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু উহা যদি—

"তোমার প্রেম যদি যুযুডাঙার বাজারে
মাখন-তোলা ছাগেল,"

হইত, তাহা হইলে?

শ্রীঅমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বজ্রারম্ভে লঘুক্রিয়া' দেখিয়া ভয় হইতেছে। আর মেয়ে যাহার সহিত প্রেমে পড়িয়াছে—তাহাকে না পাইলে তাহার কিরূপ হইবে, বাপের নিকট অকপটে তাহা ব্যক্ত করিতে দেখিয়া তবু ভরসা হইল। এইজন্য হইল, আমাদের দেশের মেয়েরা তাহা হইলে সত্য সত্যই জাগিয়া উঠিতেছে! যথা—

"বাবা, এত নিষ্ঠুর তুমি হোয়ো না। ললিতকে না পেলে আমি বাঁচবো কেমন করে!"

মেয়ের মুখে পাকা কথা শুনিয়া বাপ বলিতেছেন—

"আবার ললিত! 'ললিতকে না পেলে আমি বাঁচবো কেমন ক'রে!' বাপের মুখের সামনে একথা বলতে তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল।"

মেয়ে তবু মরিয়া—

"লজ্জা! এখন আমার লজ্জা করবার সময় কৈ?"

লীলার মুখ দিয়া লেখক যাহা বলিতেছেন, সত্যই ঐরূপ না হইলে শ্রীমতী অমুক আর কিরূপে শ্রীমান আমান ঘোষকে······ যাক, সেই পুরানো কথা। পচিয়া গন্ধ ছাড়িয়া গিয়াছে।

* * *

করপোরেশন প্রসঙ্গ

তেলা মাথায় তেল দেওয়া এ দুনিয়ার চিরন্তন রীতি। আমাদের আধা স্বরাজী পৌর প্রতিষ্ঠানেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ব্যয় সঙ্কোচের অজুহাতে কিছুদিন পূর্ব্বে পৌর প্রতিষ্ঠানের পাণ্ডারা স্বল্প বেতনভোগী কর্ম্মচারীদিগের উপরেই ব্যয় সঙ্কোচের কুঠার হানিয়াছিলেন, বড়দের গায়ে একটা আঁচড়ও লাগে নাই।

* *

চীফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ বি, এন, দে কর্পোরেশনের সর্ব্বোচ্চ বেতনভোগী অফিসার। তাঁহার বেতনের পরিমাণ বাঙ্গলাদেশের লাট সাহেবের সমতুল্য বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এহেন মিঃ দের বেতন বৃদ্ধির জন্য কিছুদিন যাবৎ কর্পোরেশনের কয়েকজন কাউন্সিলার রীতিমত কোমর বাঁধিয়াছিলেন। এমন কি কোন কোন নব-নির্ব্বাচিত ব্যারিষ্টার ও রাজ-জামাতা কাউন্সিলার পর্য্যন্ত এ জন্য ভাই বেরাদার-দের দ্বারস্থ হইতেও ত্রুটি করেন নাই। কর্পোরেশনের এই "ভাঁড়ে মা ভবানী" অবস্থায়—বিশেষতঃ ব্যয় সঙ্কোচের অজু-হাতে স্বল্পবেতনের কর্ম্মচারীদিগের উপর ব্যয় সঙ্কোচের কুঠার হানিবার পর এরূপ বেতন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অন্যায়, অশোভন ও অযৌক্তিক বলিয়া আমরা প্রথমাবধিই এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া-ছিলাম।

* *

আমরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে দে মহাশয়ের বেতন বৃদ্ধির জন্য কয়েকজন কাউন্সিলারের গোপন চেষ্টা তদ্বির সত্ত্বেও তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। গত ১৯শে আগষ্ট তারিখে কর্পোরেশনের নব নির্ব্বাচিত মেয়র স্যার হরিশঙ্কর পাল মহোদয় এই প্রস্তাবটী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। মেয়র মহোদয় এই কার্য্যে যে দৃঢ়তা, নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বস্তুতঃই প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

* *

কর্পোরেশনের কাউন্সিলার কুমার হিরণ্য মিত্র এষ্টেটস্ ও জেনারেল পারাপাজেস্ কমিটিতে এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন যে, যে সব এলাকাগুলি কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে সেই সব এলাকায় অবস্থিত লাইব্রেরী ও ক্লাব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্পোরেশনের কোন সাহায্যদান করা উচিৎ নহে এবং ইতি পূর্ব্বে এইরূপ কোনদান মঞ্জুর হইয়া থাকিলে তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। আমরা শ্রীযুক্ত মিত্রের এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। অর্থাভাবে কর্পোরেশন যখন করদাতা-দের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য তাঁহাদের অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্যগুলি প্রতিপালন করিতে পারেন না, তখন নিজেদের এলাকার বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানগুলিকে এইভাবে অর্থ সাহায্য করিয়া দান-শৌণ্ডিকতার পরিচয় দেওয়া কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না।

* * *

নির্ব্বাচনে কাহারও পক্ষে ভোট দালালী করা কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদিগের নীতি বিরুদ্ধ। কর্পোরেশনের বিগত নির্ব্বাচনের সময় কয়েকজন উচ্চ ও মধ্যপদস্থ কর্ম্মচারী এই রীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া স্ব স্ব মনের মানুষের জন্য ভোট মাধুকরী করিতে ভোটাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কংগ্রেসী নির্ব্বাচন বোর্ডের ডিক্টেটর শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু মহাশয় এই বিষয়টীর প্রতি প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে কর্পোরেশনের কোন কর্ম্মচারী এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া যাহাতে কাহা-রও পক্ষে ভোটদালালী করিতে না পারেন তজ্জন্য তিনি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

* * *

সম্প্রতি কাউন্সিলার মিঃ এ, কে, এম, জ্যাকেরিয়া সার্ভিস কমিটিতে কর্পোরেশনের

সাপ্তাহিক 'হিন্দু' বলিতেছেন—

"সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে বঙ্গীয় হিন্দু সম্মেলনের যে অধিবেশন হই-য়াছিল তাহার উদ্বোধনকালে প্রবীণ ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এমন একটি কথা বলিয়াছেন যাহাতে ব্রাহ্মসমাজ হইতে ও হিন্দু মহাসভা হইতে তাঁহার নাম খারিজ হইয়া যাওয়া উচিত।"

আমরা অবশ্য ইহা লইয়া মাথা ঘামা-ইতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু কবি চণ্ডীদাসকে লইয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রিকায় যে বাঁকুড়া-প্রীতির লক্ষণসমূহ প্রকটিত হই-তেছে, 'প্রবর্ত্তক' তাহার যে পাণ্টা দিয়াছেন—তাহাতে কবির দুর্দ্দশা দেখিয়া আমাদের সত্যই আপশোষ হইতেছে। মানুষ মরিয়াও শান্তি পাইবে না?

নিকট নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি পেশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন—(১) কর্পোরেশনের কর্মচারীগণ কর্পোরেশনের সর্বক্ষণের (হোল টাইম) চাকুরিয়া বলিয়া গণ্য হইবেন। (২) কর্পোরেশনের কর্মচারীরা বাঙ্গলাদেশে ব্যবস্থা পরিষদ, ব্যবস্থাপক সভা, জেলাবোর্ড অথবা লোকালবোর্ডের সদস্য হইতে পারিবেন না। (৩) কর্পোরেশনের কর্মচারীরা প্রকাশ্য সভায় এমন কোন বক্তৃতা করিতে পারিবেন না, যাহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সঞ্চার হইতে পারে।

* * *

কলিকাতা কর্পোরেশন নাকি পথচারী কুকুরগুলির জন্য একটা আস্তানা নির্মাণের প্রস্তাব করিয়াছেন। পূর্ব্বে এই সব বেওয়ারিশ কুকুরগুলিকে প্রকাশ্য রাস্তায় লগুড়াঘাতে হত্যা করা হইত। তারপর সভ্যতার কিঞ্চিৎ মাত্রাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেশনও এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মোলায়েম অর্থাৎ বিষ প্রয়োগে হত্যার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। বলা বাহুল্য, প্রথমোক্ত ব্যবস্থাটী নৃশংসতা ও বীভৎসতার চূড়ান্ত পরিচায়ক হইলেও শেষোক্তটীও তদপেক্ষা কিছু কম নহে। যাহা হউক, কুক্কুরের এই অসহায় জীবগুলির উপর এতদিন পরে যে সহর পিতাদের দয়া বৃত্তির উদ্রেক ঘটিয়াছে এও ভাল।

* * *

বেপরোয়া কুকুরগুলির জন্য ত আস্তানা নির্ম্মিত হইবে, কিন্তু কলিকাতার পথচারী জীবন্ত জীবগুলির অর্থাৎ ভিক্ষুকদিগের সম্বন্ধে কি কর্পোরেশনের কোন দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য নাই? তাহারা কি আবহমানকাল পথে ঘাটে এইভাবে আস্তানা গাড়িয়া থাকিবে নানাপ্রকার কুৎসিৎ ও সংক্রামক ব্যাধির বীজ ছড়াইতে থাকিবে? বোম্বাই কর্পোরেশন তত্রত্য স্যালভেশন্ আর্ম্মির সহিত সহযোগিতায় সহরের ভিক্ষুক সমস্যার আংশিকভাবে সমাধান করিয়াছেন। রোগগ্রস্ত ভিক্ষুকদিগকে স্যালভেশন্ আর্ম্মির প্রদত্ত একটি স্বতন্ত্র আস্তানায় রাখিবার ব্যবস্থা করায় সহরে ব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুকের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা যেমন হ্রাস পাইয়াছে, তেমনি কার্য্যক্ষম অনেক ভিক্ষুক আটকের ভয়ে সহর ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন কি বোম্বাইয়ের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারেন না? পথচারী কুকুরগুলির জন্য তাঁহারা যেরূপ আস্তানা নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিয়াছেন, পথচারী ব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুকদিগের জন্যও যদি তাহারা অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহা হইলে ভিক্ষুকদিগের একটা সদ্গতি হয় এবং সহরবাসীরাও সংক্রামক ব্যাধির কবল হইতে অনেকটা নিস্তার পাইতে পারে।

ভাওয়ালের মধ্যম কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ (সম্প্রতি গৃহীত ফটো হইতে)

সৎসঙ্গ আশ্রমের নামে মামলা

স্বদেশ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়!—সৎসঙ্গ আশ্রমের নাম আপনাদের নিকট অবিদিত নহে। ৺অনন্ত নাথ রায় মহাশয় এই আশ্রমের মহারাজ ছিলেন। তাঁহারই নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত চেষ্টায় এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমার স্বামী শ্রীসত্যচরণ ঘোষ মহাশয় ১০ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত মহারাজের উপদেশ মত আমাকে সঙ্গে করিয়া আশ্রম দেখার জন্তে আশ্রমে আসিয়াছিলেন। আমরা স্বামী স্ত্রী উভয়েই আর্টিষ্ট। আমার স্বামী এই দশ বৎসর আশ্রমে থাকিয়া স্বাধীনভাবে আর্টিষ্টের কাজ করিয়া নিজ পরিবার প্রতিপালন করতঃ আশ্রমের উন্নতির জন্য কোনরূপ পারিশ্রমিক না লইয়া বহু কাজ করিয়া দিতেন। আমার স্বামীর বহু ছবি পূর্ব্বে মাসিক বসুমতী পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। সম্প্রতি সৎসঙ্গের নানারূপ অত্যাচারে আমরা আশ্রম হইতে পাবনা সহরে আসিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছি। মহারাজ অনন্ত নাথ রায় মহাশয় যে হিত ও সত্য প্রচার কল্পে এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সেই আশ্রম কতিপয় স্বার্থপর লোকের চক্রান্তে ঘোর অরাজকতার ও অত্যাচারের লীলা ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। গত ১১ই নভেম্বর আমাদের নিজ ব্যয়ে ও পরিশ্রমে অঙ্কিত মূল্যবান বহু ছবি ও অন্যান্য জিনিষপত্র তাহারা আমাদিগকে আনিতে না দিয়া আমাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। তাহারা আমার স্বামীকে ক্রীতদাসের মত রাখিতে না পারিয়া জিদের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার নামে ইতিপূর্ব্বে পাবনা কোঃ আদালতে তহবিল তছরুপের এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছিল। কিন্তু আদালতের বিচারে তাহা মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। গত ৫।৬।৩৬ তারিখে আমি আমার নিজাঙ্কিত ছবি, সেলাই ছবি ও অন্যান্য জিনিষ বাবদ পাবনা ১ম সবজজ আদালতে পপার স্বরূপে সৎসঙ্গ ও অনুকূল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ব্যক্তির নামে নালিশ করিয়াছি। আশ্রম আমাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। সম্প্রতি মোকদ্দমা চালাইবার ক্ষমতা আমার নাই। সেই কারণ পপার স্বরূপে নালিশ করিতে হইয়াছে। সৎসঙ্গ আশ্রম কতকগুলি মিথ্যা সাক্ষীর দ্বারা এই পপার মোকদ্দমা ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু ১৭।৮।৩৬ তারিখে আদালতের ন্যায় বিচারে (নং ১।৩৬) পপার সাব্যস্ত হইয়াছে। এই পত্র সহ এই মোকদ্দমার আরজি পাঠাইলাম। এই আরজির (১ম) দফায় আমার স্বামীর পূর্ব্ব পরিচয় (২য়) দফায় আমাদের বিবাহ, আশ্রমে আসা ও মহারাজ অনন্ত নাথ রায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ। (৩,৪,৫) দফায় আশ্রমে অবস্থান, আমার স্বামীর নিকট আমার চিত্রাঙ্কণ শিক্ষা ও আমাদের থাকার ঘর ছবির দ্বারা সাজান ইত্যাদির বিবরণ। (৬) দফায় সৎসঙ্গের সমস্ত মালামাল ও সম্পত্তি ঠাকুর কর্ত্তৃক কতিপয় বাহ্মসম্পত্ত ব্যক্তির দ্বারা নিজের করার চেষ্টা। সেই সময় মহারাজ অনন্ত নাথ রায় ও আমার স্বামী কর্ত্তৃক ঐ চেষ্টায় বাধা প্রদান। পরে ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আশ্রমের সমস্ত সম্পত্তি মায় সৎসঙ্গ নাম অনুকূল চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নামে বিক্রয় কবালা সম্পাদন, তৎপর মহারাজের মৃত্যু। মৃত্যুর পর আমার স্বামী কর্ত্তৃক মহারাজের মৃত্যু সন্দেহজনক বলিয়া প্রকাশ। তৎপর ঠাকুরের মাতা কর্ত্তৃক আমার গৃহস্থিত সিংহাসন হইতে মহারাজের ছবি ও বিছানা তুলিয়া ফেলার আদেশ। এবং সেই আদেশ অমান্যের পরে আমাদের উপর নানারূপ অত্যাচার। অবশেষে আমার স্বামীকে দাঁতের গোড়ার অসুখের জন্য খাওয়ার ঔষধ প্রয়োগ এবং তাহা বিষ বলিয়া আমাদের সন্দেহ ও প্রকাশ ইত্যাদি। (৭) দফায় জিনিষের দাবী ও তৎ পরিবর্ত্তে ৩৬০০৲ টাকা দাবী।

আরজিতে যাহা লিখা আছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। দয়া করিয়া এই আরজি খানি পড়িয়া আপনারা যেমন যেমন সঙ্গত মনে করেন সেইভাবে আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। পপার মঞ্জুর হওয়ায় মোকদ্দমা চলিতেছে। আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর এই মোকদ্দমায় (নং ৮৫।৩৬) দিন আছে। ইতি।

নিবেদিকা
শ্রীমতী শিখরবাসিনী ঘোষ
পাবনা।

[এই পত্রের সঙ্গে এই মোকদ্দমার দীর্ঘ আর্জ্জির নকল আমাদের হস্তগত হইয়াছে। যদি সম্ভবপর হয় তাহা হইলে পরবর্ত্তী সংখ্যায় উহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এই মামলা বর্ত্তমানে বিচারাধীন, সুতরাং এ সম্বন্ধে এখন কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশে আমরা বিরত রহিলাম।—স্বদেশ সম্পাদক]

সে

(গল্প)

শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায়

রাত্রি! গভীর রাত্রি! হাতে ঘড়ি নেই, সময় হিসেবের বাইরে! তবে অদূরস্থিত গির্জ্জার ঘড়ির ঢং করে একটা আওয়াজ কাণে এসে পৌঁচেছে! সেই সূত্র ধরে হিসেব করলে এখন বোধ হয় একটা দেড়টাই হবে!···নিশীথ রাত্রি! পার্কে জনমানবের চিহ্ন নেই! লাইটগুলো ইতিমধ্যে নিভিয়ে দিয়েছে বোধ হয় প্রয়োজন নেই বলে, কিংবা ব্যয়সঙ্কোচের জন্য! সামনে মসীলেপা অন্ধকার, পিছনেও তাই। সারাটা সহর নিঃসাড়, নিস্তব্ধ, অচেতন, প্রাণহীন! যুদ্ধক্লান্ত সুপ্ত নগরী! সামান্য পায়ের মৃদু শব্দটুকু পর্য্যন্ত যেন কানের কাছে বড় বেশী বলে মনে হয়।

···আমরা দুটিতে পাশাপাশি—অবাক্! মাঝে এতটুকু ব্যবধান নেই। সে আমার হাত ধরে—দু-হাত দিয়ে খুব শক্ত করে। প্রতি পদক্ষেপে তার পদস্খলনের সম্ভাবনা। পা তার টলছে, সেই সঙ্গে ক্ষীণপেলব শরীরটা—হাওয়ায় দোলা রজনীগন্ধার মত। নীরব উত্তরেই। মূক প্রকৃতির তালে তাল দিতে গিয়ে সব যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে! এই অস্বাভাবিক নীরবতা তার কাছে বোধ হয় অসহ ঠেকল—সামনের বেঞ্চিটা দেখিয়ে বলল—'এসো, একটু বসা যাক্—আর হাঁটতে পারছিনে!'

আমি কোনো আপত্তি না করে বসে পড়লুম। সে পাশে বসে আমার কাঁধের ওপর একখানা হাত রাখল। কয়েক-মুহূর্ত্ত নীরব থেকে শ্রান্তস্বরে বলল—'দিন দিন শরীরটা ভেঙ্গে পড়চে, এত অত্যাচার আর সয় না!

আমি বললুম—সে দোষটা শরীরের নয়, তোমার খেয়ালের।

—'কেন?'—কথার ভেতর বিন্দুমাত্র উদ্বেগের চিহ্ন নেই!

—হঠাৎ নেশা করে মরতে গেলে কেন?'—সে নিরুত্তর!

আবার আমিই বললুম, প্রবীণ উপদেষ্টার মত—'সবাই তো নীলকণ্ঠ নয় যে বিষপান করেও বেঁচে থাকবে।

তা ছাড়া সব মানুষের সব জিনিষ সহ্য হয় না, তার ওপর তোমার রুগ্ন শরীর!

'হুঁ শরীর রুগ্ন!'—সে ম্লান হেসে বলল—'এ পথে নেমে শরীরের দোহাই দিলে চলে না! শরীরটাই তারা চায়, মনটা নয়!'

—'ওটীকে পাকড়ালে কোত্থেকে? দেখে মালদার আসামী বলেইতো মনে হ'লো।

সে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল—প্রাণ খোলা হাসি নয়, অন্তর্নিহিত রুদ্ধ বেদনার শব্দ রূপান্তর! অন্ধকারের মাঝে তার মুখখানি চোখে পড়ল না, আলোর সামনে দাঁড়িয়ে তুলে ধরলে হয়ত দেখতে পেতুম চোখের কোলে শীর্ণ জলের রেখা! হাসি থামিয়ে বলল—'রূপ-যৌবনের ফাঁদ পেতে! কেন, আমি কি রূপসী নই? যৌবনে এরি মধ্যে ভাঁটা পড়েছে?'

—'কি জানি?' কতকটা অন্যমনস্ক-ভাবে বললুম।—উত্তরেই নীরব। আবার আমিই বললুম—আমার যতদূর মনে পড়ে, বিয়ের দিনকতক পরেই, তোমাদের পাশের বাড়ীর সেই ছেলেটার সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলে, না?'

—হু,—ঐটেই তোমরা সতর্ক দৃষ্টিতে দেখো। একটু চুপ করে থেকে বলল—'অমুক মেয়েটা অমুক ছেলেটার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে' এই টুকুই তোমরা সাগ্রহে শুনে রাখো, আর সেইটুকুই পরম লোভনীয় সত্যি হয়ে তোমাদের সমাজের খাতায় অক্ষয় অক্ষরে লেখা থাকে। নিষ্কর্মা সমাজসেবীদের আলোচনার খোরাক! কিন্তু কত বড়ো দাগা পেয়ে তারা পথে নামতে পারে, কতখানি ব্যথা বুকে নিয়ে জেনে শুনে তারা অন্ধকারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে যদি সে খবরটুকু জানতে, তাহ'লে নেহাৎ নির্ব্বোধের মত এমন অসংলগ্ন কথাগুলো বলতে পারতেনা কিছুতেই—প্রবল উত্তেজনায় সে হাঁপাতে লাগল। তার দেহের দ্রুত স্পন্দন আমি অনুভব করলুম।

'যাক্—সঙ্গীটী কোথা গেল?'—আমি প্রশ্ন করলুম।

'সরে পড়লো—নিজের প্রাপ্যটী কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে সরে দাঁড়ালো, তোমাদের-পুরুষদের যা চিরাচরিত স্বভাব!' একটু চুপ করে থেকে হেসে বলল—'সে এখন মস্ত বড়ো লোক। সভায় বক্তৃতা দেন, কাগজে বড়ো বড়ো নীতিগর্ভ বুকনি কাটেন। সমাজে তার আসন অনেক সত্যিকারের সাধু লোকের চেয়ে উঁচুতে। 'পদস্খলন' বিশেষণটা মেয়েদের বেলাতেই ব্যবহার হয়, পুরুষদের নয়! পুরুষ সম্বন্ধে তোমাদের সমাজের উদারতা অনুকরণীয়। পদস্খলন পুরুষদের পৌরুষত্বের ষোল আনা বিকাশের প্রমাণ। সমাজে তারাই হ'ন অভিজ্ঞ—ভুক্তভোগী সমালোচক!—

একটু থেমে বলল—তার সাহচর্য্যে লাভের মধ্যে আমার হ'লো দুর্দশা।

—কেন?—আমি জিজ্ঞসা করলুম।

—আমার গর্ভে এলো একটী শিশু। সে বলল, হয়তো তুমি বলতে পারো তার জন্য যুগ্ম আবাহন চাই। কথাটা অনেকাংশে সত্যি! কিন্তু কার না ইচ্ছে হয়, কোন মেয়ের না মনে সাধ হয় সে একটী পদ্মের মত শিশুকে বুকে চেপে ধরে, দেখে তার সমস্ত কামনাকে কেমন করে সে তার পাপড়ি ভরে নিয়ে এসেচে!

—'কথাটা খুবই সত্যি' আমি বললুম—'শাশ্বত পিপাসা! কিন্তু সে কামনা মেটানোর সদুপায়ও ছিলো—অবৈধ না হ'লেও হ'তো!'

—কিন্তু তখন আমার কাছে ঘর-বাইরে সমান। ঘরেও পাবো যা বাইরে তাই, বেশী কিছু নয়। বলো তো, যুবতী মেয়ের সঙ্গে একজন অস্তিমদশী বৃদ্ধের বিবাহের পেছনে কি অর্থ থাকতে পারে। ভালোবাসা না দেহ লিপ্সা?' একটু চুপ করে থেকে বলল—'যাই হ'ক, আমার দেহে যে আশ্রয় নিয়েছিলো, সে সন্তান নয়—যৌবনের তাগিদের রাহাজানি!'

—'তারপর?

—'তারপরে সংবাদ মর্ম্মান্তিক!'

—তবু—

—পথের মাঝে সাথীটি মোড় ফিরে সরে গেল, আর আমি পড়ে রইলুম—সম্পূর্ণ নিঃসহায় অবস্থা! যা কিছু মূলধন ছিলো, তা ইতিপূর্ব্বে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো। সে হাঁফিয়ে পড়েছিলো, দম নিয়ে বললে—'তারপর পসারিণীর দলে নাম লিখলুম। সেই বিকৃত অবস্থার উপরই চললো অবিরত দেহদান। যে উপায়েই হ'ক আমার বেঁচে থাকতে হবে। বেঁচে থাকতে হলে দেহের দাবী মেটাতে হবে। নিঃস্বার্থ ভাবে আমায় কেউ সাহায্য করবেনা, বিশেষ যখন আমার যৌবনে ভাটা পড়েনি। প্রত্যাশীর কাছে সেও কিছু আশা করে।'—সে চুপ করল। মনে করলুম নেশাটা বোধ হয় জোরালো হয়ে উঠেছে, কথা কইবার শক্তি ক্রমশঃ লোপ হয়ে আসছে। আমার সন্দেহ অমূলক জানাবার জন্যই যেন সে বলে উঠল—'তারপর দেহের ভেতর আশ্রিত মহামানবটীর অপূর্ণাঙ্গ অবস্থাতেই অপমৃত্যু হ'ল। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। পথের কাঁটা সরে গেল। পূর্ণ উৎসাহ বুকে নিয়ে নেমে পড়লুম, নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তন আনতে, জীবনটাকে বাইরের দিকে দিয়ে আশ মিটিয়ে ভোগ করতে, এখনো পুরোদমে ভোগ করচি।'

—হুঁ—"আমি বললুম—আমি বললুম—তাতে তুমি জীবনকে সত্যিকারের সুখের মুখ দেখাতে পেরেচো?

—কিছুতেই নয়, সে বলল—'পারাটা স্বাভাবিক নয়। কুকর্ম্ম কোনদিনই সুফল প্রসব করে না। সুখ পাইনি, আমি পেয়েচি শান্তি! কেন জানো? সমাজের বিরুদ্ধে আমার এই অভিযান! আমি চোখে আঙুল দিয়ে সমাজকে দেখাতে চাই যে, আমি হাসতে জানি—হোক সে হাসি বীভৎস, প্রাণখোলা নাই হোক!'

—তোমার দেহে যে প্রাণীটি আশ্রয় নিয়েছিলো, আমি বললুম—'সে অজ্ঞান, নিষ্কলঙ্ক, চেষ্টা করলে হয়তো তুমি তাকে বাঁচাতে পারতে।

—'জানিনা, অতটা তলিয়ে ভাববার সময় তখন পাইনি—আর ইচ্ছে করেও করিনি। কেননা, তার স্থান তোমাদের সাধু সমাজে হতো না, এ বিষয়ে নিঃস-

স্নেহ। যদি কোন অবাবদিহি না দিয়ে কোন বাদ-বিচার না করে, শুধু মানব সন্তান এই পরিচয়ে সমাজ তাকে সকলকার মত সমান আসনে বসাতে পারতো, তাহলে আমার দেহের সমস্ত রস ফোঁটা ফোঁটা করে নিঙড়ে তাকে বড়ো করে তুলতুম, সে হবার নয়।'—হঠাৎ সে সর্বাঙ্গ ঝাকানি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো—বলল 'যাক ওঠো, রাত বোধ হয় অনেক হল।—চলো!

সারাটা পথে সে একটী কথাও বলল না। কয়েকমিনিট পূর্ব্বে অন্ধকারের মাঝে এই মেয়েটী যে অতি মুখরা হয়ে উঠেছিলো, মুখ দেখে তা বোঝবার যো নেই। খানিকটা পথ এসে একটা মোড়ের মাথায় লাইট পোষ্টের তলায় সে আমার হাত ছেড়ে দিলে, বলল—থাক আর আসতে হবে না, এবার আমি একলাই যেতে পারবো—হ্যাঁ, আর একটা কথা—আমার নোংরামী কাণ্ড শুনে, হয়তো কেন নিশ্চয়ই, তুমি আমাকে ঘৃণা করবে। করাটা স্বাভাবিক। হই আমি ঘৃণার পাত্র, অজ্ঞানের বালতি, তবু আমার সব চেয়ে বড়ো সান্ত্বনা সমাজের বিরুদ্ধে আমার এই অভিমান—আচ্ছা এসো। সে পাশের গলির ভেতর ঢুকে গেলো।

আমি লাইট পোষ্টটা ধরে নিস্পন্দের মত দাঁড়িয়ে তার চলার গতিভঙ্গী লক্ষ্য করতে লাগলুম। ওর কথাটা আমার কাণে করুণ সুরে বাজতে লাগলোঃ 'সমাজের বিরুদ্ধে আমার এই অভিমান'।

চির যৌবনা নারী

বিশেষজ্ঞরা বলেন—ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে মেয়ে-জাত-নিজেদের বয়স বা দেহ-সৌষ্ঠবের দিকে লক্ষ্য করেন না। ত্রিশ বৎসর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন যৌবনের জোয়ারে ভাঁটা ধরে, তখন সহসা দেখেন,—দেহে সে মাধুরী নাই! মন তখন অস্বস্তিতে ভরিয়া ওঠে।

এক লক্ষ্যহীনতার হেতু বিশেষজ্ঞদের মতে যৌবনে নারী নিজের রূপসম্পদের গর্ব্বে অনেকখানি আত্মহারা থাকেন—তখন প্রিয়জনের আদরে সোহাগে নিজের পানে চাহিবার অবকাশ মিলে না। বয়স বাড়িয়া চলার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-জাতির ওদিকে মনে ঘটে অবসাদ—স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ শিথিল হয়—কাজেই নারী তখন অবস্থান্তর হেতু নিজের পানে লক্ষ্য ফিরান। পুরুষের এ অবসাদের মূলে আছে নারীর যৌবন-বসন্ত অবসান!

এ জন্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, বিধাতা নারীকে বড্ড দরাজ হাতে গড়িয়াছেন। যৌবনকে ধরিয়া রাখা নির্ভর করে নারীর নিজের হাতে। কিরূপে সেই সম্বন্ধে তাঁরা আলোচনা করিয়াছেন, আমরা সে আলোচনার মর্ম্ম সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

পুরুষ ও নারীর অঙ্গছাঁদ বিভিন্নরূপ বা সুদর্শনত্বের আদর্শও বিভিন্ন। যে নারীর আকর্ষণ নাই সে নারীর মূল্যও অল্প। স্ত্রীর চেহারা যদি মনে আনন্দ না দেয়, তাহা হইলে জীবনের অনেকখানি মাধুর্য্য বিনষ্ট হয়।

পুরুষ কঠিন, কর্কশ হইবে—নারী হইবে কোমলাঙ্গী। সারাদিনের পরিশ্রম লাগিয়া পুরুষ গৃহে আসিয়া স্ত্রীর রূপমাধুরী যদি চোখে দেখে, তাহা হইলে দেহমনের অনেকখানি ক্লান্তি ঘুচিয়া যায়।

রূপমাধুরী দেখার কথা বলিয়াছি। চোখের দেখায় মন তৃপ্তি পায় অনেকখানি।

বিধির বিধান রীতির আলোচনা করিলে আমরা বুঝিব, বিশ্বসৃষ্টির মূলে আছে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণযোগ। মানবেতর প্রাণিসমাজে বিবাহবিধি নাই, সমাজশৃঙ্খলা নাই—প্রেমের নিষ্ঠা সে সমাজে অজ্ঞাত। যৌন আকর্ষণের যাহা কিছু আভাস, তাহা আসে স্ত্রী পশুপক্ষীর দিক হইতে। তাই সিংহিনীর চেয়ে সিংহ সুরূপ; ময়ূরীর চেয়ে ময়ূর সুদর্শন। স্ত্রী পশুপক্ষীকে সে সমাজে আকর্ষণ করে পুং-পশুপক্ষী। নরসমাজে বিধি বিপরীত ধরণের। মানব-সমাজে বিধাতা তাই নারীকে অধিকতর রমণীয় ও সুদর্শনা করিয়া গড়িয়াছেন। নারীর রূপে মুগ্ধ হইয়া পুরুষ আসিয়া তার কাছে প্রণয় যাচনা করিবে। নারী বংশ-জননী—নারী করিবে সৃষ্টি রক্ষা।

এইজন্যই মানব সমাজে নারীর চারুতা হওয়া প্রয়োজন। পুরুষ তাই মানব সমাজে চিরদিন নারীর পানে চায় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে।

এ ব্যাপারে সমাজে নৈতিক অধোগতি হইবে কতখানি সে সম্বন্ধে সামাজিকের দল বিচার করিতে বসুন—বৈজ্ঞানিকের
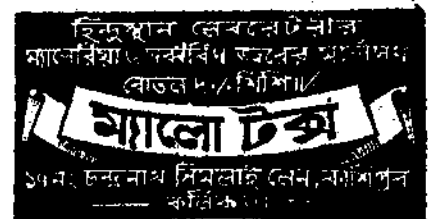
দল এ সমাজ-তন্ত্রের কোনো ধার ধারেন না। তাঁরা বৈজ্ঞানিক সত্যমাত্র বিবৃত করিবেন। বিজ্ঞানের দিক দিয়া এ কথা মানিতে হইবে যে, নারী কুরূপা, বীভৎস-গঠনা হউন, তাহা কেহ চাহেন না। কাগজে কলমে যে কথা লিখিতে কেহ হয়ত বা সঙ্কোচ বোধ করিবেন, কিন্তু মনে জানে এ সব শুচিবাতিকগ্রস্তের দল পুরকামিনী-দের কুরূপত্ব বা কুদর্শনত্ব কামনা করিবেন না।

বাস্তব জগতে আমরা দেখি, বহু সাধ্বী-সতী তাঁদের স্বামী-দেবতাদের প্রেম-নিষ্ঠা রাখিতে পারেন না! সন্ধান লইলে দেখিব, এ সব ক্ষেত্রে স্ত্রীগণ হয় সুভাষিনী নন্—কিম্বা নিজেদের সুদর্শনা রাখিতে ঔদাস্য করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিবেন, স্ত্রী হইয়া কি স্বামীর মন ভুলাইবার জন্য সাজসজ্জা করিতে হইবে? আমরা জবাব দিব,—হাঁ, করিতে হইবে, নচেৎ সৌভাগ্য-লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইতে পারে; পুরুষ চায়, মেয়েজাত চেহারায়, আচরণে মেয়ে থাকিবে—পুরুষালি চালের মেয়েরা স্মার্ট হতে পারে, পুরুষের ভালবাসা বা শ্রদ্ধার পাত্রী হইতে পারে না।

এই অঙ্গরাগ প্রভৃতির প্রথা ভারতে সত্যযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং কলিযুগেও তাহা চলিবে—চলা উচিত। সেকালের সঙ্গে সজ্জা-সম্ভারে ঘটিয়াছে প্রভেদ। তখন মেয়েরা মাখিতেন চন্দনের গুঁড়া,—এখন পাউডার। তখন মাথায় খইল ঘষিতেন, এখন মাথা ঘষেন শাম্পু তৈলে। তখন পায়ে দিতেন মল; এখন দেন জুতা। মেয়েরা সাজসজ্জা করেন, নিজের জন্য নয়, স্বামী বা প্রিয়জনের নয়ন মন-রঞ্জনের জন্য।

বিস্ময়

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

আমার প্রিয়া যে কারে ভালোবাসে আজো তাই জানি নাই
আমি ভালোবাসি এই জানিয়াই অসীম তৃপ্তি পাই।
মোর প্রিয়া আজ যারে ভালোবাসে কাল তারে ফেলে যায়,
আমার প্রিয়ার মনের নাগাল কোন জন নাহি পায়।
একে ভালোবাসে তাকে ভালোবাসে চঞ্চল প্রিয়া মোর,
আমি চেয়ে চেয়ে দেখি আর দেখি আমার জীবনভোর,
আমায় সে ভালোবাসে কিনা আমি জানি নাই কোন দিন,
আমি তার কাছে হয়ে আছি তাই অতি অল্প হীন।
আমার প্রিয়ার মনের গহনে ডুবে গেল কত লোক
নিমেষের তরে করে না তো প্রিয়া তাহাদের তরে শোক—
আমি মরে গেলে আমার প্রিয়ার খুলে যাবে বন্ধন,
সেই আশাতেই মোর প্রিয়া করে আমা লাগি ক্রন্দন,
আমার প্রিয়ার মনের মহিমা—গূঢ় রহস্যময়
তাই তো তাহারে আরো ভালোবাসি—নাই এতে সংশয়।
আমার প্রিয়ার প্রিয় কেহ নাই—সান্ত্বনা এই মোর,
আমি ভালোবাসি—ভালোবেসে আমি কাটাবো জীবনভোর।

প্রাচীন প্রসঙ্গ

আমরা জানি, —মানে, শুনিয়াছি, এই কলিকাতা-সহরটির স্থাপনা করেন জব চার্ণক। জব চার্ণক ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কেরাণী। কেরাণী-গিরি চাকরি লইয়াই তিনি ভারতবর্ষে আসেন—১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে।

১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ছিলেন পাটনায় —কোম্পানীর সেখানকার কুঠির কর্ত্তা হইয়া। তাঁর কর্ম্মক্ষমতায় কোম্পানীর বহু অর্থলাভ হয়। জব চার্ণকও বিলাতী পোষাক, বিলাতী আচার রীতি বর্জ্জন করিয়া ক্রমে এদেশীয় পোষাক ও আচার রীতির পক্ষপাতী হন। তিনি নাকি এক হিন্দু বিধবাকে সহমরণের চিতা হইতে উদ্ধার করেন এবং পরে এই বিধবার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে চার্ণক আসেন, মুর্শিদাবাদে—নবাবের সঙ্গে বহু বিবাদ-বিরোধ সত্বেও কোম্পানীর ব্যবসা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখেন; একবার নাকি নবাবের এক কর্ম্মচারী তাঁহাকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়াছিল; আর একবার তাঁর উপর অত্যাচার আসন্ন হইলে তিনি হুগলীতে পলাইয়া আসেন।

নবাবী সৈন্যের সঙ্গে হুগলীতে তাঁর বিরোধ ঘটে; তখন ১৬৮৬ খৃঃ অব্দে তিনি হুগলী ছাড়িয়া স্থতানুটিতে আসিয়া উপস্থিত হন।

মুসলমানী ইতিহাস রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে,—হুগলীতে কুঠি নির্ম্মাণকালে নবাবী পরোয়ানা বাহির হয়—জব চার্ণক এক-বারই ইহা আর রাখিতে পারিবেন না। এই ব্যাপার লইয়া কোম্পানীর তরফ হইতে চার্ণক বহু বিরোধ করেন—অবশেষে নবাবী-সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটে। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তখন মসনদে। যুদ্ধে লাভ নাই বুঝিয়া চার্ণক হুগলী হইতে চন্দননগরে আসেন—সেখানে অগ্নিসংযোগে বহু পল্লী ভস্মসাৎ করিয়া দেন। এ সংবাদ পাইয়া হুগলীর শাসনকর্ত্তা আদেশ জাহির করেন, নদীবক্ষে কোন ইংরেজী জাহাজ যেন যাইতে না পারে। এজন্য নদীর এক তীর হইতে অপর তীর পর্য্যন্ত মোটা লোহার শিকল দিয়া প্রাচীর তৈয়ার করা হয়। চার্ণক তখন চন্দননগরের অপর তীরে বারাকপুরে আসেন। এখান হইতে বহু উপঢৌকনাদি পাঠান নবাব মুর্শিদ-কুলিখাঁকে এবং তাঁহার কাছ হইতে কুঠি নির্ম্মাণের অনুমতি সংগ্রহ করেন। বারাক-পুরে তিনি আশ্রয় লন বলিয়া বারাকপুর আজিও তাঁহার নামের অনুকরণে "চার্ণক" নামে অভিহিত।

পরে জব চার্ণক স্থতানুটী বাণিজ্যের পক্ষে যোগ্য কেন্দ্র বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। স্থতানুটীর পদতলে গঙ্গার প্রবাহ —নদীতে জল সুগভীর; ওদিকে রোগ কুমীর বাঘে পরিপূর্ণ সুন্দরবন—কাজেই এ স্থান বেশ নিরাপদ—সুগমও বটে।

জব চার্ণক একা স্থতানুটীতে আসিয়া পদার্পণ করেন। এখানে নবাবী ফৌজ বহুবার হানা দিয়াছে—কিন্তু কোম্পানীর সৈন্যদল সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

স্থতানুটীতে আস্তানা বাঁধিয়া উলুবেড়িয়ায় জব চার্ণক একটা জাহাজ-মেরামতীর কারখানা খুলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থতা-নুটীতে বহু কুঠি নির্ম্মাণ করাইলেন।

স্থতানুটীর অবস্থান—আধুনিক যুক্তি খোলা ও কাষ্টমস্ হাউসের মধ্যবর্তী স্থান। জব চার্ণকের মৃত্যু ঘটে ১৬৯৩ খৃঃ অব্দে। তাঁর মৃত্যুর পর কোম্পানীর ব্যবসা বৃদ্ধির সঙ্গে স্থতানুটীর পাশাপাশি জায়গাগুলিতে কুঠি স্থাপনা সুরু হয়—জনসংখ্যা বাড়িতে থাকে। স্থতানুটীর দক্ষিণ অংশের নাম ছিল গোবিন্দপুর—এখন যে ফোর্ট উইলিয়াম, তাহারই দক্ষিণের অংশ গোবিন্দপুর নামে অভিহিত ছিল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গের প্রথম পত্তন হয়—তখন এটি খুবই ছোট ছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে এ দুর্গ আকারে বড় করিয়া রচিত হয়।

* * *

কলিকাতা মিণ্ট বা টাঁকশাল স্থাপিত হয়—১৭৭২ খৃষ্টাব্দে। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে "কলিকাতা" নাম উল্লিখিত আছে। তবে সে নাম "কলকত্তা", "কলিকাতা" বা "ক্যালকাটা" নয়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-রামের কাব্যেও কলিকাতার নাম পাওয়া যায়। রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থে উল্লি-খিত আছে—কলিকাতা পূর্ব্বে ছিল সামান্য পল্লী। এখানে ছিল কালীক্ষেত্র—তার আয় ও সেবায় ব্যয় ছিল নির্দ্দিষ্ট। জায়গার নাম ছিল, কালীকর্ত্তা; উচ্চারণের ব্যক্তি-ক্রমে কলিকাতায় রূপান্তরিত হইয়াছে। কালীক্ষেত্র হইতেই কলিকাতা নামের উৎপত্তি।

“সাগরের প্রেম”

(গল্প)

রামেন্দ্রকুমার (দেশমুখ্য)

বিকেলের দিকে তটিনী, ওর রুমে বসে জানালা দিয়ে পথের দিকে চেয়ে ছিল। টেবিলের ওপর সকালবেলাকার কেনা সুগন্ধি ফুলের তোড়া, যৌবনের সমস্ত মাধুর্য্য হারিয়ে ম্লানমুখে আসন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত্ত গুণছিল। এই মাত্র স্বামী, সাগর মধু আলাপনের মুহূর্ত্তকে সোণালী, নিবিড় করে দিয়ে কোথায় সরে পড়েছে, অপ্রত্যাশিত ভাবে। আশ্চর্য্য, তা'র এই স্বামী; রহস্যময় কিছুতেই ধরা দিতে চায় না। সাগরের মতই থাকতে চায় অনাবিষ্কৃত অবস্থায়।

বর দুপুর বেলা ওর হাতে যে নীল-রঙের খামে-করা চিঠি দিয়ে গেছে, সে কথা ভুলেই গিয়েছিলো সে। বাতায়ন পথে সুদর্শন এক তরুণের হাতে গোলাপী-রঙের একখানা আধোমুষ্ট খাম দেখেই ওর অনুস্মরণে এলে দুপুর বেলার পাওয়া খামটী, ছিন্ন হবার বেদনা নিয়ে যা পলে পলে গুমরে মর্চ্ছে।

টেবিলের ওপর হ'তে খামখানা তুলে নিয়ে সে কিনারা করে ছিড়ে ফেল্লে। সার্থকতার রূপ ধরে বেরুল, একখানা শাদা কাগজে লালকালির লিখন। সারি সারি লাল পিপড়ের দল যেন মার্চ্চ করে চলার পথের মধ্যে হঠাৎ থেমে গেছে। তটিনী দ্রুতির রাশ রূখ করে পড়ে চল্ল :

ভাই,

অনন্তের আহ্বান আমার কাণে এসে পৌছেচে। যাবার আগে তাই তোকে গুটী কতক লিখন পাঠাচ্ছি। হারানো দিনের বন্ধু বলে, রাগ করবিনে জেনেই লিখছি। সেই কবেকার পুরোন কথা টেনে আনছি বলে, বেশী করে আর আমার ওপর বীতশ্রদ্ধ হোসনে।

······বাসন্তী পূর্ণিমায় সেদিন যখন টী পার্টিতে সাগরের সঙ্গে তুই আলাপ করিয়ে দিলি—সেদিন তুইও বুঝিসনি যে সাগরে ডুব দেবার ইচ্ছে পুরী যাত্রীদের মত আমারও পুরোমাত্রায় হতে পারে। সাগর তোর বন্ধু, আমিও তোর তাই। মধ্যস্থ হয়ে তুই আমাদিগকে ইনট্রডিউসড্‌ করে দিলি। সে দিনের সেই চেনা-জানার মুহূর্ত্তে কী অনুভব করেছিলুম জানিস?

—অনুভব করেছিলুম, মীনকেতু যেন মূর্ত্তিমান হয়ে তন্বীদের নিকেতনে ধরা দিয়েছেন। ওর সেই ভাব নিবিড় সহজ চাউনি আমাকে অনাত্মস্থ করে তুল্ল। সত্যি বন্ধু, বলতে আর লজ্জা নেই এখন সেই প্রথম দর্শনেই ওকে আমার নিজের করে নেবার উদগ্র বাসনা আমার মনের ভেতর সাড়া দিলে।

সে যখন চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এক-পরে আমায় সম্বোধন কল্লে,—দেবি, আপনায় চা বোধ করি আর একটু পরেই দেয়া হচ্ছে, ততক্ষণ অধুনা এবং অগ্রে লব্ধ আমার এটেই আপনার কৃপাপাত্র হয়ে যাক। তখন আমি কি দেখেছিলুম জানিস,—দেখেছিলুম, সুধাপাত্র হাতে বাঞ্ছিত দেবতা আমায় সেটী গ্রহণ কর্ত্তে অনুরোধ কচ্ছে। শিষ্টাচার ভুলে গিয়ে উন্মুখ হয়ে সেটী গ্রহণ করেছিলুম সত্যি, কিন্তু এর জন্যে আমার তখনকার মনকে কোন রকমেই দোষ দেয়া চলতো না ভাই।

পান পর্ব্বের সমাপ্তি হয়ে গেলে পর তোরা চলে গেলি সবাই। আমি আর সে তোদের চোখকে আড়াল করে নিভৃতে বকুল গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়ালুম। মাধবী রাত,—পারুল—বকুল—রজনীগন্ধার গন্ধ ডালি নিয়ে আমাদের এসে ঘিরে দাঁড়ালো। পারিনি বন্ধু,

নিজেকে সামলে নিতে। চাঁদের দিকে চেয়ে কি মনে হয়েছিল,—জানিস? মনে হয়েছিল সে আমাদের এই গোপন মিলন দেখে হাসছে—নির্লজ্জের মত, মাত্রার শেষ সীমায় ওঠে হয়ত'।

সে মুহূর্ত্তে ভাই, আমি জোর গলায় বলতে পারি, পৃথিবীর কোন মেয়েই (অনাত্মীয়া) সংযত রইতে পার্কেনা। কিন্তু চুম্বনের মায়া মদির করেই ভুলবে তাকে। যদি সামলে নিতে পারে, তবে প্রাণহীন বলে মনে কর্ব্বো দ্বিধাহীন ভাবে।

বকুলের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ওর হাতে সেদিন পাশের মাধবী কুঞ্জ থেকে একগাছি লতা ছিড়ে নিয়ে মিলন স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে 'রাখীবন্ধন' পরিয়ে দিলুম। স্মিতহাস্তে সেও তা গ্রহণ করেছিল,—দেখেছিলুম। জীবনের সে শ্রেষ্ঠতম, স্মৃতি-সুনিবিড় মুহূর্ত্ত যে কেমন করে কেটে গিয়েছিল—তা' বলতে পার্কোনা মোটেই।

সে আমাকে ভালবাসলে। সকল কুণ্ঠার অবসান করে নিজেকে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত ওর অধিকারে ছেড়ে দিলুম। বাঞ্ছিত চিত্তে সেও আমায় গ্রহণ করল বুঝলুম। তারপর তুই এসে দাঁড়ালি আমাদের মধ্যে ব্যবধান-প্রাচীর রচনা কর্ত্তে। কিন্তু পদে পদে তুই পর্য্যুদস্ত হতে লাগলি। তোর প্রয়াস কিন্তু দমলনা। নতুন মালমসলা নিয়ে তুই আবার প্রাচীর গড়তে ওঠে পড়ে লেগে গেলি।

মৌখিক মিত্র তুই ছিলি তখন সত্যি। কিন্তু মনে প্রাণে ছিলি শত্রু। শত্রুর ছদ্মবেশে আমাকে বিপ্রলব্ধ কর্বার চেষ্টা তোর অজ্ঞাত ভাবেই চলছো। সেদিন—তুই, অতি নীচতায় আশ্রয় নিয়ে মা-বাবার কাছে অনুযোগ তুলি,—সাগরের সঙ্গে আমার অবাধ এবং অবৈধ প্রেম জমে উঠেছে। কোথাকার সে অখ্যাত এবং অপরিচিত। ওরে মূর্খ, সত্যিকার প্রেম কখনও বর্ণ-গোত্র, খ্যাতি-অখ্যাতির ধার ধারে নাকি? এ সহজ সত্যও তোর কাছে ঘোলাজলের মত অস্বচ্ছ রয়ে গেল। সত্যিকার প্রেম যে অন্তরের জিনিষ। বাইরের বিষয়বস্তু দিয়ে ওর খাঁটিত্ব যাচাই করা চলেনা। যাক্—তোর সে নীচব্যবহার আজ ভুলতে পেরেছি—বলেই লিখছি।

বাবা আমায় ডেকে নিয়ে খুব ধমকালেন। এমন বকুনি বাস্তবিকই আমার নিকট এ্যাদ্দিন অপ্রত্যাশিত ছিল। সত্যি, ওরা আমায় যা বুঝালেন—তাতে মনে হ'ল কী করে এসেছি এ্যাদ্দিন না বুঝে। সাগর ছেড়ে বালুতে যাবার জন্তে পা বাড়ালুম। কিন্তু পারলুম না। সাগরের ঢেউ আমার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে ওর বুকে নিয়ে গেল দমকা আকর্ষণে। যে দুদিনের বিরহে মন স্বভাব বিরুদ্ধতায় ব্যথিয়ে ওঠেছিল, তা আমি শুনতে চেষ্টা করেছিলুম।

আনন্দের আতিশয্যে রজনী গন্ধার অতবড় তোড়াটা কুচি কুচি করে ছিড়ে ফেলেছিলুম।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হলনা ভাই। সামাজিকতার দোহাই দিয়ে সে আমাকে হেয় জ্ঞান করলে। তোর সঙ্গেই তার বিয়ের ঠিক হ'ল। তাকে আমি অনেক বুঝিয়েছি;—সেও আমার মুখের দিকে চেয়ে এক একবার মত দিয়েছে; আবার হঠাৎ ত্রস্ত হয়ে সেই সমাজ—রূঢ় সমাজের দোহাই দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

সে দিন মনে পড়ে পার্কের জনবিরল [illegible] বেঞ্চিটায় বসে গল্পে তাকে বলেছিলুম,—মা-বাবা, সবাইকে ছাড়তে আমি রাজী আছি—কিন্তু তোমাকে শুধু তোমাকেই আমি ছাড়তে পার্কোনা। আশ্চর্য্য হলুম শুনে যখন সে উত্তরে বল্লে,—তুমি যে ব্রাহ্মণ আর আমি—।

—'দূত্তোর'—বলেছিলুম সেই মুহূর্ত্তে—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের নিকুচি কর্ছি। সমস্ত ত্যাগ করে শুধু বিনিময়ে তোমাকেই চাই। কিন্তু ফল কিছু হলনা ভাই। যাবার আগে সে জানিয়ে দিলে,—দুর্নাম কিনতে সে রাজী নয় মোটেই। আমাকেও তাই চায়না।

সেই মুহূর্ত্ত ভুলতে পার্কোনা জীবনে, কিছুই অনুভব কর্ত্তে পারিনি তখন। অবশ নিতান্ত অবশ পা নিয়ে বাসায় চলে এসেছিলুম।

আমার সমস্ত রস সে নিয়ে গেল। শীতের শুষ্ক মাধবী লতার অনুরূপ হয়ে উঠলুম আমি। তারপর শুনে আশ্চর্য্য হবি,—কলঙ্কের পশরা সবাইর মাথার ওপর তুলে দিয়ে বাড়ী ছেড়ে দিলুম। কোথায় আছি এখন জানতে চাস্‌নে। শুধু এই জানিস,—সাগরের সর্ব্বনেশে প্রেম আমাকে ঘর ছাড়িয়েছে। তটিনী তুই ভাই, সাগরের বুকে নিবিড় করে মিশে গিয়েছিস। আর আমি—সাগরের প্রেমে ঘরছাড়া হয়ে মরুপথেই ধারা হারিয়ে ফেলেছি। অতদূর এগিয়ে যেতে পারিনি ভাই। দুঃখ খুব বেশী লাগছে না। সাগর নিজে না জানুক, আমায় সে সত্যিকার প্রেমই শিখিয়েছে। অনির্ব্বাণ প্রেম বুকে করে চলছি। কোথায় যাব নিজেই জানিনা।

ইতি
তোর
কলেজী—দিনের—
অভিশপ্ত বন্ধু।

—যদি চলিগো দূরে—

(গান)

শ্রীমনোজ মোহন সান্যাল

তব কানন ছাড়ি'
　　যদি চলিগো দূরে
তবু মরম ভরা
　　রবে স্মৃতির সুরে।
সেথা জ্যোছনা রাতে
রাঙা কবরী সাথে
আমি হেরিব তোমা
　　মোর স্বপন পুরে।
জানি তুমিও সেথা
　　দূর অশোক তলে
সাঁঝে ভাসিবে শুধু
　　তব আঁখির জলে।
আমি নীরবে রব
কারে বেদনা কব
যদি কানন ছাড়ি'
　　কভু চলিগো দূরে।

চিঠি পড়া শেষ করে তটিনী উঠে দাঁড়িয়েছে মাত্র;—সাগর এসে ঘরে ঢুকল। হেসে বল্লে,—ওগো আজ যে বাসন্তী পূর্ণিমা। ঘরে শীগগির তাই ফিরলুম। সারারাত আজ জাগবো দুজনে। পুরোণ দিনের এক বন্ধু আমায় এমনিতর এক বাসন্তী পূর্ণিমায় মাধবীলতার রাখীবন্ধন পরিয়ে দিয়েছিল। বাক্সে বন্ধ আছে সেটা। দেখবে চল কেমনতর চেহারা হয়েছে ওর।

তটিনী হাসলে না। অপলকনেত্রে তাকিয়ে রইল পাহুর মত। স্বামীকে নিষ্ঠুর, নির্দয় বলে সম্বোধন কর্বার ইচ্ছে মনের মধ্যে তখন মাথা উঁচিয়ে তুলছিল কি—না কে জানে?

ছায়া ও কায়া

শ্রীমধু বসু

প্রচার বিভ্রাট

সম্প্রতি দেখা যায় কোন রঙ্গালয় বা ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠান নতুন নাটক বা চিত্র প্রথম অভিনীত বা প্রদর্শিত হবার সময় পত্রিকা-সম্পাদকদের আমন্ত্রণ পাঠান। এই যে প্রেস-কার্ড পাঠান হয় এতেও নানারকম কারসাজির পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও সময় দেখা যায়, কোন পত্রিকা যদি কোন নাটক বা ছবির প্রশংসা করতে অপরাগ হন তাহলে পরবর্ত্তী সময়ে আর তাদের আমন্ত্রণ করা হয় না—কোনও সময়ে দেখা যায় ভ্রমবশতঃ কোন বিশিষ্ট পত্রিকাকেই আমন্ত্রণ-লিপি পাঠান হয় না -- কোনও সময় দেখা যায়—প্রদর্শন সময়ের কাছাকাছি সময়ে এইরূপ লিপি এসে হাজির হল—আবার অনেক সময় নাটক অভিনীত বা চিত্র প্রদর্শিত হওয়ার পর এমন লিপি কাগজের অফিসে এসে উপস্থিত হল এবং তাতে যে তারিখ ও সময় দেওয়া ছিল তা পর্যান্ত উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অনেক সময় দেখা যায় পত্রিকার ভুল ঠিকানায় কার্ড পাঠান হচ্ছে -- অনেক সময় আবার দেখা যায় শুধু "সম্পাদক—অমুক পত্রিকা" বলেই ছেড়ে দেওয়া হয়—যে বেচারী এ সব বিলি করতে আসে তাকে হতে হয় নাস্তানাবুদ—খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে যায় -প্রায় সময়েই দেখা যায় প্রতিবারেই নতুন নতুন লোক এ জন্য নিয়োজিত হয়। এসব নিয়ে আলোচনা করবার সময় এসেছে —এমন দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার যাদের ওপর ন্যস্ত থাকে তারা প্রায়ই যোগ্যতা-সহকারে সে কাজ সম্পাদন করতে পারে না—দুঃখের বিষয় এ কথা বলতে হচ্ছে।

এর প্রতীকার হওয়া কি খুবই দুঃসাধ্য? প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে লোকের

অভাব নেই—তাদের যে কোন একজনের ওপর এই ভার ন্যস্ত করলেই চলে নাকি? এবং দুদিন পূর্ব্বেই যাতে এ সব বিলি হতে পারে তার ব্যবস্থা করাও কি খুব কষ্টসাধ্য? প্রত্যেক পত্রিকার ঠিকানা না জানার কারণ কি? এজন্য প্রত্যেক পত্রিকার নাম ও ঠিকানা সম্বলিত একটী খাতা রাখলেই তো এ বিভ্রাট হতে মুক্ত হওয়া যেতে পারে—এবং যদি সময়মত আমন্ত্রণলিপিগুলি ওই সব ঠিকানায় বুক পোষ্টে পাঠান যায় তাহলে সেগুলি যথাস্থানেই পৌছুতে পারে; কিন্তু তা মোটেই হয় না।

সম্প্রতি রঙমহলের ব্যাপারেও এমনি ধরণের ত্রুটীর পরিচয় আমরা পেয়েছি—তাদের 'নন্দরাণীর সংসার' দেখবার জন্য হয় তারা কোন কোন পত্রিকাকে ইচ্ছে করে বাদ দিয়েছেন না হয়ত অনবধানতাবশতঃ এই লিপি সেই সব কাগজের অফিসে পৌছায় নি। পূর্ব্বেকার ইতিহাস খুঁজে দেখলে দেখা যায়—রঙমহল তাদের সব নাটক দেখবার জন্যই এই সব কাগজকে আমন্ত্রণলিপি পাঠিয়েছেন, সুতরাং এবার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী বলেই ধরে নেওয়া যায়।

বাঙ্গালী

গত ১৫ই আগষ্ট হতে শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের নতুন বাংলা চিত্রদ্বয় 'বাঙ্গালী' ও 'বেজায় বগড়' প্রদর্শিত হচ্ছে আমরা আমন্ত্রিত হয়ে গত ১৮ই আগষ্ট ছবি দুখানা উত্তরায় দেখে এসেছি। নাট্যকার ভূপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একালে জনপ্রিয় না হলেও এক সময় ছিল যখন তার নাটক অসম্ভবরূপে দর্শক আকর্ষণ করত। 'বাঙ্গালী' বাংলার একটী বৃহৎ পরিবারের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। এ পরিবারের বৃদ্ধ পিতা মাত্র ১০০ [illegible] টাকা মাহিনা পান, সংসার চলে অতি কষ্টে। দীনদাসের সাতটী ছেলে সাতটী রত্ন বিশেষ—বড় ছেলে বিধু ৫৫ টাকার চাকরী করে সাংসারে দেয় মাত্র ১০টী টাকা, অথচ এতেই সে চায় বাড়ীতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত থাকতে, মেজপুত্র সিধু পালোয়ান মানুষ, পিতার তো ওই রোজগার, নিজে এক পয়সা উপায় করে না; অথচ বাদাম ও মিশ্রির সরবৎ তার প্রত্যহ চাই-ই। যাদব আছেন তানপুরা নিয়ে, মাধব কবি মানুষ, কেষ্ট শিশির ভাদুড়ীর অন্ন মারবার চেষ্টায় আছে, কনিষ্ঠ শ্রীমান ললিত পাড়ার সৌখিন থিয়েটারে মরজিনা সাজবে তারই মহলায় ব্যস্ত থাকে। একটী কন্যা পদ্ম—যেন গোবরে পদ্ম ফুল। সংসারের লক্ষ্মী এই মেয়েটী। পত্নী বড় স্নিগ্ধ ছেলেদের সব আব্দারই সহ্য করে চলেন। দীনদাসের ভ্রাতা সুখদাস অগ্রজকে ঠকিয়ে সব কিছুই আত্মসাৎ করেছেন, গৃহখানা পর্য্যন্ত তারই কাছে বাঁধা রয়েছে। ছোটগিন্নির এক মামা—নাম রামলোচন বয়েসের গাছপাথর নেই, সম্পত্তি পর্য্যন্ত উড়িয়ে দিয়ে জামাতার স্কন্ধে চেপেছেন—তিনি চান পদ্মকে বিয়ে করতে। সত্তর টাকার লোভে বোনকে বলি দিতেও রাজী। বাদ সাধলেন পিতা দীনদাস এবং ধনীপুত্র নিশীথ। পদ্মকে নিশীথ সহধর্ম্মিনীরূপে গ্রহণ করল। এ অপমানে সুখদাস দাদাকে গৃহছাড়া করিতে চেষ্টিত হল। বিধু বারাঙ্গনা ফ্লোরার পেছনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। মাতা ইহলোকের মায়া কাটিয়ে পরলোক গমন করেন। রামলোচনের পরামর্শে সুখদাসের পুত্র কিরণ ফ্লোরার গৃহে আনন্দ করতে গিয়ে নিহত ফ্লোরার হত্যাপরাধীরূপে ধৃত হয়। এমনি সময় দীনদাস জানতে পারে পালোয়ান পুত্র সিধুই আসল হত্যাপরাধী, তাকে নিজে থানায় নিয়ে ধরিয়ে দিয়ে সে সুখদাসকে নিজের মুখে জানায় তার কিরণ দোষী নয় দোষীকে সে নিজে ধরিয়ে দিয়ে এসেছে।

বিজয়া ছবিতে চন্দ্রা ও পাহাড়ী। রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করিবে।

সুখদাস তার মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়। বৃদ্ধ আর সইতে পারে না, কয়েকদিন যন্ত্রণা ভোগের পর এই দুঃখময় সংসার ত্যাগ করে অনন্ত ধামের দিকে যাত্রা করে।

গল্পটী অতি সহজ সরল চিত্রোপযোগী কাহিনী নয় বটে, তবে এক একটী টাইপ চরিত্র থাকাতে তা বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সার অংশগুলি গ্রহণ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও দু একটী অবান্তর দৃশ্য আছে—যথা ফ্লোরা-দের ভিক্ষা চাওয়া (বন্যাপীড়িতদের সাহার্য্যার্থে), ফ্লোরার ঘরে মাতালদের দৃশ্য প্রভৃতি। এ সব বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত করলে ছবির অঙ্গহানি তো হবেই না, উপরন্তু ভালই হবে।

ভিখারিণী চরিত্রের কোন সার্থকতা নাই বটে, কিন্তু মিনার্ভার ভিখারিণীর গান গুলিই (সুবাসিনীর) 'বাঙ্গালী' নাটকাভিনয়ের অন্যতম সম্পদরূপে পরিগণিত হয়েছিল। বইখানা আর যাই হোক এতে বাঙ্গালী সমাজের এমন দিকটা দেখান হয়েছে যা প্রত্যেকের কিছু না কিছু পরিমাণে আঘাত করবে। দীনদাসের ৭টী পুত্রের একটী অন্ততঃ প্রত্যেক পরিবারে দেখা যায়। ছবিটী দেখে সকলেই চুপ করে গৃহে ফেরেন, দর্শকদের এমনভাবেই 'বাঙ্গালী' ছবিখানা আত্মহারা করতে পেরেছে।

পরিচালনায় চারু রায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—এহেন নাটক এর চেয়ে ভাল হতে পারে না। আলোকচিত্রশিল্পী বিভূতি দাস স্বচ্ছ ছবি তুলেছেন, কিন্তু আরো উচ্চাঙ্গের আলোকচিত্র দেখবার আশা ছিল। শব্দযন্ত্রী এ গড়ুর আমাদের হতাশ করেছেন, কোথাও শব্দের স্বাভাবিকতা রাখতে তিনি পারেন নি। তাছাড়া আবহসঙ্গীত গ্রাউণ্ড নয়েজ ধ্বনিত হয়ে দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন করেছে। তবে অবোধ্য কোথাও হয়নি—এই ভরসার কথা। রসায়নাগারের কাজ ভাল হয়েছে—সম্পাদনায় সামান্য খুঁত আছে। পশ্চাৎপট সঙ্গীত মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। সুরশিল্পী হচ্ছেন তুলসী লাহিড়ী।

দীনদাসের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য আমাদের আশাতীত তৃপ্তি দিয়েছেন। বোধ হয় এ পর্য্যন্ত তিনি যত চিত্রে অভিনয় করেছেন তন্মধ্যে এই দীনদাসই শ্রেষ্ঠ হয়েছে। এমন স্বাভাবিক অভিনয় ছবিতে খুবই কম দেখা গিয়েছে। নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর সুখদাসও মন্দ হয়। নিভাবের অভিব্যক্তি তার মুখে তেমন ফোটে নি—তা ছাড়া দুটী স্থানে কথা যদি একটু নীচু স্বরে বলতেন তাহলে তার আরো প্রশংসা কর্ত্তে পারতাম। শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের কিরণ মঞ্চঘেঁষা হলেও খারাপ লাগে নি। ধীরাজ ভট্টাচার্য্যের নিশীথ সব দিক দিয়েই সুন্দর হয়েছে। সুবোধ মুখোঃ (বিধু), মণি ঘোষ (সিধু), হরিদাস বন্দ্যোঃ (যাদব), সমর রায় (মাধব), ভানু রায় (কেষ্ট), কার্ত্তিক রায় (সুবোধ) ও অনিলকুমার (ললিত) স্ব স্ব ভূমিকায় সুঅভিনয় করেছেন। এদের মধ্যে ভানু রায়ের অভিনয়ই সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। তুলসী লাহিড়ীর রামলোচন সবাইকে আশাতীত আনন্দ দিয়েছে—সত্যিই তার অভিনয় খুবই ভাল হয়েছে।

বড়গিন্নির ভূমিকায় মনোরমা চলনসই পর্য্যায়ের অভিনয় করেছেন। তার বেশভূষা গরীবের মত হওয়া এবং মুখসজ্জার প্রতিও নজর দেওয়া উচিৎ ছিল। ছোটগিন্নীর ভূমিকায় পদ্মাবতী সুঅভিনয় করেছেন—মানায় নি তেমন তাকে। পদ্মর ভূমিকায় তরুণী মীরা দত্তের অভিনয় চিত্তাকর্ষক হয়েছে—সুন্দর মানাত যদি তিনি একটু ক্ষীণাঙ্গী হতেন। চারুবালার ফ্লোরা বিশেষত্বহীন। নিশীথের বোনের ভূমিকায় লক্ষ্মী নাম্নী মেয়েটীর অভিনয় হয়তঃ প্রশংসার যোগ্য হত যদি পরিচালক তার হাসি একটু সংযত করাতে পারতেন। তারা নাম্নী অভিনেত্রীর লবঙ্গ একেবারে অচল—গানটী চলনসই। চারুর একটী গান মন্দ লাগে নি। মাল্‌কাজানের
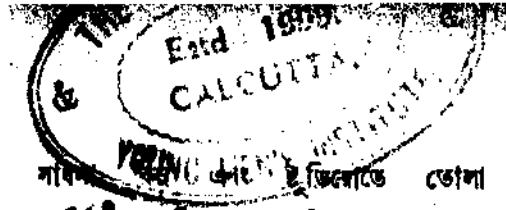
বাইজী কোন দিক দিয়েই ভাল লাগে নি। প্রসিদ্ধ গায়িকা কমলার (ঝরিয়া) ভিখারিনী একরূপ ভালই বলা চলে।

"বেজায় রগড়" খুবই উপভোগ্য হয়েছে—পরিচালনায় তুলসী লাহিড়ী প্রশংসা পাবার উপযুক্ত কাজের পরিচয় দিয়েছেন। বিভূতি দাসের আলোকচিত্র ভাল হয়েছে—গফুরের শব্দযোজনা অচল না হলেও সচল নয়। তুলসী লাহিড়ীর মামা খুবই উপভোগ্য—কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের পদ্মলোচন সম্বন্ধেও এরূপ উক্তি করা চলে। সত্য মুখার্জ্জীর বাঙ্গাল জমিদার ও তস্য পুত্র মাষ্টার সন্তুর অভিনয়ও কম হাসির খোরাক যোগায় নি। হরিসুন্দরী হাসিয়েছেন যেখানে মামার মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়। উষাবতীর মামী মন্দ নয়। অন্যান্য ভূমিকা কয়টীও সু-অভিনীত হয়েছে।

ছবিটীর সেটিংস তেমন উচ্চ প্রশংসার যোগ্য হয় নি। যাহোক্ বাঙ্গালীরা এ ছবখানা দেখে অত্যন্ত আনন্দ পাবেন তা বলা যায়।

আলিবাবা

শ্রীভারত লক্ষ্মী ষ্টুডিয়োতে মধু বসুর পরিচালনায় আলিবাবার চিত্র গ্রহণ আরম্ভ হয়ে গেছে। মিঃ বসুর প্রযোজনায় আলিবাবা বহুবার অভিজাত ঘরের মেয়ে পুরুষদের দ্বারা অভিনীত হয়েছে এবং অভিনয়ও খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। চিত্র সংস্করণেও মঞ্চের অভিনেতা অভিনেত্রীদের অনেকেই অংশ গ্রহণ করেছেন, উপরন্তু মধু বসু স্বয়ং ছবি পরিচালনা করছেন। ভূমিকা যতদূর জানা গেছে এইরূপ ভাবে বণ্টিত হয়েছে—

আলিবাবা—কমল বিশ্বাস, কাশিম নির্মল সেন, মুস্তাফা—প্রীতি মজুমদার, মর্জ্জিনা—শ্রীমতী সাধনা বসু এবং কতিমা—মিসেস্ মুখার্জ্জি। পরিকল্পনা ব্যাপারে মধু বসুকে সাহায্য করছেন শ্রীযুত মণ্টি ঘোষ।

নিউ থিয়েটার্স

এবার বোধ হয় 'গৃহ দাহ' ও 'বিজয়া'র মুক্তির তারিখ ঘোষিত হওয়ায় চিত্রপ্রিয়রা কতকটা আশ্বস্ত হয়েছেন। 'গৃহদাহ' মুক্তিলাভ করবে ১৯শে সেপ্টেম্বর চিত্রায় এবং বিজয়া মুক্তিলাভ করবে ১০ই অক্টোবর রূপবাণীতে। শরৎচন্দ্রের দুই অপূর্ব্ব সৃষ্টি—'অচলা' ও 'বিজয়া'—চিত্রা ও রূপবাণীতে আত্ম প্রকাশ করবে। পূজোর সময় নিউ থিয়েটার্সের এই দুইখানি ছবিই যে বাজার সরগরম করে রাখবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকৃতে পারে না।

> ফিল্ম জগতের অলীক বাবু কে জানেন কি? এই অলীক বাবু এডিটিং করার সময়ে কি কসরতে কোন ষ্টুডিয়ো হইতে নেগেটিভ ফিল্মের রীলগুলি অপসারিত করিয়াছেন, তাহার খবর যদি জানিতে চান, তবে আমরা পাঠকদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিব।

চিত্রার পরপারে এই সপ্তাহে ৯ম সপ্তাহে পদার্পণ করবে—এই সপ্তাহই শেষ সপ্তাহ। তারপর দুই সপ্তাহ 'মডার্ণ টাইমস্' দেখানো হবে—এর পরেই বহু আকাঙ্খিত 'গৃহদাহ' মুক্তিলাভ করবে।

পাইওনীয়ার

আমরা খবর পেলাম যে ডিরেক্টর জ্যোতিষ চন্দ্র ব্যানার্জি দেবদত্ত ফিল্মসের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়ে পাইওনীয়ার ফিল্মসে যোগদান করেছেন। দেবদত্তের পরিত্যক্ত 'অবলা' নাকি পাইওনিয়ার ষ্টুডিয়োতে তোলা হবে ব্যানার্জির পরিচালনায়।

৪ঠা সেপ্টেম্বর

এই তারিখে সুবিখ্যাত মঞ্চ ও চিত্রনট ভূমেন রায়ের সম্মান রজনী উপলক্ষে নাট্যনিকেতনে বিরাট অভিনয় আয়োজন হয়েছে। এ রাত্রির প্রধান আকর্ষণ হবে 'প্রতাপাদিত্য'—রডার ভূমিকা নিয়ে দেখা দেবেন রূপদক্ষ অহীন্দ্র চৌধুরী। রডার ভূমিকায় অনেকেই নেমেছেন, শিশির-কুমারও তন্মধ্যে একজন—সুতরাং অহীন্দ্রের রডার আকর্ষণ বড় কম হবে না। অন্যান্য ভূমিকায় সম্ভবতঃ এরা নামবেন—

প্রতাপ ও শঙ্কর—শরৎ চট্টোঃ বা রবি রায় যে কোন একটী নেবেন, ভবানন্দ—নরেশ মিত্র, সুন্দর—ভূমেন রায়, বিক্রমাদিত্য—তিনকড়ি বা কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দদাস - কৃষ্ণচন্দ্র দে, বিজয়া—সরযূবালা, কল্যাণী—প্রভা প্রভৃতি। এ ভূমিকালিপির পরিবর্ত্তন হতে পারে। এই সঙ্গে একখানা নৃত্যগীতবহুল নাটিকাও অভিনীত হবে।

সম্মিলিত অভিনয়

আরেকটী আকর্ষণীয় রজনী আসছে—আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর নাট্যনিকেতনে

রবি রায়ের সম্মানরজনী উপলক্ষে 'পোষ্য-পুত্র' ও 'আবু হোসেন' অভিনীত হবে। এই সঙ্গে দুতিনটী নৃত্যাভিনয়ও হবে। এতে তিনকড়ি, নির্মলেন্দু, রাধিকানন্দ প্রভৃতি-দের দেখা যাবে। পোষ্যপুত্রে বৈকুণ্ঠের ভূমিকায় নামবেন কৃষ্ণচন্দ্র দে—তাঁর কণ্ঠে ৪ খানা মনোরম সঙ্গীত ধ্বনিত হবে—এ আকর্ষণ বড় কম নয়। মণিমালার ভূমিকায় কোন খ্যাতনাম্নী গায়িকার দর্শন পেলেও পাওয়া যেতে পারে, না হয়ত সুগায়িকা দুর্গারাণী ওই ভূমিকায় নামবেন। জাফরাকাম্ভ—অহীন্দ্র চৌধুরী, রজনী—নরেশ মিত্র, বিনোদ—রবি রায়, হেমেন—ভূমেন রায়, ফটিকচাঁদ—জহর গাঙ্গুলী, যোগেন্দ্র—ইন্দু মুখোঃ, গাঁটকাটা—আশু বসু, শিবানী—নীহার, শান্তি—সুশীলাবালা বা চারুবালা, সিদ্ধেশ্বরী—নীরদাসুন্দরী।

ভদ্রতা জ্ঞান

বাতায়নের এক বিশেষ সংখ্যায় মিঃ বি, এন, সরকার শুভেচ্ছা জানিয়ে কয়েক-ছত্র লিখেছিলেন—এতে দোষের কি থাকতে পারে আমরা তা কল্পনাতেই আনতে পারি না। কিন্তু 'অগ্রগতি' এই ভদ্রলোকের 'সাহিত্যের আসরে' প্রবেশের অধিকার বা এক্তিয়ার সম্বন্ধে সবিস্ময়ে ভেবেছে এবং এর পেছনে কোন না কোন মৎলবের আঁচ করে নিতেও অগ্রগতির পত্তিতে বাধে নি। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ অগ্রগতির এই চিমটি-কাটার পিছনে কোন মৎলব নিশ্চয়ই আছে বলে যদি কেউ সন্দেহ করেন, তাতে তাঁকে কি দোষ দেওয়া যাবে? মিঃ বি, এন, সরকার ধাম চাল দিয়ে লেখা পড়া শেখেন নি, তার মত শিক্ষিত লোকের যদি সাহিত্যের আসরে স্থান না হয়, তা হলে মদন মিত্তির লেনের কর্তৃকে ছোঁড়াদেরই বা কেন হবে? তার পর কথা, মিঃ সরকার তাঁর বিদ্যা জাহির করে কোন প্রবন্ধ লেখেন নি, তিনি শুধু ঐ পত্রিকার প্রতি তাঁর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। এতেও রেহাই নাই! এই কি প্রগতির, না অপ্রগতির মনোভাব?

*

গত হপ্তায় 'অগ্রগতি' ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানী এবং তাঁদের প্রচার-সম্পাদক সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করেছেন তা' যেমনই অশোভন তেমনি অভদ্রোচিত। বিজ্ঞাপন না পেলে কাগজ চলেনা জানি। কিন্তু এ ক্যাঙলাপনা কেন? চলচ্চিত্রের প্রচার-কার্য্যে সুধীর বাবুর মত যোগ্য ব্যক্তি খুব বেশী নেই। তাঁর ভদ্রতা, সততা ও কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধে অতি বড় শত্রুরও কিছু বলবার নেই। অগ্রগতির বালখিল্যদের হয় ত' জানা নেই, কিন্তু তাদের অনেকেরই কলম ধরবার আগে সুধীর বাবু, সাহিত্য ও সাংবাদিক জগতে সুলেখক ও সুসমালোচক ব'লে প্রতিষ্ঠা লাভ কোরেছেন।

রঙ্গালয়

গুজব, আগামী ১১শে সেপ্টেম্বর নব নাট্যমন্দিরে 'অচলা' মঞ্চস্থ হবে—কিন্তু ওই তারিখেই হয়ে উঠবে কিনা সন্দেহ।

রঙমহলের 'নন্দরাণীর সংসার' নাকি সমস্ত দিক দিয়েই ভাল হয়েছে—ভাল হলেই ভাল।

নাট্যনিকেতনের 'কেদার রায়' রবি-বারে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হয়। 'আলাদীন'ও জমে উঠেছে - ছাঁটকাট দিয়ে। আমরা নতুন রূপ দেখে আরেক-বার 'আলাদীন' সম্বন্ধে মতামত পত্রস্থ করব।

স্বাস্থ্যের পুনর্গঠন

ডাঃ এম্, জি, খসাক এম্, বি

বাঙ্গালা দেশে ম্যালেরিয়ার আধিপত্য ও মৃত্যুর হার ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং বিভিন্ন রোগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, এ কথা অস্বীকার করিবার নহে। প্রতি বৎসর প্রায় ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কারণ এই ম্যালেরিয়া জ্বর। এমন একদিন ছিল যখন, বাঙ্গালার সৌন্দর্য্য, ধনসম্পদ, আমোদ প্রমোদ, আশা ভরসা, সুখ শান্তি ও স্বাস্থ্যবল সকলই বাঙ্গলার প্রতি পল্লীতে, প্রতি সহরে বিরাজমান ছিল। আজ কিন্তু ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর কবলে দিনে দিনে পূর্ব্বের সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য ক্রমশঃ নষ্ট হইতে চলিয়াছে। এ ধ্বংসের পথ রোধ না করিলে বাঙ্গালী জাতির আর উন্নতি নাই। ম্যালেরিয়া আজ যে কেবল এই প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে, বরং ইহা বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশের মধ্যেই ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিয়াছে। ম্যালেরিয়ার তাণ্ডবে পল্লীর কুটিরগুলি ধূলপ্রায়, পল্লীর বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা পরিত্যক্ত। দেশের স্বাস্থ্যের আবহাওয়া এখন এত দূষিত যে, পুনরায় শীঘ্র ইহাকে বিশুদ্ধ না করিলে স্বাস্থ্য রক্ষার আর উপায় নাই।

ম্যালেরিয়া এখন এ দেশে সাধারণ ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে। এমন কি নিরক্ষর কৃষক পর্য্যন্ত ইহার সহিত সুপরিচিত। ধনী প্রাসাদের মধ্যেও ইহার আক্রমণ হইতে নিস্তার পান না। এনোফিলিস্ নামক মশক কোন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্ত শোষণ করিয়া ঐ বিষ যখন কোন সুস্থ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তখন সুস্থ ব্যক্তির শরীরে ঐ রোগ প্রকাশ পায়। অধিকাংশ স্থলে দেখা যায় যে, যে স্থলে এক ব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়াছে, সেখানে ভুগিতেছে অন্ততঃ বিশ জন। এই কাল ব্যাধিতে জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি যে কত নষ্ট হইতেছে, তাহার পরিমাণ হয় না। শীর্ণ দেহে ও প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত উদরে, পাংশু মুখে, কত শত উপার্জ্জনক্ষম যুবক গৃহের কোণে নিরুপায় হইয়া দেশের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বহুদিন যাবৎ ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া নবীনা মাতার স্তন্যদুগ্ধ শুষ্ক হইয়া যায়। ক্ষুধাতুর শিশু ক্ষীণ ও দুর্ব্বল অবস্থায় মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। বিষ রক্তস্থ লাল কণিকাগুলিকে আশ্রয় করিয়া বা ক্রমে তাহাদের ধ্বংস সাধন করিয়া রক্তাল্পতা উপসর্গ আনয়ন করে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ম্যালেরিয়া রোগ ভোগের পর, ক্ষীণদেহ রক্তের অভাবে পাংশুবর্ণ হইয়া যায়। খাদ্যে অরুচি জন্মে, পেট জোড়া পিলে হয়, দেহ কর্ম্মশক্তিহীন হইয়া পড়ে। তখন এ শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। বহু বৎসর গবেষণার পর বিশেষজ্ঞগণকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে সুইজারল্যাণ্ডের আবিষ্কৃত রচিটোন ম্যালেরিয়া রোগীর কর্ম্মশক্তি ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ। ইহার নিয়মিত ব্যবহার ম্যালেরিয়ার পুনরাক্রমণ হইতে রোগীকে রক্ষা করে। রচিটোনের মূল্যবান উপাদানগুলি স্বভাবজাত উদ্ভিজ্জ সংমিশ্রন বলিয়া অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা ইহার গুণ ও কার্য্যকারিতা অনেক বেশি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকগণও ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ম্যালেরিয়া রোগ ভোগের পর রচিটোন ব্যবস্থা দিতেছেন। ইহা রক্তস্থ ম্যালেরিয়া বীজাণুদের ধ্বংস সাধন করিয়া শরীরে নূতন রক্তকণিকা সৃষ্টি করিয়া রক্তকে সতেজ করে। ইহা সেবনে দুর্ব্বলতা দ্রুত দূর হয়। দেহে যথেষ্ট নববল ও জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়; উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

———

বিচিত্রা

সূর্য্যমণ্ডলে কত গ্রহ উপগ্রহ জানেন? পঞ্চাশ হাজার। এ গণনা করিয়াছেন ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক। পৃথিবী, মঙ্গল, শনি, শুক্র, বুধ প্রভৃতি ভিন্ন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রহ, উপগ্রহ অসংখ্য দেখা গিয়াছে।

—

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে পৃথিবীর সকল জাতি যাহা ব্যয় করিয়াছিল—গত বৎসরে একাজে তাহার তিনগুণ ব্যয় করিয়াছে। গত বৎসরে এযাবৎ সমগ্র জাতি মিলিয়া ব্যয় করিয়াছে ২৫০০০০০০০০ (আড়াই শো কোটী) পাউণ্ড।

—

মিউনিসিপাল ট্যাক্সের হিসাবে সমগ্র লণ্ডনের মোট মূল্য দাঁড়ায় ৬১৩৩৬১৬৬ (ছয়-কোটী তের-লক্ষ ছত্রিশ-হাজার এক-শো ছেষট্টি) পাউণ্ড।

—

নিউইয়র্কের বিজ্ঞানসভা বহু পরীক্ষার সাব্যস্ত করিয়াছেন ইতর পশুদের মধ্যে শিম্পাঞ্জি সবচেয়ে বুদ্ধিমান্। তারপর হস্তী; তারপর যথাক্রমে গরিলা, পোষা কুকুর, বিভার, পালিত অশ্ব, ভল্লুক ও গৃহ-পালিত বিড়াল।

—

মিডল্সেক্সে একটী মুর্গী ২০ দিন ধরিয়া প্রত্যহ অবিরামভাবে একটী করিয়া ডিম পাড়িয়াছে। এমন রেকর্ড দুনিয়ার আর নাই।

—

আমেরিকার মেয়েরা ফুট বল খেলিতেছেন—খেলেন হাই-হিল জুতা পায়ে আঁটিয়া। কোন অসুবিধা তাঁরা বোধ করেন না।

—

শীতকালে ঝড় হইবার পর ইউরোপের সমুদ্রের তীরে বহুলোক মণিরত্নের সন্ধান করে। কখনও নিরাশ হয় না।—পায়— ক্রীষ্টাল, (স্ফটিক), এমেথিষ্ট, কোরাল, কর্নেলিয়া এবং বহু মণি।

—

সিনর জান ডিসিয়ার্ভা নামক প্রসিদ্ধ আবিষ্কারক এখন বার্সিলোনায় এক উরন্ত মোটর গাড়ী তৈয়ারী করিতেছেন। এই মোটর রাস্তার উপর দিয়াও চলিতে পারে এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ইহাকে মুড়িয়া আকাশে উড়াইতে পারা যায়।

—
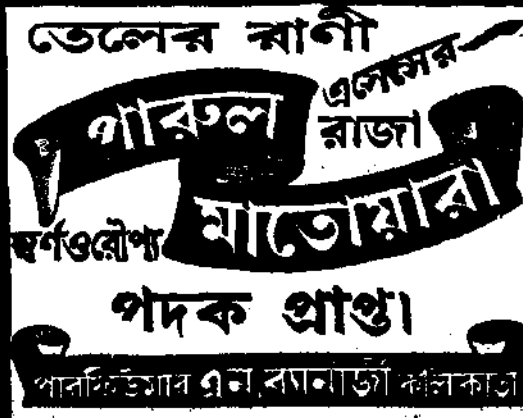
আর্জেন্টাইনের এক বৈজ্ঞানিক যুবক এক ছাপিবার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু অক্ষরের জায়গায় উহার উপরে কতকগুলি রেখা ও বিন্দু মুদ্রিত হইবে। খবরটাকে সেই যন্ত্রের মধ্যে রাখিয়া দিয়া যন্ত্র চালাইয়া দিলে সেই যন্ত্র খবরগুলি পড়িতে থাকিবে এবং তাহা শুনিতে পাওয়া যাইবে। এইরূপে পাঠকদিগকে আর কষ্ট করিয়া খবরের কাগজ পড়িতে হইবে না। ভবিষ্যতে ইহা অন্ধদের পরম বন্ধু হইয়া উঠিবে।

—শ্রীপঞ্চানন্দ পাল।
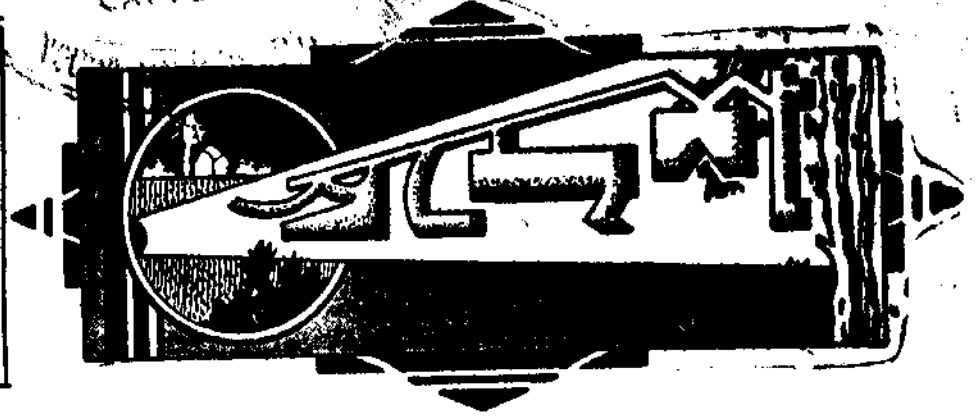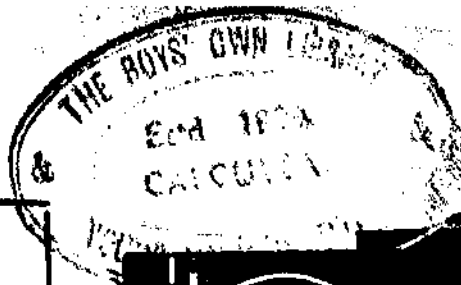
সচিত্র সাপ্তাহিক

দ্বিতীয় বর্ষ—৩০শ সংখ্যা

শুক্রবার—১১শে ভাদ্র

১৩৪৩

৪ঠা সেপ্টেম্বর—১৯৩৬

আশা

আশা! ছোট্ট এতোটুকু একটু কথা, এতোটা তার মানে—এতোটা প্রভাব! ছোট্ট একটা নদী, এতোটা তার স্রোত! ছোট্ট একটু চোখ, এতটা তার দৃষ্টি! ছোট্ট একখানি হাত, এতোটা তার স্পর্শ! যে জিনিষটা যতো বেশি ছোট, তার শক্তি ততটা বেশি তীব্র! মানুষ যাকে যতোটা খাটো মনে করে, অবজ্ঞার দৃষ্টিতে উপেক্ষা করে যেতে চায়, সেইখানেই দেখা গেছে—সে জড়িয়ে পড়েছে ততটা আরো বেশি, সে গেছে সেইখানেই বাঁধা পড়ে! তাই বলছিলাম, যে যতোই ভাবুক সে আশার দাস নয়, ততোই আশার আকর্ষণে সে বাঁধে তার বুক, কত বিনিদ্র যামিনী তার কাটে, কত আনমনা দিবস যায় গড়িয়ে, কিন্তু কৈ? সেই এতোটুকুর প্রাধান্য সে কাটিয়ে উঠতে পারে কৈ! সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে তখন এইটুকুই হয়ে ওঠে তার বড়ো, এইটুকুই হয়ে ওঠে অতোটা!—আশা! আশা! এই আশা আছে, তাই মানুষ আজো বেঁচে আছে।

অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান নেই, গরীব, তারও আশা। মরুভূমিতে জল নেই, আছে মৃগতৃষ্ণিকার আড়ম্বর। দিক্‌ভ্রান্ত পথিকের সামনে পথের নেই নিশানা, আছে আলেয়ার আলো।

মানুষের ধর্ম্ম প্রেম। একে অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, হয় তো সে জানে—এ আকর্ষণ তার পক্ষে স্বাভাবিক হলেও পাওয়াটা অস্বাভাবিক—অসম্ভব। হয় তো আকাশের চাঁদ নাগালে পাওয়ার এই ব্যর্থতা তাকে টেনে দমিয়ে রাখতে পারে না। পারে না তাকে নিরুৎসাহে, নিরুদ্যমে ঠেকিয়ে রাখতে। জানে সে শিশুর মতই নিঃসহায়, কিন্তু তবু সে বাঁধে বুক, হয় আশার আবির্ভাব! অব্যাহতি নেই! ছলনাময়ী আশার হাতে নেই কারো নিষ্কৃতি! অদ্ভুত!

জানি না সৃষ্টির কোন শুভ মুহূর্তে হয়েছিল এই মায়াবিনীর আবির্ভাব! মনের মর্ম্ম-মুকুরে যখন পড়ে তার ছায়া, আকাশের ঘন নীলে, বাতাসের শিহরণে, বনের বর্ণ-বৈচিত্র্যে, তটিনীর স্রোতচাঞ্চল্যে যখন কাঁপে তার অলস চরণে মৃদুমন্থর গতি—সেই উন্মাদ প্রাণস্পন্দনের সাবলীল ছন্দবিন্যাসে মানুষ আজো যে তার ধ্বংসোন্মুখ পাঁজরগুলোকে খাড়া করে মাথা বাঁচিয়ে জগতের কর্ম্মকোলাহলে হাসিতে আনন্দে আপনাকে মাতিয়ে রেখে বিভোর হয়ে থাকবার অবকাশ পেয়েছে, সেই বিরামহীন প্রেরণার যে অবিনাশী ইঙ্গিত—তাকে বারম্বার জানাই প্রণাম। হায় আশা! তোমার এই অবিচ্ছেদী শক্তির মাদকতায় তুমি মানুষকে ভুলাও, এ মনভুলানী প্রচেষ্টা যদি সত্যসত্যই না থাকতো, বিশ্ববিধাতার সৃষ্টির গৌরবকে মর্য্যাদায় মহীয়ান, সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল এবং চেতনাস[illegible]ল করে এমনভাবে সাজিয়ে কে রাখতো? হে মহিমময়ী আশা, সত্যই তুমি মহা[illegible]

চাতিম চাতিম

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

কোন প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জন্তুর মত লম্বা লম্বা পা ফেলে নতুন আধা-স্বরাজ আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই বিরাট সরীসৃপ যতই এগোচ্ছে আমাদের কংগ্রেসী দুনিয়া ততই মাথা নাড়ছে এই অঘটন ঘটনকে অস্বীকার করবার জন্য, তাকে এই ত্রিশ বছরের ট্রেন্ড জিহ্বা নেড়ে নস্যাৎ করে দেবার জন্য। আমাদেরই এই দেশে মায়াবাদের সৃষ্টি হয়েছিল, যা' চোখের সামনে জলজীয়ন্ত রয়েছে তাকে মায়া বলে অসৎ বা অলীক বলে উড়িয়ে দেবার এই যে প্রবৃত্তি এটা হিন্দু ভারতের হাড়ে মাসে ঢুকে অস্থি মজ্জাগত হয়ে আছে। মুসলমান ভারতের বস্তুতন্ত্র মনে এই 'হাঁ' কে না করে একটা ঝুটা স্বস্তি ও আরাম পাবার ব্যাধি যে নেই তা' আমরা শীঘ্রই হাড়ে হাড়ে টের পাব। ওরা চলবে রিয়ালিটিকে ধরে, আর আমরা চলবো আকাশের চাঁদের আশার অশ্বডিম্বের দুরাকাঙ্খায়।

* * *

এতদিন এই নয়া কন্‌ষ্টিটিউশনকে অকেজো আন-স্যাটিস্‌ফ্যাক্টরী বলে গালি দিতে আমরা মহা ব্যস্ত ছিলাম, কারণ কংগ্রেসের পলিটিকাল-মায়াবাদে ওটা যখন অলীক ও সকল দুঃখের আকর বলে সাব্যস্ত হয়ে গেছে তখন প্যাট্রিয়টিক কর্ম্ম অর্থাৎ কিনা খাঁটি দেশ সেবা মানেই ওটাকে দৈত্য ছিলে অভিসম্পাত করা। বা অলীক, অস্তিত্বই যার নেই তা' যে কি করে সর্ব্বদুঃখের আকর হয় তা' খুব চুলচেরা বুদ্ধি না হলে বোঝা যায় না। নয়া কনষ্টিটিউসন মোটেই অলীক নয়; ওটা যে জলজীয়ন্ত সত্য তা' কংগ্রেসী কর্ত্তাদের ও লেবার ও চাষী নেতৃবৃন্দের অনাহার অনিদ্রায়ই বেশ বোঝা যাচ্ছে। দেশের শতকরা ১৫ জন মানুষের অর্থাৎ তিন কোটী লোকের ভোট কুড়িয়ে যে কন্‌ষ্টিটিউশন গড়ছে তাকে অনিষ্টকারী সাব্যস্ত করতে ও রেক করতে দেশের শতকরা ৩০ জনকে অন্ততঃ বোঝাতে হবে, যে, ঐ বস্তুর দ্বারা আমাদের কোন উপকারই হবে না।

* * *

এই জন্যে কংগ্রেস জগৎ, লেবার জগৎ, কম্যুনাল জগৎ, চাষীর জগৎ, সাপ্রেসড ও অপ্রেসডের জগৎ সব একেবারে টলমল করে নড়ে উঠেছে। এতদিন যাঁরা নির্ব্বিঘ্ন আরামে মোড়লী করে থাকছিলেন তাঁদের সকলকেই সেই পুরুষানুক্রমিক মোড়লী বজায় রাখবার দুর্ভাবনায় মহা কাহিল দেখা যাচ্ছে। তাঁরা মুহুর্মুহু রং বদলাচ্ছেন বহুরূপীকেও লজ্জা দিয়ে। এদেশে প্রায়ই ডাক্তার উকিল ব্যারিষ্টার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর সম্পাদক ও জমিদাররা হন জাতীয় নেতা। তাঁদের অনেককে শীঘ্রই অদ্ভুত অদ্ভুত রোল-এ দেখা যাবে। এটা সোণার পাথরের বাটীর দেশ কিনা তাই এখানে গোল্ড মেডালিষ্ট হেমন্ত সরকার হতেন জেলেদের নেতা, যিনি মাছ শুধু খেয়ে থাকেন কখনও ধরেন না (এক ব্যবসার ট্রাবলড ওয়াটারস-এ ছাড়া) আজও দেখছি ডাক্তার ও উকিল মোলবী ও এডিটর মিলে হচ্ছেন মহকুমা কৃষক-সমিতি, যথা ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা কৃষক সমিতিতে দ্রষ্টব্য।

* * *

নেতার ধর্ম হচ্ছে বায়ু দেখে চলা, "বায়ু বহে পূরবইয়ঁ।" রাজনীতির মাঠে এই তান ধরে গলা ছাড়া। কলকেতার সস্তা ঢাউস কাগজ আনন্দবাজারের সম্পাদক সত্যেন মজুমদারকেও আজকাল বাবু ভাইয়া ছেড়ে চাষী ও মজুরের কোল ঘেষে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে। দেশে যখন কাগজ বেচে এখনো বহুকাল খেতে হবে এবং মোটা মাহিনা ও দপ্তরীতে তার সম্পাদকত্বও করতে হবে তখন চাষীর নেতা, রুহিদাস ও নরসুন্দরের নেতা তাঁকে হতেই হবে। এখন কথা হচ্ছে এই সব বর্ণচোরারা চাষীর দুঃখ কি সত্যই বোঝেন? ভোট তাঁদের একান্তই দরকার তা' জানি, কিন্তু তাঁদের ভোট লাভে তাঁদের নিজস্ব লম্বোদরটি ছাড়া চাষীর পেট ভরবে কিনা! চাষীদের মধ্যে শিক্ষিত জিহ্বাচক্ষুর অভাব আছে বলেই এই সব বর্ণচোরারা ওদের সভায় ঠাঁই পান। ওরা অবলা আর এরা বোল-বোলা 'উইথ এ ভেঞ্জিয়েন্স'; ওরা মূক আর এরা মুখর—টকী অব টকীজ্।

* * *

আনন্দ বাজারের ১৬ই ভাদ্রের সংখ্যায় হঠাৎ উদ্বেলিত চাষী প্রেমের ঠেলায় ভাষা পর্য্যন্ত (বিপর্য্যস্ত) আধ আধ ও গদগদ হয়ে এসেছে। পড়ে মনে হয় কোন ইংরাজি বক্তৃতার নাবালকী তর্জমা। "ভয় দেখাইয়া জমীদার এবং তাঁহাদের গোমস্তারা গভর্ণমেণ্টের নাকের উপরই আদায় করিয়া থাকেন।" 'আণ্ডার দেয়ার ভেরী নোজ' ইহার অর্থ নাকের নীচে, কিন্তু সে যা' হোক—জমিদার-পুষ্ট কংগ্রেস দেশের নাকের উপর ত্রিশ বৎসর প্রহসন করিয়াও ইহার কি প্রতিকার করিয়াছেন"—এই প্রশ্নের জবাবে আনন্দবাজার প্রাইভেট লিমিটেডের

জবাব আছে কি? নাকের উপর ও নীচে নানা প্রকার "সামন্ততান্ত্রিক" ও নেতৃতান্ত্রিক "উপঢৌকন" তো গুষ্টিশুদ্ধ মিলে আদায় করছেন, বাজারে ফুলের মালা ও করতালির দাম অবধি চড়ে গেছে, তার উপায় কে করবে?

* * *

"মানুষের শোকে কুমীরের চোখে সাঁতার পানি" সর্ব্বত্র এই দৃশ্য, তা' কি ঘরে আর কি বাইরে। আমাদের রাজনীতিতে—

"লঙ্কায় রাবণ ম'ল
বেহুলা কেঁদে রাঁড় হ'ল"।

"গভর্ণমেন্ট * * * এক ঋণ সালিশী আইন করিলেন যাহা প্রকৃত সমস্যার চামড়া পর্য্যন্ত পৌঁছিবে কিনা সন্দেহ।" আবার এই রকম খোলতাই তখনই হয় যখন মানুষের কৃত্রিম ভাবাতিশয্যে মাত্রা হারিয়ে যায়। এরা সব বাবুর দেশের চাউস সম্পাদক ও চাউস নেতা, বাবুস্থানে লালিত পালিত ও পুষ্ট, বাবুধর্ম্মে শিক্ষিত দীক্ষিত ও মানুষ। এরা যখন হঠাৎ চাষী-প্রেমে রাই উন্মাদিনী হয়ে বিবসনা দশায় ছোটেন তখন লাঙল হাতে নিরক্ষর চাষী ভাই মূলার মত দশনপাটী বার করে কি ভাবে সেটা গবেষণার বস্তু। জোয়াহির লালজীর অরণ্যে রোদনের ফলেও আজও কংগ্রেসে চাষী ও মজুররা পাত্ত পায় নাই, তারা আটানিক গভর্ণমেন্ট ও আটানিক বিড়লা-বাজাজের কংগ্রেসের মাঝখানে পড়ে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। আমাদের মেকী রাজনীতিতে এই পোষাকী কান্না, এই রাবণের শোকে বেহুলার অশ্রু, এই নাটুকে ডুকরানির চেয়ে বীভৎস আর কি আছে? দেশে মাস্-এর জাগরণ এখনও তার "চামড়া পর্য্যন্ত" পৌঁছায় নাই,—সত্যেন মজুমদার ও মৌলবী বদরুদ্দীনের উদ্দীপনায় তারা কতখানি সাড়া দেয় সে সম্বন্ধে এখনও বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। তারা জানে এরাও বাবুস্থানের চরানুচর, জমিদার ও মহাজনেরই মাস্তুতো ভাই। এরা যখন ভাবে গদগদ হয়ে সাশ্রুনেত্রে বোঝাতে যান যে নয়া কনষ্টিটিউশনের তেলের কুপো উল্টে দিলেই চাষীর স্বরাজ আপনি আসবে তখন চাষী মজুরেরা মাদল নিয়ে নাচে না এইটেই আশ্চর্য্য। আনন্দ বাজারের দেশের "নিম্ন মধ্য শ্রেণীর"-র (লোয়ার মিডল্‌ক্লাস-এর তর্জ্জমা) যুবকদের কাছে আনন্দবাজারের এই পুলক প্রদ আপীলের শুনানী কি হয় জানবার জন্য আমরা ব্যাকুল ও উদগ্রীব ছিলাম, কিন্তু ১লা সেপ্টেম্বর নিঃশব্দেই এলো নিঃশব্দেই গেল।

———

> **বিশেষ দ্রষ্টব্য**
>
> স্বদেশ কার্য্যালয়—২৯২, আপার সার্কুলার রোড হইতে ৬নং সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ প্রশস্ত গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখন হইতে চিঠিপত্র, টাকাকড়ি প্রভৃতি এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

চাবুক-চুমুক

—পঞ্চমুখ শর্ম্মা

সাবিত্রীপ্রসন্নকে কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। শুনিয়া হয় তো ভাবিবেন, ইতিপূর্ব্বে কি তাঁহাকে আর লক্ষ্য করি নাই? হাঁ, তাহা তো করিয়াছি, এখন একটু অতিরিক্ত করিতেছি। এই জন্য করিতেছি যে, তিনি আজকাল একটু অতিরিক্তই লিখিতেছেন। সুতরাং যদি আঁচ করিয়া থাকি, 'ভবিষ্যৎ'-এ তিনি আরো প্রসন্ন হইবেন, ইহা শুনিতে একটু বেয়াড়া হইলেও, তালে মানাইয়া গিয়াছে। অতএব যা হইয়াছে যেমন সরস, তেমনি উপভোগ্য! যথা—

"তোমারে লেগেছে ভাল,
যত ভাল লেগেছে আমারে
প্রাণমন পরিপূর্ণ
দেহে তাই জাগে শিহরণ,
তৃষাতুর আঁখি মোর
বক্ষে তব লভিল মরণ,
ভাসিয়া চলেছি সখি,
উদ্বেলিত সুখের পাথারে।"

'তোমারে' যখন ভাল লাগিয়াছে, তখন 'প্রাণমন পরিপূর্ণ দেহে' অবশ্যই 'শিহরণ' (কাঁপুনি?) জাগিয়া উঠিবে! আহা, তাই বলিয়া কি 'তৃষাতুর আঁখি' আর জায়গা পাইল না, 'বক্ষ' গিয়া 'মরণ' লভিয়া বসিল? কিরূপে তাহা হইলে 'উদ্বেলিত সুখের পাথারে' ভাসিয়া চলা হইতেছে? ভাসিয়া চলিলে যৌবনে ... হবার ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাইতে হইবে,
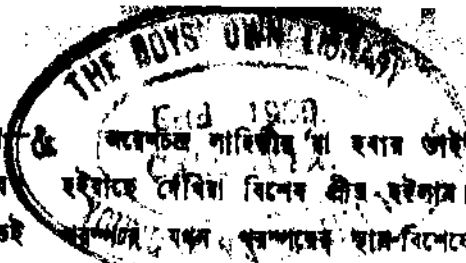
তাঁহার পর সাঁতার কাটিতে সক্ষম হইলে তবে তো ভাসিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু রমণী যখন ইহা বিশ্বাস করিতেই চাহিতেছেন না যে নাগর একজন সাঁতারু মানুষ, অগত্যা তখন বলা হইতেছে—

"বিশ্বাস হয় না তবু?

হে আমার বঞ্চিতা রমণী

জনে জনে করিয়াছ

নিত্যদিন প্রেম নিবেদন,

তৃষ্ণায় ফেটেছে বুক,

ব্যর্থতার দুঃসহ বেদন,

মাণিক কুড়াতে গিয়ে

দংশিয়াছে বিষধর ফণী।"

তাহা হইবেই। যে-জন এইরূপ 'জনে জনে' 'প্রেম' বিলাইয়া ফিরিতেছে—'বিষধর ফণী' বাগে পাইলেই দংশন করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্তীর 'টানা-পড়েন' বেশ জমে উঠছে কিন্তু। বেলার সখি বাণী যখন আগে আগে চলিয়াছে, এবং সন্তর্পণে বুকের কাছে হাতটি রাখিয়া তাহার প্রেমাস্পদের দেওয়া 'লভ্-লেটার'-খানি পড়িতেছে, পিছন থেকে বাণী তখন মনে করিতেছে—

"চলবার সময় মানুষের দুটো হাত যেমন দু'দিকে ঝুলে থেকে সমান তালে দুলতে থাকে, বেলা লক্ষ্য করল, বাণীতে তার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে—হাত দুটি জড়িয়ে বুকের দিকে উঠিয়ে ও কি করছে কে জানে!

হেঁটমুখে চলেছে।—ব্রোচটা খুলে গেল নাকি ওর বুকের কাপড় থেকে?"

অবশেষে দেখা গেল, 'বুকের কাপড় থেকে' ব্রোচটা খুলিয়া না গেলেও, যাহা গিয়াছে—ঐকব্য কবিয়া তাহারই নাম দিয়াছেন 'নীল শাড়ী'। অহো!

অমরেন্দ্র লাহিড়ীর 'খা হবার তাই' হইয়াছে দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। পরস্পরে যখন পরস্পরের প্রেম-বিশেষে পড়িয়া গিয়াছে, অথচ কেহ কাহাকেও দেখে নাই, তখন একজন ভাবিতেছে—

"তরুণ ভাবতে বসলো নমিতা সুন্দরী, নিশ্চয় সুন্দরী। না, আজকালকার বাপ-মাদের মোটেই বিশ্বাস করা যায় না। সন্তানের প্রতি স্নেহান্ধ হয়ে কাণা ছেলের নাম অনায়াসেই পদ্মলোচন তাঁরা রেখেছেন।

রংটা খুব ফরসা না হলেও চলে তবে কালো না হলেই হলো।

ছিপ ছিপে গড়ন চাই, নোখগুলি ম্যানিকিওর করা দরকার। আর কি চাই। এ হলেই ওর চলে যাবে।"

এবং অপরা ভাবিতেছেন—

"নমিতা ভাবে তরুণের দাঁত উঁচু নয় ত? যে কজন লেখকের সঙ্গে তার পরিচয় তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই বাবরি কাটা চুল আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দাঁত। এটা যেন নমিতা বরদাস্ত করতে পারে না।"

পরস্পরের যখন এইরূপ ভাবাভাবি চলিতেছে, তখন নমিতার রকম দেখিয়া নমিতার পিসিমা বলিতেছেন—

"মা গো, সেদিন দেখি মিত্তিরদের ঐ আইবুড়ো মেয়েটা ছাতে দাঁড়িয়ে একটা সমস্ত ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে।"

সর্ব্বনাশ! আইবুড়ো মেয়েটি তো বেজায় ফাজিল! কিন্তু নমিতা যখন পিসিমাকে বলিল—

"তুমি পিসেমশাইকে চুমু খেতে ঘরে জায় খিল দিয়ে লুকিয়ে—এরা খাচ্ছে প্রকাশ্যে।"—

তখন বুঝা যাইতেছে, যাহা খাইবার তাহা সকলেই খাইতেছে! সুতরাং 'খা হবার তাই' হইবে—ঠেকাইবে কোন তালব্য—?

• • •

'নাচঘর'-এ কৌতুকদীর বিমলাকান্ত লাহিড়ী মশায়কে দেখিলাম। শুনিয়াছি ইনি পাবনায় বাস করিতেছেন। ঠাকুরের কৃপায় (দুর্গাঠাকুর নহে—বোধ হয় অনঙ্গ হইবেন) সহরের আবহাওয়া যখন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, তখন গীতি-কবিতার ঝড় বহিতে সুরু হইবে—ইহা পূর্ব্বাহ্নেই জানিতাম। তাই—

"শ্যামলি, আঁখিতে তব কি মায়া বলো!
যাবার বেলায় কেন মন ভুলালো!"

সত্যই! 'আঁখিতে তব' মায়া রহিয়া যাইতেও যখন তাহা ফেলিয়া নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও চলিয়া যাইতে হয়, তখন 'যাবার বেলায়' একটা পিছু ডাকিবার লোকও যাহার নাই—তাহার মত অভাগা আর কোথায় আছে? হায়, এই জন্যই বুঝি 'তুষারে'র মধ্যেই 'শেষের শয়ন' পাতিতে হইতেছে! 'শেষের মরণ' ঘনাইয়া আসিতেছে কি? আহা! 'শেষের কবিতা'টি কিন্তু চমৎকার হইয়াছে!

'অন্তঃপুরিকা' হইতে জনৈকা লিখিতেছেন—

"শাড়ীর ভাঁজে, ব্লাউজের নিখুঁত বেষ্টনীতে, গুছানো চুলের খোঁপার শোভায় এবং পাদুকা নির্ব্বাচনের উপর নারীর;...কি করে মেয়েদের সুন্দর ও চার্মিং দেখা যায় ক্রমে তাই আমরা লিখে চলবো।

লেখিকার উদ্যম প্রশংসনীয়! কি করিলে কি হয় ইহা যদি সত্যই তিনি উদ্‌ঘাটন করিতে পারেন, নারীদের জন্য যে একটা স্থায়ী কল্যাণ সংঘটিত হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। পুরুষকে কাৎ করিতে হইলে নারীর যাহা যাহা করা প্রয়োজন, সেই সেই প্রক্রিয়াদির বহুল প্রচার 'নাচঘর'-এ হইলে, শ্রীপুরুষের অনেক কিছু উপকারিতাই আমরা সানন্দে উপলব্ধি করিব! কারণ—

"নারীর প্রতি পুরুষের,...যে স্বাভাবিক আকর্ষণ তাকে বলে, যৌন-রাগ! এ আকর্ষণ বিকর্ষণের কোন দিন দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায় নি, পাবেও না।"

ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য। আর—

"স্ত্রী...সাজ পোষাকের পেখম (সাবাস্!) তুলে থাকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার অভিপ্রায়ে।"—

ইহা সত্য কথা! লেখিকার অভিজ্ঞ হস্তের লেখনী অজ্ঞতার অন্ধকার অপসারণে কৃতকার্য্য হউক। 'পেখম' ধরিয়া চলিবার এমন উপদেশ—ইহাই বুঝি ঘুঘু ধরিবার ফাঁদ?

* * *

'শান্তি'তে (ভাদ্র) দেখিলাম, সাহানা'র চোর বাবাজীবন আবার 'চিত্রপঞ্জী'তেও সিঁদকাঠি চালাইয়াছেন খুঁটি চালাইয়াছে। এই সব সিঁদেল চোরদিগকে সাজেস্তা করিবার দাওয়াই কিছু আছে কিনা জানা নাই, তবে 'শিল্পী' কবিতাটির মূল লেখক সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয় উক্ত চোরকে নারী-হরণ-পাপে দোষী করিয়াছেন দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। অমুক ধারার প্রয়োগের সাথে-সাথে আধুনিক বেত্রদণ্ড ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবার এমন একটি ক্ষেত্র আর দ্বিতীয় নাই! কারণ—

"চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী!"

* * *

এবার আকি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ইত্যাদি ও ইত্যাদিনীদের লেখা লইয়া শ্রীমান দিলীপ দাশগুপ্তের 'নার্শিশাস' পূজার পূর্ব্বেই আত্মপ্রকাশ করিবে! শ্রীমান এবার আবার কি মূর্ত্তি লইয়া সাহিত্য-জগৎ আলো করিবেন—সবিস্ময়ে সেই কথাই ভাবিতেছি! দেখা যাক! —২

চলাই পথিকের ধর্ম্ম

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ১৭ই তারিখের চিঠি পেয়ে বিশেষ আনন্দিত হলাম। ইতিপূর্ব্বে ইয়ুরোপে থাকতে মধ্যে মধ্যে আপনার প্রেরিত "স্বদেশ" পেয়েছি। এ সময়ে আমার পক্ষে একটা ছোট প্রবন্ধ লেখা মোটেই কষ্টকর নয়, কিন্তু লিখে পাঠালে আপনার কাছে পৌঁছবে না। যদিও আমি এখন কারাগারের বাহিরে, তথাপি কারাগারের অন্যান্য নিয়মাবলী এখনও বজায় আছে—বিশেষতঃ চিঠি পত্র, দেখা সাক্ষাৎ প্রভৃতি বিষয়ক নিয়মাবলী। এ অবস্থায় আমার প্রবন্ধের আশা ত্যাগ করেই আপনাকে শারদীয়া সংখ্যার আয়োজন করতে হবে। অবশ্য তাতে যে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার কোনও ক্ষতি হবে না, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

কিছুদিন যাবৎ আমার শরীর ভাল নেই—তা সংবাদ-পত্রে বোধ হয় দেখেছেন। তার উপর নূতন খবর দেবার কিছু নেই। স্বাস্থ্য একবার ভাঙলে জোড়াতালি দিয়ে চালান মুস্কিল। কিন্তু পথিক যারা, তাদের চলতেই হবে, কারণ চলা তাদের ধর্ম্ম। প্রয়োজন হলে বক্ষিভরেও এগুতে হবে—সামনের দিকে—কারণ অজয়ের প্রগতি যে অজানা সম্মুখের পানে।

আশা করি, আপনাদের কুশল।

ইতি—
আপনাদের
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
কার্শিয়াং।

শ্রীযুত হরেন্দু ভৌমিককে লিখিত পত্র।

পাঁচ মিশালী

গ্রেট ইণ্ডিয়ার ভাগ্য

গ্রেট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোম্পানী হইতে তাহার বীমাকারীদিগের বীমাগুলি লইবার যে চেষ্টা হইতেছে তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। কিন্তু এই বেঙ্গল ইনসিওরেন্স কয় বৎসরের মধ্যে যেভাবে বার বার নানা হাত ফেরতাই হইয়াছে, তাহাতে বীমাগুলি এই কোম্পানীর হস্তগত হইলে বীমাকারীদিগের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষিত হইবে কিনা, তাহা বিবেচনা করিয়া কাজ করা বীমাকারীদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য হইবে। এদেশে চলিত কথা আছে—ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ভয় পায়! বাঙ্গালা দেশের বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম গ্রেট ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর সঙ্ঘের শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছিল। সেই গ্রেট ইণ্ডিয়াই যখন একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল, তখন তাহার ক্ষতিগ্রস্ত বীমাকারীগণের পক্ষে করপোরেশনের নামজাদা ঠিকাদার কে, সি, ঘোষ কোম্পানীর মিঃ অমর ঘোষের প্রস্তাব খুব সহজেই গলাধঃকরণ করা সম্ভব নাও হইতে পারে। প্রথমেই তাঁহাদিগকে বেঙ্গল ইনসিওরেন্সের বর্ত্তমান অবস্থা ও ইহার পরিচালনা ব্যবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, এরূপ অবস্থায় বীমাকারীদিগের পক্ষে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারের পরামর্শ লাভের আশা করা অসঙ্গত হইবেনা। মূলকথা, একের দুর্দশায় যাহাতে অপরের স্বার্থসিদ্ধি হইতে না পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। সুতরাং অন্য কোন কোম্পানী যদি গ্রেট ইণ্ডিয়ার বীমাগুলি লইতে চান, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার বর্ত্তমান অবস্থা পরীক্ষা করিতে হইবে।

কোনকূলে ভিড়িবে তরী

দৈনিক বসুমতী সংবাদ দিতেছেন, তাঁহাদের বিজয় নং ২ অর্থাৎ 'বিজয়-কাটের' শুর বিজয় প্রসাদ সিংহরায় ফাঁপরে পড়িয়াছেন। বর্দ্ধমানের জমিদার কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচন সহজ হইবে মনে করিয়া তিনি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের পুত্রকে সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্রে সাহায্য করিবার বিনিময়ে এবং জমিদার নির্ব্বাচন কেন্দ্রে মহারাজ বাহাদুরের সাহায্য পাইবেন হিসাবে পাইয়াছেন। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, ভোটার লিষ্টে তাঁহার নাম নাই। একথা যদি সত্য হয়, তবে কি তাঁহাকে শেষে ল্যাজভাঙ্গা ঘোড়ে আপনার দাদামহাশয়ের বাড়ীতে বসিয়া গান ধরিতে হইবে—

> আমার একুল ওকুল দুকুল গেল
> মাঝখানে ডুবল তরী!
> আমি আগে পাছে করলাম কিরে কি!

তিন দিন আগে

(চিত্র)
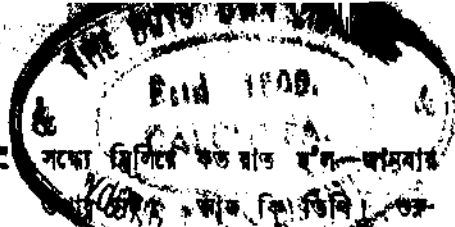
শ্রীরামেন্দ্র কুমার দেশমুখ্য

সন্ধ্যে মিলিয়ে গেছে নিশ্চয়ই। একটু আগে যে ওদিককার ছোট ছিদ্র দিয়ে এক টুকরো ঈষৎ রক্তাভ আলো এসে পড়েছিলো, তা'র চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান নেই। আলো জ্বালিয়ে দেয়নি এখনও। ভেতরে কি অন্ধকার! ঘণ হয়ে অন্ধকার যেন বরফের মত জমাট বেঁধে গেছে।

তিনদিন,--সুদীর্ঘ তিন ধরে জেলের এই প্রকোষ্ঠে বন্দী হয়ে আছি। মনে হচ্ছে এই তিন দিন যেন আমার ওপর দিয়ে তিনটী ক্লান্ত বছর চলে গেছে। গ্লানি আর অবসাদ তিলে তিলে আমাকে দহন কর্চ্ছে। জানিনে—আর কতকাল আমাকে এমনধারা অন্ধ কারার ভেতর থাকতে হ'বে। হয়ত আমার জন্যে এমন নির্দ্দিষ্ট কিছু মেয়াদ তৈয়ের হয়েছে;—কিন্তু-না-না সে সব তো আমাকে জানাবার প্রয়োজন ওরা মনে করেনি। আর জানানো যদি হয়েই থাকে, তবে থাক এ পর্য্যন্তই। জানতে চাইনে--কবে, কতদিন—কতবছর পরে আমার মুক্তি নেমে আসবে। কি কর্ব্ব ওসব জেনে? এতদিনের দীর্ঘপ্রতীক্ষা কি আর আমি সইতে পার্ব্ব? এর আগেই ডাকবো মরণকে। মিনতি জানাবো,—ওগো বন্ধু, প্রিয়তম সকল প্রতীক্ষার অবসান তুমিই করে দাও আগে।

আলো জ্বালিয়ে দেয়নি এখনও। সন্ধ্যে মিলিয়ে কত রাত হ'ল—আন্দাজ [illegible] [illegible] তিথি। শুক্লপক্ষের রাত্তি নিশ্চয়ই। তবে পূর্ণিমা নয়। ক্ষীণ জ্যোৎস্না, ছিদ্র দিয়ে ওর প্রভাব বিস্তার কর্ত্তে পার্চ্ছেনা। কি মাস? ঠিক মনে পড়ছে না। তিনটী দিনের মায়া স্পর্শ আমাকে যেন সব ভুলিয়ে দিয়েছে। হ'তে পারে চৈত্রের প্রথম দিক। বসন্ত তা হ'লে ঘন হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। আঃ,--ভুল হয়ে গেছে—শ্রাবণের শেষ দিক এখন। আষাঢ় মাস চলে গেছে। স্মৃতি-বিজড়িত জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের কত মেঘ-মেদুর, বৃষ্টি মুখর সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে এখন। সিঁড়রে আম প্রায় ফুরিয়ে গেছে। সে দিনও তো গাছ থেকে পেড়ে খেয়েছি বলে মনে হচ্ছে। মনে পড়ছে—দিন সাতেক আগে—কি আরো কিছু আগে দেখেছিলুম—আমার এই কোঠার বাইরের দক্ষিণ দিকটায় মাঝারি রকমের হাস্নুহানার গাছটায় অজস্র গোছা গোছা ফুটনোন্মুখ কলি ঝুলে রয়েছে। এখন হয়ত' সেই গাছটায় নতুন করে ফুল ফুটেছে। কই, গন্ধ তো পাচ্ছিনা। বোধ হয় ভেতর পর্য্যন্ত এসে পৌছাতে পার্চ্ছেনা বাতাস হয়ত' উল্টোয় চলতে পারে।·········আচ্ছা, মীরা—মীরা এখন কি কর্চ্ছে। নিশ্চয়ই ঘরে বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে। চিরদিনকার অভ্যেস তা'র জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চাওয়া। অন্ধকার আর জ্যোৎস্না—দুই সখীর সঙ্গেই ওর গোপনে ভাব—বিনিময় চলে। হাঁ—সেই মীরা,—একটু একটু করে মনে পড়ছে সব। তা'কে আমি ভালবাসতুম। মনে প্রাণে ওকে ভাল বাসতুম।

তারপর,—মনে পড়ছে—মীরার বিয়ে হ'ল শেষ পর্য্যন্ত আমরাই দাদার সঙ্গে। আমি কিন্তু পার্চ্ছিলাম ওর সঙ্গে আমার শ্রদ্ধার ভাব রাখতে। বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও আগেকার মত করে ওর সঙ্গে ভাব জমাতে গেলুম। কিন্তু, আশ্চর্য্য হলুম মীরার ব্যবহারে। সেই মীরা,—যে আমাকে হারানো দিনে ফুলের মত উন্মুখ হয়ে অনুরাগ জানিয়েছিল—সেই আজ আমাকে দু'হাত দিয়ে নিষেধ জানালো—আর যেন ভবিষ্যতে ওর কাছে গিয়ে প্রেমপ্রার্থী হয়ে না দাঁড়াই। শিক্ষয়িত্রীর মত করে বুঝালে তখন আর এখনের মধ্যে অনেক ব্যবধান রচনা হয়ে গেছে। তখন যা সাজতো, এখন তা' আর সাজেনা। সে এখন আমার পূজনীয়া। ইংরাজী ভালবাসা আর আমাদের মধ্যে শিকড় গাড়তে পারবে না।

দুর্জ্জয় অভিমান বুকে করে চলে এলুম মনে পড়ছে। কিছুই ভাল লাগছিল না তখন। মীরা—মীরা সে তো আমার নয়। মনে পড়ে সেই মুহূর্ত্তে কামনা করেছিলুম—আমার পূজনীয় নিরপরাধ দাদার আকস্মিক মৃত্যু। ভুলে গেলুম—এতে মীরারও কতদূর পর্য্যন্ত ক্ষতি হ'তে পারে। হিন্দুর মেয়ে সে। অপরিমিত

আশা-আনন্দ এবং মাধুর্য্য নিয়ে যার যেছে বসন্তের নব উন্মেষ হয়েছে মাত্র—সে বসন্তকে যে একজনের তিরোধানেই অনাদরে ফিরে যেতে হ'বে,—সে কথা কল্পনায়ও এলোনা। যে আমার ব্যক্তিগত সামগ্রীতে অধিকার নিয়েছে জোর-করে,—তা'র অস্তিত্ব পর্য্যন্তও আমার নিকট দুর্ব্বিসহ বলে বোধ হ'ল।

সেদিন যখন অফিস ফেরৎ দাদা এসে জানালেন, শিগগিরই তাকে বদলী হ'তে হবে অন্য কোন এক সহরে, তখন আমার অবস্থা যা হয়েছিল,—মনের দিক থেকে তা জানানো একেবারেই সম্ভবপর ছিল না। এ্যাদ্দিন তা'কে কাছে না পেলেও চোখে দেখতে পেয়েছি প্রায় সব সময়;—আর এখন দাদা বদলি হ'লে পর তা'কেও চলে যেতে হ'বে ওর সঙ্গে। তা'কে আর তা' হ'লে দেখতেও পার্ব্বোনা।

ক'দিন থেকে দেখছিলুম—ওর মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটছে। সদাহাস্যময় মুখখানি তা'র বেদনার কৃষ্ণরাগের ছোপ মাখতে সুরু করেছে। আমাকে দেখলেই সে চোখ ফিরিয়ে নিত। সময় সময় ওর বুক বেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস নামার শব্দও আমার কাণে এসে পৌছেচে। কিন্তু এ নিয়ে আমার আর তখন মাথা ঘামাবার সময় ছিলনা। বিশ্রী—একটা কুৎসিত চিন্তা আমার মনকে তখন সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

সাব এসিস্ট্যান্ট সার্জ্জন হ'য়ে সেবার বাড়ীতে এসেই চাকুরী পেয়েছিলুম,—মনে পড়ে। পিতামাতার মূলাভিসিক্ত আমার দাদা এতে খুবই আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। মীরাও খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিল এতে। সেদিন অবশ্য মীরার সঙ্গে আমার বৌদি—ঠাকুরপো সম্বন্ধ ছিল না। সেদিন মীরা,—আমারই।

—জানিনে,—বৌদি মীরা তখন কি রকম করে আনন্দ জানাত। হয়ত,…না-না, মীরাকে বৌদি বলে ভাবতে গেলেই আমার মনটা কেমন কেমন করে ওঠে যেন।

……সে দিন ছিল আমার স্মরণীয় দিন। পরজনের আলমীরার পাশে এসে আমার মনে বিদ্যুতের মত নতুন আইডিয়া দীপ্ত হয়ে ওঠল। বিদ্যুতের স্বভাবানুযায়ী নিভে গেলনা,—শিকড় গাড়তে লাগলো ভাল করে। কম্পাউণ্ডারকে সরিয়ে দিয়ে একটুখানি তীব্র বিষ ছোট্ট শিশিতে পুরে পকেটে ফেলে দিলুম। আশঙ্কা জাগল,—যদি কেউ দেখে থাকে, তবে!

তারপর, তারপর, হাঁ! আমার দাদাকে সে বিষ খাইয়ে দিলুম! সরল দাদাতো আমায় অবিশ্বাস কর্ত্তে পারেনি একটুও। মীরাও ছিল কক্ষান্তরে। সেই সুযোগ নিয়েই আমি,—না-না আর বলতে পার্ব্বোনা। শুধু এই জেনো—দাদা আমার অকালে চলে গেল অভিজিৎ লোকে। আর—আর অভাগী মীরার কথা বলছ—সে হ'ল বিধবা।

লোকের মুখে শুনেছি—এর পরে নাকি আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলুম। নিজের মুখেই আমার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করেছি। এমন কি আমি তখন ক্ষোভে দুঃখে আত্মহত্যাই করতে চলেছিলুম। কেন জানিনে শেষ পর্য্যন্ত ওরা আমায় ফাঁসী বা দ্বীপান্তর, কোনটাই দিলেনা। জেল হ'ল—জানিনে দীর্ঘ কত বছরের জন্যে। মীরা,—সে নিশ্চয়ই আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু

সে কি আমার সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা কর্ত্তে পেরেছে? আমি তো ক্ষমা পাবার যোগ্য প্রায়ও নই। কার মুখে শুনেছি—ঠিক মনে পড়ছেনা,—মীরা নাকি বলেছে, শেষ পর্য্যন্ত যে এ হ'বে সে নাকি আগে থেকেই তা' জানতো। সত্যি? তাই যদি জানতো তবে সে কেন আমায় আগে থেকে সাবধান করে দিলেনা। তা হ'লে হয়ত' এতদূর এগিয়ে যেতুম না আমি।

আমার দোষে দাদা অকালেই মারা গেলেন। আর মীরা,—হিঁদুর মেয়ে সে—সেও গেল বৈকি। কি কুক্ষণেই না ডাক্তারী পড়া শিখতে গিয়েছিলুম। শনি, রাহু, না মঙ্গল, কোন গ্রহ আমায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন এমন মহান কাজে?

+ + ×

এখনও আলো জ্বালিয়ে দেয়নি। অন্ধকার যে আর সইতে পার্চ্ছিনে। জমাট অন্ধকার যেন আমায় চেপে ধরছে দশদিক থেকে। জল—হ্যাঁ জলতেষ্টাও বড্ড পেয়েছে।

—ঐ যেন কে দোর খুলছে। আলো নিয়ে আসছে বোধ হয়। 'ডাক্তার 'বাবু'—বলে যেন আমায় কে সম্বোধন কর্লে। কে লক্ষণ? না-না—এখন তো আর আমার অধিকার নেই ওকে এমনধারা ডাক্‌বার। প্রভুত্বের ব্যঞ্জনা যে আর আমার কথার ভেতর দিয়ে এখন প্রকাশ পেতে পারেনা। ছিল একদিন সত্যি—তখন আমি ছিলুম এই জেলেরই ডাক্তার। এই লক্ষণকে আমিই আদেশ দিয়েছি কত। সে তিন দিন আগেও। আর আজ!—

[illegible]

দেশে ব্যাধি ও অকালমৃত্যু বাড়িয়াছে;—আমরা বলি, কলি হইয়াছে চার পোয়া—আমাদের পাপ ও অনাচার বহুগুণ বাড়িয়াছে,—তাই এ বিপত্তি!

কথাটা এক হিসাবে সত্য! পাপ ও অনাচার বাড়িয়াছে স্বাস্থ্য-বিধি সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যে!

ব্যাধি প্রভৃতির উপসর্গ ঘটে বাহির হইতে—মৃত্যুদূত বাহিরে নানা বেশে ঘুরিতেছে—কবলিত করিতে। এ যুগের ঐ বিষবাষ্পভরা বোমা—তার মতই ভয়ঙ্কর মাছি মশা যে আমাদের নিরন্তর আক্রমণ করিতে উদ্যত—সে মাছিমশাগুলার হাতে নিস্তার পাইবার জন্য আমাদের কোন উদ্যোগ নাই; ঝড় উঠিলে গাছ পড়িবার ভয়ে আমরা বনবাদাড় ছাড়িয়া পলাই; বৃষ্টি পড়িলে জলের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে আমরা নানা আয়োজন করি। কিন্তু এই যে মাছিগুলা গৃহে নিত্য ভন্ ভন্ করিতেছে, তাহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষার সম্বন্ধে আমরা এতখানি উদাসীন কেন? এক একটি মাছি—কালান্তক যম—শত রোগের বাহন। মৃত্যুর দূত সাজিয়া এই মাছি-মশা আমাদের আশে পাশে ঘুরিতেছে অহর্নিশি।

আত্মরক্ষা করিতে হইবে—নচেৎ ব্যাধির ভারে মানবের গৃহভূমি শ্মশান হইবে। বিলাতে জনসাধারণ আন্দোলন সুরু করিয়াছে—মশামাছি মারিবার উদ্যোগ না করিলে যেন গৃহস্থের শান্তির ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়

মশা মাছি—বিশেষ করিয়া মাছি—অতি ভয়ঙ্কর জীব! আমরা তাদের সাদরে গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবারই ব্যবস্থা করি। আম কাঁঠালের দিনে গৃহস্থবাড়ীতে যেন মাছিদের পালপার্ব্বণ সুরু হয়—আমরা অবিচল থাকিয়া এ মাছি-মেলার প্রশ্রয় দিই। আম কাঁঠালে—ভাত তরকারীতে মাছি বসিতেছে—আমাদের ও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই! অথচ ঐ মাছি-ছোঁয়া খাদ্যাদি গ্রহণে কি সর্ব্বনাশই না ঘটিয়া থাকে!

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, দুনিয়ায় মাছি আছে ৬০০০০ ষাট হাজার জাতের। শুধু এই ভারতবর্ষে মাছি আছে প্রায় ৪০০০০ জাতের। গ্রীষ্মকালে মাছিদের বংশবৃদ্ধি ঘটে এবং তারা দিকদিগন্তে বংশধরদের পাঠায় মারণ যজ্ঞ সাধন করিতে।

আকারে এতটুকু—কিন্তু অনিষ্ট যা করে, তা পাহাড় প্রমাণ। আফ্রিকার মাছি সব চেয়ে ভয়ঙ্কর—তারা বহিয়া আনে কালনিদ্রা রোগ,—তাদের উৎপাতে পশুপক্ষী নিমেষে প্রাণ হারায়।

ঘোড়ার গায়ে একরকম মাছি ডিম পাড়ে গাধা ও গাভীর গায়ে অপর জাতের মাছি ডিম পাড়ে—আশ্রয় নয়,—অপর পশুপক্ষীর অন্ত্র মধ্যে অপর জাতের মাছির অব্যাহত প্রবেশাধিকার আছে। কোন জাতের মাছি শুধু সজীব প্রাণীর নাসায় বসে, কোনটা বসে চোখে, কোনটা বা ওষ্ঠে—সবগুলি জাতে স্বতন্ত্র। এবং প্রত্যেক জাতের মাছিই রোগবাহী।

মাছির আনন্দ আবর্জ্জনায়—তাদের জন্ম ও পালন পচাধসা গলিত পলিত

আবর্জ্জনায়। মাঝে মাঝে যে সংক্রামক ব্যাধির উপদ্রব ঘটে, তার মূলে আছে এই মাছির দৌত্য।

এবং সব চেয়ে অহিতকর মাছি যারা আমাদের গৃহে নিত্য বাস করিতেছে। এ মাছি দুনিয়ার সর্ব্বত্র জুড়িয়া বাস করিতেছে।

এ মাছিগুলার উপর ষষ্ঠীর কৃপা খুব বেশী—নিত্য বংশ বৃদ্ধি লইতেছে ঝাঁকে ঝাঁকে—লাখে লাখে।

বৈজ্ঞানিকগণ আজ নিউমোনিয়া, যক্ষা, কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধের নানা ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু এসব রোগ যাদের কল্যাণে দেখা দিতেছে, সেই উৎস মাছির সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা নাই।

দুধের পাত্রে মাছি বসিতেছে—আমরা দেখিয়া নীরব আছি—কোন ডাষ্টবিন হইতে মাছি আসিয়া চায়ের পেয়ালায়, দুধের পাত্রে বসিতেছে—সে কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন? যেখানে নোংরা, যেখানে অপরিচ্ছন্নতা, সেইখানে মাছির জন্ম—সেইখানে মাছির আস্তানা।

গৃহস্থ ঘরে খাদ্যাদি ঢাকা দিয়া রাখিবার কথা সকলের মনে জাগে না। তা ছাড়া আহার করিতেছি, পাতে মাছি আসিয়া বসিল—অন্নে বসিল, আমরা মাছিকে দিলাম তাড়াইয়া—ব্যস! কিন্তু যে জায়গায় মাছি বসিয়াছে, সে জায়গাটার বহু রোগের বীজ সে রাখিয়া গেল এই কথা নিশ্চিত বলিয়া জানিয়া রাখুন। যে খাদ্যে মাছি বসিবে, কদাচ সে খাদ্য মুখে দিবেন না।

মাছি মারিতে কামান যখন পাতা চলিবে না, তখন খাদ্যাদি সব সময়ে ঢাকা দিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা চাই। তাছাড়া মাছির ফাঁদ—পাত্রে ফর্ম্মালিন, চুণের জল ও চিনি মিশাইয়া ঘরে ঘরে এমন পাত্র একটি করিয়া রাখ—ঘরে মুক্ত বাতাস যথাসম্ভব প্রবাহিত রাখ। এক একটি মাছি—প্লেগ, বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতির বীজ বহিয়া ঘুরিতেছে—অসংখ্য বীজ। অতএব যদি বাঁচিতে চাও, মাছি তাড়াও!

খাবারের দোকানে খাবার কিনিতে গিয়া যদি দেখ খাবার আলগা আছে এবং তাহাতে মাছি বসিতেছে কদাচ সে খাবার লইও না, সে খাওয়া আর রোগের বীজাণু খাওয়া একই কথা। একথা মনে রাখিও। মাংস তরীতরকারী সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা—না ধুইয়া ফল খাইবে না। এদিকে যদি সতর্ক হইতে পার, সহরে বা গ্রামে এপিডেমিকের ভয় থাকিবে না।

———

শিপ্রা

(গল্প)

শ্রীরসময় দাশ
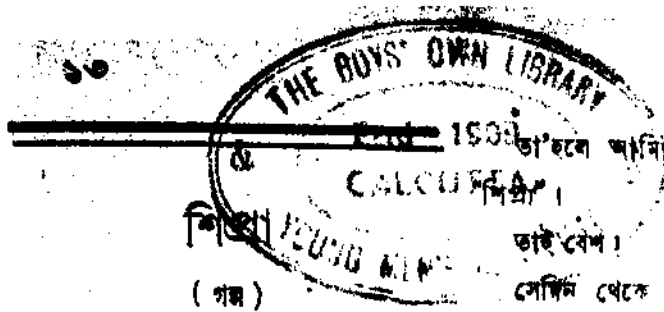
আকাশের পাখী মাটীর ধরায় ধরা দেবে না, সে অনেক আগেই টের পেয়েছিলুম।

তবু, আমার সংসারকে—আমার প্রত্যহের সুখ দুঃখকে সে এতখানি এড়িয়ে যাবে তা' কখনো ভাবিনি। তার করুণ সান্ত্বনা ভরা আঁখির আলোকে আমার প্রতিদিনের বেদনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে না,—সব চাইতে কাছের মানুষ আমার চিরদিন সবার থেকে দূরে থেকে যাবে এটা কল্পনা করতেও যেন মন কেমন হয়ে যায়।

একদিন গভীর রাতে যখন বাতায়ন পথে শরৎকালের জোছনা উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাদের বিছানায় এসে পড়েছিল, তাকে বুকে জড়িয়ে বলেছিলুম, "বলত রাণী, তোমাকে আমি কী নাম ধরে ডাকবো ?"

কিছুমাত্র না ভেবেই সে উত্তর দিলে—"কেন, সবাই যে নামে ডাকে !"

আমি বললুম,—"সে ত' নিত্যকালের চির পুরাণো নাম। সে শুধু দিনের বেলার হাটের মাঝে চলে। এমন নাম করতে হবে, যা' কেবল আমার একার,—যা' এই শরৎ-রাতের শেফালীফুলের গন্ধ-ভরা জোছনার সুরে সহজেই মিলে যাবে।"

"তবে যে নামে ডাকলে তুমি সুখী হও, সে নাম বলেই ডেকো।"

"তা'হলে আমি তোমার নাম রাখলুম শিপ্রা"।

তাই বেশ।

সেদিন থেকে তাকে শিপ্রা বলেই ডাকতুম।

কালিদাসের আমলের এ নামটাকে আমার অত্যন্ত ভাল লাগে। এর সঙ্গে যেন কতযুগের স্বপ্ন—কতকালের হারানো প্রেমের পুঞ্জীভূত স্মৃতি জড়ানো রয়েছে। কিন্তু, আমার দেওয়া নামের সঙ্গে ওর আমার সম্বন্ধের অর্থ এমন সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে—ও শুধু দূরের স্বপ্নলোকেই চিরদিন থেকে যাবে—এ কখন ভাবিনি।

সেত' অনেক দিনই দেখেছি, আমার দুঃখ ওকে গভীরভাবে অভিভূত করতে পারে না, আমার আনন্দের দিনে কখনই ও একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে না। ও যেন এসবের অনেক উপরে। ওর আমার মধ্যে কোথায় যেন কি ভুল হয়ে গেছে,—যেন দু'টি হৃদয়ের তার ঠিক এক সুরে বেজে উঠছে না।

অনেকদিন মনে করছি রাগ করবো,—অন্ততঃ আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেব যে ওর ঔদাসীন্য আমাকে গভীরভাবে আঘাত করেছে। কিন্তু পারিনি; যখনি ওর মুখের দিকে, ওর সুদূর স্বপ্নভরা সুনীল চোখের দিকে চেয়েছি, এক নিমেষে আমার বিষাদের কুহেলি-অন্ধকার পরিষ্কার হয়ে গেছে। ওর সুন্দর মুখখানিতে কী যে ইন্দ্রজাল মাখানো রয়েছে সে হয়ত ও নিজেই জানে না। অনেকদিন অভিমান করে কথা কইনি; মনে করেছি, সে নিজে এসে আমার অভিমান ভাঙাবে; কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই—সে যেন এর কিছুই জানে না। তবু তার স্নিগ্ধ হাসি আমাকে কথা কইয়েছে, তার হরিণীর মত সরল চাহনির তলে আমার সব অভিমান ভেসে গিয়েছে। উল্টা বরং নিজের রাগ হয়েছে: এমন যে শিশুর মত সরল, ফুলের মত শুভ্র, তাকেও কি না আমার ক্ষুদ্র বেদনার মধ্যে টেনে এনে মলিন করে দিতে চেয়েছিলাম! কী ভয়ানক স্বার্থপর আমি! তবু শেষ পর্য্যন্ত এভাব স্থায়ী হয় না।

সেদিন বাংলার শ্রেষ্ঠ মাসিকে যখন আমার কবিতা প্রথম বেরুলো, বন্ধুরা খুব হল্লা করতে লাগলেন; শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির লেখার সঙ্গে আমারও লেখা ছাপার হরফে বেরুতে পারে, সে ধারণা ওদের হয়ত ছিলনা—আমার ত না-ই! সে যা'হ'ক, ভেবেছিলাম, এ সংবাদে শিপ্রা খুব খুসী হয়ে উঠবে; অন্ততঃ বেশ একটু আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেছে এ ত' দেখা যাবেই। চাই কি, এখনও হতে পারে, আমার গলা জড়িয়ে ধরে ডালিমের মত টুকটুকে ঠোঁট দু'খানি ঘুরিয়ে বলবে "ভারি দুষ্টু তুমি, আমাকে লুকিয়ে লেখা পাঠিয়েছিলে! এমন ভাল তুমি লিখতে পার!"

বাড়ী গিয়ে দেখি, শিপ্রা তার নূতন রঙের শাড়ীখানি পরে দেওয়ালে টাঙানো বড় আয়নার ভিতর নিজের মুখের দিকে চেয়ে বিভোর হয়ে আছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ডাকলুম,—

"শিপ্রা শুনেছো ?"

শিপ্রা ফিরে চাইলে,—সেই তার রহস্যভরা চোখে!

বললুম—"শুনেছো ?"

"কি ?"

"'প্রভাতী'তে আমার কবিতা বেরিয়েছে।"

"আমি দেখেছি, এই একটু আগেই

পিয়ন এসে কাগজ দিয়ে গেছে। লীলা দি'রা এসেছিল, আজ 'ছায়াবাণীতে' নাকি 'দেবদাস' দেখানো হচ্ছে। আমাকে এক্ষুনি যেতে বলে গেছে। সোফারকে গাড়ী তৈরী করতে বলে দিয়েছি। অপেক্ষা ছিল শুধু তোমারি।"

বাধ্য হয়ে ওর খেয়ালে যোগ দিতে হলো। পথে যেতে যেতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, কবিতা আর কখনো লিখবো না। সেদিন সিনেমা দেখবার আনন্দে ওর এতটুকু ত্রুটী হয়েছিল বলে মনে হয় না। হাসিতে, কথায় এবং গানে সারাটা পথ এমনি মাতিয়ে তুলেছিল।

কিন্তু, আজ এত বড় বিপদের পরেও সে এতখানি উদাসীন থেকে যাবে, ভয়ে বিস্ময়ে অস্থির হয়ে বাড়ীময় একটা হৈ চৈ কাণ্ড করে তুলবে না—এ যেন স্বপ্নেরও অতীত ছিল। চোখে মুখে তার ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠেছে সত্যি, কিন্তু কি করে হঠাৎ স্বর্ণার বুকে ঝড় উঠে নৌকা ডুবে গেল, কি করে আমরা মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে করে শেষটায় বেঁচে গেলাম, এসব ত আকুল আগ্রহে তন্ন তন্ন করে খোঁজ নিলে না। আমার কেবলি মনে হচ্ছে, এতবড় বিপদেও যার হৃদয়ের সাড়া পেলুম না, দীর্ঘজীবন তাকে নিয়ে কেমন করে—কোন্ সান্ত্বনায় কাটাবো?

সন্ধ্যার পর শিপ্রাকে নিয়ে ছাদে উঠে এলাম। শুভ্র জোছনার হাসিতে আকাশ তখন ভরে গিয়েছে। শিপ্রার মুখের ভীতির চিহ্নটাও এতক্ষণে মুছে এসেছে। আজ ওকে খুব কঠিন কথা শুনাবো। বলবো তাকে পেয়ে আমি সুখী হতে পারিনি। প্রত্যহের সুখ দুঃখে তার হাতে হাত রেখে জীবনের পথ বেয়ে যাবো, সে আশা আমার আর নেই। বলবো, আমার কোনো দুঃখ আমার কোনো বেদনা······

হঠাৎ শিপ্রা হেসে উঠলো,—"দেখ দেখ কী চমৎকার জোছনা হয়েছে; আমার মনে হয়, ওই দূরে—বহুদূরে আকাশের কূলে কূলে উড়ে যেতে পারলে ভারি মজা হতো।"

শিপ্রার শুভ্র হাসিতে তখন জোছনার বুকে ঢেউ উঠেছে। আমি কিছুই বলতে পারলুম না। কেবল তাকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে তার তুলতুলে লাল দু'টি ঠোঁটের উপর একটী ছোট্ট চুম্বনের চিহ্ন এঁকে দিলাম।

———

আধুনিক সাহিত্য

[প্রবন্ধ]

—শ্রীসুনীলচন্দ্র বসু

আমি কবি অথবা সাহিত্যিক নই, তাই আমার মতন একজন অ-সাহিত্যিকের পক্ষে সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে বা লিখিতে যাওয়া ধৃষ্টতা এবং ইহা অনেকের নিকট অনধিকার চর্চা করিতে যাওয়া বলিয়া মনে হইতে পারে। তবে সাহিত্যিক হিসাবে কিছু বলিতে বা লিখিতে যাওয়া অন্যায় হইলেও পাঠক হিসাবে সাহিত্যের ভাল-মন্দ এবং ন্যায়-অন্যায়ের সামান্য বিচার আমি হয়ত করিতে পারি। বর্ত্তমানে সেই অধিকার দাবী করিয়া আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে আমি লিখিব। আশা করি, পাঠক পাঠিকারা সেজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। জগতের অধিকাংশ জিনিষই যেমন পরিবর্ত্তনশীল, তেমনি সাহিত্যও পরিবর্ত্তনশীল। আমরা একটু গম্ভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাই মানুষের মনের পরিবর্ত্তনের সহিত সাহিত্যের পরিবর্ত্তনের সংযোগ আছে অতি ঘনিষ্টভাবে, কারণ মানুষের রুচির পরিবর্ত্তন না হইলে সাহিত্যের পরিবর্ত্তন কখনই সম্ভব নহে; এবং সে পরিবর্ত্তন ভালর দিকে হউক বা মন্দের দিকে হউক তাহাকে কেহই নিবারণ করিতে পারে না। এবং মানুষের এই মনের পরিবর্ত্তনকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে সাহিত্য। আমার মনে হয় একজন অ-সাধারণের অভিভাবকত্ব না পাইলে সাধারণ কখনই ক্ষমতাপন্ন হইতে পারে না, যাহা হউক যেমন জাতির সম্পূর্ণ

আসিলেই জাগিয়া উঠে তেমনি সাহিত্যিকের মতবাদ সর্ব্বসাধারণকে সংক্রামিত করে এবং পুরাতন মতবাদকে ধ্বংস অথবা পরাজিত করিয়া আর একটী নূতন মতবাদ গড়িয়া উঠে। তবে অধিকাংশ নূতন মতবাদ সৃষ্টি হয় উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া, নূতনের স্বাদ পাইয়া। এই কারণে পরিবর্ত্তন অনেক স্থলে হইয়া উঠে অনিষ্টকর। আজ আমাদের দেশের সাহিত্যের মধ্যেও পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, এবং এই পরিবর্ত্তন আসিয়াছে অতি আকস্মিকভাবে। এই কারণে আধুনিক সাহিত্যিকদিগের মতবাদ অনেকস্থলে অনিষ্টকর। হয়ত এ পরিবর্ত্তন বিশেষ অনিষ্টকর হইত না যদি তাহা আমাদের নিজস্ব মতবাদ হইত। কারণ প্রাচ্যের চিন্তাধারা বিকৃত হইয়া আমাদের দেশের আধুনিক সাহিত্যে যে ভাবে প্রচারিত হইতেছে তাহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলকর। প্রাচ্যের চিন্তাধারা প্রাচ্য সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হইলেও আমাদের সমাজের পক্ষে তাহা উপযোগী নহে। এই কারণে ওদেশী সংস্কার সাহিত্যের মধ্য দিয়া বিকৃত রূপ পাইয়া সমাজে বেশ একটী বিপ্লব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। আমাদের দেশের প্রথম যুগের সাহিত্যের সহিত মধ্য যুগের সাহিত্যের মতানৈক্য না থাকিলেও, বর্ত্তমান আধুনিক সাহিত্যের সহিত প্রথম ও মধ্য যুগের সাহিত্যের কোনও মতের মিল নাই। বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য নৈতিক চরিত্র ও সমাজ ধ্বংসের ভীষণ রূপ। কিন্তু এর কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়—উচ্ছৃঙ্খলতা, সকল দেশের সকল জাতি একটী আদর্শ দেখিয়া গড়িয়া উঠে, কিন্তু আমাদের দেশে আদর্শের বালাই নাই, তাই বেপরোয়াভাবে আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে। এই জন্য বর্ত্তমান সাহিত্যের এই পরিবর্ত্তন বিস্ময়কর না হইলেও কিঞ্চিৎ ভীতিকর, এবং এই ভীতির কারণ "পরধর্ম্ম ভয়াবহ"র জন্য। বর্ত্তমানে সাহিত্যিক সমাজ সংস্কারকগণ তাহাদের সাহিত্যের মধ্য দিয়া সমাজের মঙ্গলের জন্য যে বাণী প্রচার করিতেছেন, তাহার অন্তর্নিহিত প্রকৃত উপদেশ ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে না পারিয়া এবং উল্টা অর্থ গ্রহণ করিয়া তরুণ সাহিত্যিক ও অর্দ্ধ শিক্ষিত জনসাধারণ সাহিত্যে ও সমাজে বিপ্লব আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আমি পাঠক ও সাহিত্যসেবক, এই কারণে গত যুগের প্রায় প্রত্যেক নামকরা সাহিত্যিকদের সাহিত্য ও কাব্য-গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি এবং বর্ত্তমানের প্রায় প্রত্যেক নামকরা লেখকদিগের লেখা পাঠ করিতেছি। কিন্তু গত যুগের সহিত বর্ত্তমানের এই প্রভেদ দেখিতেছি, গত যুগের সাহিত্যিকদের যেমন একটী কর্ত্তব্যজ্ঞান ছিল, বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যিকদের সে কর্ত্তব্যজ্ঞান একেবারেই নাই। হয়ত কেহ উপরোক্ত অভিমতটুকু পাঠ করিয়া বলিবেন,—সাহিত্য নীতিপুস্তক নহে। কিন্তু আমার মতে সাহিত্য নীতিপুস্তক বা কর্ত্তব্য পাঠ না হইলেও সাহিত্যে 'নীতি' ও 'কর্ত্তব্য' আসা বিশেষভাবে দরকার। বর্ত্তমানে আমরা সাহিত্য ও সাহিত্যিক লইয়া হট্টগোল করিলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, দীনেশ সেন, রাজশেখর বসু, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণকে দূরে সরাইয়া রাখিলে আধুনিক যুগের এমন কোনও সাহিত্যিকের নাম করিতে পারি না যিনি অবিস্মরণীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া এই সাহিত্য যুগান্তর আনিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, অথচ কু-খ্যাতি অনেকেই লাভ করিয়াছেন। যেমন পঙ্কিলময় ডোবাকে সরসী বলিতে পারা যায় না, তেমনি এই সকল লেখকদিগকে বড় জোড় আমরা লেখক বলিতে পারি, কিন্তু সাহিত্যিক বলিয়া সম্মানিত করিতে পারি না। কারণ সাহিত্যিক ও লেখকের মধ্যে প্রভেদ অনেকখানি।

সাহিত্য কি? এক কথায় ইহার সংজ্ঞা দিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে—প্রকৃত সাহিত্য হইতেছে লেখকের আত্মানুভূতির আংশিক বিকাশ এবং প্রকৃত সাহিত্যিক হইতেছেন তিনি, যিনি সেই ভাবের রূপদাতা। এই রূপদাতাকে আরো স্থান দেওয়া যায় এই কারণে যদি অচিন্ত্য তাঁহার চিন্তার মধ্য হয়, যেমন রবীন্দ্রনাথ। যিনি প্রকৃত সাহিত্যিক তিনি ভাবের এবং ভাবলোকের মানুষ। কঠিন বাস্তবলোক তাহার নিকট
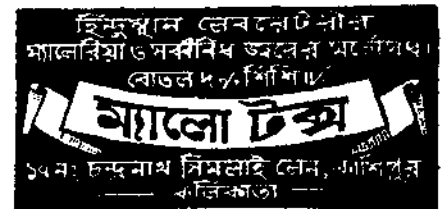
অনন্তনীয়, তাই কল্পলোকবাসী কবি অসীমতার মাঝে থাকিয়া যে গীত সর্ব্বজনকে শুনাইয়া থাকেন, তাহার স্বর নাইটিঙ্গেল পাখীর মতনই অপূর্ব্ব স্বর্গীয় এবং মধুর। যদিও এ রকম কবি বা সাহিত্যিক জগতে বিরল, অবশ্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে লইয়া আমরা নিশ্চয় গর্ব্ব করিতে পারি। কিন্তু আমার এ অভিমত পাঠ করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণ যেন আমাকে ভুল না বুঝেন, এবং তারা না মনে করিয়া থাকেন যে, আমি বলিতেছি ঐরূপ ভাব বা কল্পলোকের বাসিন্দা ছাড়া অন্য কেহই সাহিত্যিক নহেন, তাহা হইলে আমি শরৎচন্দ্রকে সাহিত্যিক বলিয়া উল্লেখ করিতাম না, কারণ বাস্তবলোকবাসীও সাহিত্যিক হইতে পারে যদি তাঁহার মোহন লেখনী স্পর্শে তাহা স্বর্গীয় সুন্দর ও ভাবময় হইয়া আর্টের কোঠায় যাইয়া পড়ে। ঠিক এই কারণে আজ আমরা শরৎচন্দ্রকে সাহিত্যিক বলিয়া থাকি। প্রথমতঃ শরৎ সাহিত্য বাস্তবলোকের গণ্ডীর মধ্যে, দ্বিতীয়তঃ তিনি যে সমাজকে আদর্শ করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন, সে সমাজকে ঘৃণা করিয়া থাকেন প্রত্যেক শিক্ষিত ও ভদ্রলোক, কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখনী স্পর্শে সেই কুৎসিত সমাজ আমাদের সম্মুখে যেরূপ দণ্ডায়মান হয় তাহাকে আমরা কখনই কুৎসিত বা অসুন্দর বলিয়া ঘৃণা করিতে পারি না। আর্ট সুন্দর, অসুন্দরের মধ্য দিয়াও যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ তাহাও আর্ট। কিন্তু সুন্দরকে কুৎসিত ভাবে রূপ দেওয়া আর্টের ধর্ম্ম নহে। এই স্থলে আমি নব্য বাংলার কয়েকজন প্রতিভাবান লেখকের নাম করিতে পারি যাহারা সুন্দরকে কুৎসিত বা জঘন্যতায় পরিণত করিয়াছেন। সাহিত্যে আদিরস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস, কিন্তু আদিরসের সৌন্দর্য্য ততক্ষণ, যতক্ষণ না সেটী বীভৎস রসে পরিণত হইতেছে। এই স্থলে আমি উদাহরণ স্বরূপে ভারত চন্দ্রের "বিদ্যা-সুন্দর" কাব্যের নাম করিতে পারি, আদিরসের জন্য উক্ত কাব্যখানি রসিক সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত, কিন্তু তাহাও বীভৎস রসের জন্য বিশেষ ভাবে নিন্দা পাইয়াছে—যেহেতু ভারতচন্দ্র অধিকমাত্রায় ভাবাসিক্ত হওয়ায় তাহা বীভৎস রসে পরিণত হইয়াছিল। যাহা হউক বর্ত্তমানে আমরা যে রস দেখিতেছি তাহাকে বীভৎস রস ছাড়া অন্য কিছুই বলিতে পারি না। আজ আমাদের সাহিত্য—প্রেম সাহিত্য, মণিকাদি কণিকাদিকে লইয়া এবং তাহাদের মুখ দিয়া সমাজ ও চরিত্র ধ্বংসকর বড় বড় বুলি আওড়াইয়া যে সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছে তাহার শেষ কোথায় এবং কবে এই নিকৃষ্ট বিষাক্ত চিন্তাধারা আমাদের বাংলার তরুণ বৃন্দ ত্যাগ করিবে তাহাই চিন্তার বিষয়। পুরুষ নারীকে চাহিয়া থাকে—নারীও পুরুষকে চাহিয়া থাকে—এ চাওয়া চিরন্তন। কিন্তু এ চাওয়া একমাত্র দেহের জন্য লালসার জন্য ছাড়া আর অন্য কিছুর জন্য নয় কি? এবং ইহা ছাড়া সাহিত্যে অন্য কিছু দেখবার নাই কি? যাহা হউক এইখানেই আমার লেখা শেষ করিব, তাহার পূর্ব্বে বলিয়া রাখি সাহিত্যকে বাচাইবার এখনও সময় আছে। আজিকার এই পরিবর্ত্তন যুগোপযোগী না হইলে এবং তাহাকে সাহিত্যোপযোগী বলিয়া গ্রহণ করিলে ইহার পরিণাম শুভ নহে। কুৎসিত বা অ-সৎ জিনিষ লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি হয় না এবং তাহা সাহিত্য নহে।

———

ছায়া ও কায়া

শ্রীমধু বসু

ভাল জিনিষ যদি হয় তা হলে তার উচিৎ মূল্য দিতে বাংলার নাট্য-প্রিয় নর-নারীরা পরাঙ্মুখ নয়—গত পূর্ব্ব রবিবার শ্যামবাজারের রঙ্গালয়গুলির দ্বারে দ্বারে বেড়িয়ে তা ভালমতই উপলব্ধি করে এসেছি। নাট্যনিকেতনে 'কেদার রায়' হচ্ছিল—প্রেক্ষাগৃহে তিল-ধারণের স্থান ছিল না; রঙমহলে নতুন নাটক 'নন্দরাণী সংসারে'র তৃতীয় অভিনয় ঐ তারিখে ছিল—সেখানেও 'হাউস ফুল' টাঙান দেখা গেল—অবশ্য সংবাদিকদের জন্য এই তারিখে কতকগুলি আসন বিনা মূল্যে দিতে হয়েছিল। তাহলেও দর্শক যে যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার কারণও যথেষ্ট ছিল, যথা—যোগেশচন্দ্রের নাটক, সতু সেনের প্রযোজনা, কাজী নজরুলের সুর সংযোজনা সর্ব্বোপরি রঙমহলের কৃতী অভিনেতৃবৃন্দ—আকর্ষণ কম কি? নব নাট্য মন্দিরেও দর্শকসমাগম বড় কম হয় নি—অভিনীত হয়েছিল 'রীতিমত নাটক' ও 'বিজয়া'। মিনার্ভায় তো তিল-ধারণের স্থানও ছিল না, 'দস্যু' দর্শকদের অর্থ এমনিভাবেই লুণ্ঠন করছে। সুতরাং রঙ্গালয় চলে না বা চলবে না এমন কথার মানেই হয় না।

ভাল জিনিষেরই আদর হয়। খারাপ জিনিষ হয় তো বিজ্ঞাপনের চটকে প্রথম অবস্থায় দর্শক আকর্ষণে সমর্থ হয়, তার পরেই শূন্য প্রেক্ষাগৃহে অভিনেতৃদের অভিনয় ভঙ্গিমা দেখাতে হয়। কেদার রায় নাটক হিসাবে মিশ্র হলেও দু একটী চরিত্র সৃষ্টি অপূর্ব্ব হওয়াতে এবং তাদের অভিনয়ও উচ্চাঙ্গের হওয়াতে, দৃশ্যপট সুদৃশ্য এবং নৃত্যগীত প্রভৃতি ভাল হওয়াতে দর্শকগণের প্রীতিবর্দ্ধনে সমর্থ হয়েছে। 'রীতিমত নাটক' নতুনত্বের পরিচায়ক। দর্শকেরা এর লোভও ছাড়তে পারেন না, 'দস্যু' সুলভদর্শনী হওয়াতে চলছে, কারণ নাচগান, দৃশ্যপট সবই উপভোগ্য ও জমকালো।

আফ্‌টার দি কোয়েক

গত ২৯শে আগষ্ট শনিবার বহু আকাঙ্ক্ষিত একখানা উর্দ্দু ছবি ভূতপূর্ব্ব রঙ্গনক-মহলে অধুনা 'রূবি'তে মুক্তিলাভ করেছে। এই ছবিখানা পরিচালনা করেছেন যশস্বী প্রয়োগশিল্পী দেবকীকুমার বসু—দেবকীবাবুর সুনাম যখন সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত তখনই এ ছবি তোলা হয়েছে। দুঃখের বিষয় "ভূমিকম্পের পরে" যখন বাংলার খাস রাজধানীতে প্রদর্শিত হল, তখন দেবকী বাবুর যশের মুকুটের পালকগুলি এক একটী করে খসে পড়েছে—সুতরাং ছবিটী দেখবার আগ্রহ অনেকেরই কমে গেছিল। তাছাড়া বাজারে গুজব ছিল—'ভূমিকম্পের পরে' কোনদিক দিয়েই প্রশংসার যোগ্য ছবি হয় নি—এর শব্দযোজনা বিশ্রি হয়েছিল—এ কথায় আমাদের প্রত্যয়ও যে না হয়েছিল তা নয়। কারণ দেখা গেল—ছবিটী গনেশ টকিতে প্রদর্শিত হবে—তারপর আবার শোনা গেল নিউ সিনেমায় এর প্রদর্শন হবে—উভয় স্থানেই স্থির-চিত্র পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছিল—তারিখ পর্য্যন্ত ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু সময়ে ছবির আর পাত্তা পাওয়া যায় নি। শুনেছি ছবিখানা নাকি নির্ম্মাতারা উত্তর ভারতের কোন ডিষ্ট্রিবিউটারকে বিক্রয় করে দিয়ে নিজেরা ঝুঁকির হাত হতে পরিত্রাণ লাভ করেছেন। সেই ছবি এতদিনে কোলকাতায় প্রদর্শিত হল 'রূবি'র দৌলতে। তবু আগ্রহ নিয়ে একখানা টিকিট সংগ্রহ করে দেখতে গেলাম। নমুনা দেখেই বুঝলাম—কেন এখানা সমাদর লাভ করে নি ঢাকায় মুক্ত হবার সুযোগ বহু পূর্ব্বে হয়েছে, অথচ খাস রাজধানীতে দেখাবার সুযোগ কেন হয়ে ওঠেনি!

দুর্ব্বোধ্য গল্প উর্দ্দু ভাষা—একবর্ণও বোঝা যায় নি। খাঁটী উর্দ্দু বোঝা সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে কঠিন। এই সেদিন উর্দ্দু 'মিলিওনেয়ার' দেখলাম—কই, বুঝতে তো মোটেই বেগ পেতে হয় নি! আসলে দেবকীবাবুর রচনাই বিশ্রি। নিজে মূল কাহিনী রচনার ভার না নিলেই তিনি সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। ঘোষের জন্য পিকচার্সকে দেবকীবাবুর "লাইফ ইজ এ ষ্টেজ" তোলার ব্যয় নির্ব্বাহ করতে নাকি এক রকম অবস্থা বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

আর্থকোয়েক দুর্ব্বোধ্য গল্প তা পূর্ব্বেই বলেছি। চিত্রনাট্যও ভাল হয় নি, অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ করা হয়েছে, স্থানে স্থানে সস্তা দরের ভাঁড়ামী দেখান হয়েছে—বৈচিত্রেরও অভাব নেই। সব কিছু

দেখাতে গিয়ে দেবকীবাবু 'আর্থকোয়েককে' জগাখিচুড়ীতে পরিণত করেছেন। গল্পের শেষ যে কেমন হল তাও বুঝলাম না—নায়িকা চলে পড়ল, বোধ হয় প্রাণবায়ু দেহ হতে বহির্গত হল—তারপর দেখি সেই প্রাণ বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি পরিভ্রমণ করে নদী তীরে থামলো—বোধ হয় তার গর্ভে বিশ্রাম লাভ করে নিশ্চিন্ত হল।

পরিচালনা হয়তঃ ভালই হয়েছে, কিন্তু 'পূরণ ভকত', 'সীতা' প্রভৃতির প্রয়োগ-শিল্পী তিনিই কি 'আর্থকোয়েকে'র প্রয়োগশিল্পী? সন্দেহ হয়।

রেকর্ডিং বিশ্রি—যদিও স্থানে স্থানে ভাল শব্দ ধ্বনিত হয়েছে। অতুল চ্যাটার্জ্জী এই শব্দ গ্রহণ করেছেন। আগাগোড়া মেটালিক শব্দ শ্রুত হয়েছে—সুখের বিষয় গানের শব্দ মোটামুটিভাবে ভাল হয়েছে বলা চলে। ফটোগ্রাফী যা দেখলাম তাকে বিশ্রি বলেই অভিহিত করা যায়—বেশীর ভাগ দৃশ্যেই পাত্র পাত্রীকে দেখা যায় নি। কৃষ্ণগোপালের কাজ হয়ত প্রশংসনীয়ই হয়েছে, কিন্তু আলোকচিত্র দেখে তা উপলব্ধি করবার সুযোগ কোথায়? সম্পাদনা প্রশংসার যোগ্য মোটেই নয়—অনাবশ্যকভাবে ছবি দীর্ঘ হয়ে গেছে। যে ছবিটী এখন প্রদর্শিত হচ্ছে—বোধ হয় সেখানা বিশ্রর জায়গায় দেখান হয়েছে—ফলে ওর মধ্যে কোন পদার্থ ই নেই। নতুন কপি হলে ফটোগ্রাফী হয়ত ভালই বলা যেত এবং রেকর্ডিংকে একেবারে বিশ্রি বলা যেত না। রাইচাঁদ বড়ালের আবহ-সঙ্গীত প্রশংসনীয়—গানের সুরও মন্দ নয়।

পৃথিরাজের অভিনয় ভাল লেগেছে। কৃষ্ণচন্দ্র দের অভিনয়াংশ প্রশংসার যোগ্য, গানগুলিরও প্রশংসা করা চলে। নবাবের অভিনয় আর ভাল লাগে না। যোগ্য ভূমিকাভাবে "ইহুদীকা লেড়কী"র প্রধান অভিনেতার কি অভিনয়ই না আমাদের দেখতে হচ্ছে। "মাসতুতো ভাই" নির্ম্মল বন্দোপাধ্যায় মিঃ ভাটরূপে হাসিয়েছেন বেশ। এইরূপ আরেকটী হাসির ভূমিকায় বিদায় আমাদের জালিয়েছেন। দেবকীবাবুর ছবিতে যে এরূপ ভাড়ামী স্থান পেতে পারে তা জানা ছিল না। দুর্গাবাই খোটে বয়সে তরুণী নন, নেমেছেন কিন্তু ওই শ্রেণীর এক ভূমিকায়। অভিনয় ও গান তার মন্দ হয় নি।

বিধ্বস্ত মুঙ্গেরের দৃশ্যগুলি অত্যন্ত মর্ম্মদাহক। ছবির মধ্যে এগুলি স্থান পাওয়াতে বিহার ভূমিকম্প সম্বন্ধে অতি সামান্য পরিমাণেও জ্ঞান লাভ হ'ল।

নন্দরাণীর সংসার

রঙ্গ-জগতের আরেকটী নির্ম্মম ঘটনা—রঙমহলে যোগেশচন্দ্রের নতুন সামাজিক করুণ রসাত্মক নাটক 'নন্দরাণীর সংসারের' আলেখ্য। রঙমহল ইদানিং দক্ষস্থ করেছেন 'চরিত্রহীন' 'সর্ব্বহারা'—তার পরেই 'নন্দরাণীর সংসার'। চরিত্রহীনের মত উপন্যাসও সমাদর লাভে সমর্থ হয় নি, কারণ নাট্যরূপ যোগ্য মত হয় নি এবং দু'একটী প্রধান চরিত্রের অভিনয়ও তেমন উচ্চ শ্রেণীর হয় নি। 'সর্ব্বহারা' যে রঙমহলকে সর্ব্বহারা করে ছাড়ে নি তাই যথেষ্ট। নন্দরাণীর সংসারের কথা শুনে ভেবেছিলাম—এবার বোধ হয় রঙমহল যোগ্য নাটক পেয়েছেন—অভিনেতৃ সঙ্ঘও এদের ভাল। সতু সেন আছেন প্রযোজক-রূপে—সুতরাং এখানা নিশ্চয়ই রঙমহলকে পূর্ব্বের ন্যায় লোভনীয় রঙ্গালয় করে তুলবে, কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল আলোচ্য নাটকখানা এমনই আধুনিক—যা দর্শককে পূর্ণ তৃপ্তি দানে সমর্থ হল না।

ঘটনাটী সহজ—কিন্তু আগ্রহোদ্দীপক নয়—একটা মানুষ সারাজীবন সংগ্রাম করে যা কিছু সঞ্চয় করেছিল তা নিমেষের মধ্যে কোথায় চলে যাবার উপক্রম হয়—যেন তাসের ঘর—যৌবনের প্রারম্ভে এক তরুণীকে প্রলুব্ধ করে—সন্তান সম্ভাবনায় তাকে পরিত্যাগ করে নিজে সংসারী হয়

তারই জননীকে বিবাহ করে। অনাথা রমণী সংসার ত্যাগ করে হরিদ্বারে এক আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করে—তারই সন্তানকে অনাথ আশ্রম হতে নিয়ে এসে পিতা তাকে খীয় সংসারে নিজ পুত্রের ন্যায়ই প্রতিপালন করেন—অবশ্য অন্য কেউই জানে না তার পরিচয়। মহিমারঞ্জনের সংসারে দুই কন্যা, রুগ্না স্ত্রী—জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বামী—ঘরজামাই। সংসারী সে, কিন্তু শান্তি নেই। বড় মেয়ে ও তার স্বামী মান অভিমান নিয়েই দিন কাটায়—কনিষ্ঠা শিক্ষিতা আধুনিক তরুণী। এই সময়ে সেই বিধবা সৌদামিনী এসে এ সংসারে হাজির হলেন—মহিমারঞ্জনকে বলেন—"আমার পুত্র কই"? মহিমারঞ্জন তাকে দুদিন অপেক্ষা করতে বলেন। এমনি সময়ে এ সংসারে আরেকটী ভবঘুরের আবির্ভাব হয়, দুদিন থাকতে এসে এই যুবকটী এখানেই স্থায়ী আস্তানা গেড়ে বসতে চান। তারপর নানারূপ ঘটনার মধ্য দিয়ে শেষে যেখানে পৌছোয় সেখানে দেখা যায়—রুগ্না পত্নী নন্দরাণী হার্টফেল করে মারা যান—সৌদামিনী তার পুত্রকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে যান—বড় কন্যা ও তেমনিভাবেই দিন কাটান—এবং ছোট মেয়ের সহিত ভবঘুরে যুবকটীর বিবাহ স্থির হয়। মহিমারঞ্জনের ব্যবসা নষ্ট হবার উপক্রম—এমনি সময়ে নন্দরাণীর মৃত্যুতেই যবনিকাপতন হয়।

পৌনে পাঁচঘণ্টা যাবৎ এর অভিনয় হয়—বিরাম সময়গুলি একটু সংক্ষিপ্ত করলে এ সময়কে চার ঘণ্টায় দাঁড় করান যায়, এবং এ হলে দর্শকগণও অনেকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন নিশ্চয়। ৪টী অঙ্ক—তন্মধ্যে ১ম ও ২য় অঙ্কে মাত্র একটী করে দৃশ্য, ৩য় অঙ্কে ৩টী ও ৪র্থ বা শেষ অঙ্কে ৪টী দৃশ্যে বিভক্ত। ঘটনাটী একটু জমে ওঠে তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে, কিন্তু তখনই সকল আগ্রহের অবসানও ওই দৃশ্যেই হয়ে যায়—মহিমারঞ্জনের দোষ মেনে নেওয়ায়। অনাবশ্যকভাবে তারপর বাড়ান হয়েছে। বিলাতী নাটকের ধারা আমাদের সমাজে চালাতে হলে তাকে যথাসাধ্য আমাদের

'গৃহদাহে' -- মলিনা ও যমুনা

সমাজোপযোগী করে নিতে হয়—যোগেশচন্দ্র বোধ হয় তা বিস্মৃত হয়েছেন। এতদিন প্রসিদ্ধ উপন্যাসগুলিকে নাট্যরূপ দিয়ে বরং তিনি সুনাম বজায় রেখেছিলেন কিন্তু মৌলিক নাট্যরচনায় তাও হারাতে বসেছেন। নন্দরাণীর মৃত্যুর পরও মহিমারঞ্জনকে দিয়ে অতক্ষণ বক্তৃতা দেওয়ার সার্থকতা কোথায়?

প্রযোজনায় সন্তু সেন বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দৃশ্যপট অতি সুন্দর নয়নাভিরাম হয়েছে। আলোকক্ষেপণও সুন্দর হয়েছে।

সুরশিল্পী নজরুলের প্রশংসা করতে পারলাম না—মাত্র একটী গানের সুরের প্রশংসা করি প্রাণখুলে, ওই গানখানা গেয়েছেন তারাকুমার ভট্টাচার্য্য। গায়কের সুকণ্ঠের ও গাইবার প্রণালীর প্রশংসা করি। বাথার গান দুখানার সুরও মন্দ নয় যদিও বালিকা অভিনেত্রী রাণী তেমন শ্রুতিমধুর করে গাইতে পারে নি।

নহিমারঞ্জনের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। জীবন গাঙ্গুলীর বিকাশেরও প্রশংসা করি। রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে মতিলালরূপে প্রথমে বেশ লেগেছিল, তার পর বড় একঘেয়ে বোধ হল। বিজয়ের ভূমিকায় মোটেই কিছু নেই। অভিনেতা নীরাজ ভট্টাচার্য্য যথাসাধ্য তাকে ভালভাবেই রূপ দিয়েছেন। অন্যান্য ছোট অংশগুলির মধ্যে গগন চট্টোর রাজেশ্বর, হীরালাল চট্টোর গুরুচরণ ও কালীপদ বসুর অভিনয় ভাল লেগেছে। গগন বাবু বেশ ধাপে ধাপে উন্নতি করছেন দেখে খুসী হয়েছি।

সব চেয়ে আনন্দ দিয়েছে জ্যোৎস্না—অভিনেত্রী শান্তি গুপ্তা এবার সত্যিই প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। তার গানখানাও মন্দ লাগল না। পূর্ণিমার ভূমিকায় পুতুলকে তেমন প্রশংসা করা যায় না—অবশ্য তার ভূমিকায় বিশেষ কিছু নেই-ও। প্রভার সৌদামিনী চরিত্রোচিত হয়েছে, এ শ্রেণীর ভূমিকাতেই তার এখন নামা উচিৎ। আসমানতারার নন্দরাণী মন্দ নয়, ভালই বলা চলে। অন্যান্য ক্ষুদ্রাংশে পদ্মাবতী (শরৎশশী) সুশীলাবালা (হিন্দুবাসিনী), গিরিবালা (পাঁচীর মা), বীণা (পাঁচকড়ি) চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন। পদ্মাবতীর গানটা বাদ দিলেই সবাই খুসী হবেন। নাট্যকার স্বয়ং নেমেছেন জমিদার পরেশ চৌধুরীর ভূমিকায়। তার অভিনয় প্রশংসনীয়, যেমন বরাবর হয় তেমনি হয়েছে।

চিত্রায় 'মডার্ণ টাইমস্'

এই শনিবার থেকে চার্লি চ্যাপলিনের বহু প্রতীক্ষিত 'মডার্ণ টাইমস্' চিত্রায় আসছে। প্রায় দুই বছর ধরে ছবিখানি নির্ম্মিত হয়েছে এবং চার্লির পূর্ব্বের ছবিগুলির চেয়েও এখানি হয়েছে মনোরম। মডার্ণ টাইমস্-এ ডায়োলোক নেই। তবে শব্দ যা আছে, তা আপনাকে মুগ্ধ করবে। এই ছবিতে চার্লি একটি বড় সহরে ফ্যাক্টরী-কর্ম্মীর ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন—এবং নানাভাবের অভিনয় তাঁকে করতে হয়েছে। ছবির গল্প চার্লিই লিখেছেন এবং সঙ্গীত সংযোজনাও, তারই পরিচালনাও তিনিই করেছেন। সুতরাং চিত্ররসিকরা ছবিখানি যে আকুল আগ্রহে দেখবার জন্য ছুটবেন এতে সন্দেহ নেই। তার সঙ্গে অভিনয় করেছেন পলেট গডার্ড। চিত্রার পরবর্ত্তী আকর্ষণ 'গৃহদাহ'।

আলিবাবা

পাঠকগণ স্বদেশের পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় জানতে পেরেছেন যে 'আলিবাবা' ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিয়োতে চিত্রে রূপ পাচ্ছে। সি, এ, পি এই নৃত্যগীতবহুল নাটকখানির শ্রীযুত মধু বসুর পরিচালনায় বহুবার সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চাভিনয় করেছেন। সি, এ, পির প্রযোজনায় যে অভিনয় হয়েছিল, তাতে অভিজাত ঘরের মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ভারতলক্ষ্মী যে ছবি তুলছেন, তাতেও প্রায় সেই সব আর্টিষ্টই অংশ গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সাধনা বসু, মিসেস্ জি, এল রায়, মিসেস্ মিলি মুখার্জ্জি, মিঃ কমল বিশ্বাস, মিঃ মধু বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। মিঃ মধু বসুই ছবিখানির পরিচালনা করছেন।

বাঙ্গালী

উত্তরায় এই শনিবার থেকে শ্রীভারতলক্ষ্মীর 'বাঙ্গালী' চতুর্থ সপ্তাহে পদার্পণ করলো। ছবিখানি প্রতি শোতে খুব দর্শক আকর্ষণ করছে। এতেই বোঝা যায়, ছবিখানি বাঙ্গালী-চিত্ত স্পর্শ করেছে। 'বাঙ্গালী' মঞ্চসাফল্যমণ্ডিত নাটক। শ্রীযুক্ত চারু রায় সেই নাটকখানিকে যে রূপ দান করেছেন, তাতে তিনি প্রশংসা দাবী করতে পারেন। বাঙ্গালীতে সবাই ভাল অভিনয় করেছেন। বিশেষ করে মনোরঞ্জন বাবুর অভিনয় দেখলে মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তুলসী বাবুর অভিনয়ও দর্শকদের বেশ আনন্দ দিয়েছে। বাঙ্গালী বহু সপ্তাহ ধরে উত্তরা অধিকার করে থাকবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

ইষ্ট ইণ্ডিয়ার 'সোনার সংসারের' চিত্রগ্রহণ বেশ দ্রুতগতিতে চলছে। অহীন্দ্র চৌধুরী এই ছবিতে নতুন রূপে দেখা দেবেন।

রূপবাণী

শনিবার ৫ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ সুরু হবে—তাই হবে দেবদত্ত ফিল্মসের রজনীর শেষ সপ্তাহ।

এর পর "রজনী"কে পাওয়া হয়তো কষ্ট সাধ্য হতে পারে, তাই যথাসময়ে দেখে নেয়া ভাল। রূপবাণীর পরবর্ত্তী চিত্র মেট্রোর রবিনহুড্ অফ্ এল ডোরাডো।

নীল পাখী

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

আজ খুব ভোর বেলায় বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। অন্ধকারের ছায়া তখন ধীরে ধীরে নিশ্রান্ত, অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। আকাশ, চাঁদ আর তারা— মুমূর্ষু, পানসে! উষা সভয়ে চাঁদের পাণ্ডু আভা, অসীম আকাশের তপস্যাস্তব্ধ বিশাল উন্মোচন— যেমনি ক্ষণিক, তেমনি অলীক। এই প্রায়ান্ধকার স্তব্ধতা কেমন যেন মাধুর্য্য ভরা নয় কি? কি সুন্দর আলো ছায়ার সম্মেলন। সে আলোর সঙ্গে যেন অন্ধকারের কোন বিরোধ নেই। আলো অন্ধকারে মিলে একটি তরল অপরূপ স্পষ্টতার সৃষ্টি করেছে।

শিউলি ঝরা আশ্বিনের সকাল। মেঘ মুক্ত আকাশ - আকাশের নীল ক্রমে আরো উজ্জ্বল, স্বচ্ছ হয়ে আসছে। সদর রাস্তার বড় কৃষ্ণচূড়া গাছটি ফুলে ফুলে লাল হয়ে এসেছে। ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। আর বাসি ফুলের পাপড়িগুলো ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ছে। কুয়াসার চসমা কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

একটি পাখী, পিঞ্জরাবদ্ধ নীল পাখীটি বারান্দায় বাঁশের আলনায় ঝুলানো রয়েছে। সে ঝিমোচ্ছে ঘুমের জড়িমায়, তন্দ্রাতুর বিহ্বল আলস্যে। ঈষৎ ফুলে আছে তার গায়ের নরম হালকা পালকগুলো। গোটাকতক পালক পুচ্ছ থেকে খসে পড়েছে। ঝিরঝিরে শীর্ণ তার অবয়ব। কেমন একটা ক্লিষ্ট বিষণ্ণতা তার শরীরময়। যেন কোন দূর বনে অস্তগামী সূর্য্যের মত – তা করুণ মনে হতে লাগলো। জীবনের স্বাদ বুঝি সে ভুলে গেছে, কবে — কবে, কোন দিন।

সহসা একটি গীত চঞ্চল পাখী উড়ে গেলো আমার সমুখ দিয়ে, অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়। তির্য্যক গতিতে মুহূর্ত্তে মিলিয়ে গেলো কোনখানে ভোরের শুক্তির মতো নীলাভ স্বচ্ছ বায়ু-মণ্ডলে।

আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতো খাঁচার পাখীটিও উঠলো চমকে, শিউরে – জেগে উঠলো তার মধ্যে অফুরন্ত প্রাণ

বিচিত্রা

বোষ্টন সহরের জর্জার একিয়েন নামে এক ভদ্রলোক সতেরো সেকেণ্ডের মধ্যে আধ গ্যালন বীয়ার মদ্য পানে নিঃশেষ করিয়াছেন। আর এক ভদ্রলোক—রেমণ্ড দেণ্ডাল আধ গ্যালন বীয়ার পান করিতে ১৯ সেকেণ্ড সময় ব্যয় করিয়াছেন।

—

নিউইয়র্কে ট্রাফিক স্কুল খোলা হইয়াছে। মোটর চালকের দলে যাঁরা পথের আইন অমান্য করিবেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাদের এই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ট্রাফিক আইনকানুন শিখিতে হইবে শাস্তি স্বরূপ, এমনি ব্যবস্থা হইয়াছে।

—

মাদাম জুগা ফরাসী বিধবা—বয়স ১০০ বৎসর। সম্প্রতি ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তাঁকে মেডেল দিয়াছেন—মিলিটারী মেডেল—বিগত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যে যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধে মাদাম সংবাদ কার্য্যে সহযোগিতা করিয়াছিলেন, সে কাজের তারিফ করিয়া এ মেডেল তাঁকে দেওয়া হয়।

—

কিম্বার্লি সহরে এক ভদ্রলোক ইঁদুরের দৌরাত্ম্যে উদ্ব্যস্ত হইয়া সাপ পুষিয়াছেন। সাপটিকে সারাদিন তিনি রাখেন বাক্সে বন্ধ করিয়া,—রাত্রে তাকে ছাড়িয়া দেন। সারারাত সাপ বাড়ীর যত ইঁদুর ধরিয়া বেড়ায়; এমন পোষ মানিয়াছে, ভোরের বেলায় মালিকের কাছে আসিয়া তাঁর হাতের পেয়ালা হইতে দুগ্ধ পান করে; পানান্তে বাক্সে গিয়া প্রবেশ করে।

—

ষ্টকহলমের কাছে লোভো দ্বীপ। এই দ্বীপে খোলা হইয়াছে রোগার্ত মৎস্য জাতির জন্য হাসপাতাল। রোগী আসে বহু নানা দিগ্দেশ হইতে। বিদেশ হইতে যে সব মাছ আসে, তারা আসে ডাকযোগে। মৎস্য চিকিৎসকেরা রোগ নির্ণয় করেন এবং যে সব জলাশয় হইতে রোগী মৎস্য আসে, সে সব জলাশয়ের অধ্যক্ষগণকে উপদেশ ব্যবস্থাদি দেন।

—

আগষ্ট মাস এখন বছরের অষ্টম মাস। কিন্তু প্রাচীন রোমান পঞ্জিকাতে এটি ছিল ষষ্ঠ মাস। তখন আগষ্ট মাস ছিল ২৯ দিন লইয়া। জুলিয়াস সীজার আগষ্ট মাসকে ত্রিশ দিনে সম্পূর্ণ করিয়া দেন। তারপর রোমান রাজা আগষ্টাস আগষ্ট মাসকে আর একটি দিন উপহার দিয়া ৩১ দিনে মাস পূর্ণ করিলেন। এ দিনটি তিনি লন ফেব্রুয়ারি মাস হইতে ছিনাইয়া। রাজা অগষ্টাস এ মাসের নাম দেন অগষ্ট—পূর্ব্বে অগষ্ট মাসের নাম ছিল সেক্‌সটাইল।

—

বিলাতে টেম্‌স নদীর তল দিয়া ডার্টফোর্ড হইতে পারফ্লীট পর্য্যন্ত যে নূতন টানেল তৈয়ার হইতেছে,—সে টানেলে বিশ ফুট চওড়া পথ স্বতন্ত্র রাখা হইবে—সে পথে গাড়ী চলিবে। এই টানেলটী জলের বুকে আশী ফুট নীচে তৈয়ার হইতেছে। টানেলটি তৈয়ার করিতে ব্যয় পড়িবে সাড়ে তিন লক্ষ পাউণ্ড। এই টানেলটি তৈয়ার হইলে আশপাশের পথে গাড়ীর ভিড় কমিবে—এসেক্স ও কেণ্ট—এ দুই প্রদেশের মধ্যে পঁয়ত্রিশ মাইল ব্যাপিয়া—ফেরি নৌকা ছাড়া নদী পারাপার হইবার অন্য উপায় নাই। টানেলটি এ অভাব দূর করিবে। জলের নীচে তখন মোটর গাড়ী চলিবে।

চাঞ্চল্য প্রবণতা, সঞ্জীবিত হয়ে উঠল নবস্মৃতি গুঞ্জন মুখর আনন্দে সে।

কিন্তু পরক্ষণেই সে শান্ত সংযত, অচঞ্চল। চোখে তার অরণ্যের ভাষা, উদার আকাশের সীমাহীন মুক্তি, অপূর্ব বর্ণ বৈচিত্র্যে দিগন্তের কান্ত ধূসরিমা, বর্ষা সজল বাদল দিনের ছল ছলানি।······

এই দীর্ঘ দিনের ব্যবধানের পরও পাখীটি তার স্বকীয়তা ভুলে যেতে পারে নি। এই আকাশ, এই আলো, কানন কুন্তলা নদী মেখলা এই প্রকৃতির মহিমময় সৌন্দর্য্যের মায়া আজো ভুলে যায় নি সে। এখনো তার জীবন শিয়রে বসে স্বপ্ন দোলা দিচ্ছে, মর্ম্মের বাসনাগুলো উঁকি মারছে তার চোখে। *

* টুর্গেনিভ।
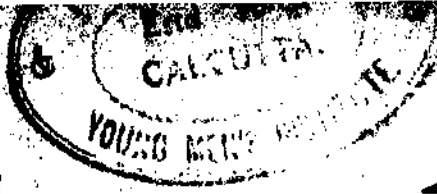
সচিত্র সাপ্তাহিক

দ্বিতীয় বর্ষ—৩২শ সংখ্যা

শুক্রবার—২রা আশ্বিন

১৩৪৩

১৮ই সেপ্টেম্বর—১৯৩৬

শরৎচন্দ্র

শরৎকাল সমাগত। ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের আবরণ চিরে 'দীর্ঘ বরষ পরে' সুন্দরী 'ষোড়শী'র মত স্নিগ্ধ-উদার নীলিমার দৃষ্টি আজ করছে ধরণীর মুখচুম্বন। হাসছে কানন, ফুল হয়ে দিকে দিকে তার আনন্দ-সৌরভ বাষ্পের মত, প্রেমের মত পড়ছে ছড়িয়ে। আর সেই ছড়ানো আনন্দের শিহরণে শিহরণে,বাতাসের উপর ভর দিয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে শত শত আত্মভোলা মধুপের দল, ফুলের বনে বসেছে প্রজাপতির হাট, কুসুমের বুকে মুখে ভ্রমরের গুঞ্জনধ্বনি রেণুর রঙে উঠেছে রঙিন হয়ে, মধুর হয়ে, স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে যেন তারই মাঝে প্রিয়তমের আহ্বান! বিভিন্ন রঙের বৈচিত্র্যময়ী বিহগকূজনে বাজছে যেন কোন্ স্বপ্নপুরীর তোরণদ্বারে মিলন-বাসরের অন্তর-বিনিময়ী সুমধুর রাগিনী, লতায়-পাতায়, বনের মর্মরে যেন কোন্ মূর্চ্ছাতুর মুহূর্ত্তের চলেছে এক সই পাতানো নিরাড়ম্বর অনুষ্ঠান!

সুরে বাঁধা ধরণীর এই প্রভাতী লগ্ন ক্রমে যখন গোধূলির ম্লানিমায় ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে আসবে, ক্রমে যখন সন্ধ্যার নিবিড় আলিঙ্গনে পড়বে 'শরৎচন্দ্রের' সোনালি চোখের প্রাণ-মাতানো দৃষ্টি, মন-মাতানো স্পর্শে হবে সঞ্জীবিত—আঃ, শরতের এই মধু যামিনীর অকালবোধনে না জানি তখন কোন্ সোনার কাঠির ইঙ্গিৎ যাবে বিদ্যুতের মত ঝলসে, রূপকুমার আর রূপকুমারীর নিভৃত কোণে এসে পৌঁছবে অমরাবতীর পারিজাত গন্ধ—যাবে দেওয়া-নেওয়ার আকুল অধীর ছোঁয়া দিয়ে!

আজ শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি। প্রকৃতির শরৎচন্দ্র আর সাহিত্যাকাশের 'শরৎচন্দ্রে' আজ কোলাকুলি। সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্রের জন্মলগ্নের এই অভূতপূর্ব্ব যোগাযোগ, আমাদের সাহিত্যে নিবিড়তম রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের অভাবনীয়তায় যে মধুর ও নির্ম্মম সৃষ্টি অন্তর প্রদেশে তুলেছে আলোড়ন, এর তুলনা নেই, যেমন নাকি কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে সহস্র সহস্র তারকাবেষ্টিত মহাকাশে শরৎচন্দ্রের নেই তুলনা। কবির ভাষায়— "তোমার তুলনা তুমি!"

ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি লাভে* শরৎচন্দ্রের সম্মান, আমাদেরও সম্মান, জাতির সম্মান। কিন্তু জানিনে, ধরণীর এই সম্মানে শরৎ-প্রতিভার যোগ্যতা রক্ষায় কতোটা সমর্থ আমরা হয়েছি! কিন্তু জাতির অন্তরে শরৎচন্দ্রের যে আসন মনের অগোচরেই হয়ে গেছে পাতা, আমরা সেই সম্মানের সশ্রদ্ধ অভিবাদনেই আজ তাঁর শুভ জন্মলগ্নের সফলতা করি কামনা। আর শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই, শরৎচন্দ্র দীর্ঘজীবন লাভ করুন।

* ৩১শে ভাদ্র বুধবার শরৎচন্দ্রের ৬১তম জন্মদিনে।

চাতিম চাতিম

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

"স্বভাবো মুষ্টি বর্ত্ততে"—এর ভাবার্থ এই যে, প্রকৃতি আমাদের চুলের টিকি ধরে ঘোরাচ্ছেন এবং পাঠশালার গুরুমশাইয়ের মত যদৃচ্ছা উঠবোস করাচ্ছেন। বড় পুরাতন কথা,—সেই সত্ত্ব রজ তমঃ তিন গুণের খেলা চলেছে মানুষ ও জীবজন্তুকে নিয়ে ভবের মজাদার রঙ্গমঞ্চে। এই যে প্রকৃতির ইঙ্গিৎ—সত্ত্ব রজ তমের প্রেরণা, এ ঠেলা আসছে আমাদের মগজের 'গ্রে ম্যাটার' চুইয়ে, তাই আমরা স্বভাবের এই তাড়নাকে টের পাচ্ছি না। 'ত্রিসফুল ইগমোরেন্স'-এর পরম পুলকে আমরা ভাবছি যে, আমরাই কর্ত্তা, দুনিয়াটা আমাদের পদতলের বর্ত্তুল, যদৃচ্ছা কিক্ করলেই যথাশাস্ত্র গোলে পৌছে যাবে।

* *

এই অহং বাবাজীউর উস্‌কানীতে আমরা প্রকৃতির প্রেরণার সমস্ত ক্রেডিটটুকু বেমালুম আত্মসাৎ করে বসে থাকি। নব যুগের বিংশ শতাব্দীর চেঙ্গিস্ খাঁ—হিটলার সাহেব তাঁর গোঁয়ার প্রকৃতির তাড়নায় মানুষের ও জাতির মাথা হাতে কাটেন, আর সমস্তটারই বাহবা নেন নিজে। তার সে রঙ্গমঞ্চের ভীমসেনী পাঁয়তাড়া দেখে হাসা রাখা দায় হয়। আমাদের এই পোড়া দেশেও সেই একই হাল। আমার সাত্ত্বিক প্রকৃতির বশে আমি বক্তৃতা মঞ্চে মাস্-এর দুঃখে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদি, জমিদার ও মহাজন এবং ধনিককে প্রাণভরে শ'কার ব'কার করি; কিন্তু আমার তিনখানা জমকালো মোটর সাততলা বাড়ী ও বিলাস বিভব আমি ছাড়তে পারি না। আমরা বুদ্ধিতে স্বাধীন, কিন্তু স্বভাবে প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক।

* *

যৌবনে যিনি তাজা রক্তের তাড়নায় বোমাবাজী করেছিলেন, বার্দ্ধক্যের ঠাণ্ডা রক্তের বশে এবং হিসাব বুদ্ধির ফেরে তিনি আজ শান্তি দেবতার বাহন। এই ত্রিগুণের হাতের দড়ি-বাঁধা বানর মানব জাতির কল্যাণ করবে কি করে? নানান প্রকৃতির বানরের নিত্য দাপাদাপির ও লম্ফঝম্পের ফলে তবু যে দুনিয়ায় কিঞ্চিৎ কল্যাণ হয় এইটিই হচ্ছে পরম আশ্চর্য্য ব্যাপার—এই জন্য ভারতের উজ্জ্বল যুগে রাষ্ট্রের ও মানব কল্যাণের চাকাটি দেওয়া হয়েছিল ত্রিগুণাতীত মহাজনের হাতে; যিনি আত্মজয়ী হয়ে কামনার উর্দ্ধে উঠেছেন—"বসুধৈব কুটুম্বকম্" বোধে। আজ আর সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই; আজ য়ুরোপের পেটকাওয়াস্তে ঔদরিক সভ্যতারই সর্ব্বত্র চলেছে জয়-যাত্রা; ভারত প্রাণপণে চেষ্টা করছে সেই রূপী আনা পাই-এর অর্থকরী সভ্যতার একটি নকল বটতলার এডিশন গড়তে। "ঘ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খল্‌সে বুড়ী বলে আমিও যাই"—

* *

বৈষম্যই সৃষ্টির মূল, একথা সত্য। কিন্তু সেই বৈষম্য যার ফলে চরমে ওঠে সে সভ্যতা কখন কল্যাণের পথ নয়। ধনীর ধনের অনুপাতে দরিদ্রের ক্ষুধা চলেছে চক্র-বৃদ্ধির হারে বেড়ে, এ দৃশ্য পশ্চিমের

পরস্বত্ব শোষী বণিক সভ্যতাই [illegible]ছে। এখন সারা য়ুরোপ জুড়ে চলেছে [illegible] সংশোধনের পালা। উৎকট ব্যাধির উৎকট দাওয়াই, তাই পশ্চিমে এসেছে সাম্যবাদের প্রবল প্রতিক্রিয়া। তাই বলেই ভক্ত গরুড়ের মত আমাদেরও তারই পুনরাবৃত্তি করতে হবে এর কোনও কারণ নাই। এখানে সবাই অল্পবিত্তর দরিদ্র নারায়ণ, ভারতের সমস্যা তাই দরিদ্রের সমস্যা, অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা, মৃতকল্প কৃষি-বাণিজ্য শিল্পকলাকে প্রাণ দেবার সমস্যা। যন্ত্র দানবের মহা জটিল পণ্যশালা—য়ুরোপের ব্যাধির সেই পেটেন্ট দাওয়াই ভারতের অনশন ও ম্যালেরিয়াগ্রস্তের জীর্ণ পাঁজরে ঢাললে এ মড়া কি জীবন পাবে?

*　　*

যার ধন নাই তার ধন সাম্যের কথা ওঠে কোথা থেকে? যাদের জীবনের কোন ক্ষেত্রে কোনও প্রতিষ্ঠানই গড়া হয় নি, সে ভেঙে মাঠসই করবে কি? দু'চার জন রাজা মহারাজা দু' পাঁচটি টাটা ও বিড়লা যে দেশের কোটী কোটী নিরন্নের মাঝে এরণ্ডোপি দ্রুমায়তে, সেখানে সাম্যবাদের ষ্টীমরোলার কাকে পিষে মাঠসই করবে? আমাদের কাঙাল দেশের কেরাণী, উকিল, ডাক্তার, মোক্তারকুল ঐ দরিদ্র নারায়ণ বা কাঙালেরই তো রাজকীয় সংস্করণ; তাদের বধ করে তবে এই আসিন্ধু হিমাচল কাঙালী ভোজনের পরিপাট্য বাড়বে, এই তুচ্ছের জীবগুলিকে হাতে ও ভাতে না মারতে পারলে কাঙালের কাঙালীত্ব ঘুচবে না, এ কথা বিশ্বাস করা বড় শক্ত।

*　　*

সাধে বলি বাঙালীর বাঙালীত্ব কলা-

[illegible] পেয়ে গেছে, তার প্রাণী[illegible] একে-বারে কৈবল্য ধাপে ইস্ক্রুপ [illegible] মেরে [illegible] বাংলা দেশের নাড়ীর খবর, ভারতবর্ষের মর্ম্ম কথাটা কি—তার হদিস এই বিজাতীয় জাতীয়তায় মানুষ বুঝবে কি করে? হিটলার বড় হয় জার্ম্মাণীর ধারা ধরে, রুশ বড় হয় রুষের জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখে তার সংশোধনের উপায় আবিষ্কার করে। কই তারা তো বাংলা দেশ বা মাদ্রাজের দরজায় এসে বাঙালী বা মাদ্রাজী কুলগুরুর জন্যে ধর্ণা দেয় না! অথচ আমাদের বড় বড় নেতারা মনে প্রাণে এমনই কাঙাল যে পশ্চিমের কাছে ধার করা বুলিই তাঁদের

ইক টন্ ট্রেড, তাঁরা বটতলা এডিশন কম্যুনিষ্ট, তাঁরা কালীঘাটের পটোর হাতের কিম্ভূতকিমাকার ফ্যাসিষ্ট, তাঁরা রাজ-নীতিতে চূণাগলির টেঁসু জাতীয় আশ-নালিষ্ট। একমাত্র মহাত্মাজীই ভারতের, কারণ তাঁর লেংটি খালি পা, ফলমূল আহার সবই ভারতের; তাই তাঁর নিজস্ব কিছু দেবার আছে সে হচ্ছে রাজনীতিতে অহিংসবাদ। সেটা যতই আজগুবি হোক খাঁটি স্বদেশী মাল বটে, মস্কো বা বার্লিনের ট্রেড মার্ক তার পাছায় দাগা হয় নি!

———

চাকুম-চুকুম

পঞ্চমুখ শর্ম্মা

'প্রতিভা' নেহাৎ গ্রাম্য হইলেও, তাহাতে একযোগে 'নানান রকম' দেখিয়া উহা যে সহরে হইতে এক ইঞ্চিও কম নহে—তাহা বলিতেই হইবে। কারণ শ্রীঅবনী কুমার চট্টোপাধ্যায় কয়লার ডিপো হইতে যে উপাদেয় উনানের সামগ্রী উপ-হার দিয়াছেন, এই দারুণ বর্ষাকালে জলে-ভেজা ঘুঁটে আর জল-মেশানো কেরোসিন ছাড়াও পল্লী পিসী তাহা দিয়া অনায়াসেই উনান ধরাইয়া ফেলিবে। যেহেতু সহরে হইতে হইলে তাহার মধ্যে যে যে-গুণ থাকা দরকার, তাহা হইতেছে—

"নেপালের আর কিছু থাক আর না থাক, মুখ আছে! তাই মেয়ে মহলে তাকে নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়। তার ওপর নেপালের আরো গুণ আছে। সে গান গাইবার সময় চেঁচায় না—টেনিস খেলতে পারে—মেয়েদের সঙ্গে চ্যারিটী পারফরমেন্সে অভিনয় করে (এইটি বিশেষ গুণ!)—বৌকে নিয়ে বড় বড় আরিষ্টো-ক্রাটিক (?) বাড়ীতে সান্ধ্য ভ্রমণে যায়—চায়ে কম চিনি খায় ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কোয়ালিফিকেশন আছে যা একটা যে সে চেহারার যে সে অবস্থায় যে সে মানুষকে (বটে!) এই বিংশ শতাব্দীতে একজন বিশিষ্ট মানুষ কোরে তুলতে পারে।"

কিন্তু এহেন নেপালও যখন বংশীকে বলিল—

"বাঃ বংশীদা, তুমি দেখচি কবি হোয়ে পড়লে! আর হবেই বা না কেন? যে বৌদি পেয়েচো!"

তখন কি মনে করিতে হইবে যে বংশীদা নেপালের চেয়েও অধিকতর ঘুঘু? কিন্তু সত্য সত্যই যে তাহা নহে, তাহা নেপালের কথার পরক্ষণেই বুঝা যাইতেছে। নেপাল বলিতেছে—

"কিন্তু বংশীদা, একটু গলদ করে ফেলেচো। পুরুষদের বেলায় দাড়ি ও ফেডস ঠিক প্রেমের আধার নয়। তার বদলে টেনিশ র‍্যাকেট, ঢলঢলে পাঞ্জাবী, মুণ্ডিত মুখমণ্ডল, রিমলেশ চশমা, ভ্যারমুথ, এই সবই প্রেমের আধার বলতে পারো। অর্থাৎ চেহারাটা যতদূর সম্ভব ফেমিনাইন করবার বৃথা চেষ্টাই হচ্ছে প্রেমিক হবার উপলক্ষ।"

চাটুয্যে মশাই হয়তো জানেন না, কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক সাহিত্য-রসিকা উক্ত মুণ্ডিত মুখকেই 'আলুর মত মুণ্ডিত মুখ' বলিয়া নাসিকাকুঞ্চন করিয়াছিলেন? আর যাহাই হউক না কেন, অতঃপর আলুমুখো মিন্‌সেদের দেখিয়া মেয়েরা যে ভুলিবে না—ইহা বেদ বাক্য। হায় চাটুয্যে মশায়!

তবে যাঁহারা 'বিশিষ্ট মানুষ' হইতে চাহেন, চাটুয্যে মহাশয় তাঁহাদের যে বিশেষ-কার্য্যে লাগিয়া যাইবেন—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতেছি!

• • •

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র মৈত্র যে একজন নিষ্ঠাবান 'হিন্দু' তাহার পরিচয় পাইলাম। এই জন্য পাইলাম, তিনি সমাজে পণপ্রথার দুষ্টতা দেখিয়া ব্যথা পাইতেছেন। শুধু ব্যথা পাইয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই, কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধও হইয়াছেন। তাই যখন বলিতেছেন—

"সহানুভূতি দেখাইয়া শব্দবিন্যাসের দ্বারা যিনি যতই ব্যথিত হইবার নিদর্শন প্রকাশ করুন না কেন,—সমাজের পক্ষে ইহা একটি প্রকৃতই দুষ্টব্যাধি এবং এপিডেমিক (?) ভাবেই উহা বিস্তার পাইয়া যাইতেছে। ইহা সকলেই দেখিতেছেন, কিন্তু তাহার নিবারণ বা তাহার প্রতিবন্ধকের উপায় নিরূপণে যাঁহারা ব্যস্ততা দেখাইয়া থাকেন তাঁহাদের প্রকৃত সহানুভূতিপূর্ণ পর্য্যবেক্ষণমূলক দৃষ্টি যে কতদূরে রহিয়াছে তাহা সত্যই ভাবিবার বিষয়।"

ইহা খাঁটি কথা। কিন্তু ডাক্তার সাহেবও দেখিতেছি 'সহানুভূতি দেখাইয়া শব্দবিন্যাসের দ্বারা'ই কার্য্য হাঁসিল করিয়াছেন। শুনিয়াছি রোগচিনিতে পারিলে হোমিওপ্যাথির একফোঁটাতেই কর্ম্ম ফতে হইতে পারে! ডাক্তার সাহেব এতবড় একটা 'এপিডেমিক'এর খবর পাইয়া, এবং তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া নেহাৎ অর্দ্ধফোঁটাও যখন ব্যবহার করিতে সাহস পাইলেন না, তখন তাঁহারও 'সহানুভূতি' আর 'শব্দবিন্যাসই' বা কতটা ক্রিয়া করিবে? তবে তিনি যে লিখিয়াছেন—

"হিন্দু সমাজের সংস্থিতির পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে আর্য্য ঋষিগণ প্রণীত ব্যবস্থা অনুযায়ী স্বগোত্রে বিবাহ হইতে পারে না, অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ এবং বিধবা-বিবাহের প্রচলন নাই।"

ইহার উত্তরে তাঁহাকে একবার 'বর্ত্তমান'-এর দিকে নজর দিতে বলি। তাহা হইলেই সমস্যার সমাধান, এবং অচিরেই!

• • •

'বর্ত্তমান'-এ (২১শ সংখ্যা) 'সগোত্র বিবাহে দুষ্টতা নাই, দেখিয়া চাটুয্যে মশাইকে তারিফ দিতে হইতেছে। সগোত্র বিবাহ তো দূরের কথা, ইনি যৌনতত্ত্বে যে নিগূঢ় সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, মহর্ষি বাৎস্যায়নের পরে আর কাহাকেও এতদূর অগ্রসর হইতে দেখা যায় নাই। যেহেতু ডাঃ কিং দুই জোড়া ইঁদুর দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন—
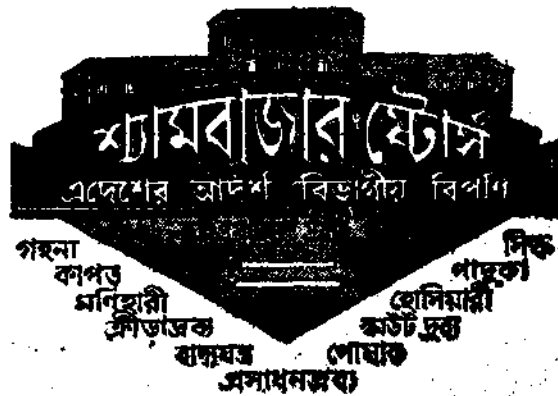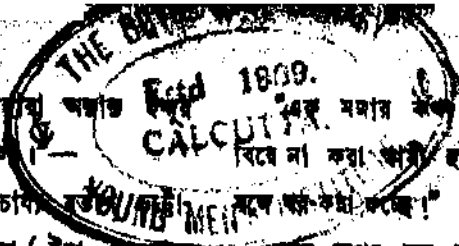
"ভ্রাতা ভগ্নীর যৌন মিলনের ফলে যে

ইঁদুরের সৃষ্টি হয় তাহারা অজাত ইঁদুর [illegible] হইতে অনেক শক্তিশালী।—

সেই হেতু যৌনাচার্য্য [illegible] পাধ্যায় নিজ অভিজ্ঞতা (ইহা একেবারে প্রত্যক্ষ!) হইতে বলিতেছেন—

"আমি নিজে (?) হাঁস, কবুতর এবং কুকুর দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এক গর্ভজাত ভ্রাতা ভগ্নীর যৌন মিলনের ফলে যে কুকুর হাঁস এবং কবুতরের সৃষ্টি হইয়াছে তাহারা খুব সম্ভব সম্পর্কহীন কুকুর, হাঁস এবং কবুতর জোড়া দ্বারা উৎপাদিত জীব হইতে অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও বলিষ্ঠ।"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যাহা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তাহা আমরা অস্বীকার করিবার সাহস না রাখিলেও, ঐরূপ নিশ্চিত ব্যাপারেও তিনি আবার 'খুব সম্ভব' বলিয়া সংশয়ের ফাঁক কেন রাখিয়া দিলেন— জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে! এখনও সন্দেহ?

তথাপিও চাটুয্যে মশায় যখন বলিতেছেন—

"আমার বোন কিম্বা কোন ঘনিষ্ঠা আত্মীয়া অথবা কোন পরিচিতাকে দেখিলে আমি বিশেষ লক্ষ্য করি না, কিন্তু যখন একজন অপরিচিতা কিম্বা অর্দ্ধ পরিচিতা যুবতী আমার পাশ দিয়া যায় তখন আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠে কেন?"—

তখন তাঁহার দুঃখে কুকুর, হাঁস এবং কবুতর জোড়া ক্রন্দন করিয়াছিল কিনা আমাদের জানা নাই, তবে একজোড়া রামপাখী আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল! কারণ প্রবোধ সরকার ও বংশলোচন কবিরাজকে পরে পরেই দেখিতে পাওয়া গেল! একদল তাঁহার নায়কের আত্মার অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নায়িকাকে বলিতেছে—

"এই মশায় [illegible], শুনেছ সুমিত্রা! বিয়ে না করা আমি হ'লেও কত পরির মনে [illegible] করছে!"

[illegible] আর অপর জন অর্থাৎ বংশলোচন বলিতেছেন—

"অসাহিত্যিক মানুষ কবিরাজী করে খাই। বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত, অশ্বগন্ধারিষ্ট, হরিমটর বটিকা, নন্দগোপাল তৈল এইসব বেচে কোন রকমে সংসার করে থাকি। বাড়ীতে সালঙ্কারা গৃহিণী আছেন, ছেলে আছে, মেয়ে আছে, বিধবা বোন (?) আছে, অবিবাহিত ষোড়শী শালী (বটে ?) আছে, গৃহিনীর রাগ বিরাগ আছে, যাকে বলে ছাপোষা মানুষ। কিন্তু আমার বরাতেও যে ভগবান প্রেম না কি বলে তাই সব, জুটিয়ে দিয়েছিলেন, এটা শুনে ভাই তোমরা ছোকরার দল যেন হেসো না।"

বংশলোচনের বংশবৃদ্ধির এতগুলি অনুপান থাকিতেও যে আবার প্রেমের পেঁচোয় পাইয়া বসিল, ইহা মারাত্মক। এইজন্যই বুঝি কবিরাজ মশায় তালিকায় মধ্যে ইচ্ছা করিয়াই 'মদনানন্দ মোদকের' উল্লেখ করেন নাই? অহো, কি দুর্দ্দৈব!

* * *

'আজকাল' দেখিতেছি মানকুমারী সান্যালের 'দ্বাদশী'র পর মাহুমল হক'-এর 'সন্ধ্যার'—

"সাঁঝ-দীপ্ জ্বলে মাটির প্রদীপে
শিহরণ লাগে তার
জীন্ গাঁও হ'তে ব'য়ে আসা ওই
দখিনার মৃদু বায়।"

কিন্তু যে স্থানে 'দৃপ্ত জয়শ্রী জাগে' সেখানে সম্পাদক একদফা হোঁচট খাইয়াছেন, পাঠক তো খাইয়াছেনই, এবং মনে হইল আরো কেউও খেয়েছেন! হায় 'বাসর রাতের খুনী'!

* * *

কলিকাতা কর্পোরেশনের নোটিশ

কোতরঙ্গ ইটখোলার ইজারা

বার্ষিক ১৪০০০৲ টাকা খাজনায় ১৪টি ইটের পাজা (ব্রিক কিলন্‌স্) এবং ৫১টি টালীর পাজা (টাইল কিলন্‌স্) সহ হুগলী নদীর তীরবর্ত্তী কমবেশী ৩৫০ বিঘা পরিমিত জমির উপর অবস্থিত কোতরঙ্গ ইটখোলা ১০ বৎসরের মেয়াদে ইজারা লওয়ার জন্য শীল মোহরাঙ্কিত খামের উপর "কোতরঙ্গ ইটখোলার জন্য প্রস্তাব" লিখিত খামে দেওয়ানীর প্রস্তাব আহ্বান করা যাইতেছে এবং উহা কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ ভ্যালুয়ার এণ্ড সার্ভেয়ার কর্ত্তৃক ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর, বুধবার বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত গৃহীত হইবে। ইজারাদারকে ইজারা প্রাপ্ত প্রেমিসেসে বর্ত্তমানে যে ১৪টি ইটের পাজা ও ৫১টি টালীর পাজা আছে, তাহার জন্য কর্পোরেশনকে ২৭,৭৫০৲ টাকা প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার তারিখ হইতে এক পক্ষকাল মধ্যে দিতে হইবে। বিস্তৃত সর্ত্তাদি ও ইজারার নিয়মাবলী নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট বা কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ ভ্যালুয়ার এণ্ড সার্ভেয়ারের নিকট পাওয়া যাইতে পারে।

ভাস্কর মুখার্জ্জি
বি এ (ক্যান্টাব), বি এস সি (ক্যাল)
অফিঃ সেক্রেটারী

সেন্ট্রাল মিউনিসিপাল
অফিস,
১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬।

শ্রীমান্ অরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এইবার সত্য সত্যই 'খেয়ালী' হইয়া উঠিলেন। যথা—

"বৌটি আমার ছন্দময়ী
চঞ্চলা ও চুলবুলে
কমলালেবুর কোয়ার মত
ঠোঁট দু'টি তার টুলটুলে
গাল দুটি তার নরম নরম,
জানেনা সে লজ্জা সরম,
ঢেউয়ের মত কলকলিয়ে
হাসেরে সে প্রাণখুলে।
পুষ্প-পেলব হাত দুখানি
টুকটুকে আর তুলতুলে।"

'অল্প বয়সে পীরিতি করিয়া' সেই 'বধূ'টিকে নাগালের মধ্যে পাইলে আনন্দ যে নাবালকের মনে থৈ থৈ করিতে করিতে অবশেষে অথৈ হইয়া উঠিবে, তাহা অবধারিত। কিন্তু বৌটি যেরূপ 'চঞ্চলা ও চুলবুলে' দেখিতেছি, তাহাতে 'কমলালেবুর কোয়ার মত বোঁটাদুটি' না হইয়া যদি কাঁঠালের ইত্যাদি হইত ? তবে তাহা 'টুলটুলে' না হইয়া ঈষৎ চট্চটে অবশ্যই হইত, এবং তাহাতে—থাক্, শ্রীমান্ আবার চটিয়া যাইবেন ! 'আহা' পুষ্প-পেলব হাত দুখানি'র মত 'ঠোঁট দুটি তার' টুকটুকে আর তুলতুলে' হউক, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ দাড়িম্ব-দানার সন্ধানও পাওয়া যাইবে। দাড়িম্ব ও কমলা-লেবুর রসে মিলিয়া যে মণি-কাঞ্চন সংযোগ সাধিত হইবে, শ্রীমান্ তাহাতে তৃপ্ত হউন—অতঃপর ইহাই কামনা করিব !

* * *

'বাতায়ন'-এ দেখিলাম, অর্থাৎ—

"পত্রিকা মারফৎ জানতে পারলুম, 'সাহানা' আবার চুরি করেছে। এই 'সাহানা' পত্রিকাখানির জন্মকাল এখনো বোধ হয় তিন মাস পূর্ণ হয় নি, কিন্তু চৌর্য্যবৃত্তিতে এর দক্ষতা যে চরমে উঠেছে, তা আমরা স্বীকার করছি। কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি এই ভেবে যে, দেশে-কি পুলিশ নেই ?"

ত্রিলোচন শর্ম্মা ভুল করিয়াছেন। তিন মাসের খোকা হইলে কি হইবে, 'সাহানা' সেয়ানা ছেলে। যেমন সেয়ানা নাকি মহীরাবণের বেটা অহীরাবণ ছিল। পেট হইতে পড়িয়াই 'রণং দেহি !' 'সাহানা'ও তেমনি পেট হইতে পড়িয়াই ওস্তাদ চোর। অতএব পুলিশ করিবে কি ? তবে 'অহীরাবণ' যেমন 'হনুমানের হস্তে' সায়েস্তা হইয়াছিল, তেমনি এক্ষেত্রেও যে নিদেন একটি জাম্বুবান, নেহাৎ ভস্মলোচনেরও প্রয়োজন হইয়াছে—একথা আমরাও অস্বীকার করিনে।

* * *

বাঙালী'র দৌলতে যে 'বর্ত্তমান'এর এম-এ মহোদয়ের সঙ্গলাভ কয়েকবার করিয়াছিলাম, তাহা ক্রমে স্মৃতির মধ্যে ঝাপসা হইয়াই রহিয়া গিয়াছিল। অকস্মাৎ দেখি মনীন্দ্র দত্ত আবার গানও জুড়িয়া দিয়াছেন !

"রাতের গান কি শোন নি বন্ধু
বুকের তারে ?"

ভাবিয়া দেখিলাম, সত্যই তো ! 'রাতের গান তো শুনিয়াছি ! এবং এমন নিবিড় করিয়াই শুনিয়াছি, যে—

"সুদূর পাখীর একেলা কাঁদনে
তমাল শাখার আবেগ কাঁপনে
মনের মানুষ কাঁদিয়া ওঠেনি
বিরহ ভারে !

বলিয়া যখন তিনি সুতীব্র দৃষ্টি হানিয়া বসিলেন, তখন কাঁদিয়াছিলাম কিনা মনে নাই।

প্যালেষ্টাইনে অশান্তি

মাতৃক্রোড় হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। ক্রমশঃ জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে সেই সংগ্রামের ঘাত প্রতিঘাতের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে। যৌবনের রঙিন আশার মধ্যেও যুদ্ধের ইঙ্গিত রহিয়াছে। অতঃপর মানুষ যখন প্রকৃতরূপে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তখনই যুদ্ধের স্বরূপ সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে। কেহ এই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতেছে, আবার কাহারও পরাজয় হইতেছে, কাহারও তরণী এই উত্তাল-তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সংসার-সমুদ্র নিরাপদে পার হইতেছে, কাহারও তরণী মধ্যপথেই "বানচাল" হইয়া ডুবিয়া যাইতেছে। যাহার শক্তি আছে, সে-ই জয়লাভ করিতেছে। এই বসুন্ধরা বীরের ভোগের বস্তু। এখানে দুর্ব্বলের স্থান কোথায় ! এই যুদ্ধ ত বীরের দাম্ভিকতার পরিচায়ক। মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষাই জীবন সংগ্রামের উত্তেজক কারণ। সকলেই কিছু না কিছু আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করে। দরিদ্র কৃষক চাষ করিয়া তাহার জীবিকার্জ্জন করিতেছে। তাহার আকাঙ্ক্ষা ঐ দৈনন্দিন জীবনের জীবিকা অর্জ্জনেই নিবদ্ধ। ধনী তাহার বিপুল বিভবেও সন্তুষ্ট নয়, তাহার আকাঙ্ক্ষা উচ্চতর। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই জগতে দরিদ্র কৃষক হইতে বিপুল বিত্তশালী ধনবান্ পর্য্যন্ত জীবন-সংগ্রামে রত। জীবন-সংগ্রামে যিনি বাঁচিয়া আসিতেছেন, তিনি কৃতকার্য্য বীর আখ্যা পাইতেছেন। শিশু যৌবনে পদার্পণ করিল, তাহার পর প্রকৃত জীবন-

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল—শেষে সে বৃদ্ধ হইল। এই বৃদ্ধের অবস্থাই মানুষের শান্তির সময়। এই সময়েও সেই বৃদ্ধ যদি শান্তির আস্বাদ না পায়, তবে তাহাকে জীবন সংগ্রামে জয়ী বলা যাইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শান্তি জীবনের কাম্যবস্তু। আজ যে প্যালেষ্টাইনে বহু বৎসরব্যাপী অরাজকতার পর শান্তির ভাব আসিয়াছে; ইহাই প্যালেষ্টাইনের কাম্য বস্তু ছিল। ১৯২১ খৃঃ অব্দ হইতে ১৯২৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত প্যালেষ্টাইনে ভীষণ অরাজকতা হয়। এখন দেশে অনেকটা শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। তবে এই শান্তভাবের অর্থ ইহা নয় যে, দেশে সম্পূর্ণরূপ শান্তি বিরাজ করিতেছে। বরং বলা যাইতে পারে, এই শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তির অনলই ধূমায়িত হইতেছে। বাহ্যতঃ অগ্নি দেখা যাইতেছে না বটে, তথাপি ইহা যে ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বন্দুক কামান গোলা গুলি লইয়া প্রকৃত যুদ্ধ হইতেছে না বটে, কিন্তু দেশের মধ্যে যে ভীষণ অগ্নি ধূমায়িত হইতেছে, তাহা সত্যই ভীতিপ্রদ।
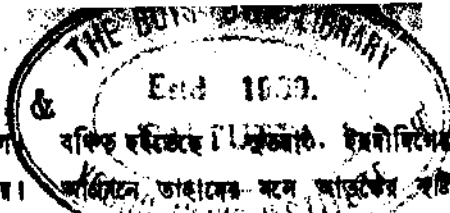
বর্ত্তমানে প্যালেষ্টাইনে যে যুদ্ধ হইতেছে, তাহা তিন দলে। প্রথম ইহুদী, লর্ড বেলফোরের ঘোষণার বলে তাহারা তাহাদের অধিকার দাবী করিতে চাহে; এবং বলিতে চাহে, তাহারাই এই অনুন্নত দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কারণ, সুতরাং তাহাদের দেশের তাহারাই অধিকারী হওয়া উচিত। দ্বিতীয়—আরব। বহু দিন হইতেই তাহাদের এখানে বাস। এই দেশে তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষের বসবাস ছিল। তাহারা মনে করে, ইহুদীদিগের আগমনেই তাহারা তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইতেছে। সুতরাং ইহুদীদিগের আগমনে, তাহাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। তৃতীয়—ইংরেজ জাতি। যে জাতি ভারতকে অধীন করিয়াছে, সেই জাতিই প্যালেষ্টাইনকেও জন ও ধন বলে অধীন করিবার চেষ্টায় আছে; ইহুদী ও আরবদের মধ্যে যে অশান্তির বহ্নি জ্বলিতেছে, তাহার সুযোগ লইয়া এই দেশকে নিজেদের কবলে কবলিত করিবার চেষ্টায় রহিয়াছে। ইহুদীরা আপনাদিগকে এই দেশের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য বলেন—প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদিগের জাতীয়তার ভিত্তিস্থাপন করিতে ইহুদী নেতৃগণ "জিয়নিষ্ট" আন্দোলনের দ্বারা এই অত্যাচারিত দেশের লোকের মুক্তিসাধন করিয়া প্যালেষ্টাইনকে ভূস্বর্গে পরিণত করিবার জন্য আসেন। তাঁহারা নিজেরাও অত্যাচার ভোগ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তাঁহারা জার্ম্মাণীর নাজী অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেন, এই অত্যাচারে প্রায় ৫ লক্ষ ইহুদীর জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে। দেশের নানাস্থানে ইহুদীদের বসতি আছে, সেই সেই স্থানেও ইহুদীদিগের আর্থিক অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে যে, সে সকল স্থানে অনেকে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই অবস্থায় তাঁহারা বলিতে চান, প্যালেষ্টাইনেও যে অল্পসংখ্যক ইহুদী বাস করেন, তাঁহাদের যদি অবস্থায় স্বচ্ছলতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলেও তাহাদের অত্যাচারিত, দুঃখক্লিষ্ট হৃদয়ে কতকটা শান্তিবারি সিঞ্চিত হইয়া নূতন আশার সঞ্চার হইবে। তাঁহারা বলেন যে, প্যালেষ্টাইনে ইহুদী উপনিবেশ আদিম অধিবাসী আরবদিগকে বঞ্চিত করিয়া হয় নাই, বরং ইহুদীরা এই আরবের দেশকে মহামারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া, আরবদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। সেজন্য আরবদিগের ইহুদীদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। ইহুদীদিগের আগমনে কোন আরবই দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে নাই বা ইহুদীরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয় নাই। বলা বাহুল্য, ইহুদীদিগের আগমনে প্যালেষ্টাইনের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিই পাইয়াছে; তাহাতে আরবদের বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হইয়াছে। গত ১৪ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ইহুদীদিগের আগমনের পর হইতে এই স্থানে আরবদেশীয় লোকের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার হইতে ৯ লক্ষ ৬০ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। উপরন্তু প্যালেষ্টাইনে যে সকল আরব বাস করিতেছেন, তাঁহাদের জীবনযাত্রা, সাধারণ আরববাসীদের তুলনায় কোন অংশে হীন নহে, ইহুদীদিগের আগমনে তাহারা যথেষ্ট লাভবান হইয়াছেন।

কিন্তু আরবদিগের ধারণা, ইহুদীরা যে কথা বলিতেছেন, তাহার কতকটা মাত্র সত্য। তাঁহারা তাঁহাদের অতীত দিনের আর্থিক অনটনের কথা আর তুলিতে চাহেন না, অতীতে আরবদের হীনতার কথা তুলিয়া যে ইহুদীরা নিজেদের প্রাধান্য এই দেশে প্রসার করিতে চাহেন, তাহা প্যালেষ্টাইনের আরবরা আর সহ্য করিবেন না। তাঁহাদের মনে ইহুদীদিগের আগমনে আরবের ধ্বংস হইবে বলিয়া আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। আরবরা মনে করেন, যতদিন বৃটিশের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ইহুদীরা আরবদিগের উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিবে না, কিন্তু বৃটিশের ক্ষমতা শিথিল

হইয়া পড়িলে ইহুদীরা আরবদিগের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিবে ও প্যালেষ্টাইনে রাজত্ব করিবে। অর্থাৎ আর্থিক ও বাণিজ্যের দিক দিয়া দেশ একচেটিয়া করিয়া লইবে। যদিও এইরূপ অবস্থা না ঘটে, এবং উত্তরোত্তর আরবদেশে ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধিতও হয়, তথাপি ইহুদীদিগের প্রতি বৎসর অধিক সংখ্যায় এই দেশে আগমনে, অদূর ভবিষ্যতে আরবজাতির ধন সম্পদ রক্ষা করা দায় হইবে। এক্ষেত্রে তাঁহারা বলিতে চাহেন, আরব কেবল দেশের শ্রীবৃদ্ধির আশায়, তাহার জাতীয়তাকে বিসর্জ্জন দিতে পারিবে না। ইহুদীদিগের পক্ষে এই যুক্তি বড়ই বিপজ্জনক। এই যুক্তি অকাট্য বলিয়া ইহুদীদিগের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষেত্রে আরবগণ যখন বেকার সমস্যা সমাধান করিবার জন্য ও তাহাদেরই দেশে তাহারা প্রজা হইয়া রহিয়াছে বলিয়া "জয়নিষ্টদের" নিকট অভিযোগ করে, তখন সেই অভিযোগের কোনরূপ উত্তর দান দুষ্কর হয়। তাহার উপর, প্যালেষ্টাইনের আরব আর মূর্খ অসভ্য জাতি নহে। এই প্রগতির যুগে তাহারা আর পূর্ব্ববৎ নাই। তাহাদের আর 'ধোয়া দিয়া' বুঝান যাইবে না।

শ্রীশ্রী বিশ্বকর্ম্মা পূজা

নিউ থিয়েটার্সে

গত বুধবার ১৭১ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে নিউসিনেমার নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের কর্ম্মচারীবৃন্দ কর্ত্তৃক মহাসমারোহে শ্রীশ্রী বিশ্বকর্ম্মা পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সন্ধ্যাবেলা সহস্রাধিক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে ভুরিভোজে আপ্যায়িত করা হয়। বিভিন্ন ফিল্ম কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তা, বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এবং ফিল্ম ব্যবসা সংশ্লিষ্ট বহু ভদ্র মহোদয়কে এই উৎসবে যোগদান করিতে দেখা গিয়াছিল। মিঃ বি, এন সরকার অসুস্থ শরীর নিয়েও নিমন্ত্রিতদিগের আদর আপ্যায়নে উপস্থিত ছিলেন। তদ্ব্যতীত শ্রীযুত সুবোধ কুমার দে প্রমুখ সহকর্ম্মীগণও অতিথি বর্গের আদর আপ্যায়নে মনোযোগী ছিলেন।

বি, কে, পাল এণ্ড কোং

প্রসিদ্ধ ঔষধ ব্যবসায়ী মেসার্স বি, কে, পাল এণ্ড কোংর কারখানায়ও মহা সমারোহে শ্রীশ্রী বিশ্বকর্ম্মা পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্যর হরিশঙ্কর পালের দমদমাস্থিত উদ্যানে এতদুপলক্ষে বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়াছিল।

করপোরেশন প্রসঙ্গ

আমরা শুনিতেছি, করপোরেশনের সেক্রেটারী মিঃ বি, ডি, রামিয়া (কেহ কেহ তাঁহাকে 'ভুষণ্ডীকাক' আখ্যায় আখ্যায়িত করেন) আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে আবার করপোরেশনের চাকুরীতে যোগদান করিতে আসিতেছেন। জন্মভূমি মন্দ্রদেশ কি আর ভাল লাগিতেছে না? আর কেন বাপু, খাতায় কলমে বয়স ৫৪ হইলেও ঠিকুজি কুষ্ঠি ঘাঁটিলে যে তোমার বয়সের গাছ পাথর পাওয়া যায় না। দেশবন্ধু জামাতা, বর্ত্তমান করপোরেশনের স্রষ্টা সুরেন্দ্র নাথের দৌহিত্র, কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুত ভাস্কর মুখার্জ্জি তাঁহার ছুটীর সময় যেরূপ দক্ষতার সহিত সেক্রেটারীর পদের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। ভাস্করবাবু অজাতশত্রু ব্যক্তি—তাঁহাকেই সকলে এখন পাকাপাকিভাবে সেক্রেটারীর পদে দেখিতে চায়। মিঃ রামিয়া ত বহু পূর্ব্বেই অবসর গ্রহণ করিবেন বলিয়া ডেপুটী একজিকিউটিভ অফিসারের সমান বেতন বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছিলেন। আর কেন? এইবার পাওনা—থোয়া যাহা আছে, লইয়া সরিয়া পড়িলে বুদ্ধিমানের কাজই হইবে। আগেকার অবস্থা এখন আর নাই। আমরা আগামী সপ্তাহে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

"স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা ভার"

(গল্প)

শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায়

ট্রেণ যাত্রী! —সন্ধ্যার ম্লান আলোর বুক চিরে ট্রেণ চলেছে। দ্রুত বিসর্পিল গতি! থার্ড ক্লাসের একটা কক্ষে—তরুণ প্রফেসার সুপ্রিয় তার পার্শ্বস্থিতা তরুণী বধূর সঙ্গে কথা কইছিলো!—ট্রেণ-জার্ণি তোমার কেমন লাগে বধূ?

অঞ্জলির দৃষ্টি তখন বাইরের অস্পষ্ট অন্ধকারের পানে নিবদ্ধ—মনও। মন্দ নয়—কতকটা অন্যমনস্কভাবে বলল।

অঞ্জলির সংক্ষিপ্ত উত্তরে সুপ্রিয় দমে গেল। তবু উচ্ছ্বাসের গতিরোধ না করে বলল—আমার কি মনে হয় জানো?

কী?—অনুন্নত স্বরে বলল অঞ্জলি।

আমার মনে হয় চলে যাই দূরে—মানুষের অশ্রান্ত কোলাহল যেখানে পৌঁছুতে পারবে না, এমন জায়গায়। দুজনে অক্লান্ত পরিশ্রমে, অদম্য উৎসাহে গড়ে তুলবো একটী ছোট্ট সংসার। থাকবো শুধু তুমি আর আমি, আর কেউ নয়।

অঞ্জলি নিশ্চল, নিস্পৃহ! সুপ্রিয় সক্ষোভ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার চেয়ে নীরবে টাইমটেবেলখানা কোলের ওপর তুলে নিয়ে দেখতে লাগল।

...ট্রেণ এসে থামল একটা মাঝারি জংশনে। তাদের কক্ষে এসে ঢুকল একটী যুবক। হাতে একটী চামড়ার সুটকেশ। গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ দেহ। [illegible] [illegible] সঙ্গে সুপ্রিয় 'টাইমটেবল'-এর পাতার ওপর থেকে মুখদৃষ্টি তুলল—চমকে উঠল—আরে অনাদি যে!

সুপ্রিয় এগিয়ে গেল অনাদির দিকে, তার একখানা হাত সজোরে চেপে ধরল। অস্ফুটস্বরে বলল—আশ্চর্য্য তুমি!

অঞ্জলি এতক্ষণ চেয়েছিল স্বামীর নবাগত বন্ধুটীর পানে! নিবিড় সতর্ক দৃষ্টি! হঠাৎ অনাদি তার দিকে চোখ ফেরাতেই চমকে উঠল—দুজনেই। অঞ্জলি শিউরে উঠল, মুহূর্ত্তে মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। চকিতে মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল।

না,—আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। অনাদি ম্লানমুখে বলল।

তুমি কী বলচো। সুপ্রিয় বিস্ফারিত চোখ দুটো বন্ধুর মুখের ওপর তুলে ধরল। কতোদিন পরে দেখা বল তো! ও সেই তুমি জার্ম্মাণ গেলে। সেই সন্ধ্যা আজো স্পষ্ট চোখের ওপর ভাসচে—সেই বিদায় সন্ধ্যা!

অনাদি অঞ্জলির প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল—অন্যমনস্কভাবে বলল—হুঁ।

সুপ্রিয় নিভে গেল, মরমরা সুরে বলল—হুঁ কি হে। তুমি যে কথা কইতেই চাও না। জার্ম্মাণ ফেরতা হয়ে গুমোর হলো নাকি? আমাদের মত থার্ড-পার্সন-এর সঙ্গে কথা কইতে আত্মসম্মানে বা লাগচে, নয়?

যা ভেবে খুশী হও—উদারকণ্ঠে অনাদি বলল—তারপর কতদূর পর্য্যন্ত গমন হচ্ছে?

হাজারীবাগ পর্য্যন্ত।

আর একবার অনাদি অঞ্জলির পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল। ভ্রূকুটী করে বলল—ও!

সুপ্রিয়র দৃষ্টি এড়াল। অনাদির কাঁধে হাত রেখে হেসে বলল—আরে অতো আড়নয়নে চাইচো কেন? ওটী আমার—ঐ কি বলে গিয়ে 'বেটার হাফ'! এসো ওর সঙ্গে ইন্‌ট্রোডিউস্ করিয়ে দিই—বলে অনাদির একখানা হাত ধরে এগিয়ে যেতে উদ্যত হল।

থাক্ থাক্—অনাদি বাধা দিয়ে বলে উঠল—তাড়াতাড়ির দরকার নেই, পরিচয়ের সময় অনেক মিলবে'খন।

নিশ্চয়। হেসে বলল সুপ্রিয়—আচ্ছা তুমি একটু বসো। আমি চট করে খাবার, কিছু খাবার কিনে আনি। পার তো ইতিমধ্যে পরিচয় পর্ব্বটা শেষ করে ফেলো।

না সুপ্রিয় পাগলামি কোরো না। সুপ্রিয়র একখানা হাত অনাদি চেপে ধরল।

বারে, তুমি না খাও, আমাদের তো চাই। সারাটা রাত পেটের ওপর বাণিজ্য

করে কাটানো অসম্ভব! যেও না লক্ষ্মীটী—এক্ষুনি আসছি। সুপ্রিয় নেমে গেল গাড়ী থেকে।

অনাদি কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তারপর ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়াল অঞ্জলির সামনে। হঠাৎ একটা টানে খুলে ফেলল তার ঘোমটা। অঞ্জলি শিউরে উঠে প্রাংশু মুখখানা অসম্ভব নত করল। অনাদি হেসে উঠল জোর গলায়, শ্লেষের সুরে বলল—'ওয়াণ্ডারফুল'! এ্যাঁ! অঞ্জলি—তুমি! এতো বিপদেও পড়ে মানুষে কী! চিনতে পারচো না? নতুন করে পরিচয় দিতে হবে নাকি? আমি—অনাদি, যার সঙ্গে তুমি একদিন—

কথার মাঝে বাধা দিয়ে অঞ্জলি অসহিষ্ণু ভাবে উঠে দাঁড়াল। জানালার রেলিংটা সজোরে দুহাতে চেপে ধরে ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বলল—চুপ করো, চুপ করো, আমায়—আমায় ক্ষমা করো!

অনাদি দুপা সরে দাঁড়াল। মুখে মর্ম্মভেদ বিরাগের চিহ্ন! ক্ষমা! অঞ্জলির মুখের ওপর জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অনাদি বলল—ক্ষমা করবো! কিসের জন্য ও কথা তোমার মুখ ফুটে বেরুলো অঞ্জলি? ক্ষমা করবো তোমায় আমি! কেন? তুমি আমার তোমার স্মৃতির কোঠা থেকে মুছে দিয়েছ বলে? নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে বন্ধুর স্ত্রীর আসন অধিকার করচো বলে?

অনাদি সজোরে পা ফেলে পায়চারি করতে লাগল। অঞ্জলি এগিয়ে গিয়ে তার দুখানা হাত চেপে ধরল, মিনতির সুরে বলল, আমার দয়া করো, তোমার পায়ে পড়ি, আমার চলার পথে এমন করে কাঁটা ছড়িও না।

অনাদি হেসে উঠল জোর গলায়। বীভৎস হাসি! তার প্রতি তরঙ্গে স্নায়ুমণ্ডলী ঝন্ ঝনিয়ে উঠে। মোচড় দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—দয়া! হয় তো করা উচিত! কিন্তু তুমি আমায় কতোটুকু দয়া করেচো অঞ্জলি? বলো, উত্তর দাও আমার কথার!

অঞ্জলি নির্ব্বাক—নিশ্চল।

শ্লেষদীপ্ত স্বরে বলে চলল অনাদি—আর অতো ভালবাসাবাসি, বড়ো বড়ো প্রেমের বুলি—সে সব আজ কোথায় পড়ে রইলো অঞ্জলি? এই তোমাদের—মেয়েদের ভালবাসা! ঠুনকো কাঁচের গ্লাসের মত পল্‌কা। শুধু উচ্ছ্বাস! নিছক অভিনয়! চমৎকার পরাকাষ্ঠা দেখালে যা হোক!

অঞ্জলি তবুও নিরুত্তর—নিষ্পন্দ!

হুঁ—সশব্দে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অনাদি বলল—কতোদিন হলো তোমাদের বিয়ে হয়েচে?

ছ মাস। ভয়কম্পিত স্বরে উত্তর দিলে অঞ্জলি।
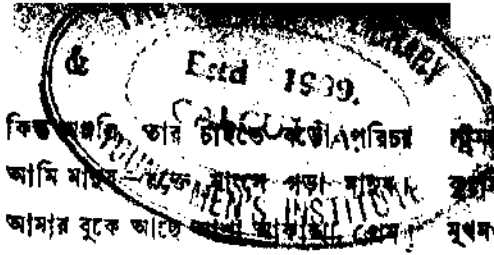
মোটে ছ মাস! শ্লেষের ভঙ্গীতে অনাদি বলল—হোঃ! এই তোমার বাহাদুরী? আরো কিছুদিন ন্যাজে খেলালে না কেন? সুপ্রিয় তো নেহাৎ সাদাসিদে মানুষ, মনে কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই। তাকে নিয়ে খেলতে মোটে বেগ পেতে হতো না। অঞ্জলির দিকে বিতৃষ্ণা-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল বেশ, কোর্টশিপ চলেছিলো কতোদিন? মাসখানেক বোধ হয়? তাহলে বিরহ অনলে পুড়তে হয়নি বেশী দিন কী বলো?

অনাদির প্রতিটী শব্দ সাঁওতালী তীরের মত অব্যর্থ, বিষাক্ত, মারাত্মক! অসহ্য হয়ে উঠল অঞ্জলি। ভেঙ্গে পড়ল অনাদির পায়ের গোড়ায়। তার পা দুটো সজোরে চেপে ধরে অশ্রুসজল স্বরে বলল—আমি অপরাধী বিশ্বাসঘাতক।

আরো—আরো নীচ। অনাদি পা ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়াল—মরিয়া হয়ে বলল—তুমি নরকের কীট, তুমি—তুমি—প্রবল উত্তেজনায় অনাদির বাকরোধ হল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল।

আরো যদি কিছু থাকে আমি তাই—অনাদির মুখের ওপর করুণ দৃষ্টি রেখে অঞ্জলি বলল। তোমার পায়ে মাথা ঠুকে ক্ষমা চাইচি। তুমি মহৎ! পারো না আমায় ক্ষমা করতে? পারো না আমায় বাঁচতে দিতে?

অনাদি অস্থির পদে পায়চারী করতে করতে কতকটা আবৃত্তির সুরে বলল—আমি মহৎ! সুতরাং আমার ক্ষমা করা উচিত। হা হা সত্যি! যে কোন তৃতীয় ব্যক্তি তোমার কথার পুনরাবৃত্তি করবে—অঞ্জলির সামনে দাঁড়িয়ে বলল।

কিন্তু অঞ্জলি, তার চাইতে বড়ো অপরিচয় আমি মানুষ—রক্তে মাংসে গড়া মানুষ। আমার বুকে আছে [illegible] প্রেম। একটু থেমে আবার বলে চলল—সুদূর প্রবাসে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, একান্ত বন্ধু স্বজনহীনভাবে কাটিয়েচি। এক একটা মুহূর্ত আমার বুকের ওপর দিয়ে ঠক্ ঠক্ করে হেঁটে চলে গেছে। কেন জানো অঞ্জলি? শুধু আমি জানতুম, তুমি আমার! ফিরে গিয়ে তোমায় আমি পাবো একান্ত আপনার করে। যতোদিনই যাক তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে। তোমায় পেয়ে নিমেষে জুড়িয়ে যাবে আমার বুকের সব ব্যথা! কিন্তু—পদ-লুণ্ঠিতা অঞ্জলির পানে ক্রূর দৃষ্টি হেনে বলল অনাদি—একটী আঘাতে তুমি আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে। উঃ কী নিষ্ঠুর তোমরা! তুমি এদিকে দিব্যি আর একজনের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াচ্ছিলে? চমৎকার!

হঠাৎ অনাদি মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা চেয়ারের হাতলের ওপর সজোরে ঠুকতে ঠুকতে দীপ্তস্বরে বলল—জেনে রেখো অঞ্জলি, এর প্রতিশোধ আমি নেবো—নিশ্চয় নেবো। না—না—ক্ষমা করতে পারবো না। প্রতিশোধ নেবো, অস্ত্র আমার কাছে। শুধু তোমার দেওয়া প্রেমপত্রের বাণ্ডিলটা। সুপ্রিয়র চোখের সুমুখে একবার মেলে ধরলেই—ব্যস্! কুৎসিত হাসি হেসে উঠল অনাদি। সারা মুখমণ্ডলে দানবীয় প্রতিহিংসায় সুস্পষ্ট কুঞ্চিত রেখা।

অনাদির শেষের কথাগুলো অঞ্জলির সারা দেহে তীব্র শিহরণ জাগিয়ে তুলল। দু হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল অঞ্জলি।

কাঁদচো! তিক্তস্বরে অনাদি বলল—হুঁ, একদিন তোমার ঐ চোখের কোণে এতোটুকু জলের রেখা দেখলে আমার বুক ফেটে যেতো। আজ ঠিক তার বিপরীত। আজ আমি চাই—আমার একান্ত কামনা তুমি কাঁদো, খুব কাঁদো। কেঁদে কেঁদে তোমার দু চোখ অন্ধ হয়ে যাক্।

দু হাতের ভেতর থেকে অঞ্জলি মাথা তুলল, অনাদির মুখের ওপর সজল দৃষ্টি রেখে রুদ্ধকণ্ঠে বলল—তুমি এতো নিষ্ঠুর!

আগে ছিলুম না, এখন হয়েচি।

অনাদি অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। হঠাৎ অঞ্জলির কাছে এগিয়ে গেল। চেয়ার থেকে সুটকেশটা হাতে তুলে নিলে, অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ স্বরে বলল—শোন, মুখ তোল।

অঞ্জলি ধীরে ধীরে মুখ তুলল, অনাদির মুখের পানে তাকিয়ে দেখবার সাহস হল না।

হাঁ, অনাদি বলল—একদিন তোমায় আমি ভালবাসতুম। তুমি তার মর্য্যাদা রাখতে পারো নি—যাক্ তার সূত্র ধরে তোমায় আমি ক্ষমা করলুম। হ্যাঁ হ্যাঁ—ক্ষমা করলুম তোমায়। আর এক কারণ, সুপ্রিয় আমার একাধারে ভাই ও বন্ধু। তোমাকে শাস্তি দিতে গেলে সেও কম শাস্তি পাবে না।

আঙুল থেকে আংটীটা খুলতে খুলতে বলল—এই নাও তোমার নাম লেখা আংটী। আর আমি আঙুলে রাখতে পারবো না। এর কলঙ্কে আমার সমস্ত দেহ কলঙ্কিত হয়ে উঠবে। তোমার জিনিষ তুমি যাকে ইচ্ছে দিও কিংবা ফেলে দিও, তাতে আমার কিছু যাবে আসবে না। সে মোহ কেটে গেছে।

কতকটা আত্মগতভাবে বলল—'স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা ভার'।—আংটীটা অঞ্জলির কোলের ওপর ছুড়ে ফেলে দিলে। তারপর ঝড়ের মত ট্রেণ থেকে নীচে নেমে গেল।

আর অঞ্জলি? সে আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে চেয়ারে বসলে। নিষ্প্রাণ—নিষ্পলক।

—সুপ্রিয় এল। হাতে খাবারের চ্যাঙড়া। এগিয়ে গিয়ে অঞ্জলির সামনে দাঁড়িয়ে সহজ গলায় বলল—অঞ্জু, অনাদি কোথায় গেলো?

অঞ্জলি একবার ধীরে ধীরে চোখ খুলে চাইল, আবার তখুনি বুজিয়ে ফেলল। চোখের কোণ বেয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল গালের ওপর। সুপ্রিয় হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল—অঞ্জলির বর্ণহীন মুখখানির পানে চেয়ে। নির্ব্বাক—নিস্পন্দ—নিশ্চল।

শেষ দশা

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

বারান্দায় যেখানে ঝুল্যমান রয়েছে 'টু-লেট'—
ইষদূর্দ্ধে দৃষ্টি দিয়া দেখি,
যৌবন-বন্দুকে পোরা এক দমদম বুলেট
প্রতীক্ষায় আছে কা'র? একি!
প্রেমার্ত্ত রাইফেলে অকস্মাৎ উদ্গারি' আগুন
মস্তিষ্ক-নায়ক ওঠে ঘুরি',
কৌমার্য্য-কার্ত্তুজে ধূম্রময়ী কল্পনা, ফাগুন
প্রেরণায় দেয় হামাগুড়ি।
কাব্যের এভারেষ্ট-চূড়া হায় হেরিয়া এ চক্ষে
আবিষ্কার-অভিযান করি'
অন্তর-মনোপ্লেনে চড়িয়া কি লভিব এ বক্ষে
ক্ষীরশুভ্র শিলালেখ? মরি!
দিক্‌চক্রবালে হায় জড়ো হয় কামনা মেঘের
সিন্দুরিয়া মন মরে কেঁদে,
অসমাপ্ত অভিযান! সর্পমুখে যে-দশা ভেকের—
সহসা লইয়া গেল বেঁধে!

মহিলা-মহল

নারী প্রেমের নিষ্ঠা

শ্রীশীলা দেবী

বর্ণা শিরায়ার বলিতেছেন, প্রেমের ছলা কলার প্রাচীন যুগে সকল দেশেই ছিল আদর। মেয়ে মহলে এ বস্তুর অনুশীলন চলিত বিস্তার মত। জুলিয়েৎ জানিতেন কথা লইয়া কি করিয়া খেলা চলে। লঘু কৌতুক বিলাসে—পরিহাসরঙ্গে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের মেয়েদের বেশ কৃতিত্ব ছিল। চোখে কটাক্ষ, অধরে হাসি—এ সব শরক্ষেপে তাদের পটুতা যেমন ছিল, সে দিকে তাদের আগ্রহ অনুরাগও ছিল তেমনি প্রবল।

একালের মেয়েরা এ ব্যাপারে একেবারে অপটু—তারা এদিকটায় গম্ভীর হইয়াছে। ফলে, জীবন হইতে আনন্দ বিসর্জ্জন দিয়াছে অনেকখানি। এ যুগের মেয়েরা সিধা পথে প্রেম করে—অর্থাৎ স্পষ্টাস্পষ্টি—সে প্রেম-লীলায় কোন ছন্দ বা বৈচিত্র্য নাই। শুষ্ক কাষ্ঠবৎ তাহা নীরস এবং রীতিমত ডিরেক্ট এবং প্র্যাকটিক্যাল।

এ যুগের স্ত্রী-স্বাধীনতার মাত্রা এত বাড়িয়াছে যে, মেয়েদের সে আকর্ষণী কমিয়াছে। এ্যাডভেঞ্চার বা গোপনতার মাধুরিমা এ যুগে নাই।

স্বাধীনতার অর্থে আমি যখন খুশী বিবাহ এবং যখন খুশী বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা বলিতেছি না। বিবাহের পর যে নারীর চিত্ত স্বামীকে ছাড়িয়া অপর পুরুষের পিছনে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাকে আমি ভদ্র মহিলা বলি না। জুলিয়েৎ রোমিওকে ভাল বাসিয়াছিল—সে যুগে শাসন নিষেধ ছিল প্রবল, গুরুজনের ইচ্ছা ছিল সর্ব্বময়—তবু রোমিওর সঙ্গে কোন কারণে বিবাহ না হইলে দ্বিতীয় কোন পুরুষকে কোনমতে বিবাহ করিতে পারিত না—এ বিষয়ে সংশয় নাই। জুলিয়েতের মতো নিষ্ঠা এ কালের মেয়ের নাই।

তারা প্রণয়ীর সহিত বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিলে অন্য পাত্রে হৃদয় দান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সে যুগের সঙ্গে এ যুগের মস্ত প্রভেদ—এই হৃদয় নিষ্ঠার ব্যাপারে।

প্যারিসের সঙ্গে জুলিয়েতের দেখা হইয়াছিল রোমিওর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব্বে এবং রোমিওর প্রতি তার অনুরাগ অপরিসীম হইয়া উঠে এবং এ কথা ঠিক প্যারিসকে যদি জুলিয়েৎ ভালবাসিত, তাহা হইলে স্বর্গের লোভেও সে কখন রোমিওর পানে ফিরিয়া চাহিত না।

চৌদ্দ বৎসর বয়স হইলেও জুলিয়েৎ নারী। এই নারীত্বের মহিমায় সে যুগের নারী-চরিত্র ছিল শক্তিমান, মহিমময়। এ কালে নারী চরিত্রে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার অভাব ঘটিয়াছে—তার কারণ এই শাসন-হীন অবাধ স্বাধীনতা। এ যুগের মেয়ে এ স্বাধীনতার ফলে " জ্যাঠা" ও ফাজিল হইয়াছে—আর কোন দিক দিয়া তার চিত্তবৃত্তি স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছে না।

এ যুগের স্বাধীনতা আমাদের শুধু পোষাক বিলাস শিখাইয়াছে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মেয়েরা হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত তোলা স্কার্ট পরিতেছে—যথাসম্ভব বসন পরিতেছে স্বল্প—সাঁতারের যে পোষাক পরে, তাহাতে লজ্জা দেশ ছাড়িয়া পালায়। পরিচ্ছদ বাহুল্য ভাল নয়, মানি; তাই বলিয়া নারীর নগ্নতা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ও বিসদৃশ বোধ হয়। একশো বৎসর পূর্ব্বে মেয়েরা পোষাকে পরিত অবগুণ্ঠন এবং এত বেশী পোষাক পরিত—কতকগুলা পেটি-কোট এবং ১১।১২টি আণ্ডার গার্মেন্ট।
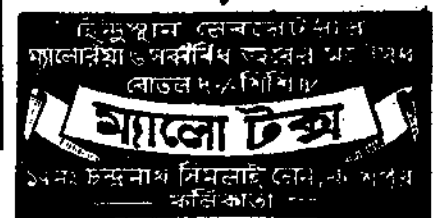
পরিতে সময় লাগিত অনেক—ব্যয়ও ছিল খুব বেশী।

এখন স্বাস্থ্যের নামে আমরা পাইয়াছি বাতাস আর সূর্য্যরশ্মি—নগ্ন তনুর উপকারিতা বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি অতিরিক্ত পরিচ্ছদে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। তার উপর সেকালের সামাজিক বহু রীতি আমাদের কাছে আজ অনর্থক কুসংস্কার বলিয়া মনে হয়। যাহা ত্যাগ করিয়াছি, তার পরিবর্ত্তে এমন কিছু পাই নাই, যাহাতে জীবন সার্থক হইতে পারে। নারী স্বাধীনতা পাইয়াছে অবাধ অসীম—কিন্তু লজ্জা এবং আত্মরক্ষার সকল উপায় বিসর্জ্জন দিয়া নারীর সৌন্দর্য্যও অনেকখানি ঝরিয়া গিয়াছে।

স্বাধীনতা লইয়া আমরা গর্ব্ব করি। কিন্তু অবাধ স্বাধীনতা কোনও বিষয়েই সমীচীন নয়। অবাধ স্বাধীনতার অপর নাম স্বেচ্ছাচারিতা, বেপরোয়া ভাব। এ স্বাধীনতার ফলে পরিবারিক সম্পর্ক—সেই সঙ্গে স্নেহ প্রেম শ্রদ্ধা ভক্তি মায়া মমতা রীতিমত আহত ও ক্ষুণ্ণ হইতেছে। সামাজিকতার সে সরল আন্তরিকতা আর নাই—কৃত্রিমতার সামাজিকতা আজ ভরিয়া গিয়াছে। ভালবাসার সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক অহি-নকুলের মত। প্রকৃত ভালবাসায় মানুষ স্বার্থ ত্যাগ করে—এখন স্বার্থ হইয়াছে সর্ব্বস্ব—কাজেই এখনকার ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা নয়—তাহা নভেলিয়ানার রূপান্তর। এই জন্যই আজ আমরা ঐশ্বর্য্য সম্ভার থাকা সত্ত্বেও সুখী নই, সর্ব্বদা অশান্তি ভোগ করিতেছি—অসন্তোষের বহ্নিদাহ বুকে লইয়া হা হা করিয়া মরিতেছি।

গোধূলি

শ্রীশুভসেন বসু

ক্ষীণ নদী চলে কেতকী বনের ওপাশ ঘুরে,
ঘুনো ঝাউগাছ আলপনা আঁকে নদীর জলে;
পাখীরা জীবন-কোরাস জুড়েছে সান্ধ্যসুরে,—
আকাশের ছায়া এলোমেলো পড়ে অতলতলে।

গোধূলির মেঘ নীলের পাথারে ছড়ায় কায়া,
রাতচরাপাখী একে একে দেখো চরতে যায়,—
দূর মাঠে নামে চারিদিক ভেঙে ধোঁয়াটে ছায়া;—
আশে-পাশে শুধু একাকার হয় আঁধার পাথার।

তোমার কথাই এরা সব আজ জাগালো মনে;
তোমার জীবন স্বচ্ছআকাশে জ্বালাতো যেমন সাঁঝ
যেমন তোমার জলঝরা মেঘ ছড়াতো আমার মনে
সুনীল আকাশ গোধূলির মেঘ সেইরূপে শুধু ঢাকছে আজ.

প্রতিবাদ

'স্বদেশ' সম্পাদক মহোদয় সমীপেষু—

আপনাদের স্বদেশের রীতিমত পাঠক হিসাবে সেদিনও (২৬শে ভাদ্র শুক্রবার) যখন হকারের কাছ থেকে একখানা কাগজ কিনেছিলাম তখন ক্ষণিকের জন্যও ভাবি নাই যে একটি পরিচিত কবিতা ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাইব। কবিতাটি ফুলরাণী ঘোষ নাম্নী জনৈক লেখিকা (সম্ভবতঃ সাহিত্য ক্ষেত্রে নূতন এবং সেই জন্য সস্তায় নাম কিনিবার প্রত্যাশী) ফাল্গুনী রায় নামক নবীন লেখকের লেখা হইতে একেবারে হুবহু কপি করিয়া দিয়াছেন। কবিতাটা (গান) দীপালী অষ্টম বর্ষ ১৫শ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

লেখিকা যদি এ কথা অস্বীকার করেন তবে তাঁহাকে আমি স্বপ্নদ্রষ্টা ছাড়া আর কি বলিব তাহা ভাবিয়া পাই না। আশা করি আপনারা সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া এবং স্বদেশের মুখোজ্জ্বল রাখিবার জন্য আপনাদের পত্রিকায় এই পত্রটি প্রকাশ করিয়া অনাগত কদর্য্যতা হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। নমস্কার জানিবেন।

ভবদীয়
শ্রীবিষ্ণুদাস রায় চৌধুরী।
বড়িশা পোঃ, ২৪ পরগণা।

মল্লিকা

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

মল্লিকা! ছোট একটি ফুল; শুভ্র, সুন্দর। ছোট্ট তার বুকে মিষ্টি একফোঁটা গন্ধ—কি উন্মাদকর—কি প্রাণমাতান!

আকাশের বুক থেকে বৃষ্টি যেমন করে ঝরে, না যেমন করে ঝরে তুষারকণা, মল্লিকা তেমনি ফোটে সবুজ পাতার পট-ভূমিতে; তেমনি ক্ষুদ্র, তেমনি অজস্র।

বাগানে গোলাপ আছে, গন্ধরাজ আছে, মল্লিকা যেন এদের আড়ালে যায় হারিয়ে, কেউ যেন তাকে দেখেও দেখে না। দেখে লোকে গোলাপ-সুন্দরীর গুণ-গরিমা, চাঁপার বর্ণসৌষ্ঠব, কমলের কমনীয় লাবণ্য। মল্লিকা ক্ষুদ্র, বেড়ার পাশে রাখে তার একান্ত অনাদৃত দেহখানিকে লুকিয়ে। তবুও গরীবের ঘরের মেয়ের মত যৌবন তারও আসে, আর আসে অসীম রূপসম্ভারের অর্ঘ্য নিয়ে। তখন ক্ষুদ্র মল্লিকার বুকে জাগে যে অন্তহীন আশা তা পূর্ণ হয়ত হয় না, তবু মল্লিকা সেদিন পূজার পুষ্পপাত্রে স্থান লাভ করে। যে দেবতার পূজায় লাগবার তার আকাঙ্ক্ষা তা সে হয়ত পায়না, কিন্তু দেবতাদেরও তো রুচিভেদ আছে। নইলে শিবঠাকুর এতো ফুল থাকতে ধুতরোকেই বেছে নিলেন কেন। তেমনি মল্লিকাকেও হয়ত কেউ নিতে চায়—হয়ত নেয়ও, কিন্তু মল্লিকার আশা পূর্ণ হয় কিনা কে জানে!

আশা ক'টা লোকেরই বা পূর্ণ হয়! ক্ষুদ্র মল্লীর আশা পূর্ণ না হলেও পৃথিবীর কিছু ক্ষতি হয় না—কিন্তু যে দেবতা মল্লিকাকেই ভূষণরূপে ধারণ করতে চায় তার কথা কজন মানুষ ভাবে!

মল্লিকা ক্ষুদ্র গ্রাম্য বালিকা। গ্রামেই তাকে মানায় ভালো। ওরকম উচ্ছ্বসিত হাসির অকারণ বিচ্ছুরণ সহরে মানায় না মোটে। তবু আধুনিক মানুষ তাকে সহরে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, তাকে টবে বসিয়ে বাড়ীর ছাদের ওপর তুলে দিয়েছে। তবুও মল্লিকা হাসবে। তার সহজ বন্ধ হাসির কোনদিন ব্যত্যয় হয় না। কিন্তু প্রাণ কি তার সত্যি হাসে? না এ হাসির রেখায় রেখায় কান্নার গান!

মল্লিকা সহরে মেয়ে ছিল না। কে ওকে এনেছে এখানে কে জানে, কিন্তু যেই আনুক, ভালো কাজ সে করে নি। কারণ সহরে এসে সহরে ম্যাগনোলিয়ার সঙ্গে ও পাল্লা দিতে যায়। রডোডেনড্রনের সঙ্গে ও নিজকে সমান মনে করে। মনে করে রজনীগন্ধার মত ও-ও যেন দিনের পর দিন প্রেমের অভিনয় করে যেতে পারবে। হায়রে কপাল, যার পরমায়ু মাত্র একটি রাত্রি সে কেন অমর স্বামী প্রার্থনা করে! সহরে এসেই মল্লিকার এ দুর্দ্দশা।

ফুলের দোকানে যাও, দেখবে গোলাপ, রজনীগন্ধা, ক্রীসান্থিমাম, ইত্যাদি হাজার সহরে ফুল শো'কেসের কয়েদখানায় দৈত্যো হাসি হাসছে। মল্লিকার কেন সাধ হয় ঐ শো'কেশে ঢুকতে! কেউ ওকে ঢুকতে দেয় না, কেউ দাম পর্য্যন্ত করে না সেখানে—তাই বলছিলাম, মল্লিকা পল্লীর মেয়ে, সেইখানেই ওকে মানায় ভালো।

অদৃষ্ট! এত্তো'টুকু মেয়ে, ফোটে যখন তার হাসি, ঝরণার মত স্নিগ্ধতা জাগায়; সে মেয়েকে দেখে কে না ভালবাসবে যার ভালবাসার মত প্রাণ আছে! কিন্তু মল্লিকা যদি তারের মালায় স্থান পেতে চায় তাহলে লোকে হাসবে না তো করবে কি! তাই বলছিলাম—আশা সকলেরই থাকে—তবে যার যা আশা করা উচিৎ তার তাই করাই ভালো।

মল্লিকা তারের মালার জন্য নয়—সে যাবে বিনিসুতার মালায়!

কুকুরে কুসংস্কার

আমরাই নাকি দারুণ কুসংস্কারাপন্ন জীব। কুসংস্কার বশে হাঁচি-টিকটিকির বাধা মানিয়া চলি; তার পরে ধোপা অযাত্রা, 'মাকুন্দ' লোক অযাত্রা—এমনই কথায় বহু জীবকে রীতিমত অপমান করি। শুধু মানুষ নয়—বেচারা শিয়াল যদি আমাদের ডান দিকের পথে দেখা দেয়, সাপ দেখি বাঁ দিকে, অমনি ভয়ে আকুল হই, লক্ষণ ভাল নয়—বিপদ বা বিঘ্ন ঘটিবে।

কিন্তু জানেন কি—বৃটিশ জাতির অতি আদরের কুকুর—কুসংস্কার বশে বৃটিশ জাতিও তার সম্বন্ধে নানা বাধা-বিঘ্ন কল্পনা করিয়া ভীত শঙ্কিত হন?

কোথাও যাত্রা করিতেছে, এমন সময়ে পথে যদি কোন কুকুর তীব্র শব্দে চীৎকার করে, তবে বুঝিতে হইবে, যাত্রা তার শুভ নয়। দুর্ভাগ্য বা বিপদ ঘটিবে।

ইয়র্কশায়ারে কেহ যদি ন্যাঙড়া কুকুর পথে দেখেন, তাহা হইলে বাঁ পায়ের জুতা খুলিয়া তার তলায় থুতু দিয়া পথের উপর ঐ জুতা ক্ষণেকের জন্য উপুড় করিয়া অমঙ্গলের আশঙ্কা কাটান; কাটাইয়া সে জুতা পায়ে দিয়া আবার যাত্রারম্ভ করেন। এ টুকু না করিলে বিপদ ঘটিবে।

ল্যাঙ্কাশায়ারের অধিবাসীদের বিশ্বাস—কর্ত্তা বা গৃহিনীর সঙ্গে পোষা কুকুরের জীবন এক সূত্রে বাঁধা। কর্ত্তা বা গৃহিনীর মৃত্যু হইলে কুকুরও অচিরে মরিবে।

হাল্লের অধিবাসীরা যদি অক্টোবর মাসের ১০ তারিখে পথে কোন কুকুর দেখেন, ত তাকে কষিয়া চাবুক মারেন—না মারিলে কার্য্যহানি অবশ্যম্ভাবী।

কুকুর কাঁদিলে গৃহে কঠিন পীড়া কিম্বা মৃত্যু ঘটিবে—ইংলণ্ডের বহু প্রদেশের অধিবাসীদের এ বিশ্বাস খুব প্রবল।

হান্টিংডনশায়ারের অধিবাসীদের বিশ্বাস—গৃহে কাহারও কাস হইলে পথের কোন অজানা কুকুরকে রোগীর মাথার একগাছি কেশযুক্ত স্যাণ্ডউইচ খাওয়াইলে কাসরোগী আরোগ্য লাভ করে।

চার্চ্চ-যাত্রী বর-কন্যা যদি চার্চ্চে প্রবেশকালে পথে কুকুর দেখে, তাহা হইলে নাকি দাম্পত্য সম্পর্ক সুখময় হইবে না—এ বিশ্বাস ইংরাজ জাতির প্রবল।

স্কটল্যাণ্ডে বর-বধূর সামনে বিবাহ তারিখে যেন কোন কুকুর আসিয়া উদয় না হয়—উদয় হইলে বিবাহ হইবে বিষময় এবং অ্যাবার্ডীনের লোক বলে—সকালে যদি কুকুরের ডাক শুনিয়া নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাহা হইলে সে দিনটা খুব খারাপ যায়।
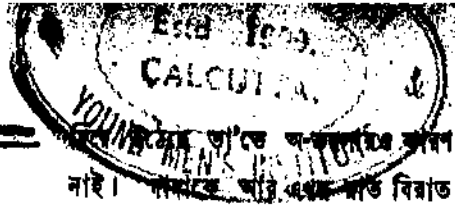
আশ্রমী প্রেম

শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়

বিষ্টুদার বরাত ভাল। অবশেষে নিভাদি একটু ফিনকি হেসে মালাটা পরিয়ে দিল দাদার গলায় পঞ্চাশোর্দ্ধে। দুজনের বয়স একাত্তুরে বাহাত্তুরে দাঁড়িয়েছে। বিয়ে ফুরিয়ে বাজনা। যা' হক দাদাকে আর হাত পুড়িয়ে রাঁধা করে খেতে হ'বে না। আমাদের দিদিটিও নাকি বকেয়া নন। দাদার জীবনে অনেক ব্যর্থ বসন্ত বাদ সাধিয়াছে। ব্যবস্থাটা মন্দ হয় নি। কারণ এতে সংসার ও সন্ন্যাস দুই চলিবে। ব্রাহ্মণের স্পর্শ পেয়ে নিভাদি'র বুকের আগুন নিভেছে, এতেই আমরা দশজনে কৃতার্থ হ'য়ে সূতিকা ষষ্ঠীর অনুগ্রহ-আশার পথ চাহিয়া রহিলাম। দাদাটি সদাচারী, কাজেই ফল ধরবে ভাল। স্বর্গগত ভট্টচাজ মশায় পিণ্ডির আশা ত্যাগ করে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন। সে দিন স্বর্গের আত্মাগুলো তাঁকে এই বৈরাগ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি হেসে বললেন, "মর্ত্যে এক খোদার খাসী রেখে এসেছিলেম বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ। বুড়ো বয়সে ভাগাড়ে ডুবাচ্ছে"। ঊর্দ্ধলোকের এই বেতারবার্তাটুকু দাদার কাছে পৌঁচেছে কিনা জানি না। দাদার কাউন্টেনের কালি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। জীবনের পেয়ালাও বহুদিন উপুড় হ'য়েছে। নূতন বাবলাটা জমবে ত? তবে বাজলার লিমিটেড কোম্পানীগুলি, যেরূপ চোতা ...কে তা'তে অ-...র কারণ নাই। ...কে আর ...ভ বিরাত পথ চলতে দেখা যায় না। তিনি নাকি বর্তমানে যৌবনকে ধন্য করিয়া তুলিবার উদ্যোগে আছেন। দেখা যা'ক ফলাফল কি দাঁড়ায়। দীনবন্ধু মিত্তির কিন্তু বহু পূর্ব্বেই হুসিয়ার করিয়া গিয়াছেন, "আনাড়ীর ঘোড়া লয়ে অপরেতে চড়ে।" দিদিটিও অকালকুসুম নন। দাদার এই নূতন চা'ল-চিড়ে বাঁধবার খবরটায় নাকি আশ্রমের মেয়ে-মজলিসে বেশ হ'ল্লা জমে উঠেছে। বিয়েটা নাকি একান্তই জবরজঙ্গ গোছের হ'য়েছে। কেন? এতে আর দোষ কি? সৃষ্টির বেদনা যখন জেগে ও'ঠে বয়সের হিসাব আর কে করে বল? পিপাসায় যখন ওষ্ঠাগত প্রাণ তখন হ'লইবা জল কিছুটা ঘোলা। তেষ্টাটাকে সামলাতে হ'বে ত? বিষ্টুদা' ছিরিছাঁদে নেহাৎ ফেলনা নন। মাথায় অবশ্য কিঞ্চিৎ চুলের অভাব। এক হিসাবে এ'তে সুবিধাই হ'বে। দিদিটিও মেদ-মজ্জায় নাড়ী-ভুঁড়িতে বেশ টইটুম্বুর। একদিন দাদার পাঠশালারই পড়ুয়া ছাত্রী ছিলেন। তারপর এল বস্ত্র-বিলাসের দিন। খাসা প্রস্তাব, "তুমি আমার বিবাহ কর। নইলে এ-জীবন মরুভূমি।" দাদা দু'চোখ রগড়িয়ে বললেন, "ঠাট্টা করছিস না ত নিভা"? নিভাদি' বোকা হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "কেন? পানসি কি আমার ভিতর পরিচিত কণ্ঠের আভাস? এখন মলাট ছাড়িয়া গ্রন্থের ভিতরে আসুন।" দিল দরিয়া মেজাজে দাদা তাকে গ্রহণ করলেন। প্রেম-পীড়ার প্রতীকার এ ছাড়া আর কি হ'তে পারে আপনারাই বলুন? এই শুভ সাদী উপলক্ষে বিশেষ ঘটা কিছুই হয়নি, কাকে বকেও টের পায়নি। জোনাকি পোকাগুলো বাতি জেলেছিল মাত্র। এমন রাজ-যোটক কেহ কখনও দেখেনি। বাসর ঘরের চারিদিক ফুটা করিয়া কতকগুলি কৌতুহলী চক্ষু প্রায় সারারাত উঁকি পড়িয়াছিল। সকলই অঘটনঘটীয়সীর লীলা। বিষ্টুদা' তার অন্যান্য ভায়রাভাইগুলোকে বেয়াকুব বানাইয়া দিয়াছেন। বস্তুত

আরও দু'চার দশ গণ্ডা ছিল। কিন্তু এলাকা পেলেন না কেহই। দাদার বুক অনেকটা বদলে গেছে। প্রাণ পিঞ্জরে নূতন পাখী বাসা বেঁধেছে। সাতটার আজকাল সকাল হয়। দুধের বাটীতে চোঁ চোঁ করিয়া চুমুক মারেন। আহারের পরিমাণও প্রায় দুনোদুনি বেড়ে গেছে। খরচের সঙ্গে তাল সাম্‌লিয়ে চলতে হ'বে ত! দিদিটি মাঝে-মাঝে প্রেম লিপি লিখেন। আমরা বলি, 'কালী কুলাও'। দিদির হাতে সেদিন কে যেন "কৃষ্ণ কবচ" এঁটে দিয়ে গেছে। তাই ত বলি, "পতি পদে মতি যার তারে বলি সতী।" বিবাহটা যে অধুনা স্পোর্টে দাঁড়িয়েছে তা বুঝি আপনারা জানেন না? স্বামীকে দিতে হয় স্ত্রীর অধিকার আর স্ত্রীকে স্বামীর। তারপর যোগাযোগের ভীড়। ভীড় ঠেলে বেরিয়ে পড়েন এক-জন নূতন আগন্তুক। আপনারা সকলে সমস্বরে বলুন, "প্রয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।" নিভাদি'র মত রমণীরত্ন জগতে দুর্লভ। তিনি "কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং" মন্ত্রে দাদার পদ বন্দনা করেন। এটা তামাসা কি ঠাট্টা ঠিক বোঝা যায় না। চারি চক্ষুর চোরা চাহনিতে মনটা যেন কেমন হুহু করিয়া ওঠে, তাই বলি:—

"যুবক-যুবতী জাগো—
যামিনী যে যায় গো"।

ছায়া ও কায়া

শ্রীমধু বসু

ঢাকায় শিশিরকুমার

ঢাকার 'পিকচার হাউস' চিত্রগৃহে গত ৭ই হতে ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী সদলবলে অভিনয় করেছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে নব নাট্যমন্দিরকে ঢাকায় অভিনয় করবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয় এবং তাঁরা সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, কিন্তু ঢাকা সহরে তখন মা ৺শীতলা দেবীর রাজত্ব চলছিল বলে তখন বায়স্কোপ পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল—সুতরাং ভাদুড়ী মশায়ের যাওয়াও সে যাত্রার মত স্থগিদ ছিল। সে যাওয়া এতদিন পরে হল।

ঢাকা ষ্টেশনে কয়েকটী তরুণ যুবক শিশিরকুমারকে সম্বর্দ্ধনা করে বলেন—আপনার অবর্ত্তমানে এ জিনিষটী নষ্ট হয়ে যাবে—প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন "এই বাংলা-দেশে এমন একজন জন্মাবেন বা জন্মেছেন যিনি এর ভার নেবেন।"

প্রথম দিনে অভিনীত হয় 'বিজয়া'। অভিনয় তেমন জমে নি, স্বয়ং বড়কর্ত্তাই সে রাত্রে এমনভাবে অসুস্থ (!) ছিলেন যার জন্য দর্শকগণ অত্যন্ত বিরক্তি নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ পরিত্যাগ করেন। অন্যস্থানে গিয়ে এভাবে অসুস্থ হওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? এমনই অসুস্থ যখন হতে হল তখন দর্শকের সামনে আত্মপ্রকাশ না করাই উচিৎ ছিল না কি? প্রথম দিনের অভিনয় দেখেই দর্শকগণ মশায়ের উপর বিরক্ত হয়ে উঠলেন। দ্বিতীয় দিন অভিনীত হল 'রীতিমত নাটক'। এ রাত্রে বিশ্বনাথ ভাদুড়ী প্রথম ঢাকার দর্শকদের সামনে প্রথম অভিনয় করলেন। এ রাত্রে দিগম্বরের ভূমিকায় শিশিরকুমার অপূর্ব্ব-সুন্দর অভিনয় করে সমবেত দর্শকদের প্রশংসা লাভ করলেন। অন্য সকলের অভিনয়ও চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। তৃতীয় রাত্রে পুনরায় 'বিজয়া' অভিনীত হল। সকলেই তথাকথিত অসুস্থ ছিলেন না বলে এবং নরেনের ভূমিকায় বিশ্বনাথ অভিনয় করাতে অভিনয় অতি সুন্দর হল। শিশিরকুমার রাসবিহারীর ভূমিকায় তার পূর্ব্বখ্যাতি অক্ষুন্ন রাখলেন।

রীতিমত নাটকের অত্যন্ত চাহিদা হওয়াতে চতুর্থ দিনে দুবার অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু বড়কর্ত্তার রাডপ্রেসার বেড়ে যাওয়াতে একবারই হয়। এই দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ বাংলার অদ্বিতীয় অভিনেতা হিসেবে শিশিরকুমারকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। পঞ্চম দিন শিশিরকুমার রোগাক্রান্ত থাকার দরুণ অভিনয় বন্ধ থাকে, ষষ্ঠ দিন তাঁকে বাদ দিয়েই 'বিরাজ-বৌ' 'রাধা-কৃষ্ণ' অভিনীত হয়। উভয় বইতে নীলাম্বর ও আয়ানের ভূমিকায় যথাক্রমে বিশ্বনাথ ও [illegible] পাল অভিনয় করেন।

ঢাকার দর্শকদের প্রথমেই যিনি মুগ্ধ করেছেন তিনি হচ্ছেন শিশিরকুমার—দিগম্বর ও রাসবিহারীর ভূমিকায় তার অভিনয়খ্যাতি সকলেরই মুখে শোনা গেছে। সুহৃৎ ডাক্তার, নরেন ও নীলাম্বরের ভূমিকায় বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর অভিনয়ও সকলের প্রশংসা লাভ করেছে। দিব্যেন্দু ও বিলাসরূপে শৈলেন চৌধুরীও প্রশংসা লাভ করেছেন। পঞ্চানন বন্দ্যোঃ তার বিখ্যাত পরেশরূপে অভিনয় করে সর্ব্বজনের সমাদর লাভ করেছেন। কার্ত্তিক চন্দ্র দে, শীতল পাল, শান্তশীল গোস্বামী, অমল বন্দ্যোঃ, অরুণ চট্টোঃ, জীবেন বসু প্রভৃতিরাও স্ব স্ব ভূমিকায় সুঅভিনয় করে প্রশংসা লাভ করেছেন। বিজয়ার ভূমিকায় দেখা দিয়ে শ্রীমতী কঙ্কা যশ লাভ করেছেন। শ্রীমতী রাণী ও প্রভা-কল্পা প্রতিভাও প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়েছেন।

শিশির সম্প্রদায়ের অনেকেই ঢাকায় থাকাকালীন পীড়াগ্রস্ত হয়েছিলেন, একজনের কলেরার মতও হইয়াছিল। শ্রীভগবানের কৃপায় এখন সকলেই সুস্থ আছেন—গত বুধবার তারা কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। শিশিরবাবু এখনও সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হতে পারেন নি, তবে কতকটা ভাল।

রবি রায়ের সম্মান রজনী

আজ নাট্যনিকেতন মঞ্চে অতি চিত্রা-কর্ত্তৃক অভিনয় আয়োজন হয়েছে, বিখ্যাত অভিনেতা রবি রায়ের সম্মানরজনী উপলক্ষে। প্রথমে শ্রীমতী কঙ্কাবতী ও নীহারবালা গান গাইবেন—তৎপর রঘুবীর মা ও সীতা হতে নির্ব্বাচিত দৃশ্যাভিনয় হবে। এ অভিনয়ে যোগদান করবেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, শ্রীমতী প্রভা, কঙ্কা, প্রভৃতি। তৎপর অভিনীত হবে 'পোষ্যপুত্র'—এতে ভূমিকা গ্রহণ করবেন—

শ্যামাকান্ত—অহীন্দ্র চৌধুরী, রজনী—নরেশ মিত্র, বিনোদ—জীবন গাঙ্গুলী, হেমেন—ভূমেন রায়, ফটিকচাঁদ—জহর গাঙ্গুলী, গাঁটকাটা—আশু বোস, শিবানী—নীহারবালা, শান্তি—চারুবালা, তাকিয়াহরি—রাজলক্ষ্মী, সিদ্ধেশ্বরী—নীরদা প্রভৃতি। এর পর অভিনীত হবে, 'খনা' ভূমিকায় নামবেন, বরাহ—অহীন্দ্র, মিহির—জহর, কামন্দক—মনোরঞ্জন বা রবি রায়, খনা—নীহার, প্রভৃতি। অন্যান্য ভূমিকায় মণি ঘোষ, সন্তোষ দাস প্রভৃতিরা অভিনয় করবেন। এ সুযোগ নাট্যামোদীরা হারাবেন না নিশ্চয়।

ক্যালকাটা থিয়েটার্স

অভিনেতা শ্রীমণি ঘোষের উদ্যোগে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃসম্মেলনে নাট্যনিকেতনে খুব শীঘ্রই ৺গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল এবং আরেকখানা বড় নাটক একসঙ্গে অভিনীত হবে। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী প্রফুল্লতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় সর্ব্বপ্রথম অভিনয় করবেন। ৺গিরিশ স্মৃতিভাণ্ডারে সাহায্যার্থে কর্ণওয়ালিস রঙ্গমঞ্চে যে সময় প্রথম দানি+শিশির সম্মিলিত হন প্রফুল্ল নাটকাভিনয়ে সেই সময় প্রফুল্লতে কাঙ্গালীচরণের ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবুকে নামাবার কথা ছিল, কিন্তু নানা কারণবশতঃ মহাকবির ওই স্মৃতি রজনীতে আর্ট থিয়েটার যোগদান করেন নি ; সেই ভূমিকায় এবার অহীনবাবুকে দেখা যাবে। এ অভিনয়ের আকর্ষণ কাটান বড় কঠিন হবে, কারণ একই নাটকে কলিকাতায় রঙ্গালয় ও চিত্রজগতের জনকতক নামজাদা শিল্পীদের দেখার লোভ বড় কম নয়। আমরা মণিবাবুর উদ্যমের সাফল্য কামনা করি।

রঙ্গালয় সংবাদ

রঙ্‌মহলের নতুন নাটক 'নজরাণীর সংসার' ধীরে ধীরে জমে উঠেছে শুনে সুখী হয়েছি। আমরা তাদের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

নাট্যনিকেতন 'কেদার রায়' ও 'আলাদীন' চালাচ্ছেন—নতুন নাটক খোলবার নাকি কোনই প্রয়োজন নেই।

নব নাট্যমন্দিরের পরিচালক ভাদুড়ী মশায় যদি সুস্থ থাকেন তাহলে 'অচলা' শীঘ্রই অভিনীত হবার সম্ভাবনা আছে।

মিনার্ভায় নাকি নতুন নাটকের প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে, এজন্য কালীবাবু হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। 'দস্যু' বেশ চলেছে।

রূপমহলের জয়ধ্বনি কেমন হয়েছে, কারা করছেন তার কোন খবরই জানিনা।

ষ্টুডিয়ো সংবাদ

ইষ্ট-ইণ্ডিয়ার 'সোনার সংসারের' মুক্তিকাল সন্নিকট, আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে উত্তরায় দেখা দেবে বলে স্থির হয়েছে। দেবকী বসুর নতুন ছবির জন্য আমরা বেশ কৌতুহলী হয়ে রয়েছি। সোনার সংসারের ভূমিকালিপি এইরূপ :—

জয় শঙ্কর নাথ—অহীন্দ্রচৌধুরী, রমেশ—জীবন গাঙ্গুলী, রঘুনাথ—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক—রতীন বন্দ্যোঃ, জমিদার—রাধিকানন্দ মুখার্জ্জি, পণ্ডিত—তুলসী লাহিড়ী, রমা—ছায়া দেবী, অলকা—মেনকা দেবী। এ ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় ভূমেন রায়, বিনয় গোস্বামী, সত্য মুখার্জ্জি, নির্ম্মল বন্দ্যোঃ, ধীরেন দাস, লক্ষিত মিত্র, কৃষ্ণ মুখার্জ্জি, রঞ্জিৎ রায়, আঙ্গুরী, কমলা (ঝরিয়া), পূর্ণিমা প্রভৃতিকে দেখা যাবে। এত শিল্পী সমাবেশ খুব কম ছবিতেই দেখা যায়। ছবিখানি যদি ১০ই অক্টোবর মুক্তিলাভ করে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। প্রচার বিভাগ ছবিখানির সুষ্ঠু ও কার্য্যকরী প্রচার কার্য্যের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

এদের উর্দ্দু চিত্র 'বাগী সিপাহী'র সম্পাদনা হচ্ছে—আগামী অক্টোবর মাসেই কলিকাতা ও পাঞ্জাবে প্রদর্শিত হবে বলে শোনা যাচ্ছে।
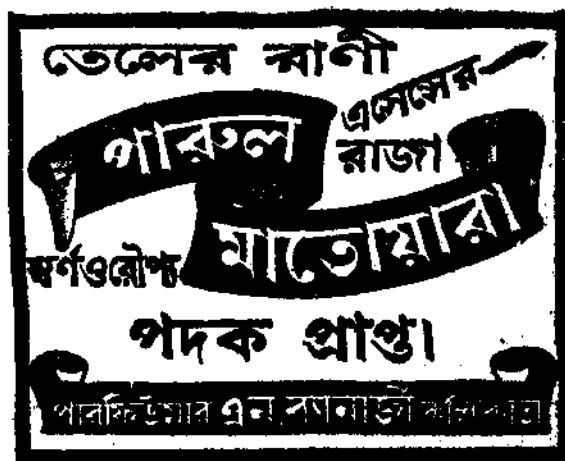
নিউ থিয়েটার্স

নিউ থিয়েটার্সের 'গৃহদাহ' সম্ভবতঃ অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে চিত্রায় প্রদর্শিত হবে। চিত্রা সংস্কার হচ্ছে—নতুন রূপ নিয়ে 'গৃহদাহ' নিয়ে চিত্রা পুনরায় যাত্রা শুরু করবে। 'বিজয়া' যে ১০ই অক্টোবর রূপবাণীতে প্রদর্শিত হবে সে খবর কারোই অজানা নেই নিশ্চয়। আর কয়েক দিনের মধ্যেই 'দেনা পাওনার' হিন্দি সংস্করণ 'পূজারিণ' নিউ সিনেমায় দেখান হবে। ষোড়শী ও জীবানন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন চন্দ্রাবতী ও সাইগাল, পরিচালক প্রফুল্ল রায়। চন্দ্রাবতীর প্রথম হিন্দি চিত্র দেখবার জন্য আমরা উন্মুখ হয়ে রয়েছি। এদের অন্যান্য ছবিগুলির খবর জানি না।

দেবদত্ত ফিল্মস

দেবদত্ত ফিল্মসের নব নিয়োজিত পরিচালক কালী প্রসাদ ঘোষ স্বরচিত 'ফুল্লরা' এখানে গছান যায় কিনা সে চেষ্টায় আছেন। ফুল্লরার কাহিনী অতি চমৎকার, যদি রচনা ভাল হয় এবং যোগ্য পাত্র পাত্রীর ওপর ভূমিকার ভার ন্যস্ত করা যায় তাহলে 'ফুল্লরা' সাফল্য মণ্ডিত হবে বলেই মনে হয়। কারণ পরিচালক ঘোষমশায়ের ওপর আমাদের আস্থা আছে।

রাধা ফিল্মস্

রাধা ফিল্মসের বিষবৃক্ষের কাজ এগুচ্ছে। বড়দিনের সময় রূপবাণীতে এর বীজ রোপিত হবে। যশস্বী নবীন ক্যামেরাম্যান যতীন সহোদর প্রবোধ দাস এখানে স্থায়ীভাবে যোগদান করায় আমরা বিশেষভাবে আনন্দিত হয়েছি। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার একটী ইউনিটে এরা 'ছিন্নহার' তুলবেন বলে নাকি কথাবার্ত্তা চালাচ্ছেন। 'ছিন্নহার' স্বর্গীয় নট-নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটী প্রসিদ্ধ নাটক।

শ্রীভারত লক্ষ্মী ষ্টুডিয়োতে মধুবোসের পরিচালনায় ক্ষীরোদ প্রসাদের 'আলিবাবা'র শ্যুটীং চলছে। আলিবাবার ভক্ত-ঘরের স্ত্রী পুরুষেরা অভিনয় করছেন—এদিক দিয়ে এর আকর্ষণ বড় কম হবে না। 'আরব্যোপন্যাসের' এই মনোরম কাহিনীকে বাস্তবভাবে রূপ দেবার জন্য খ্যাতনামা শিল্পী সুধাংশু চৌধুরীকে নিয়োজিত করা হয়েছে। দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার পরিকল্পনা তিনি করেছেন। ইণ্ডিয়া হাউসের ও মেট্রো সিনেমার প্রাচীর চিত্র ইনি অঙ্কিত করেছেন।

কালী ফিল্মসের 'টকি অব্ টকিজের' কাজ এগুতে পারছিল না, কারণ ভাদুড়ী সম্প্রদায় বাহিরে গিয়েছিলেন বলে; এখন পুনরায় শ্যুটীং আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়—শুনছি অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে 'শ্রী'তে এখানা প্রদর্শিত যাতে হতে পারে সে চেষ্টা করা হচ্ছে।

'পরভৃতিকা'র নায়িকার ভূমিকায় অবশেষে শিশুবালাকেই নাকি গ্রহণ করা হয়েছে।

'রামকান্ত'র বিজ্ঞাপন মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। খবর কি? প্রফুল্ল পিকচার্সের 'মা'রই বা খবর কি? 'মা' ছবিটী দেখবার একটু যে ইচ্ছে নেই তা নয়, কারণ জাল জুবেদা-কাননের একত্র মিলন উপেক্ষার নয় নিশ্চয়।

বাংলা 'মা'কে হত্যা করেছেন প্রফুল্ল ঘোষ মশাই, এবার তারই হাতে হিন্দিটা কেমন রূপ পেল তা দেখতে চাই।

পপুলার পিকচার্সের 'পণ্ডিত মশায়ের' শ্যুটীং কালী ফিল্মসের ষ্টুডিয়োতে সতু সেনের পরিচালনায় হচ্ছে খুব ধীর গতিতে।

পপুলার পিকচার্সের অন্যতম কর্ণধার যামিনী মিত্র স্বতন্ত্রভাবে একটী ছবি তুলবেন। আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর শ্রীভারত-লক্ষ্মীর ষ্টুডিওতে 'সরলা'র শ্যুটীং আরম্ভ হবে। ভূমিকালিপি নাকি এই ভাবে বণ্টিত হয়েছে, যথা—শশীভূষণ—অহীন্দ্র চৌধুরী, বিধুভূষণ—সুপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, গদাধর—তুলসী লাহিড়ী, নীলকমল—কেষ্টধন মুখোঃ, রমেশ দারোগা—তারা ভাদুড়ী, শ্যামা—প্রভা, প্রমদা—মনোরমা, দিগম্বরী—সুশীলা, প্রমোদার মা—হরিসুন্দরী প্রভৃতি। নাম ভূমিকায় কে যে নামবেন তা আমরা এখনও জানি না, তবে জ্যোৎস্না

গুপ্তা বা মায়া মুখার্জ্জির নাম শোনা যাচ্ছে। পরিচালনা করবেন চারু রায়। দিগম্বরীর ভূমিকায় মনোরমাকে নামানই শ্রেয়, প্রমদার ভূমিকায় মঞ্চের নিরুপমাকে নামালেও ভাল হবে।

রূপবাণী

ঝড়ের সঙ্গে জীবন যুদ্ধের একটা যেন মিল আছে। ঝড়ের বেগ কখনো কমে কখনো বাড়ে। জীবন যুদ্ধের গতি বৃদ্ধিও তাই। ইউনিভারস্তালের চাঞ্চল্যকর চিত্র "ষ্টর্ম্মি"তে এই ধরণের একটা যোগাযোগ ঝটিকা আর জীবন সংগ্রামের সঙ্গে দেখা যাবে।

একটি ছেলে একটী মেয়ে আর একদল ঘোড়া যেমন অভিনয় করলো তা সত্যিই উপভোগ্য। ছবিখানি সুরু হবে ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে। এর পরের সপ্তাহে দেখানো হবে প্যারা-মাউন্টের রঙিন ছবি "ট্রেইল অফ দি লোন্ সাম পাইন" সুরু হবে শনিবার ২৬শে সেপ্টেম্বর।

সাহায্য অভিনয়

খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক শ্রীযুত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'ঝড়োহাওয়া' নামক উপন্যাসখানিকে ২৪ পরগণা জেলার পানিহাটী মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত বিভূতিকুমার মুখোপাধ্যায় নাটকাকার দান করেছেন। আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় (সাড়ে ৬টা) আগড়পাড়া সেন ষ্টেটস্থ সারস্বত সম্মিলনী রঙ্গমঞ্চে সোদপুর লাইব্রেরীর গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে উক্ত নাটকখানি অভিনীত হবে। শৈলজানন্দ ও বিভূতি কুমার বাবু উভয়েই অভিনয় করবেন। অভিনয়ের স্থানটি আগড়পাড়া রেল ষ্টেশনের নিকটেই অবস্থিত। সর্ব্বসাধারণের সাহায্য প্রার্থনীয়।

সাপ্তাহিক এনগেজমেণ্ট

এ সপ্তাহে আমরা বহুস্থান হইতে নানা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সময়াভাবে সবস্থানে যোগদান করা সম্ভবপর হয় নাই, সেজন্য ত্রুটী স্বীকার করিতেছি।

গত শনিবারে অপরাহ্নে বেঙ্গল কেমিক্যালের মাণিকতলাস্থিত ফ্যাক্টরীতে একটী প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল। ঐ দিন কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র স্যর হরিশঙ্কর পাল এবং অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলারদিগকে প্রীতি সম্মেলনে সম্বর্দ্ধিত করেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সাংবাদিকগণ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। কারখানার বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শনান্তর সমবেত অতিথিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয় এবং শেষে বেঙ্গল কেমিক্যালের 'সিপ্রা' সাবান এক বাক্স এবং এক টীন "পানীয়ম" উপহার দেওয়া হয়।

ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলা কলেজ ষ্ট্রীটস্থ ওয়াই, এম সি, এ হলে পৃথিবী ভ্রমণকারী শ্রীযুত রামনাথ বিশ্বাসকে তাঁহার অনুরাগী বন্ধুবর্গ এক প্রীতি সম্মেলনে সম্বর্দ্ধিত করেন। ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস প্রমুখ শ্রীহট্টের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং কয়েকজন সাংবাদিক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুত বিশ্বাস তাঁহার পৃথিবী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং শীঘ্রই আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইবেন বলেন।

এই দিনই সন্ধ্যাবেলা ওয়াই, ডবলিউ সি, এ হলে মুর্শিদাবাদ বন্যা পীড়িতদের সাহায্য কল্পে এক জলসার আয়োজন হইয়াছিল।

গত রবিবার ৪২ মধু গুপ্ত লেনস্থ জগজ্জ্যোতি গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগারের ষড় বিংশতি বার্ষিক অধিবেশন ৫২।১।২ কলেজ ষ্ট্রীটে হইয়া গিয়াছে।

গত রবিবার সন্ধ্যাবেলা 'খেয়ালী'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মানার্থে ১১ নং চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোডস্থ খেয়ালী ভবনে এক প্রীতি ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে সাংবাদিক, সিনেমা কোম্পানীর পরিচালক, কবিরাজ, এটর্নী, উকীল, ব্যারিষ্টার, শিল্পী, গায়ক, কাউন্সিলার, কংগ্রেসকর্ম্মী প্রমুখ বহু লোক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে যোগদান করিয়াছিলেন। দুই শতাধিক লোককে ভুরিভোজে আপ্যায়িত করা হইয়াছে। খেয়ালী প্রেসের উপরে যে হোগলা বাঁধা হইয়াছিল, নিমন্ত্রিতদিগের মধ্যে অনেকেই আগামী "কোল্ড ওয়েদারে" ইহা অপেক্ষা বড় হোগলা দেখিবার আশা রাখেন। দেখা যাউক!

রঙ্গ-রস

—হ্যাঁ হে, বিয়ে ক'রে অপূর্ব্ব ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দিলে ?

—ছাড়েনি। ব্যাট দিয়ে উনুনের কয়লা গোঁজে। সংসার দেখতে হয় কি না। স্ত্রীটি সুন্দরী—রান্নাঘরে যেতে পারে না।

* * *

স্ত্রী। আমার রান্না খেয়ে তোমার কি মনে হয় ?

স্বামী। যে জীবন-বীমা করেছি, সে টাকাটা অচিরে তুমি পাবে।

* * *

গণক। আপনার ভাগ্য গণনা ক'রে দেবো ?

ভদ্রলোক। কত লাগবে ?

গণক। চা'র আনা।

ভদ্রলোক। ওস্তাদ লোক! আমার পকেটে আছে ঠিক চা'র আনা।

* * *

—তোমার স্ত্রীর খুব বকা-স্বভাব ?

—বলো কেন ? আমি যদি বোবা হ'য়ে যাই, তা'হলে সে খবর তিনি জানবেন আট মাস পরে।

* * *

—যে পুরুষ স্বীকার করে তার ভুল,—সে সত্যকার জ্ঞানী। আর যে পুরুষ ভুল না ক'রে চুপ-চাপ থাকে···

বুঝতে হবে, সে বিবাহিত।

* * *

—আমার বাড়ীর মালিক আর কর্তা আমি।

—বুঝেছি—তোমার স্ত্রীও তা'হলে পিত্রালয়ে গেছেন।

গত বৎসর কানাডায় বিদেশী পর্য্যটক আসিয়াছিল সর্ব্বসমেত প্রায় দেড় কোটী —অর্থাৎ কানাডার অধিবাসীর সংখ্যার চেয়ে পর্য্যটকের সংখ্যা হইয়াছিল প্রায় দেড়গুণ বেশী।

—

জাপানে রেলকর্ত্তৃপক্ষ কয়েকটি আইন বাঁধিয়া দিয়াছেন ; এবং সে আইন যথা-রীতি পালন সম্বন্ধে বিলক্ষণ হুশিয়ার। সে বিধিগুলি বলি,—১। কামরায় ভিড় থাকিলে কোনো যাত্রী তাঁর সীটের পাশে ছোট বড় কোনো রকম লাগেজ রাখিতে পারিবে না। ২। রাত্রে পরের জায়গা জুড়িয়া ট্রেণের সীটে পা ছড়াইয়া নিদ্রা দিবে না। ৩। নারী-যাত্রীরা ট্রেনে কাপড় বদলাইবে না। ৪। ট্রেণে বসিয়া গান বাজনা করিতে পারিবে না। ঘুম-কামরায় চুপচাপ থাকিতে হইবে—উচ্চকণ্ঠে কথা বলা বা গল্প চলিবে না।

—

সপ্ত সমুদ্র বলিয়া কথা চলিত আছে পৃথিবীর সকল দেশে—শুধু ভারতবর্ষেই 'সপ্ত সমুদ্র' বা 'সাত সাগর' কথার চলন নয়। অপর প্রদেশের লোকেও প্রাচীন যুগ হইতে বলে—"সেভেন সীজ"; সে সপ্ত সমুদ্র কোনগুলি ? সে সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীরা নির্দ্দেশ করিতেছেন, উত্তর ও দক্ষিণ আটলান্টিক, উত্তর ও দক্ষিণ প্যাসিফিক ; ভারত মহাসাগর, আর্কটিক এবং আনটার্টিক সাগর।

—

চীনে মেয়েদের 'বব' চুল নিষিদ্ধ হইয়াছে।

—

বৃটেনে টিনে ভরা কাঁকড়া চালান আসে বছরে প্রায় ছয় লক্ষ পাউণ্ডের। চার লক্ষ পাউণ্ড দামের কাঁকড়া আসে শুধু জাপান হইতে।

—

ইতিহাস পড়িয়া অনেকের ধারণা বিলাতে "ম্যাগনা চার্টা" বৃটনরাজ জন সহি করিয়াছিলেন ১২১৫ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুন তারিখে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। রাজা জন ছিলেন নিরক্ষর। তিনি সহি করিতেন কি করিয়া ?

সমালোচনা

রূপায়তন—কবিতার বই। শ্রীবীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত প্রণীত ও ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

শ্রীমান্ বীরেন্দ্রকুমার বয়সে তরুণ। কাব্য-প্রচেষ্টার প্রথম সোপান হিসাবে তাঁর 'রূপায়তন'এর প্রত্যেকটি কবিতাই পড়িয়া দেখিলাম। ইতিপূর্ব্বে মাসিক পত্রিকাদিতেও পড়িয়াছিলাম। সৃষ্টির মূলে যেরূপ প্রেমাবেগের পরিস্থিতি হইতে জগত-সৃজনের কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে, এবং তাহার উচ্ছ্বসিত গতি-ভঙ্গির উন্মত্ততা প্রবাহমান তটিনী-তরঙ্গে মানবের সমষ্টিকৃত মন-সমুদ্রে রসান্বিত একটা ধৃতির মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া গতি-পথ সতত কল-কূজনে মুখর করিয়া রাখিয়াছে—কাব্যে কেন্দ্রগত প্রেরণাও সেই তরঙ্গচপল যৌবনেরই ক্রমবিকাশ। শ্রীমানের কাব্য-প্রেরণাও সেই প্রথম-যৌবনের উচ্ছ্বাস হইতে আত্মপ্রকাশ করিলেও, ইহার একটি সবল ও স্বচ্ছন্দ গতি রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

'প্রথম প্রণয়ভীরু আমি তব উন্মত্ত মদন ;'

কিম্বা—

'তব তনু-সিন্ধুতীরে কৈশোরের উগ্র
স্বপ্ন-কথা
বিক্রান্ত তাণ্ডবনৃত্য গর্জ্জমান, অমিয়-মধুর ;'

অতএব—

'কুহকী অন্তর পাখী তোমা লাগি উদ্দাম
চঞ্চল,'

কিশোর-কবির মধ্যে আসন্ন যৌবনের দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা যখন অবারিত ও উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে, তখন কবিতার মধ্যে তাহার স্বত-উৎসারিত আবেগই যে মুক্ত হইয়া আবরণ-উন্মোচন করিবে—ইহা স্বাভাবিক। কবিতা যেখানে স্বাভাবিক-নীতি অনুসরণে বাস্তবক্ষেত্রে শৃঙ্খলমুক্ত হয়—তাহার একটা সার্ব্বজনীন প্রভাবও সেই সাথে সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। এঁর মুখেই যখন আবার শুনিতে পাই—

'আলুল আছিল চুল, যৌবনের পুঞ্জীভূত
মদন-মদিরা
তোমার দেহের তটে লেগেছিল ঢেউ,
জানিত না কেউ ;
আমি শুধু জেনেছিনু আর জেনেছিল মোর
সর্ব্বগ্রাসী কামার্ত্ত ইন্দ্রিয়,'

তখনও সেই আত্মবিস্মৃত উন্মাদ প্রবৃত্তির তাড়না মাত্র উপলব্ধি হইলেও, একটা স্বপ্নময় কাব্যময় স্বভাব-সৌন্দর্য্য উপভোগের অবসর পাওয়া যায়। কবির প্রত্যেকটি কবিতাই এইরূপ সহজ সরল তটিনীগর্ভের সমুদ্রমুখী প্রসারের মধ্য দিয়াই তাহার স্বপ্রণোদিত পথ মুক্ত করিয়া লইয়াছে। এই জন্যই মনে করি, প্রথম-যৌবনের উচ্ছ্বাস ভরা-যৌবনের সমুদ্রে মিলিত হইয়া ক্রমশ যে একটা গভীরতর স্থৈর্য্যভাব ধারণ করিবে, বইখানি আগাগোড়া পড়িলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষও পরিলক্ষিত হয়। কিশোর-কবির পক্ষে ইহাপেক্ষা আশাজনক সম্ভাবনা আর কি আছে ?

সর্ব্বশেষে প্রচ্ছদপট, ছাপা ও বাঁধাই প্রভৃতির দিক্ দিয়াও বইখানি আধুনিক রুচিসঙ্গত ও সুন্দর হইয়াছে বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না ?

প্রাণের টানে—উপন্যাস। শ্রীমন্মথ নাথ বিদ্যাভূষণ এম, এ কর্ত্তৃক লিখিত। এবং এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷০ মাত্র।

মন্মথবাবুর গান ও রেকর্ড-নাট্য প্রভৃতির সহিত ইতিপূর্ব্বেই পরিচিত হইয়াছিলাম। বর্ত্তমানে তাঁহার উপন্যাসের সহিতও পরিচয় হইল। বইখানি আগাগোড়া পড়িয়া তৃপ্তি পাইলাম। চরিত্র-সমাবেশে, বিশেষতঃ বর্ণনামাধুর্য্যে ইহার মধ্যে উপভোগ্য বস্তুরও অভাব নাই। আখ্যানভাগও প্রশংসনীয়। ছাপা ও বাঁধাই অনুরূপ।

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র
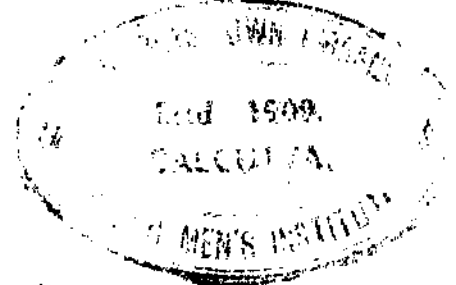
প্রীতি সম্মেলন

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর রবিবার কাশীপুর রাজাস্ পার্কে কুমার বিশ্বনাথ রায় মহাশয়ের নব কুমারের জন্মোৎসব উপলক্ষে এক প্রীতি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। মেয়র, চীফ একজিকিউটিভ অফিসার, এবং কাউন্সিলারবৃন্দ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয় এই আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ভূরিভোজনের সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রে আমন্ত্রিত বর্গের চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থাও ছিল। আমরা নব-কুমারের নীরোগ ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

সচিত্র সাপ্তাহিক
দ্বিতীয় বর্ষ—৩৩শ সংখ্যা
শুক্রবার—৯ই আশ্বিন
১৩৪৩
২৫শে সেপ্টেম্বর—১৯৩৬

সমাধির ফুল
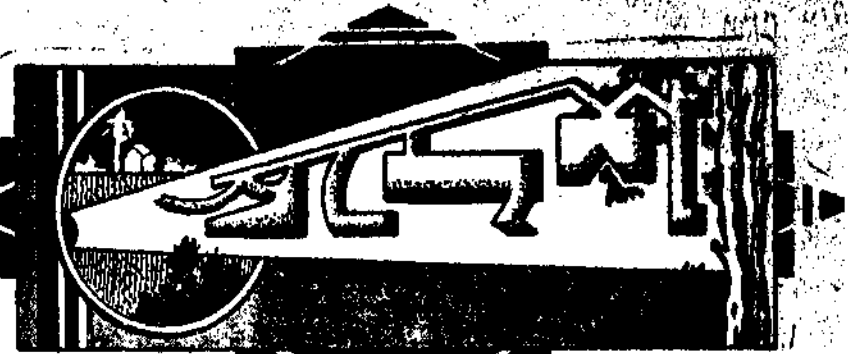
প্রথম দর্শনের এতটুকু একটু দৃষ্টি! না জানি এরই মধ্যে আছে কোন্ অদৃশ্য যাদুকরের সমুদ্রোন্মাদ স্পন্দন! কোন্ অজানা নন্দনের স্বপ্নমাখা পারিজাত-পুষ্প যেন ঘ্রাণের তীব্রতম মাধুর্য্যে অতলস্পর্শী আকর্ষণ-বিকর্ষণের হিন্দোলায় প্রাণতীর্থের মোহনায় করে সৃষ্টি! সেই লীলানিরত প্রশান্ত মোহনার 'পরে দু'টি অজানা-অচেনা হিয়ার উর্ম্মিউথল চেতনার ধারা আনে এক অজানা দেশের রূপকুমার আর রূপকুমারীর বার্ত্তা—সমুদ্রে এসে মিলিত হবার আগ্রহ নিয়ে! তাই—

"এক নিমেষের একটুখানি ভুল'
তাপস-বীরের যাগ ভাঙালো—
জন্মালো তা'র শকুন্তলা-ফুল!"

'এক নিমেষের' এই 'একটুখানি ভুল' হতেই যেমন প্রণয়ের সেরা উপহার পত্রে পুষ্পে পল্লবিত হয়ে ওঠে, যেমন করে একটুখানি দৃষ্টির আধো-আকর্ষণে প্রেমের হয় সঞ্চার, তেমনি ক'রেই বাণীর পূজারী তার পূজার অর্ঘ্য সাজাবার পায় না সময়, সে যেন, কোন্ মৃত্যুর উল্লাসে আপনার অগোচরেই আপনার জালে বাঁধা পড়ে যায়, হয় নিঃশেষিত!

প্রেমের আকর্ষণে যেমন মানুষ হয় উন্মাদ, সামাজিক মানুষ হিসাবে মানুষ হবার উজ্জ্বলতর সম্ভাবনাকে অনায়াসে অবহেলা ক'রে সে সমস্ত কিছু আপদ-বিপদকেই সম্পূর্ণ আপনার প্রাপ্য অবদানরূপে আয়ত্ত করবার চেষ্টা দিয়ে ভরিয়ে নিয়ে সামনে চলে এগিয়ে, সাহিত্যের শরশয্যা গ্রহণে অভিশপ্ত ভীষ্মদের পথও সেই এক। কেননা তারা জানে, তাদের এই সমাধির বেদীমূলেই একদিন বিজয়-রবির কিরণধারা এসে পড়বে!

শত সহস্র ঘৃণা অবহেলার গ্লানিকে অনায়াসে অবহেলার চোখে দেখে যারা আজীবন তাদের সাধনার পথে অপমানের কশাঘাতই গেল স'য়ে, হয় তো জীবন-পথে সে সাধনার মূল্য তাদের পক্ষে পাওয়ার নেই কোনো ইঙ্গিৎ, তবুও তারা যে তাদের মুমূর্ষু প্রাণটাকে আঘাত সইবার যন্ত্রে পরিণত ক'রে হাসি-মুখেই যায় জয়যাত্রায় অবারিত গতিতে আগুয়ান হয়ে—এর মূলে আছে এক দুর্জ্জয় আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা, যে বিশ্বাসে এই মাটির মানুষই হয় দেবতা, যে প্রেরণায় ধরণীর প্রেমই হয় স্বর্গীয়, যে চেতনায় ব্যথাই হয় আনন্দের সুদৃঢ়তম প্রতীক!

তাই বলছিলাম, প্রেমিকে আর সাহিত্যিকে, প্রেমে আর কবিতায় নেই কোনো বিভেদ! যে আদর্শ্য পৃথিবীতে বাস ক'রেও মানুষ তারও বাহিরে এক অপার্থিব জগতের বাসিন্দা হবার স্পর্দ্ধা রাখে, দুঃখকেই যে সুখের চরম অবলম্বন ব'লে মেনে নেবার শক্তি অক্লেশেই পারে বহন করতে,—তাকে আর যাই কেননা বলো বন্ধু, তবু পাগল ব'লে নাসিকাকুঞ্চনই কোরো না! একটু স্নেহ, একটু করুণা তাদেরকেও [illegible] দিয়ো!

চাতিম চাতিম

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

আগে সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাঁধতো, আর নল-খাগড়ার প্রাণটা যেতো। বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন ধরে থাকতো বত্রিশটি নির্জ্জীব পুতুল; তার মানে জনসাধারণ ছিল মূক ও জড়-পুত্তলি; তারা লক্ষ টাকার পৈত্রিক প্রাণটা তাদের দিত সূর্য্য বংশ চন্দ্র বংশ সেন বংশ পাল বংশের গৌরবের জন্যে। মুসলমান জগতেও আলাউদ্দীনের পদ্মিনী পিপাসা মেটাতে হাজার হাজার মুসলীম রাদার হাসতে হাসতে জানটা কোরবাণী করতো। এই ষোড়শ প্রীতিই তখন ছিল রাজনীতির ধরণ।

*　　*

এখন নাকি ডিমোক্রাশীর যুগ। এখন নরু নাপিত আর হরু খানসামা মিলে রাজনীতির আসর জমকে বসেছে; অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের চব্বিশটি নির্জীব মূটে সজীব হয়ে এক টান মেরে রাজতক্তখানা টেনে খানায় ফেলে দিয়েছে। ফলে হয়েছে কি? তার জায়গায় একখানা ইট পেতে পশু ঘরামী জেঁকে বসেছে নরু আর হরুর মাতব্বর হয়ে, তার নাম আর বিক্রমাদিত্য বা আকবর শাহ নয়, তার নাম কমরেড পশু। ফলে দেখা যাচ্ছে হরু ও নরুকে ওঠ-বস করাচ্ছে তাদেরই সগোত্রজ একজন।

*　　*

সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের সঙ্গে চার পোয়া পূর্ণ কলির তফাৎটুকু শুধু ঐখানে। তখন মানুষ ঠেঙাতো রাজা, এখন ঠেঙায় পশু ঘরামী। যুদ্ধ বিগ্রহ তেমনি আছে ব্যাঙ খোঁচানী তেমনি আছে, আইনের নাগপাশ বা ছাঁদন দড়ি গোদা বেড়ী তেমনি আছে; এ সব উপসর্গ শুধু আছে নয়, গণ কল্যাণের দোহাই দিয়ে সুদে আসলে চক্রবৃদ্ধির হারে বেড়েছে বই কমে নি। তবে ধরে ঠ্যাঙাচ্ছে যারা তারা আপন জন আর কষে প্রহারেণ ধনঞ্জয় দিচ্ছে সে নাকি আমাদেরই ভালর জন্যে। এইটুকু আরামের নাম আপাততঃ গণোক্র্যাশী।

*　　*

মস্কোর মাঠে বরোশিলভ আর জার্ম্মাণীর মাঠে হিটলার বৃষ গাঁক গাঁক ডাক ছাড়ছে,—এ বলে "তোমায় এক চোট দেখে নেব, ও বলে তোমায় এবার আচ্ছা ঠোকন্ ঠুকে দেবো।" কাশীরাম দাসের মহাভারতে আমরা ভীমের তর্জ্জন আর দুর্য্যোধনের গর্জ্জন শুনেছি। সেটা ছিল বংশগৌরবের বহ্বাস্ফোট, এটা হচ্ছে গণিকাতন্ত্রের বহ্বাস্ফোট। ফলে যারা পিপড়ার মতো মরবে তারা হচ্ছে নলখাগড়ার দল, অর্থাৎ নরু ও হরু। "হতাপি প্রাপ্সসি স্বর্গং জিত্বাপি ভোক্ষসে মহিম্।" মলে স্বর্গ পাবে নরু ও হরু আর জিতলে তারা বৈকুণ্ঠ থেকে গলা বাড়িয়ে পরম পুলকে দেখবে পশু-ঘরামী হিটলার হয়ে "হেট্টে টেট্টে টেট্টে" রবে তাদেরই বংশধরদের চরিয়ে দিন গুজরাণ করছে।

*　　*

গণিকাতন্ত্রের কথা অমৃত সমান।
জগাকান্ত দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কমরেড জগতে নারী ও পুরুষ সমান অর্থাৎ দু'জনেই কমরেড; সুতরাং আজকের ষ্ট্যালিন-শাসিত গণতন্ত্র কালকে হেলেন-শাসিত গণিকাতন্ত্রে বদলে যেতে পারে; সুতরাং ও নামটা দেওয়া অশাস্ত্রীয় হয় নাই। তা ছাড়া শাস্ত্রেই রয়েছে এক-জনের ঘর করলেই সতী আর বার জনের মন রাখতে হলে বার-বণিতা। এই সব অসুর মার্কা গণতন্ত্রও একপ্রকার বারোয়ারী বিশেষ, দুর্দ্ধর্ষ ডিক্টেটরের সামনে আপামর সাধারণকে ডাউন্ হয়ে থাকতে হলেও নামে ওটা কিন্তু গণোক্র্যাশীই; কারণ

জিরোটির আপ্ মৎলবে ভাওতা চালালেও অজুহাত দেন গণের বা বার জনের। সে যা হোক, কথাটা হচ্ছে—সত্য ত্রেতা দ্বাপর থেকে আজ এই চার পোয়া পূর্ণ কলিতে নক ও হক 'বেটার অফ', না 'ওয়ার্স অফ'? তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটেছে, না বিপর্য্যয় ঘটেছে?

* *

হক ও নক কথা না শুনলে তখন তাদের শূলে চড়াতো, এখন গুলী করে মারে। তখন তাদের ঘর বাড়ী জোৎ জমা ছিল, এখন সেদিক দিয়ে তারা সাইফার। এখন গণের কল্যাণে তাদের আহার নিদ্রা মৈথুনাদি জীবধর্ম্ম পর্য্যন্ত চলে অছির হুকুমে, কারণ প্রমাণ হয়ে গেছে যে তারা জন্মায় নাবালক অবস্থায় এবং চলে ফেরে ইডিয়টের মত। তাদের মুক্তির ও কল্যাণের জন্যেই—সুতরাং তাদের আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধতে হবে। ব্যষ্টি গলায় দড়ি ও কলসী বেঁধে ডুবে মরেছে সমষ্টির কালীয়দহে। গণোক্র্যাসী যতই এগোচ্ছে ততই গণ হয়ে পড়েছে জিরো বা সাইফার। একের পিঠে দাঁড়ালে পাঁচটা সাইফার এককে করে লক্ষ, সাতটা সাইফারে করে কোটী। এক বাবাজীউ কিন্তু সরে গেলেই সাইফার হয়ে যায় নাথিং; গণতন্ত্রের মূল কথাই তাই। আমাদের দেশেও বাঙালী মুসলমানের রাজনীতিতে নবাব নাইট বধ করে হক সাহেব শাসিত চাষীবন্ধুরা আসর জমকে বসবার জোগাড়ে আছেন। ডাক্তার, উকিল, খাঁ সাহেব, ব্যবসায়ী ইত্যাদি সুদে জলৌকারা ক্ষাঁয়েল জোঁকদের শকার বকার করছেন এক্সয়রটার বলে। এটাও গণোক্র্যাসীরই আদিপর্ব্ব।

চাকুম-চুকুম

পঞ্চমুখ শর্ম্মা

বহুদিন পরে কবি ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের 'মানসী'র সাক্ষাৎ পাইলাম। কবির স্বাভাবিক ধর্ম উদারতা। 'নক্ষত্র নিরালা' হইতে হিমশীতল 'উত্তরায়ণ'-এ আসিলে এই ঔদার্য্য যে কতদূর ব্যাপক ও ইত্যাদি হইতেও পারে—তাহা কবি যেমন উপলব্ধি করিয়াছেন, আহা তেমনটি আর কে করিবে? তাই তাঁহাকে যখন বলিতে শুনা যায়—

"তোমায় দেখেছি না-দেখা নয়নে মম,
মোর কাছে তুমি আজো আছ কল্পনা,
আমার মর্ম্মে জ্যোছনা তোমার ছবি
আমার আঁখিতে তনিমা তোমার
সোণা।—"

তখন কেহ যদি নকলই বসে—

"তোমায় ডেকেছি না-চেনা বাড়ীর দ্বারে,
মোর মাঝে তুমি রেলিংএর আল্পনা,
আমার মর্ম্মে জ্যোতনা তোমার লজি,
আমার তুলিতে ঘনিমা তোমার
নোনা।—"

তাহা হইলে উক্ত 'মানসী'র মনের প্রাসাদে সত্যসত্যই নোনা ধরিয়া যাইতে পারে।' এবং কবির হয়তো মনে হইয়াছে, আজকালকার 'মানসী'দের দূর হইতে সেলাম ঠুকিয়া যাওয়াই শ্রেয়, কারণ উহার 'সুদূর কল্পনাতে আধ-ভুলে যাওয়া প্রভাত স্বপন সম' নেশার-আমেজ কোনোক্রমে নোনা ধরিয়া ঠাণ্ডা হইবার সুযোগ পাইবে না। অতএব খুলিয়াই বলিয়া দিয়াছেন—

"আমি তো চাহিনে তব তনুখানি ঘিরে
কপোতের মত চঞ্চল চুম্বন,
আমি চাহি নাই পেলব অঙ্গে তব
আমার বাহুর নিঠুর নিপেশন!"

'কপোতের মত চঞ্চল' অথবা কচ্ছপের মত স্থির'—যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ হউক, উহাতে কিছু আসিয়া যাইবে না, কিন্তু কবির মধ্যে বিশ্ব-প্রেমিকতার তড়বড়ানি দেখিলে সেকালের শ্রীমতী তাড়কাও তড়কাইয়া যাইবে! অর্থাৎ—.

"আমার নিকট চাহিও না তুমি প্রেম
মোর প্রেম নয় একটী নারীর তরে,
এ বিশ্বে আছে যাহা কিছু সুন্দর
মোর প্রেম তায় মৃত্যুঞ্জয়ী করে।

'মৃত্যুঞ্জয়ী' হইতে হইলে অতঃপর আর শিবের মাথায় দুগ্ধ ঢালিতে হইবে না। একেবারে সার্ব্বজনীন প্রেম?

* * *

ভাবিয়াছিলাম 'চিঠির বাক্স' নিজে হাতে আর খুলিব না। কিন্তু অদূর 'ভবিষ্যৎ'-এই দেখিতে পাইলাম, নিজে না খুলিয়াও রক্ষা নাই, কে যেন কখন খুলিয়া রাখিয়া দিয়াছে? তাকাইয়া দেখি—

"নারী ও পুরুষ সৃষ্টির দুই দিক; নেগেটিভ এবং পসিটিভ এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই।"

রণজিৎচন্দ্র সান্যাল খাঁটী কথাই বলিয়াছেন। তবে দুঃখ এই, সমস্যার সমাধান কে করিবে? যদি বলা যায়, নারী নেগেটিভ,—তাহা হইলে স্যাণ্ডেল-কৃপা পৃষ্ঠদেশে অচিরেই বর্ষিত হইবে। যদি বলি পুরুষ নেগেটিভ,—তাহাতেও 'শুভ' (শুভগেন্দ্র নহে) নাই। সুতরাং কুপোকাৎ কাহাকে হইতে হইবে?

অবশেষে রেবা মুখার্জ্জী বেড়ে লিখিয়াছেন—

"দক্ষিণ কলকাতার কলেজ বিশেষে মেয়েদের সকালে ক্লাস হয় এবং এই ক্লাস ভাঙবার আগে থেকেই ঐ কলেজের ছেলেরা (বাইরের ছেলেও যে থাকে না একথা বলা চলে না) মেয়েদের রূপ দেখার জন্য সাগ্রহে দাঁড়িয়ে থাকেন।"

উক্ত কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে লেখিকাও একজন কিনা জানা যাইতেছে না। তবে 'বাইরের ছেলেও যে থাকে'—এটুকুও যাঁহার শ্যেনদৃষ্টি এড়ায় না—তাঁহাকে নেহাৎ 'বাইরের মেয়ে' মনে করিয়াও বা পারি কৈ? আর ছেলে বা মেয়ে বাহিরেরই হউক, অথবা ভিতরেরই হউক—উহা লইয়া তর্কের কোনো মূল্য নাই। কারণ যাহা দেখিবার, এমন কি যাহা দেখাইবার—তাহা তাহা দেখিয়া ও দেখাইয়া

যাহা হয় ? খাইয়া ও খাওয়াইয়াও কি তাহাই হয়, তবে দেখা ও দেখানো, খাওয়া ও খাওয়ানো লইয়াই বা মাথা ঘামাইয়া লাভ কি ? যাহা হইবার, তাহা হউক।

তথাপি শ্রীমতী (অথবা কুমারী) মুখার্জ্জী একটা কথা বড় চমৎকার বলিয়াছেন—

"আমি ছেলে বলতে বিশেষ ক'রে কলেজের ছেলেদের কথাই বলছি। তা ব'লে···মোটেই মনে করবেন না—পুরুষ জাতটির উপর আমার শ্রদ্ধা নাই।"

এই সঙ্গে আমরাও দেখিতেছি, বিশেষ করিয়া কলেজের মেয়েরাই একথা বলিতেছেন ! ধন্য ভগবানের সৃষ্টি !

কবি নিবারণ চক্রোত্তি আজকাল গান রচনা করিয়া গাহিয়া যাইতেছেন, তাঁহার নমুনাও পাওয়া যাইতেছে। সুরের 'আবর্ত্তে' পড়িয়া তিনি যে থৈই হারাইয়া ফেলেন নাই, ইহা আশার কথা। যেহেতু—

"কি হে নীল গানটা লেখা হল ?"

ইহার উত্তরে শ্রীমান নীল (লালও হইতে পারে) বলিতেছে—

"হ্যাঁ হলো, ব'লেই নীলাঞ্জন আরাম ও নিষ্কৃতির নিঃশ্বাস ছেড়ে একটা কোল বালিশ (!) দু' উরুতে চেপে ঘন ঘন গুড়গুড়ার নলে টান দিতে সুরু করলে।"

গান লিখিবার সময় কিরূপ পরিস্থিতির প্রয়োজন তাহা যে-কবি একাধারে গান লিখিতে ও গাহিতে পারেন, তিনি ছাড়া আর কে জানিবেন ? মোটামুটি 'আবর্ত্ত' জিনিষটি মন্দ নয়, কারণ উহারই মধ্যে একমাত্র ত্রিভুবন ঘুরিবার সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে।

*

আমাদের গিরিজাদা দেখিতেছি ধীরে ধীরে 'লক্ষ্মীমন্ত' ছেলেটি হইয়া উঠিতেছেন !—

"লক্ষ্মীছাড়া চিরদিন,
বিষাদে বিলীন —
কাতর জীবনযাত্রা চলেছিল
ব্যথা যাতনায়,
দলেছিল
সুকঠিন পায়
কতজন শত লক্ষবার
হৃদয় আমার।

গিরিজা দা'র যে কোনোকালে লক্ষ্মী ছাড়িয়া গিয়াছিল, এমন কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি যাহা ভাবি নাই, তাহাই ঠিক ! 'বঙ্গলক্ষ্মী' যে তবু সদয় হইয়াছেন, তাহাতে দাদার জন্য বিশেষ পুলকে গদগদ হইয়া পড়িতেছি। তাই—

"···দিল সুধারাশি
নিজে লক্ষ্মী আসি।"

বলিয়া ইনি যখন আরাম অনুভব করিতেছেন, আমরাও ভাবিয়া দেখিলাম — যে ব্যক্তি লক্ষ্মীর নিকটও 'সুধা' আদায় করিয়া ছাড়িয়াছেন—তিনি চীজটি সোজা নহেন !

* * *

'দীপিকা' দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, হয়-তো কুষ্টিয়ার সাপ্তাহিক রাবিশ আসিয়া চক্ষু-কর্ণ বুঁজাইয়া ছাড়িবে। অবশেষে ঈষৎ দৃষ্টি দিয়া ধাঁধা কাটিয়া গেল। শ্রীশিবচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের মাসিক (ঋতু-নহে) পত্রিকা যে এরূপ ভাবে দেখিতে পাইব ইহা কে ভাবিয়াছিল ?

ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র যে কেবল রোগী-রোগিনী (আবার যে-সে রোগী-

রোগিনী নয় হৃদ্‌রোগ···) চর্চা করিয়া থাকেন তাহা নহে, মানুষের দুঃখ দেখিয়াও তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। ইহা তাঁহার দরদী অন্তঃকরণের নিখুঁত একটি ছবি হিসাবে ধরিয়া লইতে আমাদের আপত্তি থাকা অবশ্যই উচিৎ নহে। কারণ—

"রাস্তার পশুদের আশ্রয় মেলে, কিন্তু ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ এমনই অভিশপ্ত যে গরু মহিষের সুবিধা হইতে সে বঞ্চিত।"

এই জন্য ডাক্তার সাহেব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। 'শ্রীকৃষ্ণ গোশালা, সি-এস-পি-সি-এ, গো সম্মেলন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গৃহ পালিত পশুদের আরাম দিবার জন্য উৎসুক' দেখিতে পাইয়া তাই ইনি ভিক্ষুকদিগকে আরাম দিবার চেষ্টা করিয়া যাইতেছেন। ডাঃ মৈত্র কিরূপ আরাম তাহাদিগকে দিতে সমর্থ হইবেন, আমাদের তাহা অবশ্য জানা নাই। কিন্তু একজন প্রোফেশনাল ডাক্তারের পক্ষে অপরের দুঃখ আরাম করিবার এই যে একটা স্পৃহা, ইহাতে যে কেবল তাঁহার পশারই বাড়িয়া যাইবে - আর কিছু হইবে না, এমন কথা আমরা বলিব না। সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগা ভিক্ষুকদেরও যে একটা ব্যবস্থা হইবে—তাহাও আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি! ভাবিতেছি, কি পরিমাণ দরদ মজুদ থাকিলে মানুষ ডাক্তার হইতে পারে?

* * *

একস্থানে দেখিলাম—

"গত সংখ্যার প্রসঙ্গ কথায় শ্রীমতী শ্যামলিয়া চাটুয্যের বিরুদ্ধে একটি পত্র পাইয়া আমরা কিছু মন্তব্য করিয়াছিলাম। শ্রীমতী চাটুয্যে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া একপত্রে লিখিয়াছেন যে 'যৌন জীবনে নারী ও নর' প্রবন্ধটি তিনি দুই বৎসর পূর্ব্বে রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু কুত্রাপি ছাপিতে দেন নাই। তাঁহার মাষ্টার মহাশয়ের বন্ধু সেটী পড়িতে লইয়া গিয়া ফেরত দেন নাই। প্রবন্ধটি কোথাও প্রকাশিত হইয়া থাকিলে তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাহা ঘটিয়াছে।"

অজ্ঞাতসারে কত স্থানে কত কাণ্ডই না হইয়া যাইতেছে! শ্রীমতী শ্যামলীয়ার মাষ্টার মহাশয়ের বন্ধুরও অজ্ঞাতসারেই যে কার্য্যটা হইয়াছে—এমনকি তাহাও আমরা বুঝিতে পরিতেছি!

আহা! এমন একটি ব্যাপারও হইয়া যায়?

* * *

'পুষ্পপাত্র' হইতে শ্রীমান্ নীরেন্দ্রকুমার গুপ্তের যাহা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, তাহা বাহির না হইয়া গত্যন্তর কি?—

"এমন মাধবী রাতে
রজনীগন্ধা ফুটাবো আমরা
নিবিড় নির্জ্জনাতে।"

শ্রীমান আর শ্রীমতী—দুইজনের মধ্যে 'একজনা' হইবার সাধ যদি না থাকিত, তাহা হইলে 'নিবিড় নির্জ্জনাতে' রজনীগন্ধা ফুটিবার অবসর কি আর মিলিত? অতএব যাহা ফুটিবার, তাহা ফুটিবে!

বেঙ্গল ষ্টোরস্ ও পূজার বাজার

—*—

সর্ব্বসাধারণকে পূজার সওদা করিবার অধিকতর সুবিধাদানের জন্য বেঙ্গল ষ্টোরস্ লিঃ এর কর্ত্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে ১লা অক্টোবর বৃহস্পতিবার হইতে ২৪শে অক্টোবর শনিবার পর্য্যন্ত ষ্টোরস্ প্রতিদিন (বৃহস্পতিবার সমেত) সকাল ৮ টা হইতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। বৃহস্পতিবারগুলিতেও দোকান খোলা রাখার ব্যবস্থা করায় ও দোকানের সময় বৃদ্ধি করায় সকলের পূজার সওদা করিবার যে বিশেষ সুবিধা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পাঁচ মিশালী

এক নম্বর ডিষ্ট্রীক্টের জঞ্জাল অপসারণের জন্ত কর্পোরেশন ৫৫ খানি মোটরলরী ক্রয়ের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, গত বুধবার তাহার চূড়ান্ত মীমাংসার কথা ছিল। কিন্তু জানিনা কি কারণে প্রস্তাবটী সে দিন ধামা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। কর্পোরেশনের এই লরী ক্রয়ের প্রস্তাবে বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কটের দিনে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি ও নানা প্রকারে দেশের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনায় কোন কোন সহযোগী ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। কর্পোরেশনে জঞ্জাল অপসারণের যে মামুলী ব্যবস্থা আছে, বর্ত্তমান সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগেও যে সেই মন্থ-মান্ধাতার আমোলের ব্যবস্থাই কায়েম-মোকায়েম করিয়া রাখিতে হইবে, ইহা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না এবং কলিকাতার ন্যায় পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাহা সুনামেরও পরিচায়ক নহে। বিশেষতঃ কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ যখন জানাইয়াছেন যে, জঞ্জাল অপসারণের কার্য্যে যে সব মেথর-ধাঙড় খাটিয়া খাইতেছিল তাহাদের অন্নে হস্তক্ষেপ করা হইবে না, তখন বেকার সমস্যার দুর্ভাবনায় অযথা আঁতকাইয়া উঠিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

* * *

কর্পোরেশনের ওয়ার্কস ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটী এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বলা বাহুল্য আমরা তাহাতে সন্তোষ লাভ করিতে পারি নাই। কমিটী চারিজন মনোনীত টেণ্ডারদাতার মধ্যে জালান মিত্র এণ্ড কোম্পানীকে (কোর্ড) বাদ দিয়া ফ্রেঞ্চ মোটর কোম্পানীকে (ডজ গাড়ী) ২৯ খানি, গ্রেট ইণ্ডিয়ান মোটর ওয়ার্কসকে (ফেডারেল) ১৮ খানি ও কি ম্যাকেঞ্জীকে (ইন্টার ন্যাশন্যাল) ৮ খানি গাড়ীর অর্ডার দিবার সুপারিশ করিয়াছেন। টেণ্ডারদাতাদিগের মধ্যে জালান মিত্র কোম্পানীকে একেবারে বাদ দিয়া ফ্রেঞ্চ মোটর কোম্পানীকে ২৯ খানি গাড়ীর অর্ডার দিবার সুপারিশে অনেকেই অনেক রকম কানাঘুষা ও আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন: কলিকাতা কর্পোরেশন বাঙ্গলা দেশের একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং ইহার পরিচালকবর্গও বাঙ্গালী। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালীর স্বার্থ যাহাতে রক্ষিত হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য নহে কি?

* * *

অনেকে হয়ত বলিবেন—কর্পোরেশনের বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কটের সময় করদাতাদিগের স্বার্থের বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে শুধু জাতীয় স্বার্থ নহে; সেই সঙ্গে ব্যয় সংক্ষেপের দিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আমরাও অবশ্য এ যুক্তি সমর্থন করি। জাতীয় স্বার্থের ন্যায় এই ব্যয় সঙ্কোচের দিক হইতেও জালান মিত্র কোম্পানীকে একেবারে বাদ দেওয়া কখনই সমীচীন হইতে পারে না; কারণ টেণ্ডার দাতাদিগের মধ্যে তাঁহাদের টেণ্ডারের দরই সর্ব্ব নিম্ন। সুতরাং আমাদের মতে এই মোটরলরী ক্রয় সম্বন্ধে গ্রেট ইণ্ডিয়ান মোটার ওয়ার্কস ও জালান মিত্র এণ্ড কোম্পানী, এই দুইজন টেণ্ডারদাতার টেণ্ডার গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এই দুইটীই বাঙ্গালী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। বৈদেশিক ব্যবসায়ীদিগের তুলনায় স্বল্প সামান্য মূল্য সুলভতার অজুহাত না দেখাইয়া বাঙ্গালী পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান দুইটীর উপরে সুবিচার করিতে দেখিলেই আমরা অধিকতর সুখী হইব এবং সহরপিতাদেরও করদাতাদের প্রতি প্রকৃত অভিভাবকের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করা হইবে।

* * *

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন সায়াহ্নের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই পৌর প্রতিষ্ঠানটীকে যখন তাঁহার দেশবাসীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই এই আশা পোষণ করিয়াছিলেন যে, পৌর প্রতিষ্ঠানে তাঁহার ভবিষ্যত বংশধরেরা সর্ব্ব প্রকারে জাতীয় স্বার্থের প্রতিই সর্ব্বাগ্রে অবহিত হইবেন। আজ যাঁহারা রাষ্ট্র-গুরুর রচিত স্বাধীনতার সেই পুণ্য-বেদীতে বসিয়া পৌরহিত্য করিতে

ছেন, তাঁহারা যদি সে আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন তাহা হইলে রাষ্ট্র-গুরুর স্মৃতিরই অমর্যাদা করা হয় না কি? জাতি যদি জাতীয় স্বার্থে সজাগ না হয় তাহা হইলে জাতীয় দুঃখ দৈন্যের অবসান কখনই সম্ভব নহে! এই আশা ও ভরসাতেই আমরা পৌর প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-বর্গকে মোটর-লরী ক্রয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রযত্নে বাঙ্গালীর স্বার্থে সজাগ হইতেই অনুরোধ করি।

* * *

আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম যে, টাকীর জমিদার শ্রীযুত সূর্য্যকান্ত রায়-চৌধুরী মহাশয় গত ৪ঠা আশ্বিন রাত্রি ৪ ঘটিকার সময় পরলোক গমন করিয়াছেন। অভিজাত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তিনি দীন-দরিদ্রের সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বহু নিঃস্বহায় ছাত্র তাঁহার সাহায্যে মানুষ হইয়াছে। দেশের সর্ব্ববিধ জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার সহানুভূতি ছিল। তিনি অতিশয় ন্যায় পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার নিকট ধনী দরিদ্র ও ইতর-ভদ্রের কোন পার্থক্য ছিল না। কোন প্রার্থীকে তাঁহার নিকট হইতে কখনো বিমুখ হইতে হয় নাই। তিনি বসিরহাটের কারমাইকেল ট্যাঙ্ক, যশোহরের বেনাপোলে এক সুবৃহৎ-দীঘি, মধ্যম পুরের জলাশয় প্রভৃতি খনন করিতে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন এবং তীর্থ সংস্কারেও তিনি মুক্ত হস্তে দান করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের এবং বিশেষভাবে দরিদ্র জন সাধারণ ও নিঃসহায় ছাত্রদিগের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ হইবে কি না সন্দেহ। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিজনবর্গের সহিত গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। শান্তিময় তাঁহার পারলৌকিক আত্মার শান্তি বিধান করুন।

* * *

ঢাকেশ্বরী মামলার জের

মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী! ঢাকেশ্বরী কটন মিলের মামলার জের মিটিয়াও মিটিতেছে না। মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টরগণ ইচ্ছা পূর্ব্বক মিথ্যা হিসাব দাখিলের অপরাধে হাইকোর্টের বিচারে কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াও গবর্ণমেন্টের অনুকম্পায় মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি ঢাকা হইতে জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, মামলায় যে সব কাগজপত্র আদালতে দাখিল করা হইয়াছিল, অব্যাহতি লাভের পর ম্যানেজিং ডিরেক্টরগণ আদালত হইতে সেই কাগজপত্রগুলি ফিরাইয়া দিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু ফরিয়াদী পক্ষের উকীল নাকি ঐ সব কাগজপত্র ফিরাইয়া দিতে আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহার আপত্তির কারণ এই যে, যে সব ডিরেক্টার ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ ব্যালান্স শীটে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন এবং যে অডিটার উহা অনুমোদন করিয়াছিলেন, কোম্পানীর অংশীদারদিগের স্বার্থ রক্ষার্থে তাঁহাদের সকলের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা প্রয়োজন, সুতরাং কাগজপত্রগুলি যেন ফেরৎ দেওয়া না হয়। আদালত ফরিয়াদী পক্ষের আবেদনই মঞ্জুর করিয়াছেন এবং মামলা রুজু করিবার জন্য ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হইয়াছে। দেখা যাক, এ প্রাদ্ধ আরও কতদূর গড়ায়!

আমরা জানিয়া মর্ম্মাহত হইলাম যে, শিল্পী চারু রায়ের ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক পুত্র গত বুধবার আত্মহত্যা করিয়াছে। আমরা চারুবাবুর এই আকস্মিক শোকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

নিশি-পদ্ম

(গল্প)

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ।
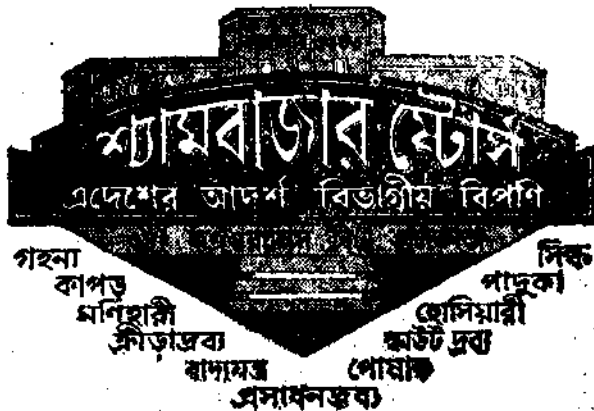
সেই রাত, যেন জলন্ত একটুকরো গ্রহের মতো সমুজ্জল সেই রাত। সেই আধ ঘণ্টার স্মৃতি। কিন্তু কিছুতেই তা মুছে যাবে না—আমার স্মৃতিপট থেকে। কি ভয়াবহ, ভীষণ রাত—সে-ই রাত!… আজ কত দিন পরে আবার সেই-কথা মনে পড়লো। আবার তো তাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করচে। এই সুদীর্ঘ কুড়ি পঁচিশ বছর তো তারপর কেটে গেচে—আজো কী তুমি বেঁচে আছো, সংসারের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার বহ্নি-চক্রে ধূপের মতো পুড়িয়ে পুড়িয়ে নিজকে নিঃশেষে মুছে ফেলচো—আমাদের-ই কল্যাণের জন্য, আমাদের প্রচ্ছন্ন অবহেলা ও নিষ্ঠুর উপেক্ষার বিনিময়ে। সত্যি সে কি অতি তুচ্ছ, অতি ঘৃণ্য!…আজ তুমি কোথায়। আর আমি-চঞ্চল, সুদূরের প্রয়াসী আমি! অই শোন কান পেতে নোতুনের দুর্জ্জয় আহ্বান!

দুপুর রাত! একা একা চলচি থিয়েটার থেকে ছোট নোংরা ইতর জনবহুল একটা গলি দিয়ে। মেঘাবৃত আকাশ, বৃষ্টি পড়চে—ঝির ঝির করে। এ বৃষ্টি মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে না, কেমন একটা স্নিগ্ধ, স্নেহ স্পর্শ বুলিয়ে দেয় সর্ব্বাঙ্গে। নিরাভ আবছায়া ছড়িয়ে পড়েচে রাস্তায়। আর্দ্র আর্দ্র ধূলি ধূসর পথ পাকে হাঁটায় চটচটে হয়ে আছে।

গলিটায় দুই পাশে ফুটে আছে কয়েকটা নিশি-পদ্ম। দাঁড়িয়ে আছে বাতায়নের ছায়ায় কয়েকটা পতিতা। একটী বাড়ী দীপালোক উদ্ভাসিত, সঙ্গীত মুখরিত…আর রুদ্ধগৃহে রুদ্ধঘরে অন্ধকারে চলেছে অভিনব অতিথি সৎকার। …সহসা, অপেক্ষমানা জন কয়েক পতিতা জনৈক পথিককে অনুসরণ করলে, না, শুধু অনুসরণ নয়, একেবারে গা ঘেসে চলে গেলো, একেবারে গা ঘেসে। বিলোল অধর প্রান্ত উড়িয়ে, আর ছড়িয়ে গেলো অঙ্গরাগের উগ্র মদির সুবাস।…কিন্তু পরক্ষণে তাদের ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে। আবার তারা আপন আপন স্থানে এসে দাঁড়াতে থাকে। চলার গতি ছন্দে কাঁপে তাদের স্তনভার।

পথ চলেচি। যেন দেহের বিপণি বসেচে এখানে। কে আগে পণ্য বিক্রি করবে—এই দেহ। ঘূর্ণ্যমান দিন আর ঘুম রুদ্ধ রাত্রি জুড়ে এই এক সমস্যা। সবাই আমাকে ডাকতে লাগলো, চোখের ইসারায় আর হাতকে লীলায়িত করে। কুৎসিত ইঙ্গিত! নিস্‌পিস্ করতে লাগলুম ঘৃণায়। দেখতে দেখতে হঠাৎ তাদের মাঝ থেকে কের তিনটি যুবতী ভয়াতুরের মত ছুটে গেলো—এবং কোন শিকারের অভিলাষে। যেতে যেতে অপর গুলোকে কী বলে গেলো বুঝা গেলো না। এবার তারাও চললো ওদের অনুসরণে,—যারা দাঁড়িয়ে ছিলো। আঁচল খানি কটিতটে জড়িয়ে। যেন হাসেনা তারা অমন অভিনয় করে আসচে।…

হঠাৎ, একটা কোমল কর স্পর্শ অনুভব করলুম। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলী কণ্ঠস্বর শোনা গেলো: বাঁচান, ছেড়ে যাবেন না। মিনতি মাখা বিবর্ণ স্বর।

মেয়েটির দিকে চাইলুম। বুঝি বয়স কুড়ির নীচে, কিন্তু তনুখিরে তেমনটি যৌবনের—ঐশ্বর্য্য, নেই, ফেনায়িত, মদির বিহ্বলতা। অন্ধকারের অন্তরালে নিঃশব্দ বিকশিত শিউলি-ফুলের মতো অজানা শিহরমানতা নেই। তার শরীরময় ক্লিষ্ট বিশীন তাটি বাঁশীর সুরের মতো করুণ হতে লাগলো। বললুম: এখানে দাঁড়াও। কোন ভয় নেই।'

সে নিরুত্তর। নিমেষের জন্য শুধু—প্রচ্ছন্ন বেদনাভ চোখ তুলে চাইলো।

রাজপথ। আঃ নিশ্চিন্ত। আর কোন ভয় নেই। চলে যাবার জন্য উদ্যত হয়েচি,—মেয়েটি—তখন মেয়েটী শুধালে: আমার বাড়ী অবধি যাওয়া হবে না?'

না।'

না কেন? এতো কোরলে আমার জন্য—আর আমি তা ভুলে যাব—?'

অপ্রতিভ—কণ্ঠে আস্তে আস্তে—তাকে বললুম: আমি তো যেতে পারিনে, আমি বিবাহিত।'

তাতে কী হয়েচে? মেয়েটি প্রতিবাদ করলে।

আহা,—এই ঢের! চিরদিন তোমার মনে থাকবে, চিরদিন! এখন আমাকে—যেতে দাও।"

পথ তখন নির্জ্জন, অন্ধকার, ভয়াবহ। আর এই নির্জ্জন অন্ধকারে আমার

একখানা হাত ধরে আছে এক যুবতী। সমস্ত বাসনার কামনার ইন্দ্রজালে আমাকে ঘিরে আছে এক অপরিচিতা। একটা ভাষাহীন অনুভূতি আমাকে মুহ্যমান করে ফেলল। সে আমাকে জড়িয়ে-ধরতে চায়!—যাও, ছাড় বলচি, ছাড় আমার হাত।' রুদ্ধ স্বরে তাকে বললুম। কেমন যেন একটা করুণ কোমল বিষন্নতা নেমে এলো তার চোখের নীচে। দিগন্তের ধূসরিমা তার মুখমণ্ডলে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে। বিস্মিত, স্তম্ভিত, বিমূঢ় হয়ে গেলুম। খানিক দাঁড়িয়ে ভাবলুম কেন সে কাঁদচে?

'লক্ষীটি, থাম। না জেনে যদি তোমাকে আঘাত দিয়ে থাকি, তা'লে আমায় ক্ষমা করো।'

ছিঃ, 'ওকথা বলোনা', ধরা গলায় সে বল্লে: কাঁদচি আমার মনের দুঃখে।'

কিসের দুঃখ?'—যাই হোক, শুনতে তোমার ভালো নাও লাগতে পারে।'

কি?'

তা নিছক ব্যক্তিগত জীবনেরই কথা উঃ, কি—দুর্বিসহ···।'

কেন তবে এই করে বেঁচে আছ?'

তা আমার ভুল নয়।'

তবে কা'র?'

একটা কৌতুহল হলো এই সঙ্কেতময়ী অপরিচিতাকে নিয়ে। শুধালুম: বল না কি হয়েচে?'

একটা নীরব মুহূর্ত্ত কেটে গেলো। কি ভেবে সে বললে: আচ্ছা, বলচি শোন। কিন্তু জেনেই বা কি হবে শুনি!'

থাক, বলতে তায় বাঁধচে। ফিরে দাঁড়ালুম, সে বাধা দিলে, ওকি, রাগ করলে! বলচি শোন—

সে বলতে লাগলে:

আমি তখন ষোড়শী। হঠাৎ বাপ মা মারা গেলেন। বিত্তহীন, স্বজনহীন। নিতান্ত অসহায় মনে হ'লো নিজকে। তারপর? তারপর এক ধনী গৃহে চাকুরী নিলুম—একটা ছোট মেয়েকে রোজ ঘন্টাখানেক পড়াতে হতো। পড়াবার সময় প্রৌঢ় গৃহস্বামী আমার দিকে প্রায়ই মুগ্ধ লালসার দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকতেন। আমি তা টের পেতুম। অবশ্যি, তিনি একটু নিরীহ, নরম ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। হোলে কি হয়, তবু আমি তাকে এবিষয়ে বিশ্বাস করতুম না।'

একদিন তিনি আমাকে চাইলেন তার ভোগানলে ঘৃতাহুতি দিতে। কিন্তু আমি তাতে অসম্মত হই।···তিনিও আর দ্বিরুক্তি না করে সেদিন চলে যান।'

শেষটায় এলো ব্যবধান। আর একজন এসে দাঁড়াল আমাদের মাঝখানে সৌম্য, সুন্দর ও অমায়িক। সে তাঁরই ষ্টেটের জনৈক কর্মচারী। 'আমার কাছে ছিল তার অবারিত দ্বার। তার আসা যাওয়া চলল সুযোগ বুঝে। আমি বুঝলুম, আমার জন্ত সে অস্থির হয়েছে। কেবল মনের মধ্যে আমাকে নিকট করে পেয়ে সে আর পরিতৃপ্ত থাকতে চায় না, সে চায় আমার সাকার রূপের মধ্যে পরিপূর্ণ নিমজ্জন, আত্মবিস্মিত অবগাহন।'

এক দিন রাত্রে উনি তা টের পেলেন। সিড়ি বেয়ে আমার কোঠায় এসে, তাকে দেখতে পেয়ে গেলেন ক্ষেপে; চাইলেন হতভাগ্যার জীবনে চির যবনিকা টেনে দিতে। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে শুরু হলো হাতাহাতি। সব দেখে শুনে একেবারে হতবাক হয়ে গেলুম। বিবর্ণ হয়ে গেলুম ভয়ে। কোনমতে স্খলিত অবিন্যস্ত বসনখানি দেহে জড়িয়ে ছুটে বেরিয়ে আসি রাস্তায়।'

কিন্তু ভারী ভয় হতে লাগলো; ভয়ে মুছে গেলুম শরীর থেকে। একটা দালা-

নের মিশকালো অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়িয়ে ঠিক-ঠাক করলুম পরনের কাপড়। তারপর, সোজাপথ ধরে চলতে লাগলুম। রাজপথ। রাত্রির তখন কৈশোর। অবিরাম একটা স্রোত চলেছে যান বাহন আর সম্মিলিত মানবতার। ঢেউয়ের পর ঢেউ আবার ঢেউ, কোলাহল মুখর কর্ম ব্যস্ত জনতা ক্ষিপ্র পদ ফেলে বিক্ষিপ্ত জনতাকে ভেদ করে চললুম। আবার কি উদ্বেগ!

* * *

চারিদিক অন্ধকার। দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকার একই আচ্ছাদনের অন্তরালে সমস্ত জগৎটাকে আবৃত করে রেখেচে। একা পথ চলচি। কোন সাথী নেই, কোন দিন নৈশ প্রকৃতির অমন বর্কশ, অদ্ভুত সৌন্দর্য্যের সাথে ঘনিষ্ট পরিচয় নেই, অভিজ্ঞতা নেই, আছে একটা পালিয়ে যাওয়ার উন্মাদনা, মুক্তির অভীপ্সা …হঠাৎ একটা কুকুর ঘেউ করে লাফিয়ে উঠলো। আর আর একটু হলেই মাড়িয়ে ফেলতুম আর কি! না, তুমি বুঝবে না, তুমি বুঝবে না সেই রাত্রির ভয়াবহতা। মাঝে মাঝে এক একবার রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে রাত্রিচর পাখীরা ডাকছিল। কেমন যেন একটা কান্না ভরা শ্বাস বইচে অন্ধকার রন্ধ্র ভরে। যেমন অন্ধকার, তেমনি নির্জ্জনতা! এর উপরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হওয়া হাত পা জমে যাবার উপক্রম হল। আর আকাশের বিশাল উন্মোচন। সত্যি, তা ভাবতেও পারবে না! উঃ, কি ভয়ঙ্কর, ভীষণ!'……

আস্তে আস্তে আকাশ ফরসা উজ্জ্বল নীলাভ হোতে লাগলো অপস্রিয়মান কুয়াসা ভেদ করে।'

দীর্ঘ পথহাঁটা আর ক্ষুধা। সঙ্গে কিছুই নেই, একটা পয়সাও নয়। আমার যথা সর্ব্বস্বই এসেচি ফেলে।'

কি করবো!…চোখের পাতাও ঢুলে আসচে অবসাদ মগ্নতায়। নিবিড় ঘুমের জলে ধুয়ে যাচ্ছে শরীর। তবু আমাকে পথ চলতে হোল—কারণ, পুলিসের ভয়। ইতি মধ্যে রোদ চড়ে গেছে। মধ্যাহ্ন সূর্য্য বলা যায় না। দু'ধারের ছোট ছোট বনের ঝোপ রৌদ্রালোয় চিকচিক করচে, খোলা জমির সবুজ শূন্যতায় যেন একটা হাহাকার! এই নির্ব্বাক অত্যুজ্জ্বল শোভার পানে অধিকক্ষণ সুদূর দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকা যায় না। আর পথ চলাও যায় না। অতএব দুপুরটা কাটিয়ে দিলুম কোন এক সরাইয়ে।'

জনবিরল পল্লীপথ। দু'ধারে ছায়া ভরা তরু-বীথি, বাঁশবন, ঝোপ ঝাড়, মাঝে মাঝে ফাঁকা আকাশ। খোলা প্রান্তরের অপূর্ব্ব সবুজিমা, মেঘ মুক্ত আকাশের নীলপটে দূর হতে বহুদূরগামী দু' একটা সাদা বক ভাসচে…আসন্ন অপরাহ্ণের শীতলতায় চারদিকে একটা কি মুক্তি! কি আনন্দের বার্ত্তা! অমন স্বপ্ন মাখা উদাস সৌন্দর্য্যের মোহ স্পর্শের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি…হঠাৎ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পাই আমার পিছনে। ফিরে তাকালুম দু'জন পুলিশ। গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, পড়ি পড়ি করে নিজকে কোন রকম সামলে নি। অশ্বারোহী দুজন ততক্ষণে আমার সমুখে এসে দাঁড়িয়েছে।'…

নমস্কার বিনিময় হল। আগন্তুক শুধালে: কোথায় যাচ্চেন আপনি?'

বেশী দূর নয়। পাশের গাঁয়…।'

পায়ে হেঁটে যেতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না?'

মন্দ কি, বেশ একটু বেড়িয়ে নিলুম।'

সত্যি কথা বলতে কি, তখন আমার দুর্ব্বলতায় ঢিপ ঢিপ করচে বুক। কথা কইতে ইচ্ছে হোচ্ছিল না। যত আপদ। …কিসের একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় দোলা দিয়ে উঠলো মন, মুহূর্ত্তের জন্য।'

আগন্তুক ফের বললে: যাক, আপনার সঙ্গে কতকটা পথ বেশ যাওয়া যাবে। আমরাও এই পথেই যাবো।'

বললুম, সচ্ছন্দে।

আম কাঁঠালের একটা প্রকাণ্ড বাগান পার হয়েই ডাক বাংলো। নবাগত বললে, চলুন, একটু বিশ্রাম করা যাক্ ডাক বাংলোয়।'

বেশতো চলুন না।' অন্যমনস্ক ভাবে বললুম।

ছোট খড়ের বাঁশের ঘর। পিছনে বন বন। দক্ষিণে গোটা কয়েক পুষ্পিত ছাতিম ও পলাশ গাছ, একটা টিনের শেড। কম্পাউণ্ডের এক জায়গায় গোল করে বেড়া দেওয়া ছোট একটা ফুলের বাগান। অপূর্ব্ব শ্রী হয়েছে বাগানটার! কি নির্ম্মল মিষ্টি একটা গন্ধ উঠছে সেখান থেকে।'…

ঘরের অবরুদ্ধ আবহাওয়া কটু, সেঁদো, সেঁদো।'

ভাখো, নারী দেহে সকলেরই লোভ আছে। অমন নির্জ্জনে তারাও আমাকে একা পেয়ে তাদের পশু অন্তর্মানব কামনায় জর্জ্জর হয়ে উঠে। ইত্যবসরে একজন কখন কোন সময় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, আমি টের পাইনি! …শেষে সুরু হোল দেহ লোভী পুরুষ ও নারীর মধ্যে দ্বন্দ্ব, অসহায়, দুর্ব্বল নারী কতক্ষণ আর নিজকে সে বাঁচিয়ে রাখতে পারে প্রবল প্রতিপক্ষের কাছে।'…সে বলতে বলতে চলল এগিয়ে, চলতে চলতে সে বলে গেলো।

চুপচাপ।

এখানে পথটা একটু অন্ধকার, পার্কের প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত শিরীষ গাছটায় ঝুপসি করে আছে। চারদিকে কি অদ্ভুত নীরবতা, কি অদ্ভুত। এই ধরণের নীরবতার সাথে জীবনে কখনও পরিচয় ছিল না। ইহা এমন কিছু, যা কল্পনার অতীত।

দুঃখে কী ক্ষোভে সে নিঃঝুম দাঁড়িয়ে রইলো বুঝা গেলো না। সে পুনরায় বলতে লাগলো:

যাক, পরে সেখান থেকে রওনা হলুম। শীতের সন্ধ্যা তখন গাঢ় হয়ে এসেছে।…কি ঘৃণা, কি গ্লানি আর এতো খিদে পেয়েছিলো, পা সরছিলো না। একটুও না। অবশ্যি, তখন তারা পাশের গ্রাম থেকে আমার জন্ম কিছু খাবার এনে দেয়। এইখানে হোল তাদের কর্ত্তব্যের শেষ, সব শেষ। আরো দশ-জন পুরুষ যেমন করে থাকে, তেমনি তারাও নারীর সর্ব্বস্ব হরণ করে দিলে গা ঢাকা!…কেমন একটা বিশ্রি অনুভূতি, এক প্রেতচ্ছায়া ঘিরে রইলো আমাকে! আস্তে আস্তে চলতে লাগলুম মন্থর, বিহ্বল পা ফেলে। কোন মতে চলতে লাগলুম। আবার বৃষ্টি নামলো। পিনপিনে বৃষ্টি! ধূসর মেঘে মেঘে ম্লানায়মান এক ফাঁকি চাঁদ লুকোচুরি খেলছে। মাথার উপরে অগনিত নক্ষত্ররাজি, ছায়া পথ, আর অস্পষ্টতর অপূর্ব্ব বর্ণ বৈচিত্র্য। চলেছি দীর্ঘ পথ বেয়ে চলেছি, পথ আর ফুরায় না। সহসা সম্বিৎ হোল: কোথায় যাচ্ছি আমি, কোথায় যাচ্ছি? আর কোথাও যেতে চাইলেই তো মেয়েদের

যাওয়া হল না। হায়রে রূপ, যৌবন!… আক্রোশ হোল বিধাতার পরে। কেন, কেন রমণীকে রমণীয় করে এতো দুর্ব্বল, অবলা করেছো ঈশ্বর? কোথায় থাকো! ফিরে চললুম আগের বাড়ীতে।

কিন্তু ভাবনা হোল এইখানে: ফিরে তো চললুম, তিনি কি আমাকে রাখবেন, একটু স্থান দেবেন আশ্রয়?…সহরের গলি দিয়ে যাচ্ছি পতিতা পল্লী। রাত তখন বারোটা। এমন সময় কে একজন আমার গা ঘেসে এসে দাঁড়ালো। কি সুন্দর তার চেহারা, অপরূপ কিন্তু অকরুণ। চোখের দৃষ্টি স্বপ্নমাখা অথচ, হৃদয়ভেদী। কি প্রশান্ত, সৌম্য মূর্ত্তি!

* * *

সহরতলী। পড়োবাড়ী—পুরানো, জীর্ণ ইটের পাজরা বার করা একটা বাড়ী। ছমছম করচে অদ্ভুত স্তব্ধতায়। সেৎসেতে মেঝে। ভেঁপসা গন্ধে ভরপুর ভিতর। সেখানে সেও নোতুন করে এঁকে দিল আর একটা পঙ্ক তিলক।…অবসাদ ভরে কখন কোন সময় ঘুমিয়ে পড়ি। ভোর বেলায় ঘুম ভাঙলো, একটু বেলাতেই আমার ঘুম ভাঙে। চারিদিকে তখন একটা শ্বাসরোধী জাড্যতা বিরাজ করচে। কি যেন একটা ছায়া, একটা প্রেত, একটা অদ্ভুত বীভৎস উপস্থিতি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়।

মাগো! কি সে জঘন্য ব্যাপার! শুনবে, কি করে সেদিন আমার ঘুম ভাঙে! …দু'জনের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা সুরু হয় আমাকে নিয়ে। কে নেবে আমাকে, কে নেবে? দু'জনের সাধ এই দেহের স্বাদে! অবশ্যি, কিছুই আর হয় নি। মাঝখান থেকে, তারা আমায় পুলিশের হাতে অর্পণ করলে। তারপর, তারপর সেখান থেকে গেলুম জেলে।…সেই কারাবাস আমার হপ্তাখানেকের। যাক সে সব কথা।

জেল থেকে বেরিয়ে চাকুরীর সন্ধান করতে লাগলুম। কিন্তু লোকে আমাকে চাকুরী দেওয়া দূরে থাক, ঘৃণা ও ভীতির চক্ষে দেখতে লাগলে। কারণ, আমি জেল ফেরতা।

অন্নচিন্তা! অন্নচিন্তা! এবার কি করবো? চারিদিকে অনাবৃত নিষ্ঠুর নগ্ন রিক্ততা। একদিন সমস্ত লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দিয়ে উপস্থিত হলুম তোমাদেরই মতো কোন শিক্ষিত, ভদ্র সমাজের মুকুট-মণির কাছে। তিনি যেন আমার প্রতি লুব্ধ ছিলেন। আমার অনুমান ঠিক হলো! দশটি টাকার একখানি নোট আমার হাতে তুলে দিয়ে তিনি হাসি মুখে বললেন: যখন যা দরকার হয় এমনি নিঃসঙ্কোচে চেয়ে নিও, আর সন্ধ্যের দিকেই এসো। আমার তখনই একটু ফুরসৎ থাকে।

সেখানে আর যাইনি। মেয়েটি ধূসর গলায় বললে এবং আমার মুখের দিকে চাইলে পাণ্ডুর চোখ দুটি বিস্ফারিত করে।

কেন? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলুম।

মহাজন যে শুধু দেহ রোজগার করতে চায়,—সে স্মিত মুখে বললে, সাপের খোলসের মত মৃত নিষ্প্রাণ হাসি—মাগো! এই বুড়োটার কাছে আত্ম-সমর্পণ। এই ক্ষীণ দৃষ্টি, লোলচর্ম্ম বুড়োর কাছে—আত্মসমর্পণ; হতে পারে না—এ কিছুতেই হতে পারে না। মনে হোল, এর চাইতে তরুণের কাছে আত্মদান করা অনেক ভালো—সেখানে আছে সম্ভোগের আনন্দ, আত্ম প্রস্ফুরণের পরিপূর্ণতা, অফুরন্ত প্রাণ-চাঞ্চল্য প্রবণতার মধুর নির্ব্বাপন।……

* * *

একটী ঝুলে পড়া নির্ব্বাক মুহূর্ত্ত, এমনি একটী মুহূর্ত্ত—শুধু এই মুহূর্ত্তই যেন জগতের সব তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতার গণ্ডীর বাইরে—মানুষ বিরাজ করে; নিজেকে মুখোমুখি দাঁড় করতে পারে ভগবানের সুমুখে।

সে পাল্টে গলায় বললে:

তারপর এই পল্লীতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করি। এ জীবনের প্রকাণ্ড সূচনা।

উঃ, কি দুর্ব্বিসহ, কি দুর্ব্বিসহ এ জীবন—প্রতিটি রাত্রি আমাদের গ্লানিময়, আমাদের গ্রাসাচ্ছদন প্রতিদিনের জীবনের অপচয়। কারণ, আমার মতো মেয়ে মানুষের তো এখানে অভাব নেই।

দু'জনে পাশাপাশি চলতে লাগলুম নিঃশব্দে, চুপে চুপে। সহসা অত্যন্ত গম্ভীর, অত্যন্ত কোমল স্বরে নিতান্তই আপন জনের মতো করে সে বললে: ওগো, সেই জন্যেই তুমি আমার বাড়ী যেতে নারাজ, না?

না। কেন সে তো আগেই বলেছি।

আচ্ছা, তাহলে যাই, কিছু মনে করো না, কিন্তু আমি নিশ্চয় করে জানি, তুমি আমাকে ভুল বুঝলে।

অমাবস্যার অন্ধকার: অভিজাত পিচমোড়া রাস্তা। মেয়েটী ধীরে ধীরে পথ চলতে লাগলো। বাতাসে তার ঘোমটার দুদিক একটু দুলে আছে, অঞ্চল প্রান্ত একটু একটু দুলছে।......

একটা লাইটপোষ্টের গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলুম। বিদায় বন্ধু! *

(কোন যাযাবরের ডাইরির কয়েক পৃষ্ঠা। এখানে তার নাম উল্লেখ করতে নিষেধ আছে।)

* মোপাশার ছায়া নিয়ে।

প্রবাহিনী

শ্রীরামেন্দ্রকুমার দেবমুখ্য—

আরক্ত মদিরা সম উষার তরল অন্ধকারে
চলার প্রথম সুরু; উচ্চকিত করিল তোমারে—
প্রিয়ের আহ্বান গীতি; অসীমেতে মিলন প্রয়াসী
স্বপ্নতুর আঁখিনীলে কী আনন্দ উঠেছিল ভাসি'।
উতল-ব্যথিতা হিয়া—বক্ষি, মুখে অস্ফুট কাকলী,
চপল পাখীর মত নৃত্যচ্ছন্দা বহিয়াছ চলি।
সুপ্ত সিত কণ্ঠহার ধরিত্রীর বক্ষ-প্রলম্বিতা।
ঊর্দ্ধরবি-রশ্মি-রাগ বক্ষে তব মুগ্ধ প্রতিহতা।
এ্যস্তমনা, পথভোলা, দ্বিধাগতি বালিকার মত,
বিসর্পিল গতিপথ করে গেছে ত্বরা নিয়ন্ত্রিত।

অন্তহীন কালগ্রন্থে অতীতের জীর্ণ পৃষ্ঠাগুলি,
অশ্রুসিক্ত পক্ষ্মপুটে, অনাগতে দিল মোহ তুলি'
ধীরে অতি ধীরে,—রূপে রাগে নিখিল ক্রন্দসী—
ভরিয়া উঠিল যবে,—একনিষ্ঠা তখনো ছন্দসী,
অভিসারিকার প্রায় চলিয়াছ প্রিয়তম পাশে,—
শান্ত স্থির হিয়া, কভু ক্ষুব্ধাবর্ত্ত ঘনঘোর শ্বাসে।

অরণ্যবীথি ঘন-ছায়া প্রশান্তি লইয়া গেছে যেচে,
নীল-ছায়া অশোকের পুষ্পশাখা রাখী বাঁধিয়াছে।
বন্ধন মান নি তবু, হে যাত্রীকি, অসীমের পানে;
মাধবী রাতের ছবি মায়া কিছু আঁকেনি নয়নে।
সম্ভার বহিয়া আনি গরীয়সী শরৎ-রজনী
ক্ষুণ্ণমনে ফিরে গেছে আপনারে দীনা হীনা গণি'।
হেমন্তের ধান্যশীর্ষ তব পায়ে প্রণতি জানালো,
তবু যদি ফেরো তুমি, আনন্দের ভাগ যদি তোলো।
কাল-বোশেখীর দর্প; পরিণতি অঘোর কাঁদনে;
চিত্তে জাগেনিকো ছায়া, বেদনার—থামোনি গমনে।
মধু অভিসার ম্লান মল্লিকার শিশিরাশ্রু ঝরা,
তব চিত্ত মণি-হর্ম্ম্যে তুলে নাই আন্দোলন পারা।
'চিরন্তন গতি' প্রেমে চিত্ত তব চির ভরপুর;
বিশ্রাম-আনন্দ নেশা হিয়া তাই করে না আতুর।

অসীমেরে পেলে দেখা বহুদূরে বন্ধহীনতায়;—
নীলার অঞ্জন মায়া চক্ষে আনি কী মোহ জাগায়।
অনন্তের স্পর্শস্পৃহী, বক্ষে যবে বাঁধিলে অসীমে,
পেলে পরিপূর্ণতায়, অসীমের সীমা পেল ক্রমে।

শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা

ভারতবাসীকে স্বামীত্বে বরণ করিয়া যে সব বিদেশিনী নারী স্বামীর দেশকেই আপনার দেশের স্থায় ভালবাসিয়াছেন, মিসেস নেলী সেনগুপ্তার নাম তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আণ্ডার গ্রাজুয়েট সেনগুপ্তের সহিত কেম্‌ব্রিজ ইউনিভারসিটি টাউনে যেদিন ইংরাজ দুহিতা কুমারী নেলী গ্রের প্রথম পরিচয় হয়, সে আজ ৩১ বৎসর পূর্ব্বের কথা। ভাগ্যদেবতা যে এই বিদেশী যুবকের সহিত তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাগ্য সমসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন—তাঁহার জীবনেই নব জীবন লাভ করিয়া একদিন যে তিনি ভারতের রমণীকুলের বরেণ্যা হইবেন সেদিন ইহা নিশ্চয়ই তাঁহার কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু মানুষের কল্পনায় যাহা স্থান পায় না বিধাতার বিধানে হয়তো তাহাই একদিন বাস্তবে পরিণত হইয়া থাকে। মিসেস সেনগুপ্তার জীবনে আজ তাহাই ঘটিয়াছে। স্বামী বিদেশী হইলেও তাঁহার জন্মভূমিকে নিজের জন্মভূমির স্থায় আন্তরিকভাবে সেবা করিয়া ও তাহার আদর্শকে নিজের জীবনে একান্তভাবে গ্রহণ করিয়া মিসেস সেনগুপ্তা যে ভাবে সহধর্ম্মিনীর কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছেন, ভারতীয় রমণীদের পক্ষে তাহা আদর্শস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিদেশিনী হইলেও ভারত নারীর স্থায় সহধর্ম্মিনীর কর্ত্তব্য তিনি যোগ্যতার সহিতই প্রতিপালন করিয়াছেন।

কেম্‌ব্রিজ ইউনিভার্সিটী টাউনে কোন ইংরাজ পরিবারে নেলী গ্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। এ জন্য যেদিন তাঁহারা শুনিলেন যে, কন্যা কোন বিদেশী যুবককে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সেদিন তাঁহারা অত্যন্ত বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তাহার মাতা তাঁহাকে এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবার জন্য বহু অনুরোধ উপরোধ করেন, কিন্তু ভাগ্যবিধাতার বিধান অলঙ্ঘনীয়। কন্যাকে তাঁহারা কিছুতেই এ বিবাহে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না।

ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর শ্রীযুত সেনগুপ্ত স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। আসিবার সময় তিনি পত্নীকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিলেন যে, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। কিন্তু পোর্টসৈয়দে পৌছিবার পর তিনি স্থির করেন যে, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ঘটনাচক্রে তাঁহার পক্ষে পুনরায় সত্বর ফিরিয়া আসা সম্ভব নাও হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ পত্নীকে সঙ্গে লইবার জন্য পোর্ট সৈয়দ হইতে চীনা জাহাজযোগে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৯০৯ সালের আগষ্ট মাসে কুমারী নেলীর সহিত শ্রীযুত সেনগুপ্তের বিবাহ হয় এবং ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে তাঁহারা ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। ডিসেম্বর মাসের এক রাত্রিতে তাঁহাদের জাহাজ গার্ডেনরীচের ডকে আসিয়া পৌছে। মিসেস সেনগুপ্তা শীতের সেই কুহেলিময় রাত্রিতে প্রথম কলিকাতা দর্শন করেন। কলিকাতায় পৌছিবার পর গাউন ছাড়িয়া এ দেশীয় রমণীদের স্থায় শাড়ী পরিধান আরম্ভ করিতে ও স্বামীর আত্মীয় পরিজন ও বন্ধু-বান্ধব সকলের সহিত আলাপ পরিচয়েই কয়েকটা দিন অতিবাহিত হয়। তারপর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শ্রীযুত সেনগুপ্ত তাঁহার বিদেশিনী পত্নীকে সঙ্গে লইয়া একদিন চট্টগ্রাম যাত্রা করেন। চট্টগ্রাম যাইবার সময় মিসেস সেনগুপ্তা সদ্য বিবাহিতা ভারত-বধূর স্থায় বেনারসী শাড়ী পরিধান করিয়া গিয়াছিলেন।

কোথায় কেম্‌ব্রিজ ইউনিভার্সিটী টাউন—আর কোথায় সুদূর বিদেশে চট্টগ্রামে শ্রীযুত সেনগুপ্তের জন্মভূমি বারামা। ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে মিসেস সেনগুপ্তা আপনাকে বেশ খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছিলেন। ভারতে আগমনের পর এই বারামা গ্রামেই তিনি প্রথম বড়দিন অতিবাহিত করেন।

স্বদেশ ও স্বজন বিচ্যুত অবস্থায় ভারতের কোন এক নিভৃত পল্লীপ্রান্তে বড়দিনের উৎসব অতিবাহিত করিবার সময় হয় তো শৈশব ও কৈশোর জীবনের স্মৃতি মনে পড়ায় তিনি নিরালায় দুই ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু বাহিরের সদা প্রফুল্ল ভাব তাঁহার অন্তরের সে বিষাদ বেদনাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, কেহই কোনদিন তাহা টের পায় নাই।

চট্টগ্রাম হইতে শ্রীযুত সেনগুপ্ত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বৎসরাধিককাল কলিকাতায় অবস্থান করেন। সে সময় মিসেস সেনগুপ্তা তাঁহার শ্বশুরালয়েই ছিলেন। তাঁহার সেবা যত্ন ও স্নেহ ভালোবাসায় অল্পদিনের মধ্যেই স্বামীর পরিবার পরিজনবর্গ এই বিদেশিনী বধূর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বিদেশের সমাজ ও সংসার যে তাঁহাকে এ দেশীয় বধূরূপেই আপনার করিয়া লইয়াছে, এই আনন্দ ও গর্ব্ব তাঁহাকে উৎফুল্ল করিয়াছিল। বিদেশিনী হইয়াও স্বামীর সংসারে আত্মীয় পরিজনের সেবা যত্নে তিনি যেভাবে আপনাকে

বিকাইয়া বিলাইয়া দিয়াছিলেন তাহা খুব কম বিদেশিনী মহিলার পক্ষেই সম্ভবপর।

১৯১০ হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত শ্রীযুত সেনগুপ্ত যখন হাইকোর্টে আইন ব্যবসা করেন সে সময় স্বামীর সহিত তিনি কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেন। কংগ্রেসের প্রতি শ্রীযুত সেনগুপ্তের বরাবরই যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তখন প্রতি বৎসর বড়দিনের সময় কংগ্রেসের অধিবেশন হইত। বড়দিনের সময় পত্নী পরিজন ত্যাগ করিয়া প্রতি বৎসর কংগ্রেসে যোগদান করিতে যাওয়ায় মিসেস সেনগুপ্ত মনে মনে যদিও বিক্ষুব্ধ হইতেন বটে, কিন্তু যোগ্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায় তিনি কোনদিনও স্বামীর ইচ্ছার প্রতিকূলতাচরণ করেন নাই। ১৯২১ সালে শ্রীযুত সেনগুপ্ত আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া যখন অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন সে সময় তিনি স্বামীর সহিত চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন। সেই সময়েই স্বামীর রাজনৈতিক মতবাদের সহিত প্রকাশ্যে তাঁহার প্রথম সহানুভূতি ও সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তারপর ভারতের কংগ্রেসের আদর্শকে একান্তভাবে গ্রহণ করিয়া যেদিন এই ইংরাজ দুহিতা কাঁধে খদ্দর লইয়া প্রকাশ্য রাজপথে ফেরী করিতে বাহির হন এবং সভা-সমিতিতে অনর্গল বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া দেশবাসীকে রাজনৈতিক আন্দোলনে উদ্‌বুদ্ধ করেন সেদিন শুধু ভারতবাসীই নহে, বহু ইংরাজ পুরুষ ও মহিলাও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। স্বামীর সহিত রাজনীতির দুর্গম পথে যাত্রা করিয়া পরাধীন দেশে দেশসেবায় যাহা চিরন্তন পুরস্কার সে পুরস্কারেও তিনি বঞ্চিতা হন নাই। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি দুইবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। একবার ১৯৩০ সালের ৩০শে অক্টোবর দিল্লীতে বে-আইনী জনতায় যোগদানের অপরাধে। আর একবার ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের সভানেত্রীত্ব করায়।

বিবাহের পর স্বামীর সহিত ভারতে আসিয়া আজ প্রায় ২৬ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি ভারতেই অবস্থান করিতেছেন। ইতিমধ্যে মাত্র দুইবার তিনি স্বদেশে গিয়াছিলেন। স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া আসিবার ১৩ বৎসর পরে ১৯২৩ সালে তিনি প্রথমবার স্বদেশে গমন করেন। সেই সময় তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। অতঃপর ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদনের পরে ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে স্বামীর সহিত তিনি দ্বিতীয়বার স্বদেশে গমন করেন। সে সময় কন্যার সুখময় ও গৌরবময় দাম্পত্য জীবন দেখিয়া তাঁহার মাতা সকল দুঃখে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন।

সে সুখ-স্মৃতির পশ্চাতে বিধাতা যে তাঁহার উপর নিদারুণ বজ্র হানিবার জন্য অলক্ষ্যে উদ্যত হইয়াছিলেন, কেহ তখন তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই। বিলাত হইতে বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিবামাত্র শ্রীযুত সেনগুপ্তকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ইহাই তাঁহার দুর্ভাগ্যের প্রথম সূচনা। তারপর ১৯৩৩ সালে রাজবন্দীরূপে রাঁচিতে শ্রীযুত সেনগুপ্তের অকাল প্রয়াণে বিধাতা তাঁহার বুকে যে নির্ম্মম শোকশেল হানিয়াছিলেন, ইংরাজ মহিলা সুলভ ধৈর্য্য ও সাহসিকতা সহকারে তিনি সে আঘাত বুক পাতিয়া লইয়াছিলেন।

যে বিদেশীর প্রেমমুগ্ধ হইয়া তিনি

স্বদেশ ও আত্মীয়বর্গকে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই তাঁহার তিরোধানের পরেও কিন্তু তিনি ভারতের মায়া পরিত্যাগ করেন নাই। সুদীর্ঘ ২৬ বৎসরকাল ভারতে অতিবাহিত করিয়া ভারতকেই তিনি এমন আপনার জন্মভূমি অপেক্ষাও অধিক ভালোবাসিয়াছেন। স্বামী বিয়োগের পরেও তিনি সন্তানদ্বয়কে পালন করিবার জন্য ভারতেই অবস্থান করিতেছেন।

স্বামীর নিকট ভারতের সেবাব্রতে তিনি যে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বামীর তিরোধানের পরেও তিনি সে ব্রত ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিতই প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। দুই দুইবার তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন এবং বিভিন্ন হাসপাতাল ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটিতে যোগ্যতার সহিত কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। শ্রীযুত সেনগুপ্তও তাঁহাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই যোগ্য সহধর্ম্মিনীরূপে লাভ করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি স্বামীর ত্যাগ নির্য্যাতন ও গৌরবের সমভাগিনী হইয়াছেন, আবার সংসার জীবনেও আদর্শ পত্নী ও গৃহিনীর কর্ত্তব্যপালন করিয়া সংসারকে সুখের আগারে পরিণত করিয়াছেন। বিবাহিত জীবনকে গৌরব ও সাফল্যমণ্ডিত করিবার যে ঐকান্তিক বাসনা লইয়া তিনি বিদেশীকে স্বামীত্বে বরণ করিয়াছিলেন, কত প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূল অবস্থা এবং কত মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুজলের ভিতর দিয়া তিনি তাহা সার্থক করিয়াছেন। চরমপন্থী রাজনৈতিক হইলেও শ্রীযুত সেনগুপ্তের জীবনে যে সংযমের পরিচয় পাওয়া যায় ইহা যে তাঁহার পত্নীর প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছিল, একথা বোধ হয় আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

সংসার ক্ষেত্রে তাঁহাদের মিলন যেমন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল কর্ম্মজীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথে তাঁহাদের দাম্পত্যজীবনও হইয়াছিল তেমনি গৌরব ও মধুময়।

স্বকীয় মুখ

(গল্প)

বীরেন দাশ

জনৈক আধবয়সী ভদ্রলোক নিজের মধ্যে কি একটা জিনিষের অভাব বোধ করে সহসা ভীত হয়ে উঠলেন। তিনি নিজেকে খুঁটে খুঁটে দেখতে লাগলেন, সমস্তই ঠিক আছে। (অবিশ্যি তার ভুঁড়িটী ছাড়া)। আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। চোখ, মুখ, কান সব কিছুই ঠিক আছে। কোথাও কোনো স্মরণীয় পরিবর্ত্তন ঠেকছে না চোখে। ভদ্রলোক আঙুল গুণে দেখতে লাগলেন। হাতে দশটা পায়ে দশটা। ঠিক আছে। কিন্তু তবুও তাঁর মনে হচ্ছে কি যেন হারিয়ে গেছে—কি যেন হারিয়ে গেছে। ভদ্রলোক অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

পত্নীকে ডেকে বললেন, মনোরমা, দেখ ত, আমার শরীরটা কোথাও বিকলাঙ্গ হলো কি না। কোথাও কোনো পরিবর্ত্তন—কি যেন মনে হচ্ছে।

মনোরমার মধ্যে ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল। তিনি উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে বললেন, যখনই মনে কুচিন্তার উদয় হয়, একশ' আটবার দুর্গানাম জপ করবে।

ভদ্রলোক বন্ধুবর্গের আশ্রয় নিলেন। একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার শুধাতে লাগলেন তাঁদের। কিন্তু সদুত্তর দিলেন না কেউ। বরং, তাঁরা তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন।

—এর মানেটা কি হতে পারে? ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

বিগত জীবনের কথা তিনি মনে করতে লাগলেন। এককালে তিনি সোসিয়ালিষ্ট ছিলেন। যুবকদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করেছেন, বিপ্লবে সাহায্য করেছেন। কিন্তু আস্তে আস্তে সমস্তই ছেড়ে দিয়েছেন। নিজে যে বাণী প্রচার করেছেন, নিজেই করেছেন তার বিরুদ্ধাচরণ। মোটকথা, সাধারণ দশজনের মত যখনকার যা ঠিক তেমনিভাবে তিনি জীবনযাপন করেছেন।

ভাবতে ভাবতে, সহসা ভদ্রলোক এক আকস্মিক মুহূর্তে, বিষয়টা আবিষ্কার করে ফেললেন।

—হা ঈশ্বর! আমার মুখখানি জাতীয়ভাবাপন্ন নয়। ছুটে গেলেন তিনি আয়নার সম্মুখে। নয়ই ত! অন্ধ পুঞ্জীভূত পাষাণের এক টুকরো—মুখ ত নয় রেখা বৈচিত্র্যহীন একখণ্ড পাথর। অস্পষ্ট—অজ্ঞাত বিদেশী ভাষার মত অস্পষ্ট।

যেন খিচুড়ী আর কি! ভদ্রলোক, আর একটু হলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন আর কি। না, এরকম—এরকম মুখ নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না।

অতএব এরপর থেকে, দামী সাবান ঘসতে লাগলেন মুখের উপর তিনি। দিনের পর দিন সাবান ঘসে ঘসে মুখখানি হয়ে উঠলো চক্‌চকে, মোলায়েম। কিন্তু ঘুচলো না মুখের অস্পষ্টতা, জড়িমা। ঘুচলো না, ঘুচলো না সেই ভাবলেশহীনতা। হা ঈশ্বর!

তিনি জিভ দিয়ে মুখ চাটতে লাগলেন। তার জিভ লম্বা ছিল, কারণ এককালে ভদ্রলোক সাংবাদিকের কাজ করেছিলেন। আর, এতেও হলো না।

ভদ্রলোক নানা উপায় উদ্ভাবন করে মুখখানি স্পষ্ট, ভাষাময় করে তুলতে চাইলেন। কিন্তু কিছু ত হলো না-ই। কেবল তার দেড় পাউণ্ড ওজন কমে গেল।

একদিন তার মনে পড়লো, থানার দারোগা রাইচরণবাবু জাতীয় সমস্যা সমাধানে বাহাদুর। ভদ্রলোক তার কাছে গিয়ে উপস্থিত।

—মশায়, এরকম এরকম হয়েছে, আপনি কি দয়া করে আমায় একটা পথ বাতলিয়ে দেবেন?

দারোগাবাবু, আত্মগৌরবে স্ফীত হয়ে উঠলেন। একজন শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি, যাকে এই সেদিন পর্য্যন্তও রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বলে সন্দেহ করা গেছে, সেই কিনা, মুখের ভাব বদলাবার জন্যে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে।

দারোগা মধুর হেসে বলতে লাগলেন, অতি সোজা কথা মশায়! পরাধীনজাতির বিরুদ্ধে মুখ খুলুন, আসল মুখ চট্ করে বেরিয়ে যাবে।

আঃ! ভদ্রলোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তার ঘাড় থেকে গন্ধমাদন নেমে এলো। ঘনিষ্ঠ—নিতান্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত তাঁরা বিদায় নিলেন! আর ভদ্রলোক ভাবতে লাগলেন, অতি সোজা, বিষয়টা, কেন আমার মাথায় এলো না এতক্ষণ? ভাবতে ভাবতে নেমে পড়লেন তিনি পথে। পথের একপাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। জনৈক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাহেব যাচ্ছিলো সেদিক দিয়ে। ভদ্রলোক ছুটে গেলেন তার সামনে।

—আপনি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হলেও বাঙ্গালী। নয় কি? দেখুন ভেবে দেখুন এই বাংলার জল—

—সাট আপ্ ইউ ফুল—সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের নাকের ডগায় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেবের বিরাশী সিক্কা ওজনের ঘুসি লাগলো। ভদ্রলোক পথের পাশে, দেওয়ালের গায়ে ছিটকে পড়লেন। যাক্ যাক্—জাতীয় মুখ তৈরী করতে হলে অমন একটু আধটু কষ্ট সহ্য করতে হয়।

জনৈক পাহাড়ী আসছিল। পাহাড়ীরা চিরকালই অসভ্য আর উষ্ণ মস্তিষ্ক বলে পরিচিত। সে বলছিল আর ছোট্ট একটু করে গানের পদ ভাঁজছিল।

'আমার ছোট পাহাড়ী কুটীর।'

না, ভদ্রলোক তাকে বাধা দিয়ে বললেন, থামো, পাহাড়ী হলেও তুমি বাঙ্গালী এই বাঙলা দেশের পাহাড়েই তোমার জন্ম। শুধু কুটীর নয়—তোমাকে ভালবাসতে হবে, এর জল, এর স্থল, এর প্রত্যেকটা—

কথা শেষ হবার আগেই ভদ্রলোককে চিৎপটাং করে দিয়ে, সে মদের আড্ডায় চলে গেল। তিনি শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন, আরো কত পাহাড়ী জাত রয়েছে। হা ঈশ্বর, বহু অসংখ্য তারা।

ঠিক সেই সময়, জনৈক বাঙ্গালী আসছিল। সে গাইছিল গুণ গুণ করে

একদা আমরা ছিলাম, জ্ঞানে গরিমায় জগতের—

না, ভদ্রলোক একলাফে উঠে দাঁড়ালেন, একদা নয়, একতা চাই একতা। এই একতার বলেই আমরা আবার জেগে

উঠবো। আমরা ভালবাসতে পারবো আমাদের দেশকে, বাংলার জল বাংলার ফুল—

এই বলে তিনি এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। বাঙ্গালীরা সাধারণত বৃহস্পতি। আস্তে আস্তে কাজ করাই তাদের স্বভাব, কিন্তু এই ব্যক্তিটী সেরকম ছিলেন না।...কোনো সহৃদয় ব্যক্তি, ভদ্রলোককে মাটী থেকে টেনে তুললেন—কোথায় আপনার বাসা?

—বৃহত্তর বাংলায়।

বলা বাহুল্য, তাঁকে তারা থানায় নিয়ে গেল। যেতে যেতে তিনি তাঁর মুখের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। চিন্তা করে গর্ব্বিত হয়ে উঠলেন—যদিও মুখের ব্যথা তখনও যায়নি। মনে হলো তাঁর, মুখখানি খুব চওড়া হয়েছে। আর তিনি ভাবলেন, সিদ্ধিলাভ হয়েছে।

দারোগা তাকে দেখে, দয়ার্দ্র ব্যক্তির মত ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তার বিস্মিত হয়ে দারোগার কাণে কাণে চুপি চুপি বললেন, আমার জীবনে এই প্রথম দেখলাম। এমন বিশ্রী জখম...কিছুই বুঝতে পারছি নে।

তার মানে কি? ভদ্রলোক ভাবতে লাগলেন। অবশেষে শুধালেন, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?

—পুরাণো মুখখানির সমস্ত মুছে গেছে। দারোগা উত্তর দিলেন। ডাক্তার বললেন, ইচ্ছে করলে, মুখখানির উপর পা'জামা পরতে পারেন।

জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তার মুখের বিশ্রী ক্ষতচিহ্নগুলো বর্ত্তমান ছিল।

এ গল্পে কোনো নীতি কথা নেই।

* ম্যাক্সিম গর্কীর ছায়া অবলম্বনে।

রাজ মজুর
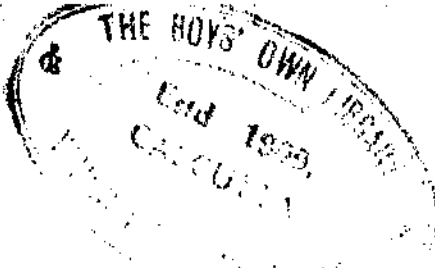
শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস

যত কারিগর কাজ করে হেথা
দেখি দুটি চোখ ভরে,
যেখানের যত ভাঙ্গা চোরা ঘর
জোড়ায় কেমন করে।
হাতিয়ার কত আনিয়াছে তারা
দেখে বিস্মিত হই
কত বাধা ঠেলে কাজ করে যায়
নির্ব্বাক চেয়ে রই।
রাজা কারিগর বিশ্বকর্ম্মা
এরা কি শিষ্য তার,
বছর বছর তার পূজা করে'
চালাতেছে কারবার!
মনে মনে ভাবি' এরা বুঝি তবে
ভাঙ্গা সব জোড়া করে
শিহরিয়া উঠে পরাণ আমার
কি যেন বেদনা ভরে।
দিবসের কাজ হয়ে গেলে সারা
এরাও যাইবে ঘর
মিলিবে তাদের প্রেয়সীর সাথে
যত সব কারিগর।
মোর ভাঙ্গা বুক জোড়া দিতে বুঝি
এদের শকতি নাই
প্রলয়ের শেষে লুপ্ত হবে কি?
ভাবিতেছি বসে তাই।

ছায়া ও কায়া

শ্রীমধু বসু

পরলোকে আর্ভিং থেলবার্গ

হলিউডের বিখ্যাত মেট্রো গোল্ডুইন মায়ার্স-এর যোগ্য প্রোডাকসান্ ম্যানেজার আর্ভিং থেলবার্গ গত পূর্ব্ব সপ্তাহে নিউমোনিয়া রোগে অকস্মাৎ পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স মাত্র ৩৭ বছর হয়েছিল। আর্ভিং ইউনিভারসালে প্রথম কার্য্যারম্ভ করেন, তৎপর মেট্রোর অন্যতম কর্ত্তার পদ লাভ করেন। আর্ভিং তার কোম্পানীর হয়ে এমন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন তার এক প্রমাণ পাই 'গ্র্যাণ্ড-হোটেল' চিত্রে তার পত্নী নর্মা শিয়ারারের পরিবর্ত্তে জোয়ান ক্রফোর্ডকে নির্ব্বাচিত করাতে। এক কথায় এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটীর চিত্রগুলি এরই নির্দ্দেশ মত গৃহীত হত। প্রসিদ্ধা সুন্দরী চিত্রাভিনেত্রী নর্ম্মা শিয়ারারের নাম আজ সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়েছে, কিন্তু এমন দিন গেছে যেদিন তিনি নতার সম্বল হীনারূপে মেট্রোর দরজায় এসে হানা দিয়েছিলেন। সেদিন তাকে এই আর্ভিং শুধু কাজ দিয়েই সাহায্য করেন নি, তাকে স্ত্রী রূপেও গ্রহণ করলেন। সুন্দর এই যুবা কর্ম্মকর্ত্তার জন্য হলিউডের সুন্দরীদের কম লোভ ছিল না, কিন্তু তিনি এক অপরিচিতা যুবতীকে গ্রহণ করলেন সহধর্ম্মিনীরূপে। নর্ম্মা তার যোগ্য প্রতিদান দিয়ে এসেছেন, হলিউডের কর্ত্তব্যপরায়ণা স্ত্রীদের মধ্যে নর্ম্মার স্থান অতি উচ্চে। এই সুখী যুবতীর সুখস্বপ্ন এত শীঘ্র ভেঙ্গে গেল, দুটী সন্তান নিয়ে তিনি বিধবা হলেন। আর্ভিং ছিলেন সত্যিকারের গুণী, তার অকালমৃত্যুতে আমরা সত্যিই মর্ম্মাহত হয়েছি। তার প্রযোজিত শেষ চিত্র 'রোমিও জুলিয়েট' নাম ভূমিকাদ্বয়ে অভিনয় করেছেন লেসলী হাওয়ার্ডও নর্ম্মা শিয়ারার।

পরলোকে চাণি দত্ত

গত পূর্ব্ব সোমবার বাংলা চিত্ররাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় হাস্যরসাভিনেতা রমেশচন্দ্র দত্ত ওরফে চাণি দত্ত ইহলোকের মায়া কাটিয়েছেন। এ খবর আমাদের কাছে অত্যন্ত মর্ম্মদায়ক। উড়ে মালি বা চাকর সাজতে হলেই চাণির প্রয়োজন ছিল, এ শ্রেণীর ভূমিকায় তার তুলনা পাওয়া কঠিন ছিল। প্রথমে তিনি রঙ্গালয়েই অভিনেতারূপে যোগদান করেন, পরে চিত্ররাজ্যে আসেন এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এ ক্ষেত্রেই কাজ করে গেছেন। নিউ থিয়েটার্সের চিত্রগুলিতে অভিনয় করে তার সুনাম আরো বর্দ্ধিত হয়। নির্ব্বাক অভিষেক চিত্রে তিনি উন্মাদরস এমনিভাবে ফুটিয়েছিলেন যাতে তার প্রশংসায় চতুর্দ্দিক মুখরিত হয়ে ওঠে। নিউ-থিয়েটার্স হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইদানিং তিনি নিজেই ছবি পরিচালনা করছিলেন—(খাসদখল)। যদি আলোকচিত্র শব্দ সংযোজনা ভাল হত, তাহলে তার কাজের খ্যাতি সকলেই করতেন। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছিল 'মাণিক জোড়' বা 'নাজা ভাগ্নে' নামে একটী ছোট কৌতুক চিত্র নাকি তিনি তুলছিলেন, সেখানা শেষ হয়েছে কিনা, না আরম্ভই হয় নি তা আমাদের জানা নেই। আমরা তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

ঢাকায় শিশির-সম্প্রদায়

শিশির সম্প্রদায়ের ঢাকা ভ্রমণ সম্বন্ধে
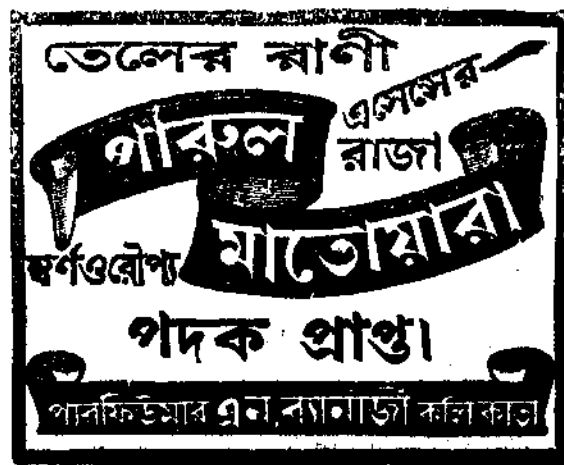
আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের সংক্ষেপে জানিয়েছি। আজ তাদের সম্বর্দ্ধনা সম্বন্ধে আর কিছু লিখলাম। ২৮শে ভাদ্র ঢাকার মাসিক যোগাযোগ-এর পরিচালক ঢাকার প্রসিদ্ধ ধনী শ্রীযুত ব্রজগোপাল দাস যোগাযোগের পক্ষ হতে নিম্নলিখিত কবিতাটী পাঠ করেন—

পরম শ্রদ্ধাস্পদ—

শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী

করকমলেষু—

ইতিহাসে পড়িয়াছি তিন শত বর্ষ আগে
ছিল আলমগীর
দুইশ' বছর আগে মরেছে নাদির ;
কোন সত্যকালে রাম ছিল অযোধ্যায়
কেমনে আবার এরা এলো বাঙলায় ?
ইতিহাস মিথ্যা তবে ?
অথবা ছলনাময় তুমি মিথ্যাবাদী ?
তোমার ছলনা ছলে
মূর্খ মোরা হাসি আর কাঁদি ?
যেই রাজা রামচন্দ্র সেই আলমগীর
একাধারে দিগম্বর দুর্দ্দান্ত নাদির
সত্য করে বলিবে, কে তুমি হে
বিচিত্রময় ?
তাহলে কি বহুরূপী সেজে তোমারই
এসব অভিনয় !
অলক্ষ্যে কে বলে দিল যেন—
চিরন্তনে অনন্তের আবির্ভাব এ-যে
অভিনয় নয় !

*

নটকুলরবি শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী
এম-এ, মহোদয়ের করকমলে—

বন্ধু,

আপনি যেদিন বাঙলার রঙ্গমঞ্চে উন্নত আদর্শ, মার্জ্জিত রুচি ও উৎকৃষ্ট রসবোধের উদ্বোধন করিলেন, সেদিন সহৃদয় সামাজিকবর্গ আপনাকে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন, আজ আমরা তাহারই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি করিয়া আপনার সম্বর্দ্ধনা করিতেছি।

যে নাট্যকলা জাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ, যাহার অনুশীলনে চিত্তের স্ফূর্ত্তি ও আত্মার আনন্দ-মুক্তি ঘটে, সেই নাট্যকলাকে আপনিই নবযুগের উপযোগী করিয়া সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; সঙ্গীত, কাব্য ও চিত্রকলার মতই যাহা উৎকৃষ্ট প্রতিভার—মৌলিক সৃজনী শক্তির অপেক্ষা রাখে, আপনিই সেই নাট্য-শিল্পকে আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। আপনি ভাবকে কণ্ঠস্বরে ও প্রাণকে দেহভঙ্গিমায় মূর্ত্ত করিয়া, শৈলুষবৃত্তিকে কবিকর্ম্মের সমকক্ষ বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। এ জন্য এ দেশের সমগ্র শিক্ষিত রসিক সমাজ আপনার নিকটে ঋণী। আজ এই অবসরে তাহাই স্মরণ করিয়া আমরা আপনাকে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও সবিনয় প্রীতি নিবেদন করিতেছি।

বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ইংরাজী সাহিত্যের কৃতী অধ্যাপক আপনি, একদা ভয় ও লজ্জা ত্যাগ করিয়া অনবহেলিতা কলালক্ষ্মীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাই আজ আমরা, অভিনয় কলার পরাকাষ্ঠা—আপনার কুশল কীর্ত্তি, 'আলমগীর', 'রাম' ও 'জীবানন্দের' অপরিমেয় নাট্যরস আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি—একই কালে নয়নময় ও শ্রবণময় হইয়া দৃশ্যকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছি। আপনি ধন্য, আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে আপনার সেই প্রতিভাকে নমস্কার করিতেছি।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘায়ু হয়ে নব নব সৃষ্টির দ্বারা বঙ্গীয় নাট্যশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন ; আপনার যশ অক্ষয় হউক। বিনীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মিলিত ছাত্র ও ছাত্রী সমাজ।

রমনা,

ঢাকা, ২৫ ভাদ্র, ১৩৪৩

নীহারবালার সম্মানরজনী

আসছে ২রা অক্টোবর, বঙ্গ রঙ্গালয়ের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী নীহারবালার সম্মানরজনী উপলক্ষে নাট্যনিকেতনে 'কেদার রায়' ও 'গৈরিক পতাকা' অভিনীত হবে। কেদার রায়ে যারা বরাবর অভিনয় করেন তারা সকলেই নামবেন, গৈরিক পতাকার প্রধান ভূমিকায় দেখা দেবেন এরা—

শিবাজী—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, যোতকণ্ঠে—অহীন্দ্র চৌধুরী, ঔরঙ্গজেব—রাধিকানন্দ মুখোঃ, রঘুনাথ—ভূমেন রায়, মীরাবাঈ—নীহার, শ্যামলী—সরযূ প্রভৃতি। এছাড়া মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, প্রভা, পুতুল প্রভৃতিরাও নামতে পারেন। স্বদেশী ভারতের দুজন শ্রেষ্ঠবীরের কাহিনী দেখতে, এবং জনপ্রিয়া অভিনেত্রীর প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থে নাট্যানুরাগীরা দলে দলে উপস্থিত হবেন আশা করি।

সম্মিলিত অভিনয়

সম্প্রতি সম্মিলিত অভিনয়ের যেরূপ হিড়িক লেগেই আছে তাতে এর আকর্ষণ না থাকারই কথা। আগামী ৯ই অক্টোবর নাট্যনিকেতনে মণি ঘোষের উদ্যোগে 'প্রফুল্ল' শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃ সম্মিলনে অভিনয় হবে। এসঙ্গে আরেকখানা নাটকও অভিনীত হবে। সম্ভবতঃ প্রফুল্লে এরা নামবেন—

যোগেশ—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, ভজহরি—অমর মল্লিক, কাঙ্গালীচরণ—অহীন্দ্র

চৌধুরী (এই প্রথম) প্রফুল্ল—নীহার, জ্ঞানদা—প্রভা বা সুশীলাসুন্দরী—নগেন্দ্রবালা বা কুসুমকুমারী, জগমণি—নীরদাসুন্দরী প্রভৃতি।

ষ্টুডিয়ো সংবাদ

'গৃহদাহে'র মুক্তিকাল আগতপ্রায়। 'চিত্রা' সুসংস্কৃত হয়ে এখানা নিয়ে নতুনভাবে যাত্রা সুরু করবে।

'বিজয়া'র মুক্তিকাল ১০ই অক্টোবর রূপবাণীতে তাই জানতাম, এখন পত্রান্তর মারফৎ জানা যাচ্ছে হয়তঃ ও তারিখে 'বিজয়া' নাও দেখা দিতে পারে। তা যদি সত্য হয় তাহলে পূজার পূর্ব্বে রাধা ফিল্মের 'বিষবৃক্ষ' রূপবাণীতে প্রদর্শিত হতে পারে। বিষবৃক্ষের কাজ অতি দ্রুত চলছে, বর্ত্তমানে যে সেটে ছবি তোলা হচ্ছে—এ খানা শেষ হলে আর মাত্র একটী সেট্ হবে (হীরার গৃহ) এবং শোনা যাচ্ছে—এইটীই এর শেষ সেট্।

উত্তরায় ১০ই অক্টোবর 'সোনার সংসার' মুক্ত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। আরেক কথা চুপি চুপি বলে রাখি - হয়তঃ শ্রীতে পূজার পূর্ব্বেই একখানা প্রসিদ্ধ কাহিনীর চিত্ররূপ দেখতে পাওয়া যাবে।

শ্রীভারতলক্ষ্মীতে 'আলিবাবা'র শ্যুটীং চলছে। এই ষ্টুডিয়োতে 'সরলা'র শ্যুটীং গত ২১শে সেপ্টেম্বর হতে আরম্ভ হয়েছে এবং কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। সরলায় নামছেন—

শশীভূষণ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বিধুভূষণ—তারাকুমার ভট্টাচার্য্য, নীলকমল—কেষ্টধন - মুখোঃ, জমাদার—তারাকুমার ভাদুড়ী, প্রমদা—প্রভা, শ্যামা—মনোরমা, সরলা—(?)। গদাধরচন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন অহীন্দ্রচৌধুরী। ছবিখানা যামিনী মিত্তিরের।

কালী ফিল্মস্ খুব বেগে কাজ আরম্ভ করেছিলেন—কিন্তু এখন তাল সামলান দায় হয়ে পড়েছে। তাদের 'দস্যুরত্ন টকি'র কাজ আপাততঃ স্থগিত আছে শিশিরকুমারের জন্য।

পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া এবার বিলেত যাচ্ছেন বিশ্রাম নিতে এবং ফিল্ম সম্বন্ধে আরো সব শিখতে। তার পরিবর্ত্তে নিউ থিয়েটার্স নাকি দেবকী বসুকে নিচ্ছেন। সুখবর নিশ্চয়! দেবকীবাবু তো অনেক জায়গাতেই ঘুরলেন কিন্তু সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে তার স্বস্থানে আসাই ভাল।

পরিচালক তড়িৎ বসু নাকি রাধার মায়া কাটিয়েছেন—তাহলে 'অভয়ার বিয়ে' হবে না বোধ হয়। প্রসিদ্ধ তরুণ ক্যামেরাম্যান যতীন সহোদর প্রবোধ দাস এখানে যোগ দিয়েছেন। আর চলে গেছেন যশোবন্ত ওয়াদীকার।

বেকারের দরখাস্ত

সুশীলচন্দ্র রায়

দরখাস্ত লিখে লিখে দোয়াত কলমের বাপের শ্রাদ্ধ করে দিলাম—তবুও দরখাস্তের সার্থকতা কি বুঝতে পারলাম না! লোকে বলে "একটা দরখাস্ত ক'রে দাও কাজ মিলবে," কিন্তু তারা ঠাট্টা করেই বলে কি সত্য কথা বলে, সেটা আমি হয়ত বেকার বলেই বুঝতে পারি না।

এই বিরাট সংসারে সকলেই আপন আপন কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে। কিন্তু বেকার সে চিরবেকার হ'য়েই দুঃখভোগ করে। যখন সংসারের বেকার আর কর্ম্মী এই দুই শ্রেণীর লোকের প্রতি তাকাই, তখন মনে হয় তারাই সুখী যাদের কাজ আছে, আর তারাই দুঃখী যারা বেকার।

কিন্তু জ্ঞানের দিক দিয়ে দেখতে গেলে মনে হয় বেকাররাই বুঝি সুখী। কারণ দুঃখ নইলে সুখ বৃথা। যে দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ না ক'রে তাকে পরাজয় করতে না পারে সে আবার সুখী কিসের? কারণ তার ত জীবন সুখ দিয়ে গড়া এবং সুখেই শেষ হবে। যে সুখ কি তা বোঝে না এবং বোঝবার সুযোগও পায় না, সে কিন্তু তার জীবনে একটা মস্ত বড় জ্ঞান লাভ করে যা সে অভাবে কাগজ কলম দিয়েও প্রকাশ করতে পারে না। তার হয়ত লেখবার অনেক কিছুই থাকে কিন্তু দরখাস্ত তার প্রতি তাকায় না। সেই জন্যই সে তা প্রকাশ করতে পারে না।

আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখি যাদের অনেক আছে তাদের প্রতিই দরখাস্ত মুখ তুলে চায়। এ চাওয়াটা কি দরখাস্তর উচিত? যদিও দরখাস্ত এটাকে উচিত মনে করে না তবুও দরখাস্তকে যে চালনা করে সে এটাকে খুব উচিত বলে মনে করে, কারণ কথায় বলে 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া' একথাটা সত্যই আমরা এখানেই সত্য মনে করি। কেন, কি জন্য তারা এটাকে ভাল মনে করে তা বুঝতে পারি না।

অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে যারা মনে করে তাদের চেয়ে সংসারে পাপী কে আছে? সংসারে ধর্ম্মের বড় কিছু নাই, কিন্তু আজ কাল হয়েছে অধর্ম্মের বড় কিছু নাই, অধর্ম্ম যে যত করতে পারবে সে তত সুখী হবে।

বিধাতা কিন্তু যাকে যেটুকু দেবো বলে আছেন তাকে সে টুকু দেবেনই তাতে আর দরখাস্তর মা বাবাদের হাত দেবার শক্তি থাকবে না। মুণ্ডমালার মত দাঁত খামুটিই সার হবে।

কিন্তু এইটাই মুস্কিল হয়েছে কি না যে দরখাস্তর মা বাবাদের তোয়াজ না করলে এ অধর্ম্মের রাজ্যে বাস করা ভার। কারণ ধর্ম্ম ত অনেক দিনই লোপ পেয়েছে তার যায়গায় অধর্ম্ম এসে চেয়ার দখল করেছে। সেই চেয়ারের মালিককে তোয়াজ করলেই নাকি বেকারের জীবন হতে মুক্তি পাবো। এত অত্যাচার এত অন্যায় কি সত্যই সহ্য হয়?

শ্যামবাজার ষ্টোরস্

ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর্স্ বা বিভাগীয় বিপণির প্রয়োজনীয়তা বাঙ্গালী আজ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। কলিকাতা সহরের বুকে এই ধরণের কয়েকটী বিপণি হইয়াছে। শ্যামবাজার ষ্টোর্স্ মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে যেরূপ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এক জায়গায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করিবার সুখ-স্বাচ্ছন্দতা প্রভূত। অতি আনন্দের বিষয় এই যে, এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালীর অর্থে পরিপুষ্ট বাঙ্গালীর দ্বারা স্থাপিত এবং বাঙ্গালী কর্ম্মীবৃন্দের দ্বারাই পরিচালিত। সুতরাং বাঙ্গালী মাত্রেরই এই ষ্টোর্স্‌কে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা উচিৎ।

প্রতিষ্ঠাতাগণ আগামী পূজা উপলক্ষে এখন হইতেই বিরাট দ্রব্যসম্ভারে ষ্টোর্স্‌টি সুসজ্জিত এবং পরিপূর্ণ করিয়াছেন। নানা দেশীয় উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি এবং এ দেশীয় কুটীর শিল্প হইতে আরম্ভ করিয়া, স্বদেশজাত সকল প্রকার জিনিষ সর্ব্বদা সুবিধা দরে বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। বিবাহাদির সকল প্রকার জিনিষ সওদা করিবার জন্য মহিলাদের পক্ষে এই ষ্টোর্স্ অতি আরামদায়ক।

এই বিভাগীয় বিপণিকে সুচারুরূপে পরিচালনা করিবার জন্য আমরা ষ্টোর্সের কর্ত্তৃপক্ষ এবং সুযোগ্য নবীন ম্যানেজারকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
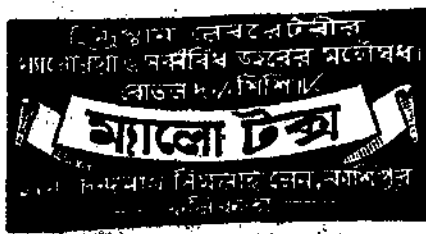
কলিকাতা কর্পোরেশন

ঋণের বিজ্ঞাপন

শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ১৯৩৬-৩৭ ডিবেঞ্চার-পত্র দ্বারা ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণের জন্য টেণ্ডার - উহা ১৯৬৬ সালের ১লা অক্টোবর পরিশোধ করা হইবে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনেরে (বঃ ব্যাঃ) ৯৭ ধারা অনুসারে, ভারত সরকারের অনুমোদনক্রমে; কলিকাতা কর্পোরেশন ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনানুসারে ধার্য্য কর, ট্যাক্স ও পাওনা ইত্যাদি জামিন রাখিয়া ডিবেঞ্চার-পত্র দ্বারা ৮০,০০,০০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণের মঞ্জুরী পাইয়া ৩০ লক্ষ টাকার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন এবং বাকী টাকা সমমূল্যে নিজেরাই ক্রয় করার অধিকার কর্পোরেশনের রহিল।

২। ১৯৩৬ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ৩০ (ত্রিশ) বৎসরকাল ধরিয়া এই ডিবেঞ্চার চলিবে এবং শতকরা বার্ষিক ৩৲ টাকা হারে সুদ দেওয়া হইবে এবং ডিবেঞ্চার-পত্র গ্রহীতার ইচ্ছানুযায়ী কলিকাতা বা বোম্বাইয়ে প্রতি বৎসর ১লা এপ্রিল ও ১লা অক্টোবর ষাণ্মাসিক সুদ দেওয়া হইবে। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর কলিকাতায় সম্পূর্ণ মূল্যে ঋণ পরিশোধ করা হইবে।

৩। ১০০৲ টাকা বা তাহার গুণিতকের জন্য ডিবেঞ্চার-পত্র দেওয়া হইবে।

৪। সমগ্র ঋণ বা তাহার অংশের জন্য টেণ্ডারসমূহ, কলিকাতায় ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বা কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী কর্ত্তৃক ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর বুধবার মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত (স্থানীয় সময়) গৃহীত হইবে।

৫। নিম্নরূপ ফরমে প্রত্যেক টেণ্ডারের দরখাস্ত করিতে হইবে এবং শীল-মোহরাঙ্কিত খামে পুরিয়া উহাতে সেক্রেটারী এণ্ড ট্রেজারার, ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, কলিকাতা অথবা সেক্রেটারী,—কলিকাতা কর্পোরেশন, সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস, কলিকাতা ঠিকানায় দিতে হইবে এবং খামের উপর ১৯৩৬-৩৭ সালের মিউনিসিপ্যাল লোনের জন্য টেণ্ডার লিখিতে হইবে। কলিকাতার ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে অথবা কলিকাতা সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে, কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারীর নিকট টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

৬। যে পরিমাণ টাকার টেণ্ডার দেওয়া হইবে, তাহার অন্যূন শতকরা ৫৲ টাকা বায়নাস্বরূপ প্রত্যেক টেণ্ডারের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে—ঐ টাকা কোম্পানীর কাগজ, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বা কারেন্সী নোট বা চেক দ্বারা দিতে হইবে।

৭। টেণ্ডার গৃহীত হইয়া ঋণপত্র বিলি হইলে পর, বায়নাস্বরূপ যে টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বাদে বাকী টাকা কারেন্সী নোট বা চেক দ্বারা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর বা তৎপূর্ব্বে কলিকাতার ইম্পিরেয়েল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ায় অবশ্য দাখিল করিতে হইবে। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বিলি করা ঋণের জন্য টাকা গৃহীত হওয়ার তারিখ হইতে ডিবেঞ্চার পত্রের সুদ চলিবে। চেক দ্বারা ঐ টাকা দিলে, চেক ভাঙ্গাইবার তারিখকেই টাকা পাওয়ার তারিখ ধরা হইবে। বায়নার টাকা নগদ হইলে টেণ্ডার
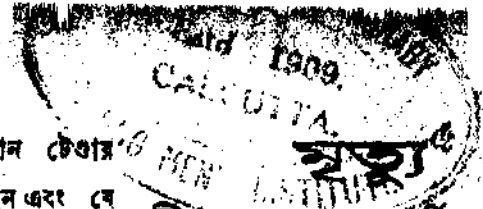
গৃহীত হওয়ার তারিখ হইতে, আর চেক হইলে চেক ভাঙ্গাইবার তারিখ হইতে, বিলিকৃত ঋণের বাকী টাকা দাখিলের তারিখ পর্য্যন্ত কালের জন্য বায়নার টাকার উপর শতকরা ৩ টাকা হারে সুদ ডিবেঞ্চার পত্র দেওয়ার সঙ্গে পৃথকভাবে চেক দ্বারা দেওয়া হইবে ; তবে ১৯৩৬ সালের ১০ই অক্টোবর তারিখে বা তৎপূর্ব্বে বিলিকৃত ঋণের সমুদয় টাকা দাখিল হইলেই উহা দেওয়া হইবে। ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে ছয়মাসপূর্ণ হইবে, সেই ভাঙ্গা সময়ের জন্য ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে ডিবেঞ্চারের সর্ব্বপ্রথম সুদ দেওয়া হইবে।

৮। যে সমস্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে না, তাহার বাবদ জমা দেওয়া বায়নার টাকা দরখাস্ত করিলেই ফেরৎ দেওয়া হইবে। কিন্তু এইরূপ জমা দেওয়া টাকার জন্য কোন সুদ দেওয়া হইবে না। যদি কোন বিলিকৃত ঋণের প্রস্তাব গৃহীত না হয় বা ১৯৩৬ সালের ১০ই অক্টোবর মধ্যে যদি ঋণের পুরা টাকা দাখিল না করা হয়, তবে বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

৯। টেণ্ডারে দেওয়া দর টাকা বা টাকা এবং আনার উল্লেখ করিতে হইবে। কিন্তু কোনক্রমেই উহা আনার ভগ্নাংশ হইতে পারিবে না। যদি কোন টেণ্ডারে দেওয়া দরে আনার ভগ্নাংশ থাকে, তবে উহা কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং ঐ দরে আনার ঐরূপ ভগ্নাংশ যেন ছিল না বলিয়াই ধরা হইবে। যে টেণ্ডারে দর টাকা বা টাকা এবং আনায় দেওয়া থাকিবে না, তাহা রদ ও বাতিল বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে।

১০। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর বুধবার অপরাহ্ন ৩॥ ঘটিকার সময় কর্পোরেশনের ফাইন্যান্স ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি কর্ত্তৃক টেণ্ডার সমূহ খোলা হইবে।

১১। সর্ব্বোচ্চ বা যে কোন টেণ্ডার গ্রহণ করিতে কমিটী বাধ্য নহেন এবং যে কোন টেণ্ডার সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে গ্রহণ করা এবং তদনুসারে বিলি করার অধিকার কমিটির রহিল।

১২। দালাল বা ব্যাঙ্কের মারফতে প্রাপ্ত টেণ্ডারও গৃহীত হইবে এবং সেই স্থলে তাহার উপর শতকরা চারি আনা হারে দালালী দেওয়া হইবে।

ভাস্কর মুখার্জ্জি,
বি-এ (ক্যান্টাব), বি, এস, সি (ক্যাল),
কর্পোরেশনের অফি: সেক্রেটারী
সেনট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
কলিকাতা
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬।

৩০ লক্ষ টাকার জন্য ১৯৩৬ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৩৬-৩৭ সালের ৩৲ টাকা সুদের ডিবেঞ্চার লোন।

সেক্রেটারী,
কলিকাতা কর্পোরেশন সমীপে—

আমি বা আমরা···এতদ্বারা···টাকার জন্য ১৯৩৬ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ৩০ বৎসরের জন্য ১৯৩৬-৩৭ সালের শতকরা ৩৲ (তিন) টাকা সুদের মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার লোনের টেণ্ডার দিলাম এবং এজন্য ১৯৩৬ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের বিজ্ঞাপনের সর্ত্তাধীনে আমার বা আমাদের ভাগে যে পরিমাণ পড়িবে, তাহার প্রতি শতকের জন্য টাকা······আনা ······দর দিতে সম্মত আছি।

আমি বা আমরা বায়নাস্বরূপ এতৎসঙ্গে জমা দিলাম
(১) কোম্পানীর কাগজ
(২) কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার
(৩) কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার
(৪) কারেন্সী নোট
(৫) ······টাকার চেক

(স্বাক্ষর)·········
তারিখ·········

মৃত্যু

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বি, এস,সি

সন্ধ্যার আঁধার যথা নেমে আসে ধীরে
প্রকৃতির শ্যাম অঙ্গে আঁকি ম্লানছায়া,
অস্তগামী তপনের রশ্মি বৃক্ষশিরে
নিভে যায় ধীরে কাটি' দিবসের মায়া।

তৈলহীন দীপশিখা ধীরে হয় ম্লান
ম্লানতর, ক্ষণ পরে হয় নির্ব্বাপিত
সাধ্য নাই আর তার করে আলো দান,
ভুলে যায় কে কাহারা ছিল আলোকিত।

মানব জীবন-দীপ হ'লে তৈলহীন
ছেয়ে আসে দেহ পরে ক্লান্তি অবসাদ,
উজ্জ্বল আনন ক্ষণে পাণ্ডুর মলিন
শেষ দিনে নাহি ভেদ—স্তুতি অপবাদ।

পাশ হ'তে মৃত্যু আসি দাঁড়ায়ে শিয়রে
কুলিশ কঠোর দেখে—শেষ হল আয়ু,
কালো যবনিকা টেনে দিয়ে আঁখি পরে
লয় কাড়ি বক্ষ চিরে ক্ষুদ্র শ্বাস-বায়ু।

ছিল যার কত সজ্জা, শয্যা মনোরম
গত প্রাণ ক্ষীণদেহ ধরায় লুটায়,
কাল পূর্ণ ক্ষুদ্র বায়ু এতই নির্ম্মম
কাঁদিছে পিছনে কা'রা ফিরে নাহি চায়।

শোক সংবাদ

আমরা জানিয়া দুঃখিত হইলাম, ই, বি, রেলওয়ের রেটস এণ্ড ডেভেলপমেন্টের এসিঃ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও পাবলিসিটি অফিসার মিঃ এস, কে, মুখার্জ্জির তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র তাহার বালীগঞ্জস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছে। শিশুটী কিছুদিন যাবৎ ভুগিতেছিল। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদিগের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সচিত্র সাপ্তাহিক

দ্বিতীয় বর্ষ—৩৪শ সংখ্যা

শুক্রবার—১৬ই আশ্বিন

১৩৪৩

২রা অক্টোবর—১৯৩৬
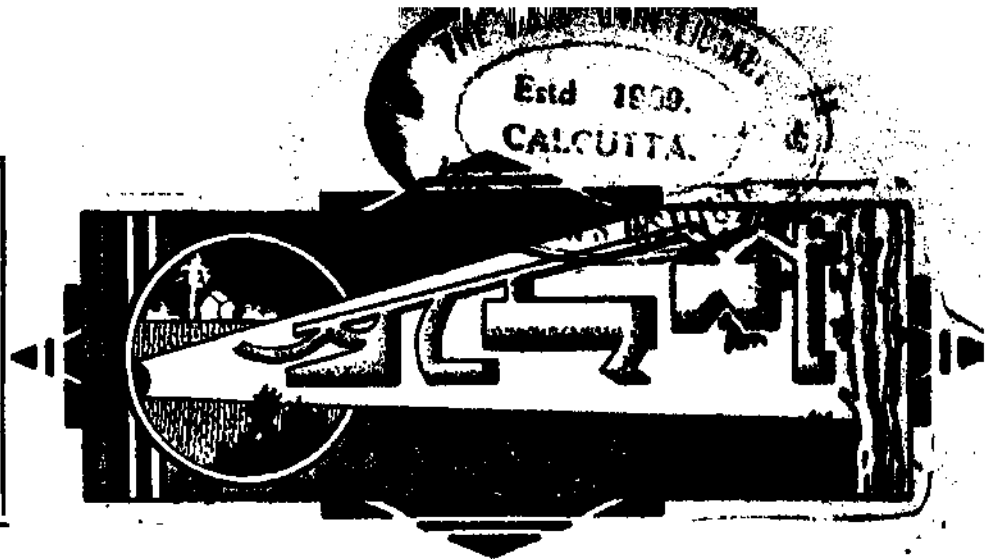
যুগধর্ম্মের প্রভাব মানুষ পারে না এড়াতে! তাই শত সহস্র প্রতিকূল আবহাওয়ার অনমনীয় আবর্ত্তে ঘূর্ণ্যমান পল্‌কা তরীর মত ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চ'লেও বিদেশী সাহিত্যের যৌনোষ্ণ পণ্যসামগ্রী আমাদেরকে কিছুটা বে-আব্রু করতে সমর্থ আজ হয়েছে। আমরাও আমাদের চিরাচরিত নৈতিক মাপকাঠির মাপকে এই কারণেই কিছু আল্‌গা দিয়ে, এই বিদেশীয় সাহিত্য-প্রসারতার ভঙ্গীকে আমাদের দেশের পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে যথাসম্ভব খাপ খাওয়াবার চেষ্টায় অবহিত হয়েছি, এবং এখনো হচ্ছি, ভবিষ্যতেও হব। কিন্তু সাহিত্যে সৃষ্টির মূল অনুপ্রেরণা যে সৌন্দর্য্য অনুভূতির সুকুমার সাধনায় জীবন-ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হবার সারল্যে, রসানুরক্তির নিবিড়তম আনন্দে আনে তন্ময়তা, তার থেকে পেছিয়ে গিয়ে কেবলমাত্র কাম-কলার পাশবিক অনুস্মৃতির চর্চ্চাতেই আমরা যেন আপনার অজ্ঞাতসারে মরণকেই শুধু ডেকে না আনি, সর্ব্বাগ্রে এই দিকে নিবদ্ধ থাকবে একটা সদাজাগ্রত দৃষ্টি! ওদেশের যা সত্যিকারের সাহিত্য, তাতে এই জাগর দৃষ্টির ব্যতিক্রম তো নেই-ই, আমাদের সংস্কৃত সাহিত্য ও তদপেক্ষা আধুনিক বৈষ্ণব-সাহিত্যেও নেই তার অভাব। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই সৌন্দর্য্যমুখী অন্তর্দৃষ্টিই হবে মূল উপাদান!

কিন্তু মানুষ করে ভুল। কামকেই সে প্রেমের সুনির্দ্দিষ্ট আহ্বান মনে ক'রে সাহিত্য সৃষ্টির বৃথা প্রয়াসে আপাতঃমধুর ইন্দ্রজাল রচনা করবার উন্মাদনায় ওঠে মেতে, তখন সে যা কিছু ভাবে, যা কিছু দেখে—তাই হয়ে ওঠে পঙ্কসিক্ত অনুর্ব্বর জলাশয়ের মত অন্তঃসারশূন্য, সে পঙ্কে ইহজীবনেও হয় না একটি মাত্র পঙ্কজেরও উন্মেষলাভ!

তবু মানুষের ধৃষ্টতার পরিসীমা নেই। অনুর্ব্বরমস্তিষ্ক শত সহস্র বালকের মধ্যে অকালে যে যৌন স্বেচ্ছাচারিতার উদগ্র ব্যগ্রতা হয়ে ওঠে বড়ো, নির্ব্বোধেরা সেই আপাতঃমধুর নারকীয় নীতির অনুসরণেই করে সাহিত্যের রাজ্যে দিগ্বিজয়ের কামনা! উগ্র স্বাভাবিক ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে অন্ধের মত, অর্ব্বাচীনের মত তারা হয় অগ্রসর।

এ কথা অবশ্যই মানি, মানুষের মধ্যেও যৌন-ক্ষুধায় একটা স্বাভাবিক গতি আছে। তাকে অস্বীকারও করিনে। কিন্তু যে গুণে মানুষ হয়েছে মানুষ, কুকুর ও ছাগাদি জীব রয়েছে পশু—বিংশ শতাব্দীর এই উন্নততর সভ্যতার আলোকে সভ্যতম জীব হয়েও সাহিত্য-সমাজে এমন ছাগমুখী নীচতাও আত্মপ্রকাশ করে! তাহলে ধৃষ্টতা বলব আর কাকে?

চাতিম চাতিম

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ভারতবর্ষ ইংরাজের প্রসাদাৎ নাকি এই দেড়শ' বছরে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর দেশে রূপান্তর হয়ে গেছে, কংগ্রেসের কর্ত্তারা আমাদের অহোরাত্র এই কথা শুনিয়েছেন। শোষণ এবং শাসনের দাপটে এই দশে থাক্তে পূর্ণ দেশ উজাড় হয়ে নাকি অলক্ষ্মীর বাথানে দাঁড়িয়েছে। এই শোষণের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী শুনে শুনে আমরা ন্যাশনালিজমের ১০৮' ডিগ্রি জ্বরে ধুঁকেছি, ফাঁকা দেশপ্রেমের প্রলাপ বকেছি, রাগে চক্ষু রক্তবর্ণ করে পলিটিকাল শ্বশুর মন্দিরে গিয়ে লপ্‌সী খেয়েছি, কি না করেছি! চেঙ্গিস্ খাঁ, নাদির শাহ থেকে ভাস্কর পণ্ডিত অবধি, শক, হুন, মোগল, পাঠান থেকে আধুনিক মাড়োয়াড়ী, ভাটিয়া, বোম্বেটে, গুর্জ্জরী অবধি নানা স্বদেশী বিদেশী মার্কা পলিটিকাল ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল শোষকের হাতে পড়ে শোষিত হওয়াটা আমাদের এতদিনে একেবারে গা-সহা হয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল। অহোরাত্র জলায় বাদায় যাকে জোঁকে খায় তার জোঁকের ভয় থাকে না।

* * *

এক জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য ঠাকুরই এই নির্জ্জলা সত্যটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন, যে, অর্থমনর্থং—অর্থই হচ্ছে অলক্ষ্মী। এই অর্থ যার আছে তার পায়ে পায়ে বিপদ ঘোরে, পুত্র হতেও ধনীর ভয়ের কারণ আছে, সুতরাং এ অনর্থ পারমার্থিক হিসেবে যাওয়াই মঙ্গল। আমাদের দেশের ভগবানই অবতার হয়ে বলে যান—"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ." দুনিয়ার আর যার নাকি দেশ ও জাত কৌপীন সম্বল দশাকে মনে প্রাণে ভয়ায়। তাদের আপ্রাণ চেষ্টা হচ্ছে এই অনর্থ বস্তুকে কিসে তারা পাহাড় প্রমাণ করে জমা করবে এবং জীবনের রাস্তায় পরমানন্দে চৌঘুড়ী হাঁকবে। আর আমাদের চেষ্টা হচ্ছে কালের চাকাটাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে করতে কি করে আমরা সত্যযুগের বল্কলসম্বল তপোবনে হাজির হবো। দুনিয়াটা যখন বাবা বুধু থেকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ অবধি সকলেরই মতে আনকোয়ালিফায়েড ডুইসেন্স তখন ওটাকে "টাকা মাটি মাটি টাকা" করতে করতে বর্জ্জন করাই বিধেয়। কি বলেন আপনারা?

* * *

গল্পে আছে, একটি নধরকান্তি কচি পাঁঠা গিয়ে ব্রহ্মার কাছে নালিশ জানিয়েছিল এই বলে, যে, "হে ঠাকুর! আমাকে যে দেখে সেই খেতে আসে।" পঞ্চমুখ দেবতা তাঁর পাঁচ পাঁচটি মুখে কচি পাঁঠা দর্শনে জল সঞ্চার হতে দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "ব্যাটা! শীগ্‌গির সরে পড়, তোকে দেখে আমারও যে লোভ হচ্ছে।" স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষ এবং শস্যশ্যামল বঙ্গদেশ হচ্ছে এবম্প্রকার কচি পাঁঠা, তার নালিশ করবার জায়গা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নাই এ সহজ কথাটা কংগ্রেস নেতাদের গরম মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। তাই যদি না হবে তা'হলে আমাদেরই বোম্বেটে গুজরাটি মাড়োয়াড়ী ভাটিয়া আদি অল ইণ্ডিয়া ব্রাদারদের মধ্যে একরি ব্লেসেড মাদার'স সন্-এর বাংলা বলতে মুখে জল আসে কেন? একচ্ছত্রা হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনা করতে গিয়ে শিবাজী ও রামদাস ঠাকুরের উপযুক্ত চেলা ভাস্কর পণ্ডিতের বাংলাজনপদ লুণ্ঠন করবার প্রবৃত্তি গজায় কেন? বাংলাদেশ কি আফগানিস্থান, না, বাল্‌খ, বোখারা? নদীমাতৃক বঙ্গদেশ কি হিন্দুর দেশ নয়?

* * *

ন্যাশনালিজমের কুজ্ঝটিকায় ধোঁয়াটে মাথায় এই রকম বহু সহজ অনায়াস তত্ত্ব প্রবেশ করে না। মোগল রবি যখন অস্তমিতপ্রায়, রোহিলা সর্দার গোলাম কাদের যখন দিল্লীর নাবালক বাদশাহের

চষু উপড়ে দিয়েছে, বর্গী পাঠান পিণ্ডারী ঠগে পাল্লা দেশটা চষে খাচ্ছে, তখন শক্তিমান সুচতুর ইংরাজ এদেশ দখল করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে। ভীম নাগের রসগোল্লার মত সুযোগ ও সুবিধামত দেশটা টপ্ করে রাজা খুড়ো যদি গালে ফেলে না দিত তা'হলে ঢিলা পায়জামা কাবুলী শত্রুপাঠ সে কার্য্য সমাধা করতো বা নাক চেপ্টা নেপালী কি জাপানী এসে সে শুভ কার্য্য সম্পাদন করতে উদাসীন থাকতো না। স্বর্ণপ্রসূ ভারতমাতার মত এরকম একটি অরক্ষণীয়াকে নিয়ে ইলোপ করার মত সহজ কার্য্য তখন আর কি ছিল ?

* * *

এই সব ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক সহজ তত্ত্ব জানা সত্বেও স্থাশনালিষ্ট নেতারা আবদার করে-থাকেন এই বলে, যে, ইংরাজ বাহাদুর, এমন সোণার দেশটাকে লুটে খাচ্ছেন, তাঁরা নিজেরা কোপীনসম্বল হয়ে কালার রীতিতে অন্নসত্র ও স্বরাজ-সত্র খুলছেন না কেন ? এই রকম পাঁঠার নালিশ এবং অভিমানিনীর প্যানপ্যানে আবদারই আমাদের রাজনীতি, এর চেয়ে বেশি বুদ্ধি ও জাতিতত্বজ্ঞান নেতাদের কাছে আমরা কখনও পাই নাই। এরা ভুলে যান যুধিষ্ঠিরের ধর্ম থেকে মোগল পাঠান রুশ জার্মাণ সকল স্বদেশপ্রীতিই অ্যাট্ দাস বডিস্ কস্ট্। দিগ্বিজয়ীর জয়মালা বামা কালীরই নর মুণ্ডমালা, ন্যাশনালিজমের ঔরসেই ইম্পিরিয়ালিজমের জন্ম—তা' সে অহিংস অশোকেরই হোক আর সুসভ্য আলেকজাণ্ডারেরই হোক।

* * *

এই অবস্থায় তখন আত্মরক্ষায় উদাসীন হওয়াই মহাপাপ। "আত্মানং সততং রক্ষেৎ ধনৈরপি দারৈরপি" কৌপীন কমণ্ডলুতে আত্মরক্ষা সম্ভব নয়, সেই কামকাঞ্চনেরই শরণাপন্ন হতে হবে। শুধু তাই নয়, পরের কাছে আত্মত্যাগ ও দানসাগর আশা করে নিজের বেলায় স্বদেশীর ট্যাঁকে হাত বুলানর হীন প্রবৃত্তিটা ছাড়তে হবে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় আছে বাঁচবার মন্ত্র, বিধিদত্ত মগজে আছে কমন সেন্স আর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আছে ঠেকে শেখার টনটনে অভিজ্ঞতা।

* * *

দেশের অর্থ দেশে রাখবার উপায় হরিণ বাড়ীর জেলে নাই, দেশের স্বরাজের ভিত কংগ্রেসের গরম গরম প্রস্তাব পাশে নাই, অর্দ্ধভুক্ত চাষার অন্ন এবং মহাজনের ঋণরূপ মুস্কিল থেকে তার আসান চটাপট চটাপট করতালিধ্বনি বা নেতার ধ্বজ পতাকার নাই ; একথা দেশবাসী বুঝেছে।

ক্ষুদ্র বৃহৎ নির্ব্বিশেষে জলোকা মাত্রেই যে রক্ত শোষণেই বাঁচে এবং পুষ্ট হয় এবং তাদের নাম যে শুধু জমিদার মহাজন নয় তাও মানুষের বোধগম্য হয়ে আসছে। মানুষের জয় যাত্রার রথের চাকা যে বিশ্বামিত্রের তপোবনে আর ফিরবে না সেই জ্ঞানের উদয়ে বহু আউট অব-ডেট স্বপ্ন ও ইলিউশানস্ কেটে গেছে। এখন আসছে জাতির নাবালকত্ব কেটে সব কয়টি আক্কেল দন্ত উদগমের সময়, ষ্টার্ক রিয়ালিটির যুগ, দু'য়ে দু'য়ে চারের হিসাব! নেতার গোঁজা মিলে আর সাদাকে কিছুতেই কালো করা যাবে না।

চাকুম-চুকুম

পঞ্চমুখ শর্ম্মা

চিরকুমার মন 'হিমালয়ের পথে' চিরকালই যে 'অগ্রগামী'ই থাকিয়া যাইবে, ভুলিয়াও কখনো শ্রীমতী ইত্যাদির সংস্পর্শে আসিবে না, এমন কি 'সিভিল ম্যারেজ'-এর কুসুমকোমল বন্ধনেও ধরা দিবে না—ইহা কেমন করিয়া বলা যায় ? এরূপক্ষেত্রে 'অগগামী'কে যদি হঠাৎ পিছাইয়া যাইতে দেখা যায়' তাহা হইলে অবশ্যই আশার কথা। তাহা না হইলে—মিস্ বসু যদি মিসেস্ চাটার্জ্জি, অথবা মিস্ দাশগুপ্ত যদি মিসেস সান্যাল ক্রমাগতই হইতে থাকেন, রাঢ়ীই হউক, বারেন্দ্রই হউক—ব্রহ্মতেজবিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণসমাজের টিকি-সঞ্চালনে আবার কি সেই চাণক্য সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়া উঠিবেন ? তখন সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের গতি হইবে কি ? হায় নিরাকার মহাপুরুষ ?—'হিমালয়ের পথে' আজ আবার একি মায়া-লতার আবির্ভাব !

* * *

'প্রবর্ত্তক'এ এতদিনে 'অগ্রগামী'র যবনিকা পতিত হইল। নায়ক ওরফে অমরেশ যখন হাসপাতালে, নায়িকা ওরফে মায়ালতা (মায়াদি ?) খোঁজ-খবর লইতে আসিয়া ক্যাবিনে ঢুকিয়াই ডাক্তারের কাছে শুনিল—

"বিপদের ভয় আর নেই। ব্যাণ্ডি মেশানো ঔষধ খাওয়ানো হয়েছে। রাত্রে দুধ খাবে।"

রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে অবশ্য রাত্রে তাহাকে দুগ্ধ সেবন করাইতেই হইবে। আর সেই সঙ্গে নিকটতম কোনো আত্মীয় বা আত্মীয়ার হস্তে উহা পান

করিলে, রোগী যেমন চকিতে সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিবে—তেমনটি হইবার আর কোনো পন্থা নাই! অতএব—

"অমরেশ চিৎ হইয়া শুইয়া আছে। তার দুই পাশে খাটের উপর দু'খানা হাত চেপে মায়ালতা তার উপর ঝুঁকে পড়লো।

অমরেশ বললে, কেন তুমি চ'লে এলে সুরপতি বাবুর ওখান থেকে?

কেন এলুম? আ, কী নরম চুল তোমার, কী গভীর!—মায়ালতা অমরেশের মাথার চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে বললে, তিনি যে তাড়িয়ে দিলেন!"

রোগীর চুলের গভীরে হাত চালাইয়া দিয়াও তদ্বিরকারিণী দিদি ঠাকরুণ যে তলাইয়া গেলেন না, আহা ভগবান তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন! কুমার (?) প্রবোধ সান্যালের হস্তে এমন জিনিষও তাহা হইলে বাহির হইল?

'সমুদ্রের অতল গর্ভে'—বিচরণের পালা শেষ করিয়া অতঃপর 'সুদূর শূন্য-ভ্রমণ'—এ বাহির হইলে যে-কেহ যে 'সর-প্লাম' সহযোগে 'সহস্র সহস্র মাইল উর্দ্ধেও' উড়িয়া যাইতে পারিবে 'বৈচিত্র্য' তাহার চমকপ্রদ নজীর উপস্থিত করিয়াছেন। রাধারমণ চৌধুরী মহাশয় সত্য সত্যই অসাধারণ লোক। বাঁশের বাঁশী বুঝি এই-জন্যই গোকুলে বাণ ডাকাইয়াছিল?

সুশীল প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, বার-এট-ল মহাশয় শুধু-'খেলা-ধুলা'য় মত্ত হইয়া না থাকিয়া অবশেষে উহার পরিভাষার জন্ম-দান-কার্য্যে অনুপ্রেরিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। 'প্রবর্ত্তক'-এর স্তম্ভে (শক্তি-স্তম্ভ নহে) উহা যে ক্রমাগত প্রকটিত হইতে থাকিবে, তাহার আভাষও পাওয়া যাইতেছে। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বিস্ত-কিকা-গ্রাউণ্ডে ঘোর বা গোল করিতে হইলে যেরূপে 'লক্ষ্যভেদ' করিতে হয়—অবশ্যই তাহার সহিত পরিচিত আছেন! তাঁহার লক্ষ্যভেদে নেট-ভেদ করিয়াও বল যদি মাঠের বাহিরেও চলিয়া যায়, তাহা-তেও কি 'খেলা-ধুলা'র মঙ্গল হইবে?

"চোখে চোখে সে আজ
কয় কি কথা'
তার-মৌন মনের সকল ভাষা
আমায় মুখর হয়ে
ডাকে নীরবতা।"—

উল্লিখিত ছন্দচটুল কবিতা (?) গানের আকারে বাহির হইয়াও যে কিরূপ নিদারুণ হোঁচট খাইতে সক্ষম হইয়াছে, দুর্গাশঙ্কর মহালানবীশ তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। পড়িয়া মুগ্ধ তো হইলামই, উপরন্তু প্যারডি লিখিবার এমন একটি বিচিত্র ছন্দ দেখিয়া হাত নিসপিস করিয়া উঠিল। সুতরাং—

"ঠোঁটে ঠোঁটে সে আজ
দেয় কি দেওয়া?
তার গৌণ চুমোর সরল-রেখা
আমায় গরল হয়ে
রাখে রসের মেওয়া!"

'গান'টি হুবহু মেওয়া ফলাইয়া ছাড়িয়াছে!

* * *

ইতিপূর্ব্বে রাণী মৃণালিনীর গলির নিকটে 'সাহানা'র সুরে কালভৈরবের সংস্পর্শে আসিয়া অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ও কবিতা লিখিয়াছেন। ভাবিয়াছিলাম উহা বোধ হয় নেহাৎ নিশাকর'-এর তৈল-মর্দ্দনের ফলেই সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা নহে, কেরাণী-বাগানের ভৈরবী-ঠাকরুণও বৃদ্ধবয়সে অসমঞ্জের ঘাড় মটকাইবার ফিকিরে আছেন? অসমঞ্জ তাহা হইলে বাস্তবিকই মেরীজানের আড়াই প্যাঁচে মাথা গলাইয়া দিয়াছেন নাকি? তাহা না হইলে—

"মন আমার হারিয়েছি আজ
শিউলী ফুলের বনে।
আপন ভুলে তাই যে আমি
ব'সে আছি আনমনে।"

বলিয়া মুখোপাধ্যায় মশায়ও মুক্তকচ্ছ হইলেন? 'নয়নে-নয়নে' চাহিয়া উন্মাদ না হয় যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারে! কিন্তু বুড়া হইয়া ভৈরবী-ঠাকরুণের যদি রস-কস নেহাৎ শুকাইয়া ঝরিয়া গিয়াও থাকে, কবিতা বুঝিবার মত দু' একজন গুড়া ভৈরবও কি কেরাণী বাগানে নাই? হায় দুঃখিনী 'বসুমতী'!

রামেন্দু দত্ত মহাশয়ের বুকে 'থাক-

প্রার্থী'-এর স্মৃতিটি ভাগ্যিস্ মনোরম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে! মিঃ ভাট লিখিতেছেন—

"ধনবুগ সম চঞ্চলতীর
সাঁওতালী নর-নারীর দলে
যে মাদল বাজে, মনের গোপনে
আজিও যে তার জলসা চলে!"

আহা! 'সাঁওতালী···নারীর দলে' যে মাদল' অহর্নিশি বাজিতেছে তাহা যদি মোটরের কারখানাতেও কলিকের তরেও বাজিয়া উঠিত, তাহা হইলে—থাক্, বেচারীর অবশেষে হয়তো হিসাবেই ভুল হইয়া যাইবে! কেননা, যে স্থানে—

"কাণে গোঁজা ফুল, শিরীষের দল!
কবরীতে শোভে মালতী-মালা!
সবল তনুর অঙ্গতে অঙ্গতে
শ্যামল রূপের লাবনী ঢালা!"—
সে স্থান বালীগঞ্জও নহে।

*　　*　　*

নিষ্ঠাবান 'হিন্দু'ও যে বাদলের মেঘে ভেকের মত আত্মহারা প্রেমিক বনিয়া যাইতে পারেন, বসন্তকুমার মৈত্র মহাশয়ের 'বাদলা দিনের গান' না শুনিলে তাহা বিশ্বাস করাই কঠিন হইত। যথা—

"বাদল সাঁঝে আমার এ দোলায় (?)
দোল দিবি কে আয় রে তোরা।
আয় ছুটে আয় মেঘের লোকে
শ্যামল মাঠে, ছন্দোহারা।"

মৈত্র মহাশয় 'তোরা' বলিয়া যাহাদের ছুটিয়া আসিতে বলিয়াছেন, উহাই কেবল ধাঁধাঁ রহিয়া গেল!

*　　*　　*

এই পর্য্যন্ত 'চকুম-চুকুম' শেষ করিয়াছি, হঠাৎ বন্ধুবর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সহসা চিরদিনের নাস্তিক বন্ধুকে 'গায়ত্রী' জপ করিবার তত্ত্বাবধানে তৎপর হইয়া উঠিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—

—ও হচ্ছে কী?

বন্ধুবর কথার কোনো উত্তর না দিয়াই বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে 'গায়ত্রী' পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন—

"সুকথায় 'শতমুখী'
ওষ্ঠনা ফিস্—
কেবল আমার সাথে
রাত্রে ফিস্ ফিস্!"

পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিব। কিন্তু বন্ধুর মুখে অভিনব 'গায়ত্রী' শুনিয়া তন্ময় হইয়া পড়িলাম! 'তারপর?'—বলিয়া বন্ধুকে চাপিয়া ধরিতে না ধরিতেই, আবার তিনি সুরু করিয়া দিলেন—

"শতমুখী' কচু যেন
শতমুখী নারী গো!
চিবিয়ে চিবিয়ে নষ্ট
কত আর পারি গো?"

শুনিতে শুনিতে এতদূর মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম যে বন্ধুবর আনন্দে আটখানা হইয়া কখন যে শিব-তাণ্ডব আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তাহা খেয়াল করিতেই পারি নাই!

যাহা হউক, নারী-জাতি অবলা। এই অবলা নারীর প্রেমে পড়িয়াই যে বন্ধুবর 'শতমুখী' নারিকেল-শলাকার আদর আব্দার বরদাস্ত করিবার মত উদার হইয়াও পড়িয়াছেন, তাহা বুঝা গেল! আহা! শ্রীমতী 'শতমুখী' যে নেহাৎই তাঁহার তৃতীয় পক্ষেরই ইয়ে গো?

*　　*　　*

কুমারী রেণুকা ঘোষের 'শয়তান'-এর পরিচয় হইল—

"সে ছিল এক দরিদ্র কৃষক···"

'কৃষক'-এর পরে যথাক্রমে তিন তিনটি ফুট্‌কি দেখিয়া কেহ যদি অবাক্ মারিয়া যান, আমরা তাঁহাকে আর যাহাই বলি—বুদ্ধিমান নিশ্চয়ই বলিব না। কারণ উহা দেখিয়া স্পষ্টই মনে হইতেছে, হয় উহা লেখিকার মনের ভুল, না হয় কম্পোজিটারের কলা-জ্ঞানের নিদারুণ নিদর্শন!

পাতা উল্টাইয়া দেখি,—'মোপাসাঁ হইতে……,' অর্থাৎ ফুট্‌কি ডবল হইয়াছে। ইহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমরা আশা করিতেছি!

* * *

"সেঞ্চুরী পাবলিশিং কোং', ৯৭-৩-৫, বারানসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা থেকে নগেন ঘোষ প্রকাশ করেছেন" আর "শান্তি প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০৩, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা হ'তে রতি সরকার মুক্তি দিয়েছেন"—'সহস্র শয্যার নায়ক'—পাঁঠা-সাহিত্যিক শ্রীমান্ যতীশ চট্টোপাধ্যায়কে! চক্ষের আড়ালে সভ্য মানুষ অনেক কিছু অকর্ম্ম কুকর্ম্ম করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সাহিত্যের সদর রাস্তায় 'ভাদ্রের কুকুর'-কেও লজ্জা দিয়া যাহারা 'মাসী, পিসী, বোন, বৌদি' প্রভৃতিরও আঁচল ধরিয়া টানিয়া বেলেল্লাপনা জাহির করিতে সঙ্কুচিত হয় না, তাহাদের জন্ত কিরূপ 'ঠনঠনের চটি'র অর্ডার দেওয়া প্রয়োজন হইবে—তাহা এই বর্ব্বর পশু সম্প্রদায়েরই একজন বেহায়া লেখক যতীশের পৃষ্ঠদেশে—প্রমাণ করিয়া লইবার প্রয়োজন ভীষণ ভাবেই আজ উপস্থিত হইয়াছে! 'বর্ত্তমান'-এর পাঁঠা-সম্পাদকের লালদীঘির লাল পানি খাইয়াও লজ্জা হয় নাই। তাই এইরূপ পাঁঠার পুস্তকে 'পরিচয়' হিসাবে একপৃষ্ঠা পাঁঠামি করিতেও বাধে নাই! আর পাঁঠা নইলে পাঁঠার মর্ম্ম বুঝিবে কে?

অভিভাবক না থাকিলে ডেঁপো ছেলে হয়তো 'ধর্ম্মের ষাঁড়' বলিয়া স্থানে-অস্থানে গুতাইয়া ফিরিতে পারে, কিন্তু ইহার পরও যে আত্মীয় স্বজন ইহাকে ঝাটাইয়া বিষ ঝাড়িয়া দেন না—ইহাই আশ্চর্য্য!

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ

অবকাশান্তে মিঃ রামিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহাকে লইয়া কি করা হইবে, এই চিন্তায় কর্পোরেশনের কর্ম্মকর্ত্তাগণ বিষম দুর্ভাবনায় পড়িয়াছিলেন। অবশেষে সার্ভিস কমিটী তাঁহাদের সে দুশ্চিন্তার অবসান করিয়াছেন। গত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে কমিটী এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, অবকাশান্তে মিঃ রামিয়া পুনরাগমন করিলে তাঁহাকে তাঁহার বর্ত্তমান ১২ শত টাকা বেতন ও ঘর ভাড়া বাবদ মাসিক দেড় শত টাকা ভাতায় একজন স্পেশাল অফিসাররূপে নিযুক্ত করা হৌক। কমিটীর এই সমীচীন প্রস্তাবটী আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। কারণ মিঃ রামিয়াকে পুনরায় সেক্রেটারীর পদে বহাল করিতে গেলে কর্পোরেশনে একটা বিভাগীয় ওলোট পালোট অনিবার্য্য হইয়া পড়িত, কিন্তু কমিটী যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে সাপও মরিবে অথচ লাঠিও ভাঙ্গিবে না। ইহাতে কর্পোরেশনে বিভাগীয় বিপর্য্যয়ের কোন বালাই থাকিবে না অধিকন্তু ইহাতে মিঃ রামিয়ার উপরে কোন অবিচারও করা হইবে না। সার্ভিস কমিটীর এই সুচিন্তিত প্রস্তাবের জন্ত আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি।

* * *

কমিটী আরও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, যদি প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মহাশয় মনে করেন কমিটীর নির্দ্দেশানুযায়ী স্পেশাল অফিসার-রূপে কার্য্য করা মিঃ রামিয়ার পক্ষে অসম্ভব, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে অস্থায়ী সেক্রেটারী শ্রীযুত ভাস্কর মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার বর্ত্তমান এক হাজার টাকা বেতন ও ১ শত টাকা ঘর ভাড়া বাবদ ভাতায় ১৯৩৭ সালের ৩০শে মেঃ ঘর অর্থাৎ মিঃ রামিয়ার চাকুরীর মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিতে পারেন। [কমিটী মি-

রামিয়ার জন্য যে কার্য্য-তালিকা স্থির করিয়াছেন—তাহাতে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার ঐরূপ মনে করিবার বা মিঃ রামিয়ার অক্ষমতা বা আপত্তির কোন কারণ না থাকাই স্বাভাবিক। মিঃ রামিয়া এখন বয়োবৃদ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং চাকুরীর অবশিষ্ট মেয়াদটা সেক্রেটারীর গুরু কার্য্য ভারের পরিবর্ত্তে বরং তাঁহাকে স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করিলে তাঁহার প্রতিও যথোচিত সুবিচারই করা হইবে। সুতরাং ইহাতে মিঃ রামিয়ার অসম্মতিরই বা কি কারণ থাকিতে পারে?
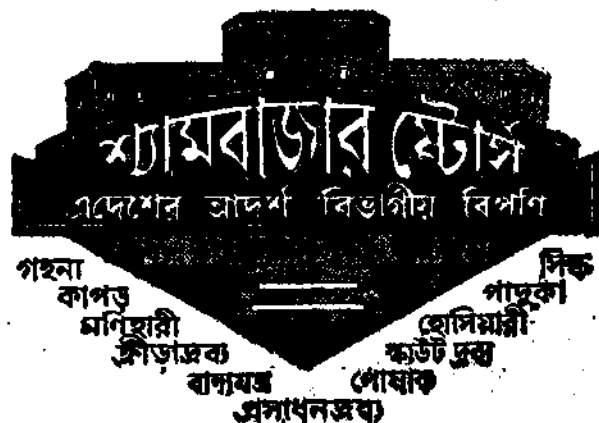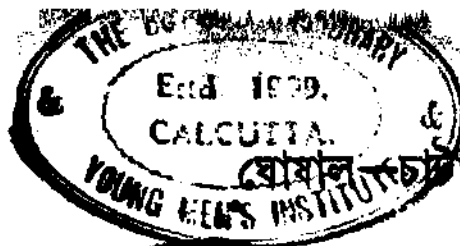
* * *

কর্পোরেশনের বর্ত্তমান অস্থায়ী সেক্রেটারী শ্রীযুত ভাস্কর মুখোপাধ্যায় সহকারী সেক্রেটারীরূপে যথেষ্ট কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। সেক্রেটারী মিঃ রামিয়ার অবকাশ গ্রহণের পর এই দীর্ঘ আড়াই বৎসরকাল অস্থায়ী সেক্রেটারীরূপেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কর্পোরেশনের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে মিঃ রামিয়াকে পুনরায় সেক্রেটারীর পদে বাহাল করিলে শুধু যে একটা বিভাগীয় ওলোট পালোট অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে তাহা নহে, অধিকন্তু একজন সুযোগ্য বাঙ্গালী অফিসারের উপরেও গুরুতর অবিচার করা হইবে না কি? বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের কর্পোরেশনে একজন বাঙ্গালী সেক্রেটারী থাকিলে সহরের বহু করদাতারও বিশেষ সুবিধা হইবে। আশা করি, কর্পোরেশন সার্ভিস কমিটীর প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া শ্রীযুত মুখার্জ্জির প্রতি সুবিচার ও করদাতাদিগের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

* * *

দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান মিউনিসিপ্যালিটি সম্প্রতি জাতি ধর্ম্ম ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর ছাত্রদিগকে বিনা মূল্যে দুগ্ধ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকার এ দৃষ্টান্ত ভারতেও বিরল নহে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে করাচী ও মুলতান মিউনিসিপ্যালিটীও অনুরূপ ব্যবস্থাবলম্বনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের ও লজ্জার বিষয় এই যে, কলিকাতা কর্পোরেশন এ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা দূরে থাক, দেশবন্ধুর দরিদ্রনারায়ণ সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সহরের দরিদ্র শিশুদিগের জন্য বিনামূল্যে দুগ্ধ সরবরাহের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাও নাকি অনেকে এখন অপব্যয় বলিয়া গণ্য করেন। করাচী ও মুলতান মিউনিসিপ্যালিটী যে সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষে কি তাহা অনুসরণ করা সম্ভব নহে? অন্ততঃ শ্রীযুত ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাব মত সুলভ মূল্যে সহরবাসীদিগকে খাঁটী দুগ্ধ সরবরাহ করিয়া সহরপিতাগণ দেশবন্ধুর আদর্শ ও স্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন না?

* * *

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, কর্পোরেশনের মোটর লরী ক্রয়ের প্রস্তাবটী চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য আগামী শুক্রবার কর্পোরেশনের এক বিশেষ সভা আহ্বান করা হইয়াছে। এই মোটরলরী ক্রয় সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বেই আমাদের তথা করদাতা জনসাধারণের অভিমত একাধিকবার জ্ঞাপন করিয়াছি এবং কর্পোরেশনের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে তাঁহাদের অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ত্তব্যের কথাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। আজ এই প্রস্তাবটীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার প্রাক্কালে আমরা পুনরায় তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি যে, দেশবন্ধু ও রাষ্ট্রগুরুর পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত কর্পোরেশনে গ্রেট ইণ্ডিয়ান ও জালান মিত্র এই দুইটী দেশী প্রতিষ্ঠানের প্রতি যাহাতে সুবিচার করা হয় সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্ব প্রথমে সেই ব্যবস্থা করিয়া তাঁহারা করদাতা জনসাধারণের শ্রদ্ধার্জ্জন করিবেন।

ঘোষাল-চাটার্জ্জি সম্বর্দ্ধনা

শ্রীযুত জে, এন, ঘোষাল

শ্রীযুত অধর চাটার্জ্জি

প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুত অধর চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত জে, এন, ঘোষালকে গত রবিবার দমদমাস্থ অক্ষয় কাননে বঙ্গীয় বার্ত্তাজীবী সঙ্ঘের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

প্রধান ভূমিকায়ঃ—

অহীন্দ্র চৌধুরী, রাধিকানন্দ, ধীরাজ, জীবন গঙ্গোঃ, রতীন বন্দ্যোঃ, ভূমেন রায়, বিনয় গোস্বামী, তুলসী লাহিড়ী, ছায়া দেবী, মেনকা, আঙ্গুরী, পূর্ণিমা, প্রভৃতি।

= উত্তরায় =

আগতপ্রায়

পূজা কনসেসন বাহির হইয়াছে, মূল্য প্রতি পাউণ্ড ৷৷৵০।
এই চা বাজারের ১৲ একটাকা পাউণ্ড চায়ের সমান। বাজারে পাইবেন।
১লা হইতে ৩১শে অক্টোবর—১৯৩৬।

তৃপ্তি স্বাস্থ্য ও উৎসাহ-প্রদ
- বিশুদ্ধ ভারতীয় পানীয়

বিচ্ছেদ

(গল্প)

শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায়

ছাত্রীত্বের পরিধি লঙ্ঘন করে বিজলী এলো দাঁড়াল মুক্ত আকাশ-তলে মুক্ত বায়ুর সংস্পর্শে। যদিও ষোল আনা মুক্তি সে পায়নি। দারিদ্রের সুকঠিন নাগপাশে সে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তবু সে পেলে একটা অখণ্ড সময়,—সংসারের জীর্ণতার আমূল সংস্কার করতে, অচল সংসারকে সচল করতে।

তাই তাকে এসে দাঁড়াতে হ'ল ছায়াহীন, রুক্ষ কর্মক্ষেত্রে—নারীসুলভ সমস্ত আকাঙ্ক্ষার মূলোচ্ছেদ করে, পুরুষের কাঠিন্য ও কর্মক্ষমতা নিয়ে। তার সামনে এখন অঢেল কাজ, অশেষ সমস্যা! কতকগুলি অপরিণত স্নেহের জীবের মুখে গ্রাস তুলে দিতে হবে। সমস্ত সংসারকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে। স্নেহের সমস্ত রস ফোঁটা ফোঁটা করে নিংড়েই হ'ক, সব কিছু ক্ষতিস্বীকার করেই হ'ক। তাকে করতে হবে, তার কর্তব্য!

এমনি একদিনে এল সঞ্জয়। বিজলীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সে দস্তুর মত চমকে উঠল। এতটা পরিবর্ত্তন সে আশা করেনি। সে বিজলী আর নেই! নেই তার মুখে যুবতীসুলভ সলজ্জ-শ্রী; একটু কোমলতা। দু-চোখে নেই আগেকার মত অলস বিহ্বলতা। আছে তাতে তীব্র জ্বালা। অপ্রশস্ত ললাটে পড়েছে কুঞ্চনের সুস্পষ্ট রেখা। পুরন্ত দুটী ঠোঁট শুকনো, ফ্যাকাশে, তার উপর বিরাজ করছে একটা অসহনীয় রুক্ষতা। সারা দেহে সুরু হয়েছে রিক্ততার ভূমিকম্প হাহাকার! বিজলী—সপ্রাণ, শীর্ণ মহীরুহ।

বিজলী কার্পেটের ওপর কি যেন একটা বুনছিল, সঞ্জয়ের দিকে চোখ তুলে মৃদুস্বরে বলল—'বোসো'।

সঞ্জয় বসল না, দাঁড়িয়ে থেকেই বলল—'তুমি রাজী হোবে না কিছুতেই?'.

বিজলী নীরব - দৃষ্টি নমিত।

'কিন্তু'—সঞ্জয় চেয়ারে বসে বলল—'কোথায় তোমার বাধা সেটা জানতে পারি কি?

এবার বিজলী মেরুদণ্ড সোজা করে বসল। কার্পেটের ওপর থেকে মগ্নদৃষ্টি

সঞ্জয়ের মুখের ওপর তুলে ধরে বলল—'সেটা আমার ব্যক্তিগত। সাধারণের কাছে প্রকাশ করলে নিজের হীনতাবৃদ্ধি ছাড়া, তাতে আর কোনো গৌরব বাড়ে না। আসল কথা আমার এখন সময় হবে না।'

'সময় হবে না?' বিস্ময়ের সুরে সঞ্জয় বলল—'কারণ?'

কারণটা মোটারকম কিছু নয়। আমার সামনে এখন এমন অনেক কাজ পড়ে রয়েচে, যেগুলো পেছনে ফেলে রেখে আমাদের মিলনটা নিতান্ত অসঙ্গত। আরো—আরো দীর্ঘকাল তোমায় প্রতীক্ষা করতে হবে।

'প্রতীক্ষা করতে হবে? বিজলী তুমি এখনো সময় চাইচো কেন কিছু বুঝতে পারচি না! তুমি কী তোমার জীবনে প্রেমের সন্ধান পাওনি?'

পেয়েচি, গভীরভাবে পেয়েচি—তাই প্রতীক্ষা করতে পারবো।'

'কিন্তু—তারোতো একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে—যেমন আমাদের জীবনের?'

বিজলী নিরুত্তর। সাদা কার্পেটের ওপর দিয়ে ছুঁচ চলতে লাগল। দ্রুত অসম গতি!

হঠাৎ সঞ্জয় সোজা দাঁড়িয়ে উঠল, অসহিষ্ণু গলায় বলল—'আর কতো—কতোদিন অপেক্ষা করতে হবে আমায়?'

বিজলী দৃষ্টি নমিত রেখে অবিচলিত কণ্ঠে বলল—'তা আমি কি করে বলবো? বলেচি তো সময় না হ'লে—'

'সময়!' সঞ্জয় চেয়ারে বসে পড়ল, অধীরস্বরে বলল—'সময়টা তোমার কাছে এতো মূল্যবান হোলো কবে থেকে?'

যেদিন থেকে কাজ পেয়েচি, সংসারের পেছনে নিজেকে ষোলআনা সমর্পণ করবার সুপ্রশস্ত অবসর পেয়েচি।'

'কাজ! বিয়ে করাটা কী তোমার জীবনের একটা কাজ নয়?'

'হয়তো, কিন্তু কী কোরবো, উপায় নেই। আমার কথা আমি বললুম তোমায় যদি দেরী না সয়, তুমি স্বচ্ছন্দে বিয়ে কোরতে পারো! দেশে সব কিছুর

সমস্যা থাকতে পারে, কল্পা সমস্যা আজো হয় নি। ভয় নেই, পুরানো প্রণয়পাত্রী হিসেবে আমি কোর্টে গিয়ে দাঁড়াবো না। সেদিক দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত।'

সঞ্জয় তার কথা কানে তুলল না, নিজের কথারই রেশ টেনে বলল—'আচ্ছা, বিজলী তোমার সময়ের সীমারেখা টেনেচো কোনখানে? সেটা আজ থেকে ক-মাস বা ক-বছর পরে? সেখানে পৌঁছে তুমি বোলবে হ্যাঁ, আমার এসেচে সময়।'

'তাও আমি সঠিক বলতে পারচি না। যতোদিন না আমি সংসারকে সচল করে তুলতে পারচি ততোদিন।'

'বিয়ের পরেও সে কাজ করা যায় বিজলী।'

'না যায় না। এখন যেটাকে খুব সহজ মনে কোরচো, পরে দেখবে সেটা খুবই শক্ত। তখন আমার স্বতন্ত্র একটা সংসার গড়ে উঠবে। তার সামান্য ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে চাইবার অবসর হবে না।'

'আমি তাদের দেখবো। তুমি আমায় বিশ্বাস করো।'

'অবিশ্বাস করি না তোমায়। কিন্তু কেন তুমি তাদের দেখতে যাবে? তুমি তাদের কে? আর তোমার দানই বা তারা দু-হাত পেতে নেবে কি দুঃখে? গরীব বলে তাদের আত্মমর্য্যাদা নেই?'

সঞ্জয় নিরুত্তর।

বিজলী অপেক্ষাকৃত নীচুগলায় বলল—'আর তাদের দুঃখের দিনে আমরা কোরবো উৎসব? সেটা সাধারণের চোখে বিসদৃশ, স্বার্থপরতার চরম পরাকাষ্ঠা।'

সঞ্জয় নিষ্ঠুরের মত বলে উঠল—'হোক বিসদৃশ, হও স্বার্থপর কিন্তু তুমি বেঁচে উঠবে বিজলী, নতুন করে বেঁচে উঠবে। সে বাঁচায় ভেতর আছে তীব্রসুখ, গভীর পূর্ণতা। দেহে মনে প্রাচুর্য্য নিয়ে তুমি মাথা তুলে দাঁড়াবে। সেখানে তুচ্ছ হয়ে যাবে তোমার নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য, সমস্ত সহৃদয়তা। বাঁচো বিজলী বাঁচো! নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেচো? আয়নায় মুখ দেখো? কি ছিলে আগে আর কি হয়েচো এখন।

বিজলী আন্তরিক শিউরে উঠল। ধমকের সুরে বলল—'এসব কি যা-তা বলচো!'

'ঠিক বলচি, যা পরম সত্যি তাই বলচি! জগতের সত্যটাকে ষোলআনা উপলব্ধি করে বলচি! যতো নৃশংস রক্তপাত, যতো বড়ো বড়ো অভিযান সব-কিছুর পেছনে একটা সুর—নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার দুরন্ত প্রয়াস! আর সব ছলনা'! একটু থেমে বিজলীর হাত দুটো সবেগে চেপে ধরে বলল—'বিজলী আমার দিকে একবার চেয়ে দেখো! আমি কি তোমার কেউ নই?'

বিজলী তার হাতের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বলল—'তুমি আমার সব' গলার স্বর ভারী হয়ে উঠল—'তুমি আমার দীর্ঘজীবনের প্রাণান্ত সঞ্চয়।'

সঞ্জয় নিভে গেল না, জলে উঠল—'না-না ওসব তোমার মিছে অজুহাত, নবীন প্রেমিকের কাব্যোচ্ছাস! তুমি নিজেকে আমার কাছ থেকে আড়াল কোরচো!'

—কী বললে?'

দৃঢ়কণ্ঠে সঞ্জয় বলল—'আরো কিছু কারণ আছে তোমার, যা তুমি আমার কাছে প্রকাশ কোরচো না মুখফুটে।'

এবার বিজলী দস্তুরমত চটে উঠল, তিক্তস্বরে বলল—'তোমার মন সন্দিগ্ধ।

নিজেকে বিচার করে সমস্ত জগৎটাকে সেই দৃষ্টিতে দেখতে চাও।'

'আমি সন্দিগ্ধ! তোমার কথা শুনে কোন্ লোকের না সন্দেহ হয়? কোন্ লোকটা পারে প্রেমিকার মুখের দিকে চেয়ে আজীবন প্রতীক্ষা করতে? প্রতীক্ষাই কী প্রেমের চরম সার্থকতা?'

'জানি না, কটু সমালোচকের দৃষ্টিতে কোনোদিন তোমার মতো প্রেমের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে বসিনি। অতো অঢেল অবসর ও হীন প্রবৃত্তি আমার নেই। আমার কথা আমি বললুম, তোমার যা ইচ্ছে হয় করো।'

'ওঃ তাই'লে এতোদিন তুমি আমার সঙ্গে শুধু ছলনাই করে এসেচো? শুধু অভিনয়!' উচ্চৈস্বরে হেসে উঠল সঞ্জয়—'চমৎকার মর্মস্পর্শী অভিনয় কিন্তু তোমার বিজলী। 'ছলনাময়ী' বিশেষণটা কী সাধে কবিরা অবাধে তোমাদের ওপর প্রয়োগ করেন?'

বিজলী অধৈর্য্য হয়ে উঠে দাঁড়াল, ঝাঁঝালো সুরে বলল—'মনে রেখো এটা চায়ের দোকান নয়, ভদ্রলোকের বাড়ী। জিভটা একটু সংযত করে কথা বলো!

'যেমন তোমার সংযত অভিনয়, কী বলো?' শ্লেষের সুরে সঞ্জয় বলল।

বিজলী দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে এল সঞ্জয়ের দিকে; রূদ্ধস্বরে বলল—'তুমি এখান থেকে যাবে কি-না?'

'যাবো, নিশ্চয় যাবো' ম্লান হেসে সঞ্জয় বলল—'হয়তো যেতুম না, যদি তোমাকে দেখতে একটু ভদ্রলোকের মতো হোতো। কিন্তু দেহ-মন দু-দিক দিয়েই তুমি তুচ্ছ।'

দোরের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সঞ্জয় ফিরে দাঁড়াল। বিজলীর চোখের ওপর জোড়ানৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল—'জেনে রেখো বিজলী, তুমি নারীকুলের এমন কোনো রত্নবিশিষ্টা নও যে আমার মতো একজন পুরুষের সাহচর্য্য কামনা কোরতে পারো। আমি তোমায় চাইছিলুম সেটা আমার উদারতা, আর তোমার সৌভাগ্য! পুরুষ জাতটা এখনো এতোটা খেলো বা সস্তা হয়নি যতোটা তোমরা—মেয়েরা মনে করো।—আচ্ছা বিজলী চললুম—তোমার কর্ত্তব্য তোমায় সুখী করুক।'

সঞ্জয় আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বিজলী নির্ব্বাক—নিস্পন্দ! হঠাৎ তার মনে নেমে এল আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ, চোখে শ্রাবণের ধারা। গভীর ক্লান্তিতে সে টেবিলের ওপর মাথা রাখল। তার অতৃপ্ত অন্তরাত্মা যেন গুমরে কেঁদে উঠল, যেন বলতে চায়—ওগো তুমি আমায় ভুল বুঝেচো। তুমি ফিরে এসো—ফিরে এসো বন্ধু আমার।

ধর্ম্ম এবং তাহার উদ্দেশ্য

সুখলাভ এবং দুঃখ দূরীকরণ ইহাই সমস্ত প্রাণীর অন্তর্নিহিত বাসনা এবং ধর্ম্ম। প্রাণীদের অনৈচ্ছিক কর্ম্ম এবং চিন্তা কিয়ৎ পরিমাণে উপর্য্যোক্ত বাসনা বা ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ সুখ এবং হিতের অনুকূলেই মানবের সমস্ত শক্তি এবং ইচ্ছা পর্য্যবসিত হইয়া থাকে এবং তাহার বিপরীত ভাব অর্থাৎ দুঃখ বা অমঙ্গল হইতে মানব স্বভাবতঃই বীতরাগ হইয়া থাকে।

উপর্য্যোক্ত প্রবৃত্তিজাত ইচ্ছা তাহার মনোমত আশ্রয় অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারে যে আশ্রয় প্রকৃত পক্ষে সকল প্রকার দুঃখ ও কষ্ট হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য এই আশ্রয় অন্বেষণ করা এবং এই আশ্রয়ে একান্তরূপে আত্মোৎসর্গ করা। 'স্পিরিট ফোরস্'-এর অনুশীলন, বিশ্ব সৃষ্টিকর্ত্তার সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান, সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং এই বিশ্বজগতে চৈতন্যশীল মানবাত্মার প্রকৃত কার্য্যাবলী ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধর্ম্মানুশীলনের পক্ষে অপরিহার্য্য।

বিশদভাবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্নের সম্যক আলোচনা অল্পপরিসর স্থানের মধ্যে অসম্ভব। একটা স্থূল 'আউট-লাইন' প্রদান করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত মণ্ডলীকে প্রায়ই নিতান্ত উদাসীন দেখা যায়। বিশেষতঃ যাঁহারা বিজ্ঞান-চর্চ্চা করেন তাঁহারা প্রায়ই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া থাকেন। ইহার একমাত্র কারণ আমাদের দেশের কোন প্রকার বিধিবদ্ধ যাবতীয় ধর্ম্ম ভাবপ্রবণতা; গূঢ় তাৎপর্য্যতা এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ-বিশ্বাসে সমাচ্ছন্ন।

যাঁহারা ঔৎসুক্যবশতঃ ধর্ম্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হন তাঁহারা কতকগুলি বাগাড়ম্বর, শব্দভূয়িষ্ঠতা এবং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে এতই রত হইয়া পড়েন যে ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত হন। সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইলেই তাহা অন্তরের সহানুভূতি হারায় এবং সে অন্তরের সহিত যোগবিহীন হইয়া পড়ে। মিথ্যা কখনও বিশ্বে সমৃদ্ধি ও উন্নতিলাভ করিতে পারে না। তজ্জন্য ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয় যে কোন ধর্ম্ম শুধু কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয় এবং অন্তরের বিশ্বাস ও ভক্তি হারায় তখনই হৃদয়বান অনুভূতিশীল ও বিশ্ব-প্রেমিক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। এবং জনসমাজকে নূতন জ্ঞানালোকে ও বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। এইরূপেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উৎপত্তি, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উৎপত্তি, ব্রাহ্ম সমাজের উৎপত্তি।

বর্ত্তমানকালেও সমস্ত ধর্ম্ম—বিশেষতঃ হিন্দু ধর্ম্ম কতিপয় আড়ম্বরে ও অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু পরম-পুরুষ সেই শ্রীভগবানের কৃপায় আমরা এক মহাপুরুষ ও মহাজ্ঞানী পুরুষাচার্য্যের সাহচর্য্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। তিনি কৃপাপরবশ তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে নূতন ব্যাখ্যা আমাদের কাছে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা কতিপয় বিশিষ্ট ধর্ম্মপ্রাণ উচ্চ-শিক্ষিত ভদ্রলোককে লইয়া 'মানসী সমাজ' নামে একটী সমাজ সংগঠিত করিয়াছি। আমাদের সমাজের উদ্দেশ্য জনসমাজে আমাদের ধর্ম্মমত প্রচার করা। ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভেচ্ছু শিক্ষিত জনসাধারণকে আমরা সাদরে আমন্ত্রণ করিতেছি।

ইতি—
জনৈক ভক্ত।

কেমন করে আমি গল্প লিখবো

(গল্প)

শ্রীজীবানন্দ ঘোষ

আজ কিন্তু তোমাদের গল্প বলবার জন্তে আমি কলম ধরিনি ; অবশ্য যদিও তোমাদের জন্তে প্লট সংগ্রহ করতেই সেদিন বেড়াতে গিয়েছিলুম, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন প্লটই পাইনি।

সেদিন ছিল বুধবার। বিকেলের দিকে স্নান করে', গায়ে লঙ ক্লথের পাঞ্জাবীটা চড়িয়ে, পায়ে স্যাণ্ডেল জোড়টা গলিয়ে একটু বেড়াবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লুম। আমার বেড়াবার স্থানটি হ'ল ঢাকুরিয়ার লেক, বাড়ী থেকে কুড়ি-একুশ মিনিটের পথ। রাস্তা দিয়ে একা-একা, চলেছি, কারণ বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বেড়ানো আমার অভ্যাস নেই। অবশ্য বন্ধু-বান্ধব যে আমার নেই, তা' নয় ; বন্ধু আছেন ! কিন্তু চিরকাল একা-একা থেকে এমনি একটা বদ্‌-অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে যে, বন্ধুদের সঙ্গ এড়াতে পারলেই যেন আমি বেঁচে যাই। থাকগে, কি বলছিলুম ! লেকে চলেছি। সবে মিনিট পাঁচেকের পথ গিয়েছি, এমন সময় পিছন থেকে শুনতে পেলুম, কি বাবাজী, বেড়াতে যাচ্ছো ?

কি একটা আমি তখন মনে মনে ভাবছিলুম, চমকে উঠে ফিরে' দেখি, উপেন—এক বৃদ্ধ চাষী। মুখে তখুনি একটু হাসি টেনে এনে বললুম, কিগো উপেন। মলিন মুখখানার ওপর একটু হাসি ফুটিয়ে বললে, কাজ থেকে আসছি বাবাজী।

তার মলিন মুখ খানার দিকে দৃষ্টি পড়তেই মনে হ'ল, তার বোধ হয় অসুখ। কিন্তু তবুও সে খাটতে গিয়েছিল ! বললুম, তোমার তো অসুখ। অসুখ বিসুখ করলে তো ভালো ছিল বাবাজী —দু' দিন বিছানায় দাঁত খিঁচিয়ে পড়ে' থাকলেই হয় মারা হ'য়ে যেত ; কিন্তু এ অসুখের থেকেও বাড়া।

আমি সবে দু'পা গিয়েছিলুম আমার কথা শেষ করে', কিন্তু উপেনের শেষের কথা ক'টা কানে যেতেই ফিরে দাঁড়ালুম। বললুম, সে আবার কি উপেন ?

উপেন বললো, দু' দু' বেলা পেটে একটাও ভাত যায়নি বাবাজী তাই আর না থাকতে পেরে এ বেলায় মরা হাড়ে ভেল্কী লাগাতে গিয়েছিলুম। যা' হোক দু' গণ্ডা তো পয়সা পেলুম বাবাজী ! বলতে বলতেই উপেনের চোখ দু'টো ছল ছল করে' উঠলো। এবং চোখে এ জল আসার কারণ সহজেই আমি বুঝতে পারলুম। কোনদিন উপেনকে পরের খেটে দু' আনা পয়সা আনতে হয়নি এবং দু' বেলা না খেতে পাওয়া তো পরের কথা, উপেনেরই বাড়ীতে কতশত গরীব দুঃখীরা দু'বেলা ছেড়ে চার বেলা খেয়েছে,— অথচ আজ সেই উপেনকেই দু' আনা পয়সার জন্তে পরের খাটতে হ'ল দু' বেলা উপোস করে'।

আমি আর দাঁড়ালুম না ; দাঁড়ালুম না ঠিক নয়, দাঁড়াতে পারলুম না। উপেনকে বললুম, তুমি বাড়ী যাও উপেন, আমি একটা জরুরী কাজে যাচ্ছি। এই দু'বেলা উপোস করা পীড়িত বন্ধুটির কাছে কেমন করে' বলবো, আমি আনন্দ পাবার জন্তে বেড়াতে যাচ্ছি !...

চলেছি আবার। উপেনের কথা কটা ভাবতে ভাবতেই আমি পথ হেঁটে চলেছি। মিনিট দশেকের পথ সবে এর পর আর গিয়েছি। সামনে দৃষ্টি আকর্ষণ করে' একটি আট-ন' বছরের মেয়ে কেঁদে বললো, বাবু একটা পয়সা দেবেন ?

দেখলুম তাকে। শুকনো মুখখানা, জীর্ণ বেশ, নোংরা চুল, কাঁধে একটা ময়লা কাঁথার ঝুলি। বললুম, তুই এক ফোঁটা মেয়ে ভিক্ষে করছিস, কেন ? গাড়ী ঘোড়ার তলায় যাবি যে !

মেয়েটা বললো, না আমি একলা নই, ঐ যে মা দাঁড়িয়ে।

মেয়েটা যেদিকে আঙুল তুলে দেখালো, সে দিকে চাইতেই দেখলুম, একটি স্ত্রীলোক একটা ছেঁড়া শাড়ী পরে' হাতখানেক ঘোমটা দিয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে। মেয়েটার দিকে চেয়ে বললুম, তোর বাবা আছে ?

—আছে।

—সে কাজ করে' পয়সা রোজগার করতে পারে না ?

—বাবার পক্ষাঘাত হয়েছে, আবার তার ওপর কাশির ব্যামো। আর শোনবার ইচ্ছে হ'ল না। পকেট থেকে একটা আনি বের করে' মেয়েটার হাতে দিলুম। আনিটা হাতে পেতেই মেয়েটার মুখে

হাসি ফুটলো। একটু পরে অস্ফুটে বললো, আনি। আনি দিলেন বাবু?

আমি তখন অনেকটা পথ চলে' এসেছি মেয়েটা তার মাকে ডেকে বললো, আজ সব শুদ্ধ তিন আনা হ'ল মা। বাবু-এক আনি দিলেন।

এবার গিয়ে পৌছুলুম একেবারে লেকের পথটায়। বুদ্ধদেবের মন্দিরটার কাছে সবে গিয়েছি এমন সময় পিছন থেকে একখানা হাত এসে আমার কাঁধের ওপর পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনতেও পেলুম, হ্যালো ফ্রেণ্ড লেকে এসেছিস্ বুঝি?

দেখলুম, বন্ধুদের দলের মধ্যে এক-গুণধর। বললুম, কিরে, ভালো! ডেপুমী করে' সে বললো, এই এক রকম রক্ত না পড়েই কেটে যাচ্ছে আর কি। তারপর তুই কি রকম আছিস? অনেক দিন পরে কিন্তু তোর দেখা পেলুম।

সব ভালো লাগে, ডেপুমীটা আর ওস্তাদীটা আমার ভালো লাগে না। মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে বললুম, ভালো আছি। চাকরী খুজছিলি, পেয়েছিস্?

—দূর! তুই দেখছি একটা আস্তো পাগল! বলে' সে আমার কাঁধের ওপর হাসতে হাসতে বিজ্ঞের মত একটা চাপড় মারলো। তারপর আবার বললো, লোকে জানে, আমি চাক্‌রী খুজছি, কিন্তু আসলে আমি একদিনের জন্যেও চাকরী খুজিনি—বাবার চোখে ধুলো দিচ্ছি! বলেই অকারণে সে তার হাসিকে মাতিয়ে তুললো।

তোমরা এইটুকু শুনে' রাখো, ওর বাবার বয়স প্রায় ষেটি হ'বে, মার্চেন্ট আফিসে এখনো চাকরী করেন। মাইনে পান, পঁয়ত্রিশ টাকা। সংসারের খেতে কম নয়।

অন্য সময় হ'লে এই অপগণ্ড বন্ধুটিকে দু' কথা বলতুম, কিন্তু এখন পারলুমনা। বললুম, কাজ আছে ভাই, চললুম। বলেই হন্‌-হন্ করে' আমি চলে' গেলুম।

বন্ধুটি বোধ হয় তারপর ক'টা আমাকে গলাগালি স্বরূপ বললো, আমার কানেও তা' গেল, কিন্তু আমি তার দিকে আর ফিরে চাইনি।

সত্যি, মনটা ভয়ানক বিগড়ে গিয়েছিল। পরপর এই তিনটে ঘটনা যেন ষড়যন্ত্র করে' আমার মনকে সহসা বিষাক্ত করে তুললো। লেকে ঢোকবার মোড়েই ডান দিকে একটা চায়ের দোকান। ঢুকে পড়লুম। এক কাপ চা নিয়ে একটা টেবিলের সামনে বসলুম। পাশে এক বৃদ্ধ নাকের ডগায় চশমা রেখে চায়ের দোকানের দৈনিক পত্রিকা থেকে 'বর্দ্ধমানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ' সংবাদটি অত্যন্ত মন দিয়ে পড়ছিলেন। সবে পেয়ালাটায় দু'টো চুমুক দিয়েছি, এমন সময় বৃদ্ধটি সংবাদ পত্রের ক'টা লাইন দেখিয়ে আমাকে বললেন, দেখুন মশায়, দেখুন! আহা বুক ফেটে যায়!

বৃদ্ধ যেখানটায় দেখালেন, সেখানটায় লেখা রয়েছে, 'প্রত্যেক গ্রামে শতকরা অন্ততঃ পঁচিশজন পুর্ণ উপবাস দিতেছে এবং অধিকাংশ লোকই অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতেছে। শতকরা মাত্র ৩।৫ জনের গৃহে দুই বেলা আহার জুটিতেছে * * *।'

আর, আজ কি কেবল আমাকে এই সব দুর্ভিক্ষের চিত্রই দেখতে হ'বে? লেকে এলুম তবে কিসের জন্যে? সংবাদপত্রের অংশটা দেখে মনের উত্তেজনাকে অনেক কষ্টে চেপে বৃদ্ধের সুরে সুর মিশিয়ে বললুম, আহা!

তারপর পেয়ালার চাটুকু নিঃশব্দে তাড়াতাড়ি শেষ করবার উদ্দেশ্যে পেটে চা ঢাললুম। তাইতো, আজ আমি এ কোথায় এসে পড়লুম? কোথায়, এ কোন দেশ? কোনদিন তো চাষীদের দুঃখের কথা তেমন করে' শুনিনি, কোনদিন তো ভিক্ষুককে একটা পয়সা দিইনি, কোনদিন তো দুর্ভিক্ষের এমন চিত্র দেখিনি? আজ চোখে কেবলই পড়ছে পীড়িত দরিদ্রের বুক-ফাটা কান্না, ভিক্ষুকের হাহাকার, দুর্ভিক্ষের নগ্ন দৃশ্য! কেন—কেন আমার চোখে এসব আজ পড়ছে? আমি যে আজ আমার গল্পের সুমিতা, সীতেশকে খুজতে লেকে এসেছি, কিন্তু কোথায় তারা—এ সব আমি কি

চলচ্চিত্রে ইন্দুর হল তখন থেকে তার অভিনয় চিত্তাকর্ষক হয়েছে। গানগুলি ভাল হয়েছে, বিশেষতঃ প্রথম গানের লাইনকটী চমৎকার। পাহাড়ী সান্যালের নির্ম্মল গানে ও অভিনয়ে প্রশংসনীয়, নবাবের জনার্দ্দন সম্বন্ধেও এরূপ উক্তি করা চলে। ত্রিলোক কাপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট, কিদারের গঙ্গারাম, বাবুলালের মোহনলাল, তমার (শ্যাম লাহা) সাগর সর্দ্দার প্রভৃতিও মন্দ নয়। চন্দ্রাবতী তারার (ষোড়শী) ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ভাবাভিব্যক্তিতে তার অক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। চন্দ্রা আমাদের অতি প্রিয় অভিনেত্রী, এ ভূমিকার যোগ্য তিনি মোটেই নন। তবে চন্দ্রাবতী নিন্দনীয় অভিনয় করেন নি, তাও বলা দরকার মনে করি। হেমলতার ভূমিকায় রাজকুমারীর অভিনয় সাধারণ শ্রেণীর। যাহোক 'পূজারিণ' নাকি হিন্দুস্থানী ভাইদের ভাল লেগেছে, তাহলে আমরাও খুশী হব।

সম্মিলিত প্রফুল্ল ও সাজাহান

প্রসিদ্ধ অভিনেতা মণি ঘোষের উদ্যোগে আগামী শুক্রবার নাট্যনিকেতন মঞ্চে এক অভিনয় আয়োজনের ব্যবস্থা হয়েছে। এ রাত্রে দুখানা প্রসিদ্ধ নাটক অভিনীত হবে, যথা 'প্রফুল্ল' ও 'সাজাহান'। উভয় নাটকে ভূমিকা গ্রহণ করবেন মিনার্ভা ও ক্যালকাটা থিয়েটার্সের খ্যাতনামা অভিনেতৃ, তা ছাড়া অভিনেতা নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, চিত্রাভিনেতা অমর মল্লিক, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রবালা প্রভৃতিরাও দেখা দেবেন। নিম্নে বিস্তারিত ভূমিকালিপি দেওয়া হল, যথা—

যোগেশ—নির্ম্মলেন্দু, রমেশ—ভূমেন, সুরেশ—ইন্দুভূষণ, শিবনাথ—জহর গাঙ্গুলী, পীতাম্বর—রবি রায়, মদনখুড়ো—রাধিকানন্দ মুখোঃ, ভজহরি—অমর মল্লিক, কাঙালীচরণ—অহীন্দ্র চৌধুরী, উমাসুন্দরী, নগেনবালা, জ্ঞানদা—নিরুপমা, প্রফুল্ল—নীহারবালা, জগমণি—নীরদাসুন্দরী, মাতঙ্গিনী—দুর্গাবালা।

সাজাহান—অহীন্দ্র, ঔরঙ্গজেব—শরৎ চট্টোঃ, দারা—রবি রায়, মোরাদ—মণি ঘোষ, যশোবন্ত—ভূমেন, দিলদার—জহর, জাহানারা—সরযূবালা, পিয়ারা—নীহারবালা, মহামায়া—চারুবালা, জহরৎ—নিরুপমা প্রভৃতি। আশা করি নাট্য-প্রিয় নর-নারীরা এ অভিনয় দেখতে বিমুখ হবেন না।

রূপমহল

ধর্ম্মতলাস্থ চীণ থিয়েটারটী পুনরায় 'রূপমহল' অধিকার করে নিয়মিত ভাবে অভিনয় করছেন। আগামী মঙ্গলবার দিন এখানে 'আনারকলি' নামে একখানি নাটক অভিনীত হবে। ভূমিকায় নামবেন গনেশ গোস্বামী, তুলসী চক্রবর্ত্তী, ভূপেন চক্রবর্ত্তী, রাধারাণী প্রভৃতিরা। মোগল সম্রাট আকবরের পুত্র যুবরাজ সেলিম আনারকলির প্রেমে পড়েন, কিন্তু এর শেষ হয় বিয়োগ ব্যথার মধ্য দিয়ে। সেই সুন্দর ব্যথাতুর প্রেম কাহিনীটিকে এরা রূপ দেবেন।

'বিজয়া'য় অমর মল্লিক ও চন্দ্রাবতী

নাট্যনিকেতন

৺পূজার পরে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' এখানে অভিনীত হবে, নাট্যরূপ দিচ্ছেন নরেশ মিত্র। আমাদের সুধীর গুহ 'আলাদীনের' ন্যায় আর একখানা বই মঞ্চস্থ করবার চেষ্টায় আছেন।

নব নাট্যমন্দির

অচলার সম্বন্ধে কোন খবরই পোনা

যায় না। হয় ত পূজার পরে যখন স্কুল কলেজ খুলবে তখন 'অচলা' দেখা দেবে।
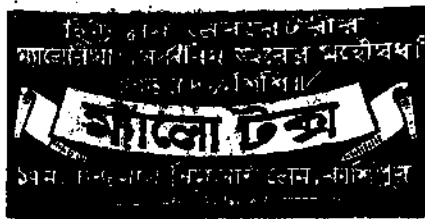
নিউ থিয়েটার্স

বড়ুয়া পরিচালিত হিন্দি 'মায়া' গত ২৬শে সেপ্টেম্বর বোম্বেতে মুক্তিলাভ করেছে। এর বাংলাটীর সম্পাদনা কার্য্য চলছে। আগামী ২৬শে অক্টোবর কুমার বড়ুয়া ইউরোপ যাত্রা করবেন, মাস তিনেকের মধ্যে তিনি ফিরবেন বলে আশা করা যায়। নীতিন বসুর ছবির বহির্দৃশ্যগুলির শ্যূটীং প্রায় শেষ হয়ে গেছে—বর্ত্তমানে অন্তর্দৃশ্য তুলতে তিনি ব্যস্ত আছেন। এই ছবির উভয় সংস্করণে যথাক্রমে নামছেন চন্দ্রাবতী, লীলা দেশাই, সাইগাল, দুর্গাদাস বন্দ্যোঃ এবং হিন্দিতে কমলেশকুমারী, লীলা দেশাই প্রভৃতি। নিউ থিয়েটার্স নতুন শিল্পী সংগ্রহে এ যাবৎ কৃতিত্ব দেখিয়ে আসছেন। আশা করি, কমলেশ ও লীলা যশ অর্জ্জনে সমর্থ হবেন।

চিত্রামোদীরা জেনে সুখী হবেন হেমচন্দ্রের 'অনাথ আশ্রমের' উভয় সংস্করণেই উমাশশী নায়িকার ভূমিকায় নামবেন। গৃহদাহ আগামী ৯ই এবং বিজয়া সম্ভবতঃ ১৭ই অক্টোবর যথাক্রমে সুসংস্কৃত চিত্রায় ও রূপবাণীতে দেখা দেবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

চিত্রামোদীরা যে সময় উত্তরায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের মুক্তি তারিখের দিন গুণছে, সেই সময় পরিচালক দেবকী বসু তাড়াতাড়ি তার বহির্দৃশ্যগুলি তুলে ফেলছেন। আমরা খবর পেলাম, কতকগুলি দৃশ্য তোলার জন্য কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত সমগ্র রেলওয়ে ষ্টিমার পরিচালকের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

সম্ভবতঃ ১৭ই অক্টোবর তারিখ সোনার সংসার উত্তরায় মুক্তিলাভ করবে।

আমরা খবর পেলাম, পরিচালক জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জি ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মসে যোগদান করছেন—তিনি যোগদান করেই একখানি বাংলা ছবি তুলতে হাত দেবেন। ছবিখানির বিষয় আমরা পরে পাঠকদিগকে জানাব।

দেবদত্ত

এবার শুনছি, দেবদত্তের নবনিযুক্ত-পরিচালক শ্রীকালী প্রসাদ ঘোষ বঙ্কিম-চন্দ্রের "ইন্দিরা"র ছবি তুলবেন বলে মনস্থ করেছেন। এদের চেষ্টা ফলবতী হোক।

চিত্রার নবরূপ

চিত্রার সংস্কার ও নবনির্ম্মাণ কার্য্য দিবারাত্র চলছে। সুসংস্কৃত চিত্রার রূপ দেখে সবাই মুগ্ধ হবেন—বাস্তবিক এই সুসংস্কৃত চিত্রগৃহটী যে আবহাওয়া ও পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করবে, তা মনোরম। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নূতন বায়ু নিয়ন্ত্রণের মেসিন বসবে। এখানে একথা বললে বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, দেশীয় চিত্রগৃহে এই ধরণের ব্যবস্থা এই প্রথম—কলকাতায় আর মাত্র দুটী শো হাউসে এই ব্যবস্থা আছে, সেগুলি বিদেশীদের। 'চিত্রা' ভারতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রগৃহরূপে পরিগণিত হবে।

বিচিত্রা

হ্যারল্ড লয়েডের জহরতের দাম ৬ হাজার পাউণ্ড। জোয়ান ক্রফোর্ডের জহরতের দাম ছ' হাজার পাউণ্ড; মে ওয়েষ্টের জুয়েলারির দাম ১০০ পাউণ্ড।

—

বিশেষজ্ঞরা বলেন,—মদ্যপতা এবং দুর্নীতিপরায়ণতা প্রতিরোধের শ্রেষ্ঠ উপায় —স্পোর্টিং। মুক্ত আলোবাতাসে মানুষের মনের স্বাস্থ্য বজায় থাকে এবং মুক্ত আলোবাতাসে বাস ও বিচরণের অভ্যাস যত বাড়িবে, মন সেই পরিমাণে হইবে স্বাস্থ্যপূর্ণ এবং তার ফলে মদ্যপতা বা দুশ্চরিত্রতা ঘুচিবে। আলস্যে বদ্ধ ঘরে বসিয়া যারা দিন কাটায় তারাই প্রায় মদ্যপ ও লম্পট হয়।

—

দক্ষিণ আমেরিকায় একটি হ্রদ আছে; হ্রদের নাম টিটিকাকা। এই হ্রদের গর্ভে নাকি পাঁচ কোটি পাউণ্ড দামের সোনা রহিয়া গিয়াছে। স্প্যানিয়ার্ডেরা আমাদের দেশের বর্গীর মতো একবার এ মুলুকে আসিয়া ভীষণ লুঠপাট আরম্ভ করে—রীতিমত দস্যুতা। সেই সময়ে দেশের যত সোনা লোকে এই হ্রদের জলে নিক্ষেপ করে। যদি ভাগ্যে থাকে, পরে মিলিতে পারে—এই উদ্দেশ্যে। সম্প্রতি বৃটিশ অভিযান চলিয়াছে এই লেক মন্থনের উদ্দেশ্যে। এ অভিযানের নায়ক ক্যাম্ব্রিজের প্রফেসর গার্ডিনার। হ্রদটি উচ্চ পাহাড়ের বুকে—সমুদ্র লেভেল হইতে ১২৫০০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। হ্রদের কিয়দংশ বিস্তারিত হইয়াছে পেরু প্রদেশে। প্রফেসরের সঙ্গে চলিয়াছেন বহু তরুণ বৈজ্ঞানিক – কারণ বয়োবৃদ্ধদের পক্ষে এখানকার পাহাড়ের উপরকার বাতাস নাকি সহিবে না। সহচরপ্রমুখ প্রফেসর সাহেব জল পরীক্ষা করিবেন – সেই সঙ্গে ওখানকার জীবতত্ত্ব ও উদ্ভিদ তত্ত্বেরও অনুশীলন করিবেন। হ্রদের জলে নাকি দু'জাতের বেশী মাছ নাই এবং সে মাছ স্বাদহীন! হ্রদের চতুষ্পার্শ্বে যে পলিমাটী তাহাতে আছে রৌপ্য, সীসা ও তামার অজস্র রেণু। এ রেণু সংগ্রহের ব্যবস্থায় প্রচুর সমৃদ্ধিলাভের আশা আছে।

———

শিশু অপরাধী

বৃটেনের ফৌজদারী বিভাগের অধ্যক্ষ হ্যানহাম সেখানে ছোকরা-অপরাধীর সংখ্যা দিনে দিনে ভয়ঙ্কর রকম বাড়িয়া উঠিতেছে কি ভাবে, তাহার আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের দেশেও বাতাস বড় ভালো বহিতেছে না। এজন্য সে আলোচনার মর্ম সঙ্কলন করিয়া দিলাম। আলোচনাটিতে ভাবিবার অনেক কথা আছে।

লেখক বলিতেছেন—১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ফৌজদারী বিভাগের রিপোর্ট পাঠে জানা যায়, সতেরো বৎসর বয়সের নীচে নানাবিধ অপরাধে বিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ জন ছোকরাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। তার আগের বৎসরে ছোকরা অপরাধীর সংখ্যা ছিল ১৪৩০২।

তিনি বলেন, অপরাধীর সংখ্যা এবং অপরাধের বৈচিত্র্যে মা-বাপের সুগভীর ঔদাসীন্য—দারুণ বিভীষিকা জাগাইয়া তোলে। বহু ক্ষেত্রে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে এ কথা মনে হয় যে, ছেলেদের সাজা না দিয়া তাদের মা-বাপের শাস্তি-বিধান কর্ত্তব্য।

এ ব্যাপারে আমি নিজে বহু সন্ধান লইয়াছি। কয়েক জন অফিসারও মন্তব্য করিয়াছেন, বহু ক্ষেত্রে পিতামাতাই দণ্ডনীয় বলিয়া মনে হইয়াছে। পুলিসবাহিনী বাড়ান হইয়াছে, তবু অপরাধ বন্ধ হওয়া দূরের কথা—তার মাত্রা বহু ভাবে বিস্তারিত হইতেছে।

সিঁধ কাটিয়া ও না কাটিয়া চুরির অপরাধে ছোকরা অপরাধীর সংখ্যা ছিল ৩৮৫১ জন। অপরাধীদের মধ্যে আবার

শতকরা ৩৫ জনের বয়স চৌদ্দ বৎসরের চেয়েও কম।

কিছুদিন পূর্ব্বে এক জন মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা তাঁর আট বৎসর বয়সের এক কন্যাকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডনের এক বৃহত্তম দোকানে যান জিনিষ কিনিতে। কেনা দূরের কথা—রাজ্যের জিনিষ টানিয়া আণ্ডিল করিয়া বাছাই করিতে তিনি প্রায় দু'ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করেন। তার উপর তাঁর আচরণে দোকানের ক'জন লোকের সন্দেহ হয়—তারা অন্তরালে থাকিয়া মহিলাটির উপর লক্ষ্য রাখে।

প্রৌঢ়ার হাতে ছিল একটা কাগজের বগলি। মহিলাটি টেবিলের উপরে জড় করা জিনিষপত্র দেখিতে দেখিতে বালিকার হাতে দিল থলি—এবং জিনিষ-পত্র সেই থলির মধ্যে দু'চারিটা করিয়া সরাইতে প্রবৃত্ত হয়। যখন থলিটি প্রায় বোঝাই করিয়া মেয়েটি বাহির হইবে—দোকানের লোক ধরিয়া ফেলে; ধরিয়া দেখে, ১৪ পাউণ্ড দামের বস্ত্র দ্রব্য সরাইয়াছে। রুমাল, মোজা, ব্লাউশ প্রভৃতি টুকিটাকি বহু দ্রব্য।

বিচারে প্রৌঢ়ার এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়—কারণ, তার অপরাধ শুধু তো চুরি নয়; ছোট মেয়েকে চুরি শেখানো।

এমনিভাবে চৌর্য্যবৃত্তি শিখাইবার ব্যবস্থা একেবারে পাকা। এ দেশের কথা বলি। আমাদের এক বন্ধু—তিনি এখানে ফৌজদারী আদালতে ওকালতি করেন। একট মোকদ্দমায় তিনি আসামী পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। আসামী—তেরো বৎসর বয়সের একটি মুসলমান ছোকরা। অভিযোগ - হ্যারিসন রোড এবং কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে এক-জন ভদ্রলোক নামেন ট্রাম হইতে—পকেটে পার্শে নোটের তাড়া—মেয়ের বিবাহের জন্য কাপড় কিনিতে আসিয়াছিলেন। ট্রাম হইতে যেমন নামা, অমনি পকেটে পড়িল টান—পার্শ লোপাট! ভদ্রলোক ছেলেটার হাত চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। পার্শটা হাতফেরতা হইয়া অদৃশ্য হইল—টাকা পাওয়া গেল না। ছোকরাকে আসামী করিয়া চালান দেওয়া হয়। মামলা চলিতেছে, এমন সময় আমাদের উকিল বন্ধু একদা দেখেন—পথে চলিয়াছে সেই আসামী ছোকরা—তার সঙ্গে একজন বয়স্ক মুসলমান। দু'জনে চলিয়াছে—বেলা তখন দুটা—সহসা রব উঠিল, চোর, চোর! ব্যস্—ছোকরা পলাইয়া অদৃশ্য হইল—আর বয়স্ক মুসলমান ভিড়ে মিশিয়া "চোর—চোর" বলিয়া চীৎকার তুলিতে লাগিল।

শেষে তিনি প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, মুসলমানটি—ছোকরাকে পকেট-মারা বিদ্যার দীক্ষা দিতেছে। তাদের দল আছে—সে দলে শিক্ষকও অনেক। এ ছোকরাটি পিতৃমাতৃহীন—খুড়ার ঘরে খাটিয়া মরিতেছিল। খুড়া পয়সা বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে ইহাদের দলে তাকে বেচিয়া দিয়াছে নগদ একশো টাকা মূল্যে। সেই অবধি ছোকরা এ দলে থাকিয়া পকেটমারা বিদ্যায় দক্ষ হইতেছে।

ছোকরা চোরদের ইতিবৃত্ত খুঁজিলে দেখা যাইবে—বহু ক্ষেত্রে মা-বাপ নয় তো এমনি দীক্ষাচার্য্য আছে চোরের পিছনে; কোন কোন ক্ষেত্রে ছেলেরা আপনা হইতে বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে।

গান

শ্রীদ্বিজেন্দ্র চৌধুরী

আকাশের ওই কাজল মেঘে শুনি কাহার গান,
দেয়ার ডাকের গভীর ব্যথায় দেয় সাড়া মোর প্রাণ।

•   •   •

সজল-মেঘের মাদল সুরে
নিখিল ভুবন দুলিল রে
আমায়, শুনিয়ে দে যায় বলাকারা বাণী সুমহান্॥

•   •   •

দিগন্তের ওই রঙের মেলায় নাচে মত্ত তাল,
আমার মনের সমুদ্র আজ তরঙ্গে উত্তাল।
শ্যামল ধরার বুকের মায়ায়,
সুরে সুরে সুর ভেসে যায়;
আজ, মায়াময়ী ছায়ার রূপে ছন্দে নব তান॥

কখনো কখনো অসম্ভবও সম্ভব হয়

অসম্ভব কি কখনো সম্ভব হতে পারে? বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, সে রকমই একটা ব্যাপার কিন্তু আমাদের দেশে কিছুকাল হোলো ঘটে গেছে—চায়ের জগতে। সে জগতে ভারতবর্ষ ছিল একেবারে নবাগত, আর সেই ভারতবর্ষই আজ সারা দুনিয়ার চায়ের ব্যবসায় একটা প্রধানতম স্থান দখল করে নিয়েছে। এটা কি কম অভাবনীয় ব্যাপার?

এর চাইতেও বড় অসম্ভব সম্ভব হতে চলেছে এবং তা দেখতে পাবেন সেদিন যখন ভারতের আপামর সাধারণ—বড়-লোক গরীব, ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ সবাই তাদের এই নিজস্ব পানীয়ের গুণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয়ে উঠবে। সেদিনের আর বেশী দেরী নেই।

একবার ভেবে দেখুন, একশ' বছর আগে যে গাছ ভারতের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে আপনা থেকে জন্মাতো, সেই গাছ থেকে আজ ভারতবর্ষ দ্রুতগতিতে পৃথিবীর চা সরবরাহের একটা প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদিও পৃথিবীর নানা জায়গাতে আজ-কাল চায়ের চাষ হচ্ছে, তবু এদেশের চা-ই জগতের সর্ব্বত্র আদর পায়, সব চেয়ে ভালো বলে', সুস্বাদু বলে'। আজ পৃথিবীতে মোট যত পণ্যের কারবার চলছে, তার মধ্যে শতকরা এক ভাগই হচ্ছে ভারতীয় চায়ের ব্যবসা। এক বিলেতই ভারতীয় চায়ের অর্দ্ধেকের বেশী নেয়।

ভারতের চা কি করে ক্ষেত্র থেকে চা বাজারে গিয়ে পৌঁছোয়? চা বাগানের ম্যানেজারেরা তাদের চা বাক্স-বন্দী করে ভারতবর্ষের বন্দরে বন্দরে এজেন্টদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। তারা, হয় সেগুলি লণ্ডনে বিক্রীর জন্য পাঠায়, নয়তো ভারত-বর্ষেই বিক্রীর ব্যবস্থা করে। কলকাতায় নিলামে যত চা বিক্রী হয় তার অনেকটাই খরিদ্দারেরা বিদেশে রপ্তানি করে দেয়।

দেশের মধ্যে যে চা ব্যবহার হয়, সেটা সাধারণত কলকাতাতেই নিলামে বিক্রী হয়। সাধারণত এই নিলামের সময় হচ্ছে জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস। অবশ্য জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী আর জুন মাসেও যে কিছু কিছু নিলাম না হয়, তা নয়। দালালরা ক্যাটালগ ছাপিয়ে বিক্রীর সব বন্দোবস্ত করে। নিলামের আগে বিভিন্নরকম চায়ের নমুনা পাঠিয়ে খরিদ্দার-দেরকে চা গুলোর গুণাগুণ জানিয়ে দেওয়া হয়। এক একটা দিনে নানা দামে ৪০,০০০ বাক্স চা পর্য্যন্ত বিক্রী হয়ে যায়।

চা পানোপযোগী করে বিক্রী করতে হলে ওস্তাদদের দিয়ে চা চাখানো এবং মেশানো দরকার। সাধারণের রুচি অনুযায়ীই চা মেশাতে হয়। এই চাখানো ও মেশানোর জন্যই মোটামুটি এক রকম চা প্রায় একই রকম দরে সর্ব্বসাধারণের পাবার সুবিধা হয়। চায়ের বিক্রীর সঙ্গে চা চাখা এবং মেশানো তাই অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

ভারতবর্ষেই চা উৎপন্ন হয়—অথচ এখানকার চেয়ে অন্য দেশে ভারতীয় চায়ের চাহিদা ঢের বেশী। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভারত-বর্ষ থেকে ১৭৬,০০০,০০০ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানী হয়েছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রপ্তানী হয়েছিল ৩৭১,৫০০,০০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ মোট চায়ের বাণিজ্যের শতকরা ৪৩'২ ভাগ। ১৯৩২-৩৩এ এই রপ্তানী বেড়ে হয়েছিল ৩৮৫,৩৯৪,৮৯৭ পাউণ্ড। ভারতের চায়ের বাণিজ্য যে এত বেড়েছে তার একটা কারণ বিলেতে চা খাওয়ার অভ্যাস অত্যন্ত বেড়ে গেছে।

গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিলেতের যুক্তরাজ্যে চায়ের চাহিদা দ্বিগুণ বেড়েছে।

১৯১৯ সালে বিলেতের যুক্তরাজ্য মোট, ৩৪৪,০০০,০০০ পাউণ্ড চা আমদানী করেছিলেন, আর এর মধ্যে শতকরা ৬৬'৭ ভাগই ছিল ভারতের চা। হিসেব করে দেখা গেছে, সে দেশে প্রত্যেক লোক গড়ে বছরে প্রায় দশ পাউণ্ড করে চা খায়, যেখানে আমাদের দেশের লোক গড়ে বছরে চা খায় মাত্র তিন আউন্স।

যদি প্রত্যেক ভারতবাসী বছরে মাত্র এক পাউণ্ড করেও চা খেতো, তাহলে ভারত যতখানি চা উৎপন্ন করতে পারে, তার প্রায় সমস্তই এ দেশের চাহিদা মেটাতেই শেষ হয়ে যেতো। এটুকু চা খাওয়া নিশ্চয়ই ভারতের পক্ষে অসাধ্য নয়।

এ দেশের লোক যে রকম ধীরে ধীরে চা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে, তাতে ভারতীয় চা ব্যবসায় একটা অসম্ভব ঘটনা শিগগিরই ঘটবে বলে আশা করা যায়।

প্রথম অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, এ দেশে চা উৎপাদন আশাতীত রকমে বেড়ে গিয়ে; আমাদের বিশ্বাস দ্বিতীয়টা ঘটাবে এ দেশের লোক নিজেরা চা পান করে'।

ভারতবর্ষে চায়ের এই জয়যাত্রা সম্মুখপানে এগিয়েই চলেছে—দেখবেন আপনি যেন পিছিয়ে থাকবেন না।

"আপনি ভারতীয় চা'র আদর করতে শিখলে দুদিনেই অসম্ভব সম্ভব হবে।"

নোটিশ

কলিকাতা কর্পোরেশন

লাইসেন্স ডিপার্টমেণ্ট

গাড়ী ও ঘোড়ার ট্যাক্স

দ্বিতীয় ষর্ম্মার্দ্ধ ১৯৩৬-৩৭

এতদ্বারা ঘোড়ার গাড়ী, জিন রিক্সা, রেসের ঘোড়া, ঘোড়া, পনি ঘোড়া, গাধা খচ্চর ইত্যাদির মালিকদিগকে বা ঐ সমস্তের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে জানান যাইতেছে যে, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৬৭ (১) ও (২) ধারা অনুসারে তাঁহাদের নিজস্ব বা তাঁহাদের অধীনে যে সমস্ত গাড়ী বা পশু আছে, তাহার সংখ্যা, উক্তদের ট্যাক্স ইত্যাদি সম্বলিত বিবরণী, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর তারিখের পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যাল অফিসে তাঁহাদিগকে দাখিল করিতে হইবে। সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে লাইসেন্স অফিসারের নিকট দরখাস্ত করিলেই ঐরূপ বিবরণীর মুদ্রিত ফরম পাওয়া যাইবে। আরও বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ঐরূপ বিবরণী দাখিল না করিলে অভিযুক্ত হইতে হইবে এবং ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে। যাঁহারা স্ব স্ব আড্ডায় থাকিয়া ট্যাক্স দেওয়া সুবিধা বোধ করেন, তাঁহারা ইন্‌স্পেক্টর আসিলে গেলেই তাঁহার নিকট প্রাপ্য টাকা দিতে পারেন, তাঁহার সেই স্থানেই টাকা গ্রহণ ও লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষমতা আছে। গাড়ী ব্যবহৃত হয় নাই—এই কারণে ট্যাক্স মাপ পাওয়ার দরখাস্ত [illegible] ৩১শে ডিসেম্বরের পর গৃহীত হইবে না।

গরুর গাড়ীর রেজিষ্ট্রেশন

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৮৩ ধারা অনুসারে চলতি ষর্ম্মার্দ্ধের জন্য গরুর গাড়ী রেজিষ্ট্রেশন ১লা অক্টোবর হইতে আরম্ভ হইবে। গরুর গাড়ী এবং হাতে ঠেলা গাড়ীর (যাহা মানুষ বহনের জন্য ব্যবহৃত হয় না) মালিকগণ, অবিলম্বে তাঁহাদের গাড়ী রেজিষ্টারী করাইবেন। প্রত্যেক গাড়ী রেজিষ্টারী করার বাবদ ৪৲ টাকা ফী দিতে হইবে। গাড়ীতে যে নম্বর-প্লেট লাগাইয়া দেওয়া হইবে, তজ্জন্য প্রত্যেক স্থলেই আরও অতিরিক্ত এক টাকা দিতে হইবে।

গাড়োয়ানদের টিকিট

উক্ত আইনের ১৮৭ ধারা অনুসারে গাড়োয়ানদিগকে কর্পোরেশন কর্ত্তৃক প্রদত্ত গাড়োয়ান হিসাবে রেজিষ্ট্রেশন নম্বর দেওয়া টিকিট লইয়া চলিতে হইবে (উহা এমনভাবে রাখিতে হইবে, যাহাতে দেখা যায়)।

ভাস্কর মুখার্জ্জী,
বি, এ (ক্যাণ্টাব), বি, এস-সি (ক্যাল),
কর্পোরেশনের অফিঃ সেক্রেটারী।
সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস,
১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬।

সচিত্র সাপ্তাহিক
দ্বিতীয় বর্ষ—৩৫শ সংখ্যা
শুক্রবার—২৩শে আশ্বিন
১৩৪৩
৯ই অক্টোবর—১৯৩৬

যুগের গতি
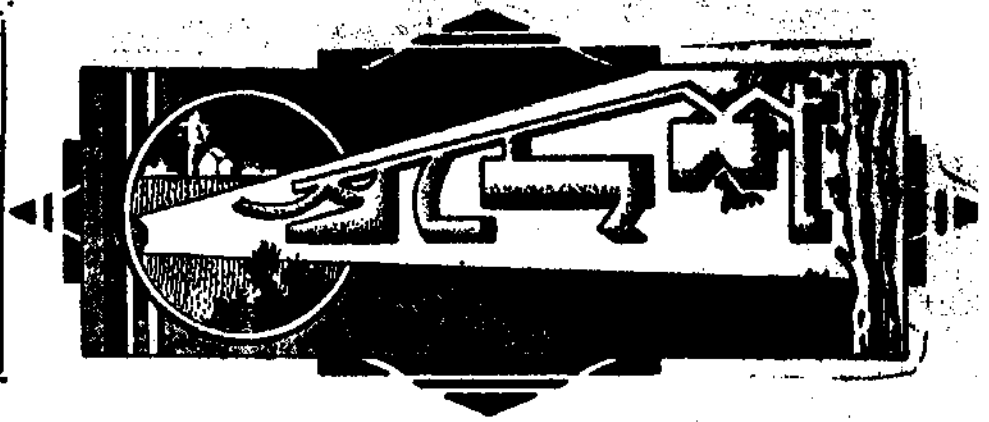
অনেক সময় যে মানুষ যা নয়, তাকে তাই বলেই প্রচারিত হতে হয়। তার অন্তরের মানুষটি বাহিরের আবরণে পড়ে যায় ঢাকা, যেমন নাকি ছাই চাপা থাকে আগুন, বালি চাপা জল, পাথর চাপা প্রাণ! বাহিরের আত্মপ্রচারী সঙ্ঘবদ্ধ সগোষ্ঠী মানুষের হাতে ছারপোকার মত চাপন খেতে খেতে সে যখন সবিস্ময়ে দেখে চেয়ে, যে যত বড় আত্ম-প্রচারক, যে যত সুকৌশলী, যত নির্মম ও বেহায়া আত্মসুখপরায়ণ—সমাজে, রাষ্ট্রে, ব্যবসা ও বাণিজ্যে, জ্ঞান ও বিদ্যার অনুশীলনে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সাধনায়, এমন কি ধর্ম-চর্চ্চার ক্ষেত্রেও একমাত্র সে-ই প্রকৃত অধিকারী, মাত্র সেই-ই সত্যিকার মানুষ হবার উপযোগিতায় বিশ্বজনীন দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম, তখন তার মাঝেও আসে এই আত্মগর্ব্বী মনুষ্যত্বের আহ্বান! তাই বাহিরের দৃষ্টিগত সৌসাদৃশ্যের মধ্যে যে নির্লজ্জ ঢক্কানিনাদ মানুষের নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রযোজিত হতে সে অহরহ দেখতে পায়, নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখবার অনিবার্য্য প্রয়োজনে অতঃপর তাকেও শিখতে হয় সেই বুদ্ধিমান মানুষের দলে, গড়তে হয় দল, হতে হয় আত্মপ্রচারের স্বপ্রণোদিত যন্ত্রের পরিচালক! প্রতিযোগিতাপরায়ণ জগতের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে যে যত উন্মত্ত গর্জ্জনে চীৎকার দিতে পারবে—নির্লজ্জের মত, বেহায়ার মত, সে-ই হবে তত বড় যোদ্ধা, তত বড় বীর, দেশপূজ্য মহামানবিক অবতার বিশেষ! এই হল বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাধর্ম্মী মানুষের অগ্রগতি!

ভাবি, কবে—কখন হল এই বিদ্যুৎবিসারী সভ্যতার উন্মেষ, মানুষ তার অন্তর-সাধনার ক্ষেত্রকে ঘৃণার দৃষ্টিতে শিখলো দেখতে? আর তার মধ্য থেকেই জেগে উঠলো এক বিশ্বগ্রাসী জাঁক-জমকের ঠুন্‌কো আবহাওয়া—যাতে করে অন্তরের অন্তঃশীলা স্রোতস্বতী বাহিরের উন্মাদ আর্ত্তনাদে হল দিশেহারা, ভুললো তার জন্ম-জন্মান্তরের কুসুমাস্তীর্ণ পাপড়িকোমল পথের নিশানা, হল আত্মবিস্মৃত! আত্মসাধনার ক্ষেত্রেও কেন এল তার আত্মবিস্মৃতির সর্ব্বনেশে ধ্বংস-পিপাসা? জানি না, এই অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? কে করবে এর মীমাংসা!

শুধু দুঃখ হয়, যে যেমনটি মানুষ, যার মধ্যে যতটুকু সম্ভাবনা—এ যুগে তাকে মাত্র সেইটুকুরই সাধনা নিয়ে চলবে না থাকা। একটি মাত্র মানুষ, তাকে হতে হবে দশ মহাবিদ্যার আধার, একাধারে সমাজ-সেবক, রাষ্ট্রনেতা, ধর্ম্মধ্বজী, কবি, শিল্পী, দার্শনিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, নাট্যকার—কী না হতে হবে তাকে? এর উপরেও হতে হবে আবার সাংবাদিক!

সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হল এই, এই যুগের মানুষ হয়ে জন্মানো! বাহিরের সাধনাই যে বন্ধু আমাদের করতে হবে!

চাতিম চাতিম

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

আমাদের নেতাদের ফুলের মালা আর জয়জোকারে অরুচি ধরে আসছে এটা শুভ লক্ষণ বলতে হবে। পণ্ডিত জোয়াহির লাল মাদ্রাজে সফরে গিয়ে তাঁর ভক্তদলকে যে রকম জ্ঞানাঞ্জন শলাকা প্রয়োগ করেছেন তা'তে তাঁর পপুলারিটি বাড়বে কিনা সন্দেহ। আমাদের এই নাদব্রহ্মের দেশ—এখানে উচ্চ চিন্তার চেয়ে উচ্চ রবই সুলভ, জয়জোকার দিয়ে ধ্বজ পতাকা উড়িয়ে হাততালির চটপটাধ্বনির জোরেই তো আমরা স্বরাজ-রথ এতদূর এগিয়ে এনেছি।

* * *

গণনেতা ধনীর দুলাল জোয়াহির লালজী মাদ্রাজে সেণ্ট্রাল ষ্টেশন থেকে সত্যমূর্ত্তির বাড়ীর অবধি গেছিলেন এক জমকালো রোলস্ রইস্ কারে। তা' তিনি যান, কাঠের ঠুঁঠো জগন্নাথ যখন বিশাল রথে চড়ে আজও পুণ্যকামীর বুকের ওপর দিয়ে চলেন এবং হাজার হাজার কাঙাল তাঁর রথের কাছি ধরে না টানলে সে জগন্নাথের রথ নড়ে না, তখন গণনাথ তিনি সামান্য একটা রোলস্ রইসে চড়বেন না তো কি গরুর গাড়ীতে চড়বেন? তাঁর বিপুল ভক্ত সমারোহকে ঠেলে সে পুষ্পক রথে চড়তে তাঁকে কিন্তু গলদঘর্ম হতে হয়েছিল।

* * *

যা' হোক ভদ্রলোক পৈত্রিক প্রাণটা নিয়ে ভক্তি-সিন্ধু-সন্তরণ করে কোনগতিকে সত্য মূর্ত্তির ঘরে উঠেছেন তখন কতরসিক ভলাণ্টিয়ার দল বাহিরে জড় হয়ে পণ্ডিতজীর দর্শন কামনায় আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার আরম্ভ করে দিল। পণ্ডিতজী বিরক্তমনে অলিন্দে দর্শন দিয়ে যা' বললেন তা'তে তাঁর মাদ্রাজী ভক্তদের আক্কেল গুড়ুম! পণ্ডিতজী বললেন, "আমি তাদের বিশ্বাস করি নে যারা চিৎকার করে, কারণ কাজের সময় এই বক্তাগীশদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তোমরা তোমাদের শৃঙ্খলা ডিসিপ্লিন বজায় রেখে কাজ করে যাও, আমাকে রক্ষা করে বিব্রত করবার কোন দরকার নেই।" তাই তো! তা' হলে এখন ভলণ্টিয়ার দল করে কি?

* * *

যাদের পেশা এতদিন ছিল চিৎকার, ধ্বজ পতাকা বহন, জয়জোকার দেওয়া ও ছুটোছুটি করে গলদঘর্ম হওয়া এমন করলে তারা যে মাঠে মারা যায়, তাদের পেশা একেবারেই মাটি! চাষীর ঋণভার চাষীর পিঠের ওপরই বহাল তবিয়তে বজায় আছে এবং ছারপোকাকে লজ্জা দিয়ে ভাবী ঋণের ডিম পাড়ছে; পল্লীর মৌকা বহুৎ আমাল বুজ বণিতায় উদরে উদরে ঢক্কার আকারে বিরাজ করছে, কচুরী পানা ক্ষেত খামারে বাদায় বিলে খালে নদীতে চাষার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে বংশ বৃদ্ধি করছে (স্থানে স্থানে উদ্যোক্তা গুরু সদয় মার্কা ম্যাজিষ্ট্রেটের তাড়া হুড়া সত্ত্বেও), দেশের কৃষি বাণিজ্য শিল্প-কলা দেশের দগ্ধ অদৃষ্টের সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধ কদলীতে পরিণত হচ্ছে। তবু চলেছে তো আমাদের পলিটিক্স-এর স্বরাজ রথ হাততালির ঝড়ে, ভোটের হুড়োয়। তবে ভয় কিসের?

* * *

আমরা নেতা-ই গৌর নিতাই

পরম দয়ালু!

চাবুক-চুবুক

পঞ্চমুখ শর্ম্মা

মেয়েরা মুখে ... কচে
শীতকালে খাই শাঁখালু।

রাজনীতির এই পোষাকী নেতৃত্ব শাঁখালের পিঠে চড়েই চলে, প্রস্তাবে প্রস্তাবে 'রিজোলিউসনে রিজোলিউসনে' ধাপিয়ে থাকে। এর গতির ধর্ম্মই হচ্ছে 'নটস্ অব টক্ এবং আউন্স অফ ওয়ার্ক; সুতরাং গঠন বিমুখ পলিটিক্স করতে নেমে আজ জোয়াহির লালজী এ কোন্ বাণী শোনাচ্ছেন? যে জাতীয় মহাসভা এতদিন মিলকে উপহাস করে চরকা ঘুরিয়ে আমাদের শিল্পোন্নতি করেছে, উদার বাগযন্ত্র ছাড়া আর কোন ইন্দ্রিয়ের যায়া হতে পারে!

"হিন্দুর ঘরে একই নাগরে
ভজিবার আছে বিধি
সাতশ' বছরে চৌদ্দ নাগরে
সে হিন্দু করিল সাধী।"

এমন পতিব্রতার দেশের জাতীয় পতি তিনি আজ গোপিনীদের ওপর রুষ্ট হচ্ছেন কেন? তারা যদি তাঁর মুখে অকস্মাৎ এই কর্ম্মবাদ শুনে তাঁর ইলোকোয়েন্ট অ-বলা কুল যদি বলে ওঠে—"একি কথা আজি শুনি মন্থরার মুখে রঘুরাজ?" তা'

> ## বিশেষ দ্রষ্টব্য
>
> ### শারদীয় অবকাশ
>
> 'স্বদেশে'র এই সংখ্যার পর পূজাবকাশের পূর্ব্বে আর সাধারণ সংখ্যা প্রকাশিত হইবে না। আগামী সপ্তাহের সংখ্যাই হইবে শারদীয়া সংখ্যা।
>
> আগামী ২৩শে ও ৩০শে অক্টোবর এই দুই সপ্তাহ অবকাশ গ্রহণান্তর স্বদেশ আগামী ৬ই নভেম্বর হইতে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিবে।
>
> বিনীত—
>
> কার্য্যাধ্যক্ষ

তার নেতা হয়ে তিনি কর্ম্মযোগ প্রচার করতে বসলে চলবে কেন? তাঁকে প্রাণপণে কণ্ঠচিরে করতে হবে জ্ঞানযোগ ও মাধ্বযোগের সাধনা এবং কর্ণপটহ রক্ষা করে শুনতে হবে ভক্তিযোগের জয়ধ্বনি।

* * *

কলকেতায় পাড়ায় পাড়ায় দেশের পল্লীতে পল্লীতে আবাল বৃদ্ধ বণিতা যে দেয়ো দাওয়ায় বসে হুকা টানে আর পরচর্চ্চা করে, অবসর সময় যারা কাটায় তাস পাশা দাবায় এলাদে, তাদের দেশ হ'লে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই। আসল কথা বাক্যের বাগেশ্বরী যুগ এখনও ঠিক অবসান হয়ে এ জাতির কর্ম্ম প্রেরণা আসে নাই। তাঁর মত সব নেতারা যদি ভক্তিযোগ ছেড়ে কর্ম্মযোগের উপদেশ দিতে থাকেন এবং এজিটেসন কজিটেশন ছেড়ে গঠনে মন দেন তা' হ'লে কালের চাকা ঘুরে গেলেও যেতে পারে।

শেষ প্রশ্ন, শেষের কবিতা, শেষ দশা—ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারের শেষ ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে! শেষপর্য্যন্ত অকবি হইল কবি, অসাহিত্যিক হইল সাহিত্যিক এমন কি অপ্রেমিকও প্রেমিক বনিয়া বসিল! দুনিয়ার এই চিড়িয়াখানা ক্রমে ক্রমে যাদুঘরে পরিণত হইয়াও কিছুতেই যেন তবুও শেষ হইতে চাহিতেছেই না! হরি! হরি! অতঃপর চর্ম্মচক্ষে 'শেষের দাবী'ও প্রত্যক্ষ করিলাম? শ্রীনিত্যহরি (ভজহরি নহে) ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই 'শেষের দাবী' করিয়া বসিয়াছেন! তথাপিও যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই উপন্যাসখানি পড়িয়া উঠিতে সময় হইল না, ইহা কেবল ভাগ্যের দোষ নহে—গ্রহের ফের, কারণ মা দশভূজা সদয় হইলেও, পূজা-সংখ্যার কাগজগুলি তো রেহাই দিবে না! সুতরাং 'শেষের দাবী' চোখ বুলাইয়া শেষ করিতে না পারিলেও, মাননীয় জাষ্টিস মন্মথ মুখার্জ্জি হইতে ছোট-বড় কর্ত্তা ও কাগজের 'উপাদেয় অভিমত' গুলি পড়িয়া চক্ষুদ্বয় ঊর্দ্ধলোকে উঠিয়া গেল! ভাবিলাম, এতগুলি মূল্যবান সার্টিফিকেট যে উপন্যাসের জগাতেই ঝুলায়মান রহিয়াছে, তাহা না পড়িয়াই ত্রৈলঙ্গ স্বামী হইয়া গেলাম—পড়িলে না জানি আরো কি হইয়া যাইব! সুতরাং পূজাবকাশের খোরাকী হিসাবেই বগল মধ্যে উহা চাপিয়া ধরিতে যাইব, সহসা চোখে পড়িয়া গেল—

"এই লেখকের লেখা
'রঙীন্ রাতের'
প্রতীক্ষায় থাকুন!"

'শেষের দাবী' শেষ করিতে নিত্য-হরি যদি 'রঙীন্ রাত'কেও আবার নগালে পাইয়া বসেন, অবশেষে 'দেহের দাবী'ও তো করিয়া বসিবেন না? উঃ! তাহা হইলেই হইয়াছে আর কি!

* * *

উদীয়মান গায়ক দেবরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় কেবলমাত্র গান গাহিয়াই গায়ক তৈয়ারী হ'ন নাই, নূতন ধরণের এক স্বরলিপিরও জন্ম দিয়াছেন! শুনিতেছি তাহা লইয়া পূজার বাজার বেশ জঁাকিয়াও উঠিয়াছে! নবশিশুর জন্ম হইলে, বাড়ীতে যেমন 'খোকা'কে লইয়া টানাটানি পড়িয়া যায়, এক্ষেত্রে দেখিতেছি হইয়াছে তাহার উল্টা! খোকার ইত্যাদি শ্রীযুত পণ্ডিত মশায়কে দেখিয়া সত্য সত্যই মহানুভূতি আসিয়া যাইতেছে! আহা, সৃষ্টিকর্তাকে কত ঝঞ্ঝাই না পোহাইতে হয়!

* * *

সচ্চিদানন্দ যেমন 'বঙ্গশ্রী'র 'শ্রী', আমাদের অপু ভট্টচাযও দেখি ঠিক তেমনটিই হইয়া উঠিলেন! শ্রীসচ্চিদানন্দ নিজে যেমন দেশ এবং দশের শোকে সাতারপানি হইয়া প্রতিক্ষণে ভেউ ভেউ করিতেছেন, অপু ভট্টচাযকেও তেমনি হাতে ধরিয়া তাহাই করাইতে শিখিয়াছেন। অতএব শুকমুখী বিছা চক্ষের মধ্য দিয়া বক্তটিকে ঠেলিয়া বাহির করিতেছে—

"তোমাদের ভাই ভাগ্য-গগনে নিত্তে তারা
ধূমকেতু ওঠে তাহারই পিছে,
সাগরপারের সভ্যতা পেয়ে সব-হারা
আকাশ-কুসুম রচিতেছে মিছে।"

ইহার পর কিরণ রায় মহাশয়ও কি 'আকাশ-কুসুম' রচনা করিতেছেন? হা অদৃষ্ট!

* * *

'নাচঘর'-এ নীলিমা সেনকে দেখিলে অজ্ঞলোকে স্বভাবতঃই মনে করিবে—তিনি নাচিতেছেন। কিন্তু যদি তাহার পরই কর্ণে আসিয়া পশে—

"নীরব ভাষায় বোল্‌ব তারে
তার বাঁশী যে বিশ্ব জুড়ে
পাগল ক'রে কাঁদায় মোরে
বিদায় ব্যথার ক্ষণে"

তখন হয়তো মনে হইবে, তিনি গাহিতেছেন। তাহার পর যদি আবার সত্য কথাটাই বলা যায় যে তিনি না-নৃত্য না গান করিয়াছেন, তখন কংগ্রেসী ত্রেণে আসিয়া প্রতিভাত হইবে, তিনি একটু লিখিয়াছেন!

অতএব আমরা অজ্ঞদিগকে বুঝাইয়া বলিতে বাধ্য যে নীলিমা সেন নাচঘরে নৃত্যও করেন নাই, গানও গাহেন নাই, খালি লিখিয়াছেন। অবশ্য আমরা 'নীরব ভাষায়' একথা 'বোলব'!

* * *

চিরকাল সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকগণের 'বাণী' বিভিন্ন পত্রিকার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়া থাকে। 'পরাগ'ও পূজার ঠিক পূর্ব্বাহ্নেই একজন অনামী লেখিকার 'বাণী' জোগাড় করিয়াছেন দেখিয়া বিশেষ আশ্বস্ত হইলাম। নামকরা লেখক-লেখিকাগণের পরিবর্ত্তে অনামী লেখক-লেখিকার 'বাণী' প্রবর্ত্তন করিয়া ডাঃ দে যে দূরদর্শিতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন—তাহা অসম্ভবরূপে

প্রশংসনীয়। তাহা না হইলে নূতন লেখক আর কিরূপেই বা তৈয়ারী হইবে?

কুমারী শান্তি মুখার্জ্জির 'প্রার্থনা'টি বেশ হইয়াছে। ইনি লিখিতেছেন—

"'পরাগ' নামটাও ভালো। স্বরে ও সুরে আমেজের (?) রেখা টেনে মনের কোণে আনে প্রেরণা, দেখবার ও তাকে ভালো বাসবার অসীম আনন্দ।

'পরাগের প্রতিটি রেণুকণা যেন ঘিরে আছে আনন্দের হিল্লোল নিয়ে। ফুলের মত পবিত্র তার দেহ, নদীর মত সমুদ্রের মত মন। মনের কোণে তাকে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা জাগে।"

ইহা সত্য। ফুলের উপর পরাগের দাগ পড়িলে তাহার মত নয়নাভিরাম, প্রাণারাম, মনমাতানো দৃশ্য ইহজগতে আর দ্বিতীয়টি নাই। উহা দেখিলে কাহার না 'মনের কোণে···ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা জাগে'? অহো! 'অসীম আনন্দ' জাগাইবার কী মনোহারী 'প্রেরণা'!

'আলো' 'তরুণের আলো' ইত্যাদি বহু হাতে-লেখা মাসিক ও ত্রৈমাসিক দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। বর্ত্তমানে 'বিংশ শতাব্দী' নামক একটি উক্তপ্রকার ত্রৈমাসিকও হাতে পাইলাম। ইহার সম্পাদক ও প্রকাশক শ্রীখসি আমেদ এবং সহঃ সম্পাদক শ্রীআনন্দ চট্টোপাধ্যায়। এগুলিও দেখিতেছি হোমরাচোমড়াদের লেখা দিয়াই ভরাট হইতেছে। অনামী তরুণ লেখকদিগের উপর নজর না দিয়া এরূপ পত্রিকা বাহির করিবার মধ্যে প্যাকামি ছাড়া কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাই যা' দুঃখ। এবং তদনুরূপ বিস্ময়েরও বিষয়! তবে ইহার একটি বৈশিষ্ট্য দেখিয়া

ই, বি. রেলে কনসেসন

ঈস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে যাত্রীদের যাতায়াতের জন্ত বিভিন্ন উৎসবের সময় যেরূপ ভাবে সুবিধা হারের ভাড়ার ব্যবস্থা করেন, তাহা সত্য সত্যই উল্লেখযোগ্য। কর্ত্তৃপক্ষ নানারূপ কনসেসনের ব্যবস্থা করিয়া যাত্রী-সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এবারও পূজার ছুটিতে ই, বি, রেল কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। দুর্গাপুজার ছুটি উপলক্ষে আগামী ১৩ই অক্টোবর হইতে ১১ই নভেম্বর পর্য্যন্ত এই রেলওয়ের উপর বিভিন্ন শ্রেণীতে সস্তা ভাড়ায় যাতায়াতের টিকিট পাওয়া যাইবে। অপরাপর রেলওয়ে ও ষ্টীমার সমূহের সহিত যোগ রাখিয়াও সকল শ্রেণীর টিকিট পাওয়া যাইবে। এই টিকিট বিক্রয়ের দিন হইতে ৪৫ দিনের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইবে, কিন্তু ১৭ই ডিসেম্বরের পর এই টিকিট চলিবে না। অতিরিক্ত গাড়ীরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বাস্তবিকই পুলকিত হইয়া উঠিলাম। যদি আমেদের নামের পূর্ব্বে 'শ্রী' যুক্ত দেখিয়া কেমন শঙ্কিত হইয়াই উঠিলাম। পুলক-মিশ্রিত শঙ্কা! 'মোহাম্মদী'র সম্পাদকের নজরে বুঝি আজো ইহা পড়ে নাই?

নদী ও নারী

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বি, এস, সি

নদীর যৌবন আজি উদ্দাম প্রবল
উর্ম্মিঘাতে ভাঙ্গি কূল কল ছল ছল
মানেনা কোনই বাধা ছুটে তীব্রগতি
ছাপিয়া দুকূল চলে—সাগরের প্রতি।
নবীনা তরুণী যথা যৌবন বিলাসে
বেগে ধায় সখা সনে মিলিবার আশে,
সাধ্য কার রোধে তা'র ব্যগ্র ব্যাকুলতা
উদগ্র বাসনা তার পূর্ণ সজীবতা।
নারীর যৌবন আর নদীর যৌবন
একই নিয়ম পথে চলে সর্ব্বক্ষণ।
আজি নদী স্ফীত বক্ষে সগর্ব্বে প্রবাহে
কে রহিল কেবা গেল কিছু নাহি চাহে;
তৃণ, গুল্ম, লতা, জীব ভাসাইয়ে সকলি
লয়ে যায় সাথে করি, বক্ষে চাপি দলি'
এইরূপ তরুণী সে যৌবন জোয়ারে
ভাসায় কত না নরে নয়ন পাথারে।
কিন্তু এই স্ফীত বক্ষা বরষার নদী—
কালের প্রবাহে কালি মিশিবে জলধি—
ফুরাবে যৌবন বারি সাগরের জলে
মানব যৌবন যথা কালের কবলে।
তবু বর্ষ পরে আসে নদীর যৌবন,
নারীর যৌবন গত ফিরেনা কখন।

কুমার কার্ত্তিকচরণ মল্লিক

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ প্রাপ্তি উপলক্ষে সন্তোষের মহারাজ বাহাদুরের সভাপতিত্বে রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকের পুত্র কার্ত্তিকচরণকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। সম্বর্দ্ধনা সভায় কুমার গোকুল চন্দ্র লাহা, কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা, কুমার বৃন্দাবনচন্দ্র লাহা, কুমার দীনেন্দ্রনাথ মল্লিক, রায় বাহাদুর চণ্ডিচরণ চট্টোপাধ্যায়, ননীলাল পাইন, নারায়ণপ্রসাদ শীল, মিঃ জে, সি, ব্যানার্জ্জি, রায় বাহাদুর গোপীনাথ সেন, অমূল্যধন আঢ্য, সতীনাথ রায়, কাউন্সিলার নটবর দত্ত ও বহু ভদ্রলোক এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

ব্যবসা জগতে ১০।১২টা যৌথ কারবারের ডিরেক্টার হইয়া ঐগুলি চালনা করিয়া কুমার কার্ত্তিকচরণ সুতীক্ষ্ণ বিষয় বুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন। তিনি বলেন যে দেশের ব্যবসাই একমাত্র উন্নতির উপায়। বর্ত্তমানের অর্থ সমস্যার প্রধান মূলই আমাদের দেশীয় পণ্যের মূল্যের হ্রাস, ইহার উন্নতি করিতে হইলে ব্যবসায়িদিগের সমষ্টিবদ্ধ হইতে হইবে, বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণের সহিত প্রতিযোগীতার জন্য ও দেশীয় ব্যবসা সংরক্ষণের জন্য সরকার বাহাদুরের নিকট বিশেষ শুল্ক বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাহা না হইলে ছোট ছোট ব্যবসা ও কুটীর-শিল্প এইদেশে চলিতে পারিবে না। এই কুটীর শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যগুলি বেকার যুবকদিগের অন্নসংস্থানের উপায় নির্দ্দেশ করিতেছে, জাপানে লক্ষ লক্ষ কুটির-শিল্প প্রতিযোগিতায় সকলকে পরাস্ত করিয়াছে, এই জলন্ত দৃষ্টান্তে তিনি দেশের বাঙ্গালী যুবকদিগের ও ধনিক সম্প্রদায়দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই সব শিল্পে সহায়তার জন্য বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় বা মহকুমায় এমন কি গ্রামে সরকার বাহাদুরের সাহায্যে ক্রেডিট সোসাইটি স্থাপন করা বিশেষ আবশ্যক।

কাউন্সিল অব ষ্টেট্

শ্রীযুত হেমকুমারচন্দ্র সরকার কাউন্সিল অব ষ্টেটের নির্ব্বাচনে প্রার্থী হবেন জেনে আমরা আনন্দিত হ'লাম। হেমন্ত বাবুর মত শিক্ষিত, ত্যাগী এবং জ্ঞানী জন নায়কের বাংলার প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান ডিভিসন হ'তে দুজন হিন্দু প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হবেন। তার মধ্যে একজন হেমন্ত বাবু হওয়াই চাই, এ বিষয়ে ভোটারগণকে অনুরোধ করা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীযুত ভাস্কর মুখার্জ্জি,

না

মিঃ রামিয়া ?

করপোরেশনের সেক্রেটারী কে থাকিবেন, শ্রীযুত ভাস্কর মুখার্জ্জি, না মিঃ রামিয়া, এই ব্যাপার অনেকেরই আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সার্ভিস কমিটী সুপারিশ করিয়াছেন যে, মিঃ রামিয়াকে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিয়া মিঃ মুখার্জ্জিকে সেক্রেটারী রাখা হউক, নচেৎ একটা বিভাগীয় ওলট পালট হইয়া যাইবে। তবে মিঃ রামিয়া যদি সম্মত না হন, তাহা হইলে মিঃ মুখার্জ্জিকেই স্পেশাল অফিসার করা হইবে। এই বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি গত বুধবারের করপোরেশনের সভায় হইবার কথা ছিল। কিন্তু ঐ দিন ইহার কিছুই নিষ্পত্তি হয় নাই। আগামী সোমবারে ইহার নিষ্পত্তির দিন পুনরায় ধার্য্য হইয়াছে। আশা করা যায়, এই দিনই এই বিষয়ে একটা হেস্ত নেস্ত হইয়া যাইবে।

মিঃ রামিয়ার স্পেশাল অফিসার হইতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে? মিঃ রামিয়া দীর্ঘ আড়াই বৎসরকাল ছুটিতে ছিলেন, সুতরাং করপোরেশনের ব্যাপার এখন মিঃ মুখার্জ্জি যেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে অবগত আছেন, মিঃ রামিয়ার তাহা থাকিবার কথা নহে। আর কলিকাতার করদাতাদের অধিকাংশই বাঙ্গালী। বাঙ্গালী সেক্রেটারীর কাছে তাহারা যেরূপভাবে অভাব-অভিযোগের কথা নিবেদন করিতে পারিবে, অবাঙ্গালীর কাছে তাহা সম্ভব নহে।

এমতাবস্থায়, আমরা আশা করি, করপোরেশনের কাউন্সিলারগণ মিঃ রামিয়াকে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিয়া মিঃ মুখার্জ্জিকেই সেক্রেটারীর পদে পাকাপাকিভাবে বহাল করিবেন।

যার হ'লো অবিচার

[গল্প]

শ্রীঅমলচন্দ্র সরকার

চিঠিখানা এলো যেন কোন মৃতের রাজ্য থেকে, হাতের লেখাটাও পর্য্যন্ত আমার মনে জাগে না যে কার। অনেক ভেবেও যখন ঠিক ক'রতে পারলুম না, অগত্যা তখন খামখানা খুলে ফেললুম।

জগদীশ আমার অনেক দিনের বন্ধু, কিন্তু সাধারণতঃ দশ জনেরি মতো কর্ম্ম জীবনে প্রবেশ ক'রে আমাদের দুজনের হয়ে গিয়েছিলো ছাড়াছাড়ি। দীর্ঘ ১৮ বৎসরের নীরবতার আবরণ ভেদ করে বন্ধু আজ আমার সন্ধান নিয়েছে, কিন্তু কী যে তার বিপদটা তা বুঝে উঠতে পারলুম না।

চিন্তিত মনে গিয়ে যখন উঠলুম চিঠিতে লেখা তার ঠিকানায়, দেখি সে টেবিলের ওপরে মুখ গুজে চেয়ারে বসে আছে। বয়সে যদিও কপালে রেখাপাতের অনুপযুক্ত সে নয়, তবু যে রেখা দেখলুম তার কপালে—সেটা একটা সাময়িক গুরুতর চিন্তার রেখা।

বহুদিন পরে দেখা—কতো রকম আবেগই না আশা করেছিলুম মনে মনে, কিন্তু জগদীশের অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কোথায় যেন তারা অদৃশ্য হয়ে গেলো, রৌদ্রে যেমন যায় শূন্যে মিলিয়ে কুয়াসা। উৎকণ্ঠা জড়িত স্বরকে যথা সম্ভব স্বাভাবিক করে প্রশ্ন করলুম—'কি খবর ?'

'এসো, অনিল তোমাকেই আজ আমার দরকার সব চেয়ে বেশী। আজ শেষের দিনে আমার ভার বোঝা তোমারি স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবো।'

'ব্যাপারটা কী বলো দেখি ?'

'একটা মামলায় পড়েছি সেইটের ভার তোমায় নিতে হবে আর কি।'

কেসটা কিসের ?

খুনের। সে অত্যন্ত সহজ ভাবে বলে ফেলল।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, খুনের কেস ? তুমি— ?

আসামী—অতি অল্প কথা, কিন্তু ওটা শোনার চেয়ে সেই মুহূর্ত্তে যদি আমার সম্মুখে একটা নারী পুরুষ হয়ে যেতো তাও বুঝিবা অতো বেশী বিস্মিত হতুম না। আবেগের কণ্ঠে প্রশ্ন করলুম—মানে ?

মানে অতি সরল আমি খুন করেছি।

'সমস্ত খোলাসা করে খুলে বলো, তবে ত কেস আমি কনডাক্ট করতে পারব।'

'ওইটেই আমায় মাপ করতে হবে ভাই, কাউকেই আমি জানাবো না, জানাতে পারবো না।—'

তবে কি করে আমি তোমার হয়ে ওকালতি করবো ?

অমনি করো বলে আমার দিকে সে কী যেন এক উৎকট দৃষ্টি দিয়ে তাকালো যার কোনো মানে হয় না। আমার আশঙ্কা হচ্ছিলো সে বুঝি পাগলই হয়েছে।

এক কাজ করো অনিল, আর কিছুই তোমার করতে হবে না, কেবল তুমি থাকবে আমার সঙ্গে সঙ্গে। পরশু তারিখ পড়েছে, বিচার হবে, সেখানে তোমার উপস্থিতির একান্ত আবশ্যক।' বলে জগদীশ একটু হাসলো, সে হাসি দেখে মানুষের মনে করুণাই জাগে।

কিন্তু ভাই, এ বুড়ো বয়সে কী সব ফ্যাসাদ বলো দেখি ? ব্যাপারটা খুলেই বলো না।'

'কিন্তু আমার অনুরোধ অভিমান সব নিমেষে কথার ঘায়ে চূর্ণ করে দিয়ে নির্ম্মম কণ্ঠে সে উচ্চারণ করলো কটা কথা 'ক্ষমা করো ভাই !'

আদালতে দেখি ভারী লোক সেদিন। সব লোকেরি উৎসুক চোখ কার যেন উদ্দেশ করছে। লোকের ভীড় ঠেলে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি—শুনতে পেলুম একটা লোক বলছে আরেক জনকে, 'যাই বলো এমন নামজাদা শিক্ষিত লোক হলেও কাজটা অন্যায়ই হয়েছে। কথা নেই—একেবারে এক জনের ঘরে ঢুকেই তাকে গুলী করা।'—স্তম্ভিত হয়ে শুনছি এমনি সময় দেখি সামনে খানিকটা স্থান হলো
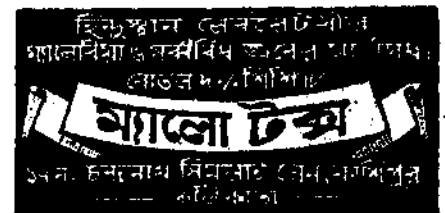
আর সেই পথ দিয়ে যে বেরিয়ে এলো সে হচ্ছে জগদীশ। আমার দিকে একটু মৃদু হেসে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো কাঠগড়ায়।

মৃতের পক্ষের উকীল সংক্ষেপে জানিয়ে দিলেন—আসামী স্বেচ্ছায় স্বহস্তে বিনা-কারণে দিবালোকে পরেশনাথকে হত্যা করেছে—অতএব ধর্ম্মাবতার তার সুবিচার করুন ইত্যাদি। বিচারক জিজ্ঞাসা কর-লেন—আসামী পক্ষের উকীল। জগদীশ জানালো, আমি উকীলের আবশ্যক বোধ করিনি হুজুর।'

'আপনার নিজের বলবার কিছু আছে?'

'না'।

'আপনি কেন হত্যা করেছিলেন?—

'কোন একটী মহিলার মান ইজ্জত রক্ষা করতে।'

'কে সে মহিলা?'

'আমি জানাতে অনিচ্ছুক।

'কেন?'

'তাও জানাবো না।'

বিচারক অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন 'এখানে কি সেই মহিলা নেই,—তিনি আত্ম পরিচয় দিয়ে ভদ্রলোককে বাঁচান?'—

তদুত্তরে জগদীশ জানলো তিনি ইহ-জগতে নেই—কোন মৃত রমণীর আত্ম-সম্মান রক্ষার নিমিত্ত আমি এ খুন করেছি।'—

আমার করবার কী আর ছিলো, কেবল দাঁড়িয়ে দেখে শুনে যেতে লাগলুম হতভম্বের মতো। বিচারক ও জুরীরা এক মত হয়ে রায় দিলেন,—আসামীর স্বপক্ষে সন্তোষজনক কিছুই জানা গেলোনা, তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।'—

কাঠগড়া থেকে নামবার পরে আমি কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম 'তুমি কি যেন একটা লুকিয়ে গেলে জগদীশ। তোমার তো এ শাস্তি হতে পারে না।'—

'না না—তুমি ভুল বুঝো না বন্ধু—বিচার সুবিচারই হয়েছে। আমি যদি স্বয়ং বিচারক হতুম তবে আমার মতো আসা-মীকে ঠিক এই দণ্ডই আমি দিতুম। বিচার ঠিকই হয়েছে।'—

ক্ষেত্রানুযায়ী বিচার হয়তো অন্যায় হয়নি, কিন্তু মন যেন তবু বলছিলো বন্ধু আমার স্বেচ্ছায় আত্মঘাতী হয়েছে।—

ঠিকই আমি ধ'রেছিলুম।

দ্বীপান্তরে রওনা হবার দিনে হঠাৎ দেখি আমায় ডেকে পাঠিয়েছে। গেলুম। বললো—'আমার তো সময় আর বেশী নেই অনিল। বড়ো জোর এ-বেলাটা—সন্ধ্যার দিকেই তো রওনা হতে হবে। তা' আমি ভেবে দেখলুম তোমায় না জানিয়ে গেলে আমার অন্যায় হ'বে।—দুঃখের কথা জানালে অর্দ্ধেক হয়।' ব্যথা

যে ওর কোনখানে সেটা জানবার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলুম।

তবে শোনো জগদীশ বলতে সুরু করলো—ঈমার সাথে আমার আলাপ হয় একদিন পথে। তার ফিটনের ঘোড়াটা হঠাৎ কেন যেন ক্ষেপে গিয়ে হাত পা ছুঁড়তে লাগলো—গাড়ি যায় আর কি উল্টে—গাড়ির মধ্যে একটা বিপন্ন মেয়েকে দেখেই আমি ছুটে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধ'রে কোন' রকমে তাকে শান্ত করলুম। মেয়েটা ততোক্ষণ গাড়ি থেকে নেমে একেবারেই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে ভয়ে বিস্ময়ে। আমায় সে কিছুতেই ছাড়লোনা, ধরে নিয়ে গেলো বাড়িতে। সেই হলো আলাপের সূত্রপাত।—

তারপর,…আমাদের দুটী প্রাণে তখন বেশ দোলা লেগেছে—আমরা বেশ ভরপুর হয়ে উঠেছি দুজনকার প্রতি দুজনকার ভালবাসার ঢেউয়ে—এমনি সময় একদিন আমায় সে জানালো—'ত্যাখো তোমার সঙ্গে তো আমার আর এমনটি করে মেশা উচিত নয়।

কেন—চকিত হয়ে আমি প্রশ্ন করলুম।

জানো তো, শত চেষ্টাতেও আমাদের আশা পূর্ণ হবার নয়। আমি অপরের হতে যাচ্ছি—মাঝখান থেকে তোমায় কেন দুর্ভাগ্যের ভাগী করি?

'হ্যাঁ তা' ঈমা—আমার কথা শেষ না হতেই দারুণ একটা দীর্ঘশ্বাস আমার বক্ষস্থল আলোড়িত করে উঠলো নিজের অজ্ঞাতসারেই।

সে তাদের দেশের বাড়িতে চলে গেলে আমি কলকাতায়ই রয়ে গেলুম—তাকে ভুলতে চেষ্টা করতে লাগলুম। অত ভুলবো বলে চেষ্টা করে আমিও তাই করলুম, কিন্তু কই তবু ভুলতে তাকে পারলুম না।—

এমনি করে কাটে মাস পাঁচ ছয়। স্মৃতির তীব্রতা ততোটা আর প্রখর নেই—; একদিন ক্লাব থেকে মেসে ফিরে দেখি এক খানা খাম। তার হাতের লেখা মাত্র একবার দেখেছিলুম—তবু যেন মন বললো সে তারি লেখা।—মনে পড়ে,—তাকে মেসের ঠিকানাটা দিয়েছিলুম।

চিঠি খানা খুলে—গা কাঁপতে লাগলো আমার, দৃষ্টি কিছুতেই স্থির থাকে না, শেষে চিঠিটাকে টেবিলের ওপরে রেখে কোন মতে শেষ করে যা জানলুম তার মর্ম এই যে…

শীগগিরই আমি আসছি। তুমি… তারিখে ইডন গার্ডেন এর অমুক গেটে রাত্রি ৭ টায় থেকো।

তার নির্দ্দিষ্ট দিনে, তারি নির্দ্দিষ্ট সময়ে গিয়ে উপস্থিত হলুম জায়গা মতো। ঠিক সাতটায় গেটে এসে থামলো এক খানা প্রাইভেট-কার। নামলো দুটী তন্বী, ঈমা আর তার সখী কণা। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই যেন মনে হলো ঝড়ের বেগে একখানা ট্যাক্সি আমাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

বোধ করিনা স্বেচ্ছায়ই কণা বললো, ঈমা আমি একটু ওধার থেকে আসি, তোরা একটু বোস' বলেই কিছুক্ষণ পরে উঠে গেলো।

আমরা দুজন ঝোপের মধ্যে। দু-জনেই দুজনের ঈপ্সিত তবু কাউকেই কারো পাবার উপায় নেই। যেন সমুদ্রের জল, তৃষ্ণায় ফাটে বুক, উপায় তবু নেই খাবার।

প্রথমে কথা কইলো ঈমা। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললো:

চললুম। আর উপায় নেই। মনে হয় কি জানো—দুজনের চোখে চোখ পড়তেই সে লাল হয়ে উঠলো, তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে বললো: 'কিন্তু এত বড়ো বংশের মুখে কালী দিতেও যে পারি না,—একটু থেমে পরে বললো:

ত্যাখো, যে আমায় পাবে, দেহখানা ছাড়া আর কিছুই সে পাবে না। মনে প্রাণে আমি তোমারই থাকবো।

আমি ভাষা হীন; নীরবে তার পিঠের ওপরে হাতখানা নাড়াচাড়া করতে লাগলুম।

কিন্তু যদিও আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলুম আমাদের সত্যি ছাড়াছাড়ি কেউই করতে পারবে না।—

ডান হাতখানা তার চিবুকে দিয়ে বাম হাত দিয়ে আকর্ষণ করে তাকে বুকের মধ্যে ধরলুম। সে তেমনি কাত হয়ে থেকেই বলতে লাগলো: উঃ কী নির্দ্দয়, এরা. টাকাটাই' যেন হলো এদের সব, আমাদের প্রাণ—প্রাণের ভালোবাসা এ সব যেন কিছুই না টাকার কাছে।—মনে হয় বিষ…

আমি মুখ খানা বন্ধ করে দিলুম… চুমোয়। সে তার বিষাদ পাণ্ডুর চোখ দুটো তুলে চাইলো আমার মুখের পানে, কিন্তু তাই আমি যে গরীব আমার কাছ

থেকে কোন ভরসাই সে পেলোনা।

উপরন্তু আমি বললুম তার কপোলে আমার গণ্ড খানা যত্নে রেখে, 'ইমা—আমি গরীব, আমি হয় তো তোমার বংশ মর্য্যাদা রাখতে পারবো না, তুমি—

সে ফুঁপিয়ে উঠলো কেঁদে আমার বুকের মধ্যে। সান্ত্বনা দোব কি, বোঝাবো কি, আমারও তখন ঐটেই বাকী।

'বংশ মর্য্যাদা, হায়রে'—

বলে আরো বেশী চঞ্চল ভাবে কেঁদে উঠে আমায় জড়িয়ে ধরলো।—কিন্তু···

দেড় বছর পরে।

সন্ধ্যায় একদিন বসে ভাবছি দেড় বছর পূর্ব্বের একটা সন্ধ্যার কথা। সন্ধ্যা সেই সন্ধ্যাই আছে, কিন্তু সে বন্ধ্যা করে দিয়ে গেছে ছুটো মনকে। হঠাৎ কণা এসে হাজির। আমি তো একেবারে থ বনে গেলুম। আমার হাতের মধ্যে একটা খাম দিয়ে বসে হাঁপাতে সুরু করলো।

খাম খুলে দেখি ৫।৬ খানা ফোটো, আমি আর ইমা এক সাথে। বিস্মিত আমার দিকে চেয়ে সে বললো: আমার পেছুনে লোক এখনও আছে। শুনুন। ইমা কদিন হলো মারা গেছে একটা ছেলে রেখে। না, না, ওতেই চমকালে হবে না। মরা ইমাকে বাঁচাবার ভার আপনার হাতে দিতে এসেছি।

পরেশ নাথ বলে এক লম্পট ফিল্ম ডিরেক্টর চেয়েছিলো সইকে পেতে। না পেয়ে, তার সাথে আপনাকে দেখে সে তার সর্ব্বনাশের তার বংশের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় থাকে। সুযোগও জুটলো।

আপনারা ইডেন গার্ডেনে গেলে সে কলো করে গিয়ে এ গুলো তুলেছে, একটা ফিল্মের মতো করে। আমি যাই—এখন যা কারবার করবেন। ঠিকানাও ওইতে আছে। ঝড়ের মতো এক নিঃশ্বাসে সবটুকু শেষ করে ঝড়েরি মতো সে চলে গেলো। বিস্ময়ে ত্রাসে, ক্রোধে আমি সংজ্ঞাহীন জড়পিণ্ড। সেই থেকে দুদিন তাকে আমি ফোন করলুম—প্রত্যেক বারই জানতে পেলুম সে বাড়ি নেই। শেষে অধীর হয়ে একদিন গিয়ে হাজির তার ষ্টুডিয়োতে। একাই ছিলো। আমায় দেখে একটু হেসে যেন কতোই পরিচিত এমনি ভাবে বললো 'আ-সুন।

আমি উপক্রমণিকা না করেই রূঢ় স্বরে বললুম—তুমি ফোটোগুলো আমায় দিচ্ছো কি না?

কোন ফোটো? সে যেন পড়লো আকাশ থেকে।

ও সব ন্যাকামো রাখো। ভালো চাওতো ওগুলো নষ্ট করতে দাও। কী হবে তোমার একটী ভদ্র কন্যার কুৎসা রটনা করে।'

হয়তো আমার অনেক লাভ হবে।'—নির্লজ্জের মতো সে বললো হাসতে হাসতে।

তার মুখে হাসি দেখে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো ক্রোধে। বললুম আরো এগিয়ে গিয়ে: জানো তোমায় এর শাস্তি পেতে হবে?

আমার ষ্টুডিয়োতে লোক আছে। ইয়া ইয়া জাঁহু খোর। বুঝলে?—এমনি সময়ে ফোনটা বেজে উঠলো, ফোন ধরে কালো মুখ করে বললো সে, ওঃ ফিল্মটা চুরি করা হয়েছে? তাতে কি? ঐযে সিন্দুকে নেগেটিভটা চাবি বন্ধ আছে। বুঝলে অতো বড়ো বাগান—প্রেম করতে অনেক রকমের লোকই ওখানে যায়—আগাগোড়া ফিল্মটা উঠেছে বেশ। হিঃ হিঃ করে সে পৈশাচিক আনন্দে হাসতে সুরু করলো।

ঠাকুরপো

[গল্প]

শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী

রূপবতী ওরফে রমাকে নিয়ে আমি কী মুস্কিলেই না পড়েছিলাম, এক অন্তর্য্যামী ভগবান ছাড়া কেউ তা বুঝবেন না। কারণ, কেউ ত আর আমার অন্তর পরখ করে দেখেন নি যে ওখানে কী ভীষণ ঝড়ই না বইছে! মানুষের ত মন! ওর প্ররোচনায় আর টিকে থা'কতে পারব বলে মনে হল না।—মনে হ'ল না, কারণ আমি মানুষ, দুর্ব্বলতা মানুষেরই আছে।

…রমা! আমারই দূরসম্পর্কীয়া ভ্রাতৃ-বধূ রমা! ষোড়শী আমার ধ্যানময়ী প্রতিমা!…জগতটাই যেন আমার নিকট রমাময় হয়ে উঠলো। বয়সের বেশী তারতম্য না হলেও, অর্থাৎ রমার চেয়ে আমি চার পাঁচ বছরের বড় হলেও আমাদের ব্যবধান অনেক। রমা বিবাহিতা, আর আমি অবিবাহিত। তার পাবার যা তা সে পেয়েছে; তার স্বামী। তার সুখ দুঃখভাগী স্বামী থাকৃতেও কেন যে সে আমার নিকট তার প্রেমের অর্ঘ্য বিলিয়ে দিতে চায়, এ হেঁয়ালীর কিছুতেই মর্ম্মোদ্ঘাটন করতে পারি না। বিষয়টা যেন কেমন উল্টো উল্টো বলে বোধ হয়। আমি পুরুষলোক অথচ অবিবাহিত; যৌবনের উন্মাদনায় আমি যদি রমার নিকট প্রণয়ে প্রেমভিক্ষা করতাম, হয়ত সেটা অত অস্বাভাবিক ঠেকতো না—নারী-হৃদয়ের প্রেমের লজ্জাহীন প্রার্থনায়! তবে কি—ওটা সাময়িক উত্তেজনা?… তবে কি সে আমারই রূপে মুগ্ধ হয়ে,…… হয়ত বা তাই!

যে ফুলের গন্ধ এখনও কেউ পায় নি, যে তার অপরিসীম সৌন্দর্য্য, অনুপম গন্ধ নিয়ে ফুটে রয়েছে,—সেই ফুল, সেই পূর্ণ বিকশিত ফুল থেকে আমি মধু আহরণ করতে চাই; অর্থাৎ যে নারী এখন পর্য্যন্তও তার প্রাণ অন্যকে বিলিয়ে দেয়নি, যে এখনও তার অনুপম সৌন্দর্য্য নিয়ে নব সাথীর প্রতীক্ষায় বসে আছে—বসে আছে জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করতে, আমার প্রয়োজন তাকে—তাকে নিয়েই আমার জীবনযাত্রা আরম্ভ করবো। আমার প্রেম, আমার বুক ভরা প্রেম আমি ত আর রমাকে অর্পণ করতে পারি না? পারিনা, কারণ সে ত তার প্রাণ আর একজনকে দান করেছে। অপরের নিবেদিত ফুল আমি গ্রহণ করতে যাব কেন?……এই সান্ত্বনায়ই এতক্ষণ টিকে আছি, নতুবা কোনদিনই পা ফসকে যেতো!

সন্ধ্যার পর নিত্যনৈমিত্তিক প্রথানুসারে রমাদের বাড়ীতে গিয়ে হাজিরা দিলাম। না যাবার সঙ্কল্প নিয়েই বেড়িয়েছিলাম, অথচ গেলাম। পা দুটো আপনি আপনিই এগিয়ে চললো। আমার সর্ব্বনাশের জন্য, আমার পতনের জন্য। তবে ত রমা একা দায়ী নয়! ধিক্কারে প্রাণটা ভরে উঠলো, কিন্তু ওটা সাময়িক! রমাকে সামনে দেখে তন্ময় হয়ে গেলাম। চেয়ে রইলাম একদৃষ্টে, অপলক নেত্রে!

দেখছো কি? —রমা চেয়ারটা সরিয়ে আমার কাছে বসলো। তারপর বাঁ-হাতটা আমার কাঁধে রেখে বললো—পুরুষলোক যে আত্মভোলা হতে পারে তা আমার কল্পনাই ছিল না; কিন্তু তোমাকে দেখে অন্ততঃ আমার সে ধারণা বদলে গেছে। রমার কোমল-কর-স্পর্শে সহসা প্রাণে বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটে চললো! সত্যই কেমন যেন আপনহারা হয়ে গেলাম! এমন কি আমার অস্তিত্বও যেন হারিয়ে ফেললাম! আমাকে মৌন দেখে রমা বলতে লাগলো, —আমি তোমায় স্বেচ্ছায় আত্মদান করলাম, আর তুমি—তুমি কিনা আমায় প্রত্যাখ্যান করলে!" কোন প্রকারে ঘাড় থেকে রমার হাতটাকে সরিয়ে বললাম—তুমি যে বিবাহিতা রমা! তোমার এক প্রাণ! ওই একটী প্রাণ তুমি দু'জনকে দেবে কেমন করে? তোমার যে স্বামী—

রমা বাধা দিয়ে বললো—হাঁ, আমার স্বামী আছে, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে শুধু স্বামীত্ব ছাড়া আর কোন সম্পর্ক যে আমার নেই, তা বোধ হয় জান না? এইটুকু বলেই রমার চোখ দুটী জলে ভরে উঠলো। তারপর আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে আবার সে বলতে লাগলো,—পুরুষেরা যদি পর-স্ত্রী-গামী হয়েও সমাজের বুকে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করে, একাধিক স্ত্রী ভোগ করেও কুলীন (সৎ) বলে পরিচিত হয়, তা হলে আমরা নারীরাও বা পর পুরুষগামী হতে পারব না কেন? একাধিক পুরুষের সহবাসী হলে আমরাও বা অসতী বলে পরিচিত হব কেন? ভোগবিলাস কি শুধু পুরুষজাতিরই জাতিগত সম্পত্তি?—রমার চোখ দুটো যেন জবা ফুলের মত লাল হয়ে উঠলো—যেন সমগ্র পুরুষজাতিরই উপর,—ঘৃণায়, ক্ষোভে ও দুঃখে।

পুরুষজাতির উপর রমার এই অভিযোগ নিশ্চয়ই যে স্ত্রীজাতির, শুধু স্ত্রীজাতি কেন, যারা শিক্ষিত—তাদের অন্তরও স্পর্শ করবে, তাতে আর বিচিত্র কি? কোন প্রকারে আত্মসম্বরণ করে বললাম,—কি আর করবে, সমাজের যা নিয়ম—যা আদি জীবন থেকে চলে আসছে,—তা নিয়ে বৃথা আলোচনা করে ত লাভ নেই!

—সমাজের নিয়ম? এমন পক্ষপাতিত্বপূর্ণ সমাজ,—এমন পুরুষজাতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সমাজ আমরা চাই না,—রমা চেঁচিয়ে উঠলো। তারপর আঁচলে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বললো,—আমরা সমাজে বিপ্লব আনবো, পুরুষদের গড়া সমাজ ভেঙে স্ত্রী পুরুষ উভয়কে নিয়ে উভয়ের স্বাধীনতা বজায় রেখে প্রকৃত সমাজ গড়ে তুলবো।

বেশ তাই কর! বলেই পরিচারিকাকে উঠে দাঁড়ালাম, রমা বাধা দিয়ে বললো,—বসে যাও না একটু, কথা আছে।

না, কাল আবার আসবো। রাত অনেক হয়ে গেছে।—উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বেরিয়ে পড়লাম।

রাতে আর ঘুম হলো না। এই অযাচিত আত্মদানের সম্বন্ধে—মনের মধ্যে কেমন এক আলোড়নের সৃষ্টি হ'ল! কি যে করি? রমাকে প্রত্যাখ্যান করবো? সারারাত্রি ছটফট করে কাটালাম। কোনো মীমাংসাই ক'রে উঠতে পারলাম না!

তারপর সাতদিন, ক্রমান্বয়ে সাতদিন রমাদের বাড়ী গেলাম না। পাগলা মন কিন্তু মাঝে মাঝে রমাকে দেখবার জন্য, তার সান্নিধ্য অনুভব করবার জন্য ছুটে যেতে চাইলো! কিন্তু আমি অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে ওটাকে দমিয়ে রাখলাম। সাতদিনের পর এক সন্ধ্যায় অবশেষে যেন এক মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতই রমাদের বাড়ী রওনা হলাম। কিছুতেই আর সংযত হতে পারলুম না।

বিছানারই একপাশে একটী ছোট টেবিল এবং এই টেবিলেরই উপর একটী ল্যাম্প। রমা বিছানায় শুয়ে একখানা উপন্যাস পড়ছিল। উপন্যাস পড়ছিল সত্যি, কিন্তু তবুও তাকে বড় আনমনা, বড় চিন্তিত বলে মনে হলো। সত্যিই সে যেন কার প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে আছে। সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন একটা জ্যোতিঃ, একটা অভাবনীয় জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে। কী মোহিনী শক্তি এই নারীর। তার এমন সুন্দর, এমন প্রাণ-ভুলানো রূপ যেন জীবনে আর কোনদিন দেখিনি! সমস্ত শক্তি, সমগ্র অনুভূতি দিয়ে আমি এই রূপ-সুধা পান করতে লাগলাম। সম্পূর্ণ অনাহুতভাবে, কোন আহ্বান না পেয়েই রমার কাছে গিয়ে বসলাম। তড়িৎস্পৃষ্টের মতই রমা আমারই একপাশে উঠে বসলো। এতদিন এলে না কেন?—বলেই জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে

চাইলো ; তারপর আমাকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়েই বললো—সত্যি করে বল দেখি সুন্দর কিনা ?

সত্য তুমি সুন্দর রমা ! বিধাতা যেন তাঁর সৌন্দর্য্য ভাণ্ডের সমস্তটাই নিঙড়ে তোমায় ঢেলে দিয়েছেন। আবেগভরে উত্তর দিলাম ! সহসা দু'হাতে আমায় আলিঙ্গন করে আমার কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে রমা বললো—আমার যৌবন, আমার সাধের যৌবন কি চিরকালই এমনি উপেক্ষিত থাকবে ? আমার প্রেমফুল, আমার পূর্ণ বিকশিত সুন্দরতম কুসুম-কোরক কি কারও পুজোয় লাগবে না ? ওকি অযাচিতভাবে শুকিয়েই খালি যাবে ?—রমার চোখ দুটী অশ্রুমতী হয়ে উঠলো, তারপর ঢোক গিলে আবার বলতে লাগলো,—ওগো, আমার দিকে ফিরে চাও ! বুকটা যে ফেটে যাচ্ছে আমার—রমা আর কথা বলতে পারলো না,—আবেগে তার বাকশক্তি লোপ হয়ে এলো ! দুনিয়ার সব চিন্তা তখন আমার সামনে থেকে সরে গেছে। আমি আর রমা ছাড়া দুনিয়ায় যেন কেউ আর নেই। সৌন্দর্য্যের মানস-প্রতিমা রমাকে বুকে ধরে অজস্র চুম্বনে তার গণ্ডদেশ সিক্ত করে দিলাম। কিন্তু একি ? কী আমি করছি ! যৌবনের উন্মাদনাবশে ক্ষণিকের এই আত্মবিস্মৃত মুহূর্ত···তার মধ্যেই যেন নতুন করে চেতনা আবার ফিরে এলো। অপরের পূজার ফুল, কি আছে আমার অধিকার—তাকে লুণ্ঠিত, দলিত করব ? হল লজ্জা, এলো ভয় ! অকস্মাৎ পরিত্যক্ত বস্ত্রখণ্ডের মতই রমাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। নারী ও নরের মিলন-কামনায় যে মধুরতম পরিতৃপ্তির ইঙ্গিত তার প্রতিটি অঙ্গে, প্রতিটি মিনতিপূর্ণ কটাক্ষের আভাসে উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছিল, তাকে যেন হেলাভরে উপেক্ষা করেই উঠে দাঁড়ালাম। তারপরও তার মুখের যখন প্রকাণ্ড অনুরোধ কাণে এসে ঠেকলো, কোনরকমে নিজেকে ঠেলে নিয়েই যেন ছুটে পথে বেরিয়ে পড়লাম !

ফিরবার কালে একটা ঘৃণা, একটা অবসাদে প্রাণটা ভরে উঠলো। ···ভাল কাজ করিনি ! রমার স্বামী ও শাশুড়ী আমাকে বিশ্বাস করেন ; সে এক অগাধ বিশ্বাস ! তাঁরা আমায় অবাধে রমার সঙ্গে মিশতে দেন, আর আমি—

সাধুতার খোলসপরা আমি কিনা তাঁদের সর্ব্বনাশ করতে বসেছি ? তাঁদের কুল-বধূ—তাঁদের অবুঝ কুল-বধূকে সর্ব্বনাশের পথে টেনে আনছি ? কী বিশ্বাসঘাতক আমি !

সীলেটে থাকলে হয়তো কোন্ অসতর্ক মহূর্ত্তে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারবো না ! এ অবস্থায় কোনো অবিবাহিত যুবকই পারে না ! মুণি, ঋষিও পারেনি ! হয়ত বা আবার কোনদিন রমার কাছে ছুটে যাব ! পরদিন সকালে শিলংএর টিকিট ক'রে বাসে চড়ে বসলাম। বাড়ীতে আমার হঠাৎ শিলং যাওয়ার কৈফিয়ৎ দিতে, বলতে হ'লো, শরীর বড় ভাল নয়, অথচ কলেজও বন্ধ। তাই একটু হাওয়া বদলাতে যাচ্ছি। দেখতে দেখতে দু'মাস কেটে গেলো, কলেজের ছুটিও ফুরিয়ে আস্‌লো। প্রবাসে এমনি করে ঘর-ছাড়া, দলছাড়া হ'য়ে আর কতদিন কাটাবো ? সীলেটে না এলেও নয়, কারণ কলেজ খুলছে। আবার এলেও বিপদ ! কি আর করি ? অবশেষে সেই বাড়ী ফিরতেই হ'লো। বাড়ী এসে শুনলাম চল্‌তি মাসেই নাকি আমার বিয়ে। বিয়ে ?······নিজের পায়ে দাঁড়াবার আগে, স্বাবলম্বী হবার আগে অর্থাৎ উপার্জ্জনোক্ষম না হয়ে বিয়ে করবার বড় ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপত্তি করলাম না। রমাকে ভুলতে হলে, তা'র কুহক থেকে মুক্ত থাকতে হলে বিয়েই আমাকে করতে হবে।

* * *

দু'বছর পরের কথা। আমি ঘোর সংসারী। এর মধ্যেও তবু সংসারের খুটিনাটি ঝঞ্ঝাট নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়। কয়দিন হ'লো রমার কথা মনে পড়ছে। সেই রহস্যময়ী রমণীকে, যার সঙ্গে আমার যৌবনের একটা বিশেষ রহস্য জড়িত—

যাকে ভুলবার জন্যই আমার বিয়ে করা, সেই রমণীকে দেখবার জন্যেই প্রাণটা আবার আকুল হয়ে উঠেছে! আশ্চর্য্য!

সেদিন রবিবার। হাতের কাজটা কোনরকমে সেরে নিয়ে বিকেল বেলা রমাদের বাড়ী গেলাম। গিয়ে দেখলাম রমা প্রায় আট দশ মাসের একটা সুন্দর ছোট শিশুকে ঘুম পাড়াচ্ছে। বুঝতে বাকী রইল না যে এ' রমারই সন্তান। আজ রমার মাতৃমূর্ত্তি! এ' স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি দেখে তার উপর ঘৃণা হলো না, তার উপর লোভ গেলো না। বরং ভক্তিই হ'লো। কী সুন্দর! সন্তানের প্রতি জননীর কী অগাধ স্নেহ। আজ আর তাঁকে রমা বলে ডাকতে প্রবৃত্তি হ'লোনা। শুধালেম—বৌদি!

রমা মুখ তুলে আমার দিকে চাইলে, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না! তার মুখ যেন লজ্জায় রাঙিয়ে উঠেছে।

রহস্যচ্ছলেই বল্লাম—বৌদি, তোমার আদর্শ সমাজ গড়া হয়েছে? এবার কিন্তু রমা উত্তর কর্‌লো—আদর্শ সমাজে আমার আর কাজ নেই ঠাকুরপো, আমার স্বামীকে আমি ফিরিয়ে পেয়েছি। আমার আর কোন সাধ নেই, এখন আশীর্ব্বাদ কর যেন হাতের শাঁখা আর সিঁথীর সিঁদুর আমার অক্ষয় হয়। তারপর কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার করে বল্‌তে লাগলো—যৌবনের উন্মাদনায়, বয়সের অপরিপক্কতায় আমি ডুবতে বসেছিলাম। শুধু আমি কেন, তোমাকেও ডোবাতে বসেছিলাম! কিন্তু তুমি—তুমিই আমার রক্ষা করেছো! তুমি মানুষ নয় ঠাকুরপো, তুমি দেবতা।

অন্ধগায়ক
শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র রায়

চুঁচুড়া নিবাসী অন্ধ-গায়ক শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গীত-সাধনা বিশেষ প্রশংসনীয়। মাত্র ৩ বৎসর বয়সে তিনি অন্ধ হইয়া সঙ্গীত-সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করেন। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতার সঙ্গীত রত্নাকর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় এবং সঙ্গীত রত্নাকর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীত, সেতার, এস্রাজ, সুর-বাহার প্রভৃতি শিক্ষা করিতেছেন। তিনি চন্দননগরস্থিত কৃষ্ণভামিনী নারী শিক্ষা মন্দিরের ও চুঁচুড়ার বীণাপাণি সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সঙ্গীতশিক্ষক। "গানের মালা" নামক একখানি সঙ্গীত পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তিনি সঙ্গীত শিক্ষার সাহায্য করিয়াছেন। তাঁ'র নিরাময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

গান

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

নওবধূ লো সামলে চলো
পুকুরঘাটে পিছল ভারি!
হড়কে যদি পিছ্‌লে পড়ো
ছল্‌কে যাবে কাঁখের বারি!
ঐখানে ঐ বকুল তলায়—
চাতক রহে শুক্‌নো গলায়,
চুমুক দিয়ে তোমার কাঁখে
জল খে'তে লো পিয়াস তারি!
আমি যে ভাই তেমনি চাতক
একটুখানি তেমনি আশা—
আকুল হিয়ার জলপিয়াসা,
সামনে পে'য়ে তোমায় আমি—
মেঘ দেখে লো কেবল যাচি,
মনের পাখা পেখম ধরে
আর কি থে'মে থাকতে পারি?

শ্রীমতী নীহারবালার অভিনেত্রী-জীবন

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের কথা। ন্যাশানাল থিয়েটারের 'কল্যাণী' নাটকের উদ্বোধন-রজনীতে শিশু 'নীলুর' ভূমিকায় দেখা দিল একটি বালিকা। সেই বালিকার অভিনয়-প্রয়াস দর্শকদের উৎসুক করে তুল্ল। বালিকার সহজ ভঙ্গী, মধুর কণ্ঠ সহজেই দর্শকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করল। ক্রমে প্রচারিত হোলো বালিকার নাম নীহারবালা।

মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ সেই বালিকার অন্তর্নিহিত প্রতিভার সন্ধান পেয়ে সাগ্রহে তাকে নিজেদের সম্প্রদায়ভুক্ত করে নিলেন এবং ক্রমশঃ বিভিন্ন রসের নানা ভূমিকায় তাকে নামাতে লাগলেন। উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে শিক্ষালাভ করে শ্রীমতী নীহার অভিনয় কৌশল আয়ত্ত করে ধ্রুব, রোহিতাশ্ব এবং প্রহ্লাদ চরিত্রের যথাযথ রূপ দিয়ে খ্যাতি অর্জ্জন করলেন। ১৯১৫ সালে তিনি মনোমোহনে যোগ দিয়ে কণ্ঠহার নাটকে শ্যামলের ভূমিকা অভিনয় করেন। 'শ্যামলই' শ্রীমতী নীহারকে অভিনেত্রীরূপে সকলের কাছে সুপরিচিতা করে দেয়। এবং শ্যামলই হচ্ছে তাঁর কিশোর-ভূমিকাভিনয়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁর অভিনেত্রী জীবনের প্রথম অধ্যায়, যা নীলুতে সুরু হয়েছিল, তা পূর্ণতা লাভ করল শ্যামলে।

তারপর আবার তিনি মিনার্ভায় ফিরে গেলেন। কৈশোর তখন উত্তীর্ণ। যৌবন দেহে ও মনে নতুন রং ফলিয়ে তুলেছে। শিশু বা কিশোরের ভূমিকা অভিনয় করে নিজেকে প্রকাশ করা আর তখন সম্ভবপর নয়। সেই থেকেই তাঁর অভিনেত্রী-জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হোলো। নৃত্যে ও গীতে, চটুল ও আবেগ-বহুল ভূমিকাতে পারদর্শিতা লাভ করে শ্রীমতী নীহার শক্তিমতী অভিনেত্রীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্নরীতে প্রথমে 'সুপ্রভা' পরে 'কিন্নরী', মণিকাঞ্চনে 'রতি', শিরী-ফরহাদে 'শিরী', আলিবাবার 'মর্জ্জিনা', আবুহোসেনে 'রোশেনা', জয়দেবে 'শ্রীকৃষ্ণ', প্রভৃতি অসংখ্য ভূমিকায় অপরূপ অভিনয় করে নর্ত্তকী ও গায়িকারূপে মঞ্চে তিনি একখানি শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে নিলেন। তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, নৃত্য ও সঙ্গীত-সাধনা তাঁর সার্থক হোলো।

ষ্টার থিয়েটারে অপরেশচন্দ্রের শিক্ষা পেয়ে তিনি তাঁর জীবনের তৃতীয় স্তরে উন্নত হলেন।

মিনার্ভার ইমোশানাল অভিনেত্রী নীহারবালা ষ্টার থিয়েটারে এসে ক্রমশঃ ইনটেলেকচুয়াল হয়ে উঠতে লাগলেন। অভিনয়ে (চিত্তাবেগের বহিঃপ্রকাশ) আর ইনটেলেকচুয়াল অভিব্যক্তির মাঝে সুস্পষ্ট সীমারেখা কোথাও টানা যায়না। অভিনয়ে দুয়েরই প্রয়োজন হয়। অযোধ্যার বেগমের 'জিন্নৎ', চণ্ডীদাসের 'রামী', ফুল্লরার 'ফুল্লরা', হচ্ছে তাঁর ইমোশানাল অভিব্যক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয়। আর চিরকুমার সভার 'নীরবালা', গৃহ প্রবেশের 'হিমি', শোধবোধের 'নেলি' প্রভৃতির ইনটেলেকচুয়াল হয়েছে মনোরম। 'কপালকুণ্ডলা', 'প্রফুল্ল', 'সরলা' প্রভৃতিতে তিনি শান্ত সংযত অভিনয় করে বুঝিয়ে দিয়েছেন ইমোশানকে ইচ্ছামত প্রকাশ করবার এবং চেপে রাখবারও ক্ষমতা তাঁর আছে।

ষ্টার থিয়েটার থেকে আবার তিনি মিনার্ভায় যান এবং শ্রী নাটকে 'বাসন্তী', ১

সুভদ্রায় 'সুভদ্রা' প্রভৃতি অভিনয় করেন। মিনার্ভা থেকে তিনি আসেন মনোমোহনে এবং মুক্তির উপায়ে 'হৈমবতী', গৈরিক-পতাকায় 'মীরাবাই', কারাগারে 'চন্দনা' অভিনয় করে পূর্ব্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখেন। তারপর নাট্যনিকেতনে সাবিত্রী নাটকে 'সাবিত্রী', ঝড়ের রাতের 'বিজলী', শুভ-যাত্রায় 'মৃণালিনী', 'মা' নাটকে 'ব্রজরাণী', জননীর 'পান্নারাণী', নরদেবতার 'শশ্বতী' প্রভৃতি অভিনয় করে তিনি অধিকতর যশঃ অর্জ্জন করেন।

অভিনেত্রী জীবনের এই তিনটি স্তরের ভিতর দিয়ে শ্রীমতী নীহারকে অগ্রসর হতে হয়েছে।

নৃত্যে, গীতে, অভিনয়ে শ্রীমতী নীহার পারদর্শিনী, তার কারণ, নাচ, গান ও অভিনয়ের মূলে যে প্রকৃত রসবোধ থাকা প্রয়োজন, তা তাঁর আছে। শুধু রসানুভূতি থাকলেই হয়না, প্রকাশ করবার ভঙ্গীও থাকা আবশ্যক। শ্রীমতী নীহারের কণ্ঠ যেমন সুস্বরতার প্রকাশ করে, তেম্নি তাঁর দেহের ভঙ্গীও ভাব-ব্যঞ্জক। শ্রীমতী নীহারের শিক্ষা নেবারও আশ্চর্য্য শক্তি রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সুরের ভাণ্ডারী স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ গান শেখাতে যখন আসতেন, যখন স্বর্গীয় মণিলাল নৃত্য শিক্ষা দিতেন, তখন তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, শিক্ষা গ্রহণ করবার আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় পেয়ে।

বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সমাচার

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের বিশ্ব-বাণিজ্য

রাষ্ট্রসঙ্ঘ সঙ্কলিত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের বিশ্ব-বাণিজ্য সংক্রান্ত সম্পূর্ণ তথ্য, সম্প্রতি, পুস্তক আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বেকার বছরগুলির তুলনায় বিশ্ব-বাণিজ্য এবং গুটী কয়েক দেশের বিশেষ বাণিজ্যের অবস্থার কথা নিয়াই বইখানি রচিত হইয়াছে। বিশ্ব-বাণিজ্যের পরিমাণ ও তাহার সহিত বিভিন্ন দেশের দরের সম্পর্ক; পৃথিবীতে কাঁচা মাল ও খাদ্য বস্তুর উৎপাদন ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা তথ্য এই বই হইতে অবগত হওয়া যায়। বিভিন্ন দেশে বর্ত্তমান মুদ্রা প্রচলন নীতি এবং বিশ্ব-বাণিজ্যের উপর তাহার ফলাফলের কথাও বই খানিতে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বিশ্ব-বাণিজ্য সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়া পুস্তকে যে সিদ্ধান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, যে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণমূল্য হিসাবে বিশ্ব-বাণিজ্যের দর সামান্য বাড়িয়াছে। কিন্তু গড়পড়তা হিসাবে ধরিলে, সোণার দর হ্রাসের দিকেই ছিল, তবে মাঝে মাঝে তাহাতে বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা গিয়াছে। ১৯৩৪ অপেক্ষা ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ৪-৫ ভাগ বাড়িয়াছে। কিন্তু ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের পরিমাণের তুলনায় ইহা শতকরা ১৮ ভাগ কম।

১৯৩৪ হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে স্বর্ণ-মূল্যে বাণিজ্যের দর কিছু কমিয়াছিল। বিশেষ করিয়া শিল্প দ্রব্যের দর সম্বন্ধেই এই হ্রাস লক্ষিত হইয়াছে। খাদ্য দ্রব্যের দরেরও হ্রাস-বৃদ্ধি কিছু কিছু দেখা গিয়াছিল। কাঁচা মালের দর কিন্তু সমানই ছিল। কৃষি প্রধান ও খনিজ দ্রব্য উৎ
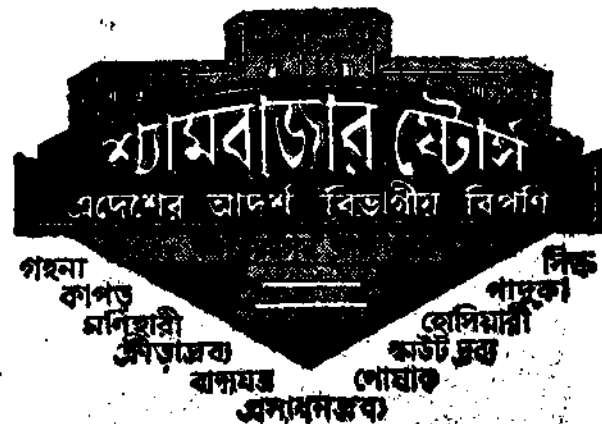
পালনকারী দেশ গুলির মধ্যে এই বছরে বাণিজ্যের বিনিময় বাড়িয়াছে।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে কাঁচামাল, খাদ্যও শিল্প দ্রব্যের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। তবে, অন্য দ্রব্যের তুলনায় খাদ্যদ্রব্য সংক্রান্ত বাণিজ্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।

য়ুরোপ ছাড়া অন্যান্য দেশগুলিতে বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ কমিয়াছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে বাণিজ্যের বৃদ্ধি সামান্যই হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দেশ গুলিতে বাণিজ্যের মোট পরিমাণ শত করা ২০ ভাগ বাড়িয়াছে।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা, যুক্ত রাজ্য, জার্ম্মাণি এবং জাপানেই রপ্তানীর পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে। ফ্রান্সে রপ্তাণী কম হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে প্রচলিত মুদ্রার স্থিরতার জন্যই বিশ্ব-বাণিজ্যের এই উন্নতি হইয়াছে কিন্তু বিনিময় অবরোধের ফলে অনেক দেশেই, বিশেষতঃ য়ুরোপীয় দেশ গুলিতে দ্রব্য বিনিময় বাধা পাইয়াছে।

ছায়া ও কায়া

শ্রীমধু বসু

রঙ্গালয়ে যে ভাবে সম্মিলিত অভিনয়ের হিড়িক পড়ে গেছে তাতে সাধারণ অভিনয়ের ক্ষতি হবে বলে আমাদের ধারণা। অনবরত যদি প্রসিদ্ধ নট-নটী সম্মিলনে প্রসিদ্ধ নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা করা হয়, তার ওপর আবার দু'খানা নাটক, তাহলে সাধারণতঃ যে অভিনয় হয় তা দর্শক আকর্ষণ করতে সমর্থ হবে কেন? বর্ত্তমানে রঙ্গালয়ে ভাল অভিনেতৃ সমাগম খুব কম, কারণ অনেকেই ফিল্মের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। এ জন্য যদি কেউ বলেন যে তাঁরা রঙ্গালয়ের চেয়ে ফিল্মকেই বেশী পছন্দ করেন তাহলে তা খুব ভুল হবে। রঙ্গালয়ের মায়া তাদের আচ্ছন্ন করতে পারছে না তার প্রধান কারণ—অর্থ। রাত্রির পর রাত্রি অভিনয় করে তাঁরা তাদের প্রাপ্য বেতন সময় মত পান না। ৪৫ মাসের মাইনে প্রায় সবারই বাকী পড়ে থাকে। সম্ভবতঃ এরই জন্য নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর মত শক্তিমান অভিনেতাও বসে রয়েছেন, হয়ত এইজন্যই রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, তুলসী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অভিনেতারা নিয়মিতভাবে নাট্যমঞ্চে অবতরণ করছেন না। ছায়ার আকর্ষণ যত বেশীই হোক না কেন যারা রঙ্গালয়ের কাজে একবার আত্মনিয়োগ করেছেন তাদের পক্ষে এর মোহ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া কষ্টসাধ্য হবে বলেই আমাদের ধারণা। অভিনেতাদের আর্থিক দুর্দ্দশার প্রতীকার হওয়া খুবই প্রয়োজন—নাট্যানুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তিই তা স্বীকার করবেন, নচেৎ এর জন্য নাট্যশিল্পের ক্ষতি হতে পারে। আমরা এর সুব্যবস্থা করবার জন্য রীতিমত আন্দোলনের পক্ষপাতী।

প্রফুল্ল ও সাজাহান

আজ শুক্রবার, নাট্যনিকেতন মঞ্চে প্রসিদ্ধ অভিনেতৃ সম্মিলনে 'প্রফুল্ল' ও 'সাজাহান' অভিনীত হবে। বিস্তারিত বিবরণ গত সংখ্যার 'স্বদেশে' দিয়েছি। ভূমিকালিপি এইভাবে বণ্টিত হয়েছে, যথা, কাঙ্গালীচরণ ও সাজাহান—অহীন্দ্র চৌধুরী, যোগেশ—নির্ম্মলেন্দু, রমেশ ও যশোবন্ত—ভূমেন, জজহরি- চিত্রমট অমর

মল্লিক, মদন—রাধিকানন্দ, শিবনাথ ও দিলদার—অহীন্দ্র গাঙ্গুলী, পীতাম্বর ও দারা—রবি রায়, ঔরঙ্গজীব—শরৎ চট্টোঃ, সুরেশ—ইন্দুভূষণ, মোরাদ—মণি ঘোষ, উমাসুন্দরী—নগেন্দ্রবালা, জাহানারা—সরযূবালা, প্রফুল্ল ও পিয়ারা—নীহারবালা, মহামায়া—চারু, জগমণি—নীরদাসুন্দরী, আনদা ও জহরৎ—নিরুপমা প্রভৃতি। আনদার ভূমিকায় নিরুপমার পরিবর্ত্তে অন্য কোন নামজাদা অভিনেত্রীকে দেখা যেতে পারে। প্রসিদ্ধ রেকর্ড গায়িকা ঢাকার খ্যাতনাম্নী গায়িকা হরিমতী এই রাত্রে প্রফুল্লতে মাতালনীর ভূমিকা নিয়ে সর্ব্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন। হরিমতী বর্ত্তমানে নিউ থিয়েটার্সে রয়েছেন।

নিউ-থিয়েটার্স

আজ শুক্রবার, ৯ই অক্টোবর সুসংস্কৃত চিত্রায় নিউ-থিয়েটার্সের নবতম অবদান 'গৃহদাহ' মুক্ত হবে। শরৎচন্দ্রের এই প্রসিদ্ধ উপন্যাসখানিকে রঙ্গালয় বা চিত্রগৃহে অঙ্গরূপে প্রতিফলিত হতে দেখবার জন্য সকলে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে রয়েছেন, সেই 'গৃহদাহ' আজ পর্দায় প্রতিফলিত হচ্ছে।

চিত্রার বাহির ও ভিতর অপূর্ব্ব সুষমামণ্ডিত হয়েছে। এখন অসঙ্কোচে বলা চলে, উত্তর কলিকাতায় রূপবাণী ও চিত্রা শ্রেষ্ঠ হাউসদ্বয় বলে বিবেচিত হচ্ছে। গরম আবহাওয়া শীতল করার প্রচেষ্টা এই চিত্রাতেই সর্ব্বপ্রথম হল। এর সমস্ত ব্যবস্থাই স্থির হয়ে রয়েছে, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে এভাবে হাউস শীতল রাখবার ব্যবস্থা হবে।

আগামী ১৭ই অক্টোবর, শনিবার রূপবাণীও 'বিজয়া' নিয়ে যাত্রা সুরু করবে। বিজয়ার নাম, বিজয়ার গান, বিজয়ার শিল্পী সবই অতি আকর্ষণের সুতরাং তরুণের দল যে বিজয়া দেখতে উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।

হিন্দি 'মায়া' গত ৩রা অক্টোবর হতে বোম্বেতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

নীতিনবাবু আশা করেন ডিসেম্বরের মধ্যভাগেই তার ছবিদুখানার শূটীং শেষ করতে পারবেন।

হেমচন্দ্র তার ছবির মহলা পুনরায় আরম্ভ করেছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তার ছবির শূটীং পুনরায় আরম্ভ হবে। প্রফুল্ল রায় লাহোর হতে ফিরে তার আগামী ছবির কাজ সুরু করবেন। বর্ত্তমানে তিনি ভূমিকা বণ্টনে মনঃসংযোগী হয়েছেন।

কালী-ফিল্মস্

'টকি অব্ টকিজে'র হাজারীবাগের শূটীং শেষ হয়েছে। শিশির ভাদুড়ী সদল বলে গত হপ্তাতেই প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। আর স্বত্বাধিকারী গাঙ্গুলী মশাই কারমাটাঁর আত্মীয় স্বজনের সহিত মিলিত হয়ে এই মাসের বাকী কটা দিন বিশ্রাম সুখ উপভোগ করবেন।

এখানে তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় 'রেশমী রুমাল' তোলা হচ্ছে—৪ রীলের হবে বাকি এবং প্রীতে পূজার মধ্যে দেখান হবে।

জ্যোতিষ মুখার্জ্জী 'মডার্ণ লেডী' এবং টকি অব্ টকিজের সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। যদিও শেষ ছবির খানিকটা অংশ এখনও তোলা হয় নি।

গুণময়ের পরিচালনায় 'পরভৃতিকা' তোলা হচ্ছে। নায়ক সুধীরের অংশে রঙমহলের গায়ক তারা ভট্টাচার্য্য (কৃষ্ণ-

কৈলাস রাজ) এবং অন্নপূর্ণার মন্দিরের মধ্যে তারকের ভূমিকাভিনেতা এবং কৃষ্ণার ভূমিকায় মনোনীত হয়েছেন শিভবালা।

শীলা হালদারকে নায়িকারূপে নিয়ে সুনীল মজুমদারও অবিমৃষ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। চেহারা ভাল নয়, অভিনয় ক্ষমতার একান্ত অভাব, তবু কি জন্য এই কুমারীকে নেওয়া হল ওই কঠিন চরিত্রের জন্য, তা আমাদের ধারণায় আসে না। গাঙ্গুলী মশায় তো লেখকের দোষ ধরেন কিন্তু তাঁর এভাবে কাজ কি সমর্থনীয় ?

চন্দ্রনাথ

ছায়া চিত্রগৃহের মালিকেরা আবার নিজস্ব ছবি তোলার জন্য মেতে উঠেছেন। শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথে'র চিত্রসত্ত্ব পর্য্যন্ত নাকি নেওয়া হয়ে গেছে। পরিচালনার ভার অর্পিত হয়েছে নরেশ মিত্রের ওপর। ছায়াচিত্র-তার দ্বারা পরিচালিত হলে তা অত্যন্ত মঞ্চ-ঘেঁসা হবে সুতরাং, তার পরিবর্ত্তে অন্য কাউকে নেওয়াই যুক্তি সঙ্গত। পায়োনীয়রের ষ্টুডিয়োতে এই ছবি তোলা হবে এবং বড়দিনের পূর্ব্বে নাকি 'ছায়া' এবং উত্তর কলিকাতার অন্য একটী হাউসে একই সময়ে প্রদর্শিত হবে।

জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোঃ

অবশেষে জ্যোতিষচন্দ্রের তরী ইষ্ট-ইণ্ডিয়ার খেমকাবাবুর ষ্টুডিয়োর দরজায় ভিড়েছে। প্রভাত মুখোঃ 'রত্নদীপ' নাকি তাঁর পরিচালনায় তোলা হবে। এই খানায় পুনরায় তিনি ভাগ্য পরীক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন। তার সাফল্যই কামনা করি।

ন্যাশনাল পিক্‌চার্স

যামিনী মিত্তিরের অন্য ইউনিট কার্ট ন্যাশনাল পিক্‌চার্স নামে অভিহিত হ'য়েছে। এরা ভারতলক্ষী ষ্টুডিওতে "সরলা" ছবি তোলা শুরু কোরেছেন—এ খবর আগেই আমরা জানিয়েছি এবং কে কোন ভূমিকায় নামবেন তাও লিপিবদ্ধ কোরেছি। "সরলা"-র নাম-ভূমিকায় কে নামবেন তা' এতদিন ঠিক হয়নি, কিন্তু এখন জেনেছি সরলায় নামছে করুণা— 'আলাদীনে'র মানিকপরী। ছবিতে আর একখানি নতুন মুখের আমদানি হ'ল।

শ্রীমতী কানন

শ্রীমতী কানন রাধার কুঞ্জ ছেড়ে নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেবেন কিনা, এই নিয়ে অনেকেই মাথা ঘামাচ্ছিলেন। আমরা খবর পেলাম, আগামী ১লা নভেম্বর থেকে শ্রীমতী কানন নিউ থিয়েটার্সের ট্রেডমার্কে এসে যাবেন।

নিউ ইণ্ডিয়া ফিল্মস্

শ্রীযুক্ত যতীন মিত্তিরের আর নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই। 'বিজয়া' নিয়ে যেরূপ মেতে আছেন, তাতে ছবিখানি আত্মপ্রকাশ করলে হৈ হৈ পড়ে যাবে। শোনা যাচ্ছে, বিজয়াতে তিনি 'ক্রেন শট্' দেখাবেন, যা এ দেশীয় ছবিতে দেখা যায়নি।

দেবদত্ত

খবর পেলাম, কালীপ্রসাদ ঘোষ নাকি দেবদত্ত ফিল্মসে যোগদান করেন নি। তড়িৎ বসু 'ইন্দিরা' পরিচালনা করবেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

সোনার সংসার বোধ হয় ১৭ই অক্টোবর উত্তরায় মুক্তিলাভ করবে। এই ছবিখানির উপর দেবকী বসুর ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করছে, তাই তিনি ছবিখানি ভাল করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন।

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা'র সুযোগ্য-সম্পাদক, সঙ্গীত-নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম সাধারণ্যে সবিশেষ পরিচিত। সম্প্রতি ইনি 'হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী'তে যোগদান করায় আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। উক্ত রেকর্ড কোম্পানী হইতে সত্যপ্রকাশিত ইঁহার দুইখানি আগমনী গান—'গিরিরাণী এই নাও উমারে' ও 'রাঙা পদে কে দিল মা' সঙ্গীতপ্রিয়দিগের নিকট আশাতীতরূপে সমাদর লাভ করিয়াছে। আশা করি সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ করিয়া ইনি রসিকসমাজে—চিরসমাদৃত সঙ্গীতশিল্পীর আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

টি সেস কোম্পানী ও চা'য়ের প্রসার

ভারতীয় টী সেস কমিটীর কার্য্যকরী সমিতির গত মাসিক সভায়, ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতে এবং ব্রহ্মদেশে ব্যবহারের নিমিত্ত কি পরিমাণ চা পাওয়া যাইতে পারে টি সেস কমিটীর ভারতের কমিশনার সভায় তাহার আনুমানিক পরিমাণসহ এক রিপোর্ট উপস্থিত করেন।

কমিশনার অনুমান হইতে দেখা যায় যে, ১৯৩৫-৩৬ সালে উৎপাদিত সর্ব্বশুদ্ধ ৪০৫৭৬৩৬৩০ পাউণ্ড চায়ের মধ্যে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ৭৯০৬০১৮৩ পাউণ্ড চা ব্যবহার হইতে পারে। এইস্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে ১৯৩৪—৩৫ সালে ভারতে ও ব্রহ্মদেশে ৬৯৯৭০০০০ পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং সভায় কমিশনারের রিপোর্টে উল্লিখিত ১৪ই জুন হইতে ১৯৩৬ সালের ১৮ই জুলাই পর্য্যন্ত কমিটীর বিভিন্ন কার্য্যাবলীর আলোচনা করা হয়। কয়েকটী বিশেষ কার্য্যের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

আলোচ্য বর্ষে ৭২টি টি সেস দল ৭২টী সহর এবং ৩৯১টী গ্রামে ও হাটে প্রচার কার্য্য চালাইয়াছিল। মেলা, বাস ষ্ট্যাণ্ড, হাট, এবং বাজারে সর্ব্বসমেত ৬৩২২৭টী প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল এবং এক পয়সা মূল্যের ৭১০১৯৬ চা প্যাকেট বিতরণ এবং গ্রামাঞ্চলের যাহারা কোন দিন চা পান করে নাই সেই সমস্ত গ্রাম্য অধিবাসীদের মধ্যে ২৫৩২৩৪০ কাপ তৈয়ারী চা বিনা মূল্যে বিতরণ করা হইয়াছিল।

প্রচারকারীগণ যে সমস্ত স্থানে প্রচার কার্য্য চালাইয়াছিলেন তথায় ৪৭ তৈয়ারী চা এবং ১৭টি পাতা চায়ের দোকান খোলার ব্যবস্থা করেন।

———

সমালোচনা

কাকলী—ছেলে-মেয়েদের সচিত্র বর্ণপরিচয় শিক্ষার বই। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। মজুমদার ব্রাদার্স, ১৫ নং ওয়ার ষ্ট্রীট, ঢাকা ও এস, সি, সেন, ৩নং ল্যান্সডাউন রোড কলিকাতা হইতে প্রাপ্তব্য। দাম আট আনা মাত্র।

স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ শিক্ষার উপযোগী করিয়া মনোজ্ঞরূপ চিত্রসহযোগে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা বইখানিতে বিশেষ সফল হইয়াছে বলা যায়। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর পুস্তকে যেরূপ কবিতা বা ছড়ার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত পুস্তকে কবি-লেখক তাহাপেক্ষা অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এবং ইহাই ইহার বিশেষত্ব। বইখানি সাধারণের নিকট যে সমাদর লাভ করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ছাপা ও বাঁধাইও (প্রচ্ছদপট সমেত) ছেলেদের উপযোগী হইয়াছে।

জাগরণ - শ্রীসত্যহরি দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত—ডি ৩৮।৭৯ হাউস কাটরা, বেনারস সিটি এবং প্রকাশক শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র, ১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১।০, কাপড়ে বাঁধাই ১॥০ মাত্র।

বইখানি প্রণয়নের মধ্যে গ্রন্থকারের যে আকুল আগ্রহ প্রকাশিত হইতে দেখা যায়, তাহা প্রধানতঃ আত্মোন্নতিমূলক জাতীয় জাগরণের ইঙ্গিতেই ভরপুর হইয়া উঠে। একদা ভারতের আর্য্য-জাতির মধ্যে যে শাশ্বত আত্মশক্তি স্বতঃপ্রবাহিত মন্দাকিনী-ধারায় স্বার প্রবাহিত হইয়া বিভিন্ন প্রকার উন্মেষের পন্থিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল, যোগজীবনের সহজ-সরল প্রকাশ ভঙ্গিমায় লেখকের হস্তে তাহা সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। আশা করি ইহা সর্ব্বসাধারণের, বিশেষতঃ অনুসন্ধিৎসু পাঠক-সম্প্রদায়ের নিকট বর্ত্তমানে সমাদৃত হইবে। ছাপা ও বাঁধাই স্পষ্ট ও মনোরম।

শ্রীভূমিভূষণ দৈত্র

সচিত্র সাপ্তাহিক
দ্বিতীয় বর্ষ—৩৭শ সংখ্যা
শুক্রবার—২০শে কার্ত্তিক
১৩৪৩
৬ই নভেম্বর—১৯৩৬

স্বাগতম্
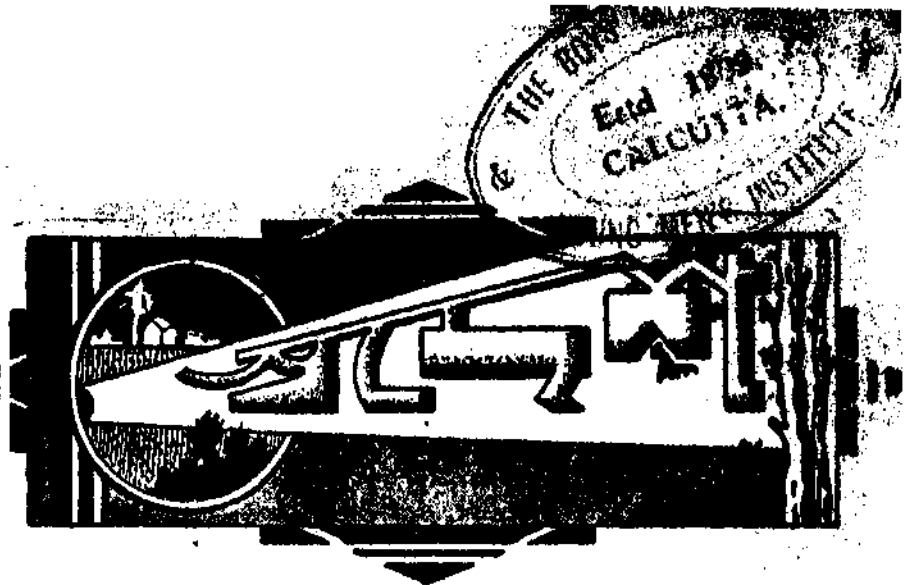
কংগ্রেসের সভাপতিরূপে পণ্ডিত জহরলালের কলিকাতায় এই প্রথম আগমন। তাই কলিকাতা অধিবাসীদিগের সঙ্গে আমরা কংগ্রেসের সভাপতিকে এই মহানগরীতে—কংগ্রেসের পিতৃভূমিতে সাদর সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছি। সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছি, দেশমাতৃকার সেবায় নিবেদিত প্রাণ আত্মভোলা কর্ম্মবীর পুরুষসিংহকে—সম্বর্দ্ধনা জানাইতেছি, দেশের পরাধীনতার দুঃসহ দহন জ্বালায় জর্জ্জরিত ভারত-বরেণ্য কংগ্রেস নায়ককে।

দীর্ঘদিন পরে পণ্ডিতজী বাঙ্গলায় আসিয়াছেন। কলিকাতায় তাঁহার অবস্থানের গোণা কয়টা দিন সভা-সমিতি, সম্বর্দ্ধনা অভিনন্দন ও বক্তৃতাতেই অতিবাহিত হইবে। বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর বর্ত্তমান দুরবস্থার সংবাদ জানিবার কতটুকু সুযোগ সুবিধা তিনি পাইবেন সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। বাঙ্গলার বহুস্থানের পল্লীবাসীগণ প্রলয়ঙ্কর প্লাবনে সর্ব্বহারা—অর্দ্ধ বাঙ্গলা জুড়িয়া আজ দুর্ভিক্ষ দানবের তাণ্ডব নর্ত্তন চলিতেছে। বিহারের দুর্গত অধিবাসীগণ তাহাদের দুর্দ্দিনে কংগ্রেস-সেবক পণ্ডিতজীর তবু কয়েকদিনের সেবাযত্ন পাইয়াছিল, গোটাকয়েক আশার ও সান্ত্বনার বাণী শুনিবার সৌভাগ্যও তাহাদের হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগা বাঙ্গালী আজও কংগ্রেস সভাপতির নিকট হইতে কোন সান্ত্বনা বা সহানুভূতি লাভ করে নাই। পারেন যদি তাহা হইলে তিনি যেন নির্দ্ধারিত কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও সেইসব দুর্ভাগাদিগকে অন্ততঃ মৌখিক আশা ও সান্ত্বনার বাণী শুনাইয়া যান।

বাঙ্গলার রাজনৈতিক আকাশ আজ অধিকতর ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন। বাঙ্গলার নয়নের মণি সুভাষচন্দ্র আজও ভগ্নস্বাস্থ্যে অবরুদ্ধ, দুই সহস্রাধিক যুবক এখনও বিনা বিচারে অবরোধের অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিতেছে। বাঙ্গলার প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থ ও প্রভুত্ব প্রয়াসীদল আজ বাঁটোয়ারা পুষ্ট সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় স্বার্থ ও মর্য্যাদা লাভের অপচেষ্টায় লালায়িত।

বাঙ্গলায় দীর্ঘ কংগ্রেসী দলাদলির অবসান হইয়াছে বটে, কিন্তু সে মিলনের বেদী সুদৃঢ় হইবে কিনা সে বিষয়ে এখনো অনেকেই সন্দিহান। বাঙ্গলায় আসিয়া পণ্ডিতজী যদি বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে বাঙ্গলা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অটুট রাখিবার ভরসা দিতে পারেন তবেই বাঙ্গালী তাহার জীবনের এই সঙ্কট সন্ধিক্ষণে তাঁহার আগমনের স্মৃতি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিবে। আর বাঙ্গলা কংগ্রেসের স্বার্থদেবী ও প্রভুত্ব প্রয়াসী বর্ত্তোরার দল যদি বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কংগ্রেসী মতে সায় দিয়া হিন্দুর স্বার্থের—তাহাদের গণতান্ত্রিকতা ও জাতীয়তার পরিপন্থী হন তাহা হইলে পণ্ডিতজী নিশ্চিন্ত জানিয়া যাউন যে, কংগ্রেসের মর্য্যাদার মোহে বাঙ্গালী হিন্দু সে আত্মঘাতী নীতি কিছুতেই অবলম্বন করিবে না।

পাঁচ মিশালী

এবার বাংলায় যেমন দুর্ভিক্ষ না মিটিতেই বন্যা আসিয়া বাঙ্গালীর দুঃখ বর্দ্ধিত করিয়াছে, তেমনি বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব চুকিতে না চুকিতে কংগ্রেসের সভাপতিকে লইয়া মাতামাতি আরম্ভ হইয়াছে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবার কংগ্রেসের সভাপতি হইবার পর সফরে বাহির হইয়াছেন। তিনি যেখানেই যাইতেছেন, সেখানেই শোভাযাত্রা, অভিনন্দন, সম্বর্দ্ধনা ও সভা হইতেছে। ইহা হইতে কি বাঙ্গালীকে অব্যাহতি দেওয়া যায়? শুনিতে পাওয়া যায়, লর্ড রেডিং যখন বড়লাট হইয়া এদেশে আসেন, তখন লেডি রেডিং (১নং) বলিয়াছিলেন, তিনি নাতি নাতিনীদের ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না এবং সেইজন্য স্বামীকে গদীতে আসীন দেখিয়াই বিলাতে যাইবেন, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, এদেশে আসিয়া তিনি লাট পত্নী হইয়া যে জাকজমকের আস্বাদ পাইয়াছিলেন, তাহার আকর্ষণ স্নেহের আকর্ষণ অপেক্ষা অনেক অধিক। তেমনই কংগ্রেসের সভাপতি যদি দিকে দিকে সম্বর্দ্ধনা লাভ করেন, লাটের কায়দায় তাঁহারও শোভাযাত্রা প্রভৃতি হয়, তবে তিনি দুর্ভিক্ষে ও বন্যায় প্রপীড়িত বাঙ্গালীকেই বা অব্যাহতি দিবেন কেন? সুতরাং তিনি বাঙ্গলায় আসিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, তিনি যদি বলিতেন, তাঁহার সম্বর্দ্ধনায় যে টাকা ব্যয়িত হইবে, তাহা দুর্ভিক্ষে ও বন্যায় বিপন্নলোকদিগের সাহায্যার্থ প্রদান করা হউক, তবে তাহাই উপযুক্ত কাজ হইত।

* * *

কিন্তু ঠিক এই সময়ে যখন বাটোয়ারা লইয়া বাঙ্গলা কংগ্রেসী বড় কর্ত্তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে, সেই সময় পণ্ডিতজীর কলিকাতায় আসার কি কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নাই? তাল খেলোয়াড় যেমন শেষে গোলাম তুরুপ্ করিয়া বোম্ করিয়া বসে, তিনি হয়ত তেমনই মনে করিয়াছেন যে, শেষ মহড়ায় আপনি হাজির হইয়া বাঙ্গালীকে কতকটা কাবু করিয়া ফেলিবেন। এখন দেখিবার বিষয়, সত্য সত্যই বাঙ্গলা আপনার সুচিন্তিত মত পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য কংগ্রেসী বড় কর্ত্তাদিগের গৃহীত মত গ্রহণ করে কিনা। সাম্প্রদায়িক সমস্যা বাঙ্গলায় যত প্রবল এবং যত ক্ষতিকর, তত আর কোথাও নহে, তাহা অবশ্যই বাঙ্গালীকে আর বলিয়া দিতে হইবে না। সুতরাং বাঙ্গালী হিন্দু আত্মরক্ষায় চেষ্টা করিবে, না কংগ্রেসী কর্ত্তাদের তুষ্টি সাধন করিবে?

* * *

কলিকাতায় জহরলালের অভ্যর্থনার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু শোভাযাত্রা যাঁহারাই লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন, ইহাতে অ-বাঙ্গালীরই কতটা আতিশয্য ও প্রাবল্য ছিল। অ-বাঙ্গালীদের মধ্যে এক শিখ ব্যতীত আর কেহই সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারায় পীড়িত হয় নাই। সুতরাং ব্যবসা ব্যপদেশে কলিকাতাবাসী বোম্বাইওয়ালা, মাদ্রাজী, পশ্চিমা, এমন কি উড়িয়াদিগের পক্ষেও সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা উপেক্ষা করিয়া কাজ করা সম্ভব, কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। আমরা আশা করি, বাঙ্গলায় আসিয়া জহরলাল বুঝিয়া যাইবেন, যে বাটোয়ারা জাতীয়তার বিরোধী, বাঙ্গলা কখনই তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিরত হইবে না এবং সেই শিক্ষা ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রদেশকে বাঙ্গলার সম্বন্ধে অধিক শ্রদ্ধাশীল করিবে।

বন্ধুর পথের বন্ধু

ঘন কাঠিন্য রচিয়া শিলাস্তূপে
দূর হতে দেখি আছ দুর্গমরূপে।
বন্ধুর পথ করিনু অতিক্রম,
নিকটে আসিনু ঘুচিল মনের ভ্রম।
আকাশে হেথায় উদার আমন্ত্রণ,
বাতাসে হেথায় সখার আলিঙ্গন।
অজানা প্রবাসে যেন চির জানা বাণী
প্রকাশ করিল আত্মীয় গৃহখানি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিগত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে কবি-গুরু হায়দ্রাবাদে গিয়ে রাজ আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই সময় 'বানজোরা' পল্লীতে একটি ছোট পাহাড়ের সুশোভন গুহাবাসে তাঁকে দিন' কতক থাকতে দেওয়া হ'য়েছিল। গুহাবাসের নাম 'কোহিস্থান'। মুদ্রিত কবিতাটি সেই 'কোহিস্থান সম্বন্ধে রচিত।

কষ্টি পাথর

শ্রীবিষকণ্ঠ শর্ম্মা

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় নানাস্থানে 'পাখীর বাসা' বাঁধিবার চেষ্টায় আছেন বটে, কিন্তু ঝড়ে টিকিতেছে না। কার্ত্তিকের ভারতবর্ষে প্রকাশিত এই 'পাখীর বাসা' এর পূর্ব্বে কয়টী বৃক্ষে বাঁধার চেষ্টা হইয়াছিল? আমাদের যতদূর স্মরণ আছে, তাহাতে মনে হয়, এই গল্পটী 'চক্রবৎ' নামে গতবর্ষের শারদীয়া সংখ্যা 'স্বদেশে' একবার বাহির হইয়াছিল।

এক মুরগী দুইবার জবেহ করার নীতি শৈলজানন্দ কতদিন হইল অবলম্বন করিয়াছেন? দুন্দুভির সম্পাদকও আমাদের কাছে অভিযোগ জানাইয়াছেন যে, এইবারের শারদীয়া দুন্দুভিতে শৈলজানন্দের যে গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নাকি গত বৎসরের 'উত্তরা'র এক সংখ্যায় বাহির হইয়াছিল। [illegible] ব্যবসা!

*

শ্রীঅপরাজিতা দেবী বলিতেছেন,--

'ধব্‌ ধবে সাদা দুধের ফেণার মত
বিছানা পেতেছি জোড়া খাট জুড়ে আজ'

এতদিন সিঙ্গেল খাটেই বিছানা পাতা হইত, হঠাৎ আজ এই ব্যাপার কেন? কেন, কবির কথাতেই শুনুন—

তিনটি বছর বিলেতে কাটিয়ে আজ
ঘরের মানুষ ফিরে আস্‌ছেন ঘরে।

এই জন্যই—

মাথার বালিশে মরাল মিথুন আঁকা
রেশমী তোষকে বনবসন্ত ছবি;
তিনটি বছর এ'দিনের আশে থাকা,—
আজ চোখে তাই রঙীন ঠেকছে সবি।

কিন্তু দীর্ঘ বিরহের পরে মিলনের আশা পূর্ণ হইল না, তাই—

দামী শাড়ী পরা মহা এক জ্বালাতন;
গরমে ঘামেতে আড়ষ্ট হয়ে থাকা!
খুলে ফেলে বাঁচি কাণবালা কঙ্কণ
ফুলের মালাটা কেন যে খোঁপায় রাখা!
কেরে? ওঃহ! দাই? শোনদিকি এইধারে
ছাদেতে একটা মাদুর বিছিয়ে দে'তো!
এ গরমে কেউ বিছানায় শুতে পারে?
ঘরে শুলে আজ মরে যাবো গরমে তো!

কোথায় দুধের ফেনার মত বিছানা, আর কোথায় ছাদে মাদুর বিছিয়ে শয্যা! পুরুষরা কি নিষ্ঠুর!

*

স্কুল মাষ্টাররা নিরীহ প্রকৃতিরই হয় জানিতাম। কিন্তু কুমুদরঞ্জন মল্লিক এমন বেপরোয়া 'সাহসী' কবে হইলেন জানা ছিল না। তিনি বলিতেছেন—

এভারেষ্টের শৃঙ্গেতে নাচি
গঙ্গাসাগরে সন্তরি।
কুম্ভীর বাঘে ডাক দিয়ে যাই
ভ্রমি সুন্দরবন ধরি!

কিন্তু এভারেষ্ট অভিযানকারী দলের মধ্যে ত' তাঁহার নাম দেখিলাম না! তারপর—

খনির তলেতে রোশনাই করি
কন্দুক করি প্রাণটীকে,

তাহা হইলে কয়লা কুঠির দেশেও তাঁর যাতায়াত আছে। পাতালপুরীতে রোশনাই-এ বিলক্ষণ সাহস চাই! তারপরেই—

আল্প্‌ হইতে পিল্লারে পড়ি
আমি জানি, কতসুখ তাহে।

আমরাও জানি, অনেকদিন শরীরে তেল মালিশ করিতে হইয়াছে।

কাজি নজরুল ইসলাম বাঁচি গিয়াছেন। কিন্তু এদিকে যে মহাসঙ্কট উপস্থিত! তাঁহার "বিদ্রোহী" এখন 'স্ত্রী দ্রোহী' হইয়া উঠিয়াছে। এখন সামলায় কে? "পাকচক্রে" বনজায় ভাল বলিতেছেন—

চির স্ত্রীদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত
যবে কাকোচ্ছকুলের ক্রন্দন রোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবেনা,
এ্যাডালটরির কলঙ্ক কথা সম্পাদকেরা
ছাপিবে না,
স্ত্রীদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।

কিন্তু সম্পাদকেরা ছাপিবার পূর্ব্বে তিনি নিজেই যে সব কথা প্রচার করিয়া ফেলিলেন!

*

প্রবোধকুমার সান্যাল আজকাল 'শ্বশুর বাড়ী'র কথাই বেশী ভাবিতেছেন, আর ভাবিতেছেন অসবর্ণ বিবাহের কথা। 'সোণার বাংলা'য় তিনি যে গল্প লিখিয়াছেন, তার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কোন ইঙ্গিত নাই ত?

চাতিম চাতিম

শ্রীখাদীপ্রকুমার ঘোষ

মানবের রক্তে লেখা
মানবের জয়!
এই কি অজয়?

কলাপাটার ষ্টেটসম্যান আর মহাত্মা গান্ধীতে আজ কিছুকাল ধরে গভীর প্রেম তত্ত্বের চর্চ্চা চলেছে। মানুষের জীবন বেদে প্রেম বড় কি দণ্ড বড় এই নিয়ে তর্ক। "আমাদের আত্মার ধর্ম প্রেম" এই হচ্ছে মহাত্মাজীর কথা, কলাপাটা কিন্তু এই নিস্ফল প্রেমতত্ত্ব মেনে নিতে পারছেন না, কারণ মানুষের ইতিহাসের ১লা পাতা থেকে শেষ পাতা অবধি দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। সেখানে প্রেম কোথায়?

"হরিনাম কর রে চোরা
ঘরে দিস্‌নে সিঁধ"—
জ্ঞানের বোঁচকা টানে চোরার
চক্ষে নাহি নিদ!

* * *

সংসারে দু' চার শ' বছরে একবার অহিংসার বাণী প্রচার করতে বাবা বুদ্ধ আসেন, একবারই গৌর নিতাই জগাই মাধাই তারিয়ে যান; আর বাদ বাকি সব দু'শ নিরানব্বই বছর ধরে আসে সৃষ্টির আগল খুলে পিল পিল করে চোরার দল। কাজেই তাদের ঠেকাতে সে যুগে গদা তিরীপাল ও এ যুগে মাষ্টার্ড গ্যাস এবং পদ্ পদ্ হস্তে স্বয়ং নারায়ণকে অবতীর্ণ হতে হয়। কাজেই হিংসা চলে প্রেমের সাথে রেস দিয়ে এবং টক্কর মেরে। অতএব দেখা যাচ্ছে মানব-জাতির যথার্থ প্রেম তো বটেই, অধিকন্তু হিংসাও বটে; যে মানুষ হাসে সেই মানুষই রাগে, যে আজ আমার গলায় মালা দেয় সেই কাল আমাকে ডাইভোর্স কোর্টে খাড়া করে তালাক দেয়। দুনিয়ার রূপ হচ্ছে লাল, তাই লাল ঝাণ্ডা এ যুগের প্রতীক; এই লালে লাল দুনিয়া ছিটে ফোঁটা প্রেম যে নাই তা নয় তবে সেটা হচ্ছে,—

"বাঘের হাতে খঞ্জনীরে ভাই
ভেড়ার চক্ষু রাঙা,
প্রেমের ভেঁপু উলটে নিলেই
কসাই চাচার ঠ্যাঙা।

* * *

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রেম ও হিংসা একই বস্তুর এ পিঠ আর ও পিঠ; কানুর পাশে শ্রীরাধার মত কালীর কাণার রক্তধারার পাশেই প্রেম ফোটে ভাল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা চাল কলা আহার করলেও কমনসেন্সে ছিলেন টন-টনে জ্ঞানী, তাই লাইফ ফোর্সকে একদিকে মড়ার মাথা ও খাঁড়া দিয়ে এবং অন্য দিকে বর অভয়ে সাজিয়ে দু'য়ের সমন্বয় করেছিলেন! নীতি-বাগীশরা সত্যের এই পরস্পর বিপরীত মূর্ত্তির রহস্য বুঝতে পারে না। পুণ্যের মোহ—ভালর ক্যাঙলামো তাঁদের ভূতের মত পেয়ে বসে। তখন জীবনের তে-বাঁকা কানুকে ধরে তাঁরা সোজা করবার দুর্দ্ধর্ব চেষ্টায় টানা-টানি করতে থাকেন। অনেক টানাটানির পর ছেড়ে দিলেই আবার প্রেমের বাঁকা ঠাকুর—জীবন বেদের এই ইটারন্যাল কুঁজো তুম আবার যে ব্যাঁকা সেই তেব্যাঁকাই হয়ে যায়। মোহমুক্ত না হলে সুতরাং এই হিংসা অহিংসার সাইটসেরার থেকে উদ্ধার নেই।

মহাত্মাজী খুব ভাল মানুষ, কিন্তু যে দুনিয়াকে ভাল করতে চান সে এক বেয়াড়া চিজ। সাধুদের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্ট দর দমনের জন্য স্বয়ং নারায়ণ বার বার মাছ, কচ্ছপ, শূকর থেকে করুণার মূর্ত্তি বুদ্ধ অবধি রূপ নিয়ে শতেক দুর্গতি ভোগ করেও যার কিছু করতে পারলেন না তাকে নিরীহ মহাত্মাজী সোজা করবেন কি করে? স্বয়ং প্রেমাবতার গৌরাঙ্গদেব বঙ্গের বাঘকে হরিনামে নাচিয়ে যেই লীলা সম্বরণ করলেন অমনি শাক্তকুল নরকুল ধ্বংসে লেগে গেল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিকই বলেছিলেন, "গঙ্গাস্নান করতে নামলেই পাপগুলো গাছে উঠে বসে থাকে, স্নান করে ফিরে যাবার পথে তারা আবার মানুষের ঘাড়ে চাপে। তাই বড় দুঃখে গোপীরা গেয়েছিল:—

"নিপট কপট তুয়া শ্যাম
হা—রে"

তাই বড় দুঃখে প্রাজ্ঞ প্রেমিক সুর তুলেছিলেন, "প্রেম যদিগো করতে হয়, মানুষেরই সাথে নয়।" কারণ মানুষ হচ্ছে ব্যাঘ্রাদপি ভয়ঙ্করঃ!

* * *

আমরা এমনি প্রচণ্ড প্রেমিক, যে, আমাদের সব উঁচু আদর্শগুলোই ভ্রাতৃবধের হাড়িকাঠ হয়ে দাঁড়ায়। সাম্যবাদের আদর্শ মনে আসা মাত্রই আমরা লেগে যাই ঝাড়ে বংশে ধনিকবধে। রামপ্রসাদ ঠাকুর দুঃখ করে বলেছিলেন—

"মন তুমি কৃষিকাজ জান না,
এমন মানব জমি
রইলো পতিত—
আবাদ করলে ফলতো সোনা।"

তিনি জানতেন না এ জমিনের এমনই গুণ যে, এক্ষেত্রে প্রেমের অমৃতবীজ রোপণ করলে হিংসার শেয়াল কাঁটা হয়েই তা জন্মায়। সুতরাং আত্মার ধর্ম প্রেম বলতে ও শুনতে খুব মুখরোচক ও শ্রুতিমধুর কিন্তু কার্য্যতঃ একটি বিরাট ভুয়া কথা। তবে কি মানুষ প্রেম বিনা যে বাংলায় যত লপেটা বাবড়ী ও শিথিল কবরী, যত পল্লী সাহিত্যিক ও প্রগতিচক্রেরা বেকার হয়ে মারা যাবেন।

* * *
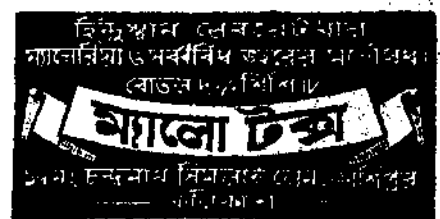
আসল মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে, জীবনটা শুধু প্রেম নয়, শুধু কাম নয়, শুধু দ্বেষ নয়, ওটা নব রসের সমন্বয়—উনপঞ্চাশ বায়ুর জগা খিচুড়ি, সেইটুকু সনাতন সত্য মেনে নিলেই আর কোন গোল নাই। সুতরাং এই ভিক্টোরিয়া(?) মেমোরিয়াল(?)-এর এই ভবের চিড়িয়াখানায়—

"যব্ যেইসা তব্ তেইসা হোকর্
সদা মগনমে রহো জী
হাঁ জী হাঁ জী করতে রহো
দুনিয়াদারী দেখো জী

এই হচ্ছে সার সত্য। এই ভবের চিড়িয়াখানায় গরুর হাউসে ঢুকলে মনের আনন্দে করবে "হাম্ হাম্", অশ্বতর বা গর্দ্দভের ঘরে ঢুকলে করবে "ভ্যাঁ-হ্যা-হ্যাঁ-হ্যাঁ", সারমেয়ের খাঁচায় ঢুকলে করবে কেঁউ কেঁউ ঘেউ ঘেউ, পক্ষী কোটরে ঢুকলে করবে "চিকির মিচির—কা কা—কুহু কুহু"। তা' যদি না করতা' হলে ওরা তোমাকে [illegible] [illegible] [illegible] ঢুকবে, একেবারে [illegible] করে দেবে। যব যেইসা তব তৈইসা না হলে আর উপায়ান্তর নেই তাকা; আর [illegible] শান্তি। সত্য কথন ও সদাচার এ রাস্তায়ে [illegible] মনের কথা বলার মনের মানুষ এ পাগলা গারদে বিরল। বিড়লা ভবনে তোমাকে যেতে হবে শাল দোশালা উড়িয়ে জরিদার টুপি পরে আর সাম্যবাদীর হাটে তোমাকে যেতে ছেঁড়া কাঁথা রুক্ষ মাথা নিয়ে, তবে পৈত্রিক প্রাণটা থাকবে। এই আকাট ইডিয়ট লেখকের অবস্থা দেখে পাঠক পাঠিকা অবহিত হোন, সত্য কথা আর মনের কথা বলতে গিয়ে এই বৃদ্ধ ধনে প্রাণে মারা গিয়েছে।

জীবন বীমা

ভারত ইন্সিওরেন্স

পাঠক বোধহয় অবগত আছেন, ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী নূতনভাবে সংগঠিত হইয়া নবোদ্যমে কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। 'ভারতে'র উপর দিয়া বড় বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এত বড় কোম্পানী বলিয়া ইহার দৃঢ় ভিত্তিকে শিথিল করিতে পারে নাই।

লালা হরকিষণ লালের পরিচালনাধীনে যখন ভারত যেভাবে অগ্রসর হইয়াছে, উক্ত কোম্পানী কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ইহার বিরাট তহবিলের সামান্য অংশ মাত্র। তাহাতে কোম্পানীর পলিসি হোল্ডারদের কোনই চিন্তার কারণ নাই। পলিসি হোল্ডারদের দাবী মিটাইয়াও এখনও ৩৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত আছে। ভারত ইন্সিওরেন্স সম্পর্কে লালা হরকিষণ লালের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিয়া আর লাভ নাই। সকলেই শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে ইন্সিওরেন্স-জগতের বিচক্ষণ ডাঃ এস, সি রায় মহোদয় ভারতের ডিরেক্টর-ইন-চার্জ্জ হইয়া স্থানীয় অফিসের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ রায়ের পরিচয় দেওয়া মানে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। তিনি নিউ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্সের ব্রাঞ্চ ম্যানেজাররূপে যে কর্মশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহার প্রশংসা সকলকেই করিতে হইবে। তিনি প্রসিদ্ধ বীমা পত্রিকা 'ইন্সিওরেন্স এণ্ড ফাইনান্স রিভিউ'র ম্যানেজিং এডিটর। তদুপরি "ফাইভ ষ্টার" নামেও একখানি ব্যবসা সংক্রান্ত পত্রিকা তাঁহার পরিচালনাধীনে প্রকাশিত হইয়াছে।

ডাঃ রায় ভারতে যোগদান করিয়াই যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে সর্ব্ব বিভাগে মনোযোগ দিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, ভারতের সেই লুপ্ত গৌরব অচিরেই ফিরিয়া আসিবে। ডাঃ রায় ফিল্ড ওয়ার্কারদের নিকট যে সার্কুলার প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠে জানা যায় যে, ভারত ইন্সিওরেন্স ভারতের প্রথম শ্রেণীর ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলির অন্যতম। ইহার মজুদ তহবিলে মোটা টাকা আছে। তাছাড়া ইনভেষ্টমেণ্টও খারাপ নহে—ইনভেষ্টমেণ্ট হইতে কোম্পানীর আয় বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকার উপর।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারত ডাঃ রায়ের মত ব্যক্তি পাইয়া বিশেষ লাভবান হইয়াছে। কারণ তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আর পাওয়া যাইত কিনা সন্দেহ।

শারদীয়া অবকাশান্তে এই আমাদের প্রথম আত্মপ্রকাশ। আমাদের সহৃদয় পাঠক, অনুগ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি ৺বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।

কার্য্যাধ্যক্ষ,

—"স্বদেশ"—

বীমা তদন্ত কমিটী

ভারতীয় ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের দুইজন ভাইস প্রেসিডেণ্ট, শ্রীযুক্ত আই, বি, সেন এবং শ্রীযুক্ত এস সি রায়, ভারত গভর্নমেণ্টের ইন্সিওরেন্স কনসলটেটিভ কমিটির সদস্য নির্বাচিত হওয়ায়, তাঁহাদের অভিনন্দনের জন্য বঙ্গীয় ন্যাসনাল চেম্বার অব কমার্স সভার হল গৃহে, ভারতীয় ইনস্যুরেন্স ইনষ্টিটিউট এবং ভারতীয় ইনস্যুরেন্স কোম্পানী সমূহের ফিল্ড ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশনের সমবেত উদ্যোগে এক অভ্যর্থনা সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

মিঃ আই, বি সেন

ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি সভার প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত ডি পি খৈতান এই সভার সভাপতি হন। তিনি ইনস্যুরেন্স আইন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকারের জটিল সমস্যার বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বদেশী ইনস্যুরেন্স সংরক্ষণের আবশ্যকতার বিষয় বুঝাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত এইচ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুত এন প্রামাণিক ইনস্যুরেন্স ব্যবসায় ও কর্ম্মী সম্পর্কিত বিবিধ সমস্যার উল্লেখ করেন।

শ্রীযুত সেন ও শ্রীযুত রায় দিল্লীতে বৈঠকে যোগদান করিতেছেন।

মিঃ এস, সি রায়

বাস্তবের তিন পৃষ্ঠা

(গল্প)

শ্রীরামেন্দ্র কুমার দেশমুখ্য

থার্ড ইয়ারের প্রথমার্দ্ধেই দীপঙ্করের পাঠ্যজীবনে বিপর্য্যয় নেমে এল। বেচারার পোষ্টগ্রাজুয়েট হ'বার কামনাচ্ছন্দে আকস্মিক বিপ্লব তা'কে খুবই ব্যথিয়ে তুল। ছন্দে প্রাণপ্রতিষ্ঠা সে যে আবার না কর্ত্তে চেয়েছিল এমন নয়, কিন্তু আগুনের তেজে ঝলসে-পড়া পুষ্পশাখার বিকাশোন্মুখ ফুলটী যেমন করে আর মদালস যৌবনকে তা'র সাদর অভিনন্দন জানাতে পারেনা, তেমনিভাবে দীপঙ্করের কামনাকলিও ব্যর্থ অনুরাগ জানিয়ে, কৈশোরেই প্রকাশমানতার পথ থেকে বিশ্রাম নেবার আয়োজন করে। সে বেচারা মধুর প্রভাতীস্বপন দেখে মিষ্টি ঘুমের আমেজটুকুও কাটিয়ে পথ চলেছিল। এ্যাদ্দিন পর্য্যন্ত ওর মনে প্রভাতীস্বপন কামনার রাঙাছোপ চোখে সার্থক-পরিণতির প্রতীক্ষা কচ্ছিল;—অকস্মাৎ আজ বাস্তবের রুঢ় দুর্ব্বাসা তা'কে বিপ্রলব্ধ, বিক্ষুব্ধ করে ব্যথার জগতে আহ্বান পাঠালে,—এসো বন্ধু।

যেদিন ওর পাঠ্যজীবনে বিপর্য্যয় নেমেছিল,—সেদিন আকাশের জীবনেও ছিল বিপর্য্যয়। ওর অন্তরের সঙ্গে সমান তাল রেখে আকাশও ক্রন্দনের বেগে ছন্দের খোরা খুলে দিয়েছিল। মুখর হয়ে উঠেছিল ক্রন্দসী সহানুভূতিতে। কালকূটের গরলে নীল বুকটা ঢেকে সমস্ত প্রদীপ্ত, হৃদয়ে আনন্দ সংহৃত হয়েছিল ওর।

...কী মেয়েয়া ... ওর জ্ঞানবুদ্ধি হ'বার আগেই তিনি পরপারে যাবার জন্যে নৌকায় উঠেছিলেন। বাড়ি-ঘরের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করে, নামতে হয়েছিল তা'কে সাগরের বুকে,—নীলমৃত্যুর আবর্ত্তে। ওপারে পৌঁচেছিলেন কিনা জানিনে, তবে যদ্দুর পেরেছি—আঁখিতারার আলোর সার্চ্চ করে দেখেছি,—তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন। তারপর একসময় দৃষ্টির সীমারেখার বাইরে মহানীলায় মিলিয়ে গেলেন। সেপারে যাওয়া হ'ল কিনা জানিনে, কারণ অতটুকু খোঁজ নিতে পারিনি;—ওদিকটা রইল রহস্যময়।

আশ্চর্য্য লাগে সত্যি—দীপঙ্করের বাবা কেমন করে ওর মাকে ঐ অপরিচিতের, অপরিমিতের আবেষ্টনীতে একা ছেড়ে দিলেন। বলতে হয়—মানুষটা ছিলেন বড্ড উদাসীন গোছের। মানুষের দিকে চাইবার তার সময় নেই। নিজেকে তিনি সারাক্ষণই ডুবিয়ে রেখেছেন তা'র কেমিক্যাল লেবরেটারীতে। রসায়নবিৎ কিনা। সেদিন কি একটা রসায়নিক সংমিশ্রনের ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে ওর লেবরেটারীতে বিস্ফোরণ হ'ল। ফলে তা'কেও নৌকো করে স্ত্রীর অনুসরণ কর্ত্তে হ'ল। তবু ভাল;—ভাবি, একলা স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে কেমন করে তিনি এ্যাদ্দিন নিশ্চিন্ত ছিলেন। এখন তবুও খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু যদি সেখানে গিয়ে খুঁজে না পান ওকে। অগণিত অপরিচিত এবং অপরিচিতার ভিড়ে যদি স্ত্রীর নির্দ্দেশ না পান;—থাকগে ওসব ভেবে আমাদের লাভ কি? যদি পরপারে যাই কোনদিন—তবে না হয়, সমুদ্রের তীর ধরে ক্যাপার সঙ্গে স্ত্রীর গমন-পথের সন্ধান নেব।

* * *

মাসখানেক পরের কথা। দীপঙ্কর চা খেয়ে ঝিলমিলি পড়ছিল। ওকে অনার্স নিয়েছে কিনা, তাই পড়ছিল আজ আর দিনের মতো। বাইরে আজ শ্রাবণের অক্লান্ত বর্ষণ নেমেছে। জানালা দিয়ে দেখা যায়—পাতায় ভরা শিমুলে আমগাছের মাথায় অর্দ্ধেকটুকু। সবুজিমা ওর সব পাতারই ফুরিয়ে গিয়েছে। অকালে যৌবন ডাক দিয়েছে বার্দ্ধক্যে। ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় নীরন্ধ্র কালো আকাশ। পাতার রঙে আর সজল মেঘের রঙে মেশা একটা সুস্পষ্ট সামঞ্জস্য ঝরে পড়ছে...।

দীপঙ্করের মন ছিল বইয়ের পাতায় গোপন মণিকোঠায়; যেখানে বন্দিনী রাজকন্যা শুয়ে আছেন অজস্র, অপরিমিত রূপ, রস, গন্ধ নিয়ে। ওর মুখে চোখে ফুটে উঠেছে গভীর উৎকণ্ঠা। তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে কখন আসবে রাজপুত্র তা'কে মুক্তি দিতে...।

বৌদি এসে ঘরে ঢুকলেন ওর। দীপঙ্কর তখন তন্ময় হয়ে পাঠ পড়ে যাচ্ছে, আর প্রশ্নের সমাধানের পথ ধরে হয়ত রাজকন্যার সেই গোপন মণিকোঠায় ঢুকে পড়েছে ততক্ষণে। বৌদি এগিয়ে গেলেন।

—শুনছ ঠাকুরপো!

দীপঙ্করের ততক্ষণে একনিষ্ঠতা ভেঙে গেছে। রাজকন্যার দোর থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে। দীপঙ্করের বুকখানা হাহাকার করে উঠল। ফিরে চাইলে বৌদির দিকে। হাসছেন তিনি। দীপঙ্করের মুখে চোখে বিরক্তির আর ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠল। কর্কশ কণ্ঠে উত্তর পাঠালে,—কিছু বলছ?

হাস্যতরল কণ্ঠে উত্তর আসল,—না ভাই, বলিনি, বলব এখন।

—দেরী হয়ে যাচ্ছে। মণিকোঠার যাবার পথ থেকে সরে সে অনেকদূর এসে পড়েছে। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অনেক

পথ—কৃপাভিখারীর মত। বাড়িতোর কাছে যাবার পথ ঠিক ঠাওর কর্ত্তে পার্চ্ছে না সে। হায়। হায়। সে এবার মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল,—বলবে কি-না? ন্যাকামির সময় নয় এখন।

গূঢ় বসন্তের মায়ামধুর স্নিগ্ধতায় আষাঢ়ের গাম্ভীর্য্য নেমে এল। আচ্ছন্নতা একটু কাটিয়ে বৌদি বল্লেন,—সত্যি ভাই ফিলজপার, তোমরা বড্ড খিটখিটে মেজাজের লোক। একটুকুতেই রাগ করে নাও। চলে যাব তা'হলে। বলতে এসেছি যা বলা হ'বে না।

—স্বচ্ছন্দে বলে যেতে পারো,—বলে দীপঙ্কর আবার ত'ার ফিলজপির কঠিন প্রশ্ন-সমাধানে মন দিলে। কিন্তু ঘুলিয়ে যেতে লাগল সব কিছু। দূত্তোর, বলে হাতের বই ফেলে দিয়ে সে দোরের দিকে চাইলে। বৌদিকে তখনও দাঁড়িয়ে দেখে সে খুবই আশ্চর্য্য অনুভব কর্লে। একটু হেসে বল্লে,—বৌদি ফিলজপার ভাইকে কি ক্ষমা কর্ত্তে পার্ব্বেনা একটুও।

বৌদির জলে-ভরা চোখ থেকে এখনও জল পড়েনি। এবার দীপঙ্করের কথায় তাই নেমে এল।—যাচ্ছি ভাই, কিন্তু যাবার আগে বলে যাচ্ছি, যে ফিলজপিকে ভালবেসে তুমি আমায় এমনধারা অপমান কর্লে,—সে ফিলজপির সঙ্গে ভাবরাখা তোমার আর বেশীদিন চলবেনা! বৌদি ঝড়ের বেগে ঘর থেকে চলে গেলেন। দীপঙ্কর চেঁচিয়ে উঠল,—বৌদি ও বৌদি শোন একটু! কিন্তু বৌদি ততক্ষণে হয়ত' বালিসের ওপর মুখ বুজে বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিয়েছেন।

মাটীর ওপর ফোঁটা কয়েক চোখের জল পড়েছিল। দীপঙ্কর ওদের পাশে এসে দাঁড়ালে। চেয়ে চেয়ে মন উঠল ব্যথিয়ে। গাছ থেকে ফলচ্যুত কথার মত সেই তো বাণী। সত্যি, কেন এমন ওর মনটা খেঁকিয়ে উঠেছিল। অনুশোচনা, তীব্র অনুশোচনার ভেতর থেকে সে বাণীগ্রহণ কর্লে—বৌদির নিকট ক্ষমা চাইতেই হ'বে।

বারান্দার মোড় ঘুরতেই দাদার সঙ্গে দেখা। গম্ভীর স্বরে তিনি বল্লেন,—এসো তো দীপু, এদিকে একটু। দীপঙ্কর এগিয়ে এলো। দাদা বল্লেন,—কোনদিনই যা ইচ্ছা ছিলনা তোমা'য় বলতে, ভাগ্যের ফের তা'তেই আমায় বাধ্য করছে। জানোই তো বাবা যদ্দিন ছিলেন, তদ্দিন তোমার কলেজে পড়ার সীমারেখা টানবার দরকার হয়নি। কিন্তু এখন যা দাঁড়িয়েছে সংসারের অবস্থা, এতে কি করে তোমার কলেজের খরচ চালানো…। তাই বলছিলুম।

দীপঙ্কর মাথা হেট করে দাঁড়িয়েছিল, বল্লে ধীরে,—তা'হলে থার্ড ইয়ারটাও শেষ করে উঠতে পার্ব্বো না?

—কি কর্ব্ব ভাই নইলে—'।

দীপঙ্কর কোন কথা বল্লেনা। মন্থরচরণে বৌদির দোরের দিকে এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু বৌদির কাছে আর পৌঁছান হ'লনা। সে ফিরে এল তার নিজের ঘরে। বৌদির পূর্ব্বতন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের সুস্পষ্ট অর্থকে এবার সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। পেছন থেকে দাদার কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল—দীপু একটু দাঁড়াও।

সে কিন্তু দাঁড়ালোনা। যেন শোনেই নি এমন ভাব দেখিয়ে চলে এল। কি আর তিনি বলবেন। দুর্দ্দিনের জন্য চাকুরীর কথাই উল্লেখ করবেন হয়ত'। থাকগে, সে চলে এল।

নিজের কোঠায় এসে সে ধপ করে বিছানার ওপর বসে পড়ল। এতটুকু পথ এসেছে সে অতিকষ্টে। খোলা জানালা দিয়ে আর বর্ষার রূপ কিছুতেই ওর মনকে আকর্ষণ কর্ত্তে পার্চ্ছিল না। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সে দেখছিল, তার ভবিষ্যতের রঙফলানো ছবির ওপর কে যেন কালি মাখিয়ে চলছে;—আর সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। সে চমকে উঠল আচমকা। সত্যি—তা'হ'লে তার প্রতিমুহূর্ত্তে সর্ব্বনাশ

হ'য়ে যাচ্ছে। জীবন নাটক তাঁ'র 'ক্লাই-ম্যাক্সে' এসে দাঁড়িয়েছে। দুপুর বেলায় আর কলেজে গেল না সে। নিজের কোঠায় বসে সপ্তাহখানেক আগের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান নিয়ে নাড়া চাড়া কর্ত্তে কর্ত্তে তাঁ'র মনে হ'ল—হঠাৎ সে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। তা'হলে কলেজ ষ্টুডেন্টদের পর্য্যায় থেকে বেকারযুবকে মাত্র চারঘণ্টার মধ্যেই পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে ! তা'হলে এখন সিল্কের পাঞ্জাবী ছেড়ে, ছেঁড়া টুইলের সার্ট গায়ে দিতে হবে। জুতোর বাঁধন থেকে পাকে দিতে হবে সম্পূর্ণ মুক্তি। ময়লা কাপড় পরে চাকুরীর আশায় বড়-লোকের উমেদারী করাই তার পেশা। মন্দ নয়।—"হোঃ-হোঃ"। সে নিজের মনেই হেসে উঠল। খুব কৌতুকের জিনিষ যেন দেখেছে সে। খোলা ষ্টেটস্‌ম্যানটার বিজ্ঞাপনের কলমের ওপর চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে শেষের দিকে চোখ তার স্থির হয়ে দাঁড়াল। স্পেশাল ক্লার্ক চাচ্ছেন সম্ভ্রান্ত বণিক একজন। মাইনে কুড়িটাকা। শিক্ষিত এবং ভদ্রযুবকেরই প্রয়োজন। টেবিলের ওপর থেকে ঝর্ণা কলমটা তুলে নিয়ে দীপঙ্কর এ্যাড্রেসটা লিখে নিল। চাকুরী যখন শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তেই হ'বে,—তখন এটা পেলে মন্দই বা কি ? আর কলকাতায় গেলে পরে ওটা না পেলেও অন্য একটা ব্যবস্থা করা যাবে সে ভাবলে। কিন্তু টাকা ! টাকার যে স্বাচ্ছন্দ্য নেই তেমন। বিদেশে গেলে পরে কিছু অর্থবলও তো চাই। সে ভাবলে বৌদির কাছ থেকে অন্ততঃ দশটা টাকা ধার করে নেবে। আর কিছু তো তাঁ'র নিজের আছেই।

* * *

[illegible] টাকা, আর তাঁ'র নিজের কিছু সঞ্চিত অর্থ সম্বল করে সে [illegible] এল কলকাতায়। শ্যামবাজারের দিকে ওর এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় থাকেন। সেখানে এসেই সে উঠলে। ওরা গরীব সত্যি। তবু আত্মীয় তার নিকট থেকে আদর আপ্যায়নের ত্রুটী হ'লনা মোটেই।

দীপঙ্কর চা খেয়ে পরের দিন সকালের দিকে পথে বেরিয়ে পড়ল। সম্ভ্রান্ত বণিকের বাড়ীটা যখন বের কর্ল্লে, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। গেটের ধারেই পেলে ওর বয়সী দুজনকে,—কথা বলছে। ডায়োলোগ ওদের সীমারেখায় আসছে না দেখে সে ওদের উদ্দেশ করে ডাক্‌লে,—শুনুন।

সৌখিন তরুণটী গ্রীবা বাঁকিয়ে বল্লে—কা'কে দেখতে বলছেন।

—আপনাকেই। রাধাকমল বাবুর বাড়ী তো এটাই।

—হ্যাঁ।

—উনি কি বাইরে আসবেন এখন ? বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

—আমাকে তা'হলে জানাতে পারেন বিশেষ প্রয়োজন টুকু।

—আপনি ?

—ওঃ আমি তারই জ্যেষ্ঠপুত্র।

—নাঃ,—তা'হলে আর জানাতে [illegible] নেই। আপনাদের এখানে নাকি স্পেশাল ক্লার্ক একজন রাখা হ'বে। তা' বাহাল হয়ে গেছে নাকি কেউ সেখানে ?

তরুণটী হাত দেখিয়ে বল্লে,—এই ইনিই বাহাল হয়ে গেছেন, আজ কিনদিন ধরে।

দীপঙ্কর আর দাঁড়ানো সঙ্গত মনে কর্ল্লনা। ফিরে চল্ল। পেছন থেকে প্রশ্ন, আগল,—বলে গেলেন না যে কিছু। দীপঙ্কর ফিরে না চেয়েই বল্লে,—আমার কিছু বলার প্রয়োজন সেরে নিয়েছি। সে পথ চল্লো। পেছন থেকে বিদ্রূপের হাসি এসে ওর কাণে তরঙ্গ তুল্লে।

আশাভঙ্গে মর্ম্মাহত হ'ল না সে খুব বেশী করে। না পেলুম ভাল;—দেখা যাক এখান থেকে পড়ার কোন সুবিধে করে উঠতে পারি কি-না। কোথাও খাবার এবং থাকার বন্দোবস্ত করে না হয় টিউশিনিতে মাইনে চালানো যাবে। আর বই ? কলেজ লাইব্রেরী এবং সহপাঠিদের সাহায্যে বইগুলোকে যাযাবরের জীবনের পর্য্যায়ে এনে ফেলা যাবে। হঠাৎ দীপঙ্কর হেসে উঠল আপন মনে। অর্থহীনের পক্ষে অজ্ঞাত আবেষ্টনীতে বি,এ পড়া কি সোজা ব্যাপার। দু'চারজন হয়ত পথ চলতে ওর

হাসি লক্ষ্য করে। কিন্তু কেউই কিছু জিজ্ঞেস করে না ওকে। ওরা নিজেরাই একটু হেসে নিয়ে একটু আরাম উপভোগ করে।

বাড়ীতে ঢুকতে যাবে, ভেতর বারান্দা থেকে নারীকণ্ঠে আপত্তি এবং অনুযোগের সুর ভেসে উঠল।—নিজেরই যখন চলছেনা তখন ওকে আবার জায়গা দিলে কেন? পুরুষকণ্ঠে অনুরোধ জাগল,—না-না ওকে ওসব শুনাতে যেওনা কিন্তু। দুদিন থেকে অমনিই চলে যাবে।—হ্যাঁ, অমনিই চলে যাবে—অবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে নারীকণ্ঠে।

দীপঙ্কর সব বুঝলে, তাকে নিয়েই সব অভাব অনুযোগের সূত্রপাত। দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ স্থাণুর মত। কত চিন্তা তার মনের ভেতর ভিড় করে যেতে লাগল। সেই তাহলে অভাবকে বাড়িয়ে তুলেছে।

মাথা নত করে সে ঢুকে পড়লো। লজ্জাশীলা নারী তৎক্ষণে গৃহান্তরে সরে পড়েছেন। আত্মীয়টী ওর হাতে পাখাখানা তুলে দিয়ে বল্লেন, আফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমি তাহলে আসি, খাওয়া দাওয়ার কোন ত্রুটী রেখোনা যেন।

দীপঙ্কর ম্লান হাসি হাসে। আত্মীয়টী চলে গেলেন। সে আর বসে না, পাখাটী বিছানার ওপর রেখে ঘরের কোণা থেকে তার স্যুটকেশটী বের করে আনে, তারপর ঘর্মাক্ত কলেবরেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। কেউ দেখল কি-না, এ নিয়ে মাথা ঘামানো সে নিষ্প্রয়োজন মনে করে।

সারাদিন রোদে পুড়ে স্যুটকেশটী বয়ে বয়ে সে শেষে ছোট্ট একটী মেসে অস্থায়ী বাসের বন্দোবস্ত করলে। চোখ ঘুরিয়ে দেখলে মেসে যে কজন আছেন, সকলেই অর্দ্ধভুক্ত তা অনুভবে বুঝল। নইলে এমন স্যাঁৎসেতে মেসে—রামঃ, লোক আসে। অবিশ্যি কৃপণ সম্প্রদায়ের কথা আলাদা। তাদের গরীব ধনীর কোন পর্য্যায়েই আনা যায়না। মেসের সংস্কার হয়নি অনেক দিন ধরে। দারিদ্রের চিহ্ন সবদিকেই সুপরিস্ফুট।

সন্ধ্যার পর রুমমেট্ ভদ্রলোকটীর সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোক কাঁচা পাকা ওর অসংস্কৃত গোঁফদাড়িতে হাত বুলিয়ে অনেক অবান্তর কথাই বলে গেলেন। দীপঙ্কর যে খুব আরাম পেলে ওসব শুনে এমন নয়। বিকেল বেলা চায়ের কাপটী যেমনতর আরাম দেয় তেমি। শীতের রাতে, গরম উষ্ণমধুর চায়ের মতন নয়।

রাত্রিতে খেয়ে দেয়ে রুমমেট হলধর বাবুকে জানালে—যদি তিনি দয়া করে এবং কিছু চেষ্টা নিয়ে ওর জন্যে কিছুর সংস্থান করে দেন, যাতে করে

মাষ্টারবাবু, বাবা বলেছেন, আপনি নাকি সকাল বেলা পড়ানোর ব্যাপারে অনেক ত্রুটী রেখে গেছেন। তিন ঘন্টার জায়গায় চলে গেছেন একঘন্টায়। কাল থেকে যেন আর আপনি না আসেন। দীপঙ্কর আশ্চর্য্য, বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। বিষিয়ে উঠল ওর মন ঘৃণায়। ওর ওষ্ঠ-পুটে কাঁপনের তালে বাণী জাগল,—ছেঁপো মেয়ে।

স্খলিত চরণে রাস্তায় নামলে। বুঝলে যে ঐটুকু তারই ত্রুটী নয়। বোধ হয়, তার চেয়েও কম মাহিনায় ঐ তরুণটী স্বীকার করেছে এই দাসত্ব। অনুকম্পায় ওর মন ভরে উঠল তরুণটীর জন্যে।

জলধরদা বিছানায় আসন করে স্তিমিত নেত্রে কারো ধ্যানে মগ্ন ছিলেন হয়ত'। তা'কে দেখেই ধ্যান ভঙ্গ করে সাশ্চর্য্যে বলে উঠলেন,—বাঃ, এত সকা-লেই যে চলে এলে?

ম্লান হাসি হেসে দীপঙ্কর বল্লে,—আর চলে এলুম;—ও টিউশানিতে ইস্তফা দিয়ে এসেছি।

—বলো কি? ভদ্রলোক মোটা চোখ করে ওর সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

দীপঙ্কর কোন কথা না বলে, কোণার দিকে এগিয়ে গিয়ে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে, এক চুমুকে নিঃশেষ করে দিলে। তারপর সুটকেসটা খুলে [illegible] গায়ে জড়িয়ে বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে পড়ল।

—বাঃ শুয়ে পড়লে যে এত সকাল, কোন অসুখ বিসুখ করে নিতো?

[illegible] দীপঙ্কর বল্লে,—হুঁ। একটু জ্বর এসেছে বলে মনে হচ্ছে।

—জ্বর এসেছে! কোন অনিয়ম করোনি তো?

—না, তবে সারাদিন হাটতে হয়েছিল কি না। দুপুর বেলায় খাবার সময় তাই করে উঠতে পারিনি। খেয়েছি বিকেলের দিকে। মাথায় আর গায়ে একটু জল ঢেলে বাসী ঠাণ্ডা ভাতগুলোই গিলেছি।

—তা' হ'লেই হয়েছে। বাসী ভাত-খেয়েই আমার সেবার—। ভদ্রলোক নিজের কথাই বলে চল্লেন।

—দীপঙ্কর পছন্দ কর্লেনা ওর আত্ম-চরিত শোনা। সে পেছন ফিরে শুলে।

ঘুম যখন প্রস্তাব বিস্তার করে ফেল, তখন সে গেল ফিলজফিতে ফার্ষ্ট ক্লাশ এম্ এ পেয়ে তা'দের সহরে ফিরে। খুব বড় একটা চাকুরী পেয়েও;—তা' না গ্রহণ করে ওদের কলেজের প্রোফেসার হ'ল। ওর কিশোরের স্বপ্ন হ'ল সফল। বৌদি হেসে ওর কাছে এসে বল্লেন,—আমার কথা ভুলে নিলুম ভাই। ফিলজফির সঙ্গে তোমার ভালবাসা অটুট থাক। তোমাদের গভীর ভালবাসায় আর কখনো বাধা দিতে যাই, তবে বলো।

'প্রতারণা'

(গল্প)

শ্রীলীলাময় বসু

ঘণায়মান অন্ধকারে ঘরের শুভ্রতা ম্রিয়মান। বিষন্ন আবহাওয়ায় একটা রহস্যের আবরণ। সোফায় তারা ও সুরেন মৌন বিষন্নমুখে সাম্‌না-সাম্‌নি বসে, কেউ বড় একটা কথা কইবার সাহস পাচ্ছে না। পাশের জানালা দিয়ে বাগান থেকে অমনি ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে।

আচম্বিতে সুরেন উঠে দাঁড়ালো, বললে: এবার চলি?

তারা তার হাত ধরে বসিয়ে দিলে, পরে পাথুরে গলায় বল্লে: আর একটু বসো? তর্ক নাই বা করলে, দুটো কথা বলো? বলে উঠে গিয়ে সুইচটা অন করে দিয়ে এলো। ঝরঝর আলোর চাঞ্চল্যচূর্ণ ছড়িয়ে পড়লো। সেই—বিস্তৃত আলোর মাঝে সুরেন একটু ছটফট

করে উঠলো, বললে: আবার নতুন করে সুরু করবে না কী?

তারা আলোচনায় আবার একটা ঢেউ তুললে: আচ্ছা, এই যে জোর করে মেয়েদের সারা জীবন একটা পুরুষকে ভালবাসতে হবে, এ একটা বর্বর নিয়ম।

সুরেন চমকালো, পরে শুধোলে: তার মানে!

—মানে, আমাদের এই মামুলি বিয়ে! তারা কিন্তু কিছুতেই বলতে পারছে না যে তার বিয়ে প্রায় ঠিক ঠাক।

সুরেন বললে: বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী তো বেশ সুখেই থাকে, মনে হয়!

—সেটা শুধু মানিয়ে চলা! সমাজের শৃঙ্খলা, সংসারের সুবিধা। তারার গলার স্বরে একটু উত্তেজনা প্রকাশ পেলে।

—আসল ভালবাসা বিবাহিত জীবনেই দেখা যায়।

—উপায় না থাকায়? আমার মতে বিয়ের আগে মেয়েদের কোন ছেলের সঙ্গে না মেশাই ভাল।

—কারণ?

—বিয়ের পর স্বামীকে ভালবাসতে একটু অধিক সময় লেগে যায়, আবার স্বামীকে অনেকেই ভালবাসতে পারে না।

—তাই বলে, মেয়েরা কী স্বামীকে ভাল বাসে না?

—ভালবাসতে পারে, দেহটা বিলিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সমস্ত হৃদয়টা দিতে পারে না। সংসারের কাজের ফাঁকে পরিচিত মুখটা তাদের মনে পড়বেই।

সুরেন খানিকটা হেসে নিয়ে বললে: দেখবো তোমার বেলায়, দিনে আমাকে কতবার তোমার মনে পড়ে?

তারা ভাবলে—তবু ও জানে না যে কিছুদিন পরেই আমার বিয়ে। জানলে, নিশ্চয়ই সে এ রকম কথা বলতে পারতো না।

সুরেন পুনরাবৃত্তি করলে: সব মেয়েই তো স্বামীর ঘরকন্না করছে, আর বেশ সুখেই আছে।

তারা বললে: যারা স্বামীর পা কামড়ে পড়ে থাকে তারা সবাই স্বামীকে ভালবাসে না। আর যারা পর-পুরুষকে ভালবাসে তারা সবাই স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যায় না।

সুরেন খানিকটা চুপ করে বললে; সত্যি তারা, এ একটা প্রশ্ন?

—জানি না, সেই সব মেয়েদের নিঃশ্বাসে সমাজের কোন ক্ষতি হচ্ছে কী না?

তারপর আলাপ চললো ক্ষীণস্রোতে থেমে থেমে। ঘরের স্তব্ধতা তাদের উপরে কেঁপে কেঁপে উঠছে অসহ্য সুন্দর বেদনায় কিন্তু পরেও যে খুব বেশী কথা তারা বললে তা নয়। মাঝে মাঝে এক আধ টুকরো আলাপ চলে। কখন তাদের পরস্পরের হাত হয়েছে শিথিল। এমনি তারা বসে রইলো অনেকক্ষণ, বাইরের ম্লান নীল আকাশের দিকে চেয়ে।

—এবার যাই। তারার কাঁধের ওপর হাত রেখে সুরেন উঠে দাঁড়ালো। তারা বিহ্বলিত দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলে, কিন্তু কী যে বললে শোনা গেল না।

তারপর সত্যি সত্যিই সুরেন চলে গেল।

তারা সুইচ-টা অফ করে আলো নিবিয়ে এসে খাটে ভেঙে পড়লো। একটা বালিশ টেনে তার ভেতর মাথাটা ডুবিয়ে দিলে, পায়ের তলার সুজনিটা নিল টেনে, চেয়ে রইলো কালো আকাশের দিকে।

তারা ভাবতে লাগলো—আচ্ছা, একবার বিদ্রোহ ঘোষণা করলে কেমন হয়? পিতামাতার বিবাহ সভার উৎসব যদি ব্যর্থ করে দি! আর্য্যযুগের দেবীরা তো তা করেছেন আর পূজাও পেয়েছেন। কিন্তু ওই দেবীদের কাজ আমরা করলে অমনি পিতামার মাথা নীচু হয়ে আসে। সব চেয়ে ভালো একটা সুবিধে মেনে চলে। লোকে বলে বটে মেয়েরা সব লেখাপড়া শিখেছে, সব স্বাধীন হয়েছে। নিজেরা ইচ্ছা করে কোর্টশিপ করে বিয়ে করবে। কিন্তু এ কথা ক' জায়গায় সত্যি? নিজেদের টাকার ওজন করে, মান কুল বজায় রেখে, পিতামাতার নির্দেশ ক্রমে, তবে যে মেয়েদের মনকে বিকোতে হয়? কতভাবে, কতরকমে মেয়েরা নিজেদের বিক্রয় করে সেটা আর কে দেখে?

সেদিনও কিন্তু তারা মুখ ফুটে বলতে পারলো না যে তার বিয়ে প্রায় ঠিক।

ব্যাপারটা শেষ অব্দি মুখে মুখে চালিত হয়ে সুরেনের কানে এলো। কৈফিয়ৎ সুরেন এ বিষয়ে তারাকে [illegible] নি, আর তারাও একদিকে মুখ ফুটে

বলতে পারলো না। ঘটনাটা সুরেন-এর কাছে আকস্মিক বলে হলো বটে কিন্তু একটু অস্বাভাবিক ঠেকলো না। এইভাবে আরো কিছুদিন গড়িয়ে গেল।

নিত্যকার মতো সেদিনে এসে সুরেন দেখলে টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে দু' হাতের ওপর মাথা রেখে তারা বসে। তাঁর চুলের ওপর এসে পড়েছে অস্তগামী সূর্যের সোনালি আভা। দু'একটা বিস্রস্ত চুল বাতাসে এধার ওধার উড়ছে।

তারার মাথায় হাত রেখে সুরেন ডাকলে। চমকে উঠে তারা দেখলে সুরেন দাঁড়িয়ে; প্রসন্ন গম্ভীর তার মূর্ত্তি।

সুরেন সস্নেহে বললে; তারা, তুমি না কী আজকাল না খেয়ে কাটিয়ে দাও। তাই এতো রোগা হয়ে এসেছ ?

তারা স্বাভাবিক সুরে সহজ ভাবে উত্তর দিলে: কে তোমায় বললে ও সব কথা।

—যেই বলুক, সত্যি নয় কী !

—ও, তুমি একটা ধারণা করে নিয়ে বলচো ?

আকাশের নীল রঙ্ ক্রমেই ঘন কালো হয়ে আসছে। অন্ধকারে ঝরে পড়ছে বিষন্নতা। ঝিলমিলে তারার দল আকাশের বুকে উঠছে ফুটে।

সুরেন শুধোলে তোমার কী শরীর ভাল নেই, তারা ?

করুণ হেসে তারা বললে: না, শরীর তো ভালোই আছে। তোমার কথাই বল, আর কতদিন আছ এখানে ? তারা উঠে গিয়ে আলো জেলে ফিরে এলো।

—[illegible] দিন নয়; তাগিদের দিন এসে পড়েছে। [illegible] তারা, কোথাও বেড়িয়ে [illegible]?

তারা যেন কী ভাবছিল। পরে বললে: কোথায় ?

—কোন সিনেমায় বা এমনি খানিকটা গঙ্গার ধারে ?

—না, এই বেশ, বসে বসে গল্প করা যাক ?

—যেতে যখন দেবে না, তখন তাই হোক !

—আগে তো গল্প করে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছ ?

—তুমি কী ওই সব পূর্ব্বস্মৃতি মনে করিয়ে দিয়ে আমাকে বসিয়ে রাখতে চাও ?

তারার সমস্ত অন্তরটা হাহাকার করে উঠলো।

সুরেন কয়েকমুহূর্ত্ত কী চিন্তা করলে, তারপর বললে: আমি যাই ?

—কেন ?

কেন ? সুরেনও ভাবছিল কেন ? তার ভাল লাগছে না এই আবেষ্টনী, এই সান্নিধ্য। এই বন্ধুত্ববোধ।

সুরেন চলে গেল। তারা সেই নির্জ্জনতায় রইলো চুপ করে বসে।

নীচে সিঁড়ির কাছে তারার বোন ডলির সঙ্গে দেখা। ডলি আনন্দে জানালে: সামনের পঁচিশে বৈশেখ দিদির বিয়ে ?

সুরেন সহজ ভাবেই বললে: তাহলে খুব সিগগির লুচি পাকচে বল ?

রাস্তায় বেরিয়ে সুরেন মনে মনে বলে: তারা, তুমি সুখী হও বিয়ে করে, অশান্তি তোমার জীবনে যেন কোনদিন না আসে।

পরদিন সুরেন এসে জানালে: তারা, কালই আমি চললুম ?

—কোথায় ?

—কাজে ?

—কালই ? কখন ?

—রাত্রে।

তারা গম্ভীর হয়ে বললে: বোধ হয় শুনে থাকবে খুব সিগগিরই আমার বিয়ে হচ্ছে। পরে সুরেনের একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললে: রাগ করো না, সুরেন দা। তোমার কথা আমি কোনদিনও ভুলতে পারবো না—কিন্তু এ-ছাড়া আমার উপায় নেই।

—সত্যি তোমার বিয়ে শুনে খুব আনন্দিত হয়েছি।

—সত্যি বলচো ?

—তোমার কী মনে হয় ?

—মনে হয়, তুমি ঠিক কথাটা চেপে রেখে মিথ্যে কথা বলচো ?

—আমি চলি ! বলে সুরেন হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।

ঘোলাটে গলায় তারা বললে: আমার কথার জবাব দিলে না যে ?

—কী কথার জবাব, তারা ? কেন বাজিছ ? আমি—আমি দুর্ব্বল ! বলে সুরেন ঝড়ের হাওয়ার বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

পরেরদিন বিকেলে সুরেন ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। চোখে মুখে তার পরিস্ফুট বিষন্নতা। পূর্ব্বের দিনের কথাগুলো মাঝে মাঝে তার মনকে বিব্রত করে তুলছিলো।

এমন সময়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এলো, বললে: আমায় বাঁচাও সুরেন দা !

সুরেন সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তারার দিকে চেয়ে রইলো। তারা বলতে লাগলো;

সুরেন দা, আমায় নিয়ে চলো এমন জায়গায় যেখান থেকে আর ফেরা যায় না।

—ব্যাপার কী—?

—যার সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্ছে তার আবার একটী ছেলে আছে। স্বরে যেমন দৃঢ়তা, কথাগুলোও তেমনি স্পষ্ট। এবার তারা ক্রন্দনের সুরে বললে; আমায় নিয়ে চলো, সুরেন দা?

—কোথায়—?

—তুমি যেখানে কাজ করো।

—আমার সঙ্গে, তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাবে! সুরেন বেশ স্পষ্ট গলায় বললে।

—কেন তোমার বাড়ীতে? সেখানে কী আমার একটু স্থান হবে না?

—আমার যেতে আরো ৫।৬ দিন যে দেরী?

—সেদিন বলে এলে আজই যাবে?

—না, আর যাওয়া হয়ে উঠলো না?

চাপা আগুন যেমন দপ করে জলে উঠলো। তীব্র কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে তারা বললে: ধূর্ত্ততা করছো আমার সঙ্গে? মিথ্যেবাদী! বিশ্বাসঘাতক কোথাকার? বলে তারা এক-রকম টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।

সুরেন শিশুর মতো উত্তেজিত কণ্ঠে বললে: না, না, তারা আমায় মাপ করো। তোমার এ দায়িত্ব আমি বইতে পারবো না?

সিঁড়ির শেষে চটির শব্দ তখন মিলিয়ে গেছে।

ছায়া ও কায়া

শ্রীমধু বসু

এবার পূজার বাজারে চিত্র-জগতেই চাঞ্চল্য বেশী। উত্তর কলিকাতার সব কয়টি চিত্র-গৃহেই দর্শকের সমারোহময় ভীড়। কারণ সব কয়টি হাউসেই নতুন ছবি মুক্তিলাভ করেছে। পূজার পূর্ব্বেই এইগুলি মুক্তিলাভ করেছে। সুতরাং এতদিন পরে সেগুলির সম্বন্ধে বিস্তৃত মুক্তিলাভ করেছে যথাক্রমে রূপবাণীতে, উত্তরায় এবং শ্রীতে। প্রথমেই ধরা যাক—

গৃহদাহ

৯ই অক্টোবর নব সংস্কৃত চিত্রায় মুক্তিলাভ করেছে এবং ১০ই অক্টোবর থেকে ভারতের ৫টি বিভিন্ন স্থানে

বিজয়ার একটী দৃশ্য

আলোচনা না করে সংক্ষেপেই শেষ করবো। নিউ থিয়েটার্সের 'গৃহদাহ' মুক্তিলাভ করেছে নবগঠিত চিত্রার সবগুলির আগে—তারপর নিউ ইণ্ডিয়া ফিল্মসের বিজয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের 'সোণার সংসার' এবং কাৰ্ট ক্যাসাঙ্কাল পিকচার্সের 'সরলা' ২১শে অক্টোবর একযোগে প্রদর্শিত হচ্ছে। এখানে প্রথমেই বলা দরকার যে শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' বিরাট উপন্যাসখানি অত্যন্ত মনস্তত্ত্বমূলক, সংলাপ-বহুল, সেই কারণে এখানি সাধারণের কাছে ততটা সমাদর পায় নি। ঐ বিরাট উপন্যাসখানি গ্রহণ করে যে চিত্র-নাট্য [illegible]

সোনার সংসার

সি, এল, খেমকার নিবেদন—বাণী পিকচার্স নিউ থিয়েটার্স ফিল্মের নবতম অর্ঘ্য। কথা, কাহিনী ও পরিচালনা—দেবকীকুমার বসু। সুরশিল্পী—কৃষ্ণচন্দ্র দে, চিত্রশিল্পী—শৈলেন বসু, শব্দযন্ত্রী—সি, এল, ফ্রিগাস। বুধবার ২১ শে অক্টোবর হতে উত্তরায় দেখানো হচ্ছে। ভূমিকালিপি—রমা—ছায়া দেবী, অলকা—মেনকা, বৈষ্ণবী—কমলা (ঝরিয়া), নর্ত্তকী—জাহ্নবী, জমিদার—রাধিকানন্দ মুখো:, [illegible]—রঞ্জিৎ রায়, ডাক্তার—জ্যোৎস্না মিত্র, স্বামী শঙ্করনাথ—অহীন্দ্র চৌধুরী, রমেশ—জীবন গঙ্গো:, রঘুনাথ—ধীরাজ ভট্টা:, পণ্ডিত—তুলসী লাহিড়ী, অধ্যাপক—রতীন বন্দো:, গো-শকট চালক—ধীরেন দাস, ইনস্পেক্টর—প্রফুল্ল মুখার্জ্জি, শিক্ষিত বেকারের দল—নির্ম্মল বন্দ্যো:, সত্য মুখার্জ্জি, নবদ্বীপ হালদার, ভূমেন রায়, বিমল গোস্বামী, কার্ত্তিক রায়।

অষ্টাদশী সুন্দরী পত্নী রমা এবং চার বৎসরের একটী সুন্দর শিশু—এই নিয়ে রমেশের সোনার সংসার। বিবাহের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব রাত্রে অঘটন ঘটল। জমিদারের কোপে ডাকাতদল হানা দিয়ে রমাকে ছিনিয়ে নিয়ে সরে পড়লো। রমা ও শিশু পুত্রের আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। ব্যর্থতায় রমেশের মন ভেঙ্গে পড়লো।

এদিকে রমার অবস্থাও শোচনীয়। ধর্ষিতা নারীর সমাজে স্থান নেই। দুঃসহ জীবনের যবনিকা টানতে রমা চেষ্টা করলো, কিন্তু গঙ্গার জলে তার মরা হ'ল না। এক সাধু তাকে বাঁচালেন। রমা কলকাতায় এসে এক সেবা সদনে নার্সের কাজ করতে লাগলো। তার সেই দস্যু-পরিত্যক্ত শিশুটিকে কুড়িয়ে পেয়েছিল এক শকট চালক। তাকে সে এক অনাথ আশ্রমে রেখে এল। সেখানকার প্রবীন অধ্যাপক তাকে পিতার স্নেহে মানুষ করতে লাগলেন। রমার সেই সন্তান আজ ২২-২৩ বছরের যুবা। নাম রঘুনাথ। তাকে সুশিক্ষিত করে অধ্যাপক আশ্রম থেকে মুক্তি দিলেন। সে স্বাবলম্বী হবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। সে এক শিক্ষিত বেকারের দলে এসে আশ্রয় পেল—নাম স্বর্গধাম। একটা বস্তীর বুকে এই স্বর্গের স্থিতি। এখানকার বাসিন্দারা সবাই শিক্ষিত ও নির্ম্মমভাবে বেকার। মর্ত্ত্যের এই স্বর্গধামের পাশে এক কুটীরে একটি মেয়ে থাকতো অলকা তার নাম। আপনার বলতে তার কেউ নেই। ঘরভাড়া দেবার পর্য্যন্ত সামর্থ্য নেই। রঘুনাথের মন দয়াকোমল হয়ে উঠল। সে গেল [illegible] জমিদার [illegible] শঙ্করনাথের [illegible] দয়া ভিক্ষা করতে এই মেয়েটির হয়ে। সামরিক প্রতিকার সে পেলে। [illegible] এই তার শঙ্করনাথ, কঠোরে কোমলে গড়া অন্তর। তবে আকস্মিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য। ডাক্তারেরা বিধান দিলেন নার্স রাখতে। সেবা সদন থেকে রমা এল পরিচর্য্যা করতে।

এখানেই পুত্র ও স্বামীর সঙ্গে রমার মিলন হয়। শঙ্করনাথ তার প্রকৃত বিত্তের দ্বারা পলাশপুরে রমেশের জমিদারী কিনে দিলেন। অলকার সঙ্গে রঘুনাথের বিয়ে হ'ল। নিয়তির পাশার ছকে আজ আবার নতুন করে দান পড়লো।

কাহিনী তেমন জোড়ালো নয়, তবে নানারূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনার দ্বারা সোনার

সংসারের কাহিনী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। খণ্ড খণ্ড দৃশ্য যেরূপ কৃতিত্বের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে। তজ্জন্য দেবকী বাবুর প্রশংসা করতে হয় প্রাণ খুলে। এরূপ সর্ব্বশ্রেণীর মনোরঞ্জন চিত্র বাংলা দেশে আর হয়নি। সোনার সংসার এবার শারদীয়া উৎসবের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। কাহিনীতে তেমন নূতনত্ব না থাকলেও ঘটনা সন্নিবেশে ছবিখানি অতুলনীয় হয়েছে। তবে এও বলব যে, ২।১ স্থানে যেভাবে 'ভালগার টেষ্টের' পরিচয় পাওয়া যায়, তা দেবকীবাবুর মত পরিচালকের কাছ থেকে আশা করিনি। এই সব অংশ বাদ দিলে ছবির কোন অঙ্গহানি হবে না এবং পরিবারের সকলে মিলে ছবিখানি উপভোগ করতে পারবে।

পূর্ব্বেই বলেছি দেবকীবাবু পরিচালনায় বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ট্রেনে সদলবলে পলাশপুর যাত্রার দৃশ্য এবং সঙ্গীত খুব উপভোগ্য হয়েছে। বেকারদের দৃশ্যটি উপভোগ্য হলেও বেকার-জীবনের সঙ্গে এর মিল নেই। তবে আর্টিফিসিয়েল হলেও উপভোগ করা যায়। ফটোগ্রাফী বেশ ভালই। এবং রেকর্ডিং খুব উচ্চশ্রেণীর না হলেও নিন্দনীয় নয়। অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্রের সুরও বেশ হয়েছে।

অভিনয় মোটামুটি সবারই ভাল হয়েছে। রায় বাহাদুরের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, রমেশের ভূমিকায় জীবন গাঙ্গুলী, অধ্যাপকের ভূমিকায় রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় চমৎকার অভিনয় করেছেন। ধীরাজ ভট্টাচার্য্য (রঘুনাথ) তুলসী লাহিড়ী (পণ্ডিত) ও উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেছেন। শিক্ষিত বেকারের দল ভাল। এক এক জন এক একটি টাইপ। সত্য মুখার্জ্জি, নবদ্বীপ হালদার, ভূমেন রায়, বিনয় গোস্বামী, নির্ম্মল বন্দ্যো, প্রভৃতি সবাই আমাদের হাসিয়েছেন।

শ্রী ভূমিকা রমা ও অলকার ভূমিকায় ছায়াদেবী ও মেনকার অভিনয় বেশ সাবলীল হয়েছে। তবে ছায়ার অবসজ্জার দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ ছিল। আঠার বছর পরে পুত্রের সঙ্গে যখন শ্বশুরনাথের বাড়ীতে দেখা হ'ল, তখনকার চেহারা এবং আঠার বছর পূর্ব্বের চেহারায় বিশেষ পার্থক্য নেই। বয়সে দেহের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। গো-শকট চালক ধীরেন দাসের গানখানি বেশ ভাল। বৈষ্ণবীরূপে কমলা (ঝরিয়া) কয়খানি গান গেয়ে কাণে মধু বর্ষণ করেছেন। জমিদার (রাধিকা মুখোঃ) ও ডাক্তারের (প্রফুল্ল মুখোঃ) ভূমিকা অনুল্লেখ্য। নর্ত্তক রঞ্জিৎ রায় এবং নর্ত্তকী আজুরীর গান ও নাচের সবখানি সহ্য করা যায় না। পার্শ্বচর কৃষ্ণধন মন্দ নয়, তবে সব সময় তাকেও সহ্য করা যায় না।

গান রচনা করেছেন শৈলেন রায়, বেশ হয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্র দের সুর সংযোজনাও হয়েছে চমৎকার। মোটের উপর সোনার সংসারের মত এত 'এনটারটেনিং ভ্যালু'র ছবি বাংলায় আর তেমন হয়নি।

ওরিয়েন্টাল কিনেটোন আর্টস

এঁদের পরবর্ত্তী চিত্র হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "ঝড়ের যাত্রী"র প্রাথমিক কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে আসছে। "ঝড়ের যাত্রী" পরিচালনা কচ্ছেন—বঙ্গ সবাকচিত্রের প্রথম পরিচালক অমর চৌধুরী। চিত্রখানি সর্ব্ব সাফল্যমণ্ডিত করিতে প্রযোজক শ্রীযুক্ত পান্নালাল পাঠক মহাশয় আধুনিক সাজ সরঞ্জামের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থাই কচ্ছেন।

উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রচার সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হয়েছেন—প্রবোধ সরকার।

পূজা স্পেশাল

পাঞ্চজন্য—চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত বাঙ্গলা-দৈনিক। সম্পাদক শ্রীঅম্বিকা চরণ দাস, মূল্য ।০ আনা।

মফঃস্বলের একমাত্র বাঙ্গলা দৈনিক পাঞ্চজন্য এবারকার পূজা সংখ্যায় কেবল তাহার পূর্ব্ব গৌরবই রক্ষা করে নাই বরং তাহাকে আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। সুসাহিত্যিক শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, মণিলাল রায়, বিনয়কুমার সরকার, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, বঙ্কিমচন্দ্র সেন, অধ্যাপক রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিকদিগের রচনা-সম্ভারে শারদীয়া পাঞ্চজন্য বেশ সমৃদ্ধ এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে অতীব সুখপাঠ্য হইয়াছে। পরিশিষ্টে চট্টগ্রামের ইংরাজী ডাইরেক্টরীটিকে চট্টগ্রামের একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাগজ ভালো, ছাপাও বেশ সুন্দর।

সোণার বাংলা—সম্পাদক শ্রীনলিনী কিশোর গুহ, ১৬৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ।০ আনা মাত্র।

শক্তিশালী লেখক নলিনীবাবুর সম্পাদনায় শারদীয়া সংখ্যা সোণার বাংলা সাপ্তাহিক পূজা স্পেশালগুলির মধ্যে বিষয়বস্তুর গৌরবে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বিশিষ্ট সাহিত্যিকদিগের উপন্যাস, কবিতা, রসরচনা, মহিলা ও শিশুপাঠ্য প্রবন্ধ এবং বহুচিত্র ও ব্যঙ্গচিত্রে সোণার বাংলার শারদীয়া সংখ্যা বিভিন্ন রুচির পাঠকদিগের চিত্তবিনোদন করিবে, সন্দেহ নাই। মফঃস্বলের সাপ্তাহিকগুলির মধ্যে সোণার বাংলা সাহিত্যিক ও পাঠক-সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। তাহার শারদীয়া সংখ্যা সে খ্যাতিকে অধিকতর সমুজ্জ্বল করিবে।

সচিত্র শিশির—সম্পাদক শিশির কুমার মিত্র বি-এ। মূল্য ।/০ আনা।

শারদীয়া সচিত্র শিশিরের গল্প প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি বেশ সুখপাঠ্য হইলেও চিত্র সম্পদের আর বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের দিক হইতে যথেষ্ট দৈন্য আছে। অধিকন্তু প্রচ্ছদপটে জীবনরত্ন তরুণীটির জোড়াতালি দেওয়া ছবিখানির মধ্যে শারদীয়া শিশিরের কোন্ বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা বুঝা গেল না। চিত্রগুলির অধিকাংশই চলচ্চিত্র জগতের তারকাদের, তাছাড়া পূজার বাজারে শিশিরবাবু অনেক বস্তাপচা রদ্দিমালও চালাইয়াছেন। ছাপা ও কাগজ সুন্দর হইলেও মূল্যের পরিমাণ অধিক হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। আশা করি, ভবিষ্যতে শিশিরবাবু এই সমস্ত ত্রুটী বিচ্যুতিগুলি সংশোধনের চেষ্টা করিবেন।

অমৃত বাজার পত্রিকা—সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ। ৬৪ পৃষ্ঠা মূল্য ৵০ আনা।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত লিখিতে হইতেছে যে, শারদীয়া সংখ্যা অমৃত বাজার আমাদিগকে বিশেষ আনন্দ দান করিতে পারে নাই। অমৃত বাজারের ন্যায় একখানি সুপরিচালিত বিশিষ্ট ইংরাজী দৈনিকের বিশেষ সংখ্যার বৈশিষ্ট্য রক্ষার দিকে কর্তৃপক্ষ আদৌ মনোযোগ দেন নাই—তাঁহাদের মনোযোগ পাঠকদিগের মনোরঞ্জন অপেক্ষা নিজেদের পকেটের দিকেই অধিকতর নিয়োজিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ৬৪ পৃষ্ঠার একখানি অসংবদ্ধ কাগজ পাঠ করিতে দেওয়ার সরলার্থ প্রকারান্তরে পাঠকদিগকে বিব্রত করিয়া তোলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। অমৃত বাজার পরিচালকগণ কি কিঞ্চিৎ দপ্তরী খরচা করিয়া পাঠকদিগকে এ অসুবিধাটুকু হইতে অব্যাহতি দিতে পারিতেন না? অমৃত বাজারের পূজা পোশাকে অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা বিজ্ঞাপনের বৈশিষ্ট্যই সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আশা করি, ভবিষ্যতে তাঁহারা পাঠকবর্গের উপরেও কিঞ্চিৎ সুবিচারে কার্পণ্য করিবেন না।

বন্দেমাতরম—মূল্য ৶০ আনা। সুযোগ্য সম্পাদকের সম্পাদনায় শারদীয়া বন্দেমাতরম বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে তাহার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেও চিত্র সম্পদের দিক হইতে পরিচালকের হাতটানের পরিচয়ই প্রকট হইয়াছে। প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও রচনার ন্যায় চিত্র সম্ভারের দিকে কিঞ্চিৎ ঔদার্য্য প্রদর্শন করিলেই শারদীয়া বন্দেমাতরম যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত ইহা মুক্ত কণ্ঠেই বলা যাইতে পারে।

—লিপিকা তব করিনু যবে পাঠ—

শ্রীসুধীর রঞ্জন সেন

সোনার লেখা লিপিকা তব করিনু যবে পাঠ,
আকাশ তলে ধূসর রেখা এঁকেছে যেথা মাঠ
আপন-হারা রহিনু সেথা চাহি'—
স্মৃতির ব্যথা সিক্ত হ'ল নয়ন-নীরে নাহি'!
চকিত দেখা প্রথম পরিচয়
জীবন-উষা তোরণ-পথে আনিল তব জয়।
মেঘের গায়ে চিকণ রূপ-রেখা
বরষা-রাতে দুখের সাথে দিয়েছে যবে দেখা,
বাসনা মোর করিয়া দাহ হৃদয়-বেদী মূলে
ভুলিয়া গেছি তোমার পূজা করেছি কোন্ ফুলে!
তাই ত আজি নীরব বেদনায়
দূরের স্মৃতি ঘোমটা তুলি' সজল চোখে চায়।
আজিকে যবে পাঠায়ে দিলে তোমার বারতারে
তড়িতালোকে সহসা জাগি' খুঁজিনু আপনারে।
নিশির ঘন টুটিল আবরণ
বিহগ-গীতে অরুণোদয়ে শিহরে জাগরণ!
পিছন ফেলে এসেছি কবে যা'রে,
তাহার সাড়া আনিল বহি মলয় বারে বারে।
বিদায়খনে মৌন তব আঁখিতে ভরা ব্যথা,
শেষের কথা জানাতে আকুলতা—
সেই সে ছবি বুকের তলে জড়ায়ে অভিমানে
জানো না তুমি রাখিনু সাবধানে।
তোমার এলো খোঁপার খসা দল-ঝরা সে ফুল
আমার বুকে জাগায় আজি ব্যথার কলরোল।
মিলন-বেলা যে ফুলসাজে সাজিলে ফুল-রাণী,
সে বাসি-মালা মলিন সাজখানি
হায় গো তুমি ফেলোনি আজো তরুণ তনু হ'তে
স্মৃতির পূজা রাখিতে চাও হৃদয়ে কোনমতে।
চোখের জলে তোমার ভিজে বাণী
সে-কথা মোর প্রেমের সাথে করিছে কানাকানি।
তাইত চাহি ফিরিয়া যেতে অতীত নিকেতনে
খুঁজিয়া মরি পথেরে শুধু হৃদয়ে বনে বনে।
ভাসিয়া গেছে নয়ন বরষায়—
পায়ের চলা ছন্দ-ছবি ধূলিতে নাহি হায়!
স্মৃতির রেখা অস্তরবি সম
আঁখির নীল অরুণী-নীরে কাঁপিছে [illegible]

সচিত্র সাপ্তাহিক
দ্বিতীয় বর্ষ—৩৮শ সংখ্যা
শুক্রবার—২৭শে কার্ত্তিক
১৩৪৩
১৩ই নভেম্বর—১৯৩৬

আসন্ন নির্ব্বাচন
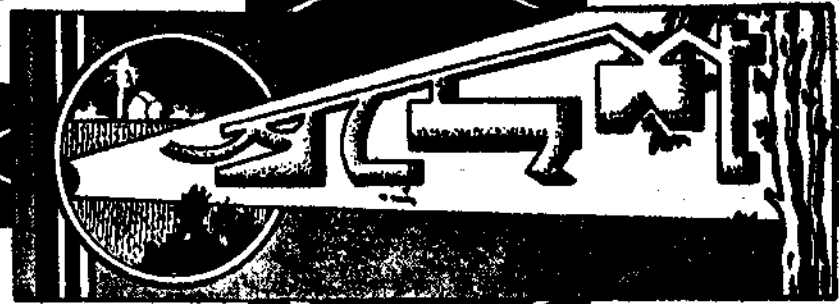
বিজয়ার সানাইয়ের বেহাগ রাগিনীর করুণ রেশ থামিতে না থামিতেই কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলালের আগমনীর তুর্য্য নিনাদে কলিকাতা মহানগরী পুলক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিতজী আসিয়াছিলেন। বাঙ্গলায় এ শোচনীয় দুর্দ্দিনেও তাঁহার সম্বর্দ্ধনার বাহ্যাড়ম্বরে বায় বাহুল্যের ত্রুটী হয় নাই। পাঁচ দিন কাল কলিকাতার পার্কে, স্কোয়ারে, হলে, ইনষ্টিটিউটে বক্তৃতার বন্যা বহাইয়া অভিনন্দন মাল্য কুড়াইয়া তিনি উৎকলে আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছেন। পণ্ডিতজী আসিয়াছিলেন, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ নির্ব্বাচনী প্রচার কার্য্য করিতে। সে কার্য্যের আসরে তিনি বাঙ্গলা কংগ্রেসের বাঁটোয়ারার যে সংশোধন করিয়া দিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গলার গুণমুগ্ধ কংগ্রেস কর্ম্মীগণ তাহাতে উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেও বাঁটোয়ারা বিক্ষুব্ধ হিন্দু তাহাতে শান্তি, স্বস্তি ও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে না।

বহু সমালোচিত ও বহু নিন্দিত বাঁটোয়ারা নাট্যের আপাততঃ যবনিকাপাত হইল। এইবার বাঙ্গলার রাজনৈতিক পটভূমিতে বিপুল উদ্যমে নির্ব্বাচনী নাট্যের অভিনয় আরম্ভ হইবে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বাঙ্গলায় নির্ব্বাচন পরিচালনার জন্য যে পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের মনোনয়ন পর্ব্ব আজও শেষ না হইলেও ইতিমধ্যেই স্বার্থপর ও প্রভুত্বপ্রয়াসী কুচক্রীদিগের অনেক শাঠ্য ও কাপট্য লীলা প্রকাশ পাইয়াছে।

আসন্ন নির্ব্বাচন রাজনৈতিক, আর্থিক ও সাম্প্রদায়িক সকল দিক হইতেই বাঙ্গলার পক্ষে একটা কঠোর অগ্নি পরীক্ষা স্বরূপ। কংগ্রেস দেশবাসীর হৃদয়ে আজও যতখানি শ্রদ্ধার আসনই অধিকার করিয়া থাকুক না কেন, সত্য কথা বলিতে কি বাঙ্গলা কংগ্রেসের সে পূর্ব্ব গৌরব বহুলাংশে খর্ব্ব হইয়াছে। তদুপরি বাঙ্গলার সংশোধিত বাঁটোয়ারা প্রস্তাব কংগ্রেসের অধুনা অর্জ্জিত প্রভাবকেও কিঞ্চিৎ ম্লান করিবে। সুতরাং বাঙ্গলার এই সঙ্কট সন্ধিক্ষণে যদি শুধুমাত্র কংগ্রেসের জয়টীকাই প্রার্থী মনোনয়নের যোগ্য মানদণ্ড হয় তাহা হইলে বলিব, তাহাতে ব্যক্তি বা দলগত হীন স্বার্থসিদ্ধির পথ সুগম হইলেও জাতি এ কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না।

আসন্ন নির্ব্বাচনে এমন সব প্রার্থীদিগকে প্রতিনিধি মনোনীত করিতে হইবে যাঁহাদের যোগ্যতা, দেশপ্রেম, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠা আছে, দেশ ও দশের সেবাই যাঁহাদের শ্রেষ্ঠ কার্য্য, ব্যক্তি বা দলগত স্বার্থের প্রলোভন যাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারিবে না—তুচ্ছ লাভ ক্ষতির খতিয়ানে যাঁহারা জাতির বৃহত্তর ও মহত্তর স্বার্থে জলাঞ্জলি দিবেন না সেই সব প্রার্থীকে—শুধু কংগ্রেসী তকমার কষ্টি পাথরে যোগ্যের অনাদর করিয়া অযোগ্যকে যেন বাছাই করা না হয়। আসন্ন নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ইহাই আমাদের কামনা ও প্রার্থনা।

পাঁচমিশালী

আমাদের দেশে একটা কথা আছে, বিষ নেই, কেবল কুলোপানা চক্কর। বাংলার কংগ্রেস কমিটীর কি তাহাই হইল? কংগ্রেস কমিটী নির্ব্বাচনের জন্য প্রচার কার্য্য পরিচালন করিতে একটী কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিটীর গঠন দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। পাণিনিকে যে অশেষবিদ্ বলা হইয়াছে তাহার কারণ। তিনি একই সূত্রে কুকুর, যুবক ও ইন্দ্রকে গাঁথিয়াছেন। এ কমিটীতেও তেমনি দেখিলাম যাহাদের নাম আছে, তাঁহাদের মধ্যে বসুমতী সম্পাদক কংগ্রেস কমিটিতে জহরলালের প্রস্তাব গ্রহণ সমর্থন করেন নাই, অমৃতবাজার সম্পাদক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে অকংগ্রেসী প্রার্থী মহারাজা স্যর মন্মথনাথ রায় চোধুরীকে সমর্থন করিয়াছেন—ইহারা কিভাবে কংগ্রেসের প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিবেন, তাহা বলিতে পারি না। বসুমতী এবং অমৃত বাজার উভয়েই বলিয়াছেন, নরেন্দ্র কুমার বসু, বিজয় চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্র নাথ বসু কংগ্রেসী কলমা না পরিলেও তাঁহাদিগকে সমর্থন করা কংগ্রেসের কর্ত্তব্য। কেবল অমৃতবাজার যে 'আণ্ডারটেকিং'এর কথা বলিয়াছেন, বসুমতী তাহা বলেন নাই। এ অবস্থায় এই কমিটীর দ্বারা প্রকৃত কাজ কতটা হইবে, তাহা বলিতে পারি না।

* * *

প্রচারের পথ দুইটী। সংবাদপত্র ও বক্তৃতা। সংবাদপত্রগুলির কার্য্যালয় কলিকাতায়। কিন্তু বিরাট ব্যাপার হইবে মফঃস্বল লইয়া। মফঃস্বলের লোককে কি কংগ্রেস সংবাদপত্র হইতে মত গঠনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন, না গ্রামে গ্রামে প্রচারক প্রেরণের ব্যবস্থা হইবে? এ ব্যবস্থা কে করিবেন এবং কাহারাই বা এ কার্য্যের ভার পাইবেন? শরৎ বাবু বা বিধানবাবু—এমন কি বাঙ্গলার কংগ্রেসী কেন্দ্রের রন্ধ্রগত শনি কিরণশঙ্করও কি গ্রামে গ্রামে যাইয়া প্রচার কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন? হাইকোর্ট খুলিয়াছে, ডাক্তারের কাজও নিমতলার ঘাটের মত নিত্য বিদ্যমান, আর কলিকাতাই ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র—কাজেই যদি ইহারা কেহ স্থান ত্যাগ করিতে না পারেন, তবে কাহাকে এ কার্য্যভার দেওয়া হইবে? জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর তরী ওয়েলিংটন স্কোয়ার, হগ মার্কেট এবং কারাগার—নানাস্থান ঘুরিয়া শেষে করপোরেশনের মিউজিয়ামে ভিড়িয়াছে। সুতরাং তাঁহাকেও যে আর তেমন পাওয়া যাইবে, এমন মনে হয় না। কংগ্রেস কমিটীগুলির অস্তিত্ব আর মফঃস্বলে তেমন নাই বলিলেই হয়। তদ্ভিন্ন দলাদলিরও অন্ত নাই। কাজেই প্রচার কার্য্যের কতটা সুবিধা হইবে, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। যদি কংগ্রেস প্রচারকার্য্যের উপর সাফল্যের আশা রাখিয়া থাকেন, তবে যে সে আশা নিরাশায় বিলীন হইবার সম্ভাবনা অধিক; তাহাই আমাদের বিশ্বাস। হাতে পাঁজী মঙ্গলবার। ১৬ই নভেম্বর হইতেই বোঝা যাইবে বাংলার কংগ্রেস কমিটীর আশার ভিত্তি দৃঢ়, কি শিথিল।

* * *

শোনা যাইতেছে, বাংলার কংগ্রেস কমিটী জমিদার, ব্যবসাদার প্রভৃতি কোন বিশেষ নির্ব্বাচন কেন্দ্রে প্রার্থী খুঁজিয়া পাইতেছেন না। যদি তাহাই হয়, তবে আর বৃথা আড়ম্বরের ঠাট বজায় রাখিয়া লাভ কি! আবার একথাও শোনা যাইতেছে, কোন কোন কংগ্রেসী নেতাই বর্দ্ধমানের জমিদারী কেন্দ্রে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের মূলনীতি ধ্বংসকারী স্যর বিজয় প্রসাদ সিংহরায়কে, বর্দ্ধমানের মহারাজ কুমার উদয়চাঁদকে, উত্তর পাড়ার জমিদার তারক নাথ মুখোপাধ্যায়কে এবং শ্রীরামপুরের কানাইলাল গোস্বামীকে সমর্থন করিতেছেন। তারক

বাবু গতবার নির্বাচনকালে বিস্তাপীঠে যে ৫ হাজার টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি কি রক্ষিত হইয়াছে? তারকবাবুর শাসনাধীনে হুগলী জেলাবোর্ডের বার্ষিক কার্য্য বিবরণীতে কংগ্রেস সম্বন্ধে কিরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে? কংগ্রেস যদি কংগ্রেসবিরোধী-দিগের নির্বাচনে বাধা দিতেও না পারেন, তাহা হইলে কংগ্রেস মুছিয়া যাইলেও কাহারও দুঃখ করিবার কিছু থাকিতে পারে না।

* * *

এই সময়ে যে বাঙ্গলার হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেদিকে কাহারও চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না। হিন্দুসভা, হিন্দু মহাসভা, এইরূপ নানাভাবে বিভক্ত হইয়া বাংলার হিন্দুরা একান্ত বিব্রত হইয়াছে। শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার বসু, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীযুত যতীন্দ্র নাথ বসু প্রভৃতি— যাঁহারা সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিলোপ করিতে চান, তাঁহারা যদি এই সুযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হন, তবে যে বাঙ্গলায় তাঁহাদের দলই প্রবল হইবে, এমন আশা করা অসম্ভব নহে। কেননা, মৌলবী ফজলুল হকের অনিশ্চিত প্রজা পার্টিকে নিশ্চিহ্ন করা যে বিশেষ কষ্টকর হইবে তাহা নয়। কিন্তু ইঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইবেন কি?

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বাঙ্গলার কংগ্রেস কমিটী শেষে বাটোয়ারা ব্যবস্থায় যেভাবে কংগ্রেসের কর্ম্মকর্ত্তাদের 'ফরমূলা' মাথা পাতিয়া লইয়াছেন, তাহাতে একটা চলিত কথা মনে পড়ে—"সিংহ রুষ্ট হইয়া তর্জ্জন করিয়া শেষে ল্যাজ নাড়িতে লাগিল।" মূল কথা, বাঙ্গলা বাটোয়ারা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে আন্দোলন চালাইবার অধিকার পাইবে কি না। পণ্ডিত জহরলাল বাঙ্গলায় আসিয়া বুঝিয়াছিলেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার সহায় থাকিলেও সোজা-সুজি বাঙ্গলার মত পরিবর্ত্তন করা যাইবে না। তাই তিনি একটা বাঁকা পথ ধরিয়া একটা ফরমূলা বাহির করিয়াছেন। জহরলাল যেভাবে কলিকাতায় আসিয়া ব্যস্ত ছিলেন, তাহাতে এই ফরমূলা রচনা করিবার সময় তাঁহার হইয়াছিল কিনা তাহা বলিতে পারি না। আর সেই জন্যই মনে হয় ফরমূলা কি বল্লভভাই, রাজেন্দ্র-প্রসাদ কোম্পানীর নিকট হইতেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে? ইহাতে বাঙ্গলায় বাটোয়ারা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার অধিকার স্বীকৃত হইল বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে কতকটা "কিন্তু" রচনা হইল।

বাঙ্গলা আন্দোলনের অধিকার পাইল বটে, কিন্তু ঐ আন্দোলন করিতে হইলেই সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় আন্দোলন জুটাইয়া আনিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ আন্দোলনকে বাছিয়া লইয়া প্রাধান্য দেওয়া চলিবে না। ইহাতে বাঙ্গলায় কংগ্রেস কমিটী ঘোষণা করিতে-ছেন, তাঁহারাই জয়লাভ করিয়াছেন, আর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী অনায়াসে বলিতে পারিবেন, তাঁহারা বলে না হউক, ছলে ও কৌশলে বাঙ্গলায় জয়লাভ করিয়াছেন।

বাঙ্গলার কংগ্রেস কমিটী যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বাঙ্গলায় হিন্দুদিগের সহানুভূতি অনেকটা হারাইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এমন কি, আমাদের মনে হয়, যদি বাঙ্গলায় হিন্দুরা এক হইয়া একটী দল গঠিত করিতে পারেন এবং উপযুক্ত লোককে সমর্থন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মনোনীত প্রার্থীরাই বাঙ্গলায় জয়লাভ করিবেন। বলা বাহুল্য, এই সকল প্রার্থী কংগ্রেসের বিরোধিতা সাধন করিবেন না, পরন্তু যেখানেই সম্ভব কংগ্রেসের সহিত এক-যোগে কাজ করিবেন। বাঙ্গলার কংগ্রেস জাতীয় দল এই ভাবেই কাজ করিয়াছেন। আমাদের সহযোগীদিগের মধ্যে যাঁহারা শ্যাম রাখিবেন কি কুল রাখিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন, তাঁহারা অবশ্যই এই নূতন প্রস্তাবে শ্যাম ও কুল উভয়ই রক্ষা হইবে মনে করিয়া স্বস্তির শ্বাস ফেলিতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাদের পক্ষে কতদিন যে দুই নৌকায় পা রাখিয়া থাকা সম্ভব হইবে, তাহা বলিতে পারি না। বাঙ্গলার জনমত যে এই প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না, তাহা বিবেচনা করিয়াও যাঁহারা এই প্রস্তাবে উল্লাস প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহা-দিগের উল্লাস যে, অল্পদিনের মধ্যেই লোপ পাইবে ইহা আমরা অনায়াসে

আবার যুদ্ধ বাধিবে কিনা?

ইউরোপে আবার যুদ্ধ বাধিবে কি না, এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া মনীষি জর্জ্জ বার্ণার্ড শ' সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নিম্নে সেই কতকাংশ উদ্ধৃত হইল।

—'ইউরোপে আর একটি ভয়াবহ যুদ্ধের ফলে সভ্যতা বিলোপ পাইবে এই আশঙ্কায় সকলেই বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি অবশ্য যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই এ কথা বলিতেছি না। জগতে অনেক কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা সকলেই সেই সকল সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া রাত্রিতে জাগিয়া বসিয়া থাকি না।

ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পম্পিয়াই নগরী ধ্বংস পাইয়াছিল। তেমনই ভাবে চাই কি প্রিমরোজ পাহাড়েও অগ্নি ও লাভা উদ্গীরণ করিতে পারে এবং ফলে লণ্ডন নগরীও ধ্বংস পাইতে পারে।

ইউরোপে এখন দুইজন জুয়াড়ী আছে। যারা সাহসের সঙ্গে বলিতে পারে ১৯১৪-১৮ সনের মহাযুদ্ধের ন্যায় যুদ্ধ বাধা অসম্ভব। বিখ্যাত জুয়াড়ীদ্বয়ের নাম হইতেছে বেনিতো মুসোলিনী ও এডলফ হিটলার। আমি ঐ দুইজন ভদ্রলোকের নামে জয়ধ্বনি দিতেছি। জাপানের যে মহাপুরুষ মাঞ্চুকুয়োর রাষ্ট্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নামেও আমি জয়ধ্বনি দিতাম, কিন্তু তাঁহার নাম আমি জানি না।

ঐ তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেই বলেন, ইউরোপে আর যুদ্ধ বাধিবে না। আমি উত্তেজিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, কিন্তু যুদ্ধ বাধিবে না। আমি প্রকাশ্যভাবে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিবিদদের নিতম্বে পদাঘাত করিব, কিন্তু যুদ্ধ বাধিবে না। উক্ত ব্যক্তিত্রয় কার্য্যেও তাহাই করিয়াছেন এবং আমরা যতই ভাবিয়াছি যে, এই যুদ্ধ বাধিল বলিয়া, ততই দেখিয়াছি যে, ইউরোপের রাজনীতিবিদ অপমান হজম করিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশে কালো মেঘ দেখা দিল, আমরা চীৎকার করিয়া বলিলাম, "যুদ্ধের কালো মেঘ দেখা দিয়াছে" কিন্তু কিছুই নহে—উহা ফাঁকা মেঘ মাত্র—হাসিবেন না—ভীত প্রাণীরাই বিপজ্জনক হইয়া উঠে।

"যুদ্ধের ভীতি বিকারের লক্ষণ মাত্র। আমরা কেন হিটলার ও মুসোলিনীর মত আমাদের মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে পারি না? "আমাদের মাথাই নাই তার মাথা ঠাণ্ডা রাখিব কি করিয়া" এই জবাব দেওয়া চলে; কিন্তু ও জবাবে ভুলাইবে না। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে ইতালী ও জার্ম্মাণীর ন্যায় যথেষ্ট মাথাওয়ালা, সাহসী ও সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক আছে। ঐ সকল লোক মনে করে যে, যুদ্ধের ভীতি বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ মাত্র।

মনে হয়, মন্ত্রীরা যাহা কিছু ভাবিতেছেন তাহা চলচ্চিত্র দেখিয়াই ভাবিতেছেন। আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন চলচ্চিত্র ছিল না, কাজেই চলচ্চিত্র না দেখিয়াই আমাদের মন গড়িয়া উঠিয়াছে।

জার্ম্মাণী আর ইতালীতে দৈত্যরূপী ডিক্টেটরগণ শাসনকার্য্য চালাইতেছে এ কথা আমি মানিয়া লইতে পারি না। এই সেদিন কোন দেশহিতৈষী সমিতির সভ্যরা হের হিটলারের লেখা "মায়েন কাম্ফ" পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদে বাদ দেওয়া হইয়াছে এমন কয়েকটা ভয়ানক লাইন পড়িয়া আমাকে ঘাবড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমিও দেখিলাম হিটলার ঠিক কথা বলিয়াছেন। লাইনগুলি মোটেই ভয়ঙ্কর নয়—হিটলারের সব প্রস্তাবেই আমার

বলিতে পারি। বাংলার বৈশিষ্ট্য যদি রক্ষা করিতে হয়, এবং বাংলার জাতীয় ভাব যদি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তবে বাঙ্গালীর পক্ষে এই প্রস্তাব পরিত্যাগ করা ব্যতীত গত্যন্তর থাকিতে পারে না।

সম্মতি আছে এবং আমাদের মন্ত্রিবর্গের কেহ যদি ঐরূপ অর্থপূর্ণ স্বীকারোক্তি লিখিতে পারেন, তাহা হইলে আমি সুখী হইব। এমন কি ইহুদী নিধনেও আমার সম্মতি আছে। আমি আরও বেশীদূর অগ্রসর হইতে চাই, আমি বলি সমস্ত মনুষ্যজাতিটাকেই নিধন করা উচিত। রাশিয়ানরা অর্দ্ধসভ্য রুশ চাষীদের সন্তানদের যেভাবে শিক্ষা দিয়া সম্পূর্ণ অন্ত-ভাবে গড়িয়া তুলিতেছে এবং তাহার ফলে যেভাবে অর্দ্ধসভ্য রুশ চাষীরা লোপ পাইতেছে, ঠিক সেই-ভাবেই বর্ত্তমান মনুষ্যজাতিকে লোপ করা উচিত। রাশিয়ানরা তাহাদের ছেলেমেয়েদের চোর ডাকাতের আড্ডার উপর বিষাক্ত গ্যাস ছাড়িবার, আর নানা সাজে সজ্জিত অকর্ম্মণ্য ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলাদের ছবি দেখাইয়া ছেলে-মেয়েদের মনকে বিষাক্ত করিয়া তোলে না। যাক, এখন আপাততঃ যে প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহা লইয়াই আলোচনা করি।

যুদ্ধ কি অবশ্যম্ভাবী? আমি বলি যুদ্ধের সম্ভাবনা এত কম যে যুদ্ধ বাধা অসম্ভব। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন গবর্ণমেন্টরা ইচ্ছামত যুদ্ধ বাধাইতে পারিতেন এবং অনিষ্টের হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইতেও পারিতেন। তখন মেয়েদের বাহাদের নিরাপত্তার উপর সমাজের নিরাপত্তা নির্ভর করে—নিরাপদ স্থানে রাখিয়া বাছা বাছা শক্তিশালী পুরুষেরা লড়াই করিত। সমুদ্র বেষ্টিত ইংলণ্ডে আমরা তখন নিরাপদে বাস করিতাম—শত্রুপক্ষকে ইংলিশ

চ্যানেলের নীচ দিয়া সুড়ঙ্গ না কাটাইতে দিলেই ঢুকিয়া যাইত।

কিন্তু এখন আর সে দিন নাই—এখন বৃটিশ মন্ত্রিসভা যদি আগামী কল্য মধ্যাহ্নে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তাহা হইলে অপরাহ্নের মধ্যেই—চা পান করিবার পূর্ব্বেই আমাদের শাসকগণ গ্যাস আক্রমণের ফলে দমবন্ধ হইয়া—আগুনের তাপে সিদ্ধ হইয়া মারা যাইবেন। তাঁহাদের দেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে—পাদ্রীর মন্ত্র শুনিবার সৌভাগ্য আর তাঁহাদের হইবে না, তাহার পূর্ব্বেই তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইবে। লণ্ডনের মেয়েদেরও ঐ দশা ঘটিবে, এ অবস্থায় কি যুদ্ধ ঘোষিত হইবার কোন সম্ভাবনা আছে? পাঁচ বৎসর পরে যুদ্ধ বাধিবে? পাঁচ বৎসর ধরিয়া ভয়াবহ মরণাস্ত্রসমূহ আবিষ্কারের পর যুদ্ধ বাধিবে?

যদি পাঁচ বৎসর পরে যুদ্ধ না বাধে তাহা হইলে কি দশ বৎসর পরে যুদ্ধ বাধিবে? দশ বৎসরের মধ্যে জাতিসমূহ যখন বেতার বা মারণ রশ্মির সাহায্যে পরস্পরকে ধ্বংস করিতে পারিবে তখন কি যুদ্ধ বাধিবে? আমাকে আপনারা হয়ত স্মরণ করাইয়া দিতে পারেন যে, আজকাল যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কেহ যুদ্ধ বাধায় না—বিনা নোটিশেই আজকাল যুদ্ধ বাধে। উহার অর্থ আর কিছুই নহে—উহার অর্থ যুদ্ধের হুমকী দেওয়া গুলী চালনা করার মতই বিপজ্জনক।

উহাদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রিসভা ব্যতীত আর কোন মন্ত্রিসভাই বিমানশক্তিহীন উপজাতি ব্যতীত আর কোন জাতির বিরুদ্ধে মুষ্টি আস্ফালন করিবে না। হাবসীরা যেভাবে ধ্বংস হইয়াছে তাহা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। যুদ্ধ বাধিলে অতি সভ্য জাতিগুলির কি দশা হইবে তাহা আমাদের মনে রাখা উচিত। শুধু ধ্বংস হইবে বলিলেই আগামী মহাযুদ্ধের ফলাফল বুঝা যাইবে না—ধ্বংস অপেক্ষা আরও ভয়ানক যদি কিছু থাকে ত' তাহাই হইবে।

বিষাক্ত গ্যাস খুব ভাল শান্তিস্থাপক। আমাদের সকলেরই প্রাণপণে গ্যাস তৈরী করা উচিত। নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে কিছু বলিলে রাজদ্রোহ হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হউক, সুয়েজ হইতে গ্রীস পর্য্যন্ত ভূমধ্যসাগরের সমস্ত উপকূলভাগে যাহাতে গোলাবর্ষণ করা যায় এইভাবে আমাদের নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। যতক্ষণ না শেষ জাহাজটি টর্পেডোর আঘাতে নিমজ্জিত হয় ততক্ষণ গোলাবর্ষণ করা হইবে। আকাশ আমাদের বিমানে ছাইয়া ফেলা হউক। এইভাবেই অর্থের সদ্ব্যয় হইবে। আজিকার বিরাট অস্ত্রসজ্জা শেষ হইবার বহু পূর্ব্বেই যদিও যুদ্ধজাহাজ ও বিমানপোত অকেজো হইয়া যাইবে, তথাপি ঐগুলি নির্ম্মিত হইলে আমাদের শ্রমিকদের কাজ জুটিবে এবং আমাদের নৌবিভাগের কর্মচারীরা বিদেশের বন্দরগুলিতে স্ফূর্ত্তি চালাইতে পারিবে।

বিমানগুলি ত বর্ত্তমান যুগে শান্তির দেবদূত। মোটের উপর মুসোলিনী ও হিটলারের স্পর্দ্ধাসূচক আস্ফালনবাক্যের উপর আস্থা রাখিয়া আমি নির্ভয়ে আপনাদিগকে উপদেশ দিতে পারি যে, আপনারা যুদ্ধ বাধিবে বলিয়া যে হুজুগ উঠিয়াছে তাহা মানবিক দৌর্ব্বল্যের পরিচয় মাত্র বুঝিয়া যুদ্ধের আশঙ্কা ত্যাগ করুন।'

শ্রীশ্রীকালী পূজা

শ্রীশ্রীকালী পূজা উপলক্ষে আমরা নানাস্থান হইতে আমন্ত্রণ লিপি পাইয়াছি। এজন্য ঐসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সাহিত্যে পুজোর বাজার

এবার পুজোর বাজার গাবিয়েছেন শৈলজা বাবু। তাঁর 'মরা মা' ছবার ক'রে মরলেন!—আর কবার মরবেন জানি না! কিন্তু তাঁর এই মা মরা দেখে অনেকদিন আগের কথা মনে পড়লো। টাকার চাহিদায় গোপাল ভাঁড়েরও ছবার মা মরেছিলো।—কৃষ্ণচন্দ্র রাজার সেটা সয়েছিলো কিন্তু গরীব কাগজওয়ালাদের সয় কি ক'রে?

* * *

বুড়ো জলধর দা'কেও শৈলজা বাবু 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ড' মাল চালিয়েছেন। কিন্তু 'সেকেণ্ড হ্যাণ্ডের' মূল্য তিনি নেন নি। ছি, ছি, চোখে কম দেখেন ব'লে কি—

আর দাদাই না হয় চোখে কম দেখেন কিন্তু আপে খ্যাত চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির তো অভাব নেই।

তবে ওঁরা নাম করা লেখক—শুড উইল এরও তো একটা মূল্য আছে।

ছবার ক'রে মেয়ে বাঁচে এমন মায়ের খবরও আমরা জানি, কিন্তু সে মা—যাক্ সে সে কথা।

* * *

বুদ্ধদেবের 'বাড়ীউলীকে'ও ছবার ক'রে দেখলাম।—এ আবার তাঁর কি রোগ হ'লো? [illegible] [illegible] দিয়ে— লোকে যে অনেক কিছু বলছে।

পুজোর বাজারে [illegible] দেখছি পচা মালের কারবারি!—কিন্তু এমন্ করলে যে ব্যবসায় ফেল মারবে বাপধন!

* * *

বাতায়নের ঘোষাল মশায়ের সংবাদ কেউ জান? শুনেছিলাম, পুজোর কাগজ বের ক'রেই তাঁর মাথা গরম হয়, কিন্তু তারপর এই দীর্ঘ দিন কোন খবরই তাঁর পাই নি।

উঃ, সে দিনের দৃশ্য কি ভয়ঙ্কর!—বল্লেন, কাগজ বের করেছি—বেশ করেছি, আমি কাউকে দেবো না। লিখেছো?—লিখলে কেন? তোমাদেরকেই যদি দেবো তবে কাগজ আমার বিক্রী হয়ে কাজ নেই: আমার যে খরচ উঠবে না।

বিনা পয়সার লেখক বুড়ো আঙুল চুষতে চুষতে বাড়ী এলো।

কলসীর পর কলসী জল ঢেলেও সে মাথা ঠাণ্ডা হ'লো না। কবিরাজ বন্ধু এলেন, মধ্যম নারায়ণের ব্যবস্থা হ'লো।—এই পর্য্যন্তই জানি কিন্তু তারপর কেউ খবর জান?

* * *

সে দিন এক বন্ধু এসে পাগলের মত ধপাস্ ক'রে আমার সাম্‌নের চেয়ারটায় বসে পড়লো।—কি ব্যাপার? বল্লে, গেলুম।

—গেলুম মানে?

—রুচীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

—কেন রে?

[illegible] কাগজ আমার সাম্‌নে মেলে ধর্‌লে।—দেখলাম, পুরোনো একখানা 'অগ্রগতি'।

বল্লাম, এই ব্যাপার?—এ তো শুধু একখানা, পুজোর কাগজগুলো বুঝি দেখিস্ নি?—দেখিস্। ঐ সব উলঙ্গ ছবি ছাপে কেন জানিস?—'এ্যানাটমি' পড়েছিস্? প্রত্যেক অঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'লে ছবির প্রয়োজন হয়।

—কিন্তু এতো 'এ্যানাটোমি' নয়,—এ যে সাহিত্য!—তবে শোন্:—

"মানসী হাঁপাতে লাগলো আর সুশীল অস্ফুট গলায় বোললো আপনি বড্ডো উত্তেজিত হয়েছেন—একটু স্থির হোন।

আমায় বোল্‌তে দাও, লক্ষ্মী ছেলে, বাধা দিও না! আমি তোমার কাছে মত জানু হ'য়ে বোল্‌ছি—সুশীল আমায় তুমি দয়া করো।"

—কিছু বুঝলি? এইখানেই অদ্বি একটি ছবির দরকার। তাহ'লেই মানে বেশ পরিষ্কার হ'য়ে গেল।

—হাঁ, তা হ'য়ে গেল বটে।

বল্লাম, এ সংখ্যাতে শুধু তো 'দয়া করো' বলে অনুরোধ করছে, অনেক সংখ্যাতে 'দয়া কর্‌লো' একথাও থাকে।

—তার ছবিও থাকে নাকি?

হেসে বল্লাম, না, তা থাকে না—এখনো ঐটুকু বাকী আছে।

* * *

প্রাচীর পত্র পড়িয়াছে—

শরৎ প্রতিভা অচলা

শিশির প্রতিভায় সচলা!

ইহা শরৎবাবুর সৌভাগ্য, না দুর্ভাগ্য? শিশির প্রতিভা কাহার কি তিনি অচলা?

———

তবু

শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র দেবনাথ

দুরন্ত যৌবনে প্রিয়া তুমি এলে অন্তরে আমার,
স্বপ্নাতুর জীবনেরে দিলে নব প্রেমের পরশ ;
ইঙ্গিতের মায়ামন্ত্রে ভরিয়াছ শত অভিসার,
ওষ্ঠপ্রান্তে রাখিয়াছ পূর্ণপাত্র, স্নিগ্ধ প্রেমরস !

ভিখারী হয়েছি তাই তব প্রেম করিয়া স্মরণ,
ব্যর্থতার তীব্রদাহ অনায়াসে করিয়াছি দূর ;
সুষমায় মুগ্ধ হ'য়ে ভুলিয়াছি মিথ্যার স্বপন,
তবু কেন চিত্তে তব বেজে উঠে বিদ্রোহের সুর ?

প্রেমে যারে করিয়াছ মনোহর উন্মাদ চপল,
তারে তুমি করিবে কি ছন্নছাড়া রূপের পিপাসায় ?
নয়নে যে বহ্নি জাগে তার তেজে পৃথ্বী টলমল,
মরণের মরীচিকা তবু কেন বসন্ত নিশায় ?

তৃষাতুর চিত্ত মোর চাহে শুধু তৃপ্তি-মাধুরিমা,
সুন্দরের স্বপ্ন মাঝে তবু কেন ভোগের পূর্ণিমা ?

১১ই নভেম্বর যুদ্ধ বিরতি দিবসে কলেজ স্কোয়ারে [illegible]
বাঙ্গালী বীরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

পুরুষ—হৃদয়হীন

(গল্প)

শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়

[এই গল্পের নায়ক সম্পদ রায় ও নায়িকা এলা সেন—উভয়েই পাশ্চাত্যের দীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত। পরিচয়—একজন প্রেমিক, অপরা প্রেমিকা। উভয়ের প্রণয়কে পরিণয়সূত্রে দিয়ে বাঁধবে, এই আশা এলাকে দিয়ে দু-বছর আগে সম্পদ গিয়েছিল বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়তে। সম্প্রতি সে দেশের মাটীতে পা দিয়েছে। দোদুল্যমান বার-এ্যাট্-ল।]

প্রথম দৃশ্য

ক্রীং-ক্রীং-ক্রীং……(ফোনের বেলটা আর্ত্তনাদ করে উঠল—এলা এগিয়ে এসে রিসিভার তুলল)

হ্যালো! কে আপনি? এঁ্যা: তুমি! সম্পদ?

হ্যাঁ আমি সম্পদ! কিন্তু তুমি তো এলা?

নিশ্চয়। (হেসে বলল) কী গো এ্যাদ্দিন পরে মনে পড়লো?

দেখতেই পাচ্ছো!—এলা!

কী—বলো?

এলা—এলা।

কী-কী-কী? বর্ব্বর: কেবল এলা এলা। বলো না কী বোলবে। এ্যাদ্দিন তো মনে পড়েনি। মনে যদি পড়লো একবার তাহ'লে আর রক্ষে নেই। তোমরা পুরুষ জাতটাই এমন। যতোক্ষণ চোখের সামনে [illegible] থেকে

একদণ্ড আড়ালে গেলে বেমালুম সব ভুলে যাও! মেয়েদের মতো স্মৃতির দেকুর তোমার বাট নেই।—বলো কী বোলবে। আমি তো তোমার কথাই শুনতে চাই।

তোমার ঘরে কেউ আছে?

না, কেউ নাই, আমি একলা। তাড়াতাড়ি বলো, শেষকালে লাইন কেটে দেবে।

হ্যাঁ বোলছি—তুমি আজ বিকেলে বাড়ী থেকো—মানে সন্ধ্যার আগে আর কী!

থাকবো—কোথায় যাবে?

ঠিক নেই। তখন ঠিক কোরলেই হবে।

সত্যি বলো না কোথায় যাবে?

মিথ্যে বোলছি না। ঠিক নেই, দুজনে মিলে ঠিক কোরবো!—এলা!

বলো!

তুমি রাগ কোরেচো আমার ওপর?

কেন?

এ্যাদ্দিন পরে খোঁজ কোরছি বলে।

নিশ্চয়! 'রাগ'টা পুরুষের পৌরুষত্বের দীপ্ত লক্ষণ বোলে, মেয়েদের রাগ করবার অধিকার নেই না-কী?

সত্যি বোলছি এলা, লণ্ডন থেকে ফিরেছি সেপ্টেম্বরের ফার্ষ্ট উইকে—মানে দিন পনেরোর বেশী হবে না। নানাকাজে ব্যস্ত থাকায় এতোদিন খোঁজ-খবর নিতে পারিনি। আশা করি অনিচ্ছাকৃত দোষের জন্য তুমি আমায় মাপ কোরবে।

উঁহু মাপ হবে না। ওটা অতো সস্তা জিনিষ নয় যে যখন তখন যার তার ওপর প্রয়োগ করা চলে। আর প্রেমিকার রাগ বুঝি ক্রোধ, সে তো অভিমানের রূপান্তর।

আবার অভিমান হোচ্চে ভালবাসার ওপিঠ—আচ্ছা যাই।

খোৎ যাই বোলতে নেই। বলো—আসি।

তবু ভালো! প্রণয়িনীর কল্যাণীরূপ দেখলুম আজ। অবশ্য চোখে দেখিনি, কণ্ঠস্বর শুনে তোমার স্বরূপখানি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো—এখন আসি, তুমি প্রস্তুত থেকো।

থাকবো গো থাকবো। না এলে কিন্তু আমায় মাথা খাবে।

....

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সম্পদ ও এলা—চলন্ত মোটরে বসে]

দুষ্কলে এলা, লণ্ডনে গিয়ে বিলাসিনী কবলে পড়েছিলুম আর একটু হোলে—ওকি! শিউরে উঠলে যে! তা বোলে যেন সন্দেহ কোরে বোসনা আমায়। সত্যি বোলচি তোমার দেওয়া ছবিখানি আমাকে উদ্ধার কোরেছে। তার সে ঋণ তোমার কাছে! জীবনে আমি নানা দেশ ঘুরেছি, কিন্তু সত্যি কথা বোলতে কী বাঙ্গালী মেয়ের মত লাবণ্যময়ী চোখে পড়েনি—বিশেষ কোরে এলা নাম্নী একটি মেয়ের মত!

থাক্ থাক্ ঢের হোয়েছে। আমার জন্তেতো আর তোমার ভাবনার অন্ত ছিল না!

বিশ্বাস হোচ্ছে না? আমি নাচার! 'বিশ্বাস'টা এমনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি যে শক্তি কিংবা যুক্তি দিয়ে করানো যায় না—

থাক্, তোমার দার্শনিক উক্তি হৃদয়ঙ্গম করবার ঢের সময় মিলবেখ'ন। কোথায় চলেছো বলোতো?

হোটেলের দিকে।

কোন্ হোটেলে?

তুমি যেটাকে পছন্দ কোরবে।

যদি বলি কোনটাই আমার পছন্দসই নয়। ওসব দিকই মাড়াবো না!

সুতরাং,—আমিও তাই—কাছ ছাড়া শীত নাই।

দূর! এমনি বোলছিলুম। গ্র্যাণ্ডেই যাওয়া যাক্, কেমন?

তাই—আই এ্যাম অলওয়েস এ্যাট ইওর সার্ভিস। যদিও কথাটা কেরাণীদের রেজেষ্টারী করা বুলি।

শুধু হোটেলে! আর কোথাও যাবে না?

নাম করো কোথায় যাবে।

যথা: গ্লোব-ম্যাডান-মেট্রো কিংবা এলফিনষ্টোন্!

বেশ, যেখানে হোক গেলেই হবে আর কী।

তোমার শীত কোরছে না?

আশ্বিন মাসে শীত? অসুখ কোরল না কী? দেখি কপালটা (কপালে হাত রাখল)

ধ্যেৎ! অসুখ কোরতে যাবে কোন্ দুঃখে। হাওয়া লেগে যেন একটু শীত কোরছে! বাব্বাঃ যে জোরে চালাচ্ছো!

এই তোমার কাছে জোর হোলো! আমার কী মনে হয় জানো?

কী?

মনে হয় ছুটি কেবল ছুটি গতি হোক অরুদ্ধ, বেগ হোক প্রচণ্ড। থাকবো শুধু তুমি আর আমি। পারিপার্শ্বিকের দিকে চোখ বুজিয়ে ছুটবো আমরা। কেননা তাদের ঈর্ষা-বিদ্রূপ আমাদের চলার পথে আগল তুলতে না পারলেও, বেগ কমে আসবে নিশ্চয়।

তা বলে সত্যি সত্যি যেনো চোখ বুজিয়োনা—

....

[illegible] প্র মুক্ত [illegible]

[গ্র্যাণ্ড হোটেলের স্পেশাল কম্পার্ট-মেন্ট! সম্পদ ও এলা লাগোয়া সোফায় বসে। তাদের সামনে গোল টেবিলটার ওপর দুটী গেলাস। ভেতরকার রঙীন পানীয় সাদা কাঁচ রক্তিম করে তুলেছে। তার পাশে গোটাকতক ডিসে মাংস, চপ ইত্যাদি। প্রথমে কথা বলল এলা:]

গেলাসে ওগুলো কী?

সোডা, খেয়ে ফেলো চট্ কোরে। তোমার ঠোঁটের কাছে এগিয়ে দেবো? আর তুমি ধোরবে আমার মুখে।

নাঃ ভারী লজ্জা করে।

লজ্জাটা কিসের? এটা একটা আলাদা ঘর, কেউ দেখতে পাচ্ছে না!

তা জানি কিন্তু—আমি বরং তোমাকে দেবো, তুমি আমাকে দিও না।

তবে থাক—নিজেই নিচ্ছি।

ইস্—অমনি পুরুষসিংহ কেশর কাঁপিয়ে তুললেন—নাও ধরো। আগে তুমি তারপর আমি (সম্পদের মুখে গেলাস ধরল)।

আঃ! (নিঃশেষ করে পাশের ভর্ত্তি গেলাসটা এলার পাতলা ঠোঁটের সামনে তুলে ধরল) খাও!

(এক চুমুক দিয়ে) উঃ কী ঝাঁঝ! গলা জলে যায়। কী দিয়েছে এতে ?

কিছু না—কই আমার তো কিছু বোধ হোলো না! নাও লক্ষী মেয়ের মত খেয়ে ফেলো চট্ কোরে!

(নিঃশেষান্তে) ভীষণ গলা জ্বালা কোরছে—বুকও—উঃ কী খাওয়ালে ?

সোডা লেমনেড। খানিকটা মাংস খেয়ে ফেলো, এক্ষুনি সব সেরে যাবে।

(মাংসাহারান্তে) মাথা ঘুরচে—বুক জ্বালা কোরছে। উঃ আমায় তুমি কি করলে গো!

তোমার মস্তক ভক্ষণ কোরলুম মাই ডিয়ার।—এসো ডান্স করা যাক একটু!

উহু—উহু; আমি পারবো না। আমায় বাড়ী নিয়ে চলো, বোসতে পারচি না! পা'র তলায় মেঝেটা দুলছে, চোখে যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না! (দাঁড়িয়ে উঠে) হাত ধরো, লক্ষীটী হাত ধরো সোণা আমার।

এ কী! তুমি দস্তরমতো কাঁপছো যে! ছোঃ একেবারে নাইন্‌টিন্‌থ সেঞ্চুরির নাবালিকা!

আঃ—পড়ে যাবো যে!

নাগো যাবে না! তবে আমি ধরে আছি কী কোরতে!

যাবো—যাবো, একশোবার যাবো!—ছ্যাইসেন্স কোথাকার মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দিতে লজ্জা করে না—একটুও গা কেঁপে ওঠে না?—যতোদিন না বিয়ে হয়, ততোদিন—

আঃ চেঁচাচ্ছো কেন। চুপ—একদম চুপ। (মুখে হাত চাপা দিল) কোয়াইট আন্‌ কাল্‌চারড! তোমরাই আবার উতলা হোয়েচো পুরুষের সঙ্গে কোর্টশিপ করে বিয়ে করবার জন্য! ছোঃ—

উম্-উঁ-উঁ (হাত ছাড়াইয়া) যতোদিন না বিয়ে হয়, ততোদিন তুমি আমার কেউ নও—বন্ধুও না—পরপুরুষ—

এলা! কী কোরছো তুমি!

ঠিক কোরছি! একটা বোকা মেয়ে যা করে তাই কোরছি। কুকুরের মুখে নিজেকে তুলে দিয়েছি।—না-না আমি তোমাকে চিনিনা—জানিনা। সম্পদ রায় বলে কোনো লোকের নাম আমার মনে পড়ে না।

এলা, বাড়ী চলো!

হ্যাঁ-হ্যাঁ বাড়ী চলো (গানের ভঙ্গীতে) হোম-সুইট-হোম! (একটু থেমে সম্পদের চিবুক ধরে) আমার ওপর রাগ কোরলে মণি ?

না, বাড়ী চলো!

না-না যাবোনা, কিছুতেই যাবো না! আগে বলো—আমার মাথা ছুঁয়ে বলো রাগ করো নি, আমার ওপর, তবে যাবো নইলে—(ডুকরে কেঁদে উঠল এলা—সম্পদের কাঁধের ওপর মাথা এলিয়ে দিল)

(সোহাগ স্বরে) এলা—এলা মাই হনি বার্ড (এলার ঘাড়ে চুম্বন করল)

....

শেষ দৃশ্য

[পরদিন সকালে।—ওপরে নিজের ঘরে এলা ইজিচেয়ারে শুয়ে। অবসাদের মূর্ত্তিমতী স্বরূপ! মাথার চুলগুলো রুক্ষ অবিন্যস্ত; কতক গালে, কতক কপালে এসে পড়েছে—চোখ দুটী ঘোলাটে, তন্দ্রাচ্ছন্ন—তার কোলে গভীর কালীর রেখা।—চাকরের প্রবেশ]

দিদিমণি, আপনার চিঠি!

কই দেখি (চিঠি হাতে নিয়ে চাকরের দিকে চোখ তুলে) যা তুই এখন!

(চাকরের প্রস্থান!—রঙীন খামটী খুলে পড়ল)

পরম প্রিয়তমা এলা,

আমি চললুম কোলকাতা ছেড়ে আজই। আপাততঃ গন্তব্য বোম্বে, তার-

স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব

শ্রীনলিনী দেবী

মামুলি তর্ক—পুরুষ বলে মেয়েরা ত গায়ে বাতাস লাগাইয়া আরামে ঘরে বসিয়া থাকে—খাটিয়া মরি আমরা। মেয়েজাত বলে, বটে! এস না, একবার সংসার-ঘানিযন্ত্র টানিয়া ছাখ না—কতখানি আরাম, তখনই বুঝিবে!

অর্থাৎ পুরুষ করে চাকরি-বাকরি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন। এই অর্থ নহিলে সংসার চলিবে না—তা সংসারে দাস্ত করিতে থাকুক অক্ষৌহিণী এবং এ পয়সা রোজগার করিতে কি দারুণ দুশ্চিন্তা, কি কঠিন শ্রম—কতখানি উদ্বেগ, অনিশ্চয়তার কত ভয়, সংসার-দায়িত্বের একশেষ—অসুখ হইলেও বিরাম নাই, ছুটী নাই। আমোদ নাই, বিলাস নাই—নিত্য রুটীন ধরিয়া কাজ করিয়া যাও: সে কাজে কারও দরদ নাই, স্নেহ নাই। মেয়েরা? কাজ করিতেছে ঘরে বসিয়া—পরের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না—যখন খুশী কাজ কর। অসুখ করিল ত বিশ্রাম লও! এ কাজটা আজ হইল না, কাল হইবে বলিয়া ফেলিয়া রাখা চলে। পুরুষের কাজের বেলায় তাহা হইবার যো নাই। সুতরাং দু'জনের কাজ লইয়া তর্ক চলে না, চলিতে পারে না।

এ কথার উত্তরে স্ত্রী-জাতি বলেন—মেয়েদের কাজ পুরুষ একবার করিয়া দেখুক—সে কাজ সহজ কি কঠিন, বুঝিতে পারিবেন।

একপাল ছেলেমেয়ে "ক্ষুধা পাইয়াছে খাইতে দাও" বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল—তাদের রুচি বয় ও সমান নয়। ঘরে [illegible] নাই, তখন এ দিক সামলায় কে? পুরুষ? না মেয়ে-জাত? অফিসে নিত্যকার বাঁধা রুটীনে সেই একই কিম্বা এক রকমের কাজ—সে কাজ কঠিন? না, সংসারে এর জ্বর, ওর পেটের অসুখ, ওর নিত্য মাথাধরা—সকলের সব দিক বুঝিয়া মুখে আহার, শয়নের শয্যা, পিপাসার জল, রোগের ঔষধ পথ্য যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ কঠিন?

একজন ইংরেজ মনস্বী লিখিয়া গিয়াছেন—মেয়েরা জানিতে চাহেন, কোনটা কষ্টকর, সমস্তদিন অফিসে নিরুপদ্রবে কাজ করা, না বাড়ীতে অধগী ছেলেপিলে লইয়া জ্বালাতন হওয়া? শুধু তাহাই নয়, আহার প্রভৃতি সারিয়া বিশ্রাম কি মেলে? কোন ছেলে গিয়া রৌদ্রে ছড়াছড়ি করিতেছে, কে গিয়া জল ঘাটিতেছে—সব দিকে নজর রাখা চাই। তার উপর আছে—কর্ত্তার কাপড়-চোপড়ের খবরদারি করা—ভাঁড়ারের শৃঙ্খলা সাধন, বাজারের হিসাব বুঝিয়া দু'বেলার আহারের ব্যবস্থা এবং কর্ত্তা ফিরিলে তাঁর পরিচর্য্যায় না ত্রুটি ঘটে, সেদিকে সে সম্বন্ধে কর্ত্তব্য সাধন।

স্ত্রী-জাতি যে কথা বলেন তাহা অস্বীকার করা চলে না। মেয়ে-পুরুষ—কাহারও জীবন আরামের নয়—তবে বেশী ভারী বোঝা বেশী দায়িত্ব বহিতে হয় মেয়েদের।

পুরুষের দেহের বল অনেক,—সত্য; কিন্তু মনের বল বেশী মেয়ে-জাতের। তারা সহজে মচকায়—কিন্তু ভাঙ্গে না। বিপদে মেয়েজাত কি ভীষণভাবে ধৈর্য্য রক্ষা করেন! পুরুষ চেঁচায়—রাগ করে—মেয়েজাত নীরবে সহে। রোগে পড়িয়াও সুস্থির নন—কোনখানে সংসার যন্ত্র বিকল হইল কি না—সেদিকে তাঁর সজাগ লক্ষ্য।

তার উপর ভাগ্য অর্জ্জনের ব্যাপার। 'পুরুষস্য ভাগ্যং' বলিয়া যে কথা চলিত আছে, তাহা খুব সত্য। ভাগ্যগঠনে পুরুষের সুযোগ চারিদিকে—মেয়েজাতের সে সুযোগ নাই। স্বামী তাঁর ভাগ্যের সীমা নির্দ্দেশ করে।

সাধারণতঃ মেয়েদের জীবন কি করিয়া কাটে? প্রাতে সবার আগে শয্যাত্যাগ করিতে হয়—স্বামী তখনও বিছানায় পড়িয়া আছেন—স্ত্রী উঠিয়া চা তৈয়ার করিলেন—স্বামীর মুখে
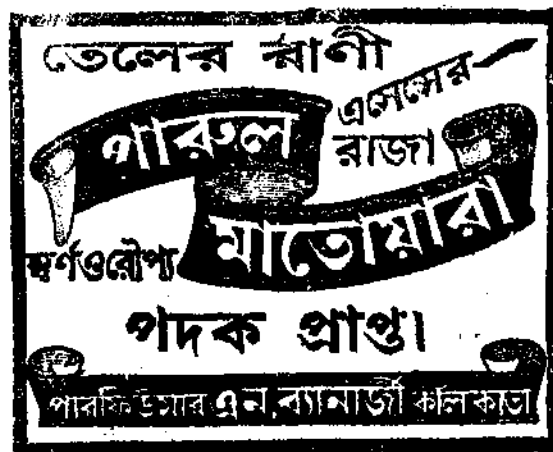
পেয়ালা ধরিয়া দিলে তবে তিনি শয্যা-ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। তার পর স্বামী বাহিরের ঘরে গিয়া খবরের কাগজ খুলিয়া বসিলেন—স্ত্রী গিয়া সংসার ঘানি-যন্ত্রে নিজেকে দিলেন জুড়িয়া! বাজারের হিসাব কর্দ্দ হইতে সুরু করিয়া সর্ব্বজনের মুখরঞ্জন আহার্য্য ব্যবস্থা—সেই সঙ্গে বড়ি দেওয়া, আচার তৈরী করা—কাহারও সাবু, কাহারও বার্লি—যেন দশভূজা হইয়া সারাদিন সংসারের কাজে নাচিতে হয়। যে চটিবে, তার মনোরঞ্জন করিতে হইবে। যত দায় তাঁর। ছেলেমেয়ে ঝগড়া-বিবাদ করিল, বাপ দিলেন তাড়া, মা তাড়া দেন কম—তাঁকে এ বিবাদ মিটাইতে হয়, ভুলাইয়া মিষ্ট কথা বলিয়া। পুরুষের কাজে রবিবার আছে, ছুটী আছে—মেয়েদের নাই রবিবার, নাই বড়দিন, নাই ছুটীছাটা!

মেয়েদের কাজে উত্তেজনা নাই, হাত-তালি নাই—শুধু আছে ভারবহা! পুরুষের কাজে তারিফ আছে—এ প্রভেদ বড় কম কথা নয়! এবং মেয়েদের এ কাজে পুরুষের দরদ সহানুভূতি নাই—এর চেয়ে দুর্ভাগ্য নারীর আর কি আছে? পাশ্চাত্য সুধীরাও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন।

নারী ও শিশু বিক্রয় ব্যবসা দমন

রাষ্ট্র সঙ্ঘের মহাসভাতে নারী ও শিশু বিক্রয়-ব্যবসা দমন সমিতি একটী কৌতূহলজনক বিবৃতি দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশই এই পাপ ব্যবসার উচ্ছেদ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে নারী-বিক্রয় ব্যবসা দমনের জন্য যে নিয়ম পত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, ৪৮টী দেশ সম্পূর্ণ ভাবে তাহা গ্রহণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া ৪৪টি দেশ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের নিয়ম পত্র অনুমোদন করিয়া সেই মত আইন প্রচলন করিয়াছে।

যে সমস্ত লোক নারীকে গণিকা বৃত্তিতে প্রবৃত্ত করাইয়া তাহার দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে তাহাদের বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া আইন প্রচলন করিবার জন্য একটী নূতন নিয়ম পত্রের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে। প্রস্তাব হইয়াছে, রাষ্ট্র সঙ্ঘের সদস্য দেশ গুলিকে সত্বর এই নিয়ম পত্র-খানি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইবে।

কি উপায়ে সমস্ত দেশেই গণিকাদের পাপ বৃত্তি পরিত্যাগ করাইয়া সামাজিক জীবনে পুনরায় ফিরাইয়া আনা যায়, সে সম্বন্ধে রাষ্ট্র সঙ্ঘে যে সমস্ত অনুসন্ধান হইতে ছিল তাহার কাষ অনেক খানি অগ্রসর হইয়াছে। প্রায় ৪১টী দেশ হইতে এ বিষয়ে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং একটী প্রাথমিক বিবৃতিও প্রস্তুত হইয়াছে।

সুদূর প্রাচ্যে যে সমস্ত রুশ নারী নিরুপায় হইয়া গণিকা-জীবন যাপন করিতেছে তাহাদের উদ্ধারের জন্য যে প্রচেষ্টার ব্যবস্থা হইয়াছিল উপযুক্ত অর্থাভাবে তাহা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। নারী বিক্রয়-ব্যবসা দমন-সমিতি প্রস্তাব করিয়াছেন, যে, আশ্রিত সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র সঙ্ঘে যে ন্যান্‌সেন-সমিতি আছে তাহার উপর এই কার্য্যের ভার দিলে ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারিবে।

রাষ্ট্র সঙ্ঘের সভা সভাতে আরও স্থির হইয়াছে, যে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আগামী বছর ফেব্রুয়ারী মাসে নারী বিক্রয়-ব্যবসা দমন সম্পর্কে প্রাচ্য দেশগুলিকে নিয়া একটী সভা হইবে। তাহাতে যুক্তরাজ্য (হংকং ও মালয় রাষ্ট্রশক্তি), চীন, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ, জাপান, নেদারল্যাণ্ডস্, পর্ত্তুগ্যাল্ এবং শ্যাম দেশ হইতে প্রতিনিধিগণ যোগ দান করিবেন। আমেরিকার পক্ষ হইতেও একজন পরিদর্শক এই সভাতে উপস্থিত থাকিবেন। জাভাতে এই সভার অধিবেশন হইবে।

পরলোকে বিমল কৃষ্ণ

যে কথা কখনও কোন দিন কল্পনা করিতে পারি নাই, নির্ম্মম নিয়তির কঠোর বিধানে তাহাই আজ রূঢ় সত্যে পরিণত হইল। বিমল কৃষ্ণ নাই—সে প্ফুটনোন্মুখ কুসুম কালের ফুৎকারে অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছে—একথা ভাবিতেও বুক ফাটিয়া যায়। বিনা মেঘে অশনি সম্পাতের ন্যায় এই মহা নগরের প্রধান নাগরিক পরোপকারী, হৃদয়বান আশ্রিত বৎসল শুর হরি শঙ্কর পাল কে টি মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বিমল কৃষ্ণ পাল গত ২রা নভেম্বর প্রাতে পিতা মাতা পত্নী আত্মীয় পরিজন ও গুণমুগ্ধবর্গকে অকূল শোক সাগরে ভাসাইয়া অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হন—সেই কাল ব্যাধিতেই তাঁহার জীবন-দীপ অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হয়।

আমাদের স্নেহের পুতুল বিমল কৃষ্ণ মাত্র ২২ বৎসর বয়সেই রূপ ও গুণে সংসারটীকে মাতাইয়া মজাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার যশঃ সৌরভে তাঁহার বন্ধুগণ আত্মীয়গণ এবং কর্ম্মচারীবর্গ চির মুগ্ধ ছিল। তাঁহার রূপ কেবল দেহের রূপ নহে, মনের রূপ, কর্ম্মের রূপ, রূপ সাগরের রূপ নিত্য সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। বিমলের সকল বিষয়েই বিমলত্ব ছিল। তিনি দেশ বিখ্যাত ব্যবসায়ীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া পাঠ্য জীবনের পরিসমাপ্তির পর ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ব্যবসায়ী ব্যবহার তাঁহার ছিল না। বিমল কৃষ্ণ যথার্থই বিমল ছিলেন। রূপ গুণে লাবণ্যে, সহৃদয়তায়, অমায়িকতায়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় বিমলকৃষ্ণের বিমলত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিত।

বিমল কৃষ্ণের কর্ম্মময় জীবনই বা কত টুকু। মাত্র বাইশ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই সংসার জীবনের সাধ না মিটিতে আশা না পুরিতেই সকলি ফুরাইয়া গেল। সংসার সমুদ্রে একটী বুদবুদ উঠিয়াছিল দুদিনের জন্য হাসিয়া ভাসিয়া, নাচিয়া খেলিয়া ডুবিয়া গেল। রাখিয়া গেল শুধু স্মৃতির তীব্র দাহন জ্বালা—মর্ম্মভেদী হা-হুতাশ ও অশ্রুজল।

সান্ত্বনা দিব কাহাকে! নিজের মনই যে কোন রূপে সান্ত্বনা মানিতে চাহে না। যে ভুলিবার নয় তাহাকে কি সহজে ভোলা ও ভোলান যায়; যাহাদের মর্ম্মভেদী শোকাশ্রু প্লাবনে অশ্রু সায়রের সৃষ্টি হয় সেই বিমল-হারা মাতা পিতা ও কাকা বাবু এবং সংসার কাননের আধ ফোটা কুসুম কলিকা বালিকা বধূকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব, কোন ভাষায় তাঁহাদের শোকাপনোদন করিব! ভাষা আজ নীরব, শোকদীর্ণ হৃদয় ভেদিয়া যে শুধু মর্ম্ম ভেদী হাহাকারই উঠিতেছে। পুত্র-শোকাতুরা জনক-জননী, স্বামী বিয়োগ বিধুরা বালিকা বধূ, বিমল-হারা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও গুণ মুগ্ধদিগের অন্তরে বিমল যে শোকের অনল জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে, সে শোকের সান্ত্বনা নাই, তুষানলের ন্যায় সে শোকাগ্নির দহন জ্বালায় যাহারা রহিল তাহাদিগকে আজীবন জ্বলিতে হইবে।

দুঃখ যিনি দেন তিনিই আবার তাহা সহ্য করিবার শক্তিও দিয়া থাকেন। এই বিধাতৃ বিধানেই বিশ্ব সংসার চলিয়া আসিতেছে। এই আশা ও বিশ্বাসে শান্তিময়ের চরণ প্রান্তে শোকাকুল দীর্ণ জীবনের এই আকুল প্রার্থনা জানাইতেছি, হে সর্ব্বনিয়ন্তা আঘাত যখন করিয়াছ, তখন তাহা সহিবার শক্তি দাও, শান্তি যখন দিয়াছ তখন সান্ত্বনাও দিও প্রভু।

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী।

পরলোকে নরেন্দ্র নাথ সেন

আমরা জানিয়া দুঃখিত হইলাম, স্বর্গীয় কবিরাজ উপেন্দ্র নাথ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্র নাথ সেন গত শনিবারে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি 'হিতবাদীর' অন্যতম অংশীদার ছিলেন। উপেন্দ্র নাথ ও তাঁহার অগ্রজ দেবেন্দ্র নাথ সেন পিতা চন্দ্র কিশোর সেন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের বিশেষ প্রসিদ্ধি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের 'জবাকুসুম তৈল' আজ সর্ব্বত্র সমাদৃত। নরেন্দ্র নাথ ও দেবেন্দ্র নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র—উভয়েই সি. কে, সেন কোম্পানীর কর্ম্ম সচিব ছিলেন। নরেন্দ্র নাথ মিষ্টভাষী এবং অমায়িক প্রকৃতির ছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মীয়স্বজনবর্গকে তাঁহাদিগের শোকে আমাদিগের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ছায়া ও কায়া

—নাইট বার্ড—

রঙ্গজগৎ—

রঙ্গজগতের খবরে বিশেষ নতুনত্ব কিছু নেই। এক নব নাট্য মন্দিরে নতুন বই খোলা হয়েছে—শরৎ চন্দ্রের গৃহদাহ উপন্যাসের নাট্যরূপ অচলা। শরৎ প্রতিভা শিশির প্রতিভার কাছে এবার কি রূপ পেল, তা আমরা এখনও দেখে উঠতে পারি নি। তবে বাজারে কিন্তু তেমন নাম ডাক শুনছি না। "দেবী পঙ্কের অচলা লক্ষ্মীর মত" এই অচলা নাকি শিশির বাবুর ঘাড়ে চেপে বসে থাকবে। ভাল কথা। এই "অচলা লক্ষ্মী" সচলা না হলেই মঙ্গল।

রঙ্‌মহল—

রঙমহলের এখন দরজা বন্ধ। ১লা নবেম্বর অভিনয়ের পর থিয়েটার বন্ধ আছে। ভাঙ্গা জিনিষ তৈরী করা কঠিন কিন্তু তৈরী জিনিষ ভাঙ্গা সহজ—এই দুই রকম কাজে যথাক্রমে শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিক ও শ্রীযুত অমর ঘোষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শ্রীযুত মল্লিক এবং যামিনী মিত্রের পরিচালনায় যে রঙমহল আদর্শ থিয়েটাররূপে পরিগণিত হয়েছিল, অমর ঘোষ ও প্রভাত সিংহের হাতে পড়ে তার কি অবস্থা!

আপাততঃ থিয়েটারটী বন্ধ আছে। তবে পুনরায় শ্রীযুত শিশির মল্লিক বা শ্রীযুত যামিনী মিত্রকে এর পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে দেখলে বিস্মিত হব না। তাই বোধ হয়।

মিনার্ভা—

এখানে দস্যুর মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। শ্রীবরদা প্রসন্ন দাসগুপ্তের 'পরশুরাম' আগামী ২১শে অক্টোবর আসর অধিকার করবে।

নাট্যনিকেতন—

নাট্যনিকেতনে নতুন নাটকের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খবর পাওয়া যাচ্ছে না। তবে বড় দিনের সময় এখানে "গোরা" অভিনীত হতে পারে। এখন "কেদার রায়" ও 'আলাদীন' চলছে।

ষ্টুডিয়ো সংবাদ—

দেবকী বাবু পরিচালিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের বাংলা চিত্র 'সোনার সংসার' অন্যান্য চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সোনার সংসার ছবিখানি এমনই ভাবে তৈরী হয়েছে যে, সবরকম রুচির লোকেই ছবিখানি উপভোগ করতে পারবেন। এরূপ সর্ব্ব রসপুষ্ট ছবি বাংলায় খুব কমই হয়েছে। ছবির কাহিনীটীও বেশ করুণ রসাত্মক। আমাদের দৃঢ় ধারণা উত্তরায় ছবিখানা বহু সপ্তাহ ধরে লোকের মনোরঞ্জন করবে।

এদের 'বাগী সিপাহী' এখনও প্যারাডাইসে বেশ চলছে—দিল্লীতেও ছবিখানি বেশ সমাদর লাভ করেছে। সেখানে দুইটী চিত্র গৃহে একযোগে চলছে।

সোনার সংসারের হিন্দী সংস্করণ বড়

দিনের পূর্ব্বেই মুক্তি লাভের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছবিখানি মুক্তি লাভ করবে বড় দিনের সময়।

কালী ফিল্মস্

"দত্তর মতো টকী"র কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মাঝে কিছুদিন ছবি তোলা বন্ধ ছিল। গাঙ্গুলী মশাই দেশের বাড়ীতে পূজোয় গিয়েছিলেন, ফিরে এসে দ্বিগুণ

কালী ফিল্মসের "টকী অব টকীজে"
শ্রীমতী রাণীবালাকে দেখা যাবে

উৎসাহে লেগে গেছেন। ছবিখানি বড়-দিনের বাজারের আকর্ষণ হবে বলে অনেকেই বলছেন, কিন্তু ছবিখানি যদি মঞ্চবেবা হয়, অর্থাৎ মঞ্চের নাটকখানিই যদি হুবহু তোলা হয়ে থাকে (যেমন ইতিপূর্ব্বে আরো কয়েকখানি নাটকের বেলায় হয়েছে), তা হলে কিন্তু তাকে শেষে পস্তাতে হবে। যাক্, ছবিখানি ভাল হলেই আমরা আনন্দিত হব।

পপুলার পিকচার্স

এদের তৃতীয় ছবি "পণ্ডিত মশাই"-এর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিয়োতে সতু সেনের পরিচালনায় ছবিখানি তোলা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসের কাহিনী প্রায় সকলেরই জানা। এই গল্পটিকে সুষ্ঠুভাবে রূপ দেওয়া তেমন সহজ কাজ নয়, এবং এই ছবি তোলার ব্যাপারে যদি কর্ত্তৃপক্ষ শৈথিল্য দেখিয়ে থাকেন, তা হলে পণ্ডিত মশাইকে কিন্তু কেউ মানবে না। আমরা এ কথা বললাম এই জন্য যে, পপুলার পিকচার্সের অন্যতম অংশীদার শ্রীযুত যামিনী মিত্র স্বতন্ত্র ইউনিট করে 'সরলা' ছবি তুলে ফেললেন!

দেবদত্ত ফিল্মস্

এখানে জি, সি, টকীজের 'ইন্দিরা'র প্রাথমিক কাজ শেষ হয়ে গেছে। তড়িৎ বসু ২।৪ দিনের মধ্যেই ছবি তোলা শুরু করবেন। জি, সি, শীল দেবদত্ত শীলের ভ্রাতা।

বিজয়া

প্রযোজক : নিউ ইণ্ডিয়া ফিল্মস্

চিত্র-নির্ম্মাতা : নিউ থিয়েটার্স লিঃ

কথা ও কাহিনী : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রবর্ত্তক : যতীন্দ্র নাথ মিত্র

পরিচালক : দীনেশ দাশ ও অমর মল্লিক

চিত্র-শিল্পী : পঙ্কু চৌধুরী

শব্দযন্ত্রী : লোকেন বসু

সঙ্গীত পরিচালক : তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য

প্রধান চরিত্রে : বিজয়া—চন্দ্রাবতী নলিনী—আরতি, রাসবিহারী—অমর মল্লিক নরেন—পাহাড়ী সান্যাল, বিলাস-জ্যোতি লাহা, দয়াল ইন্দু মুখার্জ্জী প্রভৃতি।

চিত্র-পরিবেশক : প্রাইমা ফিল্মস্

প্রথম মুক্তি : 'রূপবাণী', বুধবার ২১শে অক্টোবর '৩৬।

২১শে অক্টোবর "বিজয়া" রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করেছে। "বিজয়া" ছবি চিত্র-শিল্পের দিক দিয়ে তেমন উন্নত না হলেও সাধারণের কাছে খুব সমাদর লাভ করেছে। ছবিখানি মোটামুটি ভাল হলেও নিউ থিয়েটার্সের অন্যান্য ছবিতে যে আভিজাত্য থাকে, এ ছবিতে তার অত্যন্ত অভাব। অন্যান্য ষ্টুডিয়ো থেকে এই ছবি বেরুলে আমাদের তেমন বলবার কিছু থাকতো না।

তবে শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া'র কাহিনী এমন মনোরম যে, গল্পই ছবিকে এগিয়ে

নিয়ে যায়। পরিচালনা কার্য্যে দীনেশ রঞ্জন দাশ এবং তাঁর সহকর্মী অমর মল্লিক প্যাচ না দেখিয়ে মোটামুটিভাবে তাদের কাজ শেষ করেছেন। এতে করে প্রথম ছবিতে তারা বেশ বিবেচকের পরিচয় দিয়েছেন।

চিত্রনাট্য চমৎকার হয়েছে। গল্প সর্ব্বত্র সাবলীল গতিতে এগিয়ে গেছে। পঙ্কু চৌধুরীর ক্যামেরার হাতল ঘুরানোও সার্থক হয়েছে, কারণ স্থানে স্থানে তাঁর

বিজয়ার আলোক চিত্র শিল্পী
পঙ্কু চৌধুরী

কাজ এত চমৎকার হয়েছে যে, আমরা বিস্ময়ানুভব না করে পারি নি। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, সর্ব্বত্র আলোছায়ার সামঞ্জস্য থাকে নি। শব্দ নিয়ন্ত্রণও বেশ সুষ্ঠু হয়েছে। সাজসজ্জা ও দৃশ্যপট চমৎকার। ছবির সব চেয়ে আকর্ষণের বিষয় সঙ্গীত। সুর সংযোজনার মধ্যে তিমিরবরণ যে নতুনত্বের সন্ধান দিয়েছেন, তা বাস্তবিকই অভূতপূর্ব্ব। আবহাওয়া সঙ্গীতের মধ্যে যে মূর্চ্ছনা ধ্বনিত হয়, তা অতি মধুর।

বিজয়ার ভূমিকায় চন্দ্রাবতী সুন্দর অভিনয় করেছেন, কিন্তু তাঁর রোগক্লিষ্ট মূর্ত্তি আমাদের চোখকে পীড়া দিয়েছে। রুগ্না অবস্থায় তাঁর ছবি না তোলাই ভাল ছিল। নরেনের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল বেশ সহজ অভিনয় করেছেন বটে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত নরেনের সঙ্গে তাঁর অঙ্কিত নরেন মেলে না। তা হলেও তার নরেন উপভোগ্য হয়েছে। শ্রীমান পরেশ ছোট হলেও বেশ হয়েছে। রাসবিহারী-রূপে অমর মল্লিক কিন্তু বেশ উৎরে গেছেন। একটু সন্দেহ ছিল আমাদের পূর্ব্বাপর। বিলাসের অংশে শ্যাম লাহাকে না নামালেই ভাল হতো। প্রথম থেকেই অনেকের আপত্তি ছিল এর মনোনয়নে। নলিনীর ভূমিকায় আরতি ভাল না করলেও কোন রকমে চালিয়ে গেছেন। ইন্দু মুখুয্যের দয়াল ভাল।

নিউ থিয়েটার্সের ২নং ইউনিটের কর্ণধার শ্রীযুত যতীন মিত্র ও তাঁহার সহকর্মীগণ বিজয়ার সাফল্যের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে যে পরিশ্রম করেছেন, তা সার্থক হয়েছে দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছি।

বিজয়ার সঙ্গে "মন্দ কি" নামে এক রীলের একখানি নক্সা ছবি দেখানো হচ্ছে। ছবিখানি মন্দ কি—বেশ লাগল।

সরলা

কাহিনী—৺তারক নাথ গাঙ্গুলী, প্রযোজক—যামিনী মিত্র, পরিচালক—চারু রায়, আলোক-চিত্র-শিল্পী—বিভূতি দাস, শব্দ যন্ত্রী—গফুর, গীতিকার—শৈলেন রায়, সুর-সংযোজক—নিতাই মতিলাল পরিচালিত 'সুর-সঙ্ঘ', চিত্রনাট্য—হেমন্ত গুপ্ত।

ভূমিকা-লিপি :—শশিভূষণ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বিধুভূষণ—তারাকুমার ভট্টাচার্য্য, গদাধর—অহীন্দ্র চৌধুরী, নীলকমল—কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, জমিদার—তারা কুমার ভাদুড়ী, প্রমদা—প্রভা, সরলা—সরলা, শ্যামা—মনোরমা, দিগম্বরী—সুশীলা, কীর্ত্তনওয়ালী—রাধারাণী ইত্যাদি।

'সরলা' 'বিজয়া'র সঙ্গেই ২১শে অক্টোবর শ্রীতে মুক্তিলাভ করেছে। ফার্ষ্ট ন্যাসন্যাল পিকচার্সের প্রথম অবদান "সরলা" প্রথম শ্রেণীর ছবি না হলেও ভাল ছবি হয়েছে। এই ছবিকে আরও উন্নত করা যেত, যদি তাড়াতাড়া করে ছবি না তোলা হত। মাসখানেকের মধ্যে এই ছবি উঠেছে—সে হিসাবে বিচার করলে এর যা কিছু ভুলত্রুটি আছে, তা উপেক্ষা করা যায়। কিন্তু কি দরকার ছিল এই তাড়াহুড়ার? তারপর ছবির প্রচার কার্য্য তেমন হয়নি এবং অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ হয়েছে তিনখানি নূতন এবং বহু বিজ্ঞাপিত ছবির সঙ্গে সঙ্গে সরলাকে মুক্তিলাভ করতে দেওয়া। অন্য সময়ে মুক্তিলাভ করলে, এই সরলা বেশ সমাদর লাভ করতো। তাই বলে কেউ যেন মনে করবেন না যে, সরলা এখন দর্শক আকর্ষণ করতে মোটেই পারছে না।

৺তারক গাঙ্গুলীর প্রসিদ্ধ 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসখানির পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। স্বর্ণলতা থেকেই 'সরলা' নাটিকা-

দুষ্টু খোকা
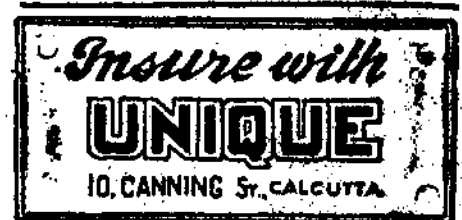
শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

সেই কাল বৈশাখের আঁধার রাত! অন্ধকারের মধ্যে কি সর্ব্বগ্রাসী নিষ্ঠুরতা; যেন মহা প্রলয়ের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলো। বুকের রক্ত দিয়ে যে ইমারত তৈরী করলাম সুদীর্ঘ পঞ্চবর্ষ ধরে, রুদ্র বৈশাখের এক নিঃশ্বাসে ঝরে পড়লো —অকালে; একান্ত অসময়ে।

জানি, দৃষ্টির আড়ালে যে চলে গেছে, সে আর দৃষ্টির আগলের মধ্যে আসবে না, তবুও কেন জানি না মনটা ব্যথায় ভরে উঠে। শুনেছি ব্যথা অনেকটা লাঘব হয় যদি অন্যের নিকট সরলভাবে ব্যক্ত করা যায় মনের ভাব—তাই আজ আমার এই লেখবার বাতুলতা।

এতটুকু ছেলে সে দুষ্টুর শিরোমণি।··· জোয়ারের জল তরঙ্গের মত চঞ্চল—অশান্ত। একদণ্ড কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না—এতই অস্থির সে। দুরন্তপনা যেন তার স্বভাবজাত। সবাই তাকে বলতো—"কী দস্যি ছেলে গো! ঐ তো এতটুকু ছেলে হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি মাখানো।

মা বলেন—"কোথাও যাসনে বাবা!"

চঞ্চল বালক ততক্ষণে উঠানটায় এক চক্কোর মেরে, চঞ্চল পদে মায়ের কাছে সরে এসে আধ-আধ ভাষায় বলে "কি বল্‌ত?"—

ছেলের দুষ্টামীতে মা উঠেন হেসে; দুষ্টু খোকাকে বুকে জড়িয়ে চুমায় তার কচি গালটীতে গোলাপ ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু চঞ্চল বালক কোলে বন্দীদশায় থাকতে চায় না; সে ছুট্‌তে চায়। অভীষ্টকে আয়ত্ত করতে চায়—সে পথে বাধা পেলে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। খিম্‌চে-কাম্‌ড়ে মায়ের চুলের গোছা টেনে, মাকে অস্থির করে তোলে। খোকনের তাণ্ডব নর্ত্তনে মায়ের প্রাণান্তের উপক্রম। ভয়ে ভয়ে তিনি নামিয়ে দেন, অমনি সে-ছুট! মুক্ত আকাশতলে এসে অকারণে এদিক ওদিক ছুটে বেড়ায়। পা যখন অচল হয়—সে চুপ করে বসে পড়ে মাটির বুকে।

দূরে—বহুদূরে, আকাশের কোল ঘেসে যেথায় মুক্ত পক্ষীকুল নীড় ছেড়ে উড়ে চলেছে ঐ দিগন্তের উদ্দেশ্যে—তার লক্ষ্য ঐখানে।—তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে আকাশে ভেসে যাওয়া, ঐ বিহঙ্গদের যাত্রাপথের দিকে—আপনহারা দৃষ্টিতে সে শুধু চেয়েই থাকে।

"খোকা! খোকা!"—মায়ের ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠ বাতাসে ভেসে আসে। দস্যি ছেলের সাড়া পাওয়া যায় না। "ওমা! তুই এখানে চুপটী করে বসে কেনরে? বেলা যে গড়িয়ে গেল?"

শান্ত শিশু হঠাৎ হয়ে উঠলো চঞ্চল। "মা! ওমা! আমি যাব ঐযে—" দুটী ক্ষুদ্র বাহু মেলে উড্ডীয়মান পক্ষীদের দেখায়।

অসহ্য পুলকে তিনি খোকনের টুক্‌টুকে ঠোঁট চুমায় চুমায় ভরিয়ে দেন। হাসি-অশ্রু আলো-ছায়ার মধ্যে এমনি করেই তার দিন কাটে।

* * *

পরম সহনশীলা ধরিত্রীর ভিত্তিরও পর্য্যন্ত টনক নড়ে, যখন বুকের ভার সহ্যাতীত হয়ে উঠে। দুষ্টু খোকার দুরন্তপনায় প্রত্যেকেই অস্থির, সবার মুখেই এক রা—'ছেলেটা বজ্জাতের ধাড়ী! জ্বালাতনের একশেষ!' সহেরও একটা সীমা আছে—একদিন প্রাতে পূর্ব্বাকাশে নবারুণ জ্যোতি তখনও অপ্রকাশ। বাড়ীর ঝির উচ্চ চিৎকারে সদ্য নিদ্রোত্থিত ঠাকুমা এসে বললেন—'কি হয়েছেরে সুরো? অত চেঁচাচ্ছিস কেন?'

কারে গ্রথিত হয় এবং বহুকাল ধরে নাট্যালয়ে অভিনীত হয়েছে। চিত্রনাট্য সেই নাটক হতেই গ্রথিত হয়েছে। তবে ছবি খানি যাতে নকযেবা না হয়, তার জন্যে চারু রায় চেষ্টা করেছেন। পরিচালনায় তেমন নতুনত্ব দেখাতে না পারলেও মোটামুটি ভালই হয়েছে।

অভিনয়ের দিক দেখতে গেলে মনোরঞ্জনবাবুর শশিভূষণ ও শ্রীমতী প্রভার প্রমদা চমৎকার হয়েছে। অহীন্দ্রবাবু গদাধরের ভূমিকায় অভিনয়ের একেবারে হতাশ করে দিয়েছেন। তার অভিনয় একেবারে ছ্যাবলামি হয়েছে। শীলকন্‌-ঠের ভূমিকায় তপন ও বেশ অভিনয় করেছেন। সরলার ভূমিকায় চিত্রজগতে নবাগতা শ্রীমতী সরলা (অরুণা) সুন্দর অভিনয় করেছেন, তবে তার একটু আড়ষ্ট ভাব কাটা উচিত ছিল। জাহার ভূমিকায় মনোরমা বিশ্রী অভিনয় করেছেন। বিধুভূষণ চলনসই। অন্যান্য ভূমিকা অনুল্লেখ্য।

শব্দ নিয়ন্ত্রণ ও আলোকচিত্র বেশ ভালই। নিতাই মতিলাল পরিচালিত "সুর সংযোগ" কাজও বেশ প্রশংসনীয় হয়েছে। নির্ব্বাক যুগের মত সাফল্য অর্জন না করলেও "সরলা" অনেককেই আনন্দ দেবে।

মুখখানাকে যথাসম্ভব বিকৃত করে 'ঝি' জবাব দেয়—'মা মা, এ বাড়ীতে কাজ করা আমার হবেনা, কি দুষ্টু ছেলে গো ?'

'কি হয়েছে তাই বলনা ?' ঠাকুমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠেন।

'হবে আবার কি ! তোমার আদরের নাতি গো নাতি। ঘুম হতে উঠে এসে মুতবার জায়গা পেলেনা—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার গায়ে মুতে দিলে গা !'

ঠাকুমা অতিকষ্টে হাসি চেপে মিনতির সুরে বললেন—'রাগ করিস না মা ! ছেলে মানুষ অবোধ !'

'ছেলেমানুষ ? দেখ না কেমন ফিক্ ফিক্ করে হাসছে।' হস্তের ক্ষিপ্র গতিতে বাসনগুলা ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল।

আর একদিন বৈকালে। অস্তমিত সূর্য্যের শেষ রশ্মি তখনও আকাশের বুক হতে মিলিয়ে যায় নাই। প্রকৃতি শান্ত সুন্দর। কর্মব্যস্ত নর-নারী নিজ নিজ কর্মে নিমগ্ন।

এখায়, সেথায় কোনরূপ মনোমত কার্য্য না পেয়ে খোকা উন্মুক্ত ছাতের তলে এসে দাঁড়াল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। সান্ধ্য-সমীরণে গাছ নড়ছে, পাতা নড়ছে। বালকের উতলা মন আকুল হয়ে উঠল। পক্ষীর ন্যায় পক্ষ মেলে, নীলান্ত-রিক্ষের অসীমে মিলিয়ে যেতে নিজের অক্ষমতা তাকে ব্যাকুল করে তুললো। ক্রোধে, ক্ষোভে সে অস্থিরপদে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করে পূজার যাবতীয় উপকরণাদি তছনছ করে ফেললো।

ঠাকুর ঘরে সান্ধ্যপ্রদীপ দেখাতে এসে জেঠাইমার চক্ষুস্থির।

'আলো ও দুর্গা দেখবি আয় তোর ছেলে কি করেছে।'

মা আসেন তেড়ে—'আজ তোকে মেরেই ফেলবো।'

শিশুর মন সহজেই কাতর হয়, সে ককিয়ে কেঁদে উঠে।

মায়ের ক্রোধ পুত্রের ক্রন্দনে নিমিষে অন্তর্হিত হয়। প্রহারে উদ্যত হস্ত স্বতঃই নমিত হয়।

*   *   *

কালস্রোত অবিরাম গতিতে বহিয়া চলে।

দুরন্ত খোকা আজ পঞ্চম বর্ষীয় সুকুমার বালক। প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় সারল্যমাখা আননখানি বাস্তবিকই সুন্দর। কল্পনায় ভবিষ্যতের রঙ্গীন আলেখ্য অঙ্কিত করা যায়, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গৃহ নিস্তব্ধ সব শেষ। সেদিন সোমবার। মাত্র বার কয়েক বমি বাহ্য করে অশান্ত শিশু সুবোধ বালকের ন্যায় শয্যায় লুটিয়ে পড়লো। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন—"কলেরা !" জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব চললো তারপর।

একটী মুহূর্ত্ত যেন একযুগ ? সময়ের যেন মৃত্যু হয়েছে। মায়ের চোখে আজ অশ্রু নাই—যেন মৃত্যু আসবার উৎকণ্ঠা ওর সমস্ত সত্ত্বাকে গ্রাস করেছে।

জল ! শুধু জল !! কী উন্মাদ তৃষ্ণা !

সুন্দর অঙ্গ লতিয়ে পড়লো মুহূর্ত্তমধ্যে।

ডাক্তার বললেন—"আশা নাই"।

রোগী একবার ডুকরে কেঁদে উঠে মাকে আঁকড়ে ধরলো।

মায়ের হৃদয় বুকফাটা আর্ত্তনাদ, তারপর সজোরে মুমূর্ষু পুত্রকে বুকে চেপে রইল—যেন সে অন্তরের মণিকোঠায় তাকে লুকিয়ে রাখতে চায়। মায়ের কোলে দুষ্টু খোকা চিরদিনের মত স্তব্ধ হলো।

সচিত্র সাপ্তাহিক
দ্বিতীয় বর্ষ—৩১শ সংখ্যা
শুক্রবার—৪ঠা অগ্রহায়ণ
১৩৪৩
২০শে নভেম্বর—১৯৩৬
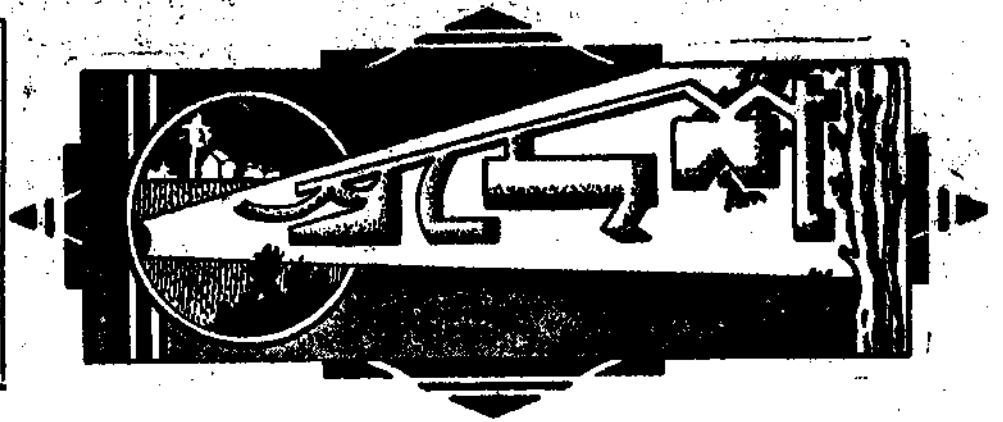
রাজনীতি চর্চ্চা

পরাধীন জাতির রাজনীতি চর্চ্চা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, আমরা একদিন রাজনীতির হাটে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ ও সামাজিক অনুশাসন জাতির জীবনে আস্তে আস্তে শিথিল হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনও ছিল। সমাজ ও ধর্ম্মকে আত্মনির্ভরশীল হইতে বলিয়া আমরা রাজনীতির সেবায় মন দিয়াছিলাম। স্বরাজ-সংগ্রাম কেন আরম্ভ হইল, কোনদিন হইতে তাহার সূত্রপাত, তাহার গতি কি ভাবে এতদিন চলিয়াছে—সে সমস্ত বৃহত্তর বিষয়ের আলোচনা করিব না। তাহা ভাবীকালের ঐতিহাসিকদের জন্য; তাঁহারাই সে প্রশ্নের সদুত্তর দিবেন। অতীত-ভবিষ্যতের চিন্তায় অবসর নাই, বর্ত্তমান লইয়াই যে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি।

রাজনীতি আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন, রাজনীতির সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের জাতীয় জীবন মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ তাহাকে আমরা এমন বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছি, এত অবজ্ঞা করিয়াছি যে রাজনীতি চর্চ্চা যেন আমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। যাহা বস্তুতঃই মহার্ঘ্য; তাহাকে আমরা সহজ-লভ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। আজ এই রাজনীতিক্ষেত্রে জয়যাত্রার আনন্দরোল বা পরাজয়ের ক্রন্দন-হুতাশ শুনিতে পাই না। আজ সেখানে হাট বসিয়া গিয়াছে। ত্যাগ-গৌরবদীপ্ত নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকগণ যেখানে বসিয়া জাতীয়-কল্যাণের চিন্তা করিতেন; পথভ্রান্তদের পথের সন্ধান দিতেন, আজ সেখানে ভীরু কাপুরুষেরা আশ্রয় লইয়াছে, হীন স্বার্থলোলুপ দল বিপণি খুলিয়াছে। শুধু বাঙ্গলায় নহে, বাঙ্গলার বাহিরেও এই দুরবস্থা। প্রতি প্রদেশেই দেখি স্বার্থসিদ্ধির হীন প্রচেষ্টা, দেশমাতৃকার পুণ্য নামে ভ্রাতা ভ্রাতার বক্ষে ছুরি মারিতে উন্মুখ। আজ জাতি আদর্শভ্রষ্ট, তাহার মেরুদণ্ড অনেক বাঁকিয়া গিয়াছে। নূতন কোন আন্দোলন আরম্ভ হইলেই জাতির হৃতস্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিয়াছে ভাবিয়া সময় সময় আমরা ভুল করিয়া বসি, আনন্দে আত্মহারা হই। কিন্তু সে আনন্দের [illegible] শুধু [illegible] লক্ষণ নহে, অন্ধকারেরই পরিচায়ক। এই নূতন উপলব্ধির [illegible] কি পথ নাই? সে সন্ধান কে দিবে?
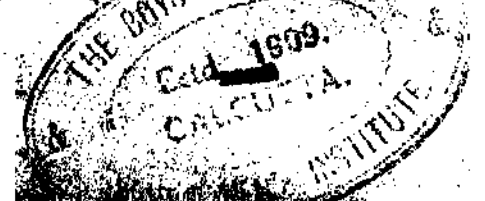
পাঁচমিশালী

বঙ্গীয় আইন সভার আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের তরফ হইতে প্রার্থী মনোনয়ন আপাততঃ ধামাচাপা পড়িয়াছে। দুই "বাজারী বৈষ্ণবী" এখন মাজায় কাপড় জড়াইয়া কোঁদলে অবতীর্ণ হইয়াছে। একে অপরের যুক্তির অসারতা প্রতিপন্নের জন্ত ব্যগ্র। এমতাবস্থায় আমরা তফাতে দাঁড়াইয়া দেখা ছাড়া আর কি করিতে পারি? অমৃতবাজার নাকি "দিনের পর দিন এই মত প্রচার করিতেছেন যে, কংগ্রেসমণ্ডলীর বাহিরেও কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী শক্তিশালী যোগ্যতাসম্পন্ন লোক আছেন, প্রয়োজন হইলে কংগ্রেস-নীতি কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করিয়াও এই সব অ-কংগ্রেসী যোগ্য লোককে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মনোনীত করা উচিত, তাহার ফলে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধিই হইবে।" "আনন্দবাজার" এই মত বরদাস্ত করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, নীতিপরায়ণ আনন্দ বাজারী দল কি কোন দিন কংগ্রেসের মতের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই? তখন কংগ্রেসনীতি কি অক্ষুণ্ণ ছিল? আর যাহারা করপোরেশনে কলী প্যাক্টের নাটের গুরু, তাহাদের কেহ কেহ যদি এই মিলনের ফলে কংগ্রেসের নিয়ামক হইয়া থাকেন, তবে তাহাতে কি কংগ্রেসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই? ভাল যুক্তি দেখাইলে গৌরাঙ্গ প্রভু!

* * *

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মিঃ এ, এফ, রহমান ছুটি লওয়ায় তাঁহার স্থলে চ্যান্সেলার গভর্ণর—খাজা স্যর নাজিমুদ্দিনের ভ্রাতা খাজা সাহাবুদ্দিনকে নিয়োগ করিয়া একজন যোগ্য ব্যক্তির সমাদর করিলেন বলিতে হইবে! এইবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদে নলিনীরঞ্জন সরকারকে নিয়োগ করিলে সোনায় সোহাগা হইবে। খাজা সাহাবুদ্দিন ইতিপূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতা হজে মক্কা গেলে তাহার স্থলে তিনি বাংলার শাসন পরিষদের সদস্য হইয়াছেন। লাট সাহেব কিছুদিন যদি ছুটী নেন্ তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়, কারণ তখন খাজা সাহাবুদ্দিন অস্থায়ী গভর্ণরের পদে আসীন হইতে পারিবেন। এই পদের জন্ত ইতিহাস অধ্যাপক ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার এবং মিঃ সহিদ সুরাবর্দ্দিকে নিয়োগের সুপারিশ ছিল। ইহাদের অপেক্ষা খাজা সাহেবের শিক্ষাগত যোগ্যতা অধিক ছিল কিনা তাহা আমাদের অপেক্ষা চ্যান্সেলারই ভাল বোঝেন!

* * *

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ,—লর্ড কিনৌল এই মর্ম্মে এক প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন যে, সম্ভব হইলে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে মুক্তি দিয়া তাঁহাকে আগামী নির্ব্বাচনে প্রচার কার্য্য করিবার সুযোগ দেওয়া হউক। ১লা ডিসেম্বর এই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হইবে। এই প্রস্তাবটীর ফলাফল কি হইবে, তাহা সকলেই বলিতে পারেন। লর্ড কিনৌল ভুল বুঝিয়াছেন। বরং অন্ত সময়ে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে নির্ব্বাচনে প্রচারকার্য্যের সুযোগ দান সরকার নিশ্চয়ই সমীচীন মনে করেন না। তাহা হইলে যে কংগ্রেসের জয় অবশ্যম্ভাবী!

———

নতুন ব্যবসায় সাহিত্যিক

নীলকণ্ঠ শর্ম্মা

পূজোর কাগজ বের ক'রে মনে করেছিলাম, এবার বুঝি অশৌচান্ত হ'লো। কিন্তু গোড়ায় ছিলো গলদ—তাই আজো তার জের টেনে চলেছি।

কেউ বল্লেন, অমুকের লেখাটা কিছু হয় নি, কেউ বল্লেন, ওটা রাবিশ, ওগুলো ফাঁকি।

কিন্তু কাগজওয়ালাদের দক্ষিণায় ফাঁকি ছিলো না—দাম দিয়ে লেখার দাম পাওয়া যায় না এটা হয়তো কাগজওয়ালাদেরই ভাগ্যের দোষে।

* * *

বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়েছি—পূজোর বাজার করতে নয় পূজোর লেখার জোগাড় করতে।

—জিজ্ঞাসা করলেন, কত দেবেন?

দরে না বনলে চলে যেতে হবে, তাই দিলাম একটা দর।

দরে বনলো না। বল্লেন, পাঁচ টাকারও লেখা আছে—আট'টাকারও লেখা আছে—আবার দশটাকারও লেখা আছে।—কোনটা চাই বলুন।

সস্তায় পেলে আর কে বেশী দিতে চায়। বল্লাম, পাঁচ টাকারটাই চাই।

এ যেন মাছের বাজারে চিংড়ি মাছের ভাগা লাগান' আছে—একপয়সা, দুপয়সা, তিন পয়সা।

বন্ধু বল্লেন, চলো, ভাল পুকুরটা হ'য়ে যাই। বাড়ী ঢুকবার সিংহদরজায় পেছনে লাগলো এক দালাল। বল্লে, ভূতের গল্প চাই;—পাঁচ টাকায় করিয়ে দিচ্ছি। বুঝ্‌লাম দালালকে আমরা ছাড়াতে চাইলেও, তিনি ছাড়বেন না।

* * *

পথে এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বল্লে, কোথায় চলেছো?

—বেলগাছিয়া।

—লেখা আনতে? আচ্ছা আমি বলে দেবো এখন, টাকাকড়ি কিছু লাগবে না।

ভাবলাম, ভালই হ'লো—পাঁচটা টাকা তবু বাঁচলো। তার কথামত একদিন গিয়ে উঠলাম। মনে করেছিলাম, হয়তো জামাই আদরই পাবো। কারণ বন্ধুটি ছিলেন ঐ বাড়ীরই জামাই।

নিবেদন জানালাম। বল্লেন, টাকা?

চমকে উঠলাম।—"একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে?" বল্লাম, আমি আপনার জামাইয়ের বন্ধু।—তিনি কিছু বলেন নি?

ভদ্রলোক রেগে উঠলেন। বল্লেন, জামাই ভুল বুঝেছে, টাকা ছাড়া আমি বাপকেও লেখা দি না।

নার্ভাস হ'য়ে গেলাম।

এর পরেই ভদ্রলোক বক্তৃতা সুরু করলেন: আজকাল আমরা দশের টাকায় কমে লিখি না—পাঁচ টাকায় লেখা দেওয়ার ব্যবসা আমরা ছেড়ে দিয়েছি।

দেখলাম, সত্যিই এ এক নূতন ব্যবসা। বন্ধু বল্লেন, আজকাল সব জিনিসেরই দর তো বেড়ে গিয়েছে, তবে আপনাদের দর বাড়লো কেন?

যাই হোক, দরই যখন করতে বসেছি—দুটাকা থেকেই সুরু করা গেল।—অবশেষে পাঁচ টাকায় রফা ক'রে বাড়ী ফিরে এলাম।

বন্ধু বললেন, এত বড় অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম!

* * *

লেখাগুলি যখন ছাপা হ'য়ে বেরুলো, আমিই সর্ব্ব প্রথম চীৎকার ক'রে উঠলাম, দুর্লভ!

পূজোর কাগজ বেরিয়ে গিয়েছে অনেক দিনই, কিন্তু আজো সেই টাকা কটির শোক ভুলতে পারিনি।

বন্ধু বললেন, ওরা এখানে কেন, আলু পটলের দোকান করলেও তো পারে—টাকায় টাকা লাভ করতে পারবে।

কোন ব্যবসাই আমরা ফলাও ক'রে তুলতে পারি নি। এঁদের ব্রেণ আছে, সাহিত্য ব্যবসা হয়তো টিকলেও টিকতে পারে আমাদের দেশে।

* * *

'সাহানা' বলছেন, এবার উঁদের 'সচিত্র সাহিত্য পত্রিকা।' কিন্তু সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিখ্যাত হাতের জোরে বায়োস্কোপের প্রবন্ধও কি সাহিত্য হ'য়ে উঠবে না কি? বায়োস্কোপের তিনটি বিভাগ দেখলাম। একটি সম্পাদকীয় কলমে সম্পাদক নিজে লিখছেন, একটি লিখছেন 'সব্যসাচী', আর একটি 'পুরন্দর'।—বোধ হয় এই তিনটি ছাড়া সবগুলি সাহিত্য?

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি ?

বাংলার কংগ্রেসের মনোনয়ন লইয়া ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায় ও ব্যারিষ্টার শরৎ চন্দ্র বসুতে কি শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি হইতেছে ? বিধানবাবু যে বাঙ্গলার লোকমতের বিরুদ্ধে কাজ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অথচ তাঁহাকেই বোর্ডের সভাপতি করিয়া শরৎবাবু কি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার অস্ত্রেই তাঁহাকে নিপাত করিতে পারিবেন ? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে শরৎবাবু বিষম ভুল করিয়াছেন। বিধানবাবুর সহিত যে দলের ঘনিষ্ঠতা এবং যে দলের লোক বিধানবাবুকে সম্মুখে রাখিয়া ইচ্ছামত কাজ করিয়া যায়, সে দলের সহিত বসু ব্রাদার্সের কিরূপ সদ্ভাব তাহা সকলেই জানেন। সেই দলের লাটের গুরু নলিনীরঞ্জন সরকার যে গবর্ণমেন্টের লোক তাহা সুভাষ বাবুই বলিয়াছেন। শরৎবাবু বন্দী অবস্থায় ভারত সরকারকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, কংগ্রেসে তাঁহার ভূতপূর্ব্ব সহকর্মীর ষড়যন্ত্রে তাঁহাকে বন্দী করা হইয়াছে। এই ভূতপূর্ব্ব সহকর্মীটি কে তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং তিনি যে বিধান বাবুর সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, ইহা তাঁহার জানা থাকাই উচিৎ ছিল। কিন্তু তিনি চক্ষু লজ্জার খাতিরেই হউক, অথবা অন্য কারণেই হউক, বিধানবাবুর নিয়োগে আপত্তি করিতে পারেন নাই। ফলে কি হইয়াছে, তাহা তিনিও দেখিতেছেন, আমরাও দেখিতেছি। যে সব লোকের মনোনয়ন শরৎবাবু কিছুতেই সমর্থন করিতে পারেন না, বিধানবাবু সেইরূপ একাধিক লোককে কংগ্রেসের মনোনয়নে দাগিয়া দিতে চাহিতেছেন। ফলে ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিয়াছে এবং একথাও মনে করা যাইতে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলার কংগ্রেসী মিলন আবার বিরোধে পরিণত হইবে। যে স্থানে মতের অনৈক্য থাকে, সে স্থানে গোঁজামিল দিয়া মিলনের আশা যে দুরাশা তাহা বলাই বাহুল্য।

বিধানবাবুর দলের যেটুকু অভাব ছিল, তাহাও পূর্ণ হইয়াছে। কেননা, তাঁহার নলিনী ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রকাশ পাইয়াছে, নলিনী জনকয়েক লোককে সমর্থন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামীকে বিলাত হইতে তারে হুকুম করিয়াছিলেন। তাহার এইরূপ হুকুম করিবার অধিকার কিসে সম্ভূত তাহার আলোচনা আজ আর আমরা করিব না। কিন্তু নলিনী শাসিত ও কিরণশঙ্কর চালিত বিধানী দল যে কি করিবেন তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহারা আর কিছু না করিলেও বাছিয়া বাছিয়া মন্ত্রীত্বকামী ও সরকারের সমর্থনকারীদিগকেই মনোনয়ন করিবেন। আশার মধ্যে এইটুকু যে নলিনী হয় তো ঢাকার নজিরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হইয়া রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য সরিয়া যাইতেও পারে। নলিনীর ভক্তদল নাকি বলিয়া বেড়াইতেছে যে, নলিনীর পক্ষে এখন নিম্নলিখিত দুইটি পদের যে কোনটাতে লাফাইয়া পড়া সম্ভব :—

১। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণরী

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারী।

তাঁহার যেরূপ বিদ্যা তাহাতে সে যে কোন কাজ অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে। কিন্তু তাহার পক্ষে কোন পথ গ্রহণ করা অধিক লাভজনক তাহা স্থির করিবার জন্য সে এক কমিটী নিয়োগ করিতেছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র সে কমিটীর সভাপতি থাকিবেন, সম্পাদক হইবেন—নলিনীরঞ্জনের সম্পর্কিত জামাতা—ডাঃ শিশির মিত্র। আর সদস্য সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও নলিনাক্ষ সান্ন্যাল।

আমরা দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি, এবার কংগ্রেসী ব্যাপারে শরৎবাবু পরাভূত হইবেন এবং বিধানীদলের কৃপায় বাঙ্গলার মুখে চুণকালী মাখা পড়িবে।

অশ্বমেধের ঘোড়া বাছাই

শ্রীবিষকণ্ঠ বাচস্পতি

কংগ্রেস রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভের ইচ্ছায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। আপাততঃ ঘোড়া বাছাই করিতেছেন; বাছাই শেষ হইলেই কংগ্রেসের কর্ত্তারা তাহাদিগকে চারিদিকে ছুটাইয়া দিবেন এবং ঢাক ঢোল পিটাইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিবেন "কে কোথায় বীরের বেটা বীর আছ? পার ত, অগ্রসর হইয়া আমাদের ঘোড়া আটকাও, আর নয় ত বশ্যতা স্বীকার কর।"

কি নিয়ম অনুসারে যে ঘোড়া বাছাই করা উচিৎ, সে সম্বন্ধে কংগ্রেসের বড় কর্ত্তারা আর একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মূল বক্তব্য এই—"এ কথা কেহ যেন মনে না করেন যে, নূতন শাসন-প্রণালীর সহিত কোনরূপ সহযোগিতা করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। কংগ্রেস চান, উহার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে এবং উহা ধ্বংস করিতে। যাঁহারা এই নীতিতে সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে ইচ্ছুক, শুধু তাঁহাদিগকেই কংগ্রেসী সদস্যরূপে মনোনীত করা উচিৎ।"

মোট কথা এই—কংগ্রেসী সদস্যগণকে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত ভাবে লড়াই করিতে হইবে। যে সমস্ত ব্যবস্থা দেশহিতকর নহে, সে সমস্ত ব্যবস্থা যাহাতে ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত না হয়, সে চেষ্টা করিতে হইবে। খুব ভাল কথা। কিন্তু দুই একটা ভাল ব্যবস্থাও গভর্ণমেণ্টের হাত দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে। এই ধরুন, গ্রাম্যশিল্পের উন্নতিকল্পে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলি ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রতি বৎসর যে টাকা পান, সে টাকা যদি খদ্দর প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট খাদি প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে ধরিয়া দেন, তাহা হইলে কংগ্রেসী সদস্যগণ কি সেই ব্যবস্থার বিরোধিতা করিবেন? বিপ্লবীদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট যদি কংগ্রেস কমিটীগুলিকে অহিংসা

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্ব্বাচন

গত ১৭ই নভেম্বর মঙ্গলবার কলিকাতার টাউন হলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে নিম্ন লিখিত ভদ্র মহোদয়গণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্থানীয় বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—

১। মিঃ ব্রজমোহন বিরলা
২। শ্রীযুত অমর কৃষ্ণ ঘোষ
৩। স্যার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা, সি, আই, ই
৪। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা
৫। মিঃ আর্থার নর্টন ওয়ার্ডলে।

মোট চৌদ্দ জন প্রার্থী ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে তিন জন পূর্ব্বে তাঁহাদের নাম প্রত্যাহার করেন।

২৫,০০০এর মধ্যে মোট ১৭,৬০১ সংখ্যক ভোট গৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মিঃ বিরলা ৯,৮৯০, শ্রীযুত ঘোষ ৫,৫০০ এবং ওয়ার্ডলে ১,৯৪৩ সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন।

প্রচারের জন্ত অর্থ সাহায্য করিতে চাহেন, তাহা হইলে কংগ্রেসী দল কি করিবেন? অতীতের কথা মনে করিয়াই আমরা এ সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। স্বরাজ্য দল যখন ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের ভাল, মন্দ সমস্ত ব্যবস্থারই তাঁহারা বিরোধিতা করিয়া শাসনযন্ত্র অচল করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু তবুও সরকারী অনেক ব্যবস্থাই তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতে হইয়াছিল এবং কংগ্রেসের নেতারাও অনেক সরকারনিযুক্ত কমিটীর সভ্য হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে যখন প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন পরিবর্ত্তিত হয়, তখন জমিদারগণের অর্থে পুষ্ট কংগ্রেসী দলকে প্রজাদিগের স্বার্থের বিপক্ষে গবর্ণমেণ্ট ও জমিদারগণের পক্ষ লইতেও দেখা গিয়াছিল। কাজেই, এ ব্যরেও এ কথা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, কংগ্রেসীদল সরকারী যে সমস্ত ব্যবস্থা হিতকর মনে করিবেন, সেগুলিকে সমর্থন করিবেন, আর যে গুলিকে অহিতকর মনে করিবেন, সে গুলির বিরোধিতা করিবেন।

কিন্তু এমন করিয়া কি শাসনযন্ত্র অচল করিয়া তুলিতে পারা যায়? যাঁহারা নূতন শাসন প্রণালীর নিয়ম অনুসারে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবেন, কোন ব্যবস্থার বিরোধিতা বা উহার সমর্থন করিবার সময় যাঁহাদিগকে প্রতিপদে নূতন শাসন-প্রণালীর নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে, কেবল বিশেষ যাঁহারা জন-হিতকর অনুষ্ঠানের সাহায্যের জন্ত সমর্থন করিতে বাধ্য হইবেন, তাঁহারা যদি বলেন যে, নূতন শাসন-প্রণালী ধ্বংস করাই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্ত এবং ঐ উদ্দেশ্ত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত যাঁহারা দৃঢ় সংকল্প, কংগ্রেস শুধু তাঁহাদিগের কাজেই ছাপ লাগাইবেন, তাহা হইলে ব্যাপারটা যে একেবারেই দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে।

কংগ্রেসের কর্ত্তারা যদি গোড়া হইতেই বলিয়া দিতেন, ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদিগের দল প্রবল হইলেও তাঁহারা সরকারী মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন না বা কোন কমিটীর সভ্য হইবেন না, তাহা হইলেও বা কথা থাকিত। সরকারী কোনাই স্ববদাবধি তাঁহারা পৃষ্ঠীতে হইত না দিতেন এবং নিজেরাও মন্ত্রী হইয়া নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে স্বীকৃত না হইতেন তাহা হইলে এ কথা বলা উচিত যে তাঁহারা নূতন শাসন-প্রণালী ধ্বংস করিতে কৃতসংকল্প।

কিন্তু কংগ্রেসের বড় কর্ত্তারা ভুলিয়াও এক বার বলেন নাই যে, তাঁহারা সরকারী মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন না। তাঁহাদিগের কথার ভাব দেখিলে মনে হয় যে, সরকারী মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াও নূতন শাসন প্রণালীর ধ্বংসের চেষ্টা করা চলে; সুতরাং উহার সম্বন্ধে পরে পশ্চাতে যেমন হউক একটা সিদ্ধান্ত করিলেই চলিবে।

পণ্ডিত রাজগোপালচারি আপাততঃ রাগ করিয়া কংগ্রেসের সহিত সব সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন বটে; কিন্তু কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন-প্রসঙ্গে তাঁহার নাম উঠিয়াছিল। সুতরাং কংগ্রেসী নীতি সম্বন্ধে তিনি বিশেষ ওয়াকিবহাল, এ কথা সহজেই অনুমান করা যায়। ব্যবস্থাপক সভায় যাইয়া কংগ্রেসী সদস্তগণের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণপ্রসঙ্গে তিনি বহুবার বলিয়াছেন যে, আইনের সাহায্যে কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজগুলির সাহায্য করাই কংগ্রেসের সদস্তগণের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহাকে যে নূতন শাসন-প্রণালী ধ্বংস করার চেষ্টা বলা চলে না, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসী সদস্তগণ যে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া কোন্ নীতি অবলম্বন করিবেন, সে সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন নেতারা একমতাবলম্বী বলিয়া মনে হয় না। পণ্ডিত রাজাগোপালাচারির সহিত পণ্ডিত জহরলালের কথার সামঞ্জস্ত নাই; এবং শ্রীমান সত্যমূর্ত্তি যাহা বলেন, তাহা একেবারে সৃষ্টিছাড়া। সর্দ্দার বল্লভভাই বা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বুদ্ধিমান লোক; কাজেই তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া কোন কথাই বলেন নাই।

গোড়ায় যেখানে এইরূপ মতভেদ ও অসামঞ্জস্য, সেখানে শুধু বড় বড় নীতির দোহাই দিয়া ইস্তাহার প্রচার করিলে চলিবে কেন? বাংলা দেশেও কাজে কাজেই ঐরূপ অসামঞ্জস্ত প্রকাশ পাইতেছে। শরৎবাবু মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরোধী আর ডাক্তার বিধানচন্দ্রের ষোল আনা মন ঐ মন্ত্রিত্ব গ্রহণের দিকে। কাজে কাজেই উভয়ে মিলিয়া কংগ্রেসী সদস্ত মনোনয়ন আরম্ভ করিলে শাসনযন্ত্র অচল হইবার পূর্ব্বে কংগ্রেসীযন্ত্র অচল হইয়া পড়িবে।

—বসুমতী।

আঠারো বছর পরে

আঠারো বৎসর পূর্ব্বে সমর পীড়িত ইউরোপ সন্ধির ঘোষণা বাণীকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধে ইউরোপের বিপুল ধন ও লোকক্ষয় এবং জেতা ও বিজেতার সম দুরবস্থা দেখিয়া মনে হইয়াছিল অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপের কোন জাতি আর সহসা সমর তরঙ্গে ঝাপ দিতে চাহিবে না এবং চাহিলেও অতঃপর সভ্যতাভিমানী ইউরোপের পক্ষে মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতা অবলম্বন ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকিবে না। ইউরোপীয় যুযুধান জাতিগুলিও সেদিন বুঝিয়াছিল যে, তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী সমরোন্মাদনাকে সংযত করিতে না পারিলে স্ব স্ব অস্তিত্বই বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

তারপর ইউরোপের শান্তির আসরে অবতীর্ণ হইলেন মার্কিণ রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট উইলসন আন্তর্জ্জাতিক সভ্যতার বাণী লইয়া। তাঁহার সে বাণী বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘের আকারে পরিণতি লাভ করিল। রাষ্ট্র সঙ্ঘের সভাতল মুখরিত ও বিশ্ববাসীকে আশ্বস্ত করিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন যে, অতঃপর পরস্পরের যুদ্ধ বিগ্রহ পরিহার করিতে হইবে, শক্তিশালী কোন রাষ্ট্র যদি কোন শক্তিহীন রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে তবে শক্তিহীনকে রক্ষা করিবার ও শক্তিমানকে প্রতিহত করিবার জন্য সঙ্ঘের সদস্যগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। সেই সঙ্গে রাষ্ট্র সঙ্ঘের সদস্য শ্রেণীভুক্ত জাতিগুলির সমরোপকরণের পরিমাণ ও তাহা ব্যবহারের সম্বন্ধেও কতই না বিধি-নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল।

সেদিন মনে হইয়াছিল ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের স্মৃতি, অতঃপর সমরপীড়িত জাতিগুলিকে ভাবী সংগ্রাম সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন করিয়া তুলিবে। দীর্ঘ চারি বৎসর ব্যাপী বিরাট যুদ্ধে যে লক্ষ লক্ষ বীর সৈনিক রণক্ষেত্রে আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছে তাহাদের উত্তপ্ত শোণিতে পরস্পরের হিংসাদ্বেষ ও সাম্রাজ্যলোলুপতার হিংস্র উন্মাদনা বিধৌত হইয়া যাইবে, বিশ্বমানব সৌভ্রাতৃত্বের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইবে।

কিন্তু আঠারো বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই ইউরোপ আবার পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর ভয়াবহ রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিয়াছে। মার্কিণ রাষ্ট্রপতির শান্তি ও সভ্যতার সদুপদেশ শক্তিমানদের সাম্রাজ্যলোলুপতার দুর্ব্বার স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে—অস্ত্র সম্বরণ বৈঠক অস্ত্র বৃদ্ধির আগ্রহকে প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছে। ইউরোপের বিগত মহাযুদ্ধ কতকগুলি সাম্রাজ্য ও রাজবংশকে ধ্বংস করিয়াছিল, কিন্তু ইউরোপের ভাগ্যাকাশ আজ যেরূপ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে ভাবী সমরে সমগ্র জাতির ধ্বংসও অসম্ভব নহে।

বিপুল সাম্রাজ্য রক্ষার দুশ্চিন্তায় যাঁহারা ম্রিয়মাণ তাঁহারা আজ অন্তরে সন্ত্রস্ত হইলেও মুখে শান্তির বন্দনা গান গাহিতেছেন। কিন্তু সংগ্রামের বিরোধী হইলেও সমরায়োজন বন্ধ করিতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছেন। সেদিন শান্তিকামী বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীও বলিয়াছেন, আমরা আজ ঘর সামলাইবার দুশ্চিন্তায় বিব্রত। আত্মরক্ষার জন্য যাহা অপরিহার্য্য প্রয়োজন সেই ধন ও জনবল সঞ্চয়ে আমরা সমগ্র প্রচেষ্টা নিয়োজিত করিয়াছি।

অপরাপর শক্তিগুলির মুখেও ঐ এক কথা। জার্ম্মাণী রুষিয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত আবার রুশও জার্ম্মাণীর কার্য্যকলাপে কম সংশয়াতুর নহে। জার্ম্মাণীর চিরশত্রু ফ্রান্সও নিশ্চিন্ত নহে। জার্ম্মাণী সম্পূর্ণরূপে সায়েস্তা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। আবিসিনিয়া বিজয়ী ইটালী শোণিতলোলুপ শার্দ্দূলের ন্যায় আজ সাম্রাজ্য বিস্তারের উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিয়াছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শান্তি ইহারা সকলেই চায়—কিন্তু প্রত্যেকেই সমরায়োজনে প্রমত্ত। কে যে কোথা হইতে কাহার দ্বারা কোন

মুহূর্তে আক্রান্ত হইবে কেহই তাহা জানে না। সমর সম্ভার নির্মাণ অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে। ভাবী যুদ্ধে আত্মরক্ষার উপকরণ সংগ্রহের জন্ত জাতিগুলি ক্রমে অবশ্যম্ভাবী অনশনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু সেদিকে কাহারো লক্ষ্য নাই—রণোন্মাদনা জাতিগুলিকে আজ এমনি আত্মহারা করিয়া তুলিয়াছে।

আজিকার ইউরোপীয় জাতিগুলির এই রণোন্মাদনা দেখিয়া মনে হয়, ১৮ বৎসর পূর্ব্বে সন্ধির ঘোষণা বাণীতে ইউরোপ যে উল্লাস প্রকাশ করিয়াছিল সে উল্লাস তাদের অক্ষমতার উল্লাস—আন্তরিকতার লেশমাত্র তাহাতে ছিল না। সেদিন ইউরোপীয় জাতিগুলি সন্ধির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল শক্তিহীনতা ও শক্তিসঞ্চয়ের অবসরের জন্ত। প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ তাহাদের মধ্যে জাগ্রত হয় নাই—সাম্রাজ্য লোলুপতার হিংস্রবৃত্তি সেদিনও তাহাদের অন্তরে সুপ্ত ছিল। আজ দীর্ঘ আঠারো বৎসরের বিশ্রামের পর আবার তাহা রুদ্র মূর্ত্তিতে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে।

বিশ্ব শান্তি রক্ষক বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের ব্যর্থতা ও অসহায়ত্ব আজ শোচনীয়ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে শান্তি রক্ষার প্রস্তাবও শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। শক্তিহীন রাষ্ট্রগুলি শক্তিমান প্রতিবেশীদের প্রবল দাপটে আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তায় আজ দিশেহারা। জার্ম্মাণী ও ইটালী কাঁচা মাল ও উপনিবেশ চায়—পক্ষান্তরে প্রাচুর্য্যের যাহাদের অন্ত নাই সেই বৃটেন ও ফ্রান্স আজ বিজ্ঞজনোচিতভাবে শান্তির আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা ও সংগ্রামের অসারতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই ব্যস্ত।

কিন্তু ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থায় শান্তি প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব? বৃটেন ও ফ্রান্স যদি ইটালী ও জার্ম্মাণীর সাম্রাজ্য লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্ত তাঁহাদের লাভের অংশ হইতে বণ্টন করিয়া দেন তাহা হইলেও কি শান্তি প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয় হইবে? বর্ত্তমানে ইউরোপে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে সাম্রাজ্য লোলুপতা ব্যতীত তাহার আরও একটা কারণ আছে। বৃটেনের যে সম্পদ প্রাচুর্য্য তাহা গড়িয়া উঠিয়াছে এশিয়া ও আফ্রিকার শক্তিহীন জাতিগুলিকে শোষণের ফলে। শক্তি ও সঙ্ঘবদ্ধহীন জাতিগুলির উপর ক্রমাগত শোষণের ভিত্তিতে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত তাহা চিরস্থায়ী হওয়া সম্ভব নহে—সে ভিত্তির বনিয়াদ একদিন না একদিন ধ্বসিয়া পড়িবেই। বৃটেনের এই সম্পদ প্রাচুর্য্যই আজ হিটলার ও মুসোলিনীকে ভাগ্যান্বেষণে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। বৃটেন ও ইটালী হয় তো ভূমধ্যসাগরে তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি রক্ষার একটা আপোষ মীমাংসা করিতে পারে, কিন্তু জার্ম্মানী—তাহাকেও যদি কোন উপনিবেশনের আশ্বাসে শান্ত করা যায় এবং সত্যই ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হয় তাহা হইলে সে শান্তির জন্ত মৃত সর্ব্বস্ব আবিসিনিয়া নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারিবে না।

মোটের উপর ইউরোপের ভাগ্যাকাশে আজ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন। একটা অসংযত উন্মাদনায় ইউরোপের জাতিগুলি ক্রমে ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হইতেছে। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি যাহাদের আছে তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিলেও নিরুপায়। বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞেরাও এ সঙ্কট সমস্যা সমাধানের আজও কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। মনে হয় যতদিন ইউরোপীয় জাতিগুলির সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্য লোলুপতার অবসান না হইবে ততদিন স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা দুরাশা। দীর্ঘ আঠারো বৎসর পরে ইউরোপের আধুনিক পরিস্থিতি দেখিয়া ইহাই অবিসংবাদিতভাবে বলা যাইতে পারে।

শিক্ষিত দু'টি তরুণ-তরুণী দখিন হাওয়ার প্রথম পরশে পরস্পরকে পাবার সোনালী স্বপ্নে বিভোর; কিন্তু বাস্তবের রূঢ় অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাদের জীবনে এল ট্রাজেডি—তারি একটা অশ্রু-সজল কাহিনী।

দখিন-হাওয়া—

(গল্প)

শ্রীসুধীর রঞ্জন সেন

বাস্তব জীবনের সীমা-রেখা পার হ'য়ে নর ও নারী যাত্রা করেছে জ্যোৎস্নালোকিত প্রেমের তীর্থলোকে। পৃথিবীর বুকে শোনা যায় সে পথ চলার নূপুর-ছন্দ। জীবনের অফুরন্ত প্রবাহ বহে যায়—তীরের মায়া বেঁধে রাখতে পারে না মানুষের মন। ছন্দ যারা হারিয়ে ফেলে, গতি বেগ যাদের স্তব্ধ, সমুখপানে এগিয়ে চলার সামর্থ্য ও পাথেয় যাদের নেই, ভবিষ্যৎ যাদের কাছে মূল্যহীন—তা'রা ফিরে তাকায় হারিয়ে যাওয়া অতীতের পানে। বর্ত্তমানের কার্য্য-কারণের লৌহ-শৃঙ্খল যেখানে ঝম্ ঝম্ করে বাজে, অতীত সেখানে সোনার তারে বীণার ধ্বনি বাজিয়ে তোলে। হায়, তবু কোন্ ক্রন্দসীর আঁখি-জলে সমস্ত অতীতটা ঝাপ্সা—অস্পষ্ট।

জ্যোৎস্না রাত। মলয়ের পায়ে পায়ে ঝিঁ ঝিঁর সোনার নূপুর বাজে। বন-কুসুমের পরাগ দূরাগত মলয়ের অলস-পাখায় মিশে রজনী করে সুবাসিত। সুলেখা নীল আকাশের দিকে চোখ তু'লে চায়। মৌন, বাথিত, ভাবে-ভরা চোখের কোণে চক্ চক্ করে মুক্তার মত কয়েক ফোঁটা অশ্রু—যেন শরৎ-প্রভাতের শিশির। নীল শাড়ী মমতায় ঘিরে রেখেছে তা'র তনুর লীলায়িত ভঙ্গিমা। এলো খোঁপা—যেন পদ্মের বুকে ভ্রমর। সুলেখা আজ মানবী নয়—যেন স্বপ্নলোকের এক কিশোরী রাজকন্যা; রূপালী জ্যোৎস্নার একটি ঝিকিমিকি—ভৈরবীর নীরব ভাবঘন অনুভূতি; যেন কিশোর বুকের হারিয়ে যাওয়া সোনালী রঙের মৃদু শিহরণ। জ্যোৎস্নার বুকে আছে কী—যেন অপরূপ যাদু! বুকে এসে লাগে সে যাদুস্পর্শ—মনে হয় বিগত রজনীর স্বপ্ন-কথা, আর সুলেখার সুবর্ণ চম্পক-কলির মত অঙ্গুলীর ফাঁকে ফাঁকে ঝরে অশ্রু-নির্ঝর।

পাহাড়ের বুকে আঁকা-বাঁকা রাঙা-মাটির পথ। সুলেখা এই পথ দিয়ে সন্ধ্যার আগে অনেকখানি যায়। শ্যামলী ধরণীর মধুশ্রী মুগ্ধ-চোখে চেয়ে দেখে। দূরে রাত্রি-রাণীর দুর্গ-প্রাচীরে অরুণ নীরবে আত্ম-গোপন করে—সুলেখা আবার ফিরে পথ চলে। প্রাত্যহিক জীবনে সন্ধ্যার ধূসর আবছায় যেন এই পথ-চলার নেই কোথাও এতটুকু ছন্দ-পতন।

সে দিন ফেরবার পথে অজস্র বর্ষণ। সুলেখা এল একটা ঝাউ-কুঞ্জের মাঝখানে। বৃষ্টি আর থামে না—ঘনতর হয়ে আসে সন্ধ্যার অন্ধকার। অশ্রান্ত বারি বর্ষণের ঝির্-ঝিরাণীর মাঝেও শোনা যায় কে যেন গান গেয়ে আসে—

"কুঞ্জ-কুটিরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জ্জ পাতায় নব গীত করো রচনা,
মেঘ-মল্লার রাগিনী,
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিনী॥"

আরো নিকটে আসে গান। সুনীল থমকে দাঁড়ায়। ঠিক সুলেখা,—শাড়ী, রাঙিন বৃষ্টিতে গিয়েছে ভিজে। কিশোরীর আয়ত আঁখি দু'টীতে অসহায় হরিণীর মৌন আবেদন। সুনীল ক্ষণিকের আবেশ ভেঙে বলে,—সুলেখা এই বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিজোনা, এই আমার ছাতাটি নিয়ে চল। সুলেখা ধীরে ধীরে চলে আসে। ভিজে পথ—পড়ে যাবার ভয়। তারপর আবার পথের দু'ধারে ঘন বন-শ্রেণী সন্ধ্যার অন্ধকার দিয়েছে আরও নিবিড় করে। সুলেখা পা'পিছলে পড়ে যাচ্ছিল, সুনীল তা'কে দিলে আপন বাহুর আশ্রয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে হাত ধরা-ধরি করে চলে যায় দু'টি কিশোর-কিশোরী। নীরবতা ভেঙে সুলেখা বলে,—সত্যি, চমৎকার গলা আপনার! আর এই মেঘলা সন্ধ্যায় গানের কথাগুলি যেন প্রকৃতির বুকে মিশে যেতে চায়।

সুনীল সুলেখার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলে,—কুঞ্জ-কুটিরে ভাবাকুললোচনার দেখাও মিলে গেল। ভূর্জ্জ পাতায় না হোক্, মনের পাতায় নব গীতও রচনা হলো মেঘ-মল্লার রাগিনীতে; কিন্তু সুলেখা, তুমিই কি সেই নব-অনুরাগিনী নও?

সুলেখার বুকখানা কী যেন অজানা পুলকে ভরে যায়। সে ধীরে ধীরে মুখখানা রাখে সুনীলের বুকে আর তার আনত সুন্দর মুখের উপর সুনীলের মুখ নেমে আসে—একটি নীরব নিবিড় চুম্বন। অন্ধকারে দেখা যায় না সুলেখার মুখখানি

গরমে রাঙা। সুলেখা বলে,—ছিঃ! ভারী দুষ্টু তুমি।

সুনীল কথা কয়না। সুলেখার বুকের উষ্ণ পরশ তখনো তা'র বুকের তটে ঢেউ-য়ের জোয়ার আনে। সে ভাবতেও পারেনি এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে সুলেখার দেখা মিলতে পারে। এই সুলেখাকে এতোদিন সে অন্তর দিয়ে কামনা করেছে বটে, কিন্তু একে ছিলনা এতো কাছে এমন নিবিড় করে পাবার কল্পনা। আজ প্রথম মনে হচ্ছিল বুঝি: প্রকৃতির এই ঝর্-ঝর্ শব্দে অনেক দূর থেকে তা'র স্বপ্ন-লোকের প্রিয়া, কল্পনার সহচরী প্রাণের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে, কেন না সে সুলেখাকে দেখেছে দূর হ'তে—ভালবেসেছে গোপনে। আজ তা'র এ কী অকুণ্ঠ প্রণয় নিবেদন! সুলেখা না-জানি কী ভাববে!

সুলেখা বলে,—রাগ হয়েছে বুঝি? বুঝো যে কথা বলছ না? সুনীল বলে,—সুলেখা, মনের কথার আজ ভাষা নেই। শুধু বুক যখন ভ'রে ওঠে তখন নীরবতাই তা'র সবচেয়ে বড়ো আর সত্যিকারের ভাষা। প্রাণের কথাটি এতো স্পষ্ট ক'রে গভীর ভাবে প্রকাশের অসীম ক্ষমতা আছে নীরবতার বুকে। আজ আমার মনে হয় এই যে সন্ধ্যা—এ যেন বিরহের নিবিড় অন্ধকার। সুলেখা, রাণী আমার! তুমি সান্নিধ্যের দীপ জেলে দাও, অজানার তমিস্রা পার হয়ে দু'জনেই আমরা দু'জনকে আপন ক'রে নিই।

সুলেখা ধীরে অথচ স্পষ্ট স্বরে বলে,—একান্ত আপনার ক'রে যে দিন তুমি আমায় ডাক দেবে, আমি বসে রইলাম সেই শুভ-দিনের প্রতীক্ষায়।

সুলেখাদের বাড়ীর পথ এল শেষ হয়ে।

• • •

তারপর প্রতিদিন সেই আঁকা-বাঁকা রাঙা-মাটির পথ। বনে বনে পাখীর কাকলি, ঝর্ণার ঝির্-ঝিরাণি, বন-কুসুমের স্নিগ্ধ সুরভি, পাইন বনে বাতাসের খস্-খসানী, অরণ্যাণীর শ্যামলিমা, গোধূলির রঙীন প্রচ্ছদপট, নব-নীল-নীরদের সজলতা, আলো-ছায়ার রহস্যময় লীলা সুলেখাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। এরা তার কানে কানে কথা কয়—সে রাঙা হয়ে ওঠে সরমে আর পুলকে। বাতাস তা'র আশমানী রঙের শাড়ীর আঁচল ধরে টানে, কাণের ঝুমকো দু'টি দুলিয়ে দেয়, নাচায় তা'র নাগিনীর মত বেণী। ঝুর্-ঝুরে ঝর্-ঝরে চিকণ কালো মুখে ও চোখের উপর অস্ত-সূর্য্যের শেষ-রশ্মি ঝিক্ ঝিক্ করে হাসে। তারি লালিমা তা'র বুকে, মুখে ও চোখের উপর পড়ে অপরূপ হয়ে ওঠে। সুলেখা মালা গাঁথে—সুনীল সুলেখার বেণীতে জড়িয়ে দেয় সে মালা। সুলেখাকে সুনীল বলে, বনজবী, কবির কাব্য, আরো কতো

কী ! সুলেখার চোখ দু'টি আবেগে কাঁপে। ঘন কালো দু'টি চোখে করুণ আকুতি মাখা। সুনীল তাকে ধীরে ধীরে বুকের কাছে আনে, সুলেখা উপর দিকে তুলে ধরে আপনার মুখ। তৃপ্তিতে মুদে আসে দু'টি পদ্ম-আঁখি। সুনীল কাণে কাণে বলে—

"এ লঙ্, লঙ্, কিস্—
এ কিস্ অব ইউথ্, এণ্ড লভ্"

ভিজে এল সুলেখার চোখের পাতা। সে কোন মতেই ভুলতে পারেনি এমনি জ্যোৎস্নালোকিত আরেক সন্ধ্যার যে বন্ধু আজ বুকের কাছে সে চলে যাবে দূরে—বহু দূরে। কাল প্রভাতের অরুণালোকে সুনীল শিক্ষার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে সাগরের ও পারে। কত দিন সে অপেক্ষা করে থাকবে এম্‌নি ধারা এক মধু-যামিনীর আশায়। সে মনে মনে জপে—সুনীল আর সুলেখা, সুলেখা আর সুনীল, নীল-লেখা। গলার স্বর ভারী হয়ে এল, সে বল্‌লে—

হার্ট টু হার্ট—
লিপস্ টু লিপস্—

* * *

পাঁচ বছর পর।—সুনীল বিলাত থেকে ফিরে এসেছে দেশে। এসেই সুনীল যখন সুলেখাদের বাড়ীতে এল তখন সন্ধ্যা হয়েছে। অনেকদিন পরে সুনীলের সাথে দেখা—সুলেখার বুকে জাগে আনন্দের কলতান, কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে কেঁপে ওঠে সুলেখার বুক। হাসির লেশ মাত্র নেই—বিবর্ণ মুখে বিষাদের ছায়া স্পষ্টায়মান। চেহারায় একটি অস্বাভাবিক-তার প্রকাশ। সুলেখা সুনীলের একখানি হাত আপন হাতে তুলে নিয়ে স্নেহ-জড়িত স্বরে ডাকলে,—নীলদা !

—সুলেখা ?

সুনীল আর কথা বলতে পারে না। তার বুকের অবরুদ্ধ ভাষা আজ সুলেখার হাতখানি সিক্ত করে দিল অশ্রু-লেখায়। সুলেখা অবাক হয়ে চায়। হয় ত বোঝে হয় ত বা বোঝে না এই বাক্যহীন অশ্রুর ভাষা। আজ তার বুকে আনন্দের কলোচ্ছ্বাস জেগে উঠেছিল। শত-বর্ষ পরে বঁধুয়া এসেছে ঘরে—রাধিকার অন্তরে উল্লাস। হারানিধি পেয়েছি ব'লে হৃদয়ে তুলে নেবার ব্যাকুলতা—নেই বিলম্বের অবকাশ ! কিন্তু এ হ'ল কী ? বঁধু যদি এল; নিয়ে এল সে দুঃখের শ্রাবণ-ধারা।

মনের ভার কিছু লাঘব হ'লে সুনীল বললে,—লেখা, তুমি আমায় ভালোবাস ?

এ কী অহেতুকী প্রশ্ন ! সুলেখা উত্তর দেয় না। অভিমানে তার চোখ দু'টি ছল্‌ছল্। সে চোখে তিরস্কারের জ্বালা নেই—নেই সন্দেহের ছায়াপাত্তা, আত্ম-প্রত্যয়ের সুগভীর স্বচ্ছতায় কী যেন কারুণ্য, কী যেন কাকুতি চোখের জলে মহীয়ান হয়ে ওঠে—যেন নীল সরোবরের বুকে পূর্ব্বাশার আলোর রেখা কম্পমান।

সুনীল বোঝে সুলেখার বোবা চোখের চাহনী। বোঝে, ভালোবাসার রঙীন পরশে তার চোখে সোনালী রঙের আবেশ। এ স্বপ্ন কি করে ভাঙবে সে ! কুমারী জীবনের অনাবিল প্রথম সবুজ প্রেম—ছলনা নেই ; সে জানে না, কাকে বলে আত্ম-প্রবঞ্চনা। জীবনের প্রথম উষালোকে অনুরাগের রক্ত-লেখায় কোন্ বাণী তার নীরবতাকে দিয়েছে মুখর করে ; অস্পষ্টতার কুয়াসা ভেদ করে নিজেকে যে জানতে পেয়েছে, দখিন হাওয়ার স্পর্শে জীবন যার বর্ণে রসে মুকুলিত, সে যখনি তার হৃদয়-কমলে একটি নীরব প্রণতিই অঞ্জলি তুলে ধরেছে তার বড়ো আদরের দয়িত দেবতার চরণে, ঠিক সেই সময় সুনীল এসে—নাঃ ! সে আর ভাবতে পারে না ! তবু উপায় নেই !

—লেখা !

কী নীলদা !

সুনীল ব'ললে,—আমায় মাপ করো রাণী। জানি, তুমি আমায় কতোখানি ভালোবাস, কিন্তু আজ যে নিষ্ঠুর সত্য প্রকাশের বেদনা আমার হৃদ্‌পিণ্ড উপড়ে দিতে চায়, সে যত বড়োই হোক, তোমাকে কোথাও বঞ্চনা করতে পারি, এতোখানি অমানুষ আজো আমি হইনি। আমার জীবনে সবচেয়ে যা সত্য, শিব ও সুন্দর ; দিনের আলোর চেয়ে যা স্পষ্ট, এমন সহজ প্রাণ-ধর্মকে ত অস্বীকার করতে পারিনে—মানুষে পারে না। কিন্তু মানুষ ভাবে এক এবং হয় আর। তোমাকে নিয়ে নীড় বাঁধবার স্বপ্ন গেল ভেঙে। তুমি জান না, বিলাত গিয়ে অর্থাভাবে পড়ে মায়ের কাছে দিলাম চিঠি। উপায়হীন তারা। অনেকদিন যায়, মা রীতিমত টাকা পাঠান ; কিন্তু মা পেলেন কোথায় জানি না। পরে এখানে এসে জানলাম তোমাদের প্রতিবেশী অমৃতবাবু মাকে টাকা ধার দিয়েছেন এই সর্ত্তে যে মায়ের বিলাত-প্রবাসী ছেলে ফিরে এসে যেন তার মেয়েকে বিয়ে করে। জানি, মা নিরুপায় ; ছেলের মনের রাজ্য তার অজ্ঞাত, তাই স্বাক্ষর করেছেন এই সর্ত্তে। লেখা, লক্ষীটি আমার ! আমায় তুমি ভুলে যেয়ো।

ধীরে ধীরে সুলেখার মুখ হয়ে এল পাংশু। এ ভাবছিল তার সহপাঠিনী নীরজার কথা। ধনী পিতার আদরিণী

মেয়ে নীরজার কথা। সুলেখা সুনীলের চোখে চেয়ে রয়—পলকহীন দৃষ্টি।

সুনীলের গলার স্বর ভারী হয়ে এল। সে বললে,—আর এখনি মোটে দু' ঘন্টার পর আমার বিয়ে।

অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে সুলেখা সুনীলের গলা জড়িয়ে ধরে বললে,—আমি তোমায় যেতে দেব না। না—না; ওগো তুমি যে আমার, পর করে দিই কেমন করে। বলেই সুলেখা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

মূর্চ্ছা যখন ভাঙ্‌লো, দেখলে ছোট বোন রেখা শিয়রে বসে বাতাস করছে। রেখা ডাক্‌লে,—রাঙাদি'! সুলেখা চায়, সে চোখের দিকে সুলেখা চেয়ে থাকতে পারে না—আঁচলে চোখ মুছে জান্‌লার পর্দাটা তুলে দিলে সে। বাহির থেকে একটা বাতাস সুলেখার চোখে স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দিল—ধীরে ধীরে মুদে এল তা'র চোখের পাতা। আরেক বাড়ীতে সানায়ের বুকে তখন মুখর হয়ে উঠেছে সাহানার মধুর আলাপন।

হঠাৎ, সুলেখা দু'হাতে রেখাকে বুকের উপর টেনে জড়িয়ে ধরে বললে,—আমি তোমায় যেতে দেব না—না-না। চোখে তার জল। রেখা ডাকে,—রাঙাদি'! সুলেখা চম্‌কে উঠে বলে,—কি রে রেখা? রেখা বলে,—তুমি একটু ভালো করে ঘুমাও লক্ষ্মীটি!

* * *

অনেক রাত। চোখে নেই ঘুম। বিয়ে বাড়ী নীরব—বর-কনে বোধ করি বাসর শয্যায়। সুলেখার আজ মনে পড়ে অনেক কথা। মনে পড়ে এক মেঘ-মেদুর সন্ধ্যার কথা। আকাশের আঁচল বেয়ে এক রাজপুত্র মুকুট পরে এসেছিল তার জীবনে।

রাজপুত্র বললে,—তুমি রাজ কন্যা।

রাজকন্যা বললে,—তুমি রাজপুত্র।

রাজপুত্র আর রাজকন্যা হাত ধরা-ধরি করে চলে যায় রাঙা-মাটির পথ বেয়ে অনেক দূর। মেঘ নেই আর আকাশে। দখিন-হাওয়া পথের দু'ধারে বুনে দেয় স্বপ্নের জাল। রাজকন্যার পায়ে নূপুর বাজে—ঝিকির্ ঝিকির্, ঝুমুর্ ঝুমুর্। রাজকন্যা আর রাজপুত্র যায়—ফিরে তাকায় না। নাঃ, আর ত দেখা যায় না, শোনা যায় না পায়ে চলার-গান। কিন্তু ওই ত দেখা যায় দূরে পৃথিবী আর আকাশ, আকাশ আর পৃথিবী, পৃথিবী-আকাশ হয়ে গেছে ঝাপসা। আকাশ যেন রাজপুত্র আর পৃথিবী রাজকন্যা।

সুলেখা সুদূর আকাশ আর পৃথিবীর দিকে চেয়ে কী ভাবে?

জ্যোৎস্না রাত। মলয়ের পায়ে পায়ে ঝিঁঝিঁর সোনার নূপুর বাজে। বন-কুসুমের পরাগ দূরাগত মলয়ের অলস-পাখায় মিশে রজনী করে সুবাসিত। সুলেখা নীল আকাশের দিকে চোখ তুলে চায়। মৌন, ব্যথিত, ভাবে-ভরা চোখের কোণে চক্ চক্ করে মুক্তার মত কয়েক ফোঁটা অশ্রু—যেন শরৎ-প্রভাতের শিশির। নীল শাড়ী মমতায় ঘিরে রেখেছে তা'র তন্বীর নীলাঞ্জিত তনিমা। এলো খোঁপা—যেন পদ্মের বুকে একটা ভ্রমর। সুলেখা আজ মানবী নয়—যেন স্বপ্ন লোকের এক কিশোরী রাজকন্যা; রূপালী জ্যোৎস্নায় একটা ঝিলিমিলি; ভৈরবীর নীরব ভাব-ঘন অনুভূতি। যেন কিশোর বুকের হারিয়ে-যাওয়া সোনালী রঙের মৃদু শিহরণ। জ্যোৎস্নার বুকে আছে কী-যেন অপরূপ যাদু। বুকে এসে লাগে সে যাদু-স্পর্শ—মনে হয় বিগত রজনীর কত স্বপ্ন-কথা, আর সুলেখার সুবর্ণ চম্পক-কলির মত অঙ্গুলির ফাঁকে ফাঁকে ঝরে অশ্রু-নির্ঝর। কোথায় সুলেখা আজ? পৃথিবীতে নয়। সুলেখা আজ পৃথিবীর মেয়ে নয়। গ্রহে গ্রহে তারায় তারায় যেখানে রূপালী আলোর আলিঙ্গনের জোয়ার এসেছে যামিনী-সহচরী সেখানে তাকে ডাক দিয়েছে। জ্যোৎস্নাজরীর জাল-বোনা এ রহস্য পুরীর কোন্ পথে সুলেখা আমাদের হারিয়ে গেছে।

স্বপ্ন-প্রিয়া

—শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

স্বপন-প্রেয়সী মোর হৃদি-ঈশ্বরি!
কত যুগ যুগান্ত ধরি'
কল্পনা-ফুলে তোমা সাজায়েছি সখি।
আমার ধ্যানের মাঝে তোমারে নিরখি'
কণ্ঠে জেগেছে তব বন্দনা গান,
হৃদয়-বীণায় মোর সুমধুর তান
ঝঙ্কার দেছে বারে বারে।
ফাগুনের কত রাতি আসি' চুপিসাড়ে
ফিরিয়া গিয়াছে হেরি' ধ্যানরত মোরে
কুঞ্জে কত না ফুল পড়িয়াছে ঝ'রে
সারাটী রজনী জাগি'
মোর লাগি'
অয়ি মোর হৃদি-ঈশ্বরি!
ধরণীর যত কিছু ছিনু বিস্মরি'
তোমারে লভিয়া মোর ধেয়ানের মাঝে,—
যেথা দেখা দিয়েছিলে অপরূপ সাজে
মন্দার মালা ল'য়ে হাতে।
জ্যোছনা-হসিত স্থির গম্ভীর নিশাতে
অপলক আঁখি মেলি' মোর মুখ পানে
কী যে কথা কয়েছিলে এ আঁখি তা জানে।

যে রাগিনী বেজেছিল কথায় তোমার
সে তো সখি, নহে ভুলিবার!
গোপন কামনা যত মোর
ভাঙি' মোর হৃদয়ের দোর
লুটাইলো সে নিশীথ রাতে
তোমারি চরণে সখি, মিলন-সভাতে।
সেই দিন প্রেম-ফুল হৃদি-ডালি ভ'রে
রেখেছিনু যাহা দেবি, দিনু শেষ ক'রে
তোমারি পূজায়, মোর হৃদয় উজাড়ি।
পূজা শেষে সব-হারা এ-দীন পূজারী
হতবাক্, নতমুখ, অপরাধী-প্রায়
দাঁড়াইল পাশে তব, বুঝি দুরাশায়
বুকে ল'য়ে, দেবী-মন্দিরে।
মৃদু হেসে তুলি মুখ ধীরে
সহসা খুলিয়া তব বক্ষ-মালাখানি
মোর গলে দুলাইলে রাণি!
নির্ভয়ে সেই ক্ষণে আমারি এ-বুকে
লুকাইলে মুখখানি না জানি কি সুখে।
তোমার মৃণাল-ভুজ পরশন লভি'
ধন্য হ'ল কবি।

মাণিকজোড় লরেল-হার্ডি

রোগা আর মোটা—দু'টি যেন মাণিক-জোড়। এমন রাজযোটক যোগ দুনিয়ায় আর নাই। স্বামী আর স্ত্রীতেও এমন খাপ খায় না—যেমন এই দু'টি বন্ধুতে—লরেল আর হার্ডি! শিক্ষিত সমাজে লরেল-হার্ডির নাম জানেন না, এমন লোক নাই। আমাদের সকলের আনন্দ-সহরে—এই বিশ্রী গোমড়া-গম্ভীর জগতে দু'টি যেন হাসির ঝরণা।

তাঁদের হাবভাব, ভঙ্গী আমাদের সবটুকু জানা—অথচ তাঁদের পরিচয় জানি কতটুকু? সম্প্রতি একখানি সাপ্তাহিক পত্রে দুই বন্ধুর লেখা আত্মজীবনী বাহির হইতেছে—তাঁদের ভাষা যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া আমরা সে জীবন-কাহিনী সঙ্কলন করিয়া দিব।

প্রথমে বলিতেছে—আমাদের "রোগা" বন্ধু ষ্টান্ লরেল। তিনি বলিতেছেন—আমার মা-বাপের দেওয়া নাম ষ্টান্‌লি জেফার্সন। আমার জন্ম একদিন হইয়াছিল—এ সম্বন্ধে লিখিত বহু প্রমাণ আছে; তার উপর সেরা প্রমাণ, আমি নিজে। আমি যদি না জন্মিতাম, তাহা হইলে আপনারা আমাকে দেখিতে পাইতেন না। যখন আমায় চোখে দেখিতেছেন, তখন একদিন যে আমি জন্ম লইয়াছি, তাহাতে সংশয় নাই। আমার জন্ম হয় লাঙ্কাশায়ারের অন্তঃপাতী উলভাষ্টন সহরে—১৬ই জুন তারিখে। কোন্ বৎসরে সে কথাটা প্রকাশ করিব না। বয়স সম্বন্ধে সকলের কাছে কথা দিয়াছি। বয়স বলিতে নাই—আমিও তাই বয়স বলিব না।

আমার বাবার নাম ছিল আর্থার জেফার্সন। এখনও তিনি বাঁচিয়া আছেন—ইলিং সহরে বাস করিতেছেন। যখন আমার জন্ম হয়, আমার বাবা তখন ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চলে পাঁচটি থিয়েটারের মালিক—আমার মা ছিলেন নামজাদা অভিনেত্রী—ষ্টেজে তাঁর নাম ছিল ম্যাজ মেটকাফ। ক'বৎসর পূর্ব্বে আমার মা মারা গিয়াছেন। আমি থিয়েটারী আবহাওয়ায় মানুষ হই—ঐশ্বর্য্য ছিল খুব। কিন্তু বেশীদিন রহিল না—আমার কিশোর বয়সে—১৫ বৎসর—বাবার ব্যবসা গেল মাটী হইয়া এবং সেই ১৫ বৎসর বয়সে অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে আমাকে গৃহ ছাড়িয়া দুনিয়ার পথে বাহির হইতে হয়।

আমি ষ্টেজে প্রবেশ করি। শুনিয়াছি শিশুবয়সে মায়ের গ্রীজ পেণ্টের 'ষ্টিক' আমি খাইয়াছিলাম—কাজেই আমার রক্তে ছিল 'থিয়েটার'—থিয়েটারে অভিনয় করতে নামিব—সে আর বেশী কথা কি।

শৈশবে আমার খেলনা ছিল ছোট একটি ষ্টেজ। আমি আর আমার বোন বিয়েট্রিস দু'জনে এই ষ্টেজ লইয়া খেলা করিতাম—রোমাঞ্চ মেলো-ড্রামার অভিনয় করিতাম। ট্রাজেডি ছাড়া কোন নাটকের অভিনয়ে প্রবৃত্তি ছিল না। পুতুল হইত নটনটী।

থিয়েটারে চাকরিতে প্রবেশ করিয়া মঞ্চে নামিবার সুযোগ পাই নাই। ষ্টেজের ফুটলাইট জ্বালিতাম, সিন্ ঠেলিতাম—ইহাই ছিল আমার কাজ। কাজে বেকুফির পরিচয় দিতাম চূড়ান্ত রকম।

একবার ফুটলাইট জ্বালিতে গিয়া ড্রপ-সিনে দিলাম আগুন ধরাইয়া—আগুন যখন নিবিল, আমি তখন বেকার হইয়াছি।

চাকরি হারাইতে হয় নাই—আমার মুখের কাঁচু-মাচু ভাব দেখিয়া মালিকের মনে দরদ জাগিয়াছিল।

স্কুলে লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ আমার বেশী মিলে নাই। টাইপ রাইটার চালাইতে শিখিয়াছিলাম খুব অল্প বয়সে। বানান ভুল করিতাম অনর্গল, বাড়ীতে সেজন্য কাণমলা খাইতাম, প্রহার খাইতাম, তবু বানান ভুল শুধরাইত না। মনে আছে, "এ্যাক্সেল" কথাটা বানান করিতে ভুল করিতাম, কিন্তু বহু কাণ মলা খাইয়াও এ ভুল শুধরাইতে পারি নাই।

টাইপরাইটারে দক্ষতা দেখিয়া বাবা স্থির করিলেন, কোন অফিসে আমাকে ঢুকাইয়া দিবেন! কিন্তু রঙ্গমঞ্চের মোহ আমার মনকে পাইয়া বসিয়াছিল। আমি
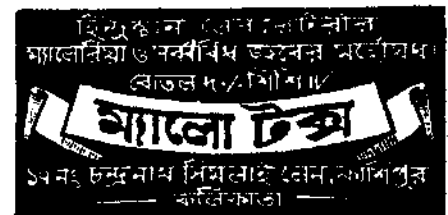
বলিলাম, না, আমি থিয়েটারে চাকরি করিব। বাবা বলিলেন—কি লেখাপড়া জানিস যে, অভিনয় করতে চাস? আমি বলিলাম—কে বলিল, আমি অভিনয় করিব? ষ্টেজে শীন ঠেলিব—ষ্টেজে কাষ করিব।

একবার নর্থ শীল্ডসে – সেদিন সোমবার সকালবেলা—রয়েল থিয়েটারের ষ্টেজে একটি ভ্রাম্যমান সৌখীন দল রিহার্শাল দিতেছিল। রোমাঞ্চকর নাটকের রিহার্শাল। একটা দৃশ্য ছিল—সে দৃশ্যে নায়িকাকে নাটকের 'ভিলেন' বোট হইতে জলে ফেলিয়া দিতেছে—জল হইতে নায়ক নায়িকাকে উদ্ধার করিবে। নদী হইয়াছিল মস্ত একটা কাচের চৌবাচ্চায় জল ভরিয়া—সত্যকার জল ছিল সে চৌবাচ্চায়। রিহার্শাল শেষ হইবামাত্র আমি বোটে চড়িয়া কষিয়া দাঁড় টানিতে লাগিলাম—ষ্টেজে তখন কেহ ছিল না। দাঁড় টানিবার উৎসাহে দাঁড় চৌবাচ্চার একটা দিকে সজোরে আঘাত লাগিল—প্রচণ্ড শব্দ হইল—ভয়ে আমি ষ্টেজ ছাড়িয়া পলাইলাম।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে লোকজন আসিল। অভিনয়কালে চৌবাচ্চায় জল ভরা হইল। কিন্তু অভিনয় দৃশ্যে সমস্ত জল কাটা কাঁচ দিয়া বাহির হইয়া অডিটোরিয়াম ভাসাইয়া যে বিভীষিকার সৃষ্টি করিল, জীবনে তাহা ভুলিব না।

কিন্তু সে কথা থাক্। আমার জীবনের কথা বলি। প্রথম ষ্টেজে নামি—তখন আমার বয়স সাত বৎসর 'দি লাইট্স্ অব্ লণ্ডন' নাটকে খবরের কাগজ বিক্রেতা সাজিয়া প্রথম রজনীর সে স্মৃতি আজিও ভুলি নাই। (ক্রমশঃ)

শেষ-সাক্ষাৎ

শ্রীমৃণাল কান্তি দাশ

এক সময়ে সে ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। কোন এক অশুভ মুহূর্ত্তে হ'লো বিচ্ছেদ। বন্ধু—হ'লো শত্রু।

অনেক দিন হয়ে গেছে। অবশেষে একদিন সে যে সহরে থাকতো সেখানে এসে শুনলুম, সে অসহায়ভাবে পীড়িত—আমাকে দেখতে চায়।

তা'কে দেখতে গেলুম। ঘরে প্রবেশ করতেই হ'লো দু'জনের চোখে চোখে মিলন। সহসা তাকে চিনতেই পারলুম না। ভগবান! রোগে তার কি দুর্দ্দশাই না করেছে।

হলদে, লোল সমগ্র মুখখানা তা'র কামানো, যা ওই চিবুকে একগুচ্ছ দাড়ি।

বিশেষ বস্ত্রাবরণ নেই পরণে, কেবল গায়ে একটা সার্ট। তা'ও গলা খোলা, ইচ্ছে করেই খোলা। অতি লঘু বস্ত্রাবরণ ধারণ করতেও সে অক্ষম।

জোর ক'রে, টেনে সে তা'র জরাবহুল একখানা হাত আমার দিকে প্রসারিত কর'লে। যেন. ছিন্ন, অসংলগ্ন একখানা হাত। কোনমতে কি যেন বল্লে, অস্ফুট অস্পষ্ট স্বরে—তা অভ্যর্থনা কি ভৎ'সনা কে জানে?

বিশীর্ণ কঙ্কাল বক্ষ তার মুহূর্ত্তের জন্যে স্ফীত হয়ে উঠে, আর উজ্জ্বল চোখের স্তিমিত আঁখি-তারা হ'তে গড়িয়ে পড়লো দুফোটা বেদনায় অশ্রু, করুণ মিনতি।

একটা অজ্ঞাত অনুভূতিতে মুহ্যমান হয়ে এলো আমার হৃদয়ে। তার পাশে একখানা চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লুম। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরিয়ে নিলেম দৃষ্টি সেই আতঙ্ক ও অবসন্নতা থেকে। হাতখানা বাড়িয়ে দিলুম তার দিকে।

কিন্তু আমার মনে হ'লো এ যেন তার হাত নয়, যেখানা আমার ধরে আছে। মনে হ'লো: কে এক দীর্ঘ, শান্ত শ্বেতবাস পরিহিতা রমণী আমাদের মাঝখানে উপবিষ্টা। তার গম্ভীর, মলিন চোখের দৃষ্টি শূন্যতায় অবসিত। কঠিন, পাণ্ডুর অধরে একটী বাক্যস্ফূর্ত্তিও নেই। এই রমণীই আমাদের দুজনের হাত একত্রিত করলে। বেঁধে দিলে চিরমিলনের রাখীবন্ধনে।

হাঁ......মৃত্যুই আমাদের পুনর্মিলন ঘটালো। *

* টুর্গেনিভ

পদ্মফুলের কুঁড়ি

শ্রীরামেন্দ্র কুমার দেশমুখ্য

পদ্মফুলের কুঁড়ি
নিদ্ পরীটার, স্বপনছোঁয়া কাজল ঘুমমায়া
—নাই বা নিল ছোঁয়া ;
কিন্তু কেন খুল্‌বে না তার চোখ ?
একরত্তি সে মেয়ে ;
একুশ মণের লোহা-ঢালাই বুক
হ'য়ে কেন তা'র ?
চোখের পাতায় মিল দে'বাতে ঘুমের অধিকার
চিরদিনের জানা।
ও জিনিষটা ঘুমের হাটেই মেলে।
নিদ্‌মহলে,—
তোরণ দোরের পাশেই ওটার ঝুড়ি।
—পদ্মফুলের কুঁড়ি,
ধন্যি সাহসখানা !

*   *   *

পদ্মফুলের কুঁড়ি ;—
রাত বারোটা হয়ত তখন বাজে ;
—পদ্মদীঘির মাঝে,
ঋতু শেষের শেষ অবদান হ'বে,
দুল্‌ছিল সে সঙ্গহীনতায়।
কালো নীলায়
আকাশ তখন ছিল অপরূপ :
ছিল সেথা আলোর ভাটার চাঁদ।
রহস্যময় শুক্র তারায় লিখন
অপরূপের বুকে,
মুখে গালে চোখে।
কেশর-রাঙা ফুলের অনুরূপ,
অদেখা সব জলের আঘাত এসে,
রাত বারোটা পবন-পরশ হানে।
বেরিয়েছিলেম আমি—
ইচ্ছে হ'ল একটু বসে পড়ি,
—একটু দেখি কুঁড়ি,
—কিশোর ভাবখানা ॥

*   *   *

পদ্মফুলের কুঁড়ি
সংশয়ারিত নীর আর নিখিল।
সংশয়ারিত পদ্মকুঁড়ি নয়ত ?
হ'বেও বা হয়ত'।
রাত বারোটা, রাজত্ব দিল তা'র—
রাত একটার হাতে
পদ্মকুঁড়ির সাথে।
চাঁদ হয়ত' ফুরিয়ে গেছে প্রায়।
প্রৌঢ়তায়,
যৌবন তা'র কবেই দেছে ডাক।
দীঘির তীর ঘেসে,
লম্বা ডগা ঘাসের আস্তরণ।
ঘুমায়নিকো তা'রা
তবু স্বপ্নভরা।
এলানো মোর আঁচলটুকু ঘেসে,
বুনো দু'টী ফুল,—
স্তব্ধ, নিথর প্রতীক্ষার দোল্,
আস্‌চে কখন কখন ?
পটভূমিতে রাত একটা রেখে
ভূমিকায় নীরবে পাঠ পড়ি
—পদ্মফুলের কুঁড়ি ॥

*   *   *

পদ্মফুলের কুঁড়ি,
জাগবে এখন মননের দেশ থেকে ;
পূবের দিক যে এল ফর্সা হয়ে।
কী কথা যায় কয়ে
শীতল বাতাস আমার কাণে কাণে।
শেফালীফুল জাগরণের শেষে,—
সব-হারানোর দেশে,
ঝরবে এবার মুকুল, সমীর-দোলে।
ঊষার ললাট তলে,
সোণার সূরয হাস্‌বে এবার মিঠি।
পদ্মকুঁড়ি খুল্‌বে এবার দিঠি—
পক্কতপা ঊষার অনুরূপ
কাছে যখন আস্‌ল অপরূপ ॥

করছেন। ও দেশে টর থিয়েটার—আমাদের দেশেও 'টর' সিস্টেমের আমদানি বোধ হয় হতে চললো।

রূপবাণী

শনিবার ২১শে নভেম্বর হতে যে সপ্তাহ সুরু হল সেই দিন হতেই নিউ থিয়েটার্সের 'বিজয়া' ষষ্ঠ সপ্তাহে পদার্পণ করল। বিজয়ার মত চিত্র যে এইরূপ জনপ্রিয় হবে এতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই—শরৎচন্দ্রের অনুকরণীয় কাহিনী নিউ থিয়েটার্সের শিল্পিবৃন্দের হাতে পড়ে এক অনুপম বাণী চিত্ররূপ পরিগ্রহ করেছে। বিজয়া চিত্রে রাস বিহারী ভূমিকায় শ্রীযুত অমর মল্লিক বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। সাইগলের বাংলা ভাটিয়ালী গান বিজয়া চিত্রের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী চন্দ্রাবতী তাঁর পূর্ব্বেকার সমস্ত অভিনয়কে একবারে ম্লান করে দিয়েছেন। আমরা আশা করি কলেজগুলি খুলবার পর বিজয়ার খ্যাতি আরও বৃদ্ধি হবে।

সোনার সংসার

ইষ্ট ইণ্ডিয়ার 'সোনার সংসার' উত্তরায় যে পরিমাণে দর্শক আকর্ষণ করছে, তাতে ছবিখানির পরমায়ু অত্যধিক। স্যর শঙ্কর নাথের ন্যায় অমায়িক ভদ্রলোকের আমন্ত্রণ কেউই উপেক্ষা করতে পারছেন না। এই অগণিত জনপ্রবাহের গতি পুরামাত্রাই চলতে থাকবে অনেকদিন ধরে। এইবার স্কুল কলেজ খুলে যাচ্ছে—যে সব ছাত্র ছুটীতে বাহিরে গিয়েছিলেন, তারাও এই জনপ্রবাহে গা ভাসিয়ে দেবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। সর্ব্বত্রই সোনার সংসারের জয় জয়কার। নিউথিয়েটার্সের 'চণ্ডীদাস', দেবদাস, ভাগ্যচক্রের পর এরূপ সাফল্যমণ্ডিত ছবি আমরা আর দেখিনি।

রঙ্গজগৎ

গত মঙ্গলবার থেকে নাট্যনিকেতনে রবীন্দ্র নাথের 'গোরা' মহলায় পড়েছে। শ্রীযুত নরেশচন্দ্র মিত্র 'গোরা'র নাট্যরূপ দিয়েছেন। পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন সব এখনও শেষ হয়নি। কর্ত্তৃপক্ষ গোরা চরিত্রের জন্ত একজন অভিনেতা খুঁজছেন।

'রঙমহলে'র সম্বন্ধে আর কোন খোঁজ খবর জানি না। শীঘ্রই এর দোর খুলবে এমন কোন সম্ভাবনা দেখছি না।

এই শনিবারে মিনার্ভার আসরে 'পরশুরাম' সশরীরে দেখা দেবেন।

নব নাট্যমন্দিরে শরৎচন্দ্রের অচলা কি শিশির প্রতিভায় সচলা হয়ে উঠেছে? বোধ হয়—ওঠে নি।

শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার পূজা ও উৎসব

প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও বৈদ্যনাথধাম—কুণ্ডা রামময় আশ্রমে শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী মাতার ত্রিকালীন মহাপূজা ও উৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে একটী মেলা হইয়া থাকে ও বহু দেশ দেশান্তর হইতে লোক সমাগম হইয়া থাকে। মাতার পূজা ও উৎসবে ৪৫ দিন দরিদ্রনারায়ণের সেবা বিশেষভাবে হইয়া থাকে। এ বৎসরও ৭ই অগ্রহায়ণ, ২৩শে নবেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত বিশেষভাবে উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হইতেছে চণ্ডীর গান, ভাগবৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা, নাম সংকীর্ত্তন, যাত্রা-বায়স্কোপ, বাজী, ম্যাজিক, সাঁওতালী নাচ, লাঠিখেলা, ঝুমুর নাচ ইত্যাদি যেমন হয় তাহারও ত্রুটী হইবেনা। দেওঘর ষ্টেশন হইতে সাধারণের সুবিধার জন্ত মটর লরীর,ব্যবস্থা হইতেছে। ইতিমধ্যেই বহুলোক সমাগম হইতেছে। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর এই মাতৃপূজা ও সাধু উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়।

এস এস বঁধু এস

দীর্ঘ পাঁচ মাস পরে দিগ্বিজয় করিয়া আমাদের রোহিণী কান্ত ঘরে ফিরিয়াছেন। এস এস বঁধু এস আধ আঁচরে বস, নয়ন ভরিয়া তোমায় হেরি! তোমার বিরহে কত মুঞ্জরিত তরু বিশীর্ণ হইয়াছিল, কত যৌবন জলতরঙ্গে ভাঁটার টান ধরিয়াছিল কত বেণু বীণার ঝঙ্কার নীরব হইয়াছিল, আসমানে কত নব তারা দীপ্তি হারা হইয়া মৌন বেদনায় গুমরাইয়া মরিতে ছিল। আজ তোমার শুভাগমনে তাহাদের মরা গাঙে আবার যৌবন জলতরঙ্গের উচ্ছাস উঠিয়াছে। কত রাসমণি আজ রসরাজকে পাইয়া রসের সাগরে হাবু ডুবু খাইতেছে।

* * *

শতেক বরষ পরে
বঁধুয়া মিলালো ঘরে
তুষারের অন্তরে উল্লাস!

কিন্তু একি কথা শুনি আজি বৈষ্ণবীর মুখে! নলিনী সম্বর্দ্ধনার জন্য সে দিন হাওড়া ষ্টেশনে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বৈষ্ণবী প্রাণ বল্লভ তুষার বাবু কে তো কৈ দেখা গেল না? অবশ্য তুষার বাবু ছাড়া আরও যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের অনেকেরই নাম প্রকাশ পায় নাই। শুনা গেল কোন স্বনামধন্য মহারাজ সে দিন সশরীরে হাওড়া ষ্টেশনে নলিনী সম্বর্দ্ধনায় জন্য বাহু বাড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিবর্ত্তে উত্তরাধিকার সূত্রে মহারাজ কুমারের নাম প্রকাশ পাইয়াছে। ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? কিন্তু সে যাহা হউক, তুষার বাবুর অনুপস্থিতি যে আমাদের মনকে সংশয়াকুল করিয়া তুলিয়াছে। কৌতূহল চিত্ত বারংবার এই প্রশ্নই করিতেছে—

বল বল সখা কোন পরাণে, কেমন করে
ভুলিলে নলিনী মুখ ইন্দু!

কয়েক দিন পূর্ব্বে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পশ্চিমদিকস্থ একখানি সুরম্য কক্ষ হইতে শীতের মন্থর বাতাসে কাণে ভাসিয়া আসিতে ছিল—

আশে রেখেছিরে প্রাণ
সে কিরে আসিবে ফিরে
সুখ সাধ অবসাদ
ভাসিব কি আঁখিনীরে!

সে ফিরিয়াছে—সুতরাং বিরহী চিত্তকে আর আঁখিনীরে ভাসিতে হয় নাই—সে দিন হাওড়া ষ্টেশনে তিনি প্রেম নীরেই হাবু ডুবু খাইয়াছেন! দুর্ভাগ্যের বিষয় সে দিন ষ্টেশনে কোন ফটোগ্রাফার ছিল না, থাকিলে অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুদ্বয়ের সে অপূর্ব্ব যুগল-মিলনের ছবি তুলিয়া এ বাজারে বেশ দু'পয়সা কামাই করিতে পারিত। কংগ্রেসের নীতিবাগীশ অস্থায়ী সভাপতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় এ যুগল মিলনে কংগ্রেসের জাত যাইবে না ত?

* * *

কংগ্রেসী ভোট গাজনের মরসুমে নলিনীর শুভাগমনে অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছেন। শুনা গেল কোন মন্ত্রিবর না কি বলিয়াছেন, নলিনী বাবু যখন আসিয়াছেন তখন কংগ্রেসী ভোটের হাটে এক দমকা বাতাস বহিবেই। কর্পোরেশনে রুপী প্যাক্টের অন্যতম নায়ক স্বয়ং পার্লামেণ্টারী পতি যাঁহার প্রেম-পাশে আবদ্ধ তাহার আবার ভাবনা কি? তাই নলিনী মৈত্রী চালে কিস্তিমাতের জন্য কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াই শ্রীযুত সতীশ চৌধুরীর বিরুদ্ধে ময়মনসিংহের কোন বিশিষ্ট জমিদার নন্দনের জন্য তদ্বির আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন? কংগ্রেস সভাপতি শরৎ বাবুকে বলিতে ইচ্ছা হয়, মাঝি সামালরে তোর তরী। সাই বাছুরে ভাব থাকিলে বনে গিয়াও যে দুধ দিবে—শরৎ বাবু কি কি এখনও তাহা টের পান নাই?

কখনো কখনো অসম্ভবও সম্ভব হয়

অসম্ভব কি কখনো সম্ভব হতে পারে? বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, সে রকমই একটা ব্যাপার কিন্তু আমাদের দেশে কিছুকাল হোলো ঘটে গেছে—চায়ের জগতে। সে জগতে ভারতবর্ষ ছিল একেবারে নবাগত, আর সেই ভারতবর্ষই আজ সারা দুনিয়ার চায়ের ব্যবসায় একটা প্রধানতম স্থান দখল করে নিয়েছে। এটা কি কম অভাবনীয় ব্যাপার?

এর চাইতেও বড় অসম্ভব সম্ভব হতে চলেছে এবং তা দেখতে পাবেন সেদিন যখন ভারতের আপামর সাধারণ—বড়লোক গরীব, ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ সবাই তাদের এই নিজস্ব পানীয়ের গুণ

সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হয়ে উঠবে। সে দিনের আর বেশী দেরী নেই।

একবার ভেবে দেখুন, এক'শ বছর আগে যে গাছ ভারতের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে আপনা থেকে জন্মাতো, সেই গাছ থেকে আজ ভারতবর্ষ দ্রুতগতিতে পৃথিবীর চা সরবরাহের একটা প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদিও পৃথিবীর নানা জায়গাতে আজকাল চায়ের চাষ হচ্ছে, তবু এদেশের চা-ই জগতের সর্ব্বত্র আদর পায়, সব চেয়ে ভালো বলে', সুস্বাদু বলে'। আজ

পৃথিবীতে মোট যত পণ্যে কারবার চলছে, তার মধ্যে শতকরা এক ভাগই হচ্ছে ভারতীয় চায়ের ব্যবসা। এক বিলেতেই ভারতীয় চায়ের অর্দ্ধেকের বেশী নেয়।

জানেন কি, কি করে ক্ষেত থেকে চা বাজারে গিয়ে পৌঁছোয়? চা বাগানের ম্যানেজারেরা তাদের চা বাক্স-বন্দী করে ভারতবর্ষের বন্দরে বন্দরে এজেন্টদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। তারা, হয় সেগুলি লণ্ডনে বিক্রীর জন্য পাঠায়, নয়তো ভারতবর্ষেই বিক্রীর ব্যবস্থা করে। কলকাতায় নিলামে যত চা বিক্রী হয় তার অনেকটাই খরিদ্দারেরা বিদেশে রপ্তানি করে দেয়।

দেশের মধ্যে যে চা ব্যবহার হয়, সেটা সাধারণত কলকাতাতেই নিলামে বিক্রী হয়। সাধারণত এই নিলামের সময় হচ্ছে জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস। অবশ্য জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী আর জুন মাসেও যে কিছু কিছু নিলাম না হয়' তা নয়। দালালরা ক্যাটালগ ছাপিয়ে বিক্রীর সব বন্দোবস্ত করে। নিলামের আগে বিভিন্নরকম চায়ের নমুনা পাঠিয়ে খরিদ্দারদেরকে চা গুলোর গুণাগুণ জানিয়ে দেওয়া হয়। এক একটা দিনে নানা দামে ৪০,০০০ বাক্স চা পর্য্যন্ত বিক্রী হয়ে যায়।

চা পানোপযোগী করে' বিক্রী করতে হলে ওস্তাদের দিয়ে চা চাখানো এবং মেশানো দরকার। সাধারণের রুচি অনুযায়ীই চা মেশাতে হয়। এই চাখানো ও মেশানোর জন্যই মোটামুটী এক রকম চা প্রায় একই রকম দরে সর্ব্বসাধারণের পাবার সুবিধে হয়। চায়ের বিক্রীর সঙ্গে চা চাখা এবং মেশানো তাই অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

ভারতবর্ষেই চা উৎপন্ন হয়—অথচ এখানকার চেয়ে অন্য দেশে ভারতীয় চায়ের চাহিদা ঢের বেশী। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ থেকে ১৭৬,০০০,০০০ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানী হয়েছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রপ্তানী হয়েছিল ৩৭১,৫০০,০০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ মোট চায়ের বাণিজ্যের শতকরা ৪৩'২ ভাগ। ১৯৩২-৩৩এ এই রপ্তানী বেড়ে হয়েছিল ৩৮৫,৩৯৪,৮৯৭ পাউণ্ড। ভারতের চায়ের বাণিজ্য যে এত বেড়েছে তার একটা কারণ বিলেতে চা খাওয়ার অভ্যাস অত্যন্ত বেড়ে গেছে।

গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিলেতের যুক্তরাজ্যে চায়ের চাহিদা দ্বিগুণ বেড়েছে। ১৯১৯ সালে বিলেতের যুক্তরাজ্যে মোট ৩৪৪,০০০,০০০ পাউণ্ড চা আমদানী করেছিল, আর এর মধ্যে শতকরা ৬৬'৭ ভাগই ছিল ভারতের চা। হিসেব করে দেখা গেছে, সে দেশে প্রত্যেক লোক গড়ে বছরে প্রায় দশ পাউণ্ড করে চা খায়, যেখানে আমাদের দেশের লোক গড়ে বছরে চা খায় মাত্র তিন আউন্স।

যদি প্রত্যেক ভারতবাসী বছরে মাত্র এক পাউণ্ড করেও চা খেতো, তাহলে ভারত যতখানি চা উৎপন্ন করতে পারে, তার প্রায় সবটাই এ দেশের চাহিদা মেটাতেই শেষ হয়ে যেতো। এটুকু চা খাওয়া নিশ্চয়ই ভারতের পক্ষে অসাধ্য নয়।

এ দেশের লোক যে রকম ধীরে ধীরে চা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে, তাতে ভারতীয় চা ব্যবসায় একটা অসম্ভব ঘটনা শিগগিরই ঘটবে বলে আশা করা যায়।

প্রথম অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, এ দেশে চা উৎপাদন আশাতীত রকমে বেড়ে গিয়ে; আমাদের বিশ্বাস দ্বিতীয়টা ঘটাবে এ দেশের লোক নিজেরা চা পান করে'।

ভারতবর্ষে চায়ের এই জয়যাত্রা সম্মুখ পানে এগিয়েই চলেছে—দেখবেন আপনি যেন পিছিয়ে থাকবেন না।

আপনি ভারতীয় চা'র আদর করতে শিখলে দুদিনেই অসম্ভব সম্ভব হবে।

———

সচিত্র সাপ্তাহিক
দ্বিতীয় বর্ষ—৪৭শ সংখ্যা
শুক্রবার—১১ই অগ্রহায়ণ
১৩৪৩
২৭শে নভেম্বর—১৯৩৬

বাঙ্গলা কংগ্রেসে হিটলারিজম্

বাঙ্গলার কংগ্রেসী পাণ্ডারা আজও তাঁহাদের মনোনীত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ না করায় দেশের চারিদিকে একটা তীব্র অসন্তোষের ভাব আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। শুনা যাইতেছে যে, আগামী রবিবার বাঙ্গলার পার্লামেণ্টারী বোর্ডের এক বৈঠক হইবে এবং সেই বৈঠকেই প্রার্থী বাছাই পর্ব্ব সমাধা করা হইবে। প্রার্থী মনোনয়নের ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত হইয়াছিল সেই ডাক্তার বিধান চন্দ্র ও শরৎচন্দ্র প্রার্থী মনোনয়নে ঐক্যমত না হওয়াতেই না কি তালিকা প্রকাশে এরূপ অযথা বিলম্ব ঘটিতেছে। ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠন হইতে এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসী কর্ত্তাদের কার্য্য ধারার সহিত যাঁহারা পরিচিত আছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহাতে বিস্মিত হইবেন না।

সম্প্রতি বাঙ্গলার জাতীয় দলের পক্ষ হইতে ডাক্তার ইন্দ্র নারায়ণ সেন গুপ্ত কংগ্রেসী কর্ত্তাদিগের নিকট যে দাবী জানাইয়াছেন এবং তাহার পর গত মঙ্গলবার আনন্দ বাজার পত্রিকায় বৈধানিক দলের চক্রান্ত সম্বন্ধে যে উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, বহু ঢক্কা-নিনাদিত বাঙ্গলার কংগ্রেসী মিলন আন্তরিক মিলন হয় নাই, যাহা হইয়াছিল তাহা লোক দেখানো একটা জোড়া তালি দেওয়া মিলন মাত্র। সে মিলনের ভিত্তি পরস্পরের আন্তরিকতার উপর স্থাপিত হয় নাই—তাহার পশ্চাতে ছিল বৈধানিক দলের দলগত প্রাধান্য লাভ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির একটা দুরভিসন্ধি। বাঙ্গলার জাতীয় দল বিষ কুম্ভ পয়োমুখদিগের সে চক্রান্ত বুঝিতে না পারিয়া সরল বিশ্বাসেই মিলনের সর্ত্তে সম্মতি দিয়াছিলেন, কিন্তু বাটোয়ারা সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন ও প্রার্থী মনোনয়নের অধিকার লাভের পরে আজ তাঁহাদের দুরভিসন্ধি আত্মপ্রকাশ করিতেছে। যে সর্ত্তে জাতীয় দলের সহিত তাঁহারা মিলিত হইয়াছিলেন আজ অধিকার লাভের পর সে সর্ত্তে পদাঘাত করিয়া তাঁহারা নিজেদের দলগত প্রাধান্য পুষ্টি ও স্বার্থ সিদ্ধির দিকেই মনোনিবেশ করিয়াছেন; জাতীয় দলের প্রার্থী মনোনয়ন সম্পর্কিত দাবীগুলি আজ আর তাঁহারা মোটেই আমোল দিতে চাহিতেছেন না।

বৈধানিকদলের স্বেচ্ছাচারিতার ইহাই একমাত্র দৃষ্টান্ত নহে। প্রার্থী মনোনয়নে অধুনা ভারপ্রাপ্ত ডিক্টেটরদ্বয় শরৎচন্দ্র ও বিধান চন্দ্র প্রার্থী মনোনয়নে নিরপেক্ষতা, দূরদর্শিতা ও কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাদের পরস্পরের স্বার্থ-বুদ্ধিই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলার জেলা কমিটীগুলি স্ব স্ব কেন্দ্র হইতে যাঁহাদিগকে প্রার্থী মনোনীত করিয়াছিলেন ডিক্টেটরদ্বয় তাঁহাদের অধিকাংশকেই বাতিল করিয়া দিয়া সেই সব কেন্দ্র হইতে নিজেদের হাতের লোকদিগকে কংগ্রেসী মনোনয়নের জয় টীকা পরাইয়া দিতেছেন। তা ছাড়া কংগ্রেসের আদর্শনিষ্ঠ, জাতীয়তাবাদী এমন কি কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় অনেক যোগ্য প্রার্থী শুধু মাত্র চারি আনার কংগ্রেস সদস্য নহেন বলিয়া তাঁহাদের বিচারে অযোগ্য প্রমাণিত হইয়াছেন। কংগ্রেসের মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ না পাইলেও কর্ত্তাদের স্বৈরাচারিতা ও কংগ্রেসের আদর্শ ভ্রষ্টতার এই যে সব দৃষ্টান্ত প্রকাশ পাইয়াছে ইহার ফলে তাঁহাদের প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের শৈথিল্য ঘটাই স্বাভাবিক।

আগামী রবিবার বাঙ্গলার কংগ্রেসী ডিক্টেটরেরা চূড়ান্তভাবে প্রার্থী মনোনয়ন করিবার সময় যেন মনে রাখেন যে, তাঁহাদের এই প্রার্থী মনোনয়নের উপরেই কংগ্রেসের প্রকৃত মর্য্যাদা, বাঙ্গালী হিন্দুর হিন্দুত্ব এবং কংগ্রেসী মিলনের স্থায়ীত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। কংগ্রেসী জাতীয়দল বাঁটোয়ারা বর্জ্জনের জন্য তীব্র আন্দোলন ও প্রতিনিধি মনোনয়নে জাতীয় দলকে সমানাধিকার প্রদানের সর্ত্তেই সম্মিলিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলার কংগ্রেসী কর্ত্তারা বাঁটোয়ারা সম্পর্কিত তাঁহাদিগের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিলেও জাতীয়দল এই ভরসায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন যে, অন্ততঃ প্রার্থী মনোনয়নের বেলায় তাঁহাদের অধিকার অক্ষুন্ন রাখা হইবে। কিন্তু কংগ্রেসী ডিক্টেটরেরা তাহাতেও জাতীয় দলকে আমোল না দেওয়ায় তাঁহাদের মনে আজ এই সন্দেহই দৃঢ়তর হইয়াছে যে, বৈধানিক দল বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলেও কার্য্যতঃ কিছুই করিতে সম্মত নহেন বলিয়াই জাতীয় দলের প্রার্থীদিগকে অন্যায় ভাবে বিমুখ করিতেছেন।

সুতরাং ইহার পর প্রার্থী মনোনয়নে বৈধানিক দলের দল পুষ্ট হইলে তাঁহাদের পক্ষে শরৎচন্দ্রের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ বিরোধী প্রস্তাবের পরিবর্ত্তন করিয়া মন্ত্রীত্ব প্রার্থী হওয়াও অসম্ভব নহে। এমতাবস্থায় কংগ্রেসী ডিক্টেটরদ্বয়ের স্বৈরাচারিতায় জাতীয়দল তাঁহাদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার লাভের দাবীতে বঞ্চিত হইলে কংগ্রেসের মিলনের বেদী যে কোন মুহূর্ত্তে ধসিয়া পড়ার সম্ভাবনাই অধিক।

বাঙ্গলার এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে ডিক্টেটরদিগের পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতা, প্রাধান্যপ্রিয়তা এবং স্বৈরাচারিতার ফলে যদি সত্যই সে দুর্দ্দিন সমুপস্থিত হয় তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চিত জানিয়া রাখুন যে বাঙ্গলার জন সাধারণ কর্পোরেশনের কণ্ট্র্যাক্টর নায়কদিগকে ক্ষমা করিলেও জাতির ও কংগ্রেসের শত্রুদিগকে কখনই ক্ষমা করিবেন না।

চাতিম চাতিম

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

এত দিন যা' অস্পৃশ্য ও অখাদ্য ছিল সেই নয়া কনষ্টিটিউশনের মিনিষ্টারী গদীর জন্যে ও মেম্বারী চাপরাশের লোভে দেশ জুড়ে কংগ্রেসী অকংগ্রেসী মোচ্ছব সুরু হয়ে গেছে। ধনী দরিদ্র, জমিদার কিষাণ, মডারেট কমরেড, তর্কভূষণ আন্তাউল্লা কেউ আর এই ভোট রঙ্গে নামতে বাকি নেই। জাত ধর্ম্ম, জীবন যৌবন, কুলমান খুইয়ে সবাই পাছার কাপড় ফেলে লেগে পড়েছেন। নেতাদের দপ্তরে অন্দরে, চায়ের কাপে ডিনারে, কার-এ ড্রয়িংরুমে সর্ব্বত্রই চলেছে জোর ফুসফুসানী ঘুস্ ঘুসানী। তাঁদের ঘিরে উঠছে লুব্ধ ভাবকগণের মুগ্ধ ও উৎফুল্ল কূজন ও গুঞ্জন।

* * *

যে যাই বলুক, ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন তারিখে সেই যে পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফজলুল হক সাহেবের সগোত্রজ নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ব্রিটিশ সিংহের ভাগ্য পরীক্ষা হয়েছিল, তার পর থেকে ভারতের তথা বাংলার রাজনীতিক হাটে এত লোভনীয় গুড়ের নাগরীর উদয় আর কখনও হয় নাই। যার পুলিশ আদালত, আইন শৃঙ্খলা, জেল ট্যাকশাল সব গুলির চাবি কাঠি কিরণ শঙ্কর বকাউল্লা কোম্পানীর গেঁজের উঠবে, রাইটার্স বিল্ডিং-এ কালা ও ধলা আই সি এস্ সেক্রেটারীরা দপ্তর বগলে কালা মিনিষ্টারদের ঘরে ঘরে শশব্যস্তে ছুটাছুটি করবেন, এতখানি বিপর্য্যয় মানুষের ধাতে সহ্য হওয়া কঠিন। এমন অঘটন ঘটন অতি স্থির হিসাবী মস্তিষ্ককেও কিছু কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা না করে পারে না।

* * *

ষড় রিপুর তাড়নায় উদ্বাস্ত মানুষ এই দুর্লভ গুড়ের নাগরীর বাজারে বড়ই কাহিল হয়ে পড়বে তার চিহ্ন এখনই দেখা যাচ্ছে। কার মতি গতি মান সম্ভ্রম নেতৃত্বের প্রেষ্টিজ কখন কোন্ হাটে কাণা কড়ির দরে বিকিয়ে যাবে তার কোন ঠিকানাই নাই। প্রথমটা ছাড়া আর বাদ বাকি পঞ্চ রিপুই মানুষকে গরু তাড়ানো করে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে সোজা ঐ লালদীঘির পাড়ের লাল বাড়ীখানার দিকে। বড় বড় ভব্য সভ্য জাতীয় বিজাতীয় নেতারা সব মুক্তকচ্ছ অবস্থায় ছুটে চলবেন ঐ কনষ্টিটিউশনে মক্কার দিকে, কেউ বা হাস্য মুখে, কেউ বা আওয়ার বাহ্যিক প্রটেষ্ট এবং কেউ বা সরমে ও মরমে মরে। কার মান, কার পলিটিক্যাল ইজ্জৎ এবং প্রায় সবারই কঙ্করসিক সতীত্ব বেহস্ত হয়ে আর বাকি থাকবে না—এই জোটাজুটির হল্লোড়ে।

* * *

আমরা সবাই অল্প বিস্তর দ্রাক্ষালোভী শৃগাল। দুর্লভ টকফল আমাদের রসসিক্ত জিহ্বায় মধুর লাগতে খুব বেশী সময় লাগে না যদি উঁচু ডালটা কেউ টেনে নাগালের মধ্যে নামিয়ে দেয়। প্রকৃতিদত্ত এই ষড়রিপুর যা' কাপড়ে ঢেকে আমরা বাজারে ঘুরি সুস্থ দেহের ভান করে। লোভ, মোহ (এম্বিশন) মদ (প্রেষ্টিজ) ও মাৎসর্য্যের (পার্টি-জেলাসি) যা কিছু আমাদের কনষ্টিটিউশন্যাল হয়ে গেছে। স্বভাব যা' তাকে স্বীকার করাই সুবুদ্ধির লক্ষণ, দলের প্রেষ্টিজের ছেঁড়া কাঁথায় উদগ্র লোভ বা অসূয়া ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টাই এই

সহজাত বৃত্তিগুলিকে আরও বিকৃত করে তোলে, তাদের আরও হাস্যকর করে দেখায়। সহজ মানুষের আছে একটা স্বাভাবিক রূপ ও ডিগনিটি যা' দীঘল-ঘোমটা মানুষের নাই। পশুরা প্রকৃতির তাড়নায় রাগে, কামচঞ্চল হয়, হিংস্র হয়ে ওঠে, তা'তে কিন্তু তাদের এতখানি বীভৎস দেখায় না। কারণ তারা হচ্ছে প্রকৃতির সহজ শিশু!

* * *

এই কথাগুলি স্মরণ রেখে আমাদের কর্তারা যদি ভোটাঙ্গনে নামেন তা' হ'লে তাঁদের চরিত্রটা পাব্লিকের চোখে মসী-লিপ্ত হয় না। পরস্পরের দেহে পঙ্ক প্রলেপ দেবার প্রবৃত্তিও তা'হলে অতখানি স্পষ্ট ও ক্ষুরধার হয়ে ওঠে না। রাজ-নীতিতে ক্ষমতা চাই, পদমর্যাদা চাই, তক্মা চাই; দেশ শাসনে এগুলো অপরি-হার্য্য উপকরণ। রাজনীতি ত্যাগধর্ম নয়, ঋজু পথও নয়, ওটা একেবারেই কুটিল সর্পিল জোগ-মার্গ। ও-পথে দুর্ভোগ আছে বিস্তর, পদে পদে দল বে-দলের সঙ্গে চলতে হয় সহযোগ করে, শোঁকাশুঁকি করতে করতে। মেড়ার গোঁ কখনই কোন কালেই রাজনীতি নয়, পলিটিক্সে আন্ ডাইলিউটেড্ কিছুই নাই, সবই সময় ও সুবিধা মাফিক ভেজাল।

* * *

পুলপিটে হাততালির আসরে যা' চলে খাঁটি ও কার্য্যকরী পলিটিক্সে তা' অচল। ধুরন্ধর নেতারা ও কমরেড লিডাররা পাশ্চাত্যে ও পুলপিটে মিটিং-এ ধরেন উগ্র মূর্ত্তি আর অফিসের চেয়ারে ধরেন ডিপ্লো-ম্যাটিক রূপ। চাণক্য থেকে মেকিয়াভেলী অবধি, কানুর থেকে ম্যাকডোনাল্ড বল্-ডুইন্ অবধি, রুষের জার থেকে ষ্ট্যালি অবধি সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে 'এই কথা এই নীতি চলে আসছে। আজ ট্রট্স্কি হয়ে আছেন আন্কম্প্রোমাইজিং চামুণ্ডারূপ কারণ তিনি আউট-অব-অফিস্ প্রোপ্যা-গ্যাণ্ডিষ্ট, আর ষ্ট্যালিন দিন দিন ধরছেন সৌম্য শান্ত ভিজে বিড়ালরূপ, কারণ তাঁকে কোলাকুলি করতে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল রাজনীতির বৈঠকে। আইরিশ ফ্রিষ্টেটের দেশপতি ডি ভ্যালেরা আজ শনৈঃ শনৈঃ কাজ হাসিল করছেন নরম ও গরম পথে—বৈধ রাজনীতির প্যাচে।

* * *

গরম রাজনীতির দোহাই দিয়ে মানুষকে জাতে ঠেলতে ঠেলতে আমরা পলিটিক্সেও অস্পৃশ্যতার করেছি সৃষ্টি। দল বেদলের মাদল ঘাড়ে ছেলেরা হয়েছে ভাড়াটে। আর কদ্দুর?—

দলের চালায় আগুন দেবার
মন ভাঙ্গাবার সূর্পনখা,
পলিটিকাল মন্থরা গো
অষ্ট অঙ্গে ওম্ বাঁকা!

এই হয়েছে আমাদের গরম রাজনীতির বাংলা দেশ। এখন সোজা কথায় সহজ পথে পা বাড়াবার দিন এসেছে। মানুষের ওপর নেতার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে আমরা ঘরে বাইরে ছিলাম ভটস্থ!

কার বুকে ঐ দুখ্ ঝরে
কার মুখে ঐ সোহাগ বাণী
মোদের চক্ষু চড়ক গাছ
কাঁপছে বুকে মহা প্রাণী।

এখন দিন এসেছে বয়াতর হয়ে খাঁটি কাজের পলিটিশিয়ানের আবির্ভাবের। সে জন্য আমরা চিনি ও বুঝি, চিনি না বর্ণ চোরা আম। মতের লীডারের চেয়ে দর-কার হয়েছে পথের লীডারের, ব্যাজের মানুষের চেয়ে কাজের মানুষের। গদী গুলি বেছে বেছে দিতে হবে তাদেরই যাদের ছেঁড়া জেল প্রেষ্টিজের কাঁথা মুড়ি দিয়ে বড় হবার দরকার নেই।

———

সাহিত্যের হাটে

কবি সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় নাকি 'বৈতালিকে'র সঙ্গে "জুতো চোরের দেশে" গিয়াছিলেন। ফলে ভিড়িতে কিনা কে জানে। সেখানে—"জুতো চোরের দেশে কারো নাইরে পায়ে জুতো"। সুতরাং সাবিত্রীবাবুরই বা থাকিবে কেন? তাই তিনি সখেদে বলছেন :

পুওর-ফাণ্ডের সভায়,
ভাইরে হয়ে গেছি জবাই,
অর্থাৎ ঠিক নয়ক জবাই,
জেনে রাখুন সবাই,
এক পাট চটী হারিয়েছে তাই
বলছি করজোড়ে
জোড় মিলাতে দিয়ে যাও ভাই,
নতুবা এই মোড়ে
দাঁড়িয়ে থেকো দুপুর রাতে
চক্ষু করে বন্ধ
ধরা পড়ার আশঙ্কাতে
যদিই লাগে সন্দ!

চুরি করিয়া যে সরিয়া পড়িয়াছে, সে কি আবার বামাল ফিরাইয়া দিতে চায় নাকি? তবে আমরা একটা হদিস্ দিতে পারি। গত করপোরেশন নির্ব্বাচনের সময় ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল হবিবেশ পার্কের এক সভায় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া এক পাটি চটি হাতে করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দর্শকদের মধ্য হইতে উহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তিনি ঐ চটি পাটি পকেটে পুরিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত সভার সভাপতি ঐ চটি তাঁহার বলিয়া দাবী জানাইয়াছিলেন। তবে কি ঐ পাটি তাহার নহে? সাবিত্রীবাবু সন্ধান লউন।

* * *

'কেশরী' নামক দৈনিক সংবাদপত্রে 'ছায়া ও কায়া' শীর্ষক চিত্র ও রঙ্গজগতের সমালোচনা স্তম্ভে নিম্নলিখিত মন্তব্যটুকু প্রকাশিত হইয়াছে :—

ভাবতে ভাবতে সামনের জানালা দিয়ে দৃষ্টি পড়তেই প্রথমেই চোখে পড়লো রাসবিহারী এভিনিউএর বেশ বড় চওড়া রাস্তা। পথের দিকে চেয়ে চেয়ে এই চিন্তাই মনে স্বভাবতঃই চাড়া দিয়ে উঠলো যে, আজ যদি কলকাতায় ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের অস্তিত্ব না থাকতো তা'হলে ত আমাদের প্রাণ সেই সরু সরু গলি ও চারিদিকে বাড়ীর ভিড়ের ভিতর থেকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। খারাপ ছোট রাস্তাগুলিও বড় করে এবং মাঝে মাঝে কিছু বাড়ী সব ভেঙ্গে যেখান থেকে ভাল ভাল রাস্তা বের করে আজ ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট কলিকাতাবাসীদের কত উপকারই না করছে। তাদের অস্তিত্ব আছে বলেই ত আজ আমাদের এই সহরের উন্নতির এত প্রচেষ্টা।

(—'কেশরী'—৫ই অগ্রহায়ণ, ১০পৃঃ)

এইরূপ মৌলিক গবেষণা ব্যতীত "সংবাদপত্রে যুগান্তর" আনা কিরূপে সম্ভবপর হয়? ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ফাঁকি দিয়া বিনা পয়সায় বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া লইল না ত?

ভোটের গাজন

ধাঁ গুড়গুড় উঠলো বেজে
ইলেকসনের ঢাক
ডাক ডাকধিন দেশোদ্ধারের
কেয়া মজার ডাক্।

অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গলাতেও ভোট গাজনের ঢাক বাজিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সন্ন্যাসীরা প্রাণ খুলিয়া নাচের আসরে নামিতে পারিতেছেন না। কংগ্রেসের মনোনয়ন তালিকা প্রকাশে গয়ংগচ্ছ নীতিই ইহার প্রধান কারণ। স্বয়ং কংগ্রেসী পাণ্ডারাও কয়েকদিন ভোট মঙ্গল গাহিবার জন্য গোষ্ঠ লীলায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু তারপর বোধ হয় বেগতিক দেখিয়া আপাততঃ রণে ভঙ্গ দিয়াছেন।

× ×

বাঙ্গলার কংগ্রেসী মনোনয়ন তালিকা যে শীঘ্র বাহিরের আলোক দেখিতে পাইবে সে সম্ভাবনাই বা কোথায়? মনোনয়নের বিসমোল্লাতেই বিধানাশ্রিত কিরণ ও নলিনাক্ষ সান্যাল এই দুইজনকে লইয়া দুই পক্ষিতে দ্বন্দ্ব লাগিয়া গিয়াছে। বেগতিক দেখিয়া নলিনাক্ষবাবু নাকি হুমকি দেখাইয়াছেন যে, শরৎবাবু তাঁহারা ভাইয়ের মন রাখিতে গিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে তিনি কংগ্রেসী কর্তাদের জন্য ডিসিপ্লিনারী একসানের দরখাস্ত দিবেন। সুতরাং ঘরোয়া দ্বন্দটা ক্রমেই বেশ জমিয়া উঠিতেছে। তদুপরি শরৎবাবু এখন লাহোরে পাড়ি দিয়াছেন। এ অবস্থায় বাঙ্গলায় কংগ্রেসী মনোনয়ন তালিকা দর্শনের আশায় বলিতে হয়—

আর কত কাল থাকবো বসে
নয়ন খুলে বঁধু আমার!

× ×

বাঙ্গলার কংগ্রেসী মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ না পাইলেও পার্লামেন্টারী কমিটীর জাল ছিঁড়িয়া দু'একটা ছিটকাইয়া বাহির হইয়াছে। ভাতের হাঁড়ির একটা ভাত টিপিলেই হাঁড়ির ভাত হইয়াছে কিনা যেমন বোঝা যায় তেমনি এই দু'একটা মনোনয়নেই দেশের কংগ্রেসী পাণ্ডাদের রুচি বিকারের পরিচয় পাইয়া দেশবাসী তাজ্জব বনিয়া গিয়াছে। যে নলিনাক্ষ সান্যাল বিগত কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে প্রকাশ্য সভায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন এবং খেলাপীর পৃষ্ঠা আজও যাঁহার কীর্ত্তিকলাপের সাক্ষ্য দিতেছে, সেই নলিনাক্ষ সান্যালকে শ্রীযুত নরেন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে কংগ্রেস মনোনীত করিলেন কোন নীতির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য? এরূপ ব্যক্তি যদি কংগ্রেসে স্থান পায় তাহা হইলে কংগ্রেসের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়িবে কি?

× ×

তারপর বাঙ্গলা কংগ্রেসের চাণক্যপ্রতিম মন্ত্রীবর কিরণশঙ্করের মনোনয়নও উল্লেখযোগ্য। যে ঢাকা নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে তিনি মনোনয়ন প্রার্থী হইয়াছেন, সেই ঢাকা জেলা কমিটী ও বার এসোসিয়েশন কিরণবাবুর মনোনয়নের বিপক্ষে। এমতাবস্থায় মনোনয়ন কর্ত্তা বিধান ও শরৎবাবু কি কিরণশঙ্করকে বহাল রাখিয়া জেলা কমিটীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন? কিরণশঙ্করের আশা ভঙ্গ করা বিধানচন্দ্রের পক্ষে অবশ্যই সম্ভব নহে, কিন্তু শরৎবাবুরও কি তাই? এবং যদি তাহাই হয় তবে বাঙ্গলা কংগ্রেসের এই ...

মেথরামির জন্ত অন্ত কোন নৈবেদ্যের ব্যবস্থা করাই যুক্তিযুক্ত নহে কি ?

× ×

এতদ্ব্যতীত কংগ্রেস শ্রীযুত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রকেও মনোনয়নের তিলক পরাইয়া দিয়াছেন। সত্যেন্দ্রচন্দ্রের নাম শুনিলেই ভারতচন্দ্রের সেই ছত্রটী মনে পড়ে—

কোন্ গুণ নাই তার
কপালে আগুন।

বাঙলার কংগ্রেসী পাণ্ডাদের নিকট কোন গুণে উমাকান্ত উপাস্যদেবতা বলিয়া বিবেচিত হইলেন তাহা তো আমরা ভাবিয়া পাই না। কংগ্রেসী পাণ্ডাদের স্মরণ আছে কিনা জানি না, তবে দেশবাসী আজও ইহা বিস্মৃত হয় নাই যে, কংগ্রেসের নির্দ্দেশে পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যগণ যখন পরিষদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখন এই কংগ্রেসী সদস্য সত্যেন্দ্রচন্দ্রই কি সে নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া পরিষদের শোভা-বর্দ্ধন করেন নাই ? তা ছাড়া যিনি সধবা বন্ধু পত্নীর সিঁথিতে ভবল সিঁদুর পরাইয়া দিয়া চারিত্রিক নিষ্ঠা অটুট রাখিয়াছেন, মাতৃ পূজার অঙ্গনে তেমন ব্যক্তি স্থান পাইলে অঙ্গন অপবিত্র হইবে কি না, সভাপতি শরৎচন্দ্রকে তাহাও জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়।

× ×

কীর্ত্তিমান নলিনীরঞ্জন নির্ব্বাচনী মরশুমে শুভাগমন করিয়াই বিভীষণী লীলা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছেন, শরৎচন্দ্রকে দক্ষিণ কলিকাতা হইতে বিনা বাধায় কিছুতেই নির্ব্বাচিত হইতে দেওয়া হইবেনা। তিনি পণ করিয়াছেন—

হয় কিবা যায় অরি
পার যে কৌশলে।

শুনা গেল এজন্ত তিনি আলিপুর হইতে ভবানীপুর পর্য্যন্ত তোলপাড় করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারায় অবশেষে অধমতারণ শ্রীহরিদাসের শরণ লইয়াছেন। তাহার পরেই সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, শ্রীহরিদাস দক্ষিণ কলিকাতা হইতে শরৎবাবুকে সম্মুখ সমরে ভেটিবেন। নলিনীর দৌলতে শরৎবাবু এতদিনে একজন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পাইলেন বলিতে হইবে। পার্লামেণ্টারী পতি ডাক্তার বিধানচন্দ্র তাঁহার বন্ধুবরের এই গুপ্তলীলার কোন সংবাদ রাখেন কি ?

× ×

তবে শ্রীহরিদাস যে এবার শরৎবাবুকে অনায়াসেই নির্ব্বাচন সমরে কুপোকাৎ করিতে পারিবেন তাহার আভাষ ইতিমধ্যেই পাওয়া যাইতেছে। শ্রীহরিদাস কলিকাতার ৭টী মহিলার সমর্থন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। দ্বাপরে সপ্তরথীতে ঘেরিয়া যখন অভিমন্যুর ন্যায় বীরকেশরীকে নিধন করিয়াছিল তখন এই প্রচণ্ড প্রগতির যুগে সপ্তনারীর ব্যূহে পড়িয়া শরৎবাবুকে যে শ্রীহরিদাসের নিকট পরাজয় মানিতে হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে ? তবে স্বাক্ষরকারিণীদের মধ্যে তুলসীমঞ্জরী দাসী, শ্রীমতী বীণা বিশ্বাস প্রভৃতির নাম দেখা গেল না কেন ? নলিনী যাহার পৃষ্ঠপোষক তাঁহার পক্ষে নারীবাহিনীর যে অভাব ঘটিবে না ইহা নিশ্চিত। সুতরাং আমরা সময় থাকিতে শরৎবাবুকে হুসিয়ার হইতে অনুরোধ করি।

———

শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার বসু

প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব মিঃ এন, কে, বসু ওরফে শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার বসু এবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলীপালী অঞ্চল হইতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্ঘের সভাপতি এবং গত কাউন্সিলে বিরোধীদলের নেতা হিসাবে যে দক্ষতা ও বাগ্মীতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এহেন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কংগ্রেস নাকি দাঁড় করাইতেছেন ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালকে। ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালের নাম খেয়ালী মামলার দৌলতে অনেকেই জানেন। মন্ত্রী স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়ের বাড়ীতে ইহার যাতায়াত আছে। একদিন মন্ত্রীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময় ইহার শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণের পরিচয় পাইয়াছিলেন কবিরাজ অনাথ নাথ রায়। ডাঃ সান্যাল যদি নির্ব্বাচিত হন, তাহা হইলে কি তিনি স্যর বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়কে কোন কোন কাজে সাহায্য করিবেন না? এই মন্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারেই? আমরা এই সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য জানিতে পারিলে সুখী হইব।

সোমেন ঃ নীলা
লীনা ঃ সুসীম

(গল্প)

শ্রীরামেন্দ্র কুমার দেশমুখ্য

চাঁদের আলোয় পৃথিবী……উন্মুখ হয়ে গ্রহণ করে নীরব ভালবাসা। নেই কোন অভিযোগ, অভিমান তার দয়িতের বিরুদ্ধে। নববধূর মত রহস্যময়, কুণ্ঠামধুর সে। দিনের আলো ওর নগ্ন সত্যকে প্রকাশ করে। ফুরিয়ে যায় তার সমস্ত মাধুর্য্য। তাই সে পারেনা ভালবাসতে সূর্য্যকে। বিদ্রোহ প্রকাশ পায় ওর কণ্ঠে। অভাব, অনুযোগে নিজেই হয়ে উঠে তিক্ত।

সোমেন আর নীলা……অন্তরের নীরব অনুরাগে সোমেনের নিকট নীলা, মহিমময়ী। নারীত্বের বিকাশ ওর কাছে প্রিয়াত্বেই। সোমেনের নীলা বসন্তের মত রহস্যমধুর। সুসীমের কাছে এলেই নীলা হয়ে ওঠে তিক্ত। সুসীম পারেনা নীলাকে প্রিয়া বলে গ্রহণ কর্ত্তে। নীলা, প্রিয়া নয় ওর নিকট। ঝাঁঝালো মেয়ে, রুক্ষ নারী, মূর্ত্ত বাস্তবিকা সে।

নীলাকে পায় ওরা সাগরপারে। রাত্রির সুর যখন হয়ে উঠেছিল গম্ভীর, সেই নীরব সুরের ছন্দায়িত মুহূর্ত্তে সোমেন আর সুসীম গিয়েছিলো বালুবেলায় বেড়াতে। সেদিন আকাশে চাঁদ ছিলনা। তবু তারার আলোকে পৃথিবীর বুকে পথ চিনে ওরা যেতে পেরেছিল সাগরতীরে। সুমুখে ছিল মৃত্যুর আলোড়ন। সবচেয়ে বীভৎস রূপ হয়ত এটা। মৃত্যুর রূপ যেখানে শ্বেত, সেখানে মৃত্যুকে বলা যেতে পারে অরূপ। কালো রূপে মৃত্যু, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সংশয় আর ঘন রহস্যময়। ওরা দাঁড়িয়ে শেষে বসে পড়েছিল। নৈশ ভোজন তা'দের শেষ হয়ে গেছে।…… সাগরের তরঙ্গ-ফেনোচ্ছ্বাস বাস্তবের চোখে হয়ত' ধরা পড়ছিল না, তবুও ধ্বনিত হ'চ্ছিল ওদের কাণে ওর ঝিমিয়ে পড়া সুর। মহাকবি সে;—ভাবত্রয়ের সংস্থার করে সে যে মহাকাব্যকে লিখেছে গানে, তাতে দিয়েছে সুর, ছুঁয়ে যাবে যা' অনাদি অতীত থেকে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের সীমারেখা পর্য্যন্ত।

পেছনে এসে দাঁড়ায় নীলা। সে তখনও অজ্ঞাত ওদের কাছে। একা সে। চমকে ওঠার ভয় নেই বন্ধু। সত্যি এ হয়েছিল। নীলা দাঁড়ালে কিছুক্ষণ, তারপর একসময় একটু পরে বল্লে,—তাহ'লে এত রাত্তিরেও এখানে লোক আসে? বেণুবনে বাতাসের মত করে ওর কথা সুরের তরঙ্গ তুল্লে। সোমেনের নিকট ভাষা দুর্ব্বোধ্য হলেও শুনেছে সে কিছু—ফিরে চাইলে। সুসীম শোনেনি কিছুই। কিশোরীর করাঙ্গুলি চাপে বীণায় যে রাত্রির সুর ফুটে উঠেছে, তা'র মধ্যেই সে লীন হয়ে গেছে তখন।

সোমেন চেয়ে চেয়ে সুসীমকে ঠেলা দিলে। সুসীম দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ফিরে চাইলে।

দেখেছিস্?

বন্ধুর চোখের দিকে চেয়েই সুসীম বল্লে, কই—না।

ঐ, বল্লে সোমেন দেখিয়ে দেয়।

সুসীম ফিরে চায়।

নীলার হাসি ভেতর থেকে ঊর্দ্ধমুখী হয়ে অধরোষ্ঠের তোরণে এসে ঠেকে গেছে। সুসীমের ফিরে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে হেসে ওঠে।

ভয় নেই, অশরীরী নই, আমি মানবীই।

* * *

ওরা ফিরে এল ক'লকাতায়, যেখানকার নর এবং নারী তা'রা।

টেবিল ঝাড়তে ঝাড়তে নীলা বলে: সোমেন, চলো, একটু বেড়িয়ে আসি। সোমেন জিজ্ঞেস করে, ট্যাক্সি ডাক্‌বো?

বসো, মাকে তো বলে যেতে হ'বে। ওঁর অনুমতিরও তো দরকার আছে।

সোমেন হেসে বলে সে আমি নিশ্চিন্ত, অনুমতি পাবেই,—তাহ'লে নিয়ে আসি। সোমেন বেরিয়ে যেতে যেতে ফিরে আসে। সঙ্গে আসে সুসীম।

কোথায় যাবে নীলা?

কোথাও নয়—নীলা উত্তর দেয়।

কোথাও নয়, এর মানে? ট্যাক্সি তো ডাকা হচ্ছে।

ও, আমি যাবো বলে নয় সুসীমবাবু। মা আর লীনা যাবে বেড়াতে।

ও—তাই, বলে সুসীম শ্লেষের কণ্ঠে।

ট্যাক্সির কথা চাপা পড়ে যায় অতীত আর বর্ত্তমানের ছিটকে পড়া কথার মধ্যে। ভুলে যায় ওরা মনের আবিলতা। হাসে সুসীম আর সোমেন। নীলা হয়ত' কিছু হাসে, কিছুনা।

—নীলার মা আর বাবা দু'জনেই মেয়ের সম্বন্ধে উদাসীন। বয়স হয়েছে ওর নিজের ভালমন্দ বোঝে নিশ্চয়ই। ছোট বোন লীনা, হয়ত অত বাড়াবাড়ি দেখতে পারে না। কিন্তু বলতে পারেনা কিছু। এটুকু অন্ততঃ বোঝে—দিদির পছন্দ কাকে দিয়ে। তারিফ কর্ত্তে পারেনা কিছু। সুসীমের কাছে ওর কোমল মনে খুবই দরদ লাগে—আহা!

সোমেনের সঙ্গে নীলা গেল সেদিন বেড়াতে। যেতে যেতে যাওয়া হল শেষে বোটানিক্যাল গার্ডেনে। নীলা বসে পড়ে। সোমেনকেও বসতে হয়। তরল জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভরে আসে। রাত বেড়ে চলে। গুঞ্জন আসে ক্ষীণ হয়ে।

সোমেনের হাতটা তুলে নীলা ডাকে, সোমেন।

অদৃশ্য জগৎ থেকে সোমেন ফিরে আসে নীলার কাছে, কিছু বল্‌ছ নীলা?

সুসীমকে ফিরাই কেমন করে, অথচ গ্রহণও যে কর্ত্তে পার্চ্ছিনে।

সোমেন এর উত্তর দিতে গিয়ে থেমে যায়। সুসীম যে ওর আলো আঁধারের বন্ধু। আলো আঁধারের মত অবিচ্ছিন্ন। কি উত্তর দেবে সে? আকাশের দিকে চোখ ফিরিয়ে সে নীরবেই বসে থাকে।

নীলাও চায়—আকাশের বুকে। বিবর্ণ, মৃত্যুপাণ্ডুর চাঁদ। মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে মৌন আবেদন জানায় নীলার কাছে—শেষ হয়ে যাও নিজের মাঝেই। পরের হাতে তুলে দিওনা নিজেকে। চাঁদ ডুবিয়ে যায়। তারার রহস্যলিখন জল্‌জল্ করে ওঠে আকাশে।

পৃথিবীর বুক হয়ে আসে আরো নীরব। নীলা আর সোমেনের মাঝখানে দুস্তর চিন্তা-সমুদ্র তরঙ্গ তুলে আছড়ে পড়ে। রহস্যাদ্রিত হয়ে ওঠে পৃথিবী। ফুলের পাপড়ির আঘাতের মত বাতাসের স্পর্শ হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ-কোমল।

নীলা চম্‌কে ওঠে। এত রাত হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে ডাকে, সোমেন।

সোমেন ওঠে চম্‌কে। ফিরে যেতে চায় আবার মন অদৃশ্য জগতে, যেখানকার পরদেশী সে। কিন্তু পথ যে নেমে গেছে পাতালের দিকে, ওর ফিরে আসার একটু গোলক-চাপে।

কলেজের পথ ধরে সুসীমের সঙ্গে সোমেনের আলাপ জমে ওঠে নীলাকে নিয়ে। সোমেন বলে: মানে, বল্‌তে চাও, শীগগিরই নীলার বিয়ে হচ্ছে?

সুসীম বিদ্রূপের হাসি হাসে। নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, সো সরি আই এ্যাম (বড্ড দুঃখিত ভাই) আরো কিছু হয়ত বল্‌তে যাচ্ছিল। সোমেন থামিয়ে দেয়, জিজ্ঞেস করে, কেমন করে জান্‌লে? ওর চোখে মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা।

পাতলা করে বলে সুসীম, ওর মার কাছ থেকেই জেনেছি, কাল রাত্তিরে। তোমরা যখন বেড়াতে বেরিয়ে এসেছিলে সেই তখন।

সোমেন গম্ভীর হয়ে ওঠে। হারিয়ে যাচ্ছে তার শ্রেষ্ঠতম বস্তুটাই প্রতি মুহূর্ত্তে। নীলা আর ওর মধ্যে দুস্তর সাগর যেন বিস্তার রচনা করে চল্‌ছে। থাম্‌বে সাগর সত্যি, যেতে যেতে। সীমারেখাও টানা হ'বে। কিন্তু যদি সে সাগর পেরিয়ে গিয়ে, সীমারেখা টানার প্রয়োজন ফুরিয়ে দেয়, তবেই সে হ'বে নিখিলের চোখে একান্ত হীন চরিত্র। এই তো নির্মম পৃথিবী! সোমেন আর কথা বলেনা।

সন্ধ্যা মিলিয়ে যায় পৃথিবীর বুকে। প্রদোষে ধূসর পর্দাটুকু সরিয়ে নিয়ে যায় অদেখা নৃত্যচটুল স্বর্গ-বালিকা। অসম্পূর্ণ চাঁদ আর অগুন্তি তারার মুখে হাসির দ্যুতি ফুটে ওঠে।

সোমেন চলে নীলার কাছে। ওর অন্তর দোলে সাগর-দোলায়।

নীলা জিজ্ঞেস করে, সোমেন তোমায় অত শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন?

সোমেন হাসে—বিষাদের হাসি, বলে, শুকিয়ে যাচ্ছি নয়? আমি শুকিয়ে গেলে, তোমার কোনখানটায় আসে যাবে নীলা? বোটার দু'টি ফুলের মধ্যে যদি ঝরে যায় একটী নির্মম অভিশাপে, তা'হলেও জীবন্ত ফুলটীর কিছু আসে যায় না। ওর জীবন-বীণার যে কড়ির সুর বেজেছে যৌবনের, তা'তে আকস্মিক বিপর্য্যয় নামেনা। সুরের

বদির মূর্ছনার বহিঃ পথিকের মনে ভিড় জমাবার বাসনা জাগিয়ে দেয়।

নীলার কণ্ঠে সান্ত্বনার সুর বেজে ওঠে, বলে, কি হয়েছে তোমার সোমেন ? খুলে বলো সব কিছু। আমি তো ফুল নই যে বন্ধুর ব্যথার অংশ নিতে পার্কোনা। বলো সোমেন।

বুকের ভেতর যে বাণী ফুটবার বেদনা নিয়ে আকুলি-বিকুলি কর্চ্ছে, তা'কে সোমেন ছেড়ে দেয়, পৃথিবীর আলো-বাতাসে।

শুনলুম শীগগিরই তোমার নাকি বিয়ে হচ্ছে নীলা।

ওঃ দাঁড়াও, বলে ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে নীলা চট্ করে সরে পড়ে। একটু পরেই ফিরে এসে বলে, চলো। তারপরেই সোমেনের হাত ধরে নিয়ে যায়।

সোমেনের ব্যগ্র উৎকণ্ঠা ভাব। বলে, কোথায় চলেছ নীলা ?

নীলা উত্তর দেয়না এর। জিজ্ঞেস করে, হ্যা, তারপর কি হ'ল, সেই যে বলছিলে আমার বিয়ে—

হ্যাঁ, শুনলুম তোমার বিয়ে হচ্ছে ; এ সত্যি তা'হলে নীলা ?

নীলার মুখে চোখে একরাশ হাসি, বলে, তা'হলে মনে করো বিয়ে হয়ে গেছে।

এর মানে ?

কিছু নয়, বলে নীলা।

সোমেন নীলার হাতটা চেপে ধরে বলে, ভাল করে বুঝিয়ে বলো নীলা।

নীলা হাত ছাড়িয়ে নেয় আস্তে, বলে, জানোইতো আমাদের প্রেম সে যে ভীরু এখনও,—আলোর মাঝে চোখ খোলার সাহস পায়নি। হ্যা, তারপর বিয়ে,—বিয়ে আমি কা'কেও কর্বোনা বন্ধু। ও শুধু মায় খেয়ালে প্রোপোজাল চলছে। আমাকে কি তুমি ওদের কথায় চলার পাত্রী মনে করো। বিয়ে আমি কর্বোনা কোনদিন। আমাদের প্রেম থাক অন্তরের ভেতর চিরন্তন হয়ে। বিয়ে সে তো বাইরের বস্তু। আর বিয়ে,—বিয়ে যদি করি কখনো, তবে, তোমাকেই সব চেয়ে বেশী ভোট দেব, তা' সত্যি।

নীলার হাত চেপে ধরে সোমেন বলে, সত্যি নীলা ?

অত উচ্ছ্বসিত হয়ো না বন্ধু, বলে নীলা।

* * *

সুসীমকে উদ্দেশ করে লীনা বলে, দিদি বাড়ীর ভেতরেই, ডেকে দেব ?

সুসীম হাসে, বলে, থাক্ তার চেয়ে এসেছি যখন, তখন তোমার সঙ্গেই কিছু কথা কয়ে যাই, কি বলো ?

লীনা বলে, সময় আমার বড্ড কম। আচ্ছা বেশ বসছি। বলুন শীগগির করে যা বল্বার। কথা বল্তে বল্তে হেসে ওঠে সে।

সুসীম চেয়ারটা টান দিয়ে টেবিলের ধারে বসে। লীনা বসে একটু দূরে।

সুসীম বলে, একটা গল্প বলি শোনো।

লীনা সম্মতি জানায়।

সুসীম বলে, দুটো ছেলে খুব আড়া-আড়ি, কাজের দিক চেয়ে মনের দিকে বেশী। ওদের আড়াআড়ির উৎস হ'ল একটা মেয়ে। ক্লিওপেট্রার মত সুন্দরী সে। মেয়েটার ভালবাসা একমুখী। যে বেচারা ভালবাসা পেলনা, ওর মধ্যে যে সাহারা বিরাজ কর্চ্ছে, সে তো বুঝতেই পাচ্ছ। অভিশপ্ত বেচারা ত্রুটী করেনি, সাধ্যমত ওর মন ভুলিয়ে চলায়। তবুও হল তার অনুরাগ ব্যর্থ। কেন সে নিজেই জানে না। তবুও সে আবার প্রেমার্ঘ জানাতে চায়। নিজেও বুঝে পায়নি কেন চায় ? কিন্তু আগেই তো বলেছি ক্লিওপেট্রার রূপে মরেছে লীলার দর্শ্যতও, আর সে তো তুচ্ছ।—ওর আছে আর একটী ছোট বোন সুন্দরী সে বড়টার অনুরূপ। দু'জনকেই পাওয়া যায় দুজনের মধ্যে, চেহারায়, অবিশ্যি মনে নয়। অভিশপ্ত তরুণ বেচারা আশা করে, বড় বোনকে না পেলেও সে বাঁচতে পারে, যদি ছোটবোন সহানুভূতি দেখায়। নাহলে জানোইতো অন্যথায় ছেলেটা মর্বে। আচ্ছা এখন বল দেখিনি—ছোট বোনটার কর্ত্তব্য কি ? এটাও ঠিক যে ছোট বোন মনোগ্রাফি জানে বলে ছেলেটী জেনেছে এবং তাই টেলিগ্রাফি না করে প্রবন্ধটাই পাঠিয়ে দিয়েছে।

লীনা চট করে বলে বুদ্ধিমতীর মত : ছোট বোনটার উচিত অভিশপ্ত বেচারাকে বিয়ে করা খুব শীগগির করে।

সুসীম উঠে দাঁড়ায়, বলে : চল্লুম লীনা, সময় বড় কম, মনে রেখো কথাগুলো।

সুসীমের সঙ্গে সোমেনের দেখা কলেজে যাবার পথে। সুসীম বলে : হ্যালো সোমেন, এবার কিন্তু সত্যিই নীলার বিয়ে হচ্ছে।

সোমেন বিদ্রূপ করে বলে : তোমার কাছে আগেই খবর এসেছে, নয় বন্ধু ?

সুসীম বলে : বেশ, আগে থেকে বন্দোবস্ত না করলে, শেষে অনুতাপ কর্তে হবে ভাই।

সোমেন বিশ্বাস করে না, অথচ কিছু কিছু কর্তে যেন কে বাধ্য করে তাকে। কলেজের শেষের দুটো ক্লাস ফেলেই সে চলে আসে নীলার বাড়ীতে। জীবনের দুর্গ থেকে উত্তর সুতো চলেছে বিশৃঙ্খলভাবে।

সে নৃত্যের মায়া এসে ছোঁয়া দিয়েছে সোমেনের বুকে। চূর্ণ চিন্তায় তারও আজ মেতেছে বিশৃঙ্খল নৃত্য।

লীনা স্কুল থেকে ফিরে এসেছে মাত্র। সোমেনকে দেখেই বলে: সুসংবাদ, সোমেনবাবু।

সোমেন উদ্বেগে শুধায়: কি লীনা?

লীনা খানিকটা হেসে বলে: শীগগিরই দিদির বিয়ে হচ্ছে।

কবে?

শীগগিরই।

তোমার দিদি কোথায়? সোমেনের স্বর ভেঙে আসছিল।

বাড়ীতে নেই, কোথায় গেছেন জানি না। তবে হাঁ, যতদূর সম্ভব মিঃ মিটারের সঙ্গে বেড়াতে গেছেন।

কি নাম বলে, মিঃ মিটার? তিনি তোমার দিদির কে হন?

আই সি, বলে লীনা, দিদির যে ভাবী বর তিনি।

সোমেন ভাবতে পারে না আর কিছু। সুনির্মম, দুঃসহ এ আঘাত। সে ফিরে চলে স্খলিত পদে। কোথায় যাবে জানে না সে।

সুসীম পেছন থেকে ডাকে। সে চমকে ফিরে চায়। কোথায় এসে পড়েছে সে।

এদিকে এলি কেমন করে সোমেন?

সোমেন উত্তর দিতে গিয়ে অনেক পেছিয়ে পড়ে। মনে করে উঠতে পারে না সব কিছু।

হারে, বিয়ের খবর নিয়েছিস্ নীলার?

হঁ্যা, এবার মনে পড়েছে, আস্তে আস্তে সব কিছু সোমেনের। ধীরে সে বলে: সত্যি ভাই শেষ পর্য্যন্তও নীলা আমার এমন বিশ্বাসঘাতকতা করলে।

সুসীম চমকে ওঠে। এ রকম উত্তরের জন্য সে তো প্রস্তুত ছিল না মোটেই।

সোমেন জানায়: চলুম ভাই দেশে। পড়া আমার শেষ হয়ে গেছে। কালই যাব চলে। নীলাকে আমার শুভেচ্ছা জানাস।

সুসীম কিছু বলার আগে সোমেন ফিরে চলে।

নানান কাজ এবং নানান চিন্তার তাড়নায় সুসীম সকালের দিকে সময় করে উঠতে পারে না। দুপুর গড়িয়ে আসতেই চলে নীলার কাছে। নীল মলাটের কি একটা ইংলিস বই পড়ছিল নীলা। মুখে তার অনুপম হাসি। সুসীম দেখেই বলে ওঠে,—দেখছেন সুসীমবাবু, প্রেমিক আর প্রেমিকার শেষ পর্য্যন্ত মিলনই হ'ল। প্রথম দিকে অবিশ্যি খুবই ঝড় উঠেছিল, কিন্তু সে সব তারা সহ্য করেছে তাদের প্রেমকে অমর রেখে। পরিণাম হ'ল তাদের মিলন, যা বিরহের সংঘাত সহ্য করে হয়ে উঠল প্রোজ্জ্বল।

কিন্তু নীলা, শেষ পর্য্যন্ত হ'ল না। গেছেন চলে গেল। নীলার মুখে মিঃ মিত্রের খবর পেয়ে সে বেচারা আশা ভঙ্গে রেগে চলে গেছে। ফিরবেনা সে আর। তোমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেছে। আচ্ছা নীলা, তাকে কেন এমন নিরাশায় ব্যথাহত করলে।

থামুন সুসীমবাবু, আর বলতে হবে না।

এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ। তারপরই ঝড়ের বেগে নীলা ভেতরের দিকে চলে যায়। সুসীমও হয় ত পথে নেমে যায়।

নীলা ওর ঘরে চলে যায়। অসহ্য ক্রন্দনের বিপুল আবেগ ওর উপচে উঠছে। দোর জানলা বন্ধ করে তরল অন্ধকারকে সাদরে আহ্বান করে, অন্ধকারের ভেতর হারিয়ে ফেলতে চায় সত্তাকে। নীলা শুয়ে পড়ে বালিশের ওপর চোখ আর মুখ বুজে। অন্ধকারকে পেতে চায় আরো নিবিড় করে।......সে অন্ধকারে খুঁজে ফেরে পথ কোথায়, কিন্তু পায় না খুঁজে। ওর অন্তর হা হা করে ওঠে—কি কর্ব্ব আমি এখন?

...অন্ধকারে আচমকা থমকে দাঁড়ায় সে। ঐ তো পথ, না? বেশ আলো আছে ওখানে। পথ চিনে যাওয়া যাবে স্বচ্ছন্দে। ছোট পথ কিন্তু। দু'জনে এক সঙ্গে যাওয়া হয় ত সম্ভবপর নয়। নীলা ভাবে, যাবে একলাই। পাথেয় আছে তার বুক ভরা অজস্র শাশ্বত প্রেম। কোন ভয় কাছে ঘেসতে পার্ব্বে না। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে নীলা দাঁড়িয়ে সুসীমকে পেছনে করে। নীলা কি ভাবে, তারপরই পেছিয়ে যায় কিছু। সুসীমকে টেনে এনে নীলার পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়।

ও-পার ও এ-পার

শ্রীশক্তিকুমার রায় চৌধুরী

পথের সঞ্চয় বহি' জীবনের স্রোতটুকু চলিয়াছে খুঁজিতে আত্মারে;—
ছোট ছোট ঢেউগুলি পরস্পর কহে কথা শব্দহীন বেদনার সুরে;
শাল আর তালীকুঞ্জ, মর্ম্মরিত ঝাউঝাড় দেখা যায় দূর পরপারে,
নারিকেল-ছায়া-ঢাকা একখানি শান্ত নীড়, দেওদার বন আরো দূরে।
পাহাড়ের চূড়া, আর দিগন্তে সোনালী সন্ধ্যা—নভোতটে পথিক-বলাকা,—
দুলায়ে ধানের শীষ বহিছে অলস বায়ু,—জোনাকীরা নেভে আর জ্বলে;
জলহারা একখানি নীল মেঘ ভেসে যায়—ওড়ে তা'র অবসন্ন পাখা,
উপল-আকীর্ণ পথ যৌরীক্ষেত পাশে রেখে ঢেকে গেছে সবুজ আঁচলে।
খেয়াপার-হয়ে-যাওয়া যাত্রীর পায়ের চিহ্ন পড়িয়াছে পথের ধূলায়,
মাঝে মাঝে দেখা যায় দু'একটি অতি ছোট ভীরু ক্লান্ত জড়িত চরণ;—
মঞ্জীরের মৃদু রেশ, চুলের রেশমী গন্ধ ধীরে ধীরে বাতাসে মিলায়;
আলো ছায়া দুইজনে বসে আছে মুখোমুখী—স্নেহমুগ্ধ অস্ফুট গুঞ্জন।

ও-পারের নীলাকাশ ছুঁয়ে আছে এ-পারের কালিঢালা জীর্ণ শাড়ীখানি,
এ-পারের কালো জল চুমে' আসে ও-পারের ভাঙাচোরা পুরাতন পাড়;
গোধূলির ক্ষণেতে ও-পার ভরিয়া নেছে সঞ্চয়ের ডালা তার আনি,
এ-পারের ম্লান মুখে গুণ্ঠন টানিয়া দেছে একখানি ঘনিষ্ঠ আঁধার।
স্রোতে স্রোতে ভেসে আসা ও-পারের ফুল যদি স্মরণের রেণু ব'য়ে আনে
তাহারে আবার আমি ভাসায়ে দিব কি জলে চলে যেতে বিস্মৃতির পানে?

দেশান্তরের ভারতবাসী

[প্রবন্ধ]

মিঃ এইচ, এস, আই পোলক লণ্ডন-প্রবাসী ভারতবাসী-সমিতির সম্পাদক। তিনি 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রে দেশান্তরের ভারতবাসী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রকাশিত হইল।

লেখক বলিতেছেন, "দেশান্তরের ভারতবাসিগণ তাহাদের দুঃখ কষ্ট ও অসুবিধা সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন মুখ ফুটিয়া আলোচনা করিতেছে। তাহারা দুঃখ কষ্ট সম্বন্ধে এখন অধিকতর সজাগ হইয়াছে; বস্তুতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা যে তাহাদের অসুবিধা বর্দ্ধিত হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না। যখন জন-সমাজ বিশেষ বিশেষ কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারে, সেই সময় তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণের সূচনা হয়, হিতৈষী বন্ধু সংগ্রহেরও ব্যবস্থা হয়।

পূর্ব্বে যে সকল ভারতবাসী সাগর-পারে বাস করিত, তাহাদের অধিকাংশই চুক্তিবদ্ধ কুলী ছিল। তাহাদের কোন শৃঙ্খলা ছিল না, এবং তাহারা বুদ্ধিচালনা না করিয়াই কষ্ট সহ্য করিত। চুক্তি-বন্ধনের প্রথা রহিত হইবার পর অর্দ্ধ যুগ অতীত হইয়াছে। দেশান্তরের এই সকল ভারতবাসীর নূতন মনোভাব আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতেছে; সুতরাং এক সময় তাহারা যে অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থায় আর থাকিতে চাহিতেছে না।

পশ্চিম ভারত হইতে যে সকল বণিক-সম্প্রদায় দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের এবং মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় নেতার চেষ্টায় তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, যতদিন যেখানে চুক্তি প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত প্রবাসী ভারতবাসিগণকে তাহাদের সামাজিক অবস্থা যেরূপই হউক, তাহাদের মনিবগণের অর্থাগমের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া থাকিতেই হইত, এবং স্থানীয় জনসমাজ তাহাদিগকে সাধারণ কুলীগণের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া রাখিত। এই জন্য মিঃ গান্ধীকে ভারতবিদ্বেষী নেতৃবৃন্দ 'কুলী উকিল' নামে অভিহিত করিত। f: গোখলে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা পরিদর্শন উপলক্ষে গমন করিলে অবজ্ঞাভরে তাঁহাকে 'কুলী রাজা' বলা হইয়াছিল।

উক্ত চুক্তি প্রথাকে স্যার উইলিয়াম হাণ্টার অর্দ্ধ দাসত্ব প্রথা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, এই প্রথা এখন রহিত হইলেও ইহার কুফল এখনও ভারতীয় সম্প্রদায়ের ক্ষতি করিতেছে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় পুরুষ ও রমণীর সংখ্যা সমান না থাকায় যে সকল দূষিত নীতি, চুক্তিপ্রথা প্রবর্ত্তিত থাকা কালে প্রবলভাবে বর্ত্তমান ছিল, এখনও তাহা অন্তর্হিত হয় নাই।

কেপ অর্থাৎ অন্তরীপ প্রদেশে প্রথম হইতেই শ্বেতাঙ্গে ও কৃষ্ণাঙ্গে কোন ভেদ-জ্ঞান ছিল না; 'সুসভ্য মনুষ্য' হইলেই সে মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিত। অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটে ভারতবাসীর প্রবেশাধিকার নাই। ট্রান্সভালে ভারত-বাসীর বসতির জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। ইউনিয়নের অন্যান্য প্রদেশে এই প্রথা অবলম্বিত না হয়, এজন্য ভারতবাসী-গণকে দীর্ঘকাল যাবৎ সতর্কতাবলম্বন করিয়া থাকিতে হইয়াছে।

যদি ভূমিস্বত্ব সংক্রান্ত আইনের কথা বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীর অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দ হইয়াছে—ইহা স্বীকার করিতেই

হইয়ে। কেপ প্রদেশে ভোটপ্রদানের অধিকারে ভারতবাসীকে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

পূর্ব আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতবাসিগণের প্রতি শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের বিদ্বেষভাব পোষণ বিস্ময়কর বলিয়াই মনে হয়। ভারতবাসীগণ কখন এই অঞ্চলে চুক্তির সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া কুলীরূপে গমন করে নাই। বিশেষতঃ ভারতবাসিগণ যে সময় সেই অঞ্চলে গমন করিয়াছিল, তাহার বহুদিন পরে সেখানে য়ুরোপীয়গণের পদধূলি পড়িয়াছিল। সার জন কার্ক ১৯১১ খৃষ্টাব্দে স্যাণ্ডার্সন কমিটীতে সাক্ষ্য দিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, ভারতবাসিগণের সাহায্য না পাইলে আমরা বৃটিশগণ সেখানে স্থান পাইতাম না। ভারতবাসিগণের সহায়তায় এবং তাহাদিগের প্রভাবেই সেখানে বৃটিশ পতাকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ভারতবাসিগণ এইভাবে তাহাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য সাহায্য করিলেও কেনিয়াতে ভারতবাসিগণকে কৃষিকার্য্যের জন্য ভূমি ক্রয় করিতে বা তাহা অধিকার করিতে দেওয়া হয় নাই। অথচ যাহারা বৃটিশ নহে, এরূপ য়ুরোপীয় এবং আমেরিকানগণকে তাহা করিতে দেওয়া হয়। অধিকন্তু নানাপ্রকার ছলচাতুরির সাহায্যে ভারতবাসীগণের ব্যবসাবাণিজ্য আক্রমণ করা হয় ইহার ফলে উপনিবেশে এবং প্রোটেক্টরেটে ভারতবাসীর অবস্থা অধিকতর বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে।

জাঞ্জিবারে ভারতবাসিগণের প্রভাব প্রতিপত্তি যথেষ্টই আছে, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ-সম্প্রদায়ের লোভে এবং স্থানীয় শাসনপ্রথার প্রতিকূলতায় ভারতবাসিগণের দীর্ঘকালের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহার ফলে যে লবঙ্গের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য ভারতীয় বণিকগণ প্রচুর চেষ্টা করিয়াছেন, যে লবঙ্গের ব্যবসায়ের উন্নতিতে, রাজকোষও লাভবান হইয়াছে, শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের লোভে ও সরকারের বিরোধিতায় সেই ব্যবসায় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ফিজিদ্বীপেও য়ুরোপীয় ও ভারতবাসী উভয় সম্প্রদায়ই ভোটের অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছে।

ভারতবাসী তীব্রভাবে প্রতিবাদে অভ্যস্ত হইলেও তাহারা প্রতিবাদেই তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ করে এবং তাহাতেই তাহারা সন্তোষ লাভ করে। 'পূর্ণ স্বাধীনতা' ব্যতীত এই সকল অন্যায়ের প্রতিকারের আশা নাই; যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন অন্য সকল অন্যায়ের প্রতিকার চেষ্টা মুলতুবী থাকিবে এরূপ ধারণা অসঙ্গত। পূর্ব্বে 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র পরিবর্ত্তে 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন' বলা হইত। এই সকল যুক্তি ভিত্তিহীন। প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে সকল দেশ স্বাধীন, সেই সকল দেশের অধিবাসীবর্গও দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত ভারতবাসিগণের ন্যায় লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে। অতএব মতবাদ ও আড়ম্বরপূর্ণ বাক্যচ্ছটা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত অবস্থায় মনোনিবেশ করাই এখন ভারতবাসিগণের কর্ত্তব্য।
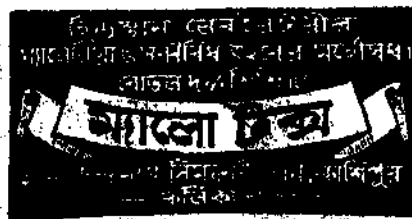
জীবন উৎসব শেষে

[গল্প]

শ্রীযামিনীভূষণ মিত্র

রূপা হেসে উঠলো, বল্লে—জানো সর্দ্দারজী আজ আবার আমার বিয়ে।..

* * *

বাইরে শুধু ভোরের হাওয়া। রূপা ডাকলে তার স্বামীকে—

ওগো ৫টায় ভোঁ বেজে গেল—এখনও শুয়ে রয়েছ।

হাঁ। এই যে উঠছি বলে রতন ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল কাঁথাটা সরিয়ে দিয়ে।

নরম শীতের একটু একটু হাওয়া দিচ্ছে—শুকতারাটা আকাশের কোলে হাসে।

ঘাট থেকে রতন ফিরে আসে—একটা পিঁড়ে নিয়ে দাওয়ায় বসে।

দে রূপা আমায় চারটী ভাত দে—

রূপা বাসি ফুলুরী দিয়ে তাকে এক কাঁসী ভাত দেয়।

কালের আঘাতে তাদের জীবন যাত্রা ঘুরে চলে।

কি রে রতনা হোর হ'ল কি একটু তাড়াতাড়ি নে ছ'টা বাজে যে—।

ভোরের পাখী গান গায়। রূপা দাঁড়িয়ে থাকে জানালার ফাঁকে চোখ দিয়ে। আঁচল দিয়ে চোখটা মুছে ফেলে—দীর্ঘনিঃশ্বাসটা চাপতে গিয়ে—গম্ভীর হ'য়ে বেরিয়ে যায়—প্রত্যেক ঘর থেকে ধোঁয়া ওঠে—রূপাও উনুনে আগুন দেয়। বাতাসটা ভারি হ'য়ে ওঠে ধোঁয়া আর শিশিরে।

* * *

দিন চলে যায়। সে দিন শনিবার।

ধূসর গোধূলির ম্লান আলো তখনও আকাশের গায়ে লেগে রয়েছে।

কি রে রতনা কাজ থেকে ঘরকে যাচ্ছিস্?

কে সর্দ্দারজী!

হ্যাঁ হ্যাঁ আমি—চমকে যাচ্ছিস্ যে বড়।

না না। রতন আর কিছু বল্তে পারে না—চোখ দু'টোও নামিয়ে নেয়।

বড্ড খেটেছিস না রে রতনা, খাবি একটু—

সর্দ্দার একটা বোতল দেখায়—

রতন যেন সাপ দেখেছে। দু পা পিছিয়ে যায়।

না সর্দ্দারজী তোমার পায়ে পড়ি—রূপা…ও আর বল্তে পারে না—

হাঃ হাঃ হাঃ—বোকা ছেলে এত খাটছিস, না খেলে চল্বে কি করে।

রতন বিস্মিত বিমূঢ়। কি যেন ও বল্তে চায়, পারে না—

রতন চলে—কিন্তু কোথায় চলেছে সে—মনে মনে সে খাঁতকে ওঠে।

আরে মরদ হ'য়ে জন্মেছিস্ ফুর্ত্তিই যদি না কর্বি—তবে আর কর্লি কি?

আরে দাঁড়িয়ে পড়লি কেন? রূপার জন্যে মন-কেমন কর্ছে? আরে এ রকম বয়সে সকলেই ও রকম করে থাকে—

নাঃ মরদ হ'য়ে তুই সামান্য পরিবারের জন্য কাঁদ্বি। আরে ছ্যাঃ—

রতনের পা দু'টো চল্তে চায় না—বুকটা ভারি হ'য়ে যায়—যেন পাথর এক টুক্রো—

সর্দ্দার তাকে নিয়ে যায় টান্তে টান্তে—শ্রমিকদের সান্ধ্য আড্ডা বাসরে।

সেটা যেমন কুৎসিত তেমনি জঘন্য…

নে নে খা এক ভাঁড়—ঃ ভারী যুধিষ্ঠির হ'য়েছিস—

অবশ্য হাতে সে দু'ভাঁড় মদ খায়—বেহুঁস হয়ে পড়ে—

সর্দ্দারের মুখে একটা ক্রূর হাসি ফুটে ওঠে—সে টলতে টলতে বেরিয়ে যায়—

দাওয়ায় শুধু প্রদীপ জ্বলে। একটা ১৮।১৯ বছরের মেয়ে আসে—

কি রে রূপা কি কচ্ছিস? এখনও রান্না চড়াস নি যে বড়।—ওঃ বাবা!

আবার কি ভাবছিস রে—

এখনও কি কলের ছুটী হয় নি? এখন ও এলোনা কেন ভাই।

(সুর করে) এখনও এলোনা কেন ভাই। মেয়ের ঢং…আজ শনিবার—সে খেয়াল আছে…

কি বললি? রূপা সাপের মত গর্জ্জন করে উঠলো—

না কিছু বলিনি, কোথায় গেছে হয় ত। আমি আসি ভাই। মেয়েটী চটের পর্দ্দা সরিয়ে মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। রূপার কান্না পাচ্ছিল। সত্যিই তাই যদি হয়, না—না তা কেন হ'তে যাবে—চুপি চুপি ও একবার ভগবানকে ডেকে নেয়। সে ডুবে যায় দিশাহীন চিন্তায়—প্রাঙ্গনের আলোটা কমে আসে।

রূপা কোথায় রে—সর্দ্দার একেবারে উঠানের মাঝখানে এসে ডাকে—

একি সর্দ্দারজী—! তুমি…তুমি এসেছ কেন, আমার স্বামী…

ভয়ে রূপার মাথাটা ঘুলিয়ে যায়।

হাঃ হাঃ হাঃ! তোর স্বামী আছে রে আছে…

অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা কালো ছায়া মূর্ত্তি আসে তার দিকে এগিয়ে। দু'টো হাত তার বাড়ান। রূপা ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে। চেঁচিয়ে ওঠে—উঃ!

সর্দ্দার তার মুখ চেপে ধরে। জোর করে ফুলের মত নিষ্পাপ ঠোঁট দুটীকে সে কলঙ্কিত করে দেয়।

রূপা সাপের মত ফোঁস করে ওঠে। দাওয়ার ওপর একটা ঘটা ছিল। মরিয়া হ'য়ে সর্দ্দারের মাথায় সে সেটা ছুড়ে দেয়। সর্দ্দার একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ করে ওঠে। কুকুরের মত ল্যাজ গুটিয়ে নিঃশব্দে পালিয়ে যায়—রূপা ভেঙে পড়ে অশ্রান্ত কান্নায়—ঠোঁট দুটো কামড়ে—রক্ত বের করে ফেলে।

* * *

শীতের দুপুর রাত। হিমেল হাওয়া বইছে। গাছের পাতা কাঁপছে সর সর কোরে।

রূপা, মাথাটা বুঝি কেটে গেল—ওরে··· জড়িত আর্ত্তনাদ শুনে রূপা চমকে যায় —চোখ ভরা শুধু জল—আস্তে আস্তে স্বামীকে তুলে নিয়ে গিয়ে সে বিছানায় শুইয়ে দেয়। চোখে তার ঘুম নেই। বুক জুড়ে অপমানের আগুন ধক্ ধক্ করে জ্বলছে—

টলতে টলতে রতন উঠে পড়ল।

সর্দ্দারের সঙ্গে হারামজাদী—

রূপা লুটিয়ে পড়'ল—ছিন্নলতার মত। আর্ত্তনাদ। বুক ফাটা আর্ত্তনাদ।

কালের কোলে দিন হারিয়ে যায়। রূপার একটী সুন্দর নিটোল ছেলে হয়েছে। দাওয়ায় বসে রূপা ছেলেকে দুধ খাওয়ায়।

'রূপা আমায় মাপ করেছিস ত'—সত্যি রূপা সর্দ্দারের জন্তে······

তুমি কেন সে দিন ওখানে গেছলে, আর যেও'না কোন দিন।

না রূপা—এই তোর গা ছুয়ে প্রতিজ্ঞা করছি—দু'জনের চোখে ঝর ঝর কোরে জল নেমে এলো—

কি নাম রাখলি ছেলের—

দুলাল—

বাঃ খাসা নাম।

তখন ভোর!—আমি যাই রূপা - সে চেঁ কে আহর করে কাজে বেরিয়ে যায়।······

ওগো বাপু শুনছ—পাশ থেকে কে ডাকে যেন।

রতন অবাক!

কি?—আঃ হাত ছেড়ে দাওনা।

ওরা কেউ আমার বাড়ীতে আসে না—আর একজন, তোমাদের দয়াতে—আমরা ত বাঁচি।

রতন সে দিন মুখ ফিরিয়ে চলে গেছল।

দিন আর চলে না—রূপা অবাক হ'য়ে স্বামীর পরিবর্ত্তনের কথা ভাবে। দুলাল খেতে পায় না। রতন আজ পাগল। রূপাকে সে দেখে না—দুলালকে ঘৃণা করে। রূপা ধার করে। ছেলেকে স্বামীকে খাওয়ায়। নিজের সব দিন জোটে না—

পাঁচ দিন তোকে ধার দিয়েছি রূপো! আর আমি দিতে পারবো না—তুই অন্ত জায়গায় দেখ গে যা বাপু।

আমি যে খেতে পাচ্ছিনা মুদী কাকা।

না না বাপু আমি পারবো না—রূপা ফিরে আসে, সে কাঁদে আর কাঁদে।

মা অনেক দিন থেকে দুধের দাম পায় নি, মনিব বড় বকাবকি করছিল—একটী সেই বস্তিরই ছেলে বলে—

আর দু'এক দিন দাও বাবা—তা না হলে দুলাল না খেতে পেয়ে মরে যাবে।

কি কর্ব্ব মা—আমার কোন হাত নেই। বস্তির ছেলেটী চলে যায়—নিরুপায় হ'য়ে।

পক্ষপাতী বিধাতা—নিষ্ঠুর বিধাতা—সে অভিশাপ দেয়।

মাস খানেক ধরে ভুগে একদিন রতন মারা গেল। রূপা তখন পাগল হয়ে গেছে। দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়েছে। কাবুলীওলা রোজ গালি দিয়ে চলে যায়।

রূপা ঘাটে যেতে পারে না—লোক-গুলো কুৎসিত মন্তব্য করে ওঠে। কেউ কেউ বলে ওঠে—দেহ আছে খাটিয়ে খানা বাপু—রূপা কাঁদে অনন্ত কান্না, বিরামহীন রূপের একটা অভিশাপ আছে সত্যি।

* * *

দুদিন অনাহারে। মাথাটা ঘুরছে—হালকা মাথাটা। বুকের ভিতর কম কন

করছে। দুঃখের দিনে সকলেই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। রূপা থাকতে পারে নি উন্মাদ রূপা—

সর্দ্দার আমার দেহ নাও, আমার সর্ব্বস্ব নাও, শুধু···তার বিনিময়ে আমার বাছার জন্যে একটু দুধ দাও।

হাঃ হাঃ হাঃ নিষ্ঠুর পশুর হাসি।

ওগো তোমার পায়ে পড়ি দাও—দাও···

হ্যা এসো আজ আমার বাড়ীতে সন্ধ্যায়, আজ আমি তোমার সঙ্গে প্রাণ খুলে আমোদ কর্ব্ব—

সর্দ্দার একটু হাসলে। তারপর ট্যাক থেকে তাকে চারটে টাকা বের কোরে দিলে।

সত্যি—

হ্যা সত্যি—

দুধ সে তাকে খাওয়াতে পারেনি নিজেই উন্মত্তের মত দুধটা খেয়ে ফেলেছিল। সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। পরিবর্ত্তন এসেছে রূপার দেহে মনে। সে দাওয়ায় বসেছিল।

এসো এসো সর্দ্দারজী তুমি নারীর দেহ নিয়ে খেলা করতে ভালবাস—এসো আজ আমরা আমোদ কর্ব্ব—বড় মজার আমোদ।

তুই কি পাগল হলি রূপা ?

—পাগল ? এ্যা (ভেবে) না না পাগল হইনি···(চুপে চুপে) হ্যা হ্যা হয়েছি ···হয়েছি।—হাঃ হাঃ হাঃ !

—আজ আমি নাচব সর্দ্দারজী কেমন।

নাচ সুরু হল এবং অনেকক্ষণ ধরে হল—রূপা লুটিয়ে পড়ল তার মৃত ছেলের পাশে—মুখ দিয়ে গাঁজা উঠছে—পাশে একটা কাগজে কালো মতন কি লেগে রয়েছে।

*   *   *

জানো সর্দ্দার আজ আমার আবার বিয়ে।

—————

জীবন বীমা

আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি স্যর মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায় আর্য্যস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেকটর হইয়াছেন। আমরা "আর্য্যস্থানের" সাফল্য কামনা করি।

বীমাতদন্ত কমিটী

দিল্লীতে বীমা তদন্ত কমিটীতে যোগদানান্তে মিঃ আই, বি, সেন ও মিঃ এস, সি রায় কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

ডাঃ এস, সি, রায়

ভারত ইনসিওরেন্সের স্থানীয় ডিরেকটর-ইন্-চার্জ্জ ডাঃ এস, সি, রায় এবার কাউন্সিল অব ষ্টেটের নির্ব্বাচনে পশ্চিম বঙ্গ অমুসলমান কেন্দ্র হইতে দাঁড়াইবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে সমর্থনও লাভ করিয়াছিলেন। এখন তিনি তাঁহার প্রার্থীত্ব প্রত্যাহার করিয়া সংবাদ পত্রে বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইতেছেন : "আমি প্রত্যেক স্থান হইতেই আশাতীত রূপে সমর্থন লাভ করিয়াছিলাম। আমার বন্ধু বান্ধবের এই আশ্বাস প্রদানের জন্য আমি তাঁহাদিগকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছি। গত ১লা অক্টোবর হইতে আমি দুইটী বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছি এবং আমি বিশ্বাস করি যে ২।১ বৎসরের মধ্যে আমার পক্ষে কোন সময়ের জন্যও কলিকাতা ত্যাগ অসম্ভব। সুতরাং আমার নির্ব্বাচক মণ্ডলীর সেবা আমি করিতে পারিব না। সাফল্য সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াও আমি আমার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিয়া লইলাম এবং পশ্চিম বঙ্গ অমুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্রের ভোট দাতাগণকে তাঁহাদের সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

———

মাণিকজোড় লরেল হার্ডি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষ্টান লরেল বলিতেছেন,—খবরের কাগজওয়ালার ভূমিকা পাইয়া অভিনয়ের রাত্রে নিজেই মেকআপ করিতে লাগিলাম। মুখে অজস্র লাইন টানিলাম—আয়নায় মুখের ছবি দেখিলাম—যেন জংশন ষ্টেশন্—আগাগোড়া রেল-লাইন কাটাকাটি করিয়া পড়িয়া আছে। আমার ভূমিকার কথা ছিল একটি—শুধু, বলিতে হইবে "এক্সট্রা স্পেশ্যাল"! এই কথাটা বারবার মনে মনে আওড়াইতেছিলাম! অবশেষে যথাকালে মঞ্চে আসিয়া দেখা দিলাম। আমার মুখ দেখিয়া দর্শকের দলে হাসির সাগর বহিয়া গেল। সে হাসির শব্দে আমি ভড়কাইলাম। কথা বলিবার সময় জিভটাকে কে যেন ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে! একটা আওয়াজ বাহির হইল—সোডাওয়াটারের বোতল খুলিলে যেমন আওয়াজ হয়, অবিকল তেমন! দর্শকের দল হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল—আমার মুখে কথা ফুটিল না। সঙের মত সরিয়া আসিলাম। এ দৃশ্যে অবশ্য দর্শকের হাসিবার কথা নয়—কিন্তু আমার চেহারা আর ভঙ্গী ভাঁড়ের মত দাঁড়াইতে তাদের হাসির অমন বন্যা বহিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষের কাছে তিরস্কার লাভ করিলাম। সকলে বলিল আমার জন্ত বইয়ের একটা ভাল দৃশ্য "জবাই" হইয়া গেল!

ইহার পর দ্বিতীয়বার 'চান্স' পাইলাম, লিউ কাশলের টাউন থিয়েটারে। সেখানে ভূমিকা পাইলাম—আস্তাবলের ঘেসেড়া। দৃশ্যটা খুব জমাট এবং গম্ভীর। অর্থাৎ নাটকের যে ভিলেন, সে আসিয়াছে, নিঃশব্দে আস্তাবল হইতে ঘোড়া চুরি করিবার জন্ত। আমি আছি আস্তাবলে প্রহরায়। আস্তাবলের দ্বারে চাবি-আঁটা, চাবি আমার কাছে। ভিলেন আসিয়া আমাকে দেখিয়া চাবি চাহিবে, আমি তাকে চাবি দিব না! ক্লাইমাক্স ঘটিবে তখন আমি বলিব—আস্তাবলে প্রবেশ বন্ধ—চাবি আমার কাছে এবং সেজন্য নিরাশ হইয়া সে চলিয়া যাইবে।

অভিনয়কালে সে আসিয়াছে আমি চাবি দিব না এবং চাবি দিব না বলিয়া চাবিটা শূন্যে দুলাইতেছি—দুলাইতে দুলাইতে আমার ঘর্ম্মাক্ত আঙ্গুল ফস্কাইয়া চাবিটা গিয়া পড়িল ভিলেন সাজা অভিনেতার সামনে, আমি শিহরিয়া উঠিলাম। যিনি ভিলেন সাজিয়াছেন, তিনি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক—শেষে চাবি কুড়াইয়া লইয়া আমার হাতে তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া মঞ্চ মধ্যে চলিয়া গেলেন। দর্শকের দলে হাসির বোমা ফাটিল। জমাট দৃশ্য একেবারে প্রহসনে দাঁড়াইল। এমন সাংঘাতিক ভুলে থিয়েটারে চাকরি রাখা যায় না—আমারও চাকরি গেল।

ও দিকে বাবার ব্যবসায়ের অবস্থা খারাপ হইতেছিল—এক একটি করিয়া থিয়েটারগুলি তিনি বেচিতেছিলেন, শেষে তাঁর রহিল শুধু একটি থিয়েটার। গ্লাসগো সহরে মেট্রোপোল। সেটা চলিতেছিল—এক রকমে।

এমন সময়ে আসিলেন অর্জ্জ ব্র্যাক নামে একজন প্রযোজক, তিনি এ থিয়েটার ভাড়া লইলেন। তিনি মঞ্চাভিনয় করিবেন না, তিনি ভাড়া লইলেন সিনেমার ছবি দেখাইবার উদ্দেশ্যে। লণ্ডনে তখন বায়োস্কোপ খুলিয়া হুলস্থূল বাধাইয়া দিয়াছে।

এ বাড়ীতে প্রথম ছবি দেখানোর দিন কি সে সমারোহ, কি প্রচণ্ড উত্তেজনা! দেখান হইতে লাগিল দু' তিন রীলের কমিক ছবি। থিয়েটার-গৃহ লোকে লোকারণ্য হইত।

তারপর আসিল কাউবয় সিরিজের ছবি। আমার মনে আছে, প্রথমে দেখান হয় গ্রেট ট্রেণ রবারি।

এ ছবির সাফল্য দেখিয়া পিতার হইল আনন্দ—আমার জাগিল ক্ষোভ। মঞ্চাভিনয়ে ছিল আমার ঝোঁক। সিনেমা আসিয়া থিয়েটারের উচ্ছেদ ঘটাইল, তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, আমাকে এক দিন এই সিনেমা লইয়া থাকিতে হইবে।

আমি পিতাকে বলিলাম, আমায় কিছু টাকা দিন, আমি প্রহসন অভিনয়ের ব্যবস্থা করিব। ছোটখাট মিউজিক হলগুলি ঘুরিয়া কয়েকটি গান শিখিয়াছিলাম। তাহাই সম্বল লইয়া গিয়া দেখা করিলাম পুরান প্যানপটিকন থিয়েটারের ম্যানেজার এ পিকার্ডের সঙ্গে। তিনি আমাকে চান্স দিলেন—প্রতি শুক্রবারের কৌতুক-নাট্যের অভিনয়ে আমাকে নিয়মিত ভাবে ভূমিকা দিবেন। এ কথা পাকা হইয়া গেল। এ কথা গৃহে কাহারও কাছে প্রকাশ করিলাম না। পিকার্ডের থিয়েটারে যোগ দিলাম।—বাবার সব চেয়ে দামী চেক পেন্টলেন নিঃশব্দে গ্রহণ করিয়া সেটাকে কাটকুট করিয়া নিজের ফিট করিয়া লইলাম—তাঁর ছাতার কাপড় খুলিয়া একটা বেতে জুড়িয়া সেটা করিলাম—আমার কৌতুক দণ্ড। আর লইলাম তাঁর শোলার হ্যাট—নাসাগ্র লালরঙে রাঙাইলাম—এমনিভাবে সাজসজ্জা করিয়া ষ্টেজে নামিলাম।

নামিবামাত্র ভয়ে যেন হিম নিস্পন্দ হইয়া গেলাম। সকলে চেহারা দেখিয়া হাসে—আমি গান গাহিব কি! ভয়ে গানের লাইন ভুলিয়া গেলাম এবং ছবিতে যেমন আমার ভ্রু-ভঙ্গী প্রভৃতি আপনারা দেখেন, তেমনই অপ্রতিভ ভাবের অভিনয় চলিতে লাগিল আমার নাসা চক্ষু ও ভ্রূর ভঙ্গিমায়। কোনমতে গানের ছচারিটি লাইন গাহিলাম—আমার ভঙ্গির সহিত মিশিয়া তাহা কি কৌতুকের সৃষ্টি করিল, দর্শকের দলই জানেন—তারা হাসি হাততালি বর্ষণে রীতিমত ঝড় বহাইয়া দিল।

এমনই করিয়া সে দিনকার মঞ্চ পর্ব চুকিল। নেপথ্য গৃহে আসিতে দেখি, সামনে বাবা। এত লোকের সামনে কি শাসন চলিবে—ভাবিয়া আমার ভয়ের সীমা নাই। বাবার পানে চাহিয়া রহিলাম আতঙ্কের দৃষ্টিতে—বাবা আমার পানে চাহিয়া রহিলেন—স্থির দৃষ্টি! অবশেষে বাবা বলিলেন—হু, মন্দ নয়, কিন্তু ও সাজসজ্জা তুই কোথায় পাইলি? ভয়ে ভয়ে আমাকে বলিতে হইল, তাঁর প্যান্ট, তাঁর ছাতা, তাঁরই টুপি। ভাবিয়াছিলাম, কঠোর ভর্ৎসনা বুঝি মিলিবে, কিন্তু মিলিল না—বাবা বলিলেন, একটু কিছু ষ্টিমুল্যাণ্ট খা। তোর জন্ম আশা হইল।

আমার মনে হইল, আমি যেন এক নিমিষে বালকত্বের গণ্ডী পার হইয়া কিশোর, তরুণ হইয়াছি। বাবা বলিলেন; কমেডি অভিনয় লইয়া সাধনা কর।

বাবার সে কথা শিরোধার্য্য করিয়া জীবনের পথ বাছিয়া লইলাম—তারপর সাধনার যে বিভিন্ন স্তর চলিল, সেই স্তরের কাহিনী বলিব, কিন্তু তার আগে অন্ত বন্ধু হার্ডির প্রথম জীবনের কথা পড়িয়া দেখুন।

অলিভার হার্ডির কথা

হার্ডি বলিতেছেন, আমার বাড়ী জর্জিয়ায়। বাড়ীতে পাঁচ ভাই—আমি সবার ছোট। দেড় বৎসর বয়সে (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে) আমি এমন মোটা হইলাম যে, সে চেহারা দেখিয়া তারিফ করিবার মত। আমার নাম ছিল বেব এবং এ নাম আমার আত্মীয় পরিচিত সমাজে আজও বহাল রহিয়া গিয়াছে, যদিও আজ আমার দেহের ওজন তিন মণ বারো সের।

আমার বাবা ছিলেন হোটেলের মালিক—গ্রামের পলিটিশিয়ান, আমার মাতামহ ছিলেন, স্কচ, মাতামহী আইরিশ। আমাদের বংশে থিয়েটারী আবহাওয়ার বাষ্পও ছিল না। আমি জানিতাম না, একদা আমি কৌতুকাভিনয়ে খ্যাতি জিনিব। বাবার সাধ ছিল, আমি ওকালতি করিব; এজন্ত জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তারপর বাবার মৃত্যু ঘটিল, আমাদের পাঁচ ভাইকে লইয়া মা হইলেন একান্ত অসহায়—নিরুপায়। আমার ওকালতির আশা গেল ঘুচিয়া। পড়ার পাঠ বন্ধ হইল।

কলেজে অধ্যয়নকালে গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতাম—আমার স্বর ছিল ভাল। আমি ভাবিতাম, এ কণ্ঠস্বরকে পুঁজি করিয়া জগতে কিছু করিতে পারিব না ?

ষোল বৎসর বয়সে আমি এক সৌখীন দলে মিশিয়া গান গাহিলাম—সে গান শুনিলেন এক জন নরওয়েজিয়ান প্রফেসর আস্তলক্ জাহেম। তিনি বলিলেন—আমার কাছে গান শেখো। এ দিকে তুমি খ্যাতিলাভ করিবে। এ আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করিলাম। প্রত্যহ তিন ঘণ্টা করিয়া তাঁর কাছে গান শিখিতাম। বেশ লাগিত।

তারপর পথে একদিন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি বলিলেন,—আমি সিনেমা খুলিয়া ব্যবসা করিতেছি, ছবি ব্যঞ্জিত করিতেছি মানুষের কণ্ঠ সঙ্গীত দিয়া। আমাদের গায়ক সহসা গিয়াছে পলাইয়া—তুমি আজিকার রাত্রির মত তার পরিবর্ত্তে আমার সিনেমায় গান গাহিবে ?

প্রচণ্ড লোভ—সত্যকার থিয়েটার, সত্যকার দর্শক, সজীব দর্শক এবং গান গাহিয়া টাকা পাইব। আমার ইচ্ছা, গান গাহিব। কিন্তু ভয় হইল, আমার প্রফেসর হয় তো এ ব্যবসায়ে অনুমতি দিবেন না। তার উপর গলা সেদিন ভাঙিয়াছিল—শিক্ষক আমায় বার বার সতর্ক করিতেন—আগে ভাল করিয়া গলা সাধ তার পর সাধারণের সামনে গাহিতে নামিবে। দর্শকদের সামনে গাহিতে গেলে গলা চড়াইতে হয়, এখনও তোমার গলা খুব চড়িবার মত শক্তিলাভ করে নাই।

[ক্রমশঃ]

তবু

শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ভাদুড়ী, কবিরত্ন, বি এ

বলিতে যা চাই আমি হয় না যে বলা !
যে ভাষা বেরিয়ে আসে ভাবের আবেশে
শব্দ-ভরা কিছু অর্থ প্রদানি' তা শেষে
প্রাণ-পানে চেয়ে থাকে নিতান্ত বিভলা।
পণ্ডিতের ব্যাকরণ—সুচতুর কলা—
টেনে ছিঁড়ে বিশ্লেষণে বিদগ্ধিয়া শেষে
কতমত মনোমত খুঁজে অর্থ ক্লেশে ;
ছিল এক ছল আর—বুদ্ধি দিয়ে ছলা !
মনের পরশ যদি নাহি পায় মনে
বিচারের তুলাদণ্ড দণ্ড মাত্র সার !
আবরণ নিয়ে দ্বন্দ্ব ফেলে দিয়ে ধনে,
লক্ষ যদি হৃদয়ের উন্মুক্ত আগার !
প্রাণের ফসল নিয়ে তবু সযতনে
দ্বারে দ্বারে ফিরি করি নাহি গ্রিত, হায়।

ছায়া ও কায়া

—নাইট বার্ড—

বড়দিনের মরশুম

বড়দিনের মরশুম ঘনিয়ে আসছে। ফিল্ম কোম্পানী এবং রঙ্গালয়গুলির কর্তৃপক্ষ এইবার উঠে পড়ে লেগেছেন। পুজোর মত বড়দিনের সময়ও কয়খানি নূতন বাংলা ছবি এবং নাটকের দেখা পাওয়া যাবে।

নিউ থিয়েটার্স

নীতিনবাবুর "দিদি" বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। ছবিখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই।

'ভাগ্যচক্রে' তাঁর কৃতিত্ব দেখে যাঁরা বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়েছিলেন, এবার তাঁরা তাঁর এই ছবি দেখে বলতে বাধ্য হবেন, হাঁ ছবি বটে!

নীতিনবাবুর 'দিদি'ই (পরে নাম বদল হবে) বোধ হয় বড়দিনের সময় মুক্ত হবে—কারণ 'মায়া' ছবি তৈরী থাকলেও এরা পর পর একই ডিরেক্টরের পরিচালিত এবং একই অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনীত ছবি দিতে চান না। চিত্র প্রিয়রাও 'মায়া'র বদলে নীতিন বাবুর ছবির মুক্তিই আগে চাইবেন—কারণ তাঁরা বহুদিন নীতিন বাবুর ছবি দেখেন নি।

দেবকীবাবুর ছবি সম্বন্ধে যুক্তি, পরামর্শ, আলোচনা প্রভৃতি চলেছে। শীঘ্রই তিনি কাজ আরম্ভ করতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে।

হেমচন্দ্রের 'অনাথ আশ্রমে'র কাজ এবার বেশ তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে।

পণ্ডিত মশাই

পপুলার পিকচার্সের তৃতীয় ছবি 'পণ্ডিত মশাই' ২৮শে নভেম্বর শ্রী চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিত মশাই' উপন্যাসের কাহিনী সবাই জানেন। এই মধুর কাহিনীটিকে যদি এরা সুষ্ঠুভাবে রূপ দিতে পেরে থাকেন, তাহলে ছবিখানি বেশ ক' হপ্তা শ্রীতে চলবে—নচেৎ চতুর্থ বা পঞ্চম সপ্তাহই শেষ সপ্তাহ ঘোষণা করতে হবে! শরৎচন্দ্রের 'বিশেষ পরিতৃপ্তি' লাভও ছবির আয় বাড়িয়ে দিতে পারবে না। পণ্ডিত মশাইয়ের ভূমিকালিপি এইরূপ হয়েছে:

বৃন্দাবন—রতীন বন্দ্যোঃ, কুঞ্জ—রবি রায়, ঘোষাল মশাই—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, তারিণী—যোগেশ চৌধুরী, গোপাল ডাক্তার—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, নিধু খুড়ো—প্রফুল্ল দাস, উদ্ধব—মণি চট্টোঃ, কেশব—নৃপেন চক্রবর্ত্তী, গোবর্দ্ধন—চৈতন রায়, বৈরাগীদ্বয়—ভবানী দাস ও গিরীন চক্রবর্ত্তী, চরণ—সাগরিকা, কুসুম—শান্তি গুপ্তা, বৃন্দাবনের মা—প্রভা, ব্রজেশ্বরী—রেণুকা ঘোষ, ঐ মা—রাজলক্ষ্মী, তারিণীর স্ত্রী—সুশীলা, বৃন্দাবনের পিসী—গিরিবালা, মনোরমা—উমাতারা, পাড়ার পিসী—প্রকাশমণি।

ছবিখানি কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিয়োতে গৃহীত হয়েছে। পরিচালনা করেছেন মন্ত্রশক্তি ও আবর্তনের পরিচালক—শ্রীসতু সেন।

লাকি শরৎ দা!

প্রকাশ, হীরেন বোস্ কিছুদিন আগে বোম্বে থেকে কলিকাতায় এসে মায়ার ফিল্মের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রের কয়েকখানা উপন্যাসের হিন্দী স্বত্ব ক্রয় করে গেছেন। তিনি শরৎচন্দ্রের 'বড় দিদি' 'চন্দ্র নাথ' 'বিজয়া' 'বামুনের মেয়ে'র হিন্দী চিত্রস্বত্ব সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। শুনলাম তিনি প্রত্যেকখানি উপন্যাসের হিন্দী চিত্রস্বত্ব চার হাজার টাকা করে একুনে ১৬ হাজার টাকায় কিনেছেন।

বঙ্গলক্ষ্মী টকিজ

বঙ্গলক্ষ্মী টকিজ শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পার্শ্বে যে বিরাট চিত্রগৃহ তুলছেন, তার নির্ম্মান কার্য্য প্রায় শেষ হয়ে এল। বোধ হয় বড়দিনের সময় এই চিত্রগৃহটীর উদ্বোধন হবে।

রামকান্ত

ওরিয়েণ্টাল কিনেটোন আর্টসের 'রামকান্ত' শেষ হয়ে গেছে—এবার তারা 'ডাক্তার ডাব' নামে একখানি প্রহসন তুলবেন। 'রামকান্ত' কোথায় মুক্তিলাভ করবে? কেউ বলছেন—রূপকথায়, কেউ বলেছেন শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পাশের নব নির্ম্মিত চিত্রগৃহে—আবার কেউ বলেছেন—টকি শো হাউসে। দেখা যাক্।

কালীফিল্মস্

এদের 'টকি অব টকিজ' শীঘ্রই শেষ হবে। ছবিখানি বড়দিনের সময় মুক্তি লাভ করবে কি না, তা কিন্তু জানা যায় নাই।

এদের হারানো মাণী বালাকে আবার ফিরে পেয়েছে। যে ভাবে বিজ্ঞাপনের চলাচলি দেখলাম, তাতে মনে হয়, ষ্টুডিয়োর সবাই মায় গাঙ্গুলী মশাই, জ্যোতিষ মুখুজ্যে পর্য্যন্ত বোধ হয় নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে ছিলেন।

সচিত্র সাপ্তাহিক
দ্বিতীয় বর্ষ—৪[illegible]শ সংখ্যা
শুক্রবার—১৮ই অগ্রহায়ণ
১৩৪৩
৪ঠা ডিসেম্বর—১৯৩৬

জাতির কর্ত্তব্য

বাঙ্গলা কংগ্রেসের প্রার্থী নির্ব্বাচন লইয়া আজ কংগ্রেসে পুনরায় দলাদলির যে বিষ-বাষ্প উত্থিত হইয়াছে, জাতির পক্ষে ইহা চরম দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ব্যক্তি ও দলগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দুর্ব্বার মোহ ও কংগ্রেসের আবরণে ভাবী শাসনতন্ত্রের আমোদে পদ ও মর্য্যাদা লাভের দুরভিসন্ধি প্রমত্ত হইয়া দেশের এই সঙ্কট সন্ধিক্ষণে যাহারা বর্ত্তমানের শোচনীয় পরিস্থিতি সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের স্বৈরাচারিতা, স্বার্থ সঙ্কীর্ণতা ও আদর্শ ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে জাতিকে আজ সঙ্ঘবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইতে হইবে।

জাতির সম্মুখে আজ সঙ্কট সন্ধিক্ষণ সমাগত। এ সঙ্কট নিত্য নৈমিত্তিকের দুঃখ দৈন্য অন্নাভাব, অর্থাভাব বা শিক্ষাভাব ও স্বাস্থ্যাভাবের সঙ্কট নহে, পরকীয় প্রলোভনের আকারে স্বার্থ সঙ্কীর্ণতার মায়া জাল ছড়াইয়া ভিক্ষান্নের ক্ষুদ কুঁড়া ও উদারতার নামে পরদত্তাভাব আরামে জাতির চিত্ত বৃত্তিকে অভিভূত ও ঐক্য ভ্রষ্ট করিবার সঙ্কট। এই পরকীয় প্রদত্ত পদ মান ও প্রতিষ্ঠার ঘৃণ্য লালসায় জাতি যখন আপনার স্বাধীন সত্ত্বাকে বিকাইয়া দেয় তখন বিলুপ্ত হয় জাতির ভবিষ্যতের আশা ভরসা, আদর্শ ও লক্ষ্য ভ্রষ্টতার গ্লানি জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়া ফেলে।

বাঙ্গলার রাজ নৈতিক দলাদলির ভিতর দিয়া বাংলা ও বাঙ্গালীর সম্মুখে যে কঠোর অগ্নি পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে, ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত বাংলাকে তাহাতে সগৌরবে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, উত্তীর্ণ হইতে হইবে কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা রাখিয়া—স্বার্থ সঙ্কীর্ণতা, দলগত প্রভাব পদ প্রতিষ্ঠা ও মর্য্যাদার ঘৃণ্য প্রলোভনকে দূরে পরিহার করিয়া। বাংলাকে আজ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একদিন এই বাংলাই সমগ্র ভারতে জাতীয়তার হোম হুতাশন প্রজ্বলিত করিয়াছিল—এই বাংলাই দেশ প্রেমের দীপশিখা জ্বালাইয়া সমগ্র ভারতকে স্বাধীনতার পথ প্রদর্শন করিয়াছিল। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনোদ্ভূত জাতীয়তার ভাব-গঙ্গা উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে এক দিন সমগ্র ভারতকে জাতীয়তার ভাব বন্যায় পরি প্লাবিত করিয়াছিল। দেশ প্রেম ও জাতীয় মর্য্যাদার সাধনা বাংলার বুকে এক বিশিষ্ট রূপ ধরিয়া সমগ্র ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা ও আদর্শের উপর নবীন আলোক সম্পাত করিয়াছিল। আজ ঘৃণ্য স্বার্থের মোহ ও পরকীয় প্রলোভনের মায়াজালে বাংলার সেই জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় সাধনার বৈশিষ্ট্যকে বিলুপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

বাঙ্গালী আজ কোন পথ ধরিবে! অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বাংলা যে সাধনা করিয়া আসিয়াছে, সে সাধনা হইতে আজ কি সে ভ্রষ্ট হইবে? আদর্শ ভ্রষ্টতার গ্লানিকে বহন করিয়া সে কি আপনার তপস্যাকে নিষ্ফল করিবে? গণ-তান্ত্রিকতার আবরণে যে স্বৈরাচারিতা আজ হীন স্বার্থের মুখোস পরিয়া আত্ম প্রকাশ করিয়াছে, ছিন্নমস্তার [illegible] জাতি কি সেই [illegible] আত্মকল্যাণকে বলি দিয়া আপনিই

চাতিম চাতিম

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ইলেকশনের বাজারে প্রাচ্য কলা-নৃত্য দিগ্‌দিকে সুরু হয়েছে। আমাদের দল-বেদলের জাতীয় বিজাতীয় নেতারা সব মাদল ঘাড়ে নাচছেন আর আপন ঢাকে আপনি কাঠি দিচ্ছেন। এঁকে বেঁকে হেলে দুলে বিলোল কটাক্ষ হাস্যে লাস্যে কখন থ্যামটার তালে, কখন গুরুসদয়ী ঢঙে আবার কখন তাণ্ডব হুঙ্কারে দাদারা সব দেশের লাগি নাচছেন। দেশপ্রেমের মহাভাবে বিভোর আত্মহারা হয়ে কখন যে কে কার কোলে ঢলে পড়েন, কখন শাম্ভিক ক্রোধের কটাক্ষে কার মদন কে ভস্ম করেন তার কোন ঠিকানাই নাই।

* * *

হে বঙ্গবাসী, ভারতবাসী ও জগজ্জন! তোমরা সকলে বিশ্বাস কর, এ প্রেমের দুধে এক ফোঁটাও স্বার্থের চোনা নাই; এ হচ্ছে একেবারে নেতার স্তন-ঝরা নিষ্কাম নির্লিপ্ত খাঁটি গা-দুগ্ধ দেশবাসীরূপ বৎসের বাৎসল্যে আপনি ঝরছে— একেবারে হস্ত দ্বারা স্পৃষ্ট নহে। এই দুগ্ধ পান করে হাড়ি বাগদী চাষা মজুরের দুঃখ ঘুচুক আর নাই ঘুচুক, দগ্ধ প্রাণ তাদের শীতল হবে এই ভেবে যে শরৎচন্দ্র মিত্র আর বদন বাগদান রায় তাদের দুঃখের ভাগিদার। দেশের আধি ব্যাধি ম্যালেরিয়া কচুরিপানা জমিদার মহাজন মশা মাছি সব পুটলি বেঁধে নিয়ে এরা ঢুকছেন নয়া কন্‌ষ্টিটিউ-শনের মন্দিমহলে। এরা দরিদ্রের বন্ধু অধমতারণ পতিত পাবন ইন্ পলিটিক্‌স্!

* * *

খদ্দরের ভদ্দর আচ্ছাদন তুলে ল্যাজ মলে তোমরা দেখে নিও এই পুষ্ট পয়স্বিনী-দের তেজ আর সামর্থ্য। এরা বৎসের কল্যাণে শুধু যে দুধ দেবেন হুড় হুড় করে তাই নয়, চাট মেরে হাট করবেন ফাঁক; এরা এ কথা একেবারেই পাবলিকলি বিস্মৃত হবেন যে, চাট মারলেই লাট এসে ছাঁদন দড়ির প্যাঁচে পা দুখানা দেবেন বেঁধে। দেশহিতের বুধী গাই এরা আজ ঊর্দ্ধপুচ্ছে হাম্বা রবে চলেছেন পথের ধূলি উড়িয়ে লালদিঘীর গোঠের পানে। সামনে বাজছে মোহময়ী কানুর বেণু, গো-কুলের প্রাণ উচাটন করে, গোপীর লাজ মান ঘুইয়ে। এই সর্ব্বনাশা বাঁশী বাজলে বুধী ও মঙ্গলার আর উপায় কি, শ্যামলী ধবলী পুচ্ছ তুলে উচ্চ ডাকে লালদিঘীর পানে ছুটবেই!

* * *

"সাপে বাঁদরে খেলা করে
লম্বা লম্বা সাপ রে।"

সাপুড়ের বাঁশীর এমনি মোহ যে, তিতা ত্যালাকুচাকে ফজলী আমের মত মিঠা করে—বাঁকাকে সুঠাম দেখায়, অ্যান-ট্যাটিস্‌ফ্যাক্টরীকে মুহূর্ত্তে স্যাটিস্‌ফ্যাক্টরী ও 'ওয়ার্থহোয়াইল' করে তোলে। টক দ্রাক্ষাফলের উচ্চ ডালটা টেনে নামিয়ে নাগালের মাঝে এনে দিবামাত্র পলিটি-কাল শৃগালের সব লম্ফঝম্প ঠাণ্ডা হয়ে যায়, সে পরমানন্দে আহারে মন দেয়। তখন চলে অন্য প্রকার লম্ফঝম্প 'টাগ অব ওয়ার', সেটা কে কোন লোভনীয় ফলের গোছাটা খাবে তার জন্য খেওখেওরি ও ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া। ভোটের বাজারের এই পয়স্বিনী নৃত্য, এই লম্বা লম্বা সাপ ও কপি বাঁদরে খেলা যে যার প্রাণ ভরে দেখে ন্যাও; এমন মজা আর কিছুকাল পরে কেউ দেখতে পাবে না।

* * *

সাপুড়ের বাঁশী বড় মোহকরী। সে বাঁশী ইংরাজের হাতে নাই, আছে আমা-দের অন্তরের স্বার্থ কুহকিনীর হাতে। আমাদের পলিটিকাল সতীরা নালিশ করেন এই বলে, যে, অবলা যে কুল মান ঘুইয়ে জাতি দেয়, সে কেবল ঐ অবলা মজানো বাঁশীর জ্বালায়। সাপ যে ভয় ত্রাস ভুলে ফোঁস্ করার চিরাভ্যাস ভুলে গর্ত্ত ছেড়ে সাপুড়ের বাঁশীর কাছে এসে

আপনার শোণিত পানে প্রমত্ত হইবে? সুরেন্দ্র নাথ, অরবিন্দ, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ দেশ-বন্ধু দেশপ্রিয়ের আরাধ্যা বাংলাকে কি স্বার্থের রুধির মাংস লোলুপ কয়েকটী শকুনি গৃধিনী ও ফেরু পালের লীলা ভূমিতে পরিণত করিবে?

জানি স্বাধীনতার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে। যুগে যুগে স্বাধীনতার মন্দিরে তীর্থযাত্রী-দলকে বিপদের বজ্র মাথায় লইয়া দুর্গম দুস্তর পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। অবাঙ্-নীর শাসনতন্ত্র ও হিন্দুঘাতী জাতীয়তা বিনাশী বাটোয়ারা আজ জাতির অগ্রগতির পথে হিমালয় প্রমাণ বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। গিরি গোবর্দ্ধন ধরণের অমিত বীর্য্য, অসীম সাহস ও দধীচির ন্যায় স্বার্থত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জাতির জয়যাত্রার পথকে যাহারা নিষ্কণ্টক করিবার কঠোর পণ লইয়া আগুয়ান হইবে, আজিকার জাতীয় যজ্ঞে জাতি কি তাঁহাদিগকেই সাগ্রহে ও সানন্দে পৌরহিত্যে বরণ করিবে না?

কথা মেলে দোলে, সে কেবল ঐ নাগিনী-মজানো বাঁশীর জ্বালায়। হে সুধী বঙ্গজন, তোমরা ভুল বুঝো না,—প্রেমের জ্বালা বড় জ্বালা, বিশেষতঃ দেশপ্রেমের।

"বিরহ নরক ভাল
একরকমে সহা যায়,
প্রেম তরঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে
কখন হাসায় কখন কাঁদায়।"

এই মহাবাণী–প্রেমিকের এই 'ক্যাণ্ডিড কনফেসন' বা সরল সত্যকথন দেশপ্রেমে যেমন খাটে এমন আর কোথায়ও নয়।

* * *

এই যে তোমরা দেখ আমাদের বুক-ভরা দহন, অপরের সীঁথির সিন্দুর দেখে হিংসার জ্বলুনী, সতীনকে অসতী বানিয়ে নিজে সতী সাজা, এ সব ঐ দেশের লাগি প্রেম তরঙ্গেরই রঙ্গ এবং ভঙ্গ। অস্পৃশ্য অবাহনীয় মোহকারী নগ্না কনষ্টিটিউশন্‌কে যে আমরা প্রাপ্তি মাত্রে মিনিষ্টাররূপে এক দম্ রেক্ করে ফেলবো তার সেরা প্রমাণ যদি চাও তা হলে হাতে হাতে দিচ্ছি। বোস কোম্পানীকে রেক করে যদি রায় কোম্পানী রাজা হতে পারে, আর রায় কোম্পানীকে মসীলিপ্ত করে যদি দাস কোম্পানী বক্ষ স্ফীত করে দাঁড়াতে পারে তা হলে আমাদের মাঝার রেকিং স্পিরিট যে পুরা মাত্রায় বর্ত্তমান সেটা সর্ব্ববাদী-সম্মত অবধারিত সত্য। ঠিক কি না? চ্যারিটির মত রেকিংও যে বিগিনস্ এট হোম্!

× ×

আমাদের সন্দেহ করা মানেই ট্রেটর, আমাদের ভোট না দেওয়াই মানে ময়ালু টার্পিচিউড কারণ আমাদের পোষাকী খদ্দর আছে তাই আমরা ভদ্দর আর আমাদের পার্টি লেবেল্ আছে তাই আমরা জেন্থইন (মাল)। পলিটিক্সের বাজারে আমরা ছাড়া আর সবই অচল টেবুয়া; আমরাই হচ্ছি, এসেন্স অব আন ডাইলিউটেড স্বার্থত্যাগ; কারণ আমরা দেশের লাগি পরের লাগি কেউ বা বিলাত ফেরৎ কেউ বা জেল ফেরৎ। আমরা যখন জামাই আদরে এ ক্লাশে অসহ্য কারা যন্ত্রণা সাফার করেছি তখন আমাদেরই আছে হল মার্ক অব প্যাট্রিয়টিজম্। সুতরাং—আমরা ছাড়া—

"অপরেণ যদ্‌কৃতং তদ্বেবং"

———

বাঙ্গলা কংগ্রেসে দলাদলি

বাঙ্গলা কংগ্রেসের প্রার্থী মনোনয়ন লইয়া সদ্য-সম্মিলিত কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে পুনরায় একটা দলাদলির যে আশঙ্কা আমরা করিতেছিলাম তাহাই আজ সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গত রবিবার বাঙ্গলা কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার জাতীয়দলের নায়ক কংগ্রেসের বর্ত্তমান অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখ জাতীয়দলের পাণ্ডারা পার্লামেন্টারী কমিটীতে স্ব স্ব পদে ইস্তাফা দিয়া জাতীয়দলকে পুনরুজ্জীবিত করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন। দেশের এই সঙ্কট সান্ধিক্ষণে বাঙ্গলার কংগ্রেস কর্ম্মীদের মধ্যে আবার এই দলাদলি জাতির নিদারুণ দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

* * *

বাঙ্গলার পার্লামেন্টারী কমিটীতে যে পরিস্থিতির উদ্ভবের জন্য শ্রীযুত শরৎচন্দ্র ও তাঁহার অনুগামীদল এই চরম পন্থাবলম্বনে বাধ্য হইয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে সেই সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। আগামী নির্ব্বাচন পরিচালনার জন্য বাঙ্গলায় যখন পার্লামেন্টারী কমিটী গঠিত হয় তখন বিবদমান দুইটীদল হইতে সমান সংখ্যক সদস্য লইয়া কমিটী গঠিত হইয়াছিল। তারপর পার্লামেন্টারী কমিটীর যে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির উপর প্রার্থী মনোনয়নের ভারার্পণ করা হইয়াছিল তাহাতেও উভয়দলের সমান সংখ্যক সদস্য ছিলেন। যে কারণেই হোক তাঁহাদের মনোনীত প্রার্থী তালিকা কর্ত্তাদের মনঃপূত না হওয়ায় তাহা বাহিরের আলোক দেখিতে পায় নাই। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তালিকাটী নাকি সেন্ট্রাল কমিটীর অনুমোদনের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পরে প্রকাশ পায় যে, কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও সেন্ট্রাল পার্লামেন্টারী কমিটীর সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই নাকি গোপনে ডাঃ রায়ের নিকট একখানি পত্রে লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গলা কংগ্রেস যদি বাঁটোয়ারা সম্পর্কে তাঁহাদের নূতন সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন না করে তাহা হইলে তাঁহারা বাঙ্গলার প্রার্থী তালিকা অনুমোদন করিবেন না। ইহার পর বারানসীতে সেন্ট্রাল পার্লামেন্টারী কমিটীর বৈঠকে স্বয়ং শরৎচন্দ্রের উপস্থিতি সত্ত্বেও ডাক্তার রায়ের আমন্ত্রণে বাঙ্গলার বাঁটোয়ারা সিদ্ধান্তের ভবিষ্যত সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহাতুর হইয়াছিলেন।

* * *

তারপরই কলিকাতায় আসিলেন, স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিতজী। তিনি শরৎচন্দ্র প্রমুখ কংগ্রেসী সদস্যদিগের পিঠ চাপড়াইয়া শুধু বাঁটোয়ারা সিদ্ধান্তেরই পরিবর্ত্তন নহে, সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থী মনোনয়নের ভার পার্লামেন্টারী ওয়ার্কিং কমিটীর পরিবর্ত্তে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র ও ডাক্তার রায় এই যুগল ডিক্টেটরের হস্তে অর্পণ করিয়া গেলেন। কোন মহদুদ্দেশ্যে পণ্ডিতজী শেষোক্ত পন্থাটী অবলম্বন করিয়াছিলেন তিনিই জানেন এবং ইহার মূলে বৈধানিকদলের গোপন হস্তের কোন ইঙ্গিত ছিল কিম্বা তাহাই বা কে বলিতে পারে। অথবা ঐক্যবদ্ধ অপেক্ষা দ্বিধা বিভক্ত বাঙ্গলা কংগ্রেস নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসী নেতাদের পক্ষে কম ত্রাসের কারণ হইবে, এ শুভ উদ্দেশ্য ইহার পশ্চাতে থাকাও হয়তো বিচিত্র নহে।

* * *

কারণ ঠিক ইহার অব্যবহিত পরেই বাঙ্গলার কংগ্রেসী প্রার্থী মনোনয়ন লইয়া ডিক্টেটরদ্বয়ের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। গত রবিবার ডাক্তার রায়ের স্বাক্ষরে যে মনোনীত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ পাইয়াছে

তাহাতে দেখা যায়, বাঙ্গলার সংস্কৃত ব্যবস্থা পরিষদে ৫০টী হিন্দু আসনের মধ্যে শরৎ বাবু ও বিধান বাবু ঐক্যমত হইয়া ৩৮ জন প্রার্থী মনোনীত করিয়াছেন। যে ৮ জন প্রার্থী লইয়া তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে মত-দ্বৈত ঘটিয়াছিল তাহার আপোষ মীমাংসা কিছুতেই সম্ভব না হওয়ায় (অনেকের মতে বড় কাকার শুভাগমনই নাকি এই অসদ্ভাবের কারণ) অবশেষে তাঁহারাই কমিটীর সদস্যদিগের ভোটের সাহায্যে তাহা মীমাংসার নির্দ্দেশ দেন। তদনুসারে গত ২৯শে নভেম্বর কমিটীর সভা আহ্বান করিয়া সদস্যদিগের ভোট গৃহীত হয় এবং বিবদমান ৮জন প্রার্থী ভোটাধিক্যে মনোনীত হন। বলা বাহুল্য এই ৮জন প্রার্থীই ডাক্তার রায়ের দলভুক্ত। যোগ্য প্রার্থীর অভাবে অবশিষ্ট ৪জন এখনও মনোনীত হন নাই। কবে হইবেন এবং আর হইবেন কিনা তাহাও সঠিক বলা যায় না।

* * *

প্রার্থী মনোনয়ন পর্ব্ব সমাধার পরে গত রবিবারেই শরৎবাবু ডাক্তার বিধান চন্দ্রের নিকট তাঁহার পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুবর্ত্তী কয়েকজন সদস্যও অনুরূপ পন্থাবলম্বন করিয়াছেন। শরৎবাবুর পদত্যাগ পত্রখানি সরকারীভাবে গৃহীত হইবার সংবাদ প্রকাশের পূর্ব্বে কাহার কার চুপিতে উহা শুধুমাত্র অমৃতবাজারে প্রকাশ পাইল তাহা বোধ হয় আর খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন হইবে না। উক্ত পত্রে শরৎবাবু জানাইয়াছেন যে, ভোটাধিক্যে বিবদমান প্রার্থী ৮জন মনোনীত হইলেও তাঁহাদের মনোনয়ন শরৎবাবুর মনঃপুত হয় নাই—অধিকন্তু তাঁহাদের মনোনয়ন কংগ্রেসের স্বার্থের পক্ষে হানিকর বিবেচনা করিয়াই তিনি পার্লামেণ্টারী কমিটীতে ইস্তাফা দানই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছেন। অতঃপর বৈধানিকদল শরৎবাবু ও তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গদের পদত্যাগ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন তাহা এখনও প্রকাশ পায় নাই।

* * *

কংগ্রেসের আদর্শ গণতান্ত্রিকতা, শরৎ বাবু একনিষ্ঠ কংগ্রেসভক্ত, সুতরাং তিনি যে গণতান্ত্রিকতারও অনুরাগী ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং তিনি নিজেও বহুবার বক্তৃতামুখে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। এস্থলে শরৎবাবু ও তাঁহার অনুগামীদিগের পদত্যাগের মূলে ব্যক্তি বা নীতিগত যে আপত্তিই থাকুক এবং তাহা যত ন্যায়সঙ্গতই হোক, ইহাতে গণতান্ত্রিকতার আদর্শ যে প্রতিপালিত হয় নাই বরং দলগত প্রাধান্যের প্রশ্নই যে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। পার্লামেণ্টারী কমিটী গঠন হইতে প্রার্থী মনোনয়ন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই গণতান্ত্রিকতা ও উভয়দলের সমানাধিকারের নীতিই অনুসৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহার পর জাতীয়দল যদি আমোল না পাইয়া থাকে এবং কয়েকটী জেলা-কমিটীর অনুমোদন যদি অগ্রাহ্য হইয়া থাকে তবে স্বয়ং শরৎবাবু ও তাঁহার অনুগত জাতীয়দলের সবক্ষেত্রেই কি সেজন্য দায়ী নহেন? বৈধানিকদলের পক্ষে যে ভোটাধিক্য হইয়াছে তাহা কি জাতীয়দলের সদস্যদিগের বিশ্বাসঘাতকতাতেই সম্ভবপর হয় নাই? স্বদলের প্রতি যাঁহাদের এইরূপ নিষ্ঠা সেইসব বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরদিগকে শরৎচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিতাড়িত করুন, নচেৎ অতঃপর এই শ্রেণীর লোকদিগকে লইয়া দল গঠন করিলে তাহার পরিণতি যে কি হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

* * *

গণতান্ত্রিকতা বা নিয়মতান্ত্রিকতার দিক হইতে শরৎবাবু ও তাঁহার দলবলের পদত্যাগ সমর্থনযোগ্য না হইলেও বৈধানিক দলের এই ভোটশাঠ্যও ততোধিক

নিন্দনীয়। কিন্তু বাঙ্গলার রাজনীতি ক্ষেত্রে কিরণ-বিধানের ভোটশাঠ্য ও রাজনৈতিক দাগাবাজী তো এই নূতন নহে! অতীতের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, সম্প্রতি কর্পোরেশনে রুপী-প্যাক্টের অবতারণা করিয়া দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পরে পৌর প্রতিষ্ঠানে কংগ্রেসী প্রস্তাব খর্ব্ব ও ডিক্টেটর শরৎ চন্দ্রকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্ত তাঁহারা দৈবী চালে যে বিভীষণগিরি করিয়াছিলেন তাহা কি শরৎবাবু ও তাঁহার দলবল ইতিমধ্যেই বিস্মৃত হইয়াছেন? তাঁহারা কি আজও ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে, বাঙ্গলা কংগ্রেসের বাটোয়ারা সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তনের ও প্রার্থী মনোনয়নে ডিক্টেটরী ক্ষমতা লাভ করিয়া আজিকার এই শোচনীয় অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টির মূলে কোন কংগ্রেসী ধুরন্ধর-দিগের গোপন হস্তের ইঙ্গিত ছিল? এই জন্তই বাঙ্গলার কংগ্রেসী মিলনে আমরা তখন খুব আশান্বিত হইতে পারি নাই। কারণ কিরণ বিধানের স্থায় কুচক্রীদিগের সহিত যে জাতীয়দলের মিলন স্থায়ী হইবে না, স্বকার্য্যোদ্ধারের পরেই যে তাঁহাদের স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকটিত হইবে, সেই সম্ভাবনাই বারম্বার আমাদের মনে হইয়াছিল। সুতরাং আজিকার এই পরিস্থিতিতে বিস্ময়ের বিষয় কি থাকিতে পারে?

• • •

বৈধানিক দলের এই ভোট শাঠ্য ও রাজনৈতিক চক্রান্তে জাতীয় দলের পরাজয়ে বিক্ষুব্ধ হইয়া সহযোগী আনন্দবাজার সেদিন লিখিয়াছেন যে, "ডাক্তার বিধান চন্দ্র ও তাঁহার অনুগামী গণ বাটোয়ারা সম্পর্কে না গ্রহণ, না বর্জ্জন নীতিরই পক্ষপাতী। বাটোয়ারার বিরুদ্ধে কোনরূপ আন্দোলন করিতে তাঁহারা নারাজ। অধিকন্তু ডাক্তার রায় ও তাঁহার অনুগামীরা যে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পক্ষপাতী এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। ডাঃ রায় ও ডাঃ আন্সারী প্রথমে এই মত প্রকাশ করেন যে, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নূতন শাসন তন্ত্রে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করাই উচিত। ডাঃ রায় সেই মত পরিত্যাগ করেন নাই বরং আরও দৃঢ় ভাবে উহা পোষণ করিতেছেন। জাতীয় দলের প্রার্থীদিগকে মনোনীত করিলে পাছে তাঁহাদের এই সব দুরভিসন্ধি চরিতার্থের পথে বিঘ্ন ঘটে এই জন্তই তাঁহারা জাতীয় দলের প্রার্থী দিগকে আমোল দিতে চাহেন নাই।"

× ×

আনন্দবাজারের স্থায় প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী ও রাজনৈতিক দূর-দৃষ্টি-সম্পন্ন সহযোগীর এ দিব্য জ্ঞানটা যে এত বিলম্বে উন্মেষিত হইল ইহাই দুঃখের ও লজ্জার বিষয়। কিন্তু সহযোগীকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, কংগ্রেসের প্রার্থী মনোনয়নের পূর্ব্বে কি তিনি এ জাতীয় দলের পাওয়া ইহা টের পান নাই? কিন্তু প্রার্থী মনোনয়নে জাতীয় দলের পরাজয়ের পূর্ব্বে তো কোন দিন সহযোগীর মুখে এ সব নীতি কথা শুনা যায় নাই। বরং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এতদিন তাঁহার মুখে বৈধানিক স্তুতিবাদই তো শুনা গিয়াছে। এবং শুধু স্তুতিবাদ নহে, যে বাটোয়ারার বিরুদ্ধে সহযোগী দিনের পর দিন তীব্র বিষোদ্গার করিয়া আসিয়াছেন, এবং মন্ত্রীত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছেন, বৈধানিকদলের ষড়যন্ত্রে যখন সেই বাটোয়ারা সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তিত হইল তখন স্বয়ং শরৎ চন্দ্র হইতে সহযোগী পর্য্যন্ত কি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাহার প্রশংসা ও সমর্থন করেন নাই? বৈধানিক দল মন্ত্রীত্ব কামী জানিয়াও কি সহযোগী এতদিন তাঁহাদেরই পৃষ্টপোষকতা করেন নাই? কোথায় ছিল তখন তাঁহার এই বাটোয়ারা বর্জ্জন প্রীতি, কোথায় ছিল মন্ত্রীত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধ নীতি? আজ দলের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হওয়াতেই বুঝি সহযোগীর এ স্থায় নিষ্ঠা ও আদর্শ প্রীতি উথলিয়া, উপচিয়া উঠিল?

× ×

আর দল ত্যাগী শরৎ চন্দ্রকেও বলি, বৈধানিক দলের শঠতা ও চক্রান্তে বিক্ষুব্ধ হইয়া তিনি সেই পদত্যাগই করিলেন, অথচ এই পদত্যাগটা যদি বাটোয়ারা সিদ্ধান্তের সময়ে দৃঢ় থাকিয়া করিতেন তাহা হইলে বাঙ্গলার হিন্দু সমাজ আজ অধিকতর আন্তরিকতার সহিত তাঁহার এ দল ত্যাগকে অভিনন্দিত করিত। যাহা হউক, বৈধানিকদল ছলে বলে বা কৌশলে ভোটাধিক্যে জয়ী হইল ও তাঁহাদের সে জয় লাভের পশ্চাতে যদি বাটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অনিচ্ছা ও মন্ত্রীত্ব গ্রহণের দুরভিসন্ধি থাকে তবে তাঁহারাও এখন হইতেই জানিয়া রাখুন যে বাঙ্গলা রুপী প্যাক্টের নায়কদিগকে ক্ষমা করিলেও বাঙ্গলার এই মীরজাফর ও বিভীষণদিগকে কখনই ক্ষমা করিবে না। দেশের এই সঙ্কট সন্ধিক্ষণে তাঁহারা যদি নিজেদের অন্যায় জিদ ও দলগত স্বার্থ এবং প্রভুত্বের মোহ পরিহার করিয়া জাতীয় দলের সহিত সম্মিলিত না হইতে পারেন তবে তাঁহাদের দুরভিসন্ধিতে দেশবাসীর সন্দেহ সংশয় আরও দৃঢ়তরই হইবে এবং সে ক্ষেত্রে শরৎ চন্দ্রের অধিনায়কত্বে আজ যে জাতীয় দলের আবির্ভাব সূচিত হইয়াছে দেশবাসী সাগ্রহে ও সমবেতভাবে তাহাকেই অভিনন্দিত করিবে।

পাঁচমিশালী

(সব্যসাচী)

অনেকদিন হইতেই জানা ছিল, বি, পি, সি, সি ছেড়াচুলে যে খোঁপা বাঁধিয়াছিল, তাহা খসিয়া পড়িতে বিলম্ব হইবে না। একদিকে বিধানবাবু মন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্য বোড়ের চাল চালিতেছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অবাঙ্গালী কংগ্রেসী কর্ত্তা-দের মনস্তুষ্টি বিধান করিতেছিলেন—আর একদিকে শরৎবাবু বাঙ্গলার লোকমত শিরোধার্য্য করিয়া সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার দাবী করিতেছিলেন। এই অবস্থায় বাংলায় কংগ্রেসের সভাপতি জহরলালের আবির্ভাব! সকলেই জানেন কংগ্রেসের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা সঙ্ঘের বাংলা দেশের সভাপতি শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার বসু স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, গবর্ণমেন্ট যেমন, কংগ্রেসও তেমনই লোক-মতের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতেছেন। জহরলাল আসিয়া একটা 'ফরমুলা' বাহির করিলেন। তাহাতে যে ব্যবস্থা হইল [illegible] একটা গোঁজামিল দিয়া তিনি তখনকার মত কাজ ফতে করিলেন। কিন্তু গোঁজামিল কখনও স্থায়ী হয় না। তাই দেখিতে দেখিতে আবার ভাঙ্গন ধরিল। বিধানবাবুর দল যেভাবে জেলা কমিটীগুলির মনোনয়ন পদদলিত করিয়া আপনাদের দল ভারী করিলেন, তাহাতে শরৎবাবু প্রমুখ জাতীয়-দলের পার্লামেন্টারী বোর্ডে থাকা সত্যসত্যই অপমানজনক হইয়া উঠিল। তাঁহারা পদত্যাগ করিয়াছেন। শরৎবাবু যদি অন্ততঃ আরো পক্ষকাল পূর্ব্বে এই বোর্ড ত্যাগ করিতেন, তবে যে ফল আরো ভাল হইত, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই, তখন আজ আর সেজন্য আক্ষেপ করিব না। আমরা শরৎবাবুকে বলি তিনি অগ্রণী হইয়া বাংলায় আবার জাতীয়দল গঠিত করুন, কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব আবার বাঙ্গালীরই হস্তগত হইবে।

* * *

হিন্দুস্থান সমবায় বীমামণ্ডলীর নিয়ম যখন এমনভাবে পরিবর্ত্তিত হয় যে, উহার ম্যানেজার নলিনী রঞ্জন সরকারই উহার ডিক্টেটর হইয়া পড়েন, তখনই অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, অপরন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় [illegible] ভবিষ্যতে। এখন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, নলিনীরঞ্জন ইউরোপে যাইয়া একটী ইটালিয়ান কোম্পানীর সহিত চুক্তি করিয়া আসিয়াছেন। সহযোগী আনন্দ বাজার পত্রিকা এইরূপ লিখিয়াছেন: ইটালীর এড্রিয়েটিক ইন্সিওরেন্স কোম্পানী হিন্দুস্থানের রি-ইন্সিওরেন্সের অধিকাংশই পাইবেন এবং বিনিময়ে হিন্দুস্থান যে অগ্নি ও জাহাজ বীমা শাখা স্থাপিত করিবেন, তাহার আদায়ী মূলধনের অধিকাংশই ঐ এড্রিয়েটিক কিনিবেন। যদি ইহাই হয়, তবে হিন্দুস্থানে ভারতবাসীর স্বার্থ যেমন হ্রাস পাইবে, ইটালিয়ানদিগের স্বার্থ তেমনই বাড়িবে। নলিনীরঞ্জন যে কাজ করিয়া-ছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহা যদি সত্য হয়, তবে তিনি দেশদ্রোহিতার সোনার মেডেল পাইবার উপযুক্ত হইবেন। যাঁহারা নলিনীরঞ্জনের পূর্ব্ব ইতিহাস অব-গত আছেন, তাঁহারা ইহাতে বিস্মিত হইবেন না, তবুও বাঙ্গালীর পক্ষে এই সংবাদ যে একান্ত শোচনীয় বলিয়া বিবে-চিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই নলিনীরঞ্জন সরকারই এবার আবার বেঙ্গল ন্যাসন্যাল চেম্বার অব কমার্স হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচনপ্রার্থী। ভোটাররা তাঁহার এই ইটালিয়ান প্রীতির বিষয় অবগত আছেন কি?

পাবনা জিলা কংগ্রেস কমিটী

কংগ্রেস পার্লমেন্টারী বোর্ডের একদল সদস্যের চক্রান্তের ফলে বহু জিলা কংগ্রেস কমিটী মনোনীত প্রার্থীগণ পরিত্যক্ত হইয়াছেন। এই কারণে শ্রীযুত শরৎ চন্দ্র বসু ও জাতীয় দলের সদস্যগণ পদত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে পাবনা জিলা কংগ্রেস কমিটী পার্লামেন্টারী বোর্ডের এই স্বেচ্ছাচারিতার সমুচিত উত্তর প্রদানের জন্য স্বাধীন ভাবে প্রার্থী দাঁড় করাইবেন। বহু জেলা কংগ্রেস কমিটীই আসন্ন নির্ব্বাচনে এই পথ অবলম্বন করিবেন বলিয়া শুনিতেছি।

রাষ্ট্র সঙ্ঘের শিশুমঙ্গল কার্য্য

সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘ-মহাসভার যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে বিশ্বের কল্যাণে রাষ্ট্র সঙ্ঘে অনুষ্ঠিত বিবিধ জনহিতকর কার্য্যের মধ্যে শিশুদের রক্ষা ও মঙ্গল বিধানের প্রচেষ্টাও অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে।

অনেক স্থলে দেখা যায়, দারিদ্র্য কিম্বা অন্যান্য সামাজিক কারণে পিতা মাতা বা অভিভাবকগণ শিশুদের যত্ন লইতে পারে না অথবা অনেক সময়ে বিশেষ কারণ-বশতঃ নিজ গৃহে মাতার সহিত বসবাস করা শিশুদের পক্ষে ভবিষ্যৎ ও সামাজিক কল্যাণের দিক থেকে অনুকূল হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে, যাহাতে অপর কোনও সুযোগ্য পরিবারে ঐ সমস্ত শিশুদের থাকা ও খোরাকীর ব্যবস্থা হইতে পারে, রাষ্ট্র-সঙ্ঘে তাহার প্রচেষ্টা হইতেছিল। এই সমস্যার বিভিন্ন দিক ইতিমধ্যেই আলোচিত হইয়াছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘে স্থির হইয়াছে, যে ছোট ছোট দল গঠন করিয়া এই সমস্যার নিরসন করা হইবে।

সিনেমার সাহায্যে যাহাতে শিশুদের নির্দ্দোষ আমোদ ও শিক্ষা বিধান করা যাইতে পারে ১৯২৫ সাল হইতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাহার চেষ্টা করিতেছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিশুমঙ্গল পরামর্শ সমিতির মতে, সাধারণ সিনেমাগুলি শিশু ও যুবজনের মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। সেই কারণে, সর্ব্বত্র এরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ, যাহার দ্বারা শিশুরা সিনেমার শিল্প মাধুর্য্য ভাল ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে। সুতরাং নির্দ্দোষ আমোদের জন্য শিশুদের উপযোগী ছবির প্রচলন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইহা ছাড়া, যাহাতে সিনেমার সাহায্যে সর্ব্ব সাধারণের মনে শিশুমঙ্গল কার্য্য সম্বন্ধে কৌতূহলের উদ্রেক করা যায়, সে বিষয়েও রাষ্ট্রসঙ্ঘে আলোচনা হইয়াছে।

কি উপায়ে উপেক্ষিত ও অপরাধপ্রবণ শিশুদের মানুষ করিয়া তোলা যায়, আগামী ১৯৩৭ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিশু-মঙ্গল পরামর্শ সমিতি সে বিষয়ে একটী বিশদ গবেষণা সুরু করিবেন স্থির হইয়াছে।

পৃথিবীতে শিশুমঙ্গল কার্য্য সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের সমাচার সংগ্রহ এবং তাহা বিতরণ করিবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘে একটী বিশেষ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠানগুলি যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছে, সে সম্বন্ধে বহুবিধ সমাচার এই কেন্দ্রে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সমাচারগুলি বিভিন্ন দেশের শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা হয়।

পৃথিবীর সমস্ত দেশেই জন সাধারণের পুষ্টি বিধান করা প্রধান কর্ত্তব্যে পরিণত হইয়াছে। কেন না, সমস্ত দেশেই সাধারণ স্বাস্থ্য, আর্থিক পরিণতি, কৃষি এবং সামাজিক প্রগতির সহিত এই সমস্যা বিশেষ সংশ্লিষ্ট। যাহাতে সার্ব্বজনীন কোন ব্যবস্থায় পৃথিবীর জন সাধারণের পুষ্টি বিধান করা যাইতে পারে, তাহার উপায় বাহির করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘে বিশেষ পুষ্টিবিধান সমিতি গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে স্থির হইয়াছে যে তাহাতে শিশুদের পুষ্টি বিধান সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা হইবে।

শিশুদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার যাহাতে বন্ধ করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে শীঘ্রই রাষ্ট্র-সঙ্ঘে বিশেষ আলোচনা হইবে।

সাহায্য অভিনয়

খুলনা জেলার টাউন—শ্রীপুর বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ সুর শিল্পী ও বহুশিল্পীগণের দ্বারা নৃত্যগীত, আবৃত্তি, ব্যায়াম ও হাস্যকৌতুকের বিপুল আয়োজন হইয়াছে আগামী ১৩ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায়।

স্থান—আশুতোষ মেমোরিয়াল হল, ভবানীপুর। প্রবেশ মূল্য—১০৲, ৫৲, ৩৲, ২৲, ১৲ ও ৷৹ আনা। মহিলাদের ১৲ টাকা।

আষাঢ়ের প্রথম দিবসে

(বড় গল্প)

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

মিলনের মাধুর্য্য সব সময় মেলে না, মানুষের মনে তাই বিরহীর শূন্যতা। বৎসরের সারা সময়ের মধ্যে সেইজন্যই সে উৎসবের একটি জ্যোতির্ম্ময় মুহূর্ত্ত বাঞ্ছা করে, একটি দিবস তোলা থাকে তার চিত্তের মণিকোঠায় স্মরণীয় হয়ে, ক্রম-বর্দ্ধমান এক-ঘেয়েমীর পুঞ্জীভূত ঘনান্ধকারের মাঝে এতটুকু সময়ের জন্যও সে চায় দীপালী উৎসব,—প্রান্তির নিবিড়তর হ'তে নিবিড়তম অনুভূতি।

নববর্ষা নেমে এল। আকাশের কিনারে কিনারে নানানৃতর মেঘপুঞ্জ স্তরে স্তরে অনন্তা জুড়েছে। ওদের কেউ হয়তঃ দূতী, কেউ মিতা, কেউ বা খোস্-খেয়ালী অন্ত কিছু। কারও পক্ষে বাঁধা রয়েছে রামগিরির লিপি, কারও হস্তে যূথিফুলের বরণডালা, বিরহ সাগরের দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে সংবাদ নিয়ে যাচ্ছে,—নির্ব্বাসিত যক্ষের সংবাদ, প্রিয়ার মর্ম্মতলে পৌঁছে দিতে।

নেই সেই অবন্তী, নেই সেই বিদিশা, হারিয়েছে উজ্জয়িনী, লুপ্ত হ'ল রেবা-শিপ্রা বেত্রবতী। আমাদের আছে শুধু মানসলোকের রামগিরি, সেথায় আমরা চির নির্ব্বাসিত। নির্ব্বাসনের সেই নিরানন্দ দিনগুলির মাঝে আমরা আমাদের হীরার্ক বাক্যা মেলে একটি ক্ষণের জন্য অপেক্ষা করি, কৃষ্ণাবাস ব্যাকুলতা নিয়ে মেঘলোকবিহারী মহাকালের দেবতাকে জানাই স্বাগতঃ সম্ভাষণ, নব-বর্ষার এই বিরহ-লাঞ্ছিত ক্ষণটিতে আমাদের চলে এক নব-আশার সংযোজনা, যার প্রেরণা জোগায় বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে থেকেও সেই বন্দী আত্মা, যে তার কল্প-লোকের কারাগার ছেড়ে দিয়ে শাশ্বত চির-সরস আনন্দোৎসবের অভিসার পথে বেরিয়ে আসতে চায় কালের গণ্ডী পেরিয়ে আজকের এই স্মরণীয় মুহূর্ত্তটির সন্ধানে, যেথায় সারা বছরের নির্ব্বাসনের ফাঁকে এতটুকু সময়ের তরেও প্রতি বাঁকে, প্রতি-পাদক্ষেপে, প্রতি কথায় বার্ত্তায়, আলাপ-আলোচনায় বাস্তব ও কল্পনার সাথে এক অপূর্ব্ব মিলনের গ্রন্থি বাঁধা রয়েছে।

নববর্ষা আসে আর চলে যায়, আমাদের মনে সে কি রেখে যায় কোন ছাপ? আষাঢ়ের জলভারাক্রান্ত মেঘের শ্যামলা মায়াদিঠির পানে তাকিয়ে জনপদবধূ-সুন্দরীর কেঁপে ওঠে কি ভ্রূলতার কাকপক্ষ? সেই ত মর্ত্ত্যবাসী আমরা, সেই ত সব আছে, তবে কেন আর আমরা প্রিয়ার উদ্দেশে তেমন করে দূত পাঠাতে পারি না? নববর্ষার ঐ প্রথম ক্ষণটি কেন তবে অমন অবজ্ঞিত, অনাদৃত অবস্থায় ফিরে যায়, পুনর থাকে অনুভবের কারাগারে বন্দী?

হয়ত তা নয়, মেঘমেদুর ঐ মুহূর্ত্তটি হয়ত কারও কারও প্রাণে সত্যকার সাড়া জাগায়। তাই সে সারা বছরের অপরিমাণ রিক্ততার দাহ-র মাঝে নিজের বহ্নিমান অতৃপ্তি নিয়েও এই মুহূর্ত্তটির জন্য অপেক্ষা করে, প্রতিদিনকার বিরাট ব্যর্থতার অশ্রু দিয়েই সে গড়ে তোলে এই ক্ষণিকের তাজমহল,—তারপর প্রচলিত অভিশাপের মত এ-ক্ষণটি থেকে সে বিধবার মত নির্ব্বাসন পায় বিস্মরণীয় রামগিরিতে। এরই পুনরাবৃত্তি ঘটে প্রতি বছর, নইলে আমার চিত্তের মণিকোঠায় আষাঢ়ের প্রথম দিবস কী করে অমন স্মরণীয় হ'য়ে রইল!

আষাঢ়ের প্রথম দিবসে—সে আমার কাছে অপরূপ মাধুরী হিল্লোল, মাধবীর সুরভি গানের মত, তাকে আমি কখনো ভুলব না। ভুলব না তার সজল মায়াদিঠি; ভুলব না তার কাজল-কালো উত্তরীয় ওড়ানো, ভুলব না তার মেঘলোকে উধাও বন্দী আত্মা।

গ্রীষ্মের খর পিঙ্গল ধূলিধূসরিত পৃথ্বির

তৃষার্ত বহ্নি যেটোথায় বক্ষেই গিরি শৃঙ্গমালার পাষাণস্তূপ শিখরদেশে নাবে কোমল ছায়াস্তরণ, ধরিত্রীর বুকের পরে চলে লাঙ্গলের ফলা সভ্যতার প্রথম নিদর্শনরূপে, হয়ত সেটা তার অপূর্ব্ব রতিক্রিয়া, সৃষ্টির আদিম প্রেরণার মত। অচলায়তনের পাষাণ বেষ্টনীই হ'ল ওর বিরহী স্বামী; তারই অন্তর্লীন নব মেঘের রসধারায় সঞ্জীবিত হ'য়ে ও হয় অন্নদাত্রী, বস্ত্রদাত্রী, সৌভাগ্যগর্ব্বী অন্তঃসত্ত্বা মাতা।

এই হ'ল সভ্যতার প্রথম পরিচ্ছেদ,—মানুষ তাই দেখে শিখেছে, তাই সে আষাঢ়ের প্রথম দিনটিতে আর বিরহী থাকতে চায় না, গিরি শৃঙ্গমালায় অস্তবর্ত্তিকা পৃথিবী, মেঘলোকে হারিয়ে যাওয়া পৃথিবী, ধূ ধূ মরুর লেলিহান শিখান্তবর্ত্তিনী পৃথিবী—এরই মাঝে সে প্রিয়াকে উদ্দেশ করে দূত পাঠায়, বুকের মধ্যে আদিত্যবর্ণ তেজময় পরম পুরুষ বিশ্বের নিখিল বিরহীবৃন্দকে সম্বোধন করে বলে—জাগো, জাগো।

তারই ডাকে সাড়া দিয়ে আমার তৃষিত আত্মা ঐ দিনটিতে অনেক কিছু পেয়েছে, পেয়েছে মৃণালের সজল আঁখিকালোর শ্যামল উপহার, পেয়েছে তার আত্ম সমর্পিত আলিঙ্গনের আবেষ্টনী, চুম্বনের গাঢ় নিবিড় পরিতৃপ্তি—অশ্রুর মধু দিয়ে, কম্পমান অনুভূতির আনন্দের মধ্য দিয়ে বহুদিনের অপ্রাপ্তির বেদনার মধ্য দিয়ে।

নিরালা একান্তে নিস্তব্ধ নিশীথের বক্ষোমাঝে বসে আমি ভাবি, ভাবি সেই প্রথম চুম্বনের কথা আষাঢ়ের প্রথম দিবসে—যে-চুম্বন দিয়েছিল মৃণাল আমার বুকের ভেতর আশ্রয় নিয়ে, আর কেঁপেছিলো, যেমন কাঁপে সন্ধ্যাতারা আকাশের বুকে মাথা রেখে। ওর ওই বেপথুরেখা আজও আমি টের পাই, ও আমার বুকে অপরূপ দোলা লাগায়—রক্তের দোলা কামনার দোলা, অপূর্ব্ব অনুভূতির দোলা। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে সেই মানসলোক, বহু অকথিত ইতিহাস, আর ওর সেই কাজল মায়াদিঠি অশ্রুর গাঢ় বাষ্পে ভরা। ফিরে আসে সেই কথা, আমার সেই কণ্ঠস্বরের অনুরণন 'মৃণাল, জানি অমর কিছুই নয়, একদিন সব হয়ত যাবে, তবুও পূর্ব্বকালের এই প্রেমকে উত্তরকালে স্মরণীয় করবার জন্যে চুম্বন দিয়ে আজ আমি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করলাম।

বারেক ও যেন চোখ বোজে; ওর চিবুকের কুঞ্চিত খাঁজখানা একটুখানি যেন কেঁপে ওঠে, তারপর বলে—'তাই তোক্ রবিদা' এ-দিনটিকে কখনো অসম্মান কোরো না।'

কিন্তু তা' হয় না, বিধাতার তূণে জমা থাকে শত শাণিত অস্ত্র, ক্রুদ্ধ সংশয় ও তীব্র বিক্ষোভের ক্রূর জটিলতা ভেঙ্গে আসে

অকারণেই, সভ্যতার অভ্যন্তরে চলে অশোভন ক্রটী-বিচ্যুতির দ্বন্দ্বের মাতামাতি, যার ফলে মানবজীবনের পরে পড়ে অসময়ে ট্রাজেডির যবনিকা !

তাই হ'ল—অনেকখানিই হারালাম, ইচ্ছে করেই, একান্ত অবহেলায়, মৃণালের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমি আমার আত্মসংযমকে বড় স্থান দিলাম, আত্ম-পীড়নকে। প্রেমের কমল-কোরক পেলনা আর প্রস্ফুটনের আস্বাদ, একটা নিষ্ফল আত্মাভিমান দু'জনার মাঝে ছেয়ে রইল, অনাদরে রচিত হ'ল আত্মঘাতী নিষ্ঠুর ব্যবধান।

যাক্‌গে, সবই গেছে কিন্তু যায়নি তার স্মৃতি, যায়নি সেই চুম্বনের বেপথুরেখা, যায়নি সেই আষাঢ়ের প্রথম দিবস ; আমার সব চেয়ে বড় আনন্দ ও ব্যর্থতায় ভরা। তারই উদ্দেশে, এই ধূলি-ধূসরিত পৃথিবীর পথে রেখে গেলাম আমার প্রাণের সজল নতি, আর বেদনার সুদীর্ঘ ইতিহাস।

• • •

প্রথম যে কবে মৃণালকে দেখেছিলাম, সেটা আর স্মরণে আনতে পারি নাক', বিস্মৃত হয়েছি সেই দিনটি যেদিন ও আমার আঁখিপাতে প্রথম ধরা দিলে,—কিন্তু এটা বেশ জানি যে সেই থেকেই ও করলে আমার হৃদয়কে অধিকার, যেমন দৃষ্টিকে অধিকার করে নিশীথের অগণিত নক্ষত্ররাজির মধ্য হ'তে শুকতারার সুশুভ্র নিকলুষ উজ্জ্বলতা। কিশোরী মৃণাল, কতই বা বয়স ওর তখন, আশে-পাশে ঘোরে, দুষ্টুমির মায়াজাল দিয়ে হৃদয়কে করে তোলে ভারাক্রান্ত, তবুও ঠিক কাছে ধরা দেয় না। ওর একটা অপূর্ব মাদকতা আছে বা' [illegible] কেবল ধরায়, কিন্তু তুলেও তা' নিবৃত্তির পানীয় যোগায় না।

ধরাছোঁয়ার বাইরে ঐ যন্ত্রণাকাতর দিনগুলি তাই একটা অস্বস্তি নিয়েই কেটে যায়, মনে হয় যেন নিঃসঙ্কোচ নিবিড়তায় ইঙ্গিত-আভাষ কোনকালে আর দেখা দেবে না। অপরপক্ষ থেকে কোনরূপ সুস্পষ্ট নির্দেশ না পেয়েই নিজেকে স্বেচ্ছায় জ্ঞাপন করার বিমুখতা আমার চিরকেলে স্বভাব, তাই বিচ্ছেদকাতর নিঃশব্দ অন্তর-টায় ওঠে না কোন আনন্দের কলতান।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন যায় ? ভালবাসার স্রোত যেখানে নিরন্তর ব'য়ে চলেছে, সেখানে অবগাহন-স্নান না করলে প্রাণ যে হাঁপিয়ে ওঠে। একে এড়াতে গেলে ওখান থেকে নিজেকে নিঃশব্দে সরিয়ে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কি ? মৃণাল যদি এতটুকু এড়িয়ে চলত, আমাকে ছেড়ে দিয়ে অপরের প্রতি ও যদি দেখাত বারেক পক্ষপাতিত্ব, তাহলে হয়ত সমস্যার সমাধান হ'তে দেরী হ'ত না। কিন্তু তা না করে ওর ঐ প্রচণ্ড দুষ্টুমির মায়াজালের ভেতর দিয়ে ও যে কভু কাছে ধরা দেবে না, সেইটেই ভয়ানক অসহ্য লাগে। তাই বাধ্য হয়ে আমিই ওকে এড়িয়ে চললাম, ওর সঙ্গে কথা বন্ধ করলাম কিছুদিন।

বেশ বুঝলাম এতে ও আঘাত পেল, বিস্মিতও কম হলনা। ভাব দেখে মনে হয় অভিমানী মৃণাল আড়ালে নীরবে ঠোঁট ফুলোয়। তাই আর থাকতে না পেরে ওকে একদিন কাছে ডাকলাম। ওর প্রতিই উল্টে চাপ দিয়ে শুধালেম মৃণাল এতদিন কেন কথা কওনি বলত ?

ও মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, জবাব দেয় না।

—কই, বললে না যে ?

আনত কলভারাক্রান্ত মুখখানা ও বারেক তুলে চাইলে না, তাতে তখন অশ্রু টল্‌ টল্‌ করছে।

আশ্চর্য্য লাগে ! এ সেই মৃণাল, যে এতদিন নিজেকে প্রকাশ করেনি ! আজ এই অনাদরে ওর চোখে জল ভরে এসেছে, এখনি হয়ত যে কেউ দেখে ফেলতে পারে। তখন ও কি জবাব দেবে ? তখন ও কি বলবে যে খেয়ালী রবিদা'র জন্যেই আজ ওর এই দুর্বলতার অভিব্যক্তি। ওকে বাঁচাবার জন্যেই আমি ওর হাত ধরে ওকে ভেতরে নিয়ে গেলাম। বললাম —মৃণাল, তোমার চোখে জল কিসের ভাই ?

ও মুখ তুলল না, শুধু ফুপিয়ে বলে উঠল—তুমিই বা এতদিন কেন কথা কওনি রবিদা' ?

বাইরে নববর্ষার মেঘপুঞ্জ তখন অপূর্ব্ব মায়াজাল সৃষ্টি করেছে, কিন্তু ভেতরে আত্ম-সমর্পিত মৃণালের সজল কালো আঁখির শ্যামল মায়াও কম লোভনীয় নয়। আমার মধ্যকার এতদিনের বন্দী আত্মা যেন ঝাঁপটা মেরে বলে উঠল জাগো, জাগো। আস্তে আস্তে ওকে বুকের কাছে টেনে এনে ওর চিবুকের কুঞ্চিত খাঁজ-খানিতে একটি চুম্বন দিয়ে বললাম—মৃণাল, তোমাকে সম্পূর্ণ পাওয়ার আরও হয়ত কয়েক বছর দেরী আছে, কিন্তু সেই সুদীর্ঘকাল কাটাবার জন্যে স্মৃতিস্বরূপ এটুকু নিয়ে নিলাম। ভুলোনা এটিকে।

চোখবুজে বুকের ভেতর ও যেন বারেক কেঁপে উঠল, তারপর জানালে—তুমিও কিন্তু আর দূরে থাকতে পাবেনা।

আষাঢ়ের প্রথম দিবস তখন পৃথিবীর উদ্দেশে বিরহীর অর্ঘ্য পাঠিয়ে দিয়েছে। মৃণালেরও অশ্রু কিসের ? ব্যর্থতার, অভিমানের, না আত্ম-লাঞ্ছনার ?

বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস অখণ্ড, অমোঘ, তারই প্রতিক্রিয়া চলে সারা জীবন ব্যেপে, এক দুরন্ত দুর্নিবার স্রোতের টানে কে কোথায় ছিটকে পড়ে, মাঝখানে থাকে শুধু শূন্যতার ব্যবধান। মৃণালের কক্ষ হ'তে আমিও তাই ছিটকে পড়লাম, আত্মগোপন করতে। প্রেম নয়, প্রয়োজন নয়, বিমুখতাও নয়,—সংসার ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যর্থতাই আমায় পাগল করেছে; তারই অশরীরী ভূতটাই আমায় পীড়া দেয়। তাই স্বেচ্ছায়ই নিজেকে সরিয়ে নিলাম অপর দেশে, মৃণালের সেই কথা 'তুমিও কিন্তু আর দূরে থাকতে পারবে না' কোন কাজেই এল না। প্রেমের চেয়ে আমার আত্ম সম্মান বড়, বন্ধুত্বের চেয়ে বড় হৃদয়ের সংগ্রামশীলতা।

নিঃসহায় মুসাফিরের মত একা একা ঘুরি; কোন সম্বলই নেই। ধরিত্রীর বুকটাকে ছু'পা দিয়ে মাড়াই; ওর সাথে যেন কত দিনের পরিচয়। ক্ষুধায় অবসন্ন হ'য়ে ওরই বুকে মাথা রেখে ওর হৃদয়ের গুঞ্জন শুনি, ওর বুকের যন্ত্রনাকাতর ধুকধুকির আওয়াজ। পাশে এসে পথের কুকুর জটলা করে, জড়ো হয় যত ভিখারী বাউল সম্প্রদায়—তারাই যেন আজ আমার পরমাত্মীয়। তাদের মুমূর্ষু, অস্ফুট কলকাকলী যেন আমার জীবনের সঙ্গীত, ছন্দহীন অন্নহীন, নোংরামীর জীবনযাত্রা যেন এক মায়াজাল সৃষ্টি করে।

ভাবি এই যে যন্ত্রণাকাতর অসহায় ধরিত্রী, মৃত্যুর ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত শ্মশানচারিণী ধরিত্রী, দুর্ভিক্ষ ও মারী প্রপীড়িত সর্বাঙ্গিকা, সংহারময়ী ভীষণা ধরিত্রী,—এরই পাশে ওর সেই মিষ্টা; বিলাস বিভোরা, অভিজাত-সুন্দরী-মূর্ত্তি কী করে খাপ খায়? জীবনের দেবতা যদি হয় সেই আদিত্যবর্ণ তেজোময় পরমপুরুষ, তবে সে কী করে সহ্য করে এই নিত্যকার লজ্জালাঞ্ছিত অসাম্যের নৃশংস বিভেদীকরণ? সৃষ্টির অনাদিকাল হ'তে যে অগণিত জ্যোতির্মালা ছায়াপথে সঙ্গীত রচনা করে, যারই স্পষ্ট ও অস্পষ্ট আলোক বন্দনায় রত থাকে মহানগরের মহাশিল্পীর অভ্রভেদী মিনার-স্তম্ভ ও সৃপতিবিদ্যা, নামহীন, আকারহীন, মৃত্যুহীন মহাকালের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যারই উদ্দেশে খোদিত হয় সভ্যতার ক্রমবর্দ্ধমান, শান্তিলিপ্সু কোমল জয়াস্তরণ, ঠিক তারই পাশে কী করে রণিয়ে ওঠে অর্থগ্রাসী, যশোগ্রাসী, অন্নগ্রাসী রিক্ততার হাহাকার? জীবনটা কি এম্নি উল্টোপাল্টায় ভর্ত্তি, এম্নি অশান্তি ও অসাম্যের মন্থনসাগর? শান্তি কি সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না কখনো?

একেই জানতে ত নির্দ্দিষ্ট গণ্ডি হতে ছিটকে পড়েছিলাম, কিন্তু আর যেন ভাল লাগে না। প্রেমকে, প্রয়োজনকে, বন্ধুত্বকে অস্বীকার করেই ত স্বেচ্ছায় আত্মগোপন করেছিলাম, কিন্তু মন যেন বলে ওঠে—এতে তুমি কি পেলে? কী কথা পড়ল তোমার সঞ্চয়ের খাতায়?

এক এক রাত্রে স্বপ্ন দেখি, দেখি যেন মৃণাল অনুযোগ করে বলছে—রবিদা, কবে তুমি ফিরবে গো? আবার শেষ রাত্রের গাঢ় সুপ্তির মধ্যে কখনো বা চোখে পড়ে মৃণাল অপরের সাথে মিলিত হয়েছে, তারই গণ্ডের ওপর মিলিত হচ্ছে অপর কারও তপ্ত ওষ্ঠ!

ঘুম ভেঙে যায়, কিন্তু লাগে সেই অসমাপ্ত রাত্রি, কিন্তু বোধ হয় তার ভোরের হাওয়া।

(আগামীবারে সমাপ্য)

সাহিত্য ও জাতীয়তা

শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু

সাহিত্য সেবায় সাহিত্য চর্চায় শিক্ষিত সম্প্রদায় যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, সাধারণে সাহিত্য হইতে সেরূপ আনন্দ লাভ করিতে পারে না। ইহার প্রধান কারণ সর্ব্বসাধারণের সাহিত্য উপভোগ করিয়া তাহার মধ্য হইতে সমস্ত রস গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে, একেবারেই সাহিত্য রসে বঞ্চিত এ কথা সুনিশ্চিত ভাবে ধরিয়া লইলে আমাদের ভুল করা হইবে। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় শিক্ষিত না হইলেও এমন বহু লোক আছেন যাঁহারা বহু শিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক সাহিত্য হইতে রস গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু শিক্ষিতদের এবং ইহাদের পৃথক করিয়া রাখিলেও আমরা দেখিতে পাই, সাহিত্য ও শিক্ষার অনুপাতে সত্যকার সাহিত্য রসগ্রাহীদের সংখ্যা আমাদের দেশে খুবই কম। এই কারণে দেখিতে পাই বাংলার সত্যকার সাহিত্য আজ সাহিত্য জগতের একটা শোচনীয় স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

সাহিত্যের এই শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করিতে গেলে বর্ত্তমানের পাঠক পাঠিকাদিগের নিয়া কিছু আলোচনা করিতে হয়, নচেৎ সত্যকার সাহিত্যের আজ এরূপ অবস্থা হইল কেন তাহা ঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। পানে আমরা পিছু ফিরিয়া চাহিলে দেখিতে পাই, ছাপাখানার সুলভতার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় সাহিত্য ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে আ-গাছা অর্থাৎ সাহিত্যের আ-গাছাও জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল, সেই সঙ্গে পাঠক পাঠিকাদিগের মনোবৃত্তিরও অবনতি হইতে লাগিল এবং সত্যকার সাহিত্যকে ভুলিতে লাগিল। এইরূপে অতি অল্পদিনের মধ্যেই অতীতকে পদদলিত করিয়া নানা বিদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জাতীয়তা ভুলিয়া এবং জাতীয় আদর্শকে তুচ্ছ করিয়া আমাদের বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে দেখা দিল উদ্দেশ্য এবং আদর্শ বিহীন ছ্যাবলামি। অবশ্য এই সাহিত্যকে একেবারে উদ্দেশ্যহীন বলা যাইতে পারে না, কারণ ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য, সাইকলজি ও সেক্সলজি লইয়া সমাজকে অন্ধ সংসার হইতে মুক্ত করা, কারণ অতি আধুনিকদের নিকট নাকি 'সাইকোলজি' ও 'সেক্স' অপেক্ষা আর কোন উচ্চ আদর্শ নাই যাহাকে বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে নির্ব্বিবাদে স্থান দান করিতে পারা যায়। এই কারণে আধুনিক সাহিত্যিকগণ "আর্ট ফর আর্ট সেক" ও বাস্তবতা লইয়া সত্যকার সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করিল। সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং সত্যেন দত্তকে আধুনিক পাঠক পাঠিকাগণ ভুলিতে লাগিল। এমন কি তাঁহাদের তুচ্ছও করিতে লাগিল। এমনি করিয়া আমাদের গত যুগের উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য অর্থাৎ "ক্লাসিক্যাল লিটারেচারে"র উপর ধূলো জমা হইতে হইতে আজ সেই পুরাতন সাহিত্য এমন স্তরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, তাহাতে সেই গত যুগের বড় বিখ্যাত সাহিত্যিকের সাহিত্য বর্ত্তমানের পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট একেবারেই অজানিত। কিন্তু আজ আমাদের বঙ্গ-সাহিত্য জগতের পাঠক পাঠিকাকে জিজ্ঞাসা করি গত যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিকদিগের সাহিত্যের সহিত

পরিচয় না হওয়াটা কি খুব অ-গৌরবের বিষয় নহে? এবং ইহা খুবই লজ্জার বিষয় নহে কি? আজকাল আমাদের বহু পাঠকবৃন্দকে ওদেশী কবি এবং সাহিত্যিকদিগের নাম উচ্ছ্বাসের সহিত করিতে দেখি, কিন্তু এই সকল সুশিক্ষিত পাঠক মহাশয়দের মুখে তাঁদের নিজেদের দেশের কোনও কবি বা সাহিত্যিকদের নাম আমরা কখন উচ্চারণও করিতে শুনিতে পাই না। এ জন্য আমি এই শ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তির শিক্ষাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারি না। আমরা দেখিতে পাই, অতীত সর্বদেশে সর্বজাতির নিকট চিরদিনই গৌরবময়। অতীত যদি গৌরবের হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই গৌরব যাহাতে চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার চেষ্টা জাতির করা কর্তব্য, আর অতীত যদি অগৌরবের হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই অতীতকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া সকলের দরকার সেই অগৌরবের কলঙ্ক ধৌত করিয়া দেশ ও জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করা; এই অতীত হইতেই জাতীয়তার সত্যকার উদ্ভব। ইটালী ও জার্মাণী জাতি তাহাদের অতীতকে স্মরণ রাখিয়াছিল বলিয়া পুনরায় তাহাদের জাতীয় পতাকা বিজয় বাদ্যের সহিত বিশ্ববাসীর চক্ষের উপর তুলিয়া ধরিতে পারিয়াছে। অতীতকে বিস্মৃত হইলে কোন জাতি আবার জাগিয়া উঠিতে পারে না এ কথা মৃত্যুর মত সত্য। তাই আজ আমাদের আধুনিক পাঠক পাঠিকাদিগের জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, আমাদের অতীত কি অপমানের, অগৌরবের? কিন্তু আমাদের অতীত কোনও দিনই অপমানের অগৌরবের নহে, যাহার লজ্জায় আজ সেই চিরস্মরণীয় অতীতকে স্মরণ করিতেও লজ্জা বোধ করিব।

হায়! আজ আমাদের সেই গৌরবময় অতীতকে এবং অতীতের সেই গৌরবময় সাহিত্যকে কয়জন মনে করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই গত যুগের প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিকই অতীতের জন্য তাঁহাদের সাহিত্যের পাতায় পাতায় অশ্রু বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন, কারণ তাঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক।

প্রকৃত সাহিত্য হইতেছে চিরন্তন সত্যের প্রতিচ্ছবি। সত্যকার সাহিত্য চিরদিনের, তাহা আজিকার নহে। আমরা আধুনিক সাহিত্য পাঠ করি, কিন্তু প্রাণের বাণী কোনও উপন্যাসে অদ্যাবধি পাই নাই, যাহা চিরদিনের তরে মনে রঙের পরশ বুলাইয়া দিয়া যাইবে। ইহা লইয়া বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া খুব অল্প সাহিত্যিকের নাম আমাদের মনে হয়। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ তাঁহারা না হইলেও বর্তমানের যে কোনও সাহিত্যিক অপেক্ষা গত যুগের সাহিত্যিকগণ বহু অংশে বড়। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় দুঃখ করিয়া বলিতে হয়:—

'আজ' 'কাল' দু'টী ভাই মরিতেছে জন্মিয়াই
কলরব করিতেছে কত,
নিশিদিন ধুলি প'ড়ে দিতেছে আচ্ছন্ন ক'রে
চিরসত্য আছে যেথা যত।

বর্তমানের পাঠক পাঠিকাদিগের যদি সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে সকলেই যাহা হউক কিছু বলিয়া খালাস পাইবার চেষ্টা করিবেন, কারণ বর্তমানে বোধ হয় কোনও পাঠক পাঠিকাই সাহিত্যের কি উদ্দেশ্য তাহা চিন্তা করিয়া গল্প, উপন্যাস বা কবিতা পাঠ করিতে বসেন না। কিন্তু বর্তমানের পাঠক-পাঠিকাগণ আধুনিক লেখকদিগের সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি—এই মনোভাব লইয়া লেখক মহাশয়দিগের লেখা পাঠ করিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে সকলেই বেশ ভালভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন আজিকার সাহিত্যে কোন উদ্দেশ্য নাই।

সাহিত্য জাতীয় জীবনের উন্নতির আলোকধারী পথ প্রদর্শক, এ কথা লেখক এবং পাঠক কাহাকেও ভুলিলে চলিবে না।
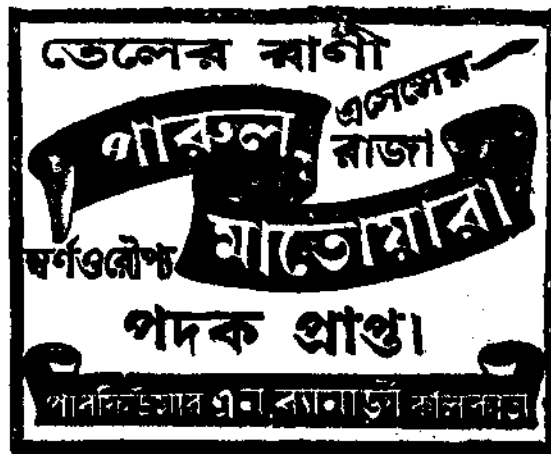
বর্ত্তমানের সাহিত্যিকগণ পাঠক পাঠিকাবৃন্দ এই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন বলিয়া সাহিত্যের একটা পতন সম্ভব হইয়াছে। সত্যকার সাহিত্য চিরন্তন সত্যের মত জাতীয় জীবনেরও প্রতিচ্ছবি, কিন্তু আজ আমাদের সাহিত্যে জাতীয়তার কোনও চিহ্ন আমাদের দৃষ্টিভূত হয় না। এই সকল সাহিত্যকে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া পাঠকবৃন্দের হস্তে প্রদান করিলে কেহ বুঝিতে পারিবে না উহা কোন দেশীয় সাহিত্য। বর্ত্তমানে বহু ব্যক্তি দেশ দেশ করিয়া, জাতীয়তার বুলি আওড়াইয়া, মা, মা বলিয়া চিৎকার করিতেছেন, বক্তৃতা দিতেছেন এবং "বন্দেমাতরমে"র জয়ধ্বনি করিতেছেন। কিন্তু আমরা সেই সকল দেশহিতৈষী-নামধারী নেতাদিগের আধুনিক সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং তাহাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি সেই বন্দেমাতরমের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ লইয়া কয়জন সাহিত্যিক আজ সাহিত্য গড়িয়া তুলিতেছেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুনীতি ও দুর্নীতি নামক দুইটা খুব বড় জিনিষ আছে, কিন্তু বর্ত্তমানের সাহিত্যিক ও পাঠকবৃন্দ এই নীতি জিনিষটাকে একেবারেই মানিতে চাহেন না, তাহারা বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও শিল্প বিচারের কষ্টি পাথর 'আর্ট' নামক জিনিষটার দোহাই দিয়া সাহিত্য ও শিল্প ক্ষেত্রে দুর্নীতির সংক্রামক বিষ ছড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু 'ভালগারিটি' যে আর্ট নহে এ কথা আজিকার এই কলাপ্রিয় জীবেদের কে বুঝাইবে। কিন্তু এই 'নীতি' না মানিবার পিছনে বর্ত্তমানের আধুনিক সাহিত্যিকদিগের ও তরুণ পাঠক-পাঠিকাদিগের যে কত স্বার্থ লুকাইয়া আছে তাহা প্রকাশ করিতে গেলেও লজ্জায় সঙ্কোচে লেখনী বন্ধ হইয়া যায়। এই স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাহিত্যিক মহাশয়গণ তথাকথিত সমালোচক মহাশয়দিগের দ্বারা তাঁহাদের সাহিত্যের গাত্রে 'আর্টে'র ছাপ মারাইয়া লইয়া অতি আধুনিক পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট হইতে যথাযোগ্য সম্মান লাভ করিয়া "সাহিত্যিক" বলিয়া আত্মপ্রসার লাভ করিতেছেন। কিন্তু ইহা সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বর্ত্তমানে এমন কেহ প্রতিভাবান ব্যক্তি নাই যিনি এর প্রতিবাদ করেন।

সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে ঐ সকল আবর্জ্জনা সরাইয়া ফেলিয়া সত্যকার সাহিত্যের পুনরুদ্ধারের বিশেষ দরকার। এখন কথা হইতেছে কি উপায়ে গত যুগের সাহিত্যিকদিগের সাহিত্য রস বর্ত্তমান যুগের তরুণ পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের মনে জাগাইয়া তুলিতে পারা যায়? এখন ইহার একটী মাত্র উপায় আছে যাহার দ্বারা এ কার্য্য করা সম্ভব হইতে পারে। তাহা আর কিছুই নহে, মাত্র নিয়মিতভাবে পুরাতন সাহিত্য লইয়া পত্র পত্রিকায় আলাপ আলোচনা করা। লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপ আলাপ আলোচনা বা সমালোচনা পাঠ করিয়া বহু পাঠকের মন পুরাতন সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহারা গত যুগের সাহিত্য পাঠ করিয়া বিশেষভাবে আনন্দ লাভ করিয়াছে। আশা করি, আমাদের অতীতকে শুধু কর্ত্তব্যজ্ঞানে নহে, ভালবাসিয়া ভক্তি করিয়া মনে রাখিতে চাহিবেন এবং যাঁহারা আজিও মনের গোপন কোণে অতীতের সুখ দুঃখের স্মৃতিকে জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন তাঁহারাই গত দিনের সাহিত্যকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন।

অভিনয়

(গল্প)

—শ্রীজীবানন্দ ঘোষ

বয়সের দিক দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চল্লেও, কেমন জানি, আমিই কেবল একমাত্র তাঁ'দের মধ্যে 'সেকেলে' অপবাদটা পেয়ে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করবার লোভে দিব্যি বিয়ে-টিয়ে করে' একাকার করে' ফেলেছি।

লেখা, মানে এই ধরণের লেখা জীবনে প্রথম লিখছি। টেলি'র কাগজে বাবার কাছ থেকে টাকা চেয়েছি লিখে, দেশের খবরাখবর নিয়েছি লিখে, আফিসে বিল সই করেছি লিখে, বন্ধুদের চিঠির উত্তর দিয়েছি লিখে, ছাত্রকে পড়াই তাও লিখে লিখে;—কিন্তু আজকের যে এইটুকু—এটি সম্পূর্ণ নতুন।

সেদিন সন্ধ্যে বেলা গোনা দশটা মিনিট অস্বস্তির সঙ্গে ষ্টেশন্‌এর এ-মোড় থেকে ও-মোড় পায়চারী করে' যখন সার্চ্চ লাইট্ আলা ট্রেণ খানার আবির্ভাবে একটু আনন্দচিত্তে ইন্টার-এর দরজাটা ধরে' টান্‌তে যাচ্ছি, এমন সময় কাণে এলো—'অমিয়বাবু, ও অমিয়বাবু!'

কয়টি অক্ষর সমাবেশে এই অত্যন্ত পরিচিত অমিয়বাবু কথাটি তৈরী। যে দিক থেকে শব্দটা এলো, সেদিকে চোখ ফেরাতেই দেখি একটি চেনা মুখ।

'আসুন না, এ-কামরায়!' সেই মুখ থেকে কথা ক'টা আবার বেরুলো অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে।

গেলুম। অনেকদিন আগেকারের দেখা মুখ। মুখটি হাস্‌লো, হাস্‌লুম আমিও। বল্‌লুম, 'এটা তো সেকেণ্ডক্লাশ। আমার টিকিট্‌ ইণ্টার-এর।'

'হোক্‌গে, আসুন!' মুখের অধিকারিণী তারপর দরজা খুলে আমাকে ভেতরে টেনে নিয়ে বল্‌লো, 'ভাড়া দেবো বেশী করে।'

মুখের অধিকারিটি পুরুষ নয় নারী; নাম লীলা।

উঠলুম রাণিং-এ। বললুম। বল্‌লুম মামুলিভাবে, 'ভালো তো? এদিকে—?'

'সোনারপুরে—মামার বাড়ীতে। যাক সে-কথা,' লীলা আনন্দে অস্থির: 'উঃ, ক'দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা অমিয়। তিনটি বছর!'

'তা' হ'বে বৈকি।' 'আপনি'কে আমিও দিলুম ছেড়ে। তিন বছরের আগের হ'লুম। বল্‌লুম, 'আমিও তোমাকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত লীলা। মাঝে-মাঝে-

'থাক, ও-মামুলি কথা!' লীলা বাধা দিয়ে অভিমানের স্বরে বললো, 'এই তিনটি-সাড়ে তিনটি বছর পরে দেখা হ'ল, তাও তো আবার এড়িয়ে যাচ্ছিলে টিকেট্‌ সম্বন্ধ করে।' পুরুষেরা ওই রকমই।'

অপরাধ নেই, তবুও অপরাধী বনে' গেলুম। চুপ করে' রইলুম।

একটু পরে লীলা বললো, 'অমিয়, তুমি ভুলে গেছো আমায়!'

ব্যথা পেলুম। যৌবনের প্রথম সাথী-রূপে পেয়েছিলুম লীলাকে। সংসারের আবর্ত্তে পড়ে' তা'কে সম্পূর্ণ করে' না ভুললেও, ভুলেছিলুম বটে। কিন্তু বললুম, 'সে কি তোমায় বন্ধু?'

'মিথ্যে কথা!' আহত হ'য়ে যেন বললো লীলা, 'নইলে, সেবারে তো যাচ্ছিলুম মরে'— একবার এলেনা।'

অজ্ঞাত সংবাদ; বললুম, সত্যিই আমি জানতুম না লীলা।'

'বেশ বেশ!' দেখলুম লীলার চোখে জল এসেছে: 'জেনেও দরকার নেই। পথে যেতে কুড়িয়ে পেয়েছিলে, পথেই তা'কে ফেলে গেলে। তা'তে কিছু না লাগতে পারে, কিন্তু সেই—সেই…' লীলা কেঁদে উঠলো।

লীলার কাছে এসে ওর মুখটা আমার বুকের ওপর চেপে ধরলুম সোহাগে। বললাম অপরাধীর মত, 'লীলা, ভুল বুঝোনা আমাকে! তোমাকে আমি সত্যিই প্রাণ দিয়ে ভালবাসতুম, কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

'কিন্তু তুমি যে সেই চলে' গেলে আর তোমাকে পাইনি। তারপরের ব্যথা…'

একটা ষ্টেশন-এ ট্রেণ থামলো।

রু উঠলো। লীলা বেশী ভাড়ার পয়সা-টা দিতে গেল; কিন্তু আমি দিতে দিলাম না, নিজেই দিলাম।

আবার ট্রেণ চললো।

'অমিয়' বললো লীলা, 'তিনটি বছর পরে আবার যে তোমাকে পাবো, তা' সত্যিই আমি আশা করিনি।'

'আমিও।' কথা না খুঁজে পেয়ে ওই 'আমিও' টুকু জুড়ে দিলাম।

খানিক পরে লীলা বললো জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে, 'মনে পড়ে অমিয়, সেই প্রতিজ্ঞার কথা?'

আঁৎকে উঠলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমরা দু'জনা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'ব। লীলার সিঁথির দিকে চেয়ে দেখলাম, সে বিবাহিতা নয়। কিন্তু আমি…আমি? আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছি। বললাম, 'মনে পড়ে লীলা।'

লীলা চুপ করে' রইলো।

উঃ, এই তিনটি বছর ধরে' লীলা আমার জন্য প্রতীক্ষা করে এসেছে। কিন্তু আমি কি করেছি এ? কেন আবার দেখা হল লীলার সঙ্গে! ওঃ! নিজেকে আমি অনেকখানি নীচু করে ধরলাম লীলার কাছে। বললাম মাথা নীচু করে, 'কিন্তু লীলা—

লীলা আমার মুখের দিকে তাকালো। বললাম আবার, 'আমাকে ক্ষমা করো লীলা,—আমি বিবাহিত।

'বিবাহিত। লীলার চোখ দু'টো দিয়ে সহসা যেন এক ঝলক আগুন বেরিয়ে আমার বুকে বিঁধলো। যন্ত্রণায় আমি ভেঙে পড়লাম।

লীলা তারপর আবার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বললো, আমি কি করবো তা হোলে?

আমি নীরব। খানিক ভেবে (আসলে ভেবে নয়) বলেই ফেললাম, 'আমি তোমাকে বিয়ে করবো লীলা। কোথা দিয়ে যে কি হোয়ে যাচ্ছে, তা সত্যিই আমার খেয়ালের বাইরে। দেখলাম, লীলার মুখে আনন্দের ছায়া পড়েছে। লীলা বললো একটু পরে, 'কিন্তু যা'কে গলায় জড়িয়ে ফেলেছো তার উপায়?'

'তার উপায়? বললাম, 'জানিনে। কিন্তু তোমাকে পেয়েছি যখন, ছাড়বার সাধ্য নেই আমার। ট্রেনের গতি গেল ফুরিয়ে। দাঁড়িয়ে পড়লো শেষবারের মত। লীলার হাত ধরে নামলাম। ষ্টেশন্-এর বাইরে এসে লীলা বললো, 'যাবে কোথায় এখন?

'যাবো? যাবো টিউশানির খাতায় হাজিরা দিতে। বললাম, 'কিন্তু তুমি—?

'হাওড়ায়। লীলা তারপর মিষ্টি একটু হেসে আবদারের সুরে বললো, 'চলোনা তুমি।

'আমি! টিউশানির খাতায় হাজিরার পরিবর্তে কুড়িটা চকচকে টাকার ছবি ভেসে উঠলো আমার সামনে। আবার একদিনের কামাইতেই 'চাকরী খতম্'—এ আশীর্ব্বাদ পেয়েছিলাম ছাত্রের পিতৃদেবের কাছ থেকে। কিন্তু এদিকে বন্ধু... যাকে,...মা থাকলো টিউশানি। বললাম, চলো।

লীলা আমার রকম দেখে বললো, 'ক্ষতি হবেনা তো কিছু?'

'ক্ষতি? স্বচ্ছন্দে বললাম, কিছু না।

ট্যাক্সি ভাড়া করা হোলো। দুজনে বসলাম গায়ে-গায়ে। লীলা কত অভিমান করলো, কত হাসলো, কত কাঁদলো। আমি সব ভুলে গেলাম। আমি যে পৃথিবীতে বাস কচ্ছি, সেই পৃথিবীতেই যে আমার স্ত্রী, আমার বাবা-মা আমার ওপর তাদের জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস নির্ভর করে বেঁচে আছে,—আমি তা ভুলে গেলাম; দেখলাম সেখানে কেবল আছি আমি আর লীলা। কি আনন্দ! যেন যুগ-যুগান্তর পরে আমার হারিয়ে-যাওয়া মাণিককে আজ খুঁজে পেয়েছি।......

ট্যাক্সি থামলো। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে নিয়ম-কানুন মেনে ষ্টেশন্-এ ঢুকলাম। একখানা ট্রেণ ইন্ করতে কিছু সময় বাকী। দেখলাম, আমাদের মত আরো কত লোক এসেছেন তাদের প্রিয় আত্মীয়-আত্মীয়াদের ট্রেণ থেকে নামাতে। কিন্তু আমরা? লীলার যে-হাতখানা আমার মুঠার মধ্যে ছিল সেটি উঁচু করে বললাম, 'কে আসবে লীলা?

'আসবেন...আসবেন একজন...কথা শেষ হলো না; ট্রেণ ইন্ করলো। সহসা লীলা আমার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভিড় ঠেলে ছুটলো। 'দাঁড়াও তুমি ওখানে অমিয়—আমি আসছি এই।'

...মিনিট সাতেক গেল উৎরে। লীলার পাত্তাই নেই।...হঠাৎ চোখে পড়লো দুটি স্ত্রী-পুরুষ একটু অপরূপ ধরণে চলে যাচ্ছে আমার সামনে দিয়ে। পুরুষটী হ্যাট্-কোট্ পরেছে;—যুবক এবং সুশ্রী।

'সত্যি, আপনার জন্যে—মেয়েটী হেসে কুটি-কুটি: 'কি ব্যস্তটাই না হয়েছিলাম। মামার বাড়ী থেকে একেবারে এক ছুটে এলাম এখানে।'

মামার বাড়ী থেকে! দেখলাম, মেয়েটীর মুখের দিকে। লীলা, না?

ঠিক সেই সময়টাতেই সেই যুবকটী হেসে লীলার মুখের কাছে মুখ এনে বললো, 'বিকজ্, ইউ আর মাই বিলাভেড!'

রাগে, ঘৃণায় মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত শরীর যেন জ্বলে উঠলো। কিন্তু, রেল-ওয়ে ঘড়িটার দিকে চোখ পড়তেই পেশাদার সংসারী শ্রীঅমিয় কুমার মিত্র তা'র রাগ, ঘৃণা সব চুলোর দোরে দিয়ে তাড়াতাড়ি ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এলো।

এখনও গেলে টিউশানিটা থাকতে পারে বোধ হয়।

আনিকজোড় সরেন-হার্ডি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অলিভার হার্ডি বলিতেছেন,—সিনেমার ম্যানেজার বিপদে পড়িল। আমি চাহিলাম নেপথ্য অন্তরাল হইতে গান গাহিবনা—আমি মঞ্চে চড়িয়া গান গাহিব। সে বলে, তাহা হয় কেমন করিয়া? কিন্তু শেষে আমি সম্মত হইলাম। গান গাইতে গাইতে গলা খুলিবে—সম্মতি দিবার ইহাই ছিল কারণ।

সিনেমার পর্দ্দার উপর রঙীন ছবি প্রতিফলিত হয়; অন্ধকার রঙ্গ-মঞ্চের একপাশে দাঁড়াইয়া আমি গান গাহিতাম। সে গান দর্শক শুনিত মন দিয়া—শুনিয়া মুগ্ধ হইত। তাদের মুগ্ধতায় এ তারিফ উপলব্ধি করিতাম। 'এনকোর'ধ্বনি উঠিত এবং দিনে দিনে আমি জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিলাম। প্রাণ খুলিয়া গলা ছাড়িয়া গান গাহিতাম।

এক রাত্রে গাহিয়া মহানন্দে সাজঘরে আসিলাম। আসিয়া দেখি, আমার আচার্য্য! আমি চমকিয়া উঠিলাম। আচার্য্য বলিলেন—তুমি নির্ব্বোধ! এমন খাসা গলা তোমার, তুমি সে গলা নষ্ট করিতেছ। তোমার কি উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই? আশ্চর্য্য! আমি তোমায় ছাড়িব না ভাবিয়াছিলাম—কিন্তু না, আর কোন আশা নাই। তোমার সঙ্গে আজ হইতে আমার কোন সম্পর্ক থাকিবে না।

এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, সশব্দে বাহির হইতে দ্বার দিলেন বন্ধ করিয়া। তারপর আর তাঁর দেখা পাই নাই।

এক বৎসরকাল সেই সিনেমায় আমি চাকরি করিলাম—'প্রোজেক্টর' সাফ করিতাম, টিকিট চেক করিতাম এবং প্রতি অভিনয়ে ষ্টেজের পাশে দাঁড়াইয়া গান গাইতাম।

এমন সময় একদল ভ্রাম্যমান অপেরা কোম্পানী আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিল। তাদের দলে যোগ দিয়া দেশে দেশে গান গাহিয়া বেড়াইলে মোটা মাহিনা দিবে। আমি এ চাকরি গ্রহণ করিলাম। আমার বয়স তখন আঠার বৎসর। আমি রোজগার করিতে লাগিলাম সপ্তাহে ষাট পাউণ্ড হিসাবে।

দু'চারি মাস কাজ করিবার পর গোলযোগ বাধিল। আমার সঙ্গে আর একজন গান গাহিত—সে ছিল কোম্পানীর একজন চাঁই। লোকটা বেসুরা গাহিত, আমি প্রতিবাদ তুলিলেই সে দারুণ কলহ বাধাইয়া তুলিত। বুঝিতেছিলাম, দু'জনে একসঙ্গে টিকিতে পারব না বেশীদিন—হয় সে, নয় আমি—একজনকে এ দল অচিরে ত্যাগ করিতে হইবে। কে চলিয়া যাইবে তাহা লইয়া সংশয় দ্বিধা চলিয়াছে, এমন সময় একদিন যেমন আমি বলিলাম—সে বেসুরা গাইতেছে! সে চোখ রাঙাইয়া ভয় দেখাইল ছুরি মারিবে। এ ব্যাপার চূড়ান্ত—আমি দল ছাড়িলাম। এ ঘটনা ঘটিল জ্যাকসন ভিলার গ্রাণ্ড থিয়েটারে। আমি ভাবিতেছিলাম, এখন কি করিব?

একজন অপরিচিত বিদেশী ভদ্রলোক আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিলেন, বলি-

লেন, তিনি সুচিন ফিল্ম কোম্পানীর তরফ হইতে আসিয়াছেন। আমায় প্রশ্ন করিলেন --ছবিতে অভিনয় করিবে? কি জানি, কেন, আমি বলিলাম,--করিব। ভাবিলাম চিত্ররাজ্যে 'ষ্টার' হইব! তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

তারপর ষ্টুডিয়োতে আসিয়া দেখি, এ এক অদ্ভুত রাজ্য। আমাকে দিল ভিলেন-এর ভূমিকা। বারে বারে আমার ফন্দী অভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়া যাইবে—এবং আমি কাদায় পড়িব প্রতিবার। ছবি তোলা হইতেছিল মুক্ত বাতাসে- ছবির গল্প ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর. হইতেছিল। এখানে সেখানে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম- ছবি তোলার কাজে। যত কিছু দৃশ্যপট ও আসবাব সরঞ্জাম আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত।

এক সপ্তাহ কাজ করিবার পর মাহিনা পাইলাম—লেফাপায় মোড়া। লেফাপা খুলিয়া দেখি, মাত্র পাঁচ পাউণ্ড। পূর্ব্বে মাহিনা পাইতেছিলাম, সপ্তাহে যাট পাউণ্ড হিসাবে- আর এখন মোটে পাঁচ পাউণ্ড; মন বিশ্রী বিরাগে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি? কোথায় চাকরি খুঁজিয়া হা হা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব। অগত্যা কোন মতে সেই সিনেমায় চাকরি লইয়া পড়িয়া রহিলাম। ভাবিলাম, আজ এটা কাল ওটা ধরিয়া ছুটাছুটী করিলে কোনটাতেই কিছু হইবেনা। দেখা যাক—সিনেমায় কোন উন্নতি ঘটে কিনা।

দিন কাটিতে লাগিল—যথা পূর্ব্বং তথা পরম্। একঘেয়ে ভাবে কাজ চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে নৈরাশ্যব্যথায় পীড়া বোধ করিতাম।

শেষে সুদিন দেখা দিল—ষ্টান লরেলের সঙ্গে মিলন। লরেলকে পাইয়া মনে হইল ভাগ্যে ষ্টুডিয়ো অবলম্বন করিয়া পড়িয়াছিলাম!

*

নিউ জার্সির আতলান্তিক সিটির কথা—আমি তখন পুরান লুবিন কোম্পানীর ষ্টুডিয়োয় ফিল্মের কাজে ঢুকিয়াছি ১৯১১ খৃষ্টাব্দ, হলিউডের নামও তখন বিশ্বের অবিদিত। অবস্থা আমার বেকারের মত। আজিকার দিন চলিয়া গেলেও কাল অদৃষ্টে কি ঘটিবে, তার কোন স্থিরতা নাই, এমন।

রেমণ্ড ম্যাকী নামে আর এক জন অভিনেতা আমার সঙ্গী ও সহচর। দু'জনে কোনমতে ১৮ পাউণ্ড সঞ্চয় করিয়া নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম ভাগ্যের সন্ধানে। আতলান্তিক সিটি হইতে নিউ-ইয়র্ক ১১০ মাইল দূরে অবস্থিত। পথের খরচেই দশ পাউণ্ড গেল নিঃশেষ হইয়া।

অবশেষে নিউইয়র্কে পৌছিলাম। নিজেদের লগেজ পিঠে বহিয়া ঘুরিয়া বেড়াই—অবশেষে ৪৪নং ষ্ট্রীটে একটা কামরা পাইলাম, ভাড়া সপ্তাহে আট শিলিঙ।

আস্তানা মিলিবার পর চাকরীর সন্ধানে বাহির হইলাম। নিত্য এ দ্বারে ও দ্বারে গিয়া দাঁড়াই। চাকরী মেলে না। আমি অধীর হইলাম। ম্যাকী বলে--ধৈর্য্য হারাইও না। আমি বলিলাম—আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিব—তারপর যে দিকে দু'চোখ যায়, সরিয়া পড়িব।

দু'দিন পরের কথা। রাত্রিকাল। ঘুমাইতেছি। সহসা পাশের কামরায় চীৎকার ও গোঙানি শব্দ—ঘুম গেল ভাঙিয়া। জাগিয়া উঠিয়া দেখি, আর একজন ভাড়াটিয়া তার স্ত্রীকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

ব্যাপার দেখিয়া পরদিন প্রাতে আমি লগেজ লইয়া ফ্লোরিডা যাত্রা করিলাম।

সেখানে একটা ঔষধের বিজ্ঞাপনী প্রচারের তরফে পথে পথে অভিনয় ভঙ্গিমায় বিজ্ঞাপন প্রচারের চাকরী জুটিল। ভঙ্গী অভিনয়ে লোক জড় করিয়া তাদের কাছে ঔষধ-বেচা—উহাই ছিল আমার ডিউটি।

এক দিন মাথায় জাগিল নূতন আইডিয়া। পূর্ব্বকালে ছবির আড়ালে যে গান গাহিতাম—ভাবিলাম, চলচ্চিত্রে তেমনই গানের সাহায্যে বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করিলে মন্দ হয় না।

সে সময় জার্ম্মাণ যুদ্ধ চলিয়াছে পুরা দমে—থিয়েটারগুলায় যুদ্ধের বার্ত্তা দেখান হয় তুতিন রীলের ছবির মারফৎ। একজন থিয়েটার-ম্যানেজারের কাছে গিয়া বলিলাম, যুদ্ধের ছবি যখন দেখাইবে, তখন নেপথ্য হইতে আমি তার ব্যঞ্জনার গান গাহিব। সে বলিল—মন্দ কি!

আমি চান্স পাইলাম। এ ব্যাপার সাফল্যমণ্ডিত হইল, এবং আমরা টুরে বাহির হইবার সঙ্কল্প করিলাম।

বাহির হইবার পূর্ব্বক্ষণে বন্ধু ম্যাকীর পত্র পাইলাম। লিখিয়া জানাইয়াছে—সেখানকার এক ফিল্ম-কোম্পানীতে ম্যাকী চাকরী পাইয়াছে—দৃশ্যমালায় অভিনয় করিবার জন্ত। আমার জন্ত সে ভূমিকাভিনয়ের চাকরী সংগ্রহ করিয়াছে—ভাল ভূমিকা পাইব।

এ চিঠি পাইয়া আমি নিউইয়র্ক যাত্রা করিলাম। ভাবিয়াছিলাম, বেশ ভালো পার্ট মিলিবে, কিন্তু গিয়া দেখি, ছবিতে কমিক রিলিফ দিবার জন্ত আমাকে দেওয়া হইয়াছে তাদের

ভূমিকা। শুধু কৌতুকরসের ভূমিকা নয়, নেহাৎ ভোতা ভাড়ামি। মনে দুঃখ হইল। পাঁচজনে বলিবে সঙ! কিন্তু উপায় কি? নামিয়া পড়িলাম। আর কোন কোম্পানীতে সুযোগ দিবে না। আমার ভূমিকা ছিল দাড়িওয়ালা লোক, পাঁচজনে আসিয়া আমার দাড়ি টানিতেছে। আমি নকল দাড়ি মুখে আঁটিলাম শিরিষের আঠা দিয়া। এমন আঁটিয়া বসিল যে, অভিনয় চুকিলে দাড়ি তুলিতে গিয়া দেখি, গালের চামড়া খসিয়া উঠিয়া আসে।

তবে ইুডিয়োর ফিল্ম-সম্বন্ধে নানা রহস্য শিখিলাম। শিক্ষানবিশীর যুগ কাটিলে আমি স্থির করিলাম, হাস্যরসের পালা অভিনয় করিব।

এ সময় কার্তু্ন নায়ক হিসাবে ল্যারি সোমলের খুব খ্যাতি ছিল। পশ্চিমাঞ্চলে হলিউড নামে এক অখ্যাত স্থানে ল্যারি সোমলে চলচ্চিত্র তৈয়ার করিত। তার কাছে চাকরী চাহিয়া পত্র লিখিলাম। উত্তরে চাকরী লাভ করিলাম।

যে দিন সেখানে যাইবার কথা—তার পূর্বদিনে সারারাত্রি ধরিয়া এখানকার ছবি তোলা হইতেছিল—শেষরাত্রে বর্ষাক্ত কলেবরে বাসায় আসিয়া ঘুমাইলাম। প্রাতে শরীর এমন দুর্বল অবসন্ন যে, নড়িতে পারি না। আমি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিলাম না! ল্যাণ্ডলেডি ভাবিল, আমি বিশ্রাম উপভোগ করিতেছি—কাজেই সে আমার ঘুম ভাঙাইল না!

এক জন বন্ধু দৈবাৎ আসিয়াছিল দেখা করিতে—আমার অবস্থা দেখিয়া সে ডাকিয়া আনিল ডাক্তারকে। ডাক্তার দেখিয়া বলিল আমার নিউমোনিয়া হইয়াছে! চিকিৎসা চলিল। কাজেই ল্যারি সোমলের কাছে দেখা দিতে পারিলাম না! ভাগ্যে যাই নাই—গেলে এ জীবনে বন্ধুবর ষ্টান লরেলের সঙ্গে দেখা হইত না!

*

এবারে আবার ষ্টান লরেলের কথা শুরু করি। ষ্টান লরেল বলিতেছেন,—প্যাণ্টোমাইমের দলে যোগ দিয়া নানা স্থানে গান গাহিয়া বেড়াইতেছিলাম। তারপর যোগ দিলাম আমেরিকার এক ভ্রাম্যমান নাট্য সম্প্রদায়ে। তারা তখন রিহার্শাল দিতেছিল 'এ্যালোন ইন দি ওয়ার্ল্ড' নামে এক খানি মেলোড্রামা। নামটার বেশ চমক আছে। আমার বয়স তখন পনের বৎসর; আমি সে বয়সে ঘর ছাড়িয়া পথকে করিআশ্রয়।

নাক দিয়া কথা কহিয়া আমাকে সাজিতে হইবে "টাইপ আমেরিকান"; সে বিদ্যাটা আমার আয়ত্ত করা ছিল। মনে মনে তার সঙ্গে আরও দু'চারিটা আইডিয়া জুড়িয়া দিলাম।

এ নাটিকার প্রথম দৃশ্য ছিল—এক দল কালা আদমী নেপথ্য হইতে গান গাহিবে, পটে থাকিবে নদী। কিন্তু ষ্টেজে নদীর নূতন দৃশ্যপট না আঁকিয়া ভাড়া করা নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিন ব্রিজের ছবি খাটান হইল। আমি সে দৃশ্যপটের পানে চাহিয়া দেখি নাই। আমাদের দর্শকরাও দেখে নাই তাই কোন পক্ষে বিরোধ ঘটিবার হেতু ছিল না এবং কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই।

নাটিকার শেষ দৃশ্য ছিল—মস্ত বড় ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া গিয়াছে - সাধারণ লোক ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ব্যাঙ্কের সামনে ক্যাশিয়ারের পিঠের ছাল তুলিয়া লইবার জন্য। কিন্তু এত ভিড় কোথায় পাইব? আসলে মঞ্চে নামিল ভিড়ের স্থলে পাঁচজন মাত্র লোক এবং ভিড়ের কোলাহল তোলা হইল নেপথ্য হইতে দলের সকলে চেঁচামেচি করিয়া।

একদা অভিনয় রাত্রে মঞ্চোপরি এই সাজা দল চীৎকার করিল—আমাদের টাক

ছায়া ও কায়া

—লাইট ম্যান—

নিউ থিয়েটার্স

সম্ভবতঃ বড়দিনের সময় নিউ থিয়েটার্সের নূতন বাংলা ছবি 'মায়া' চিত্রায় মুক্তিলাভ করবে। ১৯শে ডিসেম্বরও ছবিখানি মুক্ত হতে পারে। শ্রীযুত প্রমথেশ বড়ুয়া 'মায়া' পরিচালনা করেছেন এবং এতে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—পাহাড়ী সান্যাল, যমুনা, সিতারা, কৃষ্ণচন্দ্র দে, বোকেন চট্টোঃ, আজুরী প্রভৃতি। শ্রীযুত বিমল রায়, বাণী দত্ত ও রাইচাঁদ বড়াল যথাক্রমে আলোকচিত্র, শব্দ ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন।

এঁদের ১নং ষ্টুডিয়োতে নূতন একটী সাউণ্ড ষ্টুডিয়ো নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হয়ে এল। এই ব্যবস্থায় এরা এক সঙ্গে চারখানা ছবি তুলতে পারবেন। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এই নতুন ষ্টুডিয়োতে কাজ সুরু হবে। শব্দ গ্রহণের সুবিধার জন্ত একটী 'সেন্ট্রাল সাউণ্ড বুথ' তৈরী করা হয়েছে, যাতে করে প্রধান শব্দযন্ত্রী বিভিন্ন ইউনিটে তোলা ছবির শব্দ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

ষ্টুডিয়োতে এরা দুটী টেনিস লন তৈরী করেছেন। বিশ্রামের সময় টেকনিসিয়ানরা এবং আর্টিষ্টরা এখানে আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। নিউ থিয়েটার্স কর্ত্তৃপক্ষ তাদের প্রতিষ্ঠানকে সর্ব্ব বিষয়ে আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার জন্ত সর্ব্বদা যত্নবান।

শ্রীযুত নীতিন বসুর পরিচালনায় অগ্রসর হচ্ছে। দিদির কাহিনী অতি মনোরম—'সংসারে আপন বলিতে তাহারা দুই বোন, মাতার মমতা, পিতার ভালবাসা একাই সব কিছু দিয়া কনিষ্ঠকে মানুষ করিল দিদি। কিন্তু একদিন দুই বোনের মাঝে আসিল এক পুরুষ। দুই বোন তাহাকেই ভালবাসিল। হইল প্রতিদ্বন্দ্বী। কামনা, বৈরাগ্য সব কিছুর অপনয়ন হইল কিসে?'

দুই বোনের একটি পুরুষকে ভালবাসার দৃশ্যগুলি নীতিন বাবু খুব কৌশলের সঙ্গে তুলেছেন। তাঁর অভিনেতা অভিনেত্রীগণ সবাই মন দিয়ে কাজ করছেন। সে দিন ভানু ব্যানার্জ্জী ও লীলা দেশাইকে নিয়ে নীতিন বাবু বেঙ্গল কেমিক্যালে কারখানার একটী দৃশ্য তুলে এলেন।

দিদির হিন্দী সংস্করণে সায়গল, কমলেশকুমারী, লীলা দেশাই, জগদীশ, কাপুর, নবাব, বিক্রম নাহার এবং বাংলার সায়গল, চন্দ্রাবতী, লীলা দেশাই, ভানু বন্দ্যোঃ, অমর মল্লিক, দুর্গাদাস, ইন্দু মুখোঃ প্রভৃতি অভিনয় করছেন।

হেমচন্দ্রের পরিচালনায় 'অনাথ আশ্রমে'র কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে—কিন্তু শ্রীমতী উমাশশীর অসুস্থতার জন্ত সম্প্রতি চিত্র গ্রহণ স্থগিত আছে। কালী পূজোর দিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাজী পোড়ানো দেখবার সময় একটা তুবড়ী এসে তার কপালে লেগে তিনি আহত প্রফুল্ল রায় তাঁর ছবির আনুষঙ্গিক কাজ শেষ করে ফেলেছেন, ষ্টুডিয়ো খালি পেলেই কাজ আরম্ভ করে দেবেন।

পরিচালক বড়ুয়া তাঁর পরের ছবির জন্ত প্রস্তুত হচ্ছেন। জানুয়ারীর প্রথম থেকেই ইনি ছবি তুলতে আরম্ভ করবেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্

শ্রীমতী ছায়া দেবী ও শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে পরিচালক দেবকী বসুকে পুনরায় সম্মানিত করা হয়েছে। অহীন্দ্র চৌধুরী ও ছায়া দেবীর অভিনয় নৈপুণ্য এবং দেবকী বাবুর পরিচালনা কৌশলের জন্ত উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী মিঃ ডি, পি, ঘোষ তাঁহাদিগকে তিনখানি নিরেট স্বর্ণ পদক পুরস্কার দেন। গত রবিবারে উত্তরার সন্ধ্যা বেলা এই পুরস্কার বিতরিত হয়। অহীন্দ্রবাবু নাট্যনিকেতনে অভিনয়ে নিয়োজিত থাকায় স্বয়ং উপস্থিত হয়ে ঐ পদক গ্রহণ করতে পারেন নি। দেবকী বাবু এবং ছায়া দেবী স্বয়ং উপস্থিত থেকে ঐ পদক গ্রহণ করেন।

সোনার সংসার

সোনার সংসারের ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তার কিছুমাত্র হ্রাস ঘটে নি। সুতরাং নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, ছবিখানি আরো বহুদিন উত্তরার পর্দ্দা অধিকার করে থাকবে।

কালী ফিল্মস্

গুণময় বাড়ুয্যের 'পরভৃতিকা'র চিত্র গ্রহণ বেশ এগিয়ে চলেছে। দেখা যাক্, কেমন হয়।

সুশীল মজুমদার এইবার 'মুক্তি স্নানে' নেমেছেন। সবে ছবি খামা আরম্ভ হয়েছে। শিল্পী নির্ব্বাচন এখনও সম্পূর্ণ হয় নি।

তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী 'বামনাবতার' ও

'হারানিধি' নামে দুখানা ছবি এক সঙ্গে তুলবেন। তিনি প্রাথমিক কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

জ্যোতিষ মুখার্জ্জি 'খনার' চিত্র নাট্য তৈরী করছেন।

রাধা ফিল্মের "বিষবৃক্ষ"

ভালো ছবির চাহিদা বাজারে আছে। বড়দিনে উত্তর কলিকাতার যে সকল নাম করা ছবি আসছে তার মধ্যে রাধা ফিল্মের আগামী আলেখ্য বঙ্কিম চন্দ্রের বিষবৃক্ষের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

ছবি খানি সব দিক দিয়ে উপভোগ্য হবে আশা করা যায়। এতে অভিনয় করেছেন—কানন বালা, শান্তি গুপ্তা, মীরা দত্ত, রেণুকা রায়, জহর গাঙ্গুলী, ভূপেন রায়, কুমার মিত্র, তারক বাগচী, জানকী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। সঙ্গীত রচনা করছেন—শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী। আলোক শিল্পীর কাজ করেছেন শ্রীযুক্ত বীরেন দে—শব্দ ধারণ করেছেন—শ্রীযুক্ত নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ। সুর সংযোজনা করেছেন শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশ ভাদুড়ী। শ্রীযুক্ত ফণী বর্ম্মা পরিচালক হিসাবে—অনেক নূতন কিছু চিত্র রাজ্যে দান করবেন—এইরূপ শোনা যাচ্ছে। চিত্রখানি রূপবাণীতে প্রদর্শিত হবে এবং এর পরিবেশনের ভার নিয়েছেন—প্রাইমা ফিল্মস লিঃ।

আলিবাবা

শ্রী ভারত লক্ষ্মী ষ্টুডিয়োতে শ্রীযুত মধু বসুর পরিচালনায় এদের নৃত্য গীত বহুল 'আলিবাবা'র চিত্র গ্রহণ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। সম্ভ্রান্ত বংশীয় নরনারীরা এতে অংশ গ্রহণ করেছেন। ছবিখানি বড় দিনের সময় সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়।

পূজোর ছুটীর আগে

শ্রীদীপ্তি রাণী মজুমদার

পূজোর ছুটীর আগে
তরুণের দল পাশ দিয়ে ঘোরে
সুগভীর অনুরাগে!
'লেকচারে' আর ওঠেনাকো মন,
মোর পানে প্রায় সকল নয়ন
বেদনার ভারে বাঁকা হয়ে থাকে
কি গভীর তার ভাষা
কলেজ শেষেও উঁকি মেরে দেখা
মেটেনাকো তবু আশা!
এতো কি যে দেখে ভেবে পাই নাকো
হাসি শুধু মনে মনে
কত ব্যথা হায় বাজিবে এদের
আমার অদর্শনে!
এখনি ইহারা মোর দেখা পেতে
হাওয়া করে যায় বালীগঞ্জেতে
না জানি ছুটীতে কি হবে এদের;
সত্যি দুঃখ লাগে,
তাই আজ হতে যাব নাকো ক্লাশে
পূজোর ছুটীর আগে।

দেবদত্ত ফিল্মস

শ্রীযুত তড়িৎ বসু 'ইন্দিরা'র প্রাথমিক কাজ শেষ করে ফেলেছেন—এইবার দিন দেখে শ্যুটিং আরম্ভ করে দেবেন। প্রকাশ, ছবি বিশ্বাস ও শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তা এই ছবির নায়ক নায়িকা সাজবেন।

পণ্ডিত মশাই

আমরা গত শনিবার প্রাতে 'শ্রী'তে ট্রেডশোয় উপস্থিত হয়ে পপুলার পিকচার্সের নূতন বাংলা চিত্র 'পণ্ডিত মশাই' দেখে এসেছি। ছবিখানি আমাদের ভালো লেগেছে। ফটোগ্রাফী ও রেকর্ডিং ভাল হয়েছে। অভিনয়ও সবাই ভাল করেছেন—বৈরাগীর গান সবাইকে মুগ্ধ করেছে। আমরা আগামী সপ্তাহে ছবিখানি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করব।
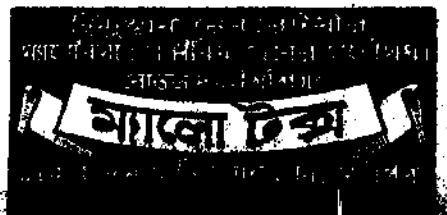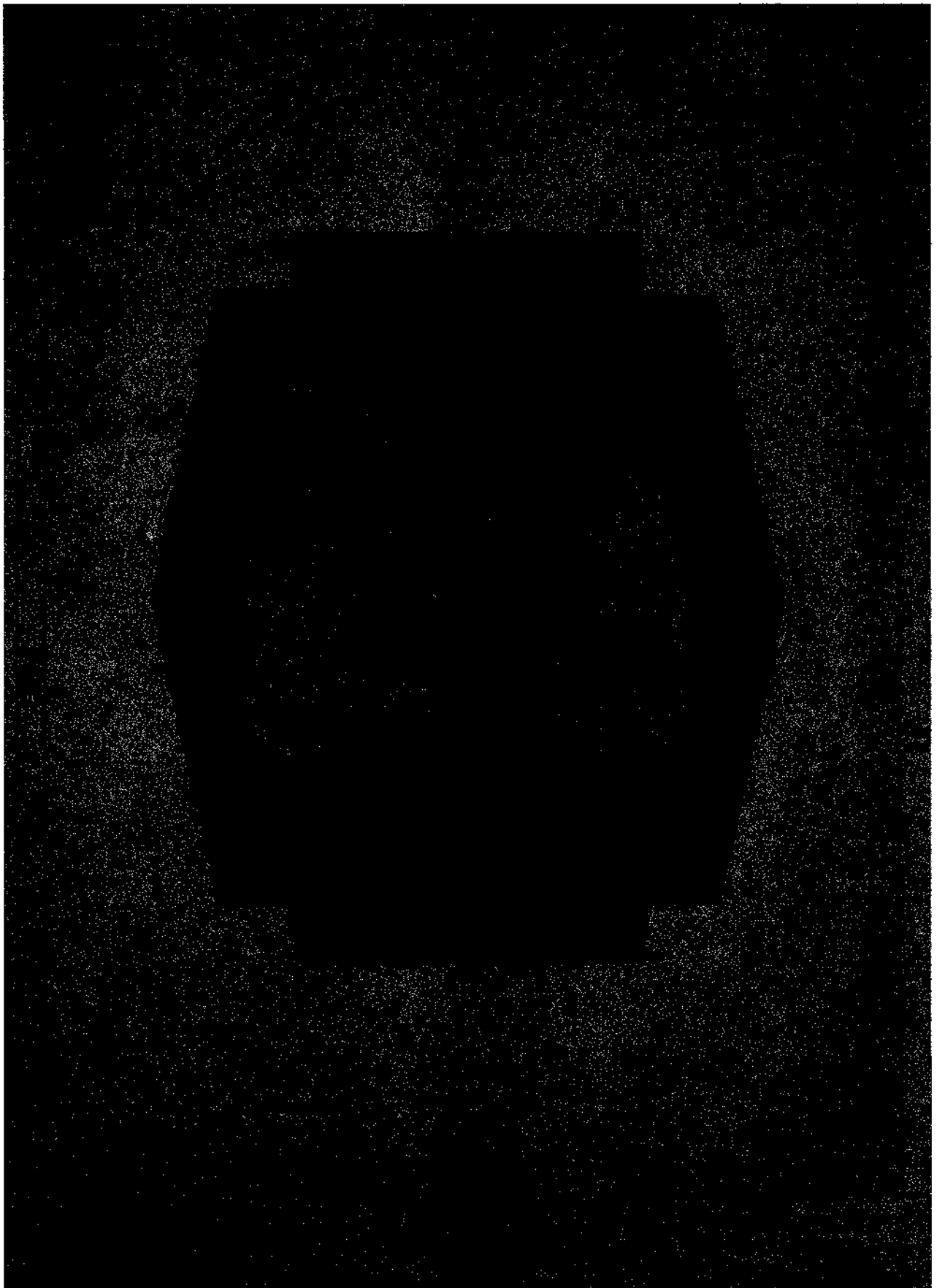
সচিত্র সাপ্তাহিক
দ্বিতীয় বর্ষ—৪২শ সংখ্যা
শুক্রবার—২৫শে অগ্রহায়ণ
১৩৪৩
১১ই ডিসেম্বর—১৯৩৬

হৃদয়ের দাবী

সে আজ অনেক দিনের কথা। ফ্লোরেন্সের রাজপথ দিয়ে চলেছে এক অশ্বারোহী যুবক—মুখে তার তারুণ্যের দীপ্তি, বাহুতে অমিত বীর্য্য—সারা অঙ্গে যৌবনের উচ্ছ্বসিত লাবণ্য। চলার পথে তরুণের দৃষ্টি পড়লো পাশের অলিন্দে এক অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণীর আধ-ফোটা গোলাপের মত সুন্দর মুখচ্ছবির প্রতি। তরুণীও প্রেমবিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তরুণের পানে—আঁখি তার নিষ্পলক। শিরায় শিরায় খেলে গেল যৌবনের রক্তরাগের হোরী খেলা। প্রথম দৃষ্টিতেই হ'লো দুজনের প্রণয় সৃষ্টি। কিন্তু তাদের মিলনের পথে প্রতিবন্ধকতা এলো তরুণীর দিক থেকে—কারণ সে আর একজনের বিবাহিতা।

তবু প্রণয়-দেবতা তাঁর ফুলশর সম্বরণ করলেন না। অশ্বারোহী তরুণ নিত্য যায় সহরের সেই পথ দিয়ে তার মানসীকে দেখার ব্যাকুলতায়, আর তরুণীও তার উন্মুখ অন্তর নিয়ে অলিন্দে দাঁড়িয়ে থাকে মিলনের সেই শুভ মুহূর্ত্তটীর প্রতীক্ষায়। দু'জনেই ভাবে মিলনের পথে এই যে মানুষের সৃষ্টি বাধা, এ বাধা তারা মানবে না। মানুষের রচা বিধি নিষেধের আগল ভেঙে একদিন তারা বাইরে বেরিয়ে এসে তাদের এ প্রেমের স্বপ্নকে করে তুলবে সার্থক। এই স্বপ্নেই দুটী বিরহী অন্তর থাকে বিভোর হয়ে পরস্পরের নিশীথ শয়নে। প্রভাতের আলোয় তাদের স্বপ্ন ভেঙে যায় তাকে সার্থক করে তোলবার সঙ্কল্পের আঘাতে। কিন্তু স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই হয়ে যায়, সার্থক আর তা হয় না।

এমনি করে কত মাস বর্ষ গেল কেটে। স্বপ্ন তাদের টুটলো না বটে, কিন্তু যৌবন গেল টুটে। যৌবনের সে মাদকতা, সে আগ্রহ গেল প্রৌঢ়ত্বের চাপে স্তিমিত হয়ে। যৌবন ফুরুলেও যৌবনের এই প্রেমের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখবার জন্তে তরুণী তৈরী করালেন অলিন্দে প্রিয়তমের আশায় প্রতীক্ষমানা তাঁর পাষাণ প্রতিমা, আর তরুণও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নির্ম্মাণ করালেন অশ্বারোহী বেশে তাঁর মর্ম্মর মূর্ত্তি। প্রেমের স্বপ্ন এদের যে সার্থক হতে পারে নি সে শুধু তাদের অবসাদে—হৃদয়-দৌর্ব্বল্যে।

সম্রাটের বিবাহ নিয়ে আজ ঠিক এমনি সমস্যারই সৃষ্টি হয়েছে। তরুণ-তরুণীর প্রেমের স্বপ্ন সার্থক হয় নি তাদের মনের অবসাদ আর হৃদয়-দৌর্ব্বল্যে। আর মিলনোন্মুখ দুইটী প্রেমিক হৃদয়ের মিলনের পথে আজ অন্তরায় সৃষ্টি করেছে বৃটেনের মানুষের রচা আভিজাত্য গর্ব্ব। একদিকে হৃদয়ের দাবী, অন্যদিকে এই আভিজাত্যের প্রাণহীন দম্ভ—এ দ্বন্দ্বের মীমাংসা কে জিতিবে, সমগ্র বিশ্ব আজ সেই উত্তরেরই প্রতীক্ষা করে।

চাতিম চাতিম

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

প্রেমের ফাঁদ পাতা
ভুবনে!
কে কোথা ধরা পড়ে
কে জানে!

কবি রবীন্দ্র নাথ যখন কাঁচা বয়সে এ কথা লিখেছিলেন তখন দেশপ্রেমে ভোটের জন্ম হয় নি। তখন কি কবি জানতেন আদি রসের বাজারের দেশে পলিটিক্সের বাজারে তাঁর এই অমর বাণী এমন করে এপ্রোপ্রিয়েট হয়ে খাটবে? আজ কত "খ্যাঁদা বাঁচুক রায় বাহাদুর" অবধি রায়-বোসী তকমার জোরে কংগ্রেস টিকেটে দাঁড়াচ্ছেন, তবু আট জনের বেলায় এই রায় বোসী রায় বাঁশ চিড় খেয়ে দু'ফাঁক হয়ে গেল। কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্॥

* * *

শুধু কি দেশ প্রেমের বেড়া জালে ধরা পড়া? ধরা যাঁরা পড়ছেন তাঁরা তো তরে যাচ্ছেন, আর যাঁরা না পড়ছেন তাঁদের

"গরব গেঁথ হায়
দু'দিনে টুটে যায়
সলিল বহে যায়
নয়নে!"

তাঁরা চটে মোটে বলছেন এবার জোরে উঠে যাঁর মুখ প্রথম দেখবেন তাঁরই খাতায় নাম লেখাবেন। তাঁদের অন্তরস্থ মহাপ্রাণী বড় দুঃখেই কেঁদে কেঁদে বলছে—

"প্রেম যদি গো শিখতে হয়
মানুষেরই কাছে নয়।"

আদি রসের বাংলা দেশ দেশপ্রেমের হাসাকাঁদার নাগর দোলা সম্বন্ধে একদম্ ওয়াকিব হাল ছিল না, এতে যে কতখানি হাঁকচ্ প্যাঁকচ্ করতে পারে—নাগরীর পিরীতকেও লজ্জা দিয়ে, তা জানা থাকলে অনেক হোমরা চোমরা শিক্ষিত অভাজনের আজ নাস্তানাবুদ হবার লজ্জায় এতখানি রাশ করতে হতো না।

* * *

"গাছে তুলে মই কাড়া" থেকে উনপঞ্চাশ রকম ট্রিক ও চাল যেখানে অহরহ বাহাল তবিয়তে চলছে, বন্ধুকে বিবস্ত্র করা যেখানে মহা পুণ্য কার্য্য এবং প্রতিপক্ষের চরিত্রে পুরীষ নিক্ষেপ যেখানে ভারত-মাতার সুসন্তানেই করে থাকে, সেখানে ভদ্রলোকের গতিবিধি ক্রমশঃ দুঃসাধ্য হয়ে আসছে।

কে জানে লো সই দেশের পিরীতে
কেমনে বিছুটি এলো?
দেশের লাগিয়া চুলকায়ে পাড়া
কাঁদিয়া জনম গেল।

এই হয়েছে ভোটের বাজারে হরেক রকম প্যাট্রিয়টের অবস্থা!

* * *

নেতারা সব নিজ নিজ পেট্রল ভ্যানে উঠে পড়ে লেগে গেছেন; তাঁদের দলবলে দেশ মাতার শ্রাদ্ধ করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই, কারণ ভোটাভুম মানেই পার্টি-পলিটিক্সের মেড়ার লড়াইয়ের আখড়া।

"একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন
মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।"

এ কথা সুন্দরের মুখে সাজে, পলিটিকাল বাঁকা শ্যামের মুখে অচল। কারণ পলিটিক্সে কিছুই রেক্ করা যাবে না,—না রাইভালের চরিত্রকে, না, লোক্যাল মিলিটারীর আনুস্ট্যাটিস্‌ক্যাম্বেরী কন্‌ষ্টিটিউশনকে। সুতরাং সকলেই দেশপ্রেমের খ্যাপলা জাল হাতে সাঙাৎ আহরণে ভোটের এবং কংগ্রেস টিকেটের ট্রাবল্ড ওয়াটার্স এ নেমেছেন। সকলেরই সঙ্গে আছে—

"চু চোর গোলাম চামচিকে
তার মাইনে চোদ্দ সিকে।"

এই চৌদ্দ সিকের গোলাম গুলিকে না হলে কোন দেশোদ্ধার, কোনও স্বরাজ সাধন সম্ভব নয়; তাঁর ধর্মরূপী কুম্ভকে

না দিয়ে যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করেন নি ভোট পলিটিক্সেও তেমনি "অভূত্যং ধর্মমাচরেৎ"। গ্যাং পলিটিক্সের স্বরূপই এই, সাইবিরিয়ার ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের মত ভোটের বাজারে নেতারা দল বেঁধে প্রতিপক্ষ বধরূপ পুণ্য কার্য্যে ধর্ম্মাধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়ে নেমে থাকেন।

*   *   *

"কে জানিত জ্বলবে আগুন --
এমন দাবানলের মত --"

দেশপ্রেমের আগুন দাউ দাউ করে বুকের মাঝে হৃদ্‌কুণ্ডে লেলিহান শিখায় জ্বলছে, ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য হিতাহিত লজ্জাসরম সবই তাতে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। বাকি রইলো শুধু গ্যাং সলিডারিটি -- গ্যাং-প্রীতি। একদিকে ম্যালেরিয়া মশা মাছি দুর্ভিক্ষ মহামারী ভরা দেশ এবং আর দিকে একদল উর্দ্ধমুখে ভোটভিক্ষু চ্যালা-চামুণ্ডা। যার দেশ জাহান্নমে যাক, আমার শ্রীচরণের ছুঁচোরা বেঁচে থাক! এই হচ্ছে আজকালকার কাউন্সিল্ রেকিং প্যাট্রিয়টিজমের মূল কথা। ব্যক্তি এখন উঠেছে ব্যষ্টিকে ছাপিয়ে, তাই পার্সনাল্ ম্যালিস্ নিয়েছে গরম রাজনীতির স্থান। এখন তাই মিত্তিরকে দেখে কার ওঠেন জ্বলে আর বোসকে দেখলে চাটুয্যের দেশোদ্ধারে হয় অযাত্রা।

*   *   *

দেশমাতার মুক্তি উঠেছে শিকায়, চাষার ঋণ আর বেকার সমস্যা ঘোচাচ্ছেন সার নাজিমুদ্দীন ও সার জন এণ্ডার্সন্। সুতরাং আমাদের এখন পরস্পরের পশ্চাদ্দেশে বংশ দেবার প্রচুর অবসর। আমরা এখন ঘরে ঘরে মীরজাফর ও উমীচাঁদ, প্যাট্রিয়টে প্যাট্রিয়টে ভাশুর ভাদ্দর-বৌ সম্পর্ক। যাদের মুখ দেখলে পিত্ত যায় জ্বলে, ছায়া মাড়ালে অযাত্রা ঘটে, তাদের সঙ্গে দেশের হিত করা চলে না। দেশবন্ধু আজ গোলোকে কি আনন্দলোকে কোথায় গেছেন জানিনে, সেখান থেকে তাঁর দেশ-ভৈরাতদের সোদরপ্রীতি ও গাঢ় ভ্রাতৃস্নেহ দেখে ভদ্রলোক বোধ হয় দুনিয়াটাকে একটা বিরাট ফক্কিকারী মায়া বলে জ্ঞান করছেন।

*   *   *

নেতার চুলোচুলির হুল্লোড়ে দেশের যত চাউস কাগজ কুলোর বাতাস দিচ্ছে, আনন্দবাজার আর অমৃতবাজারে চলেছে মেছোহাটা, ফলে আনন্দ ও অমৃত দিয়েছে লোকের রুচি বিকার ঘটিয়ে। ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই লাগলেই লোক জমে, জমা হাটে তখন কাগজ বিকোয় ভাল, তাই দেশের পলিটিক্স হয়েছে--

"শিঙে শিঙে লাগে ঠকর
কে হইবে আদু বকর।"

এক ভস্ম আর ছার

সম্রাটের বৈবাহিক সমস্যার স্তায় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের ডিক্টেটর শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ও তাঁহার অনুগামী ২২ জন শিল্প সেবকের পদত্যাগে বাঙ্গলা কংগ্রেসে যে সঙ্কট-সঙ্কুল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সমাধান হয় নাই। উভয় পক্ষে একটা আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হয় কিনা তাহা দেখিবার জন্ত ইতিমধ্যেই নাকি দু' একটা ঘরোয়া বৈঠক হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় কিন্তু তাহার ফলাফল কিছুই প্রকাশ পায় নাই। আপোষ বৈঠকের সংবাদ সত্য হইলেও আপোষ যে সম্ভব হয় নাই, বর্ত্তমান পরিস্থিতিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

*　*　*

২৯শে নভেম্বর পার্লামেণ্টারী বোর্ডের নির্ব্বাচনের পর দিবসেই শ্রীযুত শরৎচন্দ্র ডাক্তার রায়ের বরাবরে তাঁহার পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। তাহার পর আজ প্রায় দুই সপ্তাহ অতীত হইতে চলিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বৈধানিক দল কর্ত্তৃক তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণের কোন সংবাদ জানা গেল না। পক্ষান্তরে পদত্যাগ পত্র দাখিলের পর স্বয়ং শরৎবাবুও মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার কিম্বা তাঁহার শিল্পসেবকবর্গেরও আর কোন উচ্চ বাচ্য শুনা যাইতেছে না। বৈধানিক দলও তাঁহাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ত সরকারী ভাবে কোন কৈফিয়ৎ প্রদান করেন নাই। এমতাবস্থায় বাঙ্গলার কংগ্রেসী পরিস্থিতি কি ত্রিশঙ্কুর দশাপ্রাপ্ত হইয়াই থাকিবে? এদিকে দিন যে আগত ঐ!

*　*　*

শরৎচন্দ্র তাঁহার পদত্যাগ পত্রে জানাইয়াছিলেন যে, বোর্ডের সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ৮ জন সদস্যের সম্বন্ধে তাঁহার মতানৈক্য ও কয়েকটী জেলা কংগ্রেস কমিটীর মনোনয়ন বাতিল করাই তাঁহার পদত্যাগের কারণ। সেই সঙ্গে জাতীয়দলের প্রার্থী মনোনয়নের দাবী উপেক্ষা সম্বন্ধেও তিনি একটু ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। অবশ্য বৈধানিক দল শরৎবাবুর এই অভিযোগ সম্বন্ধে সরকারী-ভাবে এ পর্য্যন্ত কোন কৈফিয়ৎ প্রদান করেন নাই। তবে আমাদের কোন বিশিষ্ট দৈনিক সহযোগী কংগ্রেসের বর্ত্তমান ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় বিচলিত হইয়া অনুসন্ধানের ফলে যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাকে বিধানী দলের বে-সরকারী কৈফিয়ৎ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সহযোগীর অফলাশ্রয়ে এরূপ লুকোচুরী না খেলিয়া বিধানীদল সোজা-সুজি একটা বিবৃতি প্রকাশ করিবার সৎ সাহসটুকু দেখাইতে কুণ্ঠিত হইলেন কেন?

*　*　*

সহযোগীর তদন্ত রিপোর্টে পার্লামেণ্টারী বোর্ডের যে সব গুপ্ত তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে শরৎবাবুর পদত্যাগের মূলে ন্যায়, নীতি বা যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। জাতীয়দলের ৪ জন প্রার্থীকে কংগ্রেসী মনোনয়নের ছাপ না দেওয়া এবং কয়েকটী জেলা কমিটীর সুপারিশ বাতিল করাই নাকি সদলবলে শরৎবাবুর পদত্যাগের কারণ। আরও প্রকাশ যে, পূর্ব্বে যেসব সর্ত্তে জাতীয়দলের সহিত বৈধানিক দলের মিলন হইয়াছিল, পণ্ডিতজীর কলিকাতায় আগমনের পর বাঁটোয়ারা সিদ্ধান্তের ন্যায় তাহাও উভয় দলের সম্মতিক্রমেই পরিবর্ত্তিত হয়। এই পরিবর্ত্তিত সর্ত্তে স্থির হয় যে, জাতীয়দলের আর কোন স্বতন্ত্র সত্তা থাকিবে না, দুঁহু তনু মিলিয়া এক হইয়া যাইবে। তা ছাড়া অতঃপর নির্ব্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য বোর্ডের নির্দ্দেশ অনুসারেই পরিচালিত হইবে। জাতীয়দলের দলপতি এবং পাণ্ডারা তখন তথাস্তু বলিয়া তাহাতেই ঘাড় কাৎ করিয়াছিলেন। তবে আজ আবার তাঁহারা দলগত স্বার্থে উদ্বোধিত হইয়া যুঝিবার জন্ত এমন ঘাড় বাঁকাইয়া বসিলেন কেন?

*　*　*

তারপর পণ্ডিতজীর নির্দ্দেশক্রমে বসু-রায় যুগল ডিক্টেটরের উপর প্রার্থী মনোনয়নের ভারার্পণ করা হয়। তদনুসারে তাঁহারা যুগলে ঐক্যমত হইয়া যে ৩৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন করেন তাঁহাদের মনোনয়নের সময় জাতীয়দলের প্রার্থীদের সম্বন্ধে নাকি

সম্বন্ধে কোন দাবী দাওয়া করা হয় নাই। তা ছাড়া যে দশ জন প্রার্থী সম্বন্ধে ডিক্টেটর যুগল একমত হইতে না পারিয়া বোর্ডের সদস্যদিগের ভোটের উপর মীমাংসার ভার দিয়াছিলেন, বোর্ডের সদস্যগণ কর্ত্তৃক সেই দশজন প্রার্থী নির্ব্বাচনের সময়ে জাতীয়দলের পাণ্ডারা তথায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কোন উচ্চ বাচ্য করেন নাই। এই দশজনের মধ্যে জাতীয়দলের সেক্রেটারী যে ৪জনের নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ২ জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এ ছাড়া মনোনীত আরও ৬।৭ জন প্রার্থী নাকি জাতীয়দলভুক্ত। এ সংবাদ যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহার পরেও জাতীয়দলের দলত্যাগ করিবার যুক্তিসঙ্গত কি কারণ থাকিতে পারে?

* * *

কয়েকটী জেলা কমিটীর মনোনয়ন অগ্রাহ্য করা শরৎবাবুর পদত্যাগের দ্বিতীয় কারণ। এ সম্বন্ধেও সহযোগীর মন্তব্যে প্রকাশ পাইয়াছে যে, জেলা কমিটীগুলির মনোনয়ন অগ্রাহ্য করিয়া এমন কি দুইটী জেলা কমিটীর আপত্তি সত্ত্বেও উভয় ডিক্টেটরে ঐক্যমত হইয়া কয়েকজন প্রার্থী মনোনীত করিয়াছেন। যে ৮জন প্রার্থীকে লইয়া শেষ পর্য্যন্ত উভয় ডিক্টেটরে মতবিরোধ ঘটে এবং বোর্ডের সদস্যগণের ভোটাধিক্যে যাঁহারা নির্ব্বাচিত হন, তাঁহাদের মধ্যে তিনজন জেলা কমিটীর মনোনীত হইলেও শরৎবাবু তাহা অগ্রাহ্য করিয়া জেলাকমিটীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করেন। ইহাতে বলা যায় যে, জেলা কমিটীগুলির মনোনয়ন বাতিলের জন্য রবী প্যাক্টের নায়কেরা দোষী হইলেও স্বয়ং শরৎবাবুও একেবারে বিশুদ্ধ গঙ্গাজল নহেন। কিন্তু ইহার পরেও জেলাকমিটীর মনোনয়ন অগ্রাহ্য যে কোন নীতি ও যুক্তি অনুসারে তাঁহার পদত্যাগের কারণ হইল শরৎবাবু তাহা জানাইবেন কি?

* * *

শরৎবাবুর 'প্রভারবিয়েল র‍্যাপের' কথা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার ক্রোধবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় যেরূপ সত্বর, নির্ব্বাপিত হয় ততোধিক দ্রুতগতিতে। বিগত কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে রায়-রুণী প্যাক্টের নায়কদিগের সহিত তাঁহার পুনর্মিলনে ও বাঙ্গলা কংগ্রেসের বাটোয়ারা সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তনে ইহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই 'প্রভারবিয়েল র‍্যাপের' বশে পদত্যাগ করিলেও পরে তিনি বোধ হয় পদত্যাগের কারণগুলির যুক্তিহীনতা উপলব্ধি করিয়াই তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়াছেন। শরৎবাবু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠকে যোগদানের জন্য বোম্বাই গিয়াছেন। আরবসমুদ্রবারিধৌত বোম্বাইয়ের মলয় শীতোষ্ণ সমীরণে তাঁহার মস্তিষ্কের ক্লান্তি দূর করিতে না পারিলেও আশা করি, বোম্বাইয়ে ভারত মহাসাগরের সুশীতল বায়ুতে তাঁহার সে মানসিক উত্তেজনা নিবারিত হইবে। পাঞ্জাব হইতে ফিরিবার পরেই তিনি যেমন বাটোয়ারা সিদ্ধান্ত বর্জ্জনে সায় দিয়াছিলেন, বোম্বাই হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেও তেমনি পরস্পরে মুখ সোকাশুকি করিয়া বিরোধের অবসান ঘটাইবেন। বাঙ্গলায় এ সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে কংগ্রেসে আবার দলাদলি, সম্রাটের বৈবাহিক সম্বন্ধে বৃটেনের শাসনতান্ত্রিক দুর্দ্দৈবের ন্যায় বাঙ্গলার পক্ষে একটা চরম দুর্দ্দৈব ব্যতীত আর কিছুই নহে। শরৎ বাবুর ন্যায় বিচক্ষণ দেশপ্রেমিকের শুভ বুদ্ধিতে সে দুর্দ্দৈব নিবারিত হইবে, এ আশা করা কি দুরাশা?

কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে!

সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড মিসেস সিম্পসন নাম্নী এক মার্কিণ মহিলাকে বিবাহের সঙ্কল্প করায় সারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটা আজ আন্দোলিত হয়ে উঠেছে, আর সে আন্দোলনের ঢেউ সুদূর ইউরোপ হ'তে মার্কিণ বেয়ে ভারতের তট প্রান্তেও আছাড় খেয়ে পড়েছে। আমাদের এক দৈনিক সহযোগীর কানে কানে কলকাতার কোন বিশিষ্ট চিকিৎসক বলেছেন, সম্রাটের এই বিবাহ-বিভ্রাটের চাঞ্চল্যে তাঁর হাসপাতালের রুগীরা নাকি চাঙ্গা হয়ে উঠেছে, তাদের ক্ষুধার মাত্রা গেছে বেড়ে, আর সেই সঙ্গে বেড়ে উঠেছে তাদের সংবাদ পত্র পড়ার বাতিক। তারা নাকি ঠিক করেছে যে, সম্রাটকে এই বিবাহ বিভ্রাট থেকে নিস্তার লাভের পরামর্শ দেবার জন্য শীঘ্রই তারা হাসপাতালে একটা সভা আহ্বান করবে। বলা বাহুল্য সহরে ঐ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন স্বয়ং সহযোগী সে দিন সম্রাটের সিংহাসন ত্যাগের সংবাদ দিয়ে। তাতে প্রকাশ পেয়েছিল যে, সম্রাট মন্ত্রীদের মতে সায় দিতে না পেরে সিংহাসন ত্যাগের দলিলে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন। তাঁর স্থলে ডিউক-অব-ইয়র্ক ষষ্ঠ জর্জ নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে বসবেন আর ডাচেস্ সাম্রাজ্ঞী হবেন এলিজাবেথ নাম নিয়ে। রাম না হতেই রামায়ণের মতো সহযোগী এমনি আজব সংবাদ দিয়ে সহরবাসীকে একেবারে শঙ্কিত করে তুলেছিলেন। কিন্তু পরে জানা গেছে, সহযোগীর এ খোস খবরের সবই ঝুটা; রাজাকে শেষ পন্থা স্থির করবার জন্যে কয়টা দিন সময় দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু তবু চাঞ্চল্য আজও থামেনি, বরং এই চাঞ্চল্যের চাপে তলিয়ে গেছে আজকের জটীল আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলো। এমন যে হিটলার মুসোলিনী—তাঁরাও গেছেন এই বিবাহ বিভ্রাটের টানে তলিয়ে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের কোলাহল আজ আর কারও কানে প্রবেশ করে না, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর মরক্কো বাহিনী মাদ্রিদের পথে এগুলো কি পেছুলো, রুষ জার্মাণীতে বীরত্বের মৌখিক আস্ফালন কি ফল প্রসব করবে এ সব দুশ্চিন্তা আজ আর কারো মনে স্থান পায় না। বাঙ্গলার এমন যে কংগ্রেসী কোন্দল ও আসন্ন নির্ব্বাচন তাও এই বিবাহ বিভ্রাটের সোরগোলে চাপা-চেপে হয়ে উঠেছে। তবু বিলাতের মতো কলকাতায় শেয়ার বা বীমার বাজারে এখনো যে জোয়ার ভাঁটার টান ধরেনি এও ভালো।

সম্রাট যে রূপসীটিকে আত্মদান করে ফেলেছেন, তিনি রাজ কুমারী বা অভিজাত বংশীয়া না হলেও রূপসী, মনোরমা। তাঁর দেহভঙ্গী লীলাচঞ্চল, মুখাকৃতি কমনীয়, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, আলাপ আলোচনা মধুর, ব্যবহার সরল অমায়িক, প্রকৃতি সদা হাস্যময়ী, নৃত্য গীতে পটীয়সী।

সম্রাটের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও তাঁর আজকের নয়। কেউ বলেন ৬ বৎসর, কারো মতে দুই বৎসর আগে সম্রাটের সঙ্গে প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁদের প্রণয় সৃষ্টি হয়। তারপর অনেকদিন তিনি রাজ প্রাসাদে পরিচারিকারূপে বাস করেছেন, সম্রাট ও প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে খানা খেয়েছেন, এক সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখেছেন, এমনকি কিছু দিন আগে সম্রাট যখন নাহলিন জাহাজে প্রমোদ ভ্রমণে যান, তখনও এই সিম্পসনই ছিলেন তাঁর মাননীয়া সঙ্গিনী। মার্কিনের কাগজগুলো অনেকদিন থেকেই সম্রাটের এই প্রিয়তমাটীর সম্বন্ধে অনেকরকম জল্পনা কল্পনা নিয়ে মসগুল ছিল—কিন্তু নীতিবাগীশ বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এ পর্য্যন্ত বিলেতে তাদের আমোল দেন নাই।

কিন্তু মরমীর মনের কথা আজ প্রাণের আগোল টুটে বাইরে আত্ম-প্রকাশ করেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে অমনি বৃটেনের নীতিবাগীশ ধর্ম্মযাজক ও নিয়মতান্ত্রিক মন্ত্রীমণ্ডলী 'গেল রাজ্য গেল মান' বলে বার্ণার্ড শ'র মতে আধ-পাগলা হয়ে উঠে-

পাবনা-বগুড়া নির্ব্বাচন কেন্দ্র

অন্যতম নির্ব্বাচন প্রার্থী শ্রীযুত সতীশ নারায়ণ চৌধুরী। ইনিই কি সেই ব্যক্তি যিনি কিছুদিন পূর্ব্বে একটী মারপিট মামলার ফরিয়াদী হইয়াছিলেন? ইনিই কি ঢাকার পাঠ্যজীবনে কোন ঘটনার নায়ক হইয়াছিলেন? বারান্তরে!

মিসেস্ সিম্পসন

ছেন। তাঁদের মতে মিসেস সিম্পসন সম্রাটের মনোরমা হলেও তিনি দু-দুবার পতি পরিত্যাগিনী; তাছাড়া রাজকুমারী বা অভিজাত বংশীয়া নন, কাজেই তাঁকে বিয়ে করা কিছুতেই চলতে পারেনা। তাতে রাজবংশের গৌরব হবে খর্ব্ব আর রাজ সিংহাসনের মর্য্যাদা নাকি ধূলোয় পড়বে লুটিয়ে।

সত্যিকথা বলতে কি রাজপরিবারের বিবাহ-বিধি, বা আইন কানুনে এমন কোন নির্দ্দেশ নেই যা এই বিয়ের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। আর আভিজাত্য বা বংশ মর্য্যাদার অজুহাত— সেটাও নেহাৎ বাজে। কারণ ইংলণ্ডের রাজবংশেরই অষ্টম হেনরী, চতুর্থ জর্জ্জ ও দ্বিতীয় চার্লস এরা যাদের পত্নীত্বে বরণ করেছিলেন, বংশমর্য্যাদায় তাঁরা কেউই সিম্পসনের চেয়ে বড় ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে শুধু সাধারণ ঘরের কুমারী নন, দু-দুবারের বিধবাও ছিলেন। বিশেষতঃ দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহ কাহিনী চমৎকারীত্বে সে এর চেয়েও বহুগুণে অভিনব। তখন কিন্তু আভিজাত্য গর্ব্বীরা আজকের মতো সিংহাসন বা রাজবংশের মর্য্যাদার কোন প্রশ্নই তোলেন নেই। আর ধর্ম্মধ্বজীরাও সমাজ জীবনের কলঙ্ক খুঁজে পাওয়ার মতো এমন আঁতকে ওঠেন নি।

মোটকথা এঁরা নিয়ম বা শাসনতান্ত্রিক যত কিছু অজুহাত তুলুন, আসলে এঁদের আপত্তি হচ্ছে মিসেস সিম্পসন মার্কিন মহিলা বলে। তিনি যদি মার্কিনী না হয়ে বৃটনবাসিনী হতেন, তাহলে হয়তো রাজকুমারী বা অভিজাত বংশীয়া না হলেও আজকের মতো এমন বাদ প্রতিবাদের সোর গোল উঠতো না। নিজের বিয়ের ব্যাপারে ব্যক্তিগত মত স্বাধীনতা সম্রাটের আছে—কিন্তু তবুও যে কেন বৃটেনের আভিজাত্য গর্ব্বীরা সম্রাটের হৃদয়ের দাবীকে উপেক্ষা করছেন এবং সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য করবার অধিকার না থাকলেও সেই সম্ভাবনাকেই স্পষ্টতর করে তুলছেন, এইটেই সব চেয়ে দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয়। শিক্ষা ও সভ্যতাদৃপ্ত গণতান্ত্রিকতার দেশে এমন উৎকট গোঁড়ামী কখনই শোভনীয় নয়, বরং এতে শক্তিশালী বৃটেনের হৃদয় দৌর্ব্বল্যই প্রকাশ পেয়েছে।

সম্রাট এ সমস্যায় নীরব, কিন্তু মিসেস সিম্পসনের বুক ফাটলেও তাঁর মুখ ফুটেছে। তিনি বলেছেন, আমাকে নিয়েই যখন এত সমস্যা দেখা দিয়েছে তখন আমি স্বেচ্ছায় সম্রাটের প্রণয়ের পথ থেকে সরে যেতে প্রস্তুত আছি। মিসেস সিম্পসনের পক্ষে ইহা ঔদার্য্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই কিন্তু সম্রাট কি তাঁর বাঞ্ছিতাকে বঞ্চিতা করতে রাজী হবেন? সমস্যা তো এইখানেই।

তবে শুধু মাত্র আভিজাত্যের অহমিকা যদি এ সঙ্কল্পিত বিবাহের পথে প্রতিবন্ধক হয়, আর তার ফলে প্রজারঞ্জক ও জনপ্রিয় সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন তা হলে রাজভক্ত ভারতবাসী তাতে ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হবে সন্দেহ নেই। তবে আমরা পরাধীন ভারতবাসী—বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী ধুরন্ধরদের কাছে আমাদের এ মর্ম্মবেদনার মূল্য কি? ——

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আগামী ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে স্বদেশের সাধারণ সংখ্যা প্রকাশিত না হইয়া বড় দিনের সময় বৃহদাকারে **বড়দিন সংখ্যা** প্রকাশিত হইবে। এই সংখ্যায় বাংলার কয়েকজন ফিল্ম ডিরেক্টর এবং অভিনেতৃদের রচনা থাকিবে। এতদ্ব্যতীত বহু চিত্তাকর্ষক ছবি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। বিজ্ঞাপন দাতাগণ সত্বর হউন। এই সংখ্যার মূল্য হইবে নাম মাত্র।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

বড়দিনে ভ্রমণের সুবিধা

আগামী বড়দিন ও ইংরাজী নব-বর্ষের ছুটী উপলক্ষে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানী সকল শ্রেণীর যাত্রীদিগের জন্য সুবিধা ভাড়ার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। ই-বি রেলওয়ের অবাধ ভ্রমন টিকিটের ভাড়া—প্রথম শ্রেণী ৬০৲ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণী ৪০৲ টাকা, মধ্যম শ্রেণী ১৫৲ টাকা ও তৃতীয় শ্রেণী ১০৲ টাকা মাত্র। ১১ই ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই কনসেসন টিকিট পাওয়া যাইবে এবং ১৫ দিন পর্য্যন্ত এই টিকিটে ভ্রমণ করিতে, ইচ্ছামত যে কোন ষ্টেশনে যাত্রা বিরতি করিতে ও রেলওয়ে ফেরী ষ্টীমারে পারাপার হইতে পারা যাইবে। এই টিকিট আগামী ১৪ই জানুয়ারী মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত চলিবে। দেশ ভ্রমণ ও তীর্থ পর্য্যটনে অভিলাষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা স্বর্ণ সুযোগ সন্দেহ নাই। কর্ম্মক্লান্ত জীবনে যাঁহারা সত্যই অবকাশের অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিতে চাহেন, তাঁহারা এ সুযোগ হারাইবেন না।

পরলোকে কৃষ্ণ কুমার মিত্র

সুপ্রতিষ্ঠিত সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সমাজসেবক ও রাজনৈতিক নেতা শ্রীযুত কৃষ্ণ কুমার মিত্র গত শনিবার মধ্যাহ্নে তাঁহার কলেজ স্কোয়ারস্থিত বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮৫ বৎসর হইয়াছিল।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারদিগকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

আষাঢ়ের প্রথম দিবসে

(বড় গল্প)

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আর থাকতে পারলাম না, বহুদিন পরে ফিরে এলাম। কত লোকে কত কথা বললে, কেউ বাহবা দিলে, কেউ বা জানালে, আচ্ছা ছেলে যা'হোক্। মৃণাল কিন্তু প্রথমটায় আমার সঙ্গে কিছুতেই দেখা করলে না, তারপর আমিই যখন ওকে দেখতে যাবার সঙ্কল্প করেছি, তখন দেখি ও নীরবে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে—না এলেই ত পারতে রবিদা, বেশ ত ভুলেই ছিলে।

আমি আর কোন জবাব না দিয়ে ওকে বুকের কাছে টেনে নিলাম। ও এল বটে, কিন্তু এবার দেখলাম যে, আগেকার ওর সেই ছেলেমানুষী আর নেই, লজ্জা ওর কণ্ঠলগ্ন হয়ে ধন্ত হয়েছে।

অনেক দিনের ব্যবধান, অনেকখানিই বোধ হয়। সময়ের যে অপূরণীয় ফাঁক, সেটা আর কিছুতেই ভরে না। কিসের যেন টানে গ্রহতারা কক্ষচ্যুত হ'য়ে যায়, কল-কল্লোলিনী নদী মাঝপথে হারায় গতি বেগ, জীবনের 'পরে একটা অহেতুক অভিশাপের কাঁটা যেন খচ খচ করে। সেটা তোলা ত মোটেই শক্ত নয়, অথচ কিছুতেই যেন সেটা তোলা যায় না—এমনি দুর্নিবার সঙ্কোচ।

মৃণাল আমার কাছে সম্পূর্ণ ধরা দেয়, তার অবস্থিতি দিয়ে আমার চারপাশে ভরিয়ে রাখে এক পুলকের আবেষ্টনী, তবুও ও যেন আমার অবর্ত্তমানে অনেকটা বদলে গেছে। ওকে যেমন ভাবে আশা করেছিলাম, সে রকমটি আর পাই না, ও হ'য়ে উঠেছে বিলাসের লীলাসঙ্গিনী; কর্ত্তব্যের কর্ম্মসঙ্গিনী নয়।

এর কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে একটা অকল্পনীয় জিনিষ আমি আবিষ্কার করলাম যা' আমার জীবনের স্রোতকে দিলে আবার ঘুরিয়ে, মৃণালের সঙ্গ আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলাম। ওকে দূর থেকে ভাল বাসতে পারি; কিন্তু আর কাজের সঙ্গী করতে পারি নে, অপরের যে তাতে মন টাটায়, অধিকারে আঘাত পড়ে'ও।

বেশ বুঝতে পারলাম, মৃণাল যে আমার এত ঘনিষ্ঠ হয় সেটা আর একজন চায় না, আমারই অবর্ত্তমানে সে ওকে আপন করে নিয়েছে। মৃণালকে সে সত্যই ভালবাসে, ওর মুখেই শুনেছিলাম যে সে ওর সামনে মেলে ধরে অনেক কিছু উপহারের মায়া-জাল। আমি আসার পর থেকে তাকে ছেড়ে মৃণাল যে আমার কাছে ঘেঁষতে আরম্ভ করেছে তাতে সে ক্ষুণ্ণ হয়। তার সঙ্গে আমার প্রজার সম্পর্ক, সুতরাং সেটাকে প্রতিযোগিতার পর্য্যায়ে টেনে আনা আমার সাজে না। মৃণালের প্রতি দাবীই ত বেশী; সে ত ওকে অনেক কিছু দিয়ে খুসী করে—আমার কাছ থেকে ও ত কিছু পায় না, পায় শুধু কথার উপহার; সুতরাং বিনা প্রতিদানে আমি ওকে আর এক জনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেব কোন্ অধিকারে? ও যে আমার দিকে ঝুঁকে ছিল, সেটাই ত ওর করুণা বলতে হ'বে।

তাই আমি ওর সঙ্গ ত্যাগ করলাম, শুধু আর একজনের জন্যে। এর আরও একটা কারণ ছিল। মৃণাল ক্রমশঃ বিলাস সঙ্গিনী হ'য়ে উঠেছে, তাই ওর দেহ পাওয়া যেমন সহজ, মনটা ঠিক ততখানি শক্ত। ওকে শোধরাতে গেলে আর এক জনের আবেষ্টনী থেকে ওকে টেনে রাখতেই হ'বে। কিন্তু তাতে যদি আর একজন ভাবে যে শুধু মাত্র স্বার্থসিদ্ধির জন্যই আমি ওরূপ করলাম! কাজ নেই তাতে, আমি বরং ওকে দূর থেকেই ভাল-বেসে যাব। আক্ষেপ আমার সইবে, কিন্তু অসম্মান সইবে না।

ওর সঙ্গে আর আমি কথা বলি না। ও এতে ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়, বলে—এ তুমি কী করছ রবিদা,' কী হ'ল তোমার? কোন জবাব দিই না, ও আমায় বলে ওঠে—অপরকে আঘাত দিতে কি তোমার এতই ভাল লাগে? এবারও আমি চুপ করে থাকি। ও আবার জানায়—এখনো তুমি আমায় শোধরাতে পার রবি দা,' এর পর অন্যরকম কিছু হ'লে যেন আমায় আর দোষ দিও না।

ভেতরটায় কেমন যেন করে উঠল; মরিয়া হ'য়ে বললাম—না; দোষ দেব কেন? বিলাসের মধ্যেই তুমি নিজেকে ডুবিয়ে রাখ।

কথা শুনে বারেক যেন ও কেমন হ'য়ে গেল, তারপর ঝেঁজে বললে—রাখবই ত। লজ্জা করে না তোমার বলতে, কী দিয়েছ তুমি আমায়? আঘাত ছাড়া তোমার কাছ থেকে আর কী পেয়েছি আমি?

চলে গেল ও, আর এল না।

আমার নিষ্ঠুরতার ও যোগ্য প্রতিদানই দিলে, এ শাস্তি ত আমার প্রাপ্যই ছিল! তবু জানালাম না কেন আমি এমন করলাম।

বিচ্ছেদ কাতর দিবস রজনী এখন

নিরানন্দে কাটে ; আকাশের তারাদের মনে হয় জ্যোতিহীন নিষ্প্রভ। একটা যেন রুগ্ন পাণ্ডুর বিষণ্ণতা হৃদয়ের অপরিসর ঘর খানির আবহাওয়া করুণ করে তুলেছে, সেথায় শুধু ক্ষোভ ও বেদনার অসহায় মাথাকোটাকুটি, দীর্ঘশ্বাসের সকাতর ক্রন্দন ধ্বনি, কর্ত্তব্য ও প্রবৃত্তির সুনিষ্ঠুর সংঘাতের দ্বন্দ্ব!

এক এক সময় যেন আর পারি না, যেন মনে হয় মিথ্যা সব, মিথ্যা আমার আত্ম-পীড়ন। জীবনে ভোগই সমস্ত, কেন তাকে স্বেচ্ছায় হারাতে বসেছি। চোখে দেখি মৃণাল ধীরে ধীরে নিজেকে নষ্ট করছে। ও সুন্দর, সৌন্দর্য্য লীলা তাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক ; কিন্তু সুন্দরের আবেষ্টনীকেই এক মাত্র জীবনের কাম্য করে সুন্দরের দেবতাকে ও ভুলে গেল, চর্ম বিলাসই ওর হ'ল প্রসাধন, মর্ম বিলাসকে ও করলে পরিহার। তাই ওর নিন্দা সকলের মুখে মুখে ভেসে বেড়ায়, মোহান্ধতায় সেটাকেই ও ভুল করে ভাবে বুঝি ওর প্রশস্তির স্তুতি।

নববর্ষার প্রথম দিনটি আবার ফিরে এসেছে, মেঘমালার উন্মত্ত নর্ত্তনে সারা আকাশ ছেয়ে গেল। ভেবেছিলাম এ দিনটিকে বুঝি সে অসম্মান করবে না ; কিন্তু বিস্মরণীর বিমুখতায় সে এর মাধুর্য্যকে করলে একেবারে ভূলুণ্ঠিত। আমি শুধু হাসলাম, মনে হ'ল আগেকার মৃণালের সঙ্গে আজকের মৃণালের কত না প্রভেদ! আর বছরে অনেক রাত্রে নিশীথ অভিসারিকার মত স্বেচ্ছায় এসেই ত এ দিনটির উপহার সে আমায় দিয়ে গিয়েছিল।

মনে মনে ভাবি যে এ আমার স্বেচ্ছাকৃত শাস্তি। আমার আশা পুতুল যে আমি নিজ হাতেই গুঁড়িয়েছি।

তবুও মনের মধ্যে কি যেন খচ্ খচ্ করে। মৃণাল কি এমনি ভাবেই নষ্ট হবে? ওর চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টি যাবে হারিয়ে, দেহটা হ'বে সাধারণ পণ্য পসরার উন্নত সংস্করণ?

আশে পাশে সবার প্রীতি ও একে একে হারাচ্ছে, ওর অযথা গর্ব্বের মূঢ় উদ্ধত্যই এর কারণ হল। তাই তারা ওর নিন্দায় আড়ালে একেবারে পঞ্চমুখ, কিন্তু সামনে কিছুই বলে না। আমার ইচ্ছে হয় মৃণালকে ডেকে এসম্বন্ধে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিই, বলি, মৃণাল, তোমার এই রকমটি হওয়াই কি সবাই আশা করে ছিল?

একদিন কিন্তু যা করে বসলাম তার জন্যে আজও আমি লজ্জিত। কি একটা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে গিয়ে পৌঁছেছি, কে যেন আমার দৃষ্টি একদিকে আকর্ষণ করল। চেয়ে দেখি এক যায়গায় মৃণাল

সবার সামনে নিজেকে নির্লজ্জ ভাবে জাহির করছে। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম, কিন্তু সঙ্গীর দল মন্তব্য করলে যে এর যোগ্য প্রতিবিধান দরকার। আমি কিছু মন্তব্য করবার আগেই তাদের মধ্যে এক জন মৃণালকে আমার কাছে ডেকে দিল, ও এসে কুণ্ঠিত ভাবে আমার কাছে দাঁড়িয়ে শুধাল—আমায় ডাকছ রবিদা?

ওঃ কত দিনের পর আমার প্রতি ওর এই ভাষণ, আমি যেন কেমন হয়ে গেছি! বুকের রক্ত আমার তখন তোলপাড় করছে, কিন্তু সঙ্গীরা আমার মুখের পানে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে; একটা কিছু বলতেই হ'বে; নইলে যোগ্য প্রতিবিধান হয় না। ফস্ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—এরই যদি নিজেকে লোক সমাজে জাহির করবার চেষ্টা মৃণাল, তাহলে ত একখানা ঘর ভাড়া করলেই পার। অনেকে আসবে। কিন্তু বলবার মাত্রই আমার মনে হোল—এ কী করলাম; এ কী বললাম আমি আমার আদরের মৃণালকে? এ কোন্ অশ্রাব্য ইঙ্গিত?

কথা শুনে ও যেন কেঁপে উঠল, এক আশ্চর্য্য দৃষ্টি মেলে বললে—আমি—আমি কখনো এমন—। বাদবাকী কথা আর গলা দিয়ে বেরুল না, চলে গেল ও। মনের মধ্যে আমি কিছুতেই শান্তি পাই না, একটা অসহ্য অশান্তি ভেসে বেড়ায়। প্রতি নিয়ত যেন প্রশ্ন হয়—এ তুমি কী করলে? কোন শয়তান তখন তোমায় পাগল করেছিল?

কিছুদিন পরে শুনতে পেলাম যে মৃণাল এ নিয়ে তার একজনের কাছে অনুযোগ করেছে, কেঁদেছেও। বলেছে—রবিদা' আজ ছোট লোকের পর্য্যায়ে নেমে গেছে। তাই বলুক। যে আঘাত আমি দিয়েছি; এ গালাগাল তার পক্ষে ত কিছুই নয়।

মন বললে—এরকম অশান্তি দিয়ে নিজেকে প্রপীড়িত করো না। ত্রুটী স্বীকার করে নাও। তাই মৃণালকে এক দিন ডাকলাম, বললাম—তোমার একটু সময় হবে মৃণাল?

ও আশ্চর্য্য হয়ে উত্তর দিলে—কেন? কি দরকার?

—দরকারটাই কি সবখানি? আজ সন্ধ্যে বেলা একবার এসো।

ও একটু ইতস্ততঃ করলে, ভাবে বোঝা গেল যেন অস্বীকার করবে। কিন্তু কী ভেবে তারপর বললে, আচ্ছা।

সন্ধ্যার পর যখন ও এল তখন রাত্রির তমিস্রা নেমেছে। বললে—কেন ডেকে ছিলে?

—কেন আন্দাজ করতে পার?

—আন্দাজের আমার প্রয়োজন নেই, অন্য কিছু বলবে?

ওর এই জবাবে একেবারে চমকে উঠলাম। বললাম—মৃণাল এ তুমি কি হোলে? কোন জবাব নেই। খানিকক্ষণ কাটলো। তাই আবার শুধোলাম—কই বললে না? এবারেও কোন উত্তর নেই; অন্ধকারের মধ্যে ও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আশ্চর্য্য হয়ে ডাকলাম—মৃণাল? তবু ও সাড়া দিল না।

অন্ধকারের মাঝেই ওর হাতখানা ধরতে ফোঁটাকয়েক জল ওর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো। বিস্মিত হয়ে ওর মুখ খানা তুলে ধরে বললাম—এ কি মৃণাল? তুমি কাঁদছ?

ও আমার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে বলে উঠলো—যাও, সবার সামনে কী অপমানটা সে দিন করেছিলে মনে নাই?

—তার জন্যে আমায় ক্ষমা কোরো ভাই।

—ক্ষমা ? ক্ষমা করলেই কি সে নিষ্ঠুর আঘাত ভোলা যায় ?

অন্ধকার রাত্রি, নিশুতি জল স্থল, সামনে মৃণাল, অঝরে কাঁদছে ! আমার যেন তা কেমন করে দিলে, ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম—হ্যা যায়।

ও তবুও ফুঁপিয়ে বলে উঠল—কিন্তু কি করে তা পারব ?

ওর হাতখানা তখনো আমার হাতে ধরা আছে, সুশুভ্র সুডৌল হস্ত। এতদিনে ও অনেকটা বেড়ে উঠেছে ; ওর তনুতীর্থের কূলে কূলে বয়ে চলেছে অফুরন্ত জোয়ার—তারই আঘ্রাণ পাচ্ছি। অতি কষ্টে নিজেকে দমন করে ওর চোখের অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বললাম—পারবে মৃণাল ; তোমার রবিদার অনুরোধ এই কথা ভেবে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ও জবাব দিল—বেশ তাই হ'বে। কিন্তু তুমিও আমায় আর দূরে রাখতে পারবে না।

না ভাই, নববর্ষার ঐ প্রথম দিনটি ছাড়া আর আমার উপায় নেই। ও আশ্চর্য্য হয়ে মুখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে—উপায় নেই কেন ?

কেন তা' তুমি টের পাও না ?

না। তুমি বল কেন তুমি ওরকম ব্যবহার কর ?

আজ নয়, অন্য দিন শুনবে।

কিন্তু অন্য দিনকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। সেদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে মৃণাল চুপি চুপি এসে বললে—রবিদা', তোমায় বলতেই হ'বে। আজ তুমি কোন মতেই আমায় ফেরাতে পারবে না।

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে বললাম—বাড়ী যাও মৃণাল। তোমার বাড়ীতে যে বকবে।

না, কেউ টের পাবে না। বল তুমি কেন ওরকম করে থাক ?

ও নাছোড়বান্দা জেনে আমি গম্ভীর ভাবে বললাম—তোমাদের মাঝে আমি কাঁটা হয়ে থাকব বই ত নয়।

কাঁটা হয়ে তুমি থাকবে ! এ তুমি কি বলছ রবিদা' ?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। তুমি জান আর একজন তোমায় ভালবাসে ?

তাতে কি ? তাতে আমাদের এ সম্পর্কে কেন পড়বে বাধা ?

কিন্তু সে ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া কি তোমার কর্ত্তব্য নয় ?

হ্যাঁ, সাধ্যমত দিয়েও থাকি ; কিন্তু সে অন্যভাবে।

আমার বিস্ময় বাড়ল। তবে এতদিন আমি কি ভেবে এসেছিলাম ? এতদিন কি আমি তা'হলে ভুল বিচার করেছি, কিন্তু তা'ত নয় ; তাই বললাম—মৃণাল, সে হয়না। তোমায় কাছে টানলে ওধারের সম্পর্ক ছিন্ন হবার সম্ভাবনা।

ও এবার ক্ষুন্ন হয়ে জবাব দিল—না। তোমায় ত বলেছি রবিদা' ওধারের সম্পর্ক অন্যভাবের, সে স্নেহের। তুমি কেন বৃথা কষ্ট পাচ্ছ।

কিন্তু ও যাই বলুক, আমি ত জানি ও এটাকে স্নেহের বলে মনে করলেও আর একজন সেটা ভালবাসার বলেই গ্রহণ করেছে। তাই বললাম—না মৃণাল অপরের প্রাণে আমি ব্যথা দিতে পারব না।

অপর ! অপরেই তোমার বড় হ'ল রবিদা' ? আমি কি তোমার কেউ নই ?

তুমি আমার সব চেয়ে বড় বলেই ত তোমায় স্বেচ্ছায় হারানোর কষ্ট সহ্য করতে পারি মৃণাল।

কিন্তু আমি কি পেলাম ? নিজের কথাটাই ভেবে দেখলে, আমার বিষয় ত ভেবে দেখলে না ?

তুমি বড় হও, সুন্দর হও, সার্থক হও। এই কামনাই করি।

ও একবার কী যেন ভাবলে, তারপর বললে—এই তোমার শেষ কথা রবিদা ? কিন্তু পরে যেন বোলো না যে মৃণাল আমাদের সম্পর্ককে অসম্মান করেছে।

চলে গেল ও।

আমি সেই দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। হায়, তখন কি জানতাম কতখানি আমি হারাতে বসেছি!

(আগামীবারে সমাপ্য)

"ভারতে সমবায়ে বেচাকেনা"

শ্রীললিত মোহন হাজরা

বিরাট দুনিয়ায় সমবায়ে বেচাকেনা (কো-অপারেটিভ মার্কেটিং) বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছে। আর তারই ফলে ইউ-রোপের দেশগুলি আর্থিক অবস্থার চরম উন্নতি ক'রে নিয়েছে ও নিচ্ছে। আমাদের ভারতবর্ষেও এই "সমবায়ে বেচাকেনা" আন্দোলন অনেকখানি সাফল্য লাভ ক'রেছে। কিন্তু করলে কি হবে? তার উন্নতি বহুল পরিমানে হ'চ্ছে না। আজ সেই কথা ব'লবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। কো-অপরেটিভ মার্কেটিং এর বিশেষ বিবরণ জানার আগে আমাদের বিশেষ ক'রে জানতে হবে সমবায় কা'কে বলে। পরস্পরের সাহায্য ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই এই সমিতির সৃষ্টি হ'য়েছে। এই সাহায্য ও বিশ্বাসের বাঁধন যে দিন শিথিল হ'বে সেই দিনই এই সমিতির উচ্ছেদ সাধন হবে। পরস্পরের সাহায্য ও বিশ্বাস যদি খুব ভাল ভাবে থাকে তবে সে সমিতি যেমন কাজ করতে পারবে তেমন কাজ গভর্ণমেণ্টের আইনেই হোক, আর যে ক'রেই হোক কিছুতেই সম্ভব হবে না। প্রথমেই দেখা যাক্ এই সমবায়ের উদ্দেশ্য কি? এর উদ্দেশ্য সত্যি ক'রেই মহৎ—এর ভিতরে সত্যিকারের একটা দরদ আছে। উদ্দেশ্যও এর অনেক। সে গুলি যথাক্রমে:— (১) দেশের কৃষক-সম্প্রদায় ও ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান-গুলিকে খুব কম সুদে টাকা ধার দেওয়া (২) ধনোৎপাদনকারীদের উৎপন্ন দ্রব্য কেনা-বেচার জন্যে তাদেরই মধ্যে একটা সমিতি গঠন করা ও (৩) ক্রেতা সম্প্রদায়ের মধ্যে সমিতি গঠন করা। ক্রেতা সম্প্রদায় তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরাসরি উৎপাদনকারীদের কাছে কিনে না। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা শ্রেণী আছে তাকে বলা হয় মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায়। এই মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায়ের নিকট ক্রেতা সম্প্রদায় তাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে। এতে লোকসান হয় দু'দলেরই, আর লাভের অঙ্ক বাড়ে মধ্যবর্ত্তীদের। এই দুর্দ্দান্ত সম্প্রদায়ের হাত হ'তে রেহাই পাবার জন্যেই সমবায় সমিতি গঠন করা হ'য়েছে। আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে সমবায়ের একটা বিশেষ দিক — বেচাকেনার দিক — পর্য্যালোচনা করা। অধ্যাপক ক্যালভার্ট—একজন মস্ত বড় অর্থনীতিবিৎ পণ্ডিত; তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'ল এণ্ড প্রিন্সিপল্‌স্ অফ কো-অপরেশন' পুস্তকে, এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। সব যুগেই দেখা গেছে যে, দুনিয়ার কোন লোকই সমস্ত বিষয়ে ওস্তাদ হ'তে পারে নি। তাকে কোন না কোন জিনিষের জন্যে পরের কাছে হাত পাততে হবেই। এই কৃষক গুলিও সকল বিষয়ে ওস্তাদ নয়; তাই চাষ আবাদের জন্যে এবং উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিক্রয়ের জন্যে প্রতিবেশীর উপর সব সময়েই তাদের নির্ভর ক'রে চলতে হয়। এমনি ভাবে তাদের দিন চলতে লাগল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাদের টনক নড়ল'। তারা বেশ বুঝতে পারল' যে তারা ঐ মধ্যবর্ত্তী লোকের সাহায্যে তাদের উৎপন্ন শস্যাদি বিক্রয় ক'রে আর কিছু করুক আর নাই করুক বণিকদের পেট ভরাচ্ছে। এ ছবিটা তাদের চোখের সামনে ধ'রে দিল ঐ সমবায় সমিতি। কৃষক সম্প্রদায় তখন আস্তে আস্তে সমবায় সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করলে। সমিতির কর্ম্মীরা কৃষকদের এইবার বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিলেন তাঁদের উদ্দেশ্য। চাষীরা উদ্দেশ্যগুলি বুঝলে এবং বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই সমবায় নীতির প্রতি তাদের আগ্রহ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠল'। কর্ম্মীরা এই উপলব্ধির সুযোগ গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হ'লেন না। তাঁরা কৃষকদের মাঝ হ'তে দু'চার জন

মুরুব্বিগোছের লোক বেছে নিয়ে একটা সমিতি গঠন ক'রে ফেলেন। এই ভাবে হ'লো কো-অপরেটিভ মার্কেটিং এর সূচনা। এই আন্দোলন সর্ব্ব প্রথমে দেখা দেয় জার্ম্মেনী, ডেনমার্ক ও ইংলণ্ডে। তার পর গোটা জগতে ছড়িয়ে প'ড়েছে। এর ফল হ'য়েছে এই যে দেশের কৃষক সম্প্রদায় ও ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি বণিক-দের সঙ্গে কি ব্যবসায়ে কি বাণিজ্যে সকল খুটি নাটি বিষয়েই সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে চ'লেছে। এ ত হ'লো শুধু ওপারের কথা। এবার দেখা যা'ক্ ভারত-বর্ষে এ আন্দোলন কতখানি সাফল্য লাভ ক'রেছে। প্রত্যেক আন্দোলনেরই একটা বেশ ইতিহাস আছে, এ ক্ষেত্রেও সেই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। ব্যাপারটা সম্যক ভাবে বুঝতে হ'লে এর ইতিহাসটা গোড়াতেই জানা বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমেই ব'লে রাখছি— ওপারের আন্দোলন আমাদের দেশের সর্ব্ব প্রথম আন্দোলন নয়। ওপারের আমদানি আন্দোলনের আগেও আমাদের দেশে এই আন্দোলন বিশেষ ভাবেই ছিল। তবে ওপারের রূপটা ছিল না। আমাদের দেশে সমবায়-সমিতির প্রথম আন্দোলন দেখা দেয় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। এর আগে মাদ্রাজে 'চেট্টি' ও নিধি প্রথা চলে আস-ছিল ও আসছে। এই 'নিধি' প্রথাটা বর্ত্তমান যুগের ইউরোপীয় ফ্রেণ্ডলী সোসাইটি এবং প্রভিডেণ্ট ফণ্ডগুলির সমতুল্য। ভারতবর্ষ একটা প্রকাণ্ড দেশ। এর লোক সংখ্যা কারো অজানা নেই। শতকরা ৭২ জন লোকের জীবন কৃষির উপরই নির্ভর করে। কৃষির অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়—কৃষিকাজের জন্য তাদের প্রতিবৎসরে ঋণ গ্রহণ করতে হয় বেশ মোটা রকম সুদে। গোটা ভারতটার কৃষি-ঋণ হ'চ্ছে ন' শ' কোটী টাকা; আর তারই মধ্যে আমাদের বাংলা দেশের ঋণই একশ' কোটী টাকা। আগে সরকারী মহল হ'তে কম সুদে টাকা ধার দেওয়ার কোন ব্যবস্থাই ছিলনা। তখন কৃষকরা দেশের মহাজন ও জমিদারের কাছে ঋণ পেত। কিন্তু মহাজনদের সুদের হার এমনই মারাত্মক ছিল যে নিঃস্ব কৃষকদের আসল টাকা শোধ দেওয়া ত দূরের কথা, সুদের টাকা পরিশোধ করাই দায় ছিল। এই সুযোগে মহাজনেরা জমি জায়গা সম-স্তই বন্ধক নিয়ে টাকা ধার দিতে লাগল। ওদিকে জমিদারের অত্যাচার ও দিনের পর দিন লাঞ্ছনা বৃদ্ধি। মহাজনদের চেয়ে জমিদারই বেশী মারাত্মক হয়ে উঠেছিল সমাজের পক্ষে। মিঃ এম, ডারলিং, এ সম্বন্ধে জোর গলায় বলেছেন যে,— মহাজন অপেক্ষাও জমিদারকে সমাজে বেশী ভার বলে মনে হয়। মহাজন খারাপ কিন্তু তার পরিবর্ত্তন হ'তে পারে। সর-কার বাহাদুর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কো-অপারে-টিভ ক্রেডিট সোসাইটি এক্ট প্রণয়ন করে সমবায়-ঋণদান সমিতি বসালেন। মহাজন-দের হাত হ'তে নিরীহ কৃষকদের রক্ষা পাবার একটি ব্যবস্থা হ'লো। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আন্দোলন বেশ ব্যাপক-ভাবে দেখা দিল। সেই উদ্দেশ্যে সরকার বাহাদুর ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আর এক নূতন আইন পাশ করালেন। তারপর নিযুক্ত হলো ম্যাকলাগান কমিটি। কমিটি যথা-সময়ে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করলেন। শুধু টাকা ধার দিলেই সমিতির কাজ শেষ হবে না। ভারতীয় ক্যাপিট্যালিষ্টদের সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায় ও শিল্পী সম্প্রদায় প্রতিযোগীতা করে দাঁড়াতে পারছে না। তারা দিন দিনই হ'টে যাচ্ছে। মহাজনদের পাওনা শোধ দেবার জন্যে, সরকারের বরাদ্দ ট্যাক্স দেবার সময়ে ও ফেরীওয়ালা-দের "শুভাগমনে" তারা তাদের সঞ্চিত শস্য মাটির দরে বিক্রী করতে বাধ্য হয়। এর ফলে কৃষকেরা সর্ব্বস্বান্ত হ'চ্ছে। সমবায় সমিতিকে কেবল মাত্র টাকা ধার দেওয়া বয় না করে তার সাহায্যে চাষীর উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রী করার ব্যবস্থা করতে হবে। বেচাকেনার দিকটা সমবায় নীতির প্রকট ও অত্যাবশ্যকীয় প্রধান অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও এতদিন পর্য্যন্ত সমবায় সমিতিগুলি টাকা ধার দেওয়ার জন্য গঠিত হয়েছিল। সর-কার বাহাদুর ম্যাকলাগান কমিটির মন্তব্যে সায় দিলেন ও কমিটির নির্দ্দেশ মত কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এইবার সত্যি করেই ভারতের সমবায় সমিতির ইতিহাসে যথার্থ এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন হলো। কিন্তু ইউরোপে মহাযুদ্ধ হওয়ায় সে সময় ঐ আইনটা কার্য্যকরী হতে পারে নাই। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মণ্টেগু-চেমস্ ফোর্ড রিফর্ম্মস্ এ্যাক্ট অনুসারে সমবায় সমিতিগুলিকে হস্তান্তরিত করা হয়েছে ও দেশীয় সুযোগ্য মন্ত্রী মহাশয়দিগের হাতে এর ভার ন্যস্ত হয়েছে। তাঁরা আপন আপন প্রদেশের প্রয়োজন মত ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত সরকারী মহল হতে সমবায়-নীতি অনুযায়ী কেনাবেচার কোন ব্যবস্থাই হলোনা। স্বর্গীয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন মিত্র মহাশয়ও এই বিষয়ে আক্ষেপ করে গেছেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

অনলের কথায় টুকরো এসে আহত হচ্ছিল পরাশরের কাণের পর্দায়।
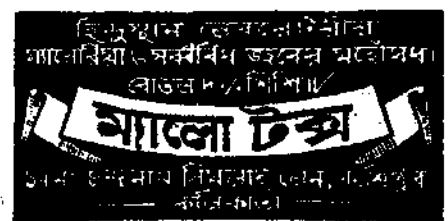
সত্যি এবার উঠি: আবার বল্লে পরাশর।

না, আজ থাকতে হবে তোমাকে।

অসম্ভব। মামাবাবুর কড়া হুকুম আছে দশটার পরে আর বাইরে না থাকি। কিন্তু এগারোটার আগে কোন দিনও আমি বাসায় ফিরতে পারি নে। বলতে বলতে লালিমার ড্রেসিং গ্লাসটার দিকে একবার তাকালে পরাশর। তারপর দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো: গোপীগণের বস্ত্রহরণ, নিমাইর গৃহত্যাগ, বিলিতি ফিল্ম ষ্টার নীর্মা লয় আর গার্বো। আর পিছনে একটু ফিরে তাকিয়ে দেখলে—এমন কি কালীঘাটের কালীও ওখানে জায়গা নিয়েছে!

আবার দু'জনে একটু চুপ করলে দু' জনের চোখের দিকে তাকিয়ে।

একগ্লাস জল দেবে? তেষ্টা পেয়েছে বড্ড। পরাশর বল্লে।

হ্যা দিচ্ছি একটু অপেক্ষা করো।

পরাশর আর কথা বল্লে না।

বিশ্বনাথ! লালিমা ডাকলে।

দিদিমণি। নীচ থেকে হাকাতে হাকাতে এসে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো একটা বুড়ো হিন্দুস্থানী। তারপর ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে টাকা বার করে বারান্দা অবধি এগিয়ে গিয়ে আস্তে বিশ্বনাথের হাতে দিয়ে চুপি চুপি বল্লে লালিমা: এক সের গরম দুধ আর একটা হোয়াইট লিক।

আবার দরজা ভেজিয়ে ঘরে ঢুকতেই পরাশর লালিমাকে জিজ্ঞেস করলে: আচ্ছা তুমি এই বইটা কোত্থেকে পেলে?

কোন বইটা?

ঐ যে আলমারী থেকে উঁকি মারছে রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা।

ওটা। (একটু থেমে আবার বল্লে) দিয়েছে একটা বড়লোকের ছেলে, কলেজে পড়তো তখন। রোজই এখানে আসতো। অবশ্যি ছেলেটার গুণ ছিল যথেষ্ট। চমৎকার গাইতে পারত। লিখতো কবিতা আর গল্প। আর ছাপা হতো সেগুলো সাময়িক পত্রে।

তার নামটা মনে আছে তোমার?

না।

বইটায় হয় তো লেখা থাকবে নিশ্চয়ই, পরাশর ভাবলে। আচ্ছা দেখি বইটা একবার পরাশর বল্লে।

কেন নিয়ে যাবে নাকি? তা' কিন্তু দিতে পারবো না আমি।

ও বই দিয়ে কী করবে তুমি?

সারা জীবন মিথ্যা ভালবাসার অভিনয় করে যা' পেয়েছি তার কিছুই আমি নষ্ট করতে পারবো না। এমন কি নষ্ট হতেও দেব না।

বেশ না দিলে; বরং দেখতে দাও একবারটী।

লালিমা পরাশরের হাতে এনে বইটা দিলে। দু' তিনবার পাতা উল্টোতে উল্টোতে পরাশর জিজ্ঞেস করলো: লোকটার খোঁজ কতদিন রাখ না?

প্রায় দু' বছর। তবে সেদিন একটা উড়ো খবর পেলুম তার এক বন্ধুর কাছ থেকে। দুজনে একই কলেজে পড়তো তখন, আর আমার এখানে ও আসত এক সঙ্গে। সে এখন নাকি ঢাকায় প্রফেসর। বিয়ে করেছে, বৌ নাকি চমৎকার। আমাকে অনেকদিন বলেছিল: তোমাকে আমি যদি বিয়ে করি, তুমি আমার সঙ্গে কি যাবে না যেখানে নিয়ে যাই?

লালিমা যেন সেদিনকার অর্দ্ধবিস্মৃত ঘটনার উপর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল তন্ময় হয়ে। (ইতিমধ্যে চাকরটা এসে খাটের নীচে রেখে গেল গরম দুধ আর হোয়াইট লিক ব্রাণ্ডি।) আবার লালিমা ফিরে এলো উপস্থিত সময়ে আর বল্লে: মদ খাবে?

—মদ! পরাশর যেন লাফিয়ে উঠলো।

—মদ খেলে কি জাত যায় নাকি?

—তা' কি আর আমি বলছি।

—তা' হলে খাবে না কেন? তোমাকে খেতেই হবে।

—মাপ কর, ও সব চলবে না।

—বরং খানিকটা গরম দুধ।

—দাও।

তারপর দুধ আর ব্রাণ্ডিতে চমৎকার মিশিয়ে লালিমা পরাশরের হাতে দিলে। নিঃশ্বাসের পর নিঃশ্বাস টেনে পুরো দুই গ্লাস শেষ করে ফেল্লে। আর সে যেন বেঁচে গেল। দারুণ খিদে পেয়েছিল পরাশরের।

—তোমার ঐ সিন্দুকে কি? জিজ্ঞেস করলে পরাশর।

—কেন?

—টাকা বুঝি?

—নেবে?

—দাও না। সত্যি তুমি জান না আমার কত অভাব। দস্তুর মতো খেতে পাইনে। এতো টাকা দিয়ে কি করবে তুমি বরং আমাকে কিছু দাও।

—বেশ তো আমার এখানে থাক তুমি।

—আচ্ছা কত টাকা আছে তোমার?

—অনেক। ক্যাশ সার্টিফিকেট আছে একটা হাজার টাকার। ফরিদপুরের এক জমিদার সেটা আমায় কিনে দিয়েছিল।

সে আমাকে খুব ভালবাসতো। আর কোলকাতা এলে, আমার এখানেই থাকতো। সে বলতো কি জান, হেসে উঠলো লালিমা, তার মেয়ের মতো নাকি আমাকে দেখতে।

পরাশর বোকার মতো তার চোখের দিকে তাকিয়ে বল্লে: সত্যি আমাকে টাকা দেবে তো?

—হ্যাঁ দেব। বল তুমি আমাকে ভালবাস।

—হাঁ।

—সত্যি?

—সত্যি।

—আজ এখানে থাক তা' হ'লে।

—থাকবো। টাকা দেবে তো?

—হুঁ। তোমাকে আমার কত ভাল লাগে তুমি তা' বুঝবে না। (একটু থেমে আবার) আচ্ছা তোমার আর কে আছে? মা-বাবা আছেন তো?

—সুদূর পল্লীর জামাকলে অভাবের অসহ্য যাতনা বুকে নিয়ে মা আছেন আর বাবা থেকেও নেই। তার সঙ্গে পরিচয় স্বীকার করতেও আমি লজ্জা এবং কুণ্ঠা বোধ করি। সন্তানের জন্ম দিয়ে সে সন্তানের উপর যে অত্যাচার এবং অবিচার করে, তাকে পিতা বলা আমার শাস্ত্রে নেই। শুধু জন্মদাতা আখ্যাই তার পক্ষে যথেষ্ট।

—আচ্ছা, তুমি একটা চাকরী খুঁজে নিলে পার না কি?

—চাকরী! কিছুদিন আগে আমি চাকরীই করতুম। এক ভদ্রলোকের অনুকম্পায় কারখানায় একটা চাকরী পেয়েছিলুম। কিন্তু বাঙালী ম্যানেজারের অহেতুক অত্যাচার, আর ঐ ভদ্রলোকের উপকারের নামে অত্যাচার আমার জীবনকে বিষিয়ে তুলছিল, সুতরাং চাকরী ছেড়ে দিয়েছি। বাঙালীর উপর বাঙালী যে এতো অত্যাচার করতে পারে এ কথা এর পূর্ব্বে আর কোনদিনই ভাবতে পারি নি। এরা আবার চায় স্বায়ত্তশাসন!

—আমি যদি তোমাকে একটা চাকরী দেই করবে তো? স্বর একটু করুণায় আর্দ্র করে জিজ্ঞেস করলে লালিমা।

—কি চাকরী, তোমার দালালী?

—যদি তাই হয়।

—কেন, মরণ কি তার চেয়ে ভাল নয়?

—তা' হ'লে তুমি আমাকে ঘৃণা কর, আর ভালোবাসার কথা যা' বল কেবল মুখেই, না? লালিমার মুখে নেমে এলো ঈষৎ একটা কালো ছায়া।

যখন ভাবি তোমার অনেক টাকা, ভালবাসায় আপনি নত হয়ে আসে মন। আর যখন ভাবি, তুমি একটা সাধারণ— হঠাৎ হোঁচোট খাওয়া পথিকের মতো থমকে গেল পরাশর। পরাশর আর কোন কথাই বলতে পারলে না। লালিমার মুখের দিকে শুধু তাকালে।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ লালিমা বল্লে: এর আগে কি কোন মেয়েমানুষকে তুমি ভালবেসেছিলে?

—কেন? হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে পরাশর।

—সত্যি বল না। লালিমাও একটু হাসলে।

—যদি বলি ভালবেসেছিলুম। হাই তুলতে তুলতে বল্লে পরাশর। ঘুমে তার চোখ যেন জড়িয়ে আসছিল।

—হ্যাঁ বুঝেছি। তুমি ভালবেসে ব্যথা পেয়েছ, না?

পাংশু হয়ে পরাশর লালিমার মুখের দিকে একবার তাকালে। তারপর হঠাৎ পরাশরের মাথাটা একটু ঝিম ঝিম করে এলো। দারুণ ঘুমে চোখের পাতাগুলো যেন বুজে আসছিল ক্রমে ক্রমে।

—উঃ আমি আর বসে থাকতে পারবো না। দারুণ ঘুম পাচ্ছে আর মাথা ঘুরছে। আমার মনে হচ্ছে, পৃথিবী যেন ছোট্ট একটী ষোড়শী মেয়ের মতো নাচছে আমাকে ঘিরে। আমি ঘুমুব, সত্যি ঘুমুব এখন।

পরাশর শুয়েই চোখ বুজলে। লালিমা তাকে দু'তিনবার ডাকলে, কিন্তু চোখ মেলে তাকাবার মতো শক্তিটুকুও তার ছিল না। অসম্ভব রকমের নেশা তাকে পেয়ে বসল।

তারপর আস্তে তার মাথাটা কোলের উপর টেনে এনে তাকে জড়িয়ে ধরে তার তৃষিত দুই ঠোঁটে লালিমা চেপে ধরলো পরাশরের ঠোঁট দুটো। আর পরাশর স্বপ্ন দেখছিল ডলিকে। যার জন্ত আজ তার এই রেকলেস্ লাইফ আর যাকে ভোলবার জন্ত স্বেচ্ছায় সে লালিমার কাছে ধরা দিয়েছে। ডলিই যেন আদর করছে তাকে তার প্রথম যৌবনের অভিশপ্ত ভালবাসার উচ্ছলতায়।

———

ছায়া ও কায়া

—নাইট বার্ড—

পণ্ডিত মশাই

সুধীর দাসের প্রযোজনায় পপুলার পিক্‌চার্স কর্ত্তৃক কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে গৃহীত। কাহিনী: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা: সতু সেন, প্রধান শব্দযন্ত্রী: মধু শীল, আলোক চিত্রশিল্পী: সুরেশ দাস, সুর শিল্পী: কমল দাসগুপ্ত, ভূমিকালিপি: বৃন্দাবন: রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কুঞ্জ: রবি রায়, ঘোষাল মশাই: তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, তারিণী মুখুয্যে: যোগেশ চৌধুরী, গোপাল ডাক্তার: মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, নিধু: প্রফুল্ল দাস, বৈরাগীদ্বয়: গিরীন চক্রবর্ত্তী ও ভবানী দাস। চরণ: সাগরিকা, কুসুম: শান্তি গুপ্তা, বৃন্দাবনের মা: প্রভা, ব্রজেশ্বরী: রেণুকা ঘোষ, ব্রজেশ্বরীর মা: রাজলক্ষী প্রভৃতি। পরিবেশক: রীতেন এণ্ড কোং, শুভ-উদ্বোধন শ্রীতে শনিবার ২৮শে নভেম্বর, '৩৬।

পণ্ডিত মশাই শরৎ চন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প, এর কাহিনী বাংলার পল্লী-জীবনের এক করুণ আলেখ্য যার সঙ্গে বাংলার পাঠক সমাজের পরিচয় আছে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে। সুতরাং গল্পটির আমূল পুনরুল্লেখ না করে সংক্ষেপে কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করছি—পাঁচ বৎসরের ছোট্ট মেয়ে কুসুমের সঙ্গে বাড়ল গ্রামের অবস্থাপন্ন গৌরদাসের একমাত্র পুত্র বৃন্দাবনের তখন বিবাহ হয়, কিন্তু বিবাহের অনতিকাল পর কুসুমের বিধবা মায়ের নামে গাঁয়ের মধ্যে এক কলঙ্ক ওঠায়, গৌরদাস তার পুত্রবধূকে ত্যাগ করে—বৃন্দাবনের আবার বিবাহ দেন। কিন্তু কুসুমের মা দীন দুঃখী হলেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত গর্ব্বিতা। তাই রাগে তিনি গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানকার একজন আসল বৈরাগীর সঙ্গে কুসুমের কণ্ঠিবদল করালেন। কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে কুসুম বিধবা হয়। তারপর কয়েক বৎসরের মধ্যে গৌরদাস ও বৃন্দাবনের দ্বিতীয় পরিণীতা ইহলোক ত্যাগ করে। বৃন্দাবন জমিজমা তদারক করে

এবং নিজের কুটীরের পাশে একটি পাঠশালা খুলে গাঁয়ের চাষা ভূষোর ছেলে-দের লেখা পড়া শেখায়। কুসুম এখন ষোল বৎসরের যুবতী—দুঃখী ভাই কুঞ্জনাথ গাঁয়ে গাঁয়ে ফেরী করে যা পায় বোনটির হাতে তুলে দিয়ে সে খালাস হয়। তবে এই ক'বছরের ভেতর এই দুই পরিবারের মনের কালি অনেকটা মুছে গেছে—এমন কি বৃন্দাবনের মা বৌকে আবার নিজের ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্য কুঞ্জনাথের বাড়ীতে একদিন গেলেন কিন্তু কুসুম সে প্রস্তাব ঠিক ভাবে গ্রহণ না করায় এদের পুনর্মিলনে তখনকার মত যবনিকা পড়ল। একদিন বৃন্দাবন পুত্র চরণকে সঙ্গে করে এসে উপস্থিত—কুসুম চরণের মা আহ্বানে তাকে কোলে তুলে নিল। বৃন্দাবনের মার সাহায্যে নলডাঙ্গায় গোকুল বৈরাগীর মেয়ে ব্রজেশ্বরীর সঙ্গে কুঞ্জর বিবাহ হয়। এমনিভাবে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে দিন চলে। বিধাতার অভিশাপে বাড়ল গ্রামে মহামারী দেখা দিল—এতে গ্রামশুদ্ধ উজাড় হতে লাগল। বৃন্দাবন তার মাকে অন্যত্র নিয়ে যাবার চেষ্টা করল—কিন্তু ভিটের গৃহদেবতাকে ফেলে রেখে অন্য কোথাও যেতে রাজী হলেন না। অবশেষে বৃন্দাবনের গৃহেও বিসূচিকা রোগ দেখা দিল—তাতে বৃন্দাবন মা হারালো এবং তার একমাত্র আদরের পুত্র চরণও সে রোগে আক্রান্ত হ'লো।

ব্রজেশ্বরীর মুখে চরণের রোগের কথা শুনে কুসুম শিউরে উঠল—তাকে রক্ষা করবার জন্য কাউকে না জানিয়ে সেই দুর্যোগ-রাত্রে বেরিয়ে পড়লো—স্বামীর আমন্ত্রণে একদিন যেখানে সে যেতে চায়নি। আজ পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় নিজের সমস্ত অভিমান ও দেমাক ভুলে ছুটে চলল নলডাঙ্গায়। দুর্যোগ রাত্রকে অতিক্রম করে কুসুম যখন স্বামীর গৃহে উপস্থিত হলো, তখন চরণ হাসি-কান্নার অতীত স্থানে চলে গেছে। বৃন্দাবন একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল "এসেছ কুসুম—আর একটু আগে এলে চরণের বড় সাধ পূর্ণ হতো। সমস্ত দিন রাত যত যন্ত্রণা সে পেয়েছে, ততই সে তোমার কাছে যাবার জন্য কেঁদেছে—কি ভালই তোমাকে সে বেসে-ছিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে কুসুমের চোখে অশ্রুর বন্যা উঠল- মৃত পুত্রকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে তার মনে কোন সান্ত্বনা পেলনা।

এই হচ্ছে গল্পের মূল প্রতিপাদ্য। এমন করুণ ঘটনাকে চিত্রনাট্যকার বহুলাংশে ছেটে কেটে এমন সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন যে দর্শকদের কাছে কাহিনীটি বুঝতে এতটুকুও বাধবে না। সুতরাং এইরূপ সুষ্ঠু চিত্রনাট্য রচনা হওয়াতেই ছবির টেম্পো অনাহত-গতিতে বয়ে গেছে। পরিচালনা কার্য্যে সতু সেন আমাদের বেশ সন্তুষ্ট করেছেন। তার জন্য আমরা সতু সেনকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। পণ্ডিত মশাইয়ের মতন বইকে চিত্রে পরিচালনা করে সেন মশাই যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই প্রসংশনীয়—পপুলার পিকচার্সের যন্ত্রশক্তি ও আবর্ত্তন দেখে তাঁর বিরুদ্ধে যেরূপ ধারণা জন্মেছিল, সত্যি কথা বলতে কি সে ধারণা সেদিন "পণ্ডিত মশাই" আমাদের মনের কোণ হতে মুছে দিয়েছে।

আলোকচিত্র—সুরেশ দাস আজ পর্য্যন্ত যে সব ছবি তুলেছেন তাদের মধ্যে পণ্ডিত মশাইয়ের ফটোগ্রাফী সবচেয়ে ভাল বলতে আমরা দ্বিধাবোধ করবো না। শব্দযন্ত্রের কাজে মধু শীল ও জগদীশ বাবু স্থানে স্থানে ছাড়া মাইকের দ্বারা খুব স্বাভাবিক স্বর গ্রহণ করেছেন দেখে সকলেই খুশী হবেন। আবহাওয়া সঙ্গীত ছবিখানার সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলেছে।

সম্পাদনায়—বৈদ্যনাথ ব্যানার্জ্জি যথাযথভাবে কাঁচি চালিয়েছেন—যার জন্য তিনিও প্রশংসা পাবার উপযুক্ত।

অভিনেত্রীবর্গের মধ্যে খুব ভাল অভিনয় করেছেন রবি রায় কুঞ্জনাথের ভূমিকায়। তার চরিত্রের মনের ভাব নিয়ে তিনি
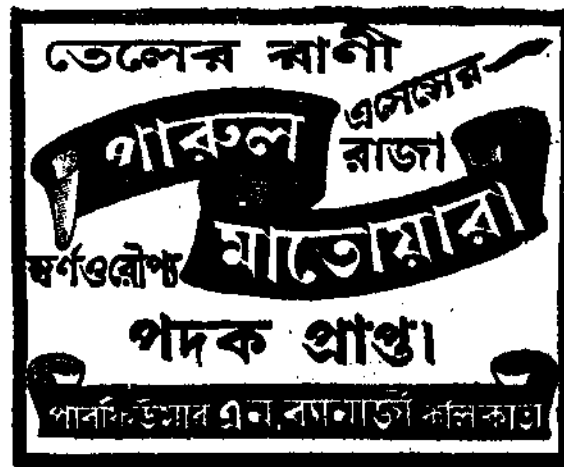
এমন নিখুঁত অভিনয় করেছেন যা সত্যই দেখবার মত। যতীন ব্যানার্জির বৃন্দাবনও আমাদের মুগ্ধ করেছে। ভূষণের ভূমিকায় শান্তি গুপ্তা আগের চেয়ে চলাফেরার জড়তা কাটিয়ে বেশ স্বাভাবিকভাবে অভিনয় করেছেন। একার বৃন্দাবনের মায়ের মধ্যে খুব সুন্দর অভিনয়ের রূপ এনেছিল। চরণের ভূমিকায় সাগরিকা সবাইকে চমৎকৃত করেছে। রেণুকা ঘোষ ব্রজেশ্বরীর ভূমিকায় বেশ উত্তরে গেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, প্রফুল্ল দাস, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি চরিত্রোপযোগী অভিনয় করেছেন। বৈরাগীদের গান আমাদের মনে তৃপ্তি দিয়েছে। মোটের ওপর পণ্ডিত মশাই দেখে আমরা সত্যই খুসী হয়েছি, এবং আর একটা দিক লক্ষ্য করলাম—শরৎচন্দ্র যেমন পুস্তক লিখে পাঠকদের যেমন আনন্দ দিয়েছেন, পপুলার পিকচার্সও তদুপযোগী চিত্র গঠন করে দর্শকদের তার চেয়ে কম আনন্দ দেননি।

নিউ থিয়েটার্স

এইবার প্রতিবাদের তোয়াক্কা না রেখে ঘোষণা করা যায় যে, ডিরেক্টর দেবকী বসু নিউ থিয়েটার্সে ঢুকেছেন। গত ১৫ই নভেম্বর তারিখ তিনি নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। দেবকীবাবু বি ইউনিটে এইবার ছবি তুলবেন; একই গল্পের বাংলা ও হিন্দী সংস্করণ। দেবকী বাবুর লেখা 'বৈকবী' নামে একটা গল্প এই ছবি দুইখানির আখ্যানভাগ হবে। মিঃ বি, এন সরকার গল্পটি অনুমোদন করেছেন। এই ছবি দুইখানিতে উমা, পাহাড়ী, কৃষ্ণচন্দ্র এবং যদি কানন বালা ছেড়ে আসেন তা হলে তাকেও দেখা যাবে।

হেমচন্দ্র তার 'অনাথ আশ্রমে'র কয়েকটী বাহিরের দৃশ্য তোলবার জন্যে খণি অঞ্চলে গেছেন।

মায়া

প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালিত "মায়া"ই হবে চিত্রায় বড়দিনের আকর্ষণ। শ্রীযুত নীতিন বসুর পরিচালিত "দিদি" সম্পূর্ণ হতে এখনো প্রায় ১৫ দিন লাগবে। আমরা শুনছি, 'মায়া' নতুন ধরণের ছবি হয়েছে, প্রতি দৃশ্যেই লোকে নতুনত্বের আস্বাদ পাবে। এতে অভিনয় করেছেন পাহাড়ী, যমুনা, সিতারা, আজুরি, বোকেন চট্টোঃ, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতি।

নিউ থিয়েটার্সের হিন্দী 'মায়া'ও বড়দিনের সময় নিউ সিনেমায় আসর দখল করে থাকবে। ছবিখানি বাইরে খুব খ্যাতি অর্জ্জন করেছে।

বিষবৃক্ষ

রাধা ফিল্মের নবতম চিত্রাবদান বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' আগামী ১৫ই ডিসেম্বর রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করবে। ছবিখানির পরিচালনা করেছেন ফণী বর্ম্মা এবং ছবি তুলেছেন বীরেন দে। এতে অভিনয় করেছেন কাননবালা, শান্তি গুপ্তা, মীরা দত্ত, রেণুকা, অহর গাঙ্গুলী, ভূমেন রায়, কুমার মিত্র, তারক বাগচী প্রভৃতি। চিত্র পরিবেশনের ভার গ্রহণ করেছেন প্রাইমা ফিল্মস্ লিঃ। শ্রীযুত অখিল নিয়োগীর লেখা 'কীর্ত্তিমান' নামে একখানি এক রীলের কমিক ছবি তোলা হচ্ছে। অখিলবাবুই তার পরিচালনা করছেন। রূপবাণীতে বিষবৃক্ষের সঙ্গে এই হাসির ছবিখানি দেখানো হবে।

দেবদত্ত ফিল্মস্

ষ্টুডিয়োর জুইটী শিফ্‌ট এখন মাদ্রাজের রয়াল টকিজ এবং মাজাজের চন্দ্র। ফিল্মসের দুইখানি তামিল ছবি তোলা হচ্ছে।

শ্রীযুত তড়িৎ বসু বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা'র চিত্রনাট্য তৈরী করে বসে আছেন। ঐ দুটি কোম্পানীর ছবি তোলায় ষ্টুডিয়ো খালি না থাকায় শ্রীযুত বসু কাজ আরম্ভ করতে পারছেন না। তবে 'ইন্দিরা'র মহলা খুব জোরসে চলছে এবং খুব শিগগিরই ছবি তোলা আরম্ভ হবে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্

উত্তরার 'সোনার সংসার' এখনও পূর্ব্ববৎ চলছে। বড়দিনের সময়ও ছবিখানি এইরকম ভাবেই চলবে বলে মনে হচ্ছে। এই শনিবার থেকে ছবিখানি ৯ম সপ্তাহে পদার্পণ করলো।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া তাদের সিডিউল অনুযায়ী ছবি তোলা শেষ করেছেন এবং আবার শীঘ্রই ছবি তোলা আরম্ভ করবেন।

আলিবাবা

শ্রীযুত মধু বসুর পরিচালনায় 'আলিবাবা'র চিত্র গ্রহণ বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আমরা খবর পেলাম আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে 'বিষবৃক্ষে'র পরেই 'আলিবাবা' রূপবাণীতে মুক্তিলাভ করবে। সম্ভবতঃ ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মুক্তিলাভ করবে। আর এও শুনলাম যে, 'আলিবাবা' এক সপ্তাহ নিউ এম্পায়ারেও দেখানো হবে।

রূপবাণী

শনিবার ১২ই ডিসেম্বর থেকে যে সপ্তাহ সুরু হবে সেই সপ্তাহ বিজয়ার শেষ সপ্তাহ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্য সপ্তাহ বিজয়ার ৯ম সপ্তাহ।

মঙ্গলবার ১৫ই ডিসেম্বর থেকে রাধা ফিল্মের বহু প্রতীক্ষিত চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" এই চিত্র গৃহে প্রদর্শিত হবে। এই ছবিতে ঝড় বৃষ্টির যে চিত্র গ্রহণ করা হয়েছে তা নাকি সত্যই বিস্ময়কর। পরিচালক হিসাবে ফণি বর্ম্মা নূতন কিছু দেখাতে পারবেন বলে মনে হয়। প্রকাশ, কুন্দের ভূমিকায় কাননবালা এবং সূর্য্যমুখীর ভূমিকায় শান্তি গুপ্তা অতি উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেছেন।

মাণিকজোড় লরেল-হার্ডি

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

ষ্টান লরেল বলিতেছেন—ষ্টেজে গিয়া এক ভদ্রলোককে দেখিলাম। তিনি আমায় দেখিয়া স্মিতহাস্য মুখে বলিলেন, তুমি শ্রীযুত জেফার্শনের পুত্র! বল, আমি কি করিতে পারি তোমার জন্য? আমি বলিলাম আমি আসিয়াছি ফ্রেড কার্ণো মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে। তিনি বলিলেন—তিনি তোমার সামনে।

আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বিস্ময়ে আমি হতবাক্! আমি মনে মনে তাঁর চেহারা কল্পনা করিয়াছিলাম মস্ত মোটা ভদ্রলোক—মোটা গোঁফ আছে—ডগা মোম মাখাইয়া চোস্ত রাখিয়াছেন!

কিন্তু চেহারা দেখিয়া বিস্মিত! আমি তাঁকে সংক্ষেপে বলিলাম—হাস্যকৌতুকের অভিনয় আমি করিতে চাই।

তিনি বলিলেন—হাসাইতে পার? কি কাজ কর এখন? আমার সামান্য অভিজ্ঞতার পরিচয় আমি দিলাম। তিনি শুনিলেন, শুনিয়া বলিলেন, বেশ কথা। আমি তোমায় কাজ দিব। সপ্তাহে দু'পাউণ্ড বেতন পাইবে। ম্যাঞ্চেষ্টারে আমার যে সম্প্রদায় আছে, সেখানে ফ্রাঙ্ক ও নীল আমার কাজ চালাইতেছেন। আমার কোম্পানীর নাম মামিং বার্ডস্, সেখানে যাও—গিয়া মনে বেশ জোর করিয়া কাজে লাগিয়া যাও। কোন ভয় নাই। ক'সপ্তাহ পরে আমি লণ্ডনে ফিরিব। সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হইবে। কালই যাত্রা কর।

আকস্মিক সাফল্যের আনন্দে আমি আত্মহারা হইলাম। আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলাম। তাঁর পরিচয়-পত্র লইয়া আমি পথে বাহির হইলাম। মাথা ঘুরিতেছিল।

ফ্রেড কার্ণোর সম্প্রদায়ে কৌতুকরসের অভিনয় করিতে পাইবার ভাগ্য—সে যে বহু পুণ্যে ঘটে! এক কথায় আমার এমন সুযোগ মিলিল—মনে হইল, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ত আমার চিরদিনের বাসনা পরিতৃপ্ত হইবে!

মামিং বার্ডস্ সম্প্রদায়ের নাম তখন প্রচুর খ্যাতিসম্পন্ন। আমি সে সম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকার পাইলাম। উন্নতির মার্গ আমার সামনে দেখিলাম মুক্ত! আনন্দে মত্ত হইয়া ট্রেণে চড়িয়া ম্যাঞ্চেষ্টারে আসিয়া নামিলাম। ষ্টেশন হইতে থিয়েটারে আসিলাম প্রায় যেন ছুটিয়া। থিয়েটারে তখন কার্ণো-কোম্পানীর রিহার্শাল চলিয়াছে বিপুল সমারোহে।

আমি সদম্ভে আত্মপরিচয় দিলাম—আমার নাম ষ্টান জেফার্শন। আমি আসিয়াছি। তখনও আমি লরেল নাম গ্রহণ করি নাই বা সে নাম গ্রহণের কল্পনাও আমার মনে তখন স্থান পায় নাই।

সম্প্রদায়ের ম্যানেজার এবং প্রধান রঙ্গাভিনেতা মিষ্টার ও'নীল আমায় সমাদরে গ্রহণ করিলেন। এবং সেদিন সন্ধ্যায় আমায় দিলেন একটা বিশ্রী বেমানান ড্রেশ-স্যুট; দিয়া বলিলেন, ঐ পোষাক পরিয়া

আমাকে দর্শকের ভূমিকায় নামিতে হইবে। ম্যাজিক বার্ডস্—কৌতুক নাটিকা—আমার উপর আদেশ হইল, বক্সে বসিয়া অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়-ভঙ্গী লক্ষ্য করিবার জন্য।

মেক-আপ করিয়া পোষাক পরিয়া আমি মহানন্দে গিয়া বক্সে বসিলাম। ঠিক আমার ভূমিকায় রিহার্শাল সুরু হইবে, এমন সময় মিষ্টার ও'নীল আসিয়া বলিলেন এখনই তোমাকে একবার রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইতে হইবে—একটা জরুরী পার্শেল আসিয়াছে, সেই পার্শেল আনিতে।

নিরাশ চিত্তে মুখের রঙ মুছিয়া সে পোষাক ফেলিয়া আমি ছুটিলাম ষ্টেশনে। কোথায় পার্শেল? নামগন্ধ নাই। কিছুক্ষণ পরে থিয়েটারে ফিরিলাম তখন রিহার্শাল শেষ হইয়া গিয়াছে।

তারপর প্রথম পর্ব্বের অভিনয়। আবার রং মাখিলাম, পোষাক পরিলাম—তৈয়ারী। সহসা সংবাদ আসিল, সেই হারান পার্শেল ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমাকে এখনই ষ্টেশনে যাইতে হইবে সে পার্শেল আনিতে।

আবার রং মুছিলাম, সাজ খুলিলাম এবং ক্ষুণ্ণ মনে ষ্টেশনে চলিলাম। আবার সেই গোলযোগ। পার্শেল নাই। যখন থিয়েটারে ফিরিলাম, তখন অভিনয় শেষে জাতীয় সঙ্গীতের রাগিনী জাগিয়াছে। এমনইভাবে কার্নো সম্প্রদায়ের দলে আমার প্রথম প্রবেশরাত্রি। ক'দিনের পর বুঝিলাম, আমাকে লইয়া রঙ তামাসা চলিয়াছিল।

তারপর মিলিল ভূমিকা। সাজসজ্জা করিয়া তৈয়ার, সহসা ঘটিল বিঘ্ন। পোষাক বিভাগের অভিনেত্রী আসিয়া বলিল—একজন নূতন রঙ্গাভিনেতা আজ মিষ্টার ও'নীলের ভূমিকায় নামিতেছেন মাতাল গোয়েন্দের ভূমিকা। তার যোগ্য পোষাক নাই; তুমি যে পোষাক পরিয়াছ, সেটা তাকে ফিট করিবে। অতএব ও পোষাকটা চট করিয়া দাও।

মন ভাঙ্গিয়া গেল। পোষাক ছাড়িয়া সেটা লইয়া নূতন রঙ্গাভিনেতার সাজঘরে গেলাম তাকে সে পোষাক দিতে—লোকটি দেখিলাম খাশা। কাল কোঁকড়া চুল, নীল চোখ, দুধের মত সাদা দাঁত এবং মুখে বেশ প্রীতিভরা হাসি তাঁর সঙ্গে বেশ বনিল এবং দু'তিন দিনে তাঁর সঙ্গে জমিল সুগভীর সখ্য।

এই রঙ্গাভিনেতাটির নাম—বিশ্ববিখ্যাত চার্লি চ্যাপলিন, তখন অবশ্য এ খ্যাতি তাঁর ছিলনা।

নূতন প্রহসন পঙ্করঙ্গে আমরা রিহার্শাল সুরু করিলাম। চার্লির ছিল প্রধান ভূমিকা—আমি তার একজন অনুচর।

একদিন ফ্রেড কার্নো আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন, না—চার্লি যেভাবে এ ভূমিকা অভিনয় করিতেছে, আমার তা পছন্দ নয়।

একথায় চার্লি বলিল—কে চায় ও ভূমিকা! আমায় রেহাই দিলে আমি কৃতার্থ হইব। ও ভূমিকায় আমি নামিবনা।

চার্লি দিল ভূমিকা ছাড়িয়া। কে তখন এ ভূমিকা লইবে! মহা সমস্যা, কর্ত্তা আমায় বলিলেন—তুমি লও এ ভূমিকা। পারিবে ত?

তোৎলামির স্বরে বলিলাম—চেষ্টা করিয়া দেখিব। সে ভূমিকা আমি পাইলাম।

অবশেষে আসিয়া দেখা দিল প্রথম-রজনীর উদ্বোধন-উৎসব। একসঙ্গে

দেবদত্ত ফিল্ম্‌স্

(প্রাপ্ত)

শ্রীযুত দেবদত্ত শীল মহাশয় ধনী যুবক—চিত্র ব্যবসায়-ক্ষেত্রে নবাগত: তিনি শিক্ষিত, উদারহৃদয় ও নিতান্ত ভাল মানুষ। তাঁহার মনে যখন এই ব্যবসায়ের পরিকল্পনা জাগে, তখন তিনি ব্যাপারটা ব্যক্তিবিশেষের কূটকৌশল-বাণীতে মুগ্ধ হইয়া যেমনটি বুঝিয়াছিলেন, এই এক বৎসর কাল কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া ঠিক তাহার উল্টা সত্য তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন। মাস কয় পূর্ব্বে জ্যোতিষবাবুর কেরামতিতে "রজনী" যেরূপ ঘোর অমবস্যাময় হইয়া পড়িল, তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। "রূপবাণীর" সাদর ও সংজ্ঞযোগ আহ্বানে চিত্রমুক্তি দেখিয়া বহু ব্যোমভোলা সমালোচক কীল্ খাইয়া কীল্ চুরি করিয়া আসিলেন; দরিদ্র সপ্তাহিকের সম্পাদককূল বিবেক বেচারাকে বহু কষ্টে দাবাইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া যে কিকে রঙের প্রশংসাপত্র জাহির করিলেন, তাহার যথার্থ রহস্য বহু চতুর ভাবীদর্শকের কাছে ধরা পড়িয়া গেল। এক কথায়, শীল মহাশয়ের "রজনী" নির্ম্মাণে যতটা ব্যয় হইবার কথা নহে—তদপেক্ষা বেশী ব্যয়

দু'জায়গায় একই বইয়ের অভিনয়—সময়ের একটু পার্থক্য। আমরা বাসে চড়িয়া ছুটাছুটি করিতাম। শীতকাল, অভিনয়ে সাফল্যলাভ করিলাম।

হইল, অথচ ব্যবসায় দিক্ হইতে তাহা প্রায় বিফল বলিয়া প্রমাণিত হইল। প্রথম উদ্যম এই ভাবে মাঠে মারা যাইতে দেখিয়া চিত্রামোদীরা যেমন ধিক্কার দিলেন, যাঁহার 'কাপুড়া' কাটিল তিনি ততোধিক মর্মাহত হইলেন। হইবারই কথা।

অতঃপর কতকগুলি যুক্তিযুক্ত কারণেই জ্যোতিষবাবুকে মনস্থলগনীর মায়া কাটাইতে হইল। কিন্তু যাঁহারা রহিয়া গেলেন, তাঁহাদের মায়া আবার দেবদত্ত বাবু কাটাইতে পারিলেন না। নিজে এ ব্যবসায় অপরিপক্কবুদ্ধি হইয়াও তিনি ভাঙা হাট সরগরম করিবার চেষ্টা করিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে গোড়া হইতেই সুপক্ক তাস-পাতি ভাবিয়া তোকা সুখে বত্রিশ পাটি দন্ত সহায়তায় কামড় বসাইতেছিল, তাহাদের কেহ কেহ সরিল বটে, কিন্তু অধিকাংশই মুখে 'তোবা' করিয়া তাঁহার আশ্রয়ে রহিয়া গেল। মাদ্রাজী চিত্র সংগঠনকারীদের কাড়া জুটাইয়া দিয়া কেহ কেহ তলে তলে টু পাইস্ কমিশন্ পকেটস্থ করিবার যোগাড়ও নাকি করিতে লাগিল; যাহারা গ্রীষ্মকালে বাসে চড়িয়া মাথায় লাল পাগু জড়াইত, তাহারা ষ্টুডিয়োর এক-একখানি ঝরঝরে মোটরে চড়িয়া শীতকালে পরমানন্দে শাক আলু খাইতে সুরু করিল।

শুভাকাঙ্খা, আত্মীয়তা, ও বন্ধুত্বের দোহাই দিয়া কেহ কেহ উপযাচক হইয়া, ষ্টুডিয়ো পরিচালন ও চিত্র-প্রস্তুতের বর্ণ পরিচয় না রপ্ত করিয়াই এই সদ্যোজাত শিশু-প্রতিষ্ঠানটীকে বাঁচাইবার ভার গ্রহণ করিলেন। দেবদত্ত বাবু চক্ষুলজ্জার খাতিরে মুখ ফুটিয়া কাহাকে কিছু বলিতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহার পেশীই পূর্বাপেক্ষা যৎকিঞ্চিৎ লঘু হইলেও; মাদ্রাজী পেট্রোল, গরম চা ও বেজিটেবল্ চপ্ সমান টানে নিত্য বৈকালে খরচ হইতে লাগিল। কচ্ছপ গতিতে মাদ্রাজীদের ছবি তোলা হয়, মাঝে মাঝে ফাঁক পাইয়া দেবদত্ত বাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বপ্রবোধিত "ইন্দিরার" দু' একটা সুটিং গ্রহণ করান। ইন্দিরার ডিরেক্টর তড়িৎবাবু বেচারা সহকর্মী ও কর্তৃপক্ষগণের মতিগতি ও মন্থরগতি দেখিয়া নাকি রীতিমত ঘামিয়া উঠিতেছেন। তাঁহাকে মৌখিক সমবেদনা করা ছাড়া আর উপায় নাই।

দেবদত্ত বাবুর অজস্র অর্থ একটা চিত্র প্রতিষ্ঠানের সফলতার পশ্চাতে নিয়োজিত দেখিয়া বাঙালী মাত্রেরই মনে যেমন আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তেমনি গোড়া হইতে এতাবৎকাল তাহার অপব্যয়, অপ-ব্যবহার ও দৃঢ় ব্যবসায় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠান-স্থাপনের শৈথিল্য ও ক্ষেত্রপাত্র নির্বিচারে যথাতিরিক্ত অনুগ্রহ বা সৌজন্য প্রদর্শন-ব্যাপারের গন্ধ পাইয়া তাহাদের ক্ষুব্ধ হইবার কথা। নিজের পয়সা যদৃচ্ছা খরচ করিবার স্বাধীনতা অবশ্য সকলেরই আছে; কিন্তু সে পয়সা যখন সাধারণের মনস্তুষ্টি করিবার বা তাহাদের খোপার্জিত অর্থব্যয়কারক কোন প্রয়াসে নিয়োজিত করা হয়, তখন সাধারণের সেই প্রয়াসটির নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। সেইজন্য আমরা দেবদত্ত ফিল্মসের আমূল সংস্কার চাই, দ্রুত উন্নতি দেখিতে চাই এবং অবিলম্বে প্রথম শ্রেণীর চিত্রের মুক্তি দেখিতে চাই।

দেবদত্তবাবুর নিকট অনুরোধ যে, তিনি এমন একটি দল গঠন করুন, যাঁহারা মোটা মাহিনার পরিবর্তে মোটা কাজ দেখাইতে পারিবেন, যাঁহারা সত্যকার মগজ দিয়া তাঁহাদের কর্তব্যের মূল্যবান অভিজ্ঞতা নিয়োজিত করিবেন, যাঁহারা অমুক ডিরেক্টরের ভাই বা ভাগিনা বলিয়া টাকার তোড়ার সহিত ডিরেক্টরী গড়গড়ার তামাক টানিবার অধিকারী হইবেন না, যাঁহারা স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার' হইয়া তাঁহাকে ব্যবসায়ের অতলে প্রবেশ করিতে দিতে সঙ্কোচ করিবে না। আমরা বহুবার শুনিয়াছি তাহাঁর মনে হয় যে, এখনো তাঁহার ষ্টুডিয়োর একজন সুদক্ষ ম্যানেজার ও চৌকষ প্রচার সম্পাদকের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলে, কোন চিত্র-প্রতিষ্ঠানেরই কোনকালে উন্নতি হইতে পারে না। তারপর, ভালো ডিরেক্টর, শব্দযন্ত্রী, অভিনেতা-অভিনেত্রী তো আছেই।

সচিত্র সাপ্তাহিক
দ্বিতীয় বর্ষ—৪৪শ সংখ্যা
শুক্রবার—১৭ই পৌষ
১৩৪৩
১লা জানুয়ারী—১৯৩৭
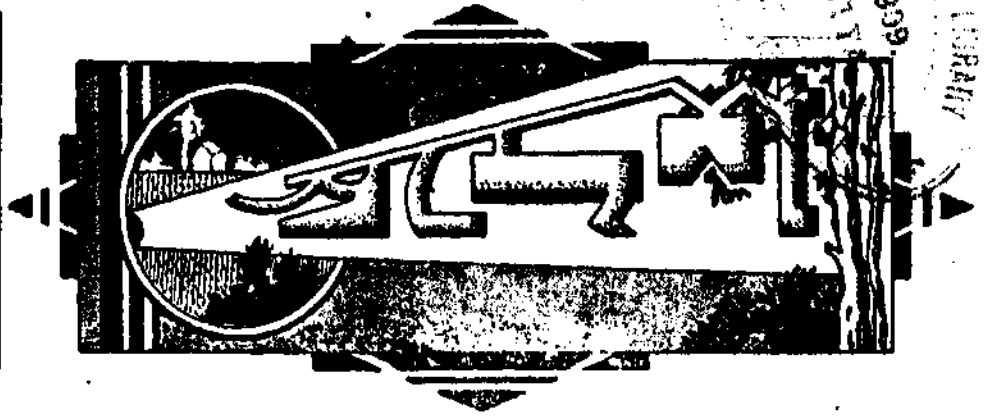
সিদ্ধিলাভ

জগতের উপর দিয়া নিত্য নূতন পরিবর্ত্তনের যে স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহার ঘাত-প্রতিঘাতে বিশ্বমানবের ভাবধারা আজ উদ্দাম গতিতে চলিয়াছে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পথে। পরাধীনতার প্রাকার বেষ্টিত বিচিত্র জীবনে অভ্যস্ত হইলেও জাগতিক ভাব ধারার এই সজ্যাত সংঘর্ষ আজ ভারতবাসীর অন্তরকেও স্পর্শ করিয়াছে। বিশ্বের এই অগ্রগতির সহিত সমান তালে, পা ফেলিয়া তাহাকেও আজ চলিতে হইবে—চলিতে হইবে নির্ভয় চিত্তে, অকম্পিত চরণে। তাহার এ চলার পথে হয় তো শত সহস্র বাধার হিমালয় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে—প্রতি পদক্ষেপে বাধা দিবে স্বার্থপরের প্রভুত্বের প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু দুর্গম পথের যাত্রী যাহারা, বিপদের বজ্র বুক পাতিয়া তাহাদিগকে বরণ করিতে হইবে—ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য স্বার্থসঙ্কীর্ণতার তুচ্ছ মোহ ত্যাগ করিয়া, অভীষ্টের অভিসারে অগ্রসর হইতে হইবে।

ফৈজপুরে ভারতের মহামানবের সাগরতীর হইতে মাতৃপূজার প্রধান ঋত্বিকের কণ্ঠে এই আহ্বান বাণীই উৎসারিত হইয়াছে। সে বাণীর প্রতি ছত্রে বিচিত্র সুর লহরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে জাতির জাগরণী গান। শীতের ভুজঙ্গের ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা তাহার চলিবে না, নৈরাশ্য ও অবসাদের জড়তা ত্যাগ করিয়া তাহারও সমাজ এবং রাষ্ট্র জীবনের বীণাখানিকে আজিকার নিখিল বিশ্বের দীপক রাগিনীর সুরে বাঁধিয়া লইতে হইবে।

সার্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া মাতৃপূজার অধিকার শুধু তাহারাই লাভ করিয়া আসিয়াছে, জাতির মেরুদণ্ডের সহিত যাহাদের প্রাণের কোন স্পর্শ নাই, শিক্ষা সভ্যতা ও আভিজাত্যের অভিমান মানুষের সহিত মানুষের মিলনের পথে যেখানে দুরতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করিয়াছে, মানুষের রচা সেই বাধার নিগড় ভাঙ্গিয়া মাতৃপূজার প্রাঙ্গনে আজ তাহাদিগকেই সাদরে আহ্বান করিতে হইবে অজ্ঞতা, উপেক্ষা ও দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিষ্পিষ্ট হইয়া যাহারা মুষ্টিমেয় প্রগতিশীল জাতিকে টানিতেছে পশ্চাতের দিকে।

ভারতের শ্যামল ছায়াচ্ছন্ন পল্লী কুটিরে যে গণ-নারায়ণ আজ সুপ্ত, মহাশক্তির ধ্যানমগ্ন সেই গণ-নারায়ণকে আজ জাগাইতে হইবে, নব জাগরণের মন্ত্রে তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সার্দ্ধ শতাব্দীর জাতীয় যজ্ঞে যাহারা আমন্ত্রিত হয় নাই, অপাংক্তেয় বলিয়া অনাদর ও অনাদরে উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, প্রণানত চিত্তে সেবার দান লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে সেই দীনহীন বেদনা মৌন গণ-নারায়ণের দ্বার প্রান্তে। তাঁহাদের সেবাই সার্থক করিয়া তুলিবে আমাদের রাষ্ট্রীয় সাধনাকে, শক্তিশালী করিবে জাতীয় জীবনকে, সমাজ জীবনকে করিবে কুসংস্কারের বাধামুক্ত—আর তাহারই দুর্ব্বিবার শক্তিতে আমরা লাভ করিব আজিকার রাষ্ট্রীয় সাধনায় বাঞ্ছিত সিদ্ধি।

রাজনীতির কাণামাছি

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

রাজনীতির কাণামাছি আমরা চলতে ফিরতে সর্ব্বদাই শুধু ঐ জীবটিকে অত্যন্ত বিশেষভাবে নিয়ে ফেলি বলে ওকে কাণা-মাছি বলে চিনি নে। রাজনীতির কাণামাছি খেলায়ও এই কাণামাছির চোখে থাকে ফেট্টি বাঁধা আর তার মাথায় পড়ে চটাপট চাঁটি। এই অবস্থায় চাঁটির পর চাঁটিতে অস্থির হয়ে ফেটা বাঁধা জীবটি দু'হাত মেলে অস্থির ঘুরপাক খেতে থাকে যা হোক একটা কিছুকে জাপটে ধরবার দুরাশায়। মানুষ জানে না কিসে তার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হবে, এ বিষয়ে সে একেবারে কাণা। সে কিন্তু অকপটে একথা স্বীকার করে, করে না শুধু ঐ পলিটিক্সের কানা মাছি। স্বীকার করলে তার খেলা জমে না, তার নেতার চাপরাশ যায় ছুটে।

* * *

তোমরা বলবে কাণা মাছি কি শুধু রাজনীতিতেই আছে, "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ" :—একি সমাজ সংস্কারে ধর্মক্ষেত্রে মুদ্রানীতিতে চলছে না? চলছে বই কি, চোখে ফেট্টি বাঁধা কাণামাছি সর্ব্বত্র সর্ব্ব-ক্ষেত্রেই বন্ বন্ করে ঘুরছে আর মুহুর্মুহু চাঁটি খাচ্ছে। জীবনের সমস্যাগুলোই হচ্ছে এই চাঁটি; প্রত্যেক পলিটিকাল, সোশ্যাল, রিলিজিয়াস্ কাণামাছিকে এই প্রব্লেমের নির্দ্দয় চাঁটি তাড়িয়ে আনে পাবলিক লাইফে এবং চাঁটিয়ে বের করে সেই লোভনীয় পাবলিক লাইফ থেকে নগণ্যতার পাদাড়ে। আজকের আপ্-টু-ডেট নেতা কালকে আউট-অব-ডেট হয়ে বিস্মৃতি ও উপেক্ষার পঙ্কে ডুবে যাচ্ছেন। তবু এ ঝকমারী মানুষকে করতেই হবে।

* * *

সই, কে বলে করম ভাল?
দেশের লাগিয়া করম করিয়া
কাঁদিয়া জনম গেল।

এই বুক ফাটা দুঃখ নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ গেছেন, দেশবন্ধু গেছেন, মহাত্মাজী গেছেন, আর বাদ বাকি যাঁরা আছেন গরম মস্তের টাল মাটাল ঢেউয়ের ধাক্কায় তাঁরাও একদিন যাবেন। ভবের রঙ্গমঞ্চে দু'দিনের নাকে, কাঁদা তার পরে সবই ফক্কিকার। কিন্তু যখন এই মঞ্চে যাঁকে মাজা দুলিয়ে নাচতে হয় তখনই এই ভেবে নাচতে হয়, যে এ আসর আর কখনও ভাঙবে না, এ আলো রোশনাই বাদ্য সাজসজ্জা জনম অবধি কায়েম থেকে যাবে। তাই চক্ষু না থাকলেও কাণা-মাছিকে এলো পাতারি ছুটোছুটি করতে হয়, যাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় তাকেই ধরতে হয় জাপটে। একটা ইলিউসিভ প্রব্লেমকে একটা সমস্যার মায়ামৃগকে না কাৎ করতে পারলে এ অন্ধত্ব যে ঘুচবে না।

* * *

প্রগতি মানুষের চাই, পাঁচ পা এগিয়ে সাত পা পিছিয়ে যেমন করেই হোক প্রগতি মানুষের দরকার। এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকাই মৃত্যু আর খুব খানিকটা নড়াচড়া ঝম্পঝম্পই জীবন। সৎভাস্তা লয়েলের প্রাণপণ দরকরাজী এই হচ্ছে প্রগতির মোটিভ পাওয়ার—অনু-প্রেরণা। জীবনে যখন ছারপোকার মত ক্রমবিবর্দ্ধমান প্রব্লেম আছে তখন তার সমাধান থাকাও লজিকালী সম্ভব। প্রব্লেম বা সমস্যার সমাধান নাই বা সে বস্তু চিরদিনই 'ইলিউসিভ লাইফ' শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা তাড়িত বিদ্ধ মায়া মৃগবৎ একথা মেনে নেওয়া চলতে পারে না। তা মেনে নিলে মানুষের হাঁড়ি ও কলসী সংযোগে মা গঙ্গার পুণ্য বক্ষে অবগাহন ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। প্রাণপণে ভাবতে হবে সমস্যার আছে সমাধান এবং হাত পা ছুঁড়ে তার প্রচেষ্টা করে দেখাতে হবে যে, এই তার সমাধান।

* * *

মানুষের মুক্তি যেমন আজও কোথাও কোন্ দেশেই আসে নি অথচ 'মেক্ বিলিফ' মুক্তি যুগে যুগে দেশে দেশে প্রচুর এসেছে, প্রত্যেক প্রব্লেম তেমনি বার বার বহু ক্ষেত্রে বহু কাণামাছি দ্বারা সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু দুর্দ্দৈব এই যে, রক্ত বীজের জাতের মত প্রব্লেমগুলো মরেও মরে না, সমাধান হয়েও আবার ডিম পাড়ে এবং পিল পিল করে সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে রক্ত শোষণ করে। মানব সমাজের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের সমস্ত সমস্যাগুলিকে এমন কায়দায় বগলদাবা করে ঠেসে ধরার পরও তারা কখন যে বেমালুম পিছনে যায় তা টেরও পাওয়া যায় না। পুনরপি চলে কাণামাছির খেলা, পুনরপি চলে চাঁটি ও নেতার অন্তর্দাহ।

*   *   *

এই যে লীলার আন্তহীনতা—এটার দিকে লক্ষ্য না করে আমরা ভাণ করতে থাকি যে ওটা গজ কাঠি দিয়ে মাপা যায়। ওটার আদি তো আছেই, অন্তও আছে। নব নব প্রগতির ফিরিস্তি দিয়ে আমরা ভাবি দুর্ব্বোধ্য সমস্যাগুলো যেন জলের মত সরল, দু'টো তুড়ি মেড়ে ওদের কিনারা করে ফেলা স্রেফ ছেলেখেলা। আমি এতদিন বুদ্ধির গজকাঠি নিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই নি বলেই যা কিছু গণ্ডগোল বেধেছে। এইভাবে পরকে, জগৎকে ও দেশকে ঠকাতে ঠকাতে আমরা নিজেকেও ঠকিয়ে বসি। তারপর জমে ওঠে কাণা-মাছির আসর। তা ছাড়া কাণামাছিকে ঘিরে চলে কি জান?—

"জয়নাল ফকিরে বলে বন্দে মাতা গাও
ধন্দে থেকে ভাটের লাগ্যা
পকেট মাইর‍্যা যাও।"

———

ফৈজপুর কংগ্রেস

লোকমান্য তিলকের পুণ্যস্মৃতিপূত মহা-রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র পল্লী ফৈজপুরে এবার কংগ্রেসের পঞ্চাশৎ অধিবেশন হইয়া গেল। জাতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভার সার্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপী ইতিহাসে পল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন এই প্রথম হইল, ইহাই এবারকার কংগ্রেসের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যে তিনদিন কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া-ছিল, সেই তিনদিনই মহারাষ্ট্রের দূরবর্ত্তী পল্লী গ্রামাঞ্চল হইতে সহস্র সহস্র পল্লীবাসী কৃষক নর নারী ফৈজপুরে সমবেত হইয়া-ছিল। ইহা যে কংগ্রেসের প্রতি পল্লীবাসীর অনুরাগের পরিচায়ক তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে।

কংগ্রেসের অধিবেশন ত হইয়া গেল। এবারকার অধিবেশনে জাতি কোন নূতন কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ পাইল জাতীয় যজ্ঞে আমরা কি ফল লাভ করিলাম, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সার্দ্ধ শতাব্দীকাল পূর্ব্বে যে ক্ষুদ্র জাতীয় প্রতিষ্ঠানটী বোম্বাইয়ে প্রথম জন্মলাভ করে, কালক্রমে ও যুগধর্ম্মের প্রভাবে আজ তাহা নিখিল ভারতের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিত্বমূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কংগ্রেস ভারতে জাতীয়তার যে ভাবধারা প্রবাহিত করিয়াছে তাহাতে সুপ্ত ভারতবাসী লাভ করিয়াছে আর্থিক ও রাজনৈতিক পরাধীনতার বন্ধন বেদনা মোচনের দুর্নিবার প্রেরণা। দীর্ঘ ১৬ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদের নিগড় হইতে জাতিকে মুক্ত করিয়া স্বাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠ করিবার জন্য কত না অভিনব কর্ম্মপন্থাই অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য যে, আজও সে কর্ম্ম প্রচেষ্টা সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই।

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পর হইতে স্বরাজ সাধনার জন্য তিনি যখনই যে পথের নির্দ্দেশ দিয়া-ছেন, আহিমাদ্রি-কুমারিকা ভারতবাসী শ্রদ্ধাবিনতচিত্তে বিপুল উদ্যমে তাহার অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু জাতির সে উদ্দীপনা সেই সীমারেখায় আসিয়া স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে, যে সীমারেখা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে দীন-দরিদ্র-গণ নারায়ণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কংগ্রেস এযাবৎ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ভারতের জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন ইহা সত্য, কিন্তু যে অজ্ঞতা, উপেক্ষা ও দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে জাতির মেরুদণ্ড আজ ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রতিবিধানের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা কংগ্রেসের কর্ম্মতালিকায় স্থান পায় নাই। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ কংগ্রেসের একাধিক প্রকাশ্য অধি-বেশনে কংগ্রেসের পরিচালনাধীনে কৃষক ও শ্রমিক সঙ্ঘগুলি নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু আজও তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ট্রেড ইউনিয়নিষ্টগণ যে কর্ম্মপ্রস্তাব অনুসরণ করিয়াছিলেন, কংগ্রেস তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। কৃষক ও শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে কংগ্রেসের ছত্রছায়া তলে আশ্রয় দিতে কংগ্রেসের সুবিধাবাদী প্রাচীন পন্থীগণ প্রতিপদে শ্রেণী সঙ্ঘাতের আশঙ্কায় শঙ্কিত ও কুণ্ঠিত হইয়াছেন। তাই ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনা আজ সার্দ্ধ শতাব্দীকাল অতি-

ক্রম করিলেও জাতীয় প্রতিষ্ঠানে, জাতি বলিতে প্রকৃত যাহাদিগকে বুঝায় তাহারা এখনো স্থান লাভ করিতে পারে নাই।

আজিকার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ইহা অবিসংবাদিতভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, জাতীয় প্রতিষ্ঠানের স্বরাজ সাধনাকে সিদ্ধির পথে অগ্রসর করিতে হইলে ভারতের গণদেবতার সহযোগিতা অপরিহার্য্য। সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে মাতৃপূজার মঙ্গলঘট পূর্ণ করিতে না পারিলে মাতৃপূজার সিদ্ধিলাভ হইবে না। প্রতিক্রিয়াশীল দলের প্রভাব মুক্ত করিয়া ভারতের এই গণদেবতাকে মাতৃপূজার ন্যায্য অধিকার কি ভাবে প্রদান করা যায়, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বহুদিন ধরিয়া তাহার আলোচনায় মাথা ঘামাইলেও লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পূর্ব্বে কোন কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে পণ্ডিত জহরলালের নির্দ্দেশক্রমে গণ-সহযোগ কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল কিন্তু গণ-নারায়ণের দুর্ভাগ্যক্রমে কমিটী আজও তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিতে পারেন নাই। পণ্ডিতজী এ জন্য তাঁহার অভিভাষণে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, জাতীয় মহাসভার স্বরাজ সাধনা কেবল ব্যবস্থাপক সভার গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। গণ সহযোগের যে সমস্যা আজ কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সহিত তাহার সমাধান করিতে হইবে। বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে গণদেবতার সমর্থন লাভ করিতে না পারিলে ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে কংগ্রেস যতই সংখ্যাধিক্য লাভ করুক না কেন, তাহাতে কোন ফলোদয় হইবে না।

এই বাঞ্ছিত গণ-সহযোগ লাভের জন্য এবারও সংশোধিতাকারে একটী প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুত মানবেন্দ্র নাথের পরিকল্পনানুযায়ী কংগ্রেসের গঠন-তন্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্যও একটী কমিটী নিয়োগ করা হইয়াছে। এই কমিটী লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে নিযুক্ত গণ-সহযোগ কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধেও বিবেচনা করিবেন। ইতিমধ্যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে প্রতি পল্লীতে, সহরে ও নগরে প্রাথমিক কমিটী সমূহ গঠনের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সব প্রাথমিক কমিটীগুলি স্থানীয় অধিবাসীদিগের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন এবং পল্লীবাসীদিগকে কংগ্রেসের নীতি ও কার্য্য তালিকা বুঝাইয়া দিয়া উর্দ্ধতন কমিটীগুলির নিকট যথারীতি তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিবেন এবং কমিটী ঐ বিষয়ে যথাসম্ভব ব্যবস্থাবলম্বনের নির্দ্দেশ দিবেন।

জাতীয় প্রতিষ্ঠানে জাতির সহযোগিতা লাভের প্রচেষ্টা বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এতদিন তাহা শুধু মৌখিক বাক-বিতণ্ডার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবারকার প্রস্তাবটী যদি প্রকৃত কার্য্যে পরিণতি লাভ করে তাহা হইলে ফৈজপুর কংগ্রেসের স্মৃতি ভারতের জাতীয় মহাসভার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ভোটের গাজন

ভোট যুদ্ধ পুরাদমে আরম্ভ হইয়াছে। দীর্ঘ ৭ বৎসর পরে বাঙ্গলার কাউন্সিল নির্ব্বাচন—তবু দেশবাসীর মধ্যে তেমন উৎসাহ ও উল্লাসের সাড়া পাওয়া যাইতেছে কৈ? যে নির্ব্বাচনের নামে বাঙ্গালার মরা গাঙে জোয়ার বহে, কত 'শুষ্ক তরু মুঞ্জরিয়া উঠে, কত মূক বাচলতা লাভ করে, কত পঙ্গু গিরি লঙ্ঘনের জন্য পায়তাড়া কষিতে থাকে, সে নির্ব্বাচন এবার যেন কতকটা ঢিমেতেতালা চালে চলিতেছে, পূর্ব্বের ন্যায় তেমন জমিতেছে না।

*　　　　*

ইহার কারণ কি? এবারকার নির্ব্বাচনেও বিভিন্ন দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদিগের সংখ্যা তো বিরল নহে। রুই-কাতলা হইতে চুনো পুঁটী পর্য্যন্ত অনেকেই তো এবার ভোট যমুনায় কেলী করিতে নামিয়াছেন, কিন্তু তবু তাহাতে তুফান উঠিতেছে কৈ? এবারকার নির্ব্বাচন কেন্দ্রগুলি যেমন বিস্তৃত তেমনি বিক্ষিপ্ত ভোটদাতাদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নহে, কাজেই ট্যাঁকে যাহাদের মা ভবানী বিরাজ করিতেছেন তাঁদের পক্ষে সিঁড়ি দেখিয়া বাহ্ আড়াইলেও কোৎকার ভয়ে পিছু হটিবার সম্ভাবনাই অধিক।

*　　　　*

ভাগাড়ে গরু পড়িলে শকুনিদের যেমন টনক নড়ে, তেমনি বাঙ্গালার ভোটের ভাগাড়গুলিতে নির্ব্বাচনের গরু পড়ায় বহু পার্থী শকুনিদের টনক নড়িয়া উঠিয়াছে। সেবার আগ্রহে লম্বু বাড়াইয়া তাঁহারা যে যাহার কেরামতি দেখাইবার জন্য কোমর বাঁধিতেছেন। ছলে বলে বা কৌশলে নিজের কার্য্য সিদ্ধির জন্য ইতিমধ্যেই নানা রকম দুর্নীতির খেলা সুরু হইয়া গিয়াছে। এতদিন যাঁহারা সরকারী মগডালে বসিয়া দেশের লোকদিগকে দন্ত বিকাশ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, ভোটের মরসুমে তাঁহাদিগকেও আজ জনসেবকের ভেক ধরিয়া ভোটদাতাদের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। সবচেয়ে তাঁহাদের দুর্ভাবনাই আজ বেশী দেশবাসীর ন্যায়বিচারের কষ্টি পাথরে যে সব ধামাধরাদের মেকী প্রমাণিত হইবার ভয় অধিক।

*　　　　*

কর্পোরেশনে সুরেন্দ্রনাথের কীর্ত্তিনাশা মন্ত্রীবর বিজয় সিংহের বড় আশা ছিল যে, দশহাজারী ভোটের জোরে তিনি এবার-কায়মত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ভোটের পগাড় পাড়ি দিবেন কিন্তু তাঁহার বড় সাধে বাদ সাধিয়াছেন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ ঘোষ মৌলিক মহাশয়। মন্ত্রীবরের খোঁটার জোর সেইদিনই দেশবাসী বুঝিয়া লইয়াছে যে দিন মন্ত্রীবর সগোষ্ঠি মিলিয়া সত্যেন্দ্র নাথের বাড়ীতে তাঁহাকে শাসাইতে গিয়াছিলেন এবং তাহাতে উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিয়া মনোনয়ন পত্র দাখিলের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার জন্য চুঁচুড়া পর্য্যন্ত গুপ্তচর পাঠাইয়াছিলেন। হায় বিজয় প্রসাদ! ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। মন্ত্রী মসনদে সাত বছরী মৌরসী পাট্টা লাভ করিয়া মনে করিয়াছিলে আমি কি হনুরে! কিন্তু এইসা দিন যে নেহি রহেগা এ কথা কি তখন মনে ঠাঁই দিয়েছিলে? সুতরাং আজ মিছে আফশোষে মাথা খুঁড়িয়া মরিলে কি হইবে?

*　　　　*

তোমার কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিলে জীবন কাল না ফুরাবে তবু! আর প্রভাসের ধামা ধরা গিরি করিয়াও ওকালতীতে ইন্‌কমট্যাক্স দিবার মত রুজি রোজগার যাহার হইত না, সেই তুমি কি ভাবে কুমার শিখরকে ভাওতা দিয়া মন্ত্রীর মসনদে বসিয়া বৎসর বৎসর দরিদ্র দেশের চৌষট্টি হাজার টাকা পকেটস্থ করিয়াছ দেশবাসী তাহা অবিদিত নহে। কর্পোরেশনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের কীর্ত্তিনাশ, ব্যবস্থাপক সভায় দমন আইনের অন্ধ সমর্থন, এ দুর্দ্দিনে দরিদ্র প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট জারী ও দামোদর ক্যানালের গুরু ভারের বোঝা চাপাইয়া দিয়া তুমি যে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছ, তাহার যোগ্য পুরস্কার হইতে এবার দেশবাসী তোমাকে অবশ্যই বঞ্চিত করিবে না। দেশের দুর্দ্দশা লইয়া এই কয় বৎসর তুমি যে বেসতি চালাইয়াছ, দেশবাসী এবার কড়ায় ক্রান্তিতে তাহার বিচার করিয়া তোমার যোগ্য সমাদর করিবে?

*　　　　*

মধ্য কলিকাতা কেন্দ্রেও (৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড) ভোটযুদ্ধ বেশ জমিবে বলিয়া মনে হইতেছে। এখানে প্রার্থী—ডাঃ জে, এম, দাসগুপ্ত (কংগ্রেস), ডাঃ হরিধন দত্ত (হিন্দু ন্যাসন্যালিষ্ট) ও শৈলেন্দ্রনারায়ণ রায় (ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট)। ইনি নির্ব্বাচনে তাঁহার 'সিম্বল' বাছিয়া লইয়াছেন মেরিগোল্ড—অর্থাৎ গাঁদা ফুল। গাঁদা ফুলকে ভোট দিবার জন্য কুমার শৈলেন আবেদন জানাইতেছেন। ডাঃ হরিধন নির্ব্বাচনে না দাঁড়াইতে পারিলে তাঁহার পিত্তি রক্ষাই হয় না। যেবার কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করেন, সেবার ইনি সুরুৎ করিয়া ঢুকিয়া পড়েন, অন্যথায় কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে ইনি ইতিপূর্ব্বেও হারিয়াছেন, এবারও কি হয় বলা

যায় না। এই ডাঃ দাসগুপ্তের সঙ্গেই তিনি একবার হারিয়াছিলেন।

জোড়াসাঁকোর নৈশলেন কোন শক্তিকে এবার করপোরেশনে কাউন্সিলার হইতে পারিয়াছেন বলিয়া ইহার লোভ বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু এবার ত আর শুধু ৬-এর ওয়ার্ড নয়—সঙ্গে আরো দুইটী ওয়ার্ড রহিয়াছে। গত করপোরেশন নির্ব্বাচনে ৮ নং ওয়ার্ড হইতে ডাঃ দাসগুপ্ত নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং কয় বৎসর পূর্ব্বে ৬, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ড হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এবার কাহার জোর বেশী আগামী সংখ্যায় তাহার কোষ্ঠী বিচার করিব।

* * *

পূর্ব্ব কলিকাতা নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতে এবার কুমার হিরণ্য কুমারের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু। শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমারের জনসেবার পরিচয় নূতন করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ও মেয়ররূপে তিনি যে সব কাজ করিয়াছেন, কলিকাতা বাসীর তাহা অবিদিত নহে। অবশ্য জন সেবার দিক দিয়া কুমার হিরণ্য কুমারও যে যথেষ্ট ঔদার্য্যের এবং সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য। রাজা দিগম্বর মিত্রের বংশধররূপে কুমার হিরণ্য কুমার বংশোচিত সুনাম বজায় রাখিয়াছেন সত্য কিন্তু হৃষীকেশ পার্কে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে যে তিনটী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আশা করি, শীঘ্রই তিনি তাহার সদুত্তর দিয়া ভোট-দাতাদিগকে আশ্বস্ত করিবেন।

* * *

দক্ষিণ মধ্য কলিকাতা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, মিঃ পি সি কুমার। তিনি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার হইতেও দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন কিন্তু বোধ হয় এই কেন্দ্র হইতে রীতিমত পাল্লা দিবার জন্যই তিনি বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারের প্রার্থীত্ব প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্গলার রাজনীতি ক্ষেত্রে মিঃ গোধিকা গুপ্তের লীলা খেলার অন্ত নাই। স্বদলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যে হীন স্বার্থসিদ্ধির আশায় তিনি লালায়িত হইয়াছেন, ভোটদাতাগণ তাহার সমুচিত প্রত্যুত্তর দিতে কার্পণ্য করিবেন না, এ বিশ্বাস আমাদের যথেষ্টই আছে।

কলিকাতার মহিলা নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতে স্বনামধন্যা শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী এবার নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহার অতি বড় শত্রুরও প্রতিবাদের কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। পৌর প্রতি-ষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে জনসেবায় শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন কলিকাতার জাগ্রত জনসাধারণ তাহা স্মরণ করিয়া এবারও যে তাঁহাকে জয়যুক্ত করিবেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

* * *

ব্যবস্থাপক সভার বিরোধীদলের নেতা উগ্র জাতীয়তাবাদী ও কংগ্রেসের আদর্শ-নিষ্ঠ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সান্যাল মহাশয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নির্ব্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেহেতু শ্রীযুত বসু কংগ্রেসের চারি আনার সদস্য নহেন, সেই হেতু দেশবাসীর সর্ব্ববাদী সমর্থন সত্ত্বেও তিনি কংগ্রেসের মনোনয়ন লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হইলেও সান্যাল মহাশয়ের কংগ্রেস নিষ্ঠার পরিচয় সর্ব্বজন বিদিত। বিগত কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিয়াও কিরূপে

যে তিনি কংগ্রেসী নেতাদের সমর্থন লাভ করিলেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? যাঁহার চারিত্রিক নিষ্ঠার পরিচয় মন্ত্রীর মামলায় দেশবাসী পাইয়াছেন, সেই কংগ্রেসদ্রোহী সান্যাল মহাশয়ের পরিবর্ত্তে জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী নরেন্দ্র কুমারই যে নির্ব্বাচক মণ্ডলীর সমর্থন লাভ করিবেন ইহা নিশ্চিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

* * *

ময়মনসিংহে রাজায় রাজায় যুদ্ধটা এবার ভালো রকম জমিবে বলিয়াই মনে হয়। স্পীকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বিধেয় নহে বলিয়া যাঁহারা ক্ষীণ প্রতিবাদের অযৌক্তিক ধূয়া ধরিয়াছিলেন, জনমতের প্রবল দাপটে সেই সব উলুখাগড়াদের অমূলক নীতির দোহাই যে কোথায় তলাইয়া যাইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। এপর্য্যন্ত যে সব তথ্য আমাদের দপ্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে ময়মনসিংহের মহারাজার সাফল্যই ষোল আনা নিশ্চিত। সন্তোষকে এবার বিমুখ ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া অসন্তুষ্ট চিত্তেই ঘরে ফিরিতে হইবে। যাঁহাদের সার্টিফিকেটের বর্ম্মে তিনি অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়াছেন, জনমতের সুতীক্ষ্ণ শায়কে তাহা কোথায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে।

* * *

প্রেসিডেন্সী বিভাগ জমিদারকেন্দ্রের নির্ব্বাচন প্রার্থীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুত শ্রীশ চন্দ্র নন্দী ও শ্যামপুকুরের কুমার মন্মথ নাথ মিত্র। আমরা কাশিমবাজারকে শুধু এই কথাটী জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, নিজের পৈতৃক ষ্টেট পরিচালনা করিবার যোগ্যতা যাঁহার নাই তাঁহার পক্ষে নির্ব্বাচনের আসরে যোগ্যতার পাল্লা দিতে না নামিলেই মান ও মুখ দুই রক্ষা হইত না কি? কুমার মন্মথ নাথের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়া মিছে লোক হাসানই যে তাঁহার সার হইবে, ইহা তো দিব্য দৃষ্টিতেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

* * *

বাঙ্গলা কংগ্রেসের শনিগ্রহ শ্রীযুত কিরণ শঙ্কর রায় এবার কংগ্রেসের মনোনয়নের তিলক পরিয়া ঢাকাই গগণে কিরণ বিকীর্ণ করিতে উদয় হইয়াছেন। ঢাকাই নির্ব্বাচক মণ্ডলী সমস্বরে তাঁহাকে চাই না বলিয়া একাধিকবার মত প্রকাশ করিয়াছে কিন্তু ভোট দাতারা না চাইলেও কমলী কিছুতেই ছাড়িতেছে না। কিরণ শঙ্করের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন কংগ্রেস সেবক শ্রীযুত ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। জনমতের সমর্থনের পাল্লা তাঁহার দিকেই বেশী ঝুকিয়া পড়িতেছে। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে যে, শরৎ বাবু বার এসোসিয়েশনে তার করিলেও শ্রীমান তেওতা শঙ্করকে এবার থোতা মুখ আরও ভোতা করিয়াই ফিরিতে হইবে।

* * *

বীরভূমের বীর কেশরী জিতেন্দ্র লালের এবারও জয় জয়কার। তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে কাহারো কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকাই স্বাভাবিক। অধিকন্তু জেলাবোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গুলির ভিতর দিয়া তিনি জনসেবার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের সাফল্যের আশা সুদূর পরাহত বলিয়াই মনে হয়। জিতেন্দ্রলাল বিহীন কাউন্সিল শিবহীন যজ্ঞের ন্যায়ই মনে হয় নাকি?

* * *

যশোহর নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে প্রদীপ সম্পাদক শ্রীযুত অতুল ঘোষ মহাশয় ভোট-যুদ্ধে লড়িবার জন্য প্রদীপে তেল সলিতা দিয়াছেন। বোম্বাই হইতে জাতীয়তার বজ্রমন্ত্র সুদূর মহারাষ্ট্রের ক্ষুদ্র পল্লী ফৈজপুরে পৌঁছিলেও, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রদীপের ক্ষীণ দীপ-শিখা যশোহরের নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে সম্পাদক প্রবরের নৈরাশ্যান্ধকার দূর করিতে পারিবে কি? শেষে দুইটী আসনই অন্নদত্তেরা না দখল করিয়া লয়! যশোহরবাসী কি বলেন? যশোহরের সেবিকা পত্রিকা ঠাকুরদাই বা অমন নীরব কেন?

* * *

বরিশালের স্বনামধন্য স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমারের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত সরল কুমার দত্ত মহাশয় এবার ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়াছেন। কংগ্রেস মনোনীত সরল বাবুর কংগ্রেস নিষ্ঠা ও দেশ সেবায় ত্যাগ এবং নির্য্যাতন বরণের কাহিনী বরিশালবাসীর অবিদিত নহে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কীর্ত্তিপাশার জমিদার শ্রীযুত সীতাংশু রায় চৌধুরী মহাশয় প্রার্থীত্ব প্রত্যাহার করিয়া যোগ্যের যোগ্যতার যেমন সমাদর করিয়াছেন তেমনি নিজের মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ঢাকের কাছে ট্যামটেমির ন্যায় শ্রীযুত মণ্ডল মহাশয়কেও মহাজনের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে দেখিলে আমরা অধিকতর সুখী হইব। আশা করি তিনি পূর্ব্ব কৃতজ্ঞতা স্মরণ করিয়া দুর্গা নামের কবচে সুন্দর ভোট সাগরে পাড়ি দিতে বিরত হইবেন।

* * *

এবার প্রথমে পাবনা পল্লীকেন্দ্রের নির্ব্বাচনে তেমন উৎসাহ ছিলনা, কিন্তু যখনই দেখা গেল, এক ক্ষণ মুহূর্ত্তে তাড়াশের রায় বাহাদুর রাধিকাভূষণ রায় ও নাটোরের মহারাজা (পৈরো দুটী তিথ বা

পাইয়া) মনোনয়ন পত্র দাখিল করিলেন, তখন বেশ উদ্দীপনা দেখা গেল। উদ্দীপনা এই হিসেবে দেখা গেল যে, ১৯৩৩ সালের নির্ব্বাচনে রাধিকাভূষণ প্রায় ৩০ হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলেন, এইবারই বা কেন ৩০।৩৫ হাজার টাকা খরচ না করিবেন! দাড়িওয়ালাদের দাড়িতে ঘনঘন হস্ত সঞ্চালিত হইতে লাগিল, টেকো মস্তকে বাম হস্ত উঠিতে লাগিল, তরুণের দল মুচকি হাসিতে লাগিল।

* * *

সে যাহাই হউক, তাড়াশের জমিদার তাড়াশে কিনা জানিনা, নির্ব্বাচন প্রাক্কালে এলাহাবাদ গিয়া বসিয়া আছেন, এদিকে কেল্লা প্রায় ফতে হইয়া যাইবার উপক্রম। নাটোরের মহারাজা এক সার্টিফিকেট দিয়াছেন যে, তিনি যখন দাঁড়াইতে চাহেন তখন রাধিকাবাবু সরিয়া পড়িতে চাহিয়াছিলেন। এটা কিন্তু সত্য কথা নহে, তিনিই তাড়াশের বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন!

অন্যতম প্রার্থী সতীশনারায়ণ চৌধুরীরও চেষ্টা যত্নের ত্রুটি নাই। শুনিতে পাই, কানাই বলাই দুই ভাই হাফ্ প্যান্ট পরিয়া চাল চিড়া বাঁধিয়া লইয়া সাইকেলযোগে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভোট ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। আরো প্রকাশ যে, বনমালী ইনষ্টিটিউটের সভ্যগণও তাঁহার হইয়া ভোট ক্যানভাস্ করিতেছেন।

* * *

কংগ্রেস প্রার্থী নরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর জন্যও কংগ্রেসী পাণ্ডাদের চেষ্টা যত্নের ত্রুটি নাই। ইনি যাহাতে মনোনীত না হন, তাহার জন্য ইহাঁরা কম চেষ্টা করেন নাই, এখন আবার তাহার হইয়াই ভোট ক্যানভাস্ করিতে দেখা যাইতেছে! শুনিতেছি, ইহাদের ৬ হাজার পোষ্টার চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আর সব প্রার্থীদের ত' তেমন তোড় জোড় দেখিতেছি না! আমাদের প্রতিনিধি শীঘ্রই মফঃস্বলে সফরে বাহির হইবেন, সেই সব স্থানের সংবাদ আগামী সংখ্যায় দিবার চেষ্টা করিব।

* * *

ফরিদপুরের নির্য্যাতিত ও জনপ্রিয় কংগ্রেস প্রার্থী সুরেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কুমার পূর্ণেন্দু ঠাকুর। এ দুঃসাহস তাঁহার না দেখাইলেই ভালো হইত না কি? কাঞ্চন কৌলিন্য যে সকল ক্ষেত্রেই সাফল্য লাভের সহায়ক হয় না, কুমার ইহা নিশ্চিত জানিয়া রাখুন। সুরেন্দ্রনাথকে ফরিদপুরের মুকুটহীন রাজা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কুমারের সাফল্যের আশা, বামনের চন্দ্র ধারণের ন্যায় অসম্ভব বলিয়াই মনে হয় না কি?

দুঃখ করো না

শ্রীমৃণাল কান্তি দাশ

দুঃখ করো না ভাই—
স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু তুমি
দুঃখ তোমার নাই।
বেদনার বাণী মর্ত্তের সাথী,
অশ্রুজলের ধারা—
চিত্ত তোমার রাঙিয়া উঠিবে
বেদনার অনুরাগে।
ওগো সুদূরের প্রয়াসী,
আলোকের বাঁশী
বাজিছে তোমার ভুবনে—
চির আকুল তুমি,
দুঃখ তোমার নাই:
এই পৃথিবীর ভালবাসা, প্রেম,
অবহেলা, অবিচার,
এই লাঞ্ছনা, এই যে হতাশা—
দু'দিনের তরে শুধু
দুখ-জাগানিয়া দু'দিনের ভাই
যখন, মহান তুমি,
দুঃখ তোমার নাই—
অসীম হইতে অশেষ তোমার
আত্মার আহ্বানি।

বিজয়লালের কচায়ন

(মতামতের জন্ম সম্পাদক দায়ী নহেন)

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

আনন্দবাজারের গ্রুপ চালিত "দেশ" পত্রিকায় বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায় প্রায় ক্ষিপ্তের মত আমাকে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করেছেন। এ রকম ক্রুদ্ধ অবস্থা শিক্ষিত মানুষের দু' কারণে হতে দেখা যায়, এক স্নায়বিক বিকৃতিতে, আর অন্নদাস অবস্থায় পয়সার লোভে। কেন জানি না আনন্দবাজার আমার সঙ্গে ভাসুর ভাদ্দর-বৌ সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তাঁরা খুব সম্ভব মনে করেন বারীন ঘোষকে আক্রমণ করা খাঁটি নির্জ্জলা প্যাট্রি-য়াটিজমের লক্ষণ, যেমন শ্রীসজনী কান্ত দাস চালিত 'শনিবারের চিঠি' মনে করতো ব্রণ ঊচ্ছা করা মধুমক্ষিকারই স্বভাব। যে মেয়ে কোমর বেঁধে জোর গলায় অসতী বলে অন্য মেয়েকে গালি পাড়ে সে আপন সতীত্ব সঙ্গে সঙ্গে জাহির করে। বাজারে পসার বজায় রাখবার জন্যে রাজনীতিক সতীত্বের খুব জোর এডভার্টাইজমেন্ট চাই, নইলে কাগজ বিকোবে কেন?

আমার "ভারত কোন্ পথে" বইখানা শিক্ষিত ও সুস্থ মানুষকে এতখানি ক্ষিপ্ত ও কাণ্ডজ্ঞানহীন করতে পারে তা' না দেখলে বিশ্বাস হওয়া কঠিন। ইনিয়ে বিনিয়ে কবিত্বের ভাষায় অভদ্র ইঙ্গিতে নিচক ইতর মেছোহাটার বিজয় লালের লেখা সুস্থ মনের পরিচয় দিচ্ছে না।

আমার বইখানা "পচা লালী ঘায়ের" মত নিঃস্পর্কীয় নির্ব্বিরোধী বিজয় লালের পশ্চাদ্দেশ অবধি জড়িয়ে পড়ার এক ঔদরিক হেতু ছাড়া আর কি হেতু থাকতে পারে? আমি ছাড়াও বোধ হয় দেশে ইংরাজের হিতৈষী, অন্নদাস ও স্তাবক লাখে লাখে আছে, নইলে আজ দু'শ বছরের উপর এ রাজা টিঁকে আছে কি করে? বিজয় লালের বাবা, ঠাকুরদা, শ্বশুর, শ্যালক, জ্যাঠতুতো ও খুড়তুতো ও মাস্তুত ভাই বহু লোক ইংরাজের ঘরে করে খেয়েছে ও আজও খায়। বিজয় লালও স্বয়ং সে অন্নে আশৈশব লালিত, পালিত ও পুষ্ট। তিনি পবিত্র স্বদেশী গোময় আহার করে এতখানি বড় হন নাই।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ ও দেশের বহু কৃতী সন্তান ইংরাজের গুণ স্বীকার ও কীর্ত্তন প্রায়ই করে থাকেন; সুতরাং আমি ইংরাজের একটু যথাযথ গুণ কথন ও স্তুতি করলে এত কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? আমাদের দেশ জয় করেছে বলেই কি তারা অপগুণের আধার ও আমরা সর্ব্বগুণে গুণান্বিত? আমাদের পলিটিকাল প্রতি-পক্ষ বলেই কি তাদের সদ্‌গুণ স্বীকার করায় উদারতা ও মহত্ত্ব ভারতবাসীর থাকা মহা পাপ? বিজয় লালের এই হুঙ্কার ও আস্ফালন কিন্তু ভাড়াটিয়া সাংবাদিকেরই উপযুক্ত কাজ হয়েছে। পেটের দায়ে মানুষ অনেক কিছুই করে, পাছায় কাপড় ফেলেও নাচে, এ তারই মত একটা অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনা।

ক্যাপা কুকুর যেমন করে মানুষকে এলোপাতাড়ি যেখানে পায় কামড়ায়, বিজয়লাল তেমনি করে আমাকে স্থানে অস্থানে দংশন করেছেন। আমার দ্বীপান্তরের বাণী লেখা নিয়ে বদরসিকতা করে তারপর পুণ্য শ্লোক শ্রীচৈতন্য মহা-প্রভুর সম্বন্ধে কটূক্তি করেছেন এই বলে, যে, "সেবার নদীয়া নাগর বিনামূল্যে কলসী কলসী প্রেম বিতরণ করেছিলেন এবার নাম মাত্র মূল্যে দাদা শ্রীমুখের বাণী বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন।" বিজয়-লালের বোধ হয় জানা নাই আমার দ্বীপা-ন্তরের বাণী আনন্দবাজারের অন্যতম পাণ্ডা স্বয়ং শ্রীসুরেশ চন্দ্র মজুমদার বিনামূল্যে ছেপে দিয়েছিলেন। তার পর বিজয় লালের অন্তর্দাহ মুক্তির জন্য আরও বলি, আমি "ভারত কোন পথে"র ৩০০০ হাজা-রেরও বেশী কপি বিনা পয়সায় বিতরণ করেছি। আনন্দবাজারের ক'টা টাকার লোভে যদি একজন নির্ব্বিরোধী মানুষের ওপর এতখানি বিষ ঢালা সম্ভব হয় তা, হলে অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর ইংরাজের প্রসাদ লোভে কিঞ্চিৎ বিষ ছড়ানো মাদৃশ জনের পক্ষে আশ্চর্য্য কি?—যদি সেই লোভেই আমি এই দুষ্কার্য্য করে থাকি এতে বিজয়লালের এতখানি নার্ভাস্ ডেবিলিটি হবার কারণ কি?

"ভারত কোন্ পথে"র বক্তব্য সম্বন্ধে বিজয়লালের ভাড়াটে যুক্তির সঙ্গে বিচার করে লাভ নাই। দলের সংস্কার থেকে যে মুক্ত এবং সংবাদ পত্রে আড়াই পয়সায় চাকরী বা প্রাপ্যের দায় যার নাই এরকম নিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক ব্যক্তি বইখানা পড়ে কোন যুক্তি দেখালে তার উত্তর

দেওয়ায় লাভ আছে। ভাড়াটে লেখকের দলগত উমার কি জবাব দেব ?

দেশের সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে এই লেখকের মন কতখানি সঙ্কীর্ণ তা' এই কয়টি পঙক্তি থেকে বোঝা যায়। "সাধারণ মানুষ তো কাদার তাল, যে রূপ তাদের দেবে সেই রূপ তারা নেবে। তারা পুতুল নাচের পুতুল, যেমন নাচাবে তেমনি নাচবে।" (জনসাধারণের প্রতি কি অপরিসীম শ্রদ্ধা!) শিক্ষিত বাবুরা নাকি চিরকাল এই কাদার তাল ও পুতুল নাচের পুতুলকে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করে এসেছে! কত বড় সঙ্কীর্ণ পাতি বুর্জোয়া মন এই নির্জ্জলা মিথ্যা কথা বলতে পারে? শিক্ষিত সম্প্রদায় এক ভোট লালসা ছাড়া কবে এই কাদার তাল নেড়েছেন বা এই লাখ লাখ পুতুল নাচিয়েছেন—তাদের সত্যকার মুক্তিমন্ত্র দেওয়া চুলোয় যাক?

এই পাতি-বুর্জোয়া শিক্ষিত ভদ্রলোকদেরই কার্ল মার্কস্, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ ও লেনিন বায়ুমার্গী ও সুবিধাবাদী বলে অনেক লেখনী চালনা করেছেন। বিজয়লাল স্বয়ং সেই জাতীয় পাতি বুর্জোয়া। কারণ তিনি যে নিঃশ্বাসে সবহারাদের (কাদার তালের?) গান রচনা করেন সেই নিঃশ্বাসেই গান্ধীজীর স্তাবক হন। তিনি কখনও কম্যুনিষ্ট, কখনও ফ্যাসিষ্ট, কখনও হিটলারাইট এবং কখনও ন্যাশনালিষ্ট। বিজয়লাল লিখেছেন, "বারীন-দাদা যাদের শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে উপহাস করেছেন তারা হলো মধ্যবিত্ত ঘরের এই অশান্ত নবযৌবনের দল। এদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় সন্দেহ নাই, কিন্তু দুর্জ্জয় ইচ্ছাশক্তিকেই আশ্রয় করে ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্ত্তন হয়েছে বারে বারে।" একেই বলে "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে"।

"ক্লাস কন্সাস্" কথাটা ফ্যাসিষ্ট-কম্যুনিষ্ট-ন্যাশনালিষ্ট বিজয়লালের মার্কস্‌বাদ থেকে ধার করা বুলি। তাঁর ঐ কথাটার ঠিক অর্থ জ্ঞান নাই, যেমন তোতা পাখীর কৃষ্ণ নামের অর্থবোধ থাকে না অথচ তা' সে নিত্য আদা ছোলার লোভে আওড়ায়। মার্কস্, লেনিন ও এঙ্গেলস্ তাকেই ক্লাস কন্সাস্ বলেছেন শ্রমিকদের মধ্যে থেকে যে মাইনরিটি আত্মশ্রেণী স্বার্থে জাগ্রত হয়ে উঠেছে; বাবুর দলকে বলেন নাই। সেই বাবুর দল মার্কসের মতে ডিক্লাস্‌ড্—যারা নিজ শ্রেণীর অভিমান ত্যাগ করে শ্রমিকদের স্বার্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বাবুর দল আবার যখন স্বশ্রেণীর স্বার্থে ক্লাস কন্সাস হয় তখনই জন্মায় বাঁদর নাচাবার হিটলার, মুসোলিনী যার স্যাঙাৎনী হচ্ছেন বিজয়লাল কোম্পানী, নইলে তিনি দেশের কোটী কোটী লাঞ্ছিত অবহেলিত শিক্ষায় দীক্ষায় বঞ্চিত মানুষকে পুতুল নাচের পুতুল বলে অপমান করতে স্পর্দ্ধা রাখতেন

না। তাদের নির্জীব পুত্তলীতে পরিণত করেছে কে? তাদের এক্সপ্লয়েট করেছেন বাবুর দলই, বিদেশী শক হুণ মোগল পাঠান ইংরাজ নয়।

এই বিজয়লাল সংবাদপত্র ও সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠান্তরে শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি করতেন, আজ শ্রীঅরবিন্দের যোগপন্থা সমগ্র পৃথিবী শ্রদ্ধাবনত শিরে গ্রহণ করায় তিনি বোল ফিরিয়েছেন। আগার যোগসাধনার চেষ্টাকে টিটকারী করে ডাড়াটে সাংবাদিক বিজয়লাল দুই সংখ্যাব্যাপী প্রবন্ধ শেষ করেছেন গীতা উপনিষদ ঋষি ও তপোবনের মাহাত্ম্য গেয়ে। তিনি তরাজুর একধারে জমা করেছেন পাশ্চাত্যের যন্ত্র সভ্যতার জীবন্ত উপকরণ এবং অন্যধারে ভারত ও এসিয়ার অতীত গৌরবের কঙ্কাল। যে ভারত উপনিষদ গীতা লিখেছিল তার বংশধর বিজয়লাল! তিনি বা তাঁর সম-সাময়িকরা ক'টা উপনিষদ্ লিখেছেন? "মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ—এই বিচ্ছেদের নীতির উপরে দাঁড়িয়ে আছে ওদের সমাজ আর রাষ্ট্র।" এই হলো পাশ্চাত্যের সম্বন্ধে বিজয়লালের বক্রোক্তি! আর আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ছিল বোধ হয় জাতি, বর্ণ, গোত্র ও ধর্ম্মের ভেদের উপর ন্যস্ত হয়ে মানুষের একাত্ম মিলন রচনা করে। সেই মিলনের ফলেই বোধ হয় ম্লেচ্ছ জাতির হাতে আমাদের সাত শতাব্দী ধরে লাঞ্ছনা? তারা বিচ্ছিন্ন বলেই বোধ হয় তাদের এত শক্তি?

বিশ্ববিজয়ী পাশ্চাত্য জাতিরা আজ অত্যাচার করছে, আর বিশ্ববিজয়ী আর্য্যরা বোধ হয় নিরস্ত্র ও অহিংস অভিযান করে অনার্য্যদের উচ্ছেদ সাধন করতো? তাদের রাজবংশ গৌরবের অশ্বমেধের ঘোড়ার খুরে যারা ভারতে নরমুণ্ড (পুতুলের?) গড়াতো সেটা বোধ হয় বিজয়লালের ঋষি শাসিত রাজ্যের ভাগবত লীলা। মডার্ণ সভ্যতা সেটা করে জাতির ও দেশের গৌরবে, শাকাসিংহ বা আত্তাউল্লার বংশের জন্য নয়। শক্তিমান চিরদিনই পররাজ্য উৎসন্ন করে এসেছে, জগন্নাথের রথের চাকা আমার এবং বিজয়লালের মত বত রথবন্ধ্যাগ্রাহীকে পিষেই চলেছে। শক্তির প্রকাশ তো আর যাতের গায়ে হাত বুলানো নয়!

বিজয়লালের ভারত তার জাগ্রত চিত্ত নিয়ে যে "জ্ঞানে উদ্ভাসিত শক্তির প্রাচুর্য্যে গরিমাময় প্রেমের ঐশ্বর্য্যে মহিমামণ্ডিত মুক্ত দীপ্ত ও বিশাল জীবন" চাইছে তার সঙ্গে আমার ভারত কোন্ পথের লক্ষ্যের চোরা সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। মাঝখানের পার্থক্যটা শুধু আনন্দ বাজারের ক'টা টাকা বইতো নয়। নরখাদক মহাপাপিষ্ট পাশ্চাত্য ছাড়া কোন স্বদেশী মণীষীর বুকনী কিন্তু বিজয়লালের বক্তব্য প্রমাণ করতে জোটে নাই, এটা সুধী পাঠকরা লক্ষ্য করবেন। পাশ্চাত্যের জ্ঞান, বিজ্ঞান যন্ত্র ও তন্ত্র নিয়ে আমাদের যত জারিজুরি, যত স্বরাজ ও গণতন্ত্র। উপনিষদের পবিত্র পাতা থেকে এবং তাজমহলের কবর থেকে জীবনের কোন উপকরণই পাওয়া গেল না?

———
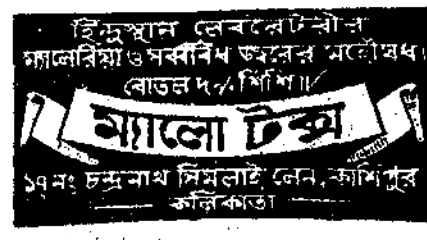
ছন্দ-পতন

(গল্প)

শ্রীসত্যেন্দ্রভূষণ বিশ্বাস

চমকপ্রদ, উজ্জ্বল বেশভূষায় সুসজ্জিত তন্বী, সুন্দরী নারী তাতিয়া কারোলী, তা'র অনন্যকরণীয় সুমিষ্ট স্বরে প্রাণবিমোহন ক্রেয়োল সঙ্গীত গাইছিল। বিদূষক ফ্লিট পিয়ানোটার ওপর অস্বাভাবিকরূপে ঝুঁকে পড়ে তা'র সর্ব্বশরীরের কসরৎ দেখাচ্ছিল। তা'র আধো হাস্যোদ্দীপক এবং আধো কিম্ভূতকিমাকার ভূষো মাখানো কালো মুখখানার ভেতরের মুখগহ্বরটা ঠিক একটা মস্ত বড় ঘায়ের মত দেখাচ্ছিল। কতকগুলো নিগ্রো অর্কেষ্ট্রাটার সাথে তালে তালে লাউয়ের খোসার মত কি একটা হলদে জিনিষ বাজিয়ে আনাড়ির মত নাচছিল।

কিন্তু সে সন্ধ্যার প্রধান আকর্ষণ ছিল একটা বিরাট স্পেন দেশীয় কুকুরের সাথে মুলাতো (কাফ্রি ও শ্বেতাঙ্গের সহযোগে উৎপন্ন সন্তান) নারীর বেশধারী কোনও এক হতভাগা বৃদ্ধ নিগ্রোর যুদ্ধ। যুদ্ধটা চলেছিল ঠিক একটা শক্তিশালী পুরুষ এবং একটা দুর্ব্বল কাণা ষাঁড়ের সাথে যুদ্ধের মত— কুকুরটা ওর পোষাকের যে অংশটা সুবিধা মত পাচ্ছিল, কামড়ে টুকরো টুকরো ক'রে দিচ্ছিল, আর লোকটা নেহাৎ দায়ে ঠেকা কাজের মত অবসন্নভাবে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা ক'রে যাচ্ছিল—ব্যাপারটা একদিকে যেমন আমোদজনক, অন্য দিকে তেমনি করুণ।

"দলটা এ লোকটাকে কোথায় কুড়িয়ে পেল, বলতে পার সেফিল্ড?" কায়দা

তুরন্ত দর্শক নোয়েল জিজ্ঞাসা ক'রল।

"জান না?—এর নাম হচ্ছে জেম্‌স্‌ ষ্টারলিং; কিন্তু সে ষ্টারলিং আর নেই। অল্প দিনের ভেতর এর এত পরিবর্ত্তন হ'য়েছে যে তুমি কল্পনাই ক'রতে পারবে না এর পূর্ব্বাবস্থা। তার জীবনটা ছিল দেল্‌খোস্‌ এবং পরিপূর্ণ। তা'র সাহস ছিল সিংহের মত এবং কে কি বলল আর না বলল তা' সে মোটেই গ্রাহ্যের ভেতর আনত না। সে এই সার্কাস পার্টির অন্যতম দক্ষ এবং নির্ভীক অশ্বারোহী ছিল এবং সে অতি অল্প দিনের ভেতর তা'র গৌরবের চরম শিখরে অধিরোহণ ক'রেছিল।"

"ওহো, মনে পড়েছে।" নোয়েল ব'লে উঠল। "এ সেই লোকটা না, যা'র জন্যে কারো ব্রাস টৌপিনকে বেশ কয়েক ঘা' ঘোড়ার চাবুক বসিয়ে দিয়েছিল, কারণ সে তা'কে তা'র কাছ থেকে নিয়ে সটকে পড়ার চেষ্টা ক'রেছিল?...কিন্তু তা'র এ দশা কি ক'রে হ'ল?"

এই সময়টার রঙ্গভূমিতে সর্দ্দার ষ্টার লিংকে ঘিরে বানরগুলোর নাচ চলেছিল—বিরাটকায়, লোমশ, নীলমুখো বানরগুলো, চুলগুলো তা'দের কাঁধের পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে আর বিরাট বিরাট লেজগুলো ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হচ্ছে।

সেকিন্ত তা'র সঙ্গিনীর হাতে এক গোছা আঙ্গুর ফল দিয়ে বলে চলল:

"গল্পটা আমোদজনক না হ'লেও, এরূপ ঘটনা সত্যিকার জীবনে মেলা দায়।

"ষ্টারলিং একটী কলাম্বিয়ান যাযাবর জাতীয় মেয়ের প্রেমে পড়ল। বয়স তা'র বাইশ পেরিয়েছে কি না পেরিয়েছে, নিটোল স্বাস্থ্য এবং বুকে অদম্য সাহস। তা'র লাবণীল গতি আর চটুল নয়নের দৃষ্টিতে এমন কেউ ছিল না যে মুগ্ধ না হয়ে থাকতে পারত। তা'র গায়ের সুগন্ধি চামড়া ছিল ঠিক চিনে কাগজের মত নরম এবং মাথার চুলগুলো ছিল মখমলি চোখের মত গভীর কালো। হাসি-ঠাট্টা সে খুব ভালবাসত। সবাইকে সে আশা দিয়ে বেড়াত, কিন্তু কারুর সাথে প্রেম বিনিময় ক'রত না।

"সে আসন ও বল্গাবিহীন ঘোড়ার ওপর নিজেকে স্বচ্ছন্দে এলিয়ে দিত। ঘোড়া দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে, সাথে সাথে তা'র সুকোমল দেহখানা দুলছে, অবিন্যস্ত কেশরাশি রুক্ষ ঘোড়ার কেশরের সাথে এক হয়ে গেছে—সে তা'র অভ্যস্ত, সুনিপুণ হস্তে বর্শা এবং ঝলসায়মান ছুরির খেলা দেখিয়ে চ'লেছে।

"তা'র নামটা ছিল বেশ মিষ্টি—ছাচা। ছাচা ষ্টারলিংয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তা'র বলদৃপ্ত অঙ্গ গৌরবে এবং সুমিষ্ট ব্যবহারে। তা' ছাড়া একবার সে তা'র খাতিরে একজন ইতালীয় বন্য পশুপালককে এক বিরাট ঘুসিতে বসিয়ে দিয়েছিল।

"তা'রা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসত এবং এত যে—তা'দের দারিদ্র্যকে তা'রা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না; যখন তাদের গৃহে এক মুঠিও খাবার থাকত না তখন তারা পরস্পর পরস্পরকে আরও বেশী করে ভালবাসত। বাস্তবিকই, এই যে বেদে দাম্পত্য-নীতি, যাতে খেয়ালের মাথায় বা কথার ঝাঁজে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ আসন্ন হয়ে ওঠে না—এ যে আমাদের তথাকথিত পরিমার্জ্জিত সভ্যজগতের সামাজিক জীবনের চেয়ে অধিকতর সুন্দর এবং শান্তিপ্রদ তাতে সন্দেহ করবার অবকাশ বোধ হয় কারুর নেই।

"কিছুদিনের ভেতরই সে সন্তান-সম্ভবা হল। কাজেই তার নাম প্রোগ্রাম হতে বাদ পড়ল।

"অবশেষে তিনদিন নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগের পর সে শয্যাশ্রয় করলে এবং যে দিন সে তার হাতে হাত রেখে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল—ষ্টারলিংয়ের সেদিনকার অবস্থা অবর্ণনীয়।

"কিন্তু তবুও তাকে মাতৃহীন শিশুটীর জন্ম বাঁচতে হল। সে এতটা স্নেহ এবং যত্ন দিয়ে শিশুটীকে লালন পালন করে তুলেছিল যে ছেলেটা তাকে 'মা' বলে ডাকতে শিখল—এবং সেই থেকে লোকে তাকে মা টারলিং, বলে ডেকে আসছে।

"বালকটী হবহু মায়ের অবয়ব পেয়েছিল এবং শীঘ্রই সে ঘোটা চেস্তনে রঙ্গ ভূমিতে নাবতে সমর্থ হল। সুষ্ঠু এবং চঞ্চল প্রকৃতির মুখখানা; তার চেহারা দেওয়া দেওয়াল বিজ্ঞাপনী ঝাকে ঝাকে লোক টানতে সমর্থ হল।

"একদিন, যখন সে প্রশংসা মুখরিত রঙ্গভূমি থেকে প্রত্যাগমন করছে, বিদূষক টম্ পিরার তাকে ডেকে বলল: 'যদি তুমি নিজেকে ঠিক রাখতে পার, তবে তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।'

"তাচ্ছিল্য ভরে বালক উত্তর করল: 'সে আমি দেখে নোব।

"সে ছিল অত্যন্ত বেপরোয়া সে যখন একটা দোলন কাঠ থেকে আর একটায় গিয়ে লাফিয়ে পড়ত, তার সুদৃঢ় মাংসপেশী-গুলো দেখে উম্পাত্ত বলে ভ্রম হত এবং তার এই দুঃসাহসিক খেলায় যৎসামান্য হৃদস্পন্দন বা বিন্দুমাত্র ঘামের রেখা পরিলক্ষিত হত না।

"তার দর্শকদের লক্ষ্য করে হাসির ধরণ ছিল ঘৃণা ব্যঞ্জক। বিপদ আমন্ত্রণ করে আনা তার নিকট আনন্দ।' প্রায়ই, সে একটা কঠিন খেলা দেখানোর সময় একটা বিকট চীৎকার করে উঠত—মৃত্যু-তাচ্ছিল্যকারী ঠিক একটা বিরাট দানবের মত। জেম্‌স্ টারলিং তার ক্রীড়া কৌশল লক্ষ্য করত, যেমন অভিনেতার মাতা তার সন্তানের অভিনয় লক্ষ্য করে থাকে।

"তারা পাশাপাশি একটা ঘরে বাস করত। ঘরের চারটে দেয়াল—বড় বড় হরফে টারলিংয়ের নাম লেখা বিভিন্ন রংয়ের এবং বিভিন্ন ভাষার বিজ্ঞাপনী দ্বারা মোড়া। আর ছিল সেখানে কয়েকখানা ছবি—ধূলিধূসরিত এবং শুষ্ক লরেল মাল্য বেষ্টিত, ছোট ছোট হরফে তলায় কি যেন লেখা।

"এক রাত্রে সর্ব প্রথম যুবকটী বাড়ী ফিরল না। একবার মাত্র রিহার্সেলের সময় তাকে দেখা গেল—ক্লান্ত, চোখের তলায় সুস্পষ্ট কালিমা, ঠোঁট দুটো উত্তপ্ত এবং বিবর্ণ; কিন্তু তার মুখখানা এরূপ জ্যোতিরুজ্জ্বল যে টার্লিং সাহস করে তাকে কিছু বলতে পারল না।

"এবং যুবক সেই রাত্রে দৃপ্ত এবং আবেগপূর্ণ ভাষায় তার পিতার নিকট আগাগোড়া তার প্রেমাভিনয়ের বর্ণনা দিল—কি করে সে নিজেকে সেই বালিকার বাহু বেষ্টনে ছেড়ে দিয়েছিল এবং উত্তপ্ত চুম্বনে চুম্বনে পরস্পর পরস্পরকে বিহ্বল করে তুলেছিল।

"এ খুব বেশীদিনের কথা নয়। সে প্রায় প্রত্যেক অভিনয়েই উপস্থিত থাকত—একই বক্সে। সে তার কাছে পত্র দিত—দুর্লভ, অতুলনীয় সে পত্র—দুষ্প্রাপ্য, দুর্মূল্য সুগন্ধিতে সুবাসিত। সে তাকে আকৃষ্ট করেছিল বিচিত্র, মোহময় এক আকর্ষণে। তার সাথে প্রায়ই কতকগুলো লোক থাকত—মনে হত তাদের উপস্থিতিতে সে খুবই উত্যক্ত, সে তার অভিনয়ে খুবই তৃপ্তি পেত এবং সে প্রায়ই তার দিকে তাকিয়ে মধুর হাসি হাসত।

মাঝে মাঝে সে তার কোঁকড়া চুলে কালো মুক্তো দুলিয়ে একা এসে উপস্থিত হত সেই বক্সটায় এবং তার অভিনয় শেষ হলেই সে উঠে চলে যেত।...

তারপর এল সেই সন্ধ্যা, যখন সে তাকে তার গাড়ীতে তুলে নিল এবং দৃঢ় বাহু-বন্ধনে বাঁধল।...ওঃ, সেই পর্দাটানা অন্ধকারময় গাড়ীতে চড়া, নারীর উত্তপ্ত বাহু-বন্ধনে নিজেকে দোদুল্যমান বক্ষে ছেড়ে দেওয়া! সে তার উদ্দীপ্ত বন্ধনে বন্দী হল; সে তার দেহের এবং ফুলের গন্ধে (এবং আরও একটা কিছুতে যা' সে তখন ঠিক জানত না), বিহ্বল-বিমূঢ় হয়ে পড়ল।

"তার চুম্বনগুলো ছিল ঘুম পাড়ানো—স্বর্গীয়। সে তার ঠোঁটের ওপর ঠোঁট রাখত, চেপে ধরত অতি আদরের সহিত, সন্তর্পণে—তাকে অননুভূত আনন্দ সাগরে ভাসিয়ে, তাকে রিক্ত করে। সে তার ক্ষুদ্র হাত দু'খানায় তার মাথাটা চেপে ধরত—গাড়ী গড়িয়ে চলত রাত্রির নিস্তব্ধ বরফস্তূপের ওপর দিয়ে। সে তার পশমী জামায় তাকে ঘিরে রাখত এবং খুব মনোযোগের সহিত তার অভিনয়ের কথা শুনতে ভালবাসত।

"যখন তারা তার চিত্র যবনিকা এবং মখমলের মোড়া নানা কারুকার্য খচিত ক্ষুদ্র বৈঠকখানাটায় গিয়ে ঢুকল, দেখল

তাদের রাত্রের খাবার প্রস্তুত। সে নিজ হাতে তাকে পরিবেশন করল……

সে সব কিছু অসঙ্কোচে তার কাছে বলে গেল—কার কাছে এসব সে বল্‌ছে এ' খেয়াল তার নেই সে ভুলে গেছে যে শ্রোতা তার বন্ধু নয়, তার পিতা।

ষ্টারলিং প্রকৃতিস্থ হয়ে সব শুনল—কিন্তু তার ধৈর্য্য যেন আর থাকতে চায়না, তার প্রকৃতি চঞ্চলতার আভাষ দিতে লাগল। সে বিবেচনা করে দেখল যে ছেলে এখন তার শাসনের বাইরে, সে এখন শুধু উন্মত্ত নয়, কাণ্ডজ্ঞানহীন পশুর নামান্তর—এখন তার প্রতি কঠোর হওয়া বা তার রাশ সবেগে টেনে ধরা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়, সে নিজে বুঝুক—নিজেই নিজের ভুল শুধরে নিক। সে জানত, যে নারীটি তাকে নাচাচ্ছে, সে একটী 'আপাত মধুর, পরিণাম বিষ' জাতীয়া নারী; ষ্টারলিংয়ের মতে এরূপ নারীর সাথে ছেলের ভাব হওয়া কোন মতেই সুখকর নয়—সে চায় ছেলে কোনও উচ্চবংশোদ্ভূতা, উচ্চহৃদয়া নারীর সাথে ভাব করুক—তার ভবিষ্যৎ ভাল। সে নারী ছেলেকে সুখী করতে পারবে এবং তাদের প্রেম হবে চিরস্থায়ী, আর এ প্রকৃতির নারী পুরুষকে অল্পদিনেই করে তোলে ক্লান্ত—তাদের প্রেম হয় অস্থায়ী। নেলী দারজিন হচ্ছে সেই প্রকৃতির নারী, যে নারী তার 'অলন্ত অগ্ন' রূপ নিয়ে পুরুষের চোখ ধাঁদায়, তার চটুল, রসাল ব্যবহারে পুরুষের মন ক্ষণিকের জন্য আকৃষ্ট করে—সে রূপ-শিখা অল্পেই ভস্মে পরিণত হয়, তা' পুরুষকে অবশেষে করে তোলে বিরক্ত, সে নয়নমুগ্ধকর ভাবভঙ্গী কিছুদিনের জন্য পুরুষকে আনন্দ প্রদান করে, নিজে হয়ে পড়ে রিক্ত—তার ভেতর আর কোনও নূতনত্ব নেই, তাতে আর হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ বহায় না।

যুবক ষ্টারলিংয়ের প্রেমটা ছিল রাক্ষুসে—যাকে সে ভালবাসবে তাকে সে একান্ত ভাবে পেতে চায়। সে কোনও দিন ভাবতেও পারেনা যে তার এই প্রেম স্রোতে জোয়ার ভাটা আছে। শিরায় উপশিরায় যার যাযাবর রক্ত প্রবাহিত—কোনও মেয়ে তাকে ভালবেসে দূরে সরিয়ে দেবে, এ ধারণাও যে তার পক্ষে একান্ত অসহ্য।

বুড়ো ষ্টারলিং সারাটা জীবনে অনেক টাকা উপায় করেছিল। যে পরিমাণে সে উপায় করেছিল সে পরিমাণে সে ব্যয় করেনি। জমার অঙ্ক সে রীতিমত ভারী করে রেখেছিল। উদ্দেশ্য ছিল দু'টী—একটী নিজের বুড়ো বয়সের সংস্থান এবং আর একটী ছেলের ভবিষ্যৎ। সে নিজেকে ভাল খাওয়া-পরা থেকে বঞ্চিত করে এই টাকা জমিয়েছিল—ছেলেটা যাতে দেখে শুনে একটা ভাল বৌ ঘরে আনতে পারে এবং সুখী হয়।

কিন্তু ফল হল অন্যরকম। দু'হাতে ছেলেটা তারই রক্ত দিয়ে কেনা টাকাগুলো তারই চোখের সামনে উড়িয়ে দিতে লাগল, আর দেখেশুনে তার দু'ফোটা চোখের জল ফেলা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। পিতা হয়েও শাসন করবার অধিকার যে তার আর নেই—সে নিরুপায়।

অবশেষে তাতেও কুলোল না। তাদের কয়েক বছরের অগ্রিম বেতন বিক্রী করে দিতে হল অর্থগৃধ্নু সার্কেস পার্টির কাছে।

অদৃষ্টের পরিহাস! টাকা না থাকলে আদর নেই। নেলী তার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল। কথায় কথায় গালাগাল আর মুখ খিচুনি। অবশেষে সে একদিন তাকে দোর দেখিয়ে দিল, যেমন পূর্ব্বে আরও অনেকের ভাগ্যে ঘটেছে।

এ অপমান যুবক ষ্টারলিংয়ের পক্ষে অসহ্য। এ জ্বালা ভুলতে সে মনে প্রাণে

কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর উপযোগিতা

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সেন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধনের জন্য আমাকে আহ্বান করিয়া আপনারা আমার প্রতি যে প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। প্রত্যেক দেশে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির পক্ষে প্রদর্শনী যে প্রকার সাহায্য করিয়া থাকে তাহা আমরা হয়ত অনেকেই অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারি না। পাশ্চাত্য দেশসমূহ প্রদর্শনীর মূল্য বোঝে এবং এক একটা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর জন্য কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের বার্মিংহাম ও লণ্ডন সহরে অনুষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ শিল্প প্রদর্শনী, প্রাগ, লিপ্‌জিগ, প্যারী প্রভৃতি সহরের বিশ্ববিখ্যাত প্রদর্শনী, শিকাগো আন্তর্জাতিক শিল্প প্রদর্শনী প্রভৃতির নাম এ দেশের অনেকেই অবগত আছেন। এই সব প্রদর্শনীতে যে বিপুল অর্থব্যয় হয় এবং দেশের রাজশক্তি, রেল-বিভাগ, জাহাজ কোম্পানী, ডাক বিভাগ, মিউনিসিপ্যালিটী, যানবাহন কোম্পানী প্রভৃতি এই ব্যাপারে যে ভাবে জনসাধারণের সহযোগিতা করিয়া থাকেন তাহা আমাদের দেশের লোকের চিন্তার অগম্য।

আপনারা যে এখানে একটী কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন তজ্জন্য এতদঞ্চলের অধিবাসীগণ আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ। এই মহকুমা বাংলা দেশের সর্ব্বাপেক্ষা উর্বর অংশের মধ্যে পড়িয়াছে। এই অঞ্চলে উন্নত শ্রেণীর কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের পক্ষে কি প্রকার সম্ভাবনা রহিয়াছে তদ্বিষয়ে এই প্রদর্শনী দেখিয়া অনেকের চক্ষু ফুটিবে। শিল্পের ব্যাপারেও এই মহকুমা পশ্চাৎপদ নহে। এতদঞ্চলের তাঁতিপাড়া, মাইজপাড়া ও বুরৈর অঞ্চল তাঁত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এই সব স্থানের সতরঞ্চ, পাগড়ী, ধুতি, চাদর, সাড়ী লুঙ্গি ও গামছা এই জেলার বাহিরেও বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকে। এক সময়ে এই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বহু স্থানে পাট হইতে বহু প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইত। জনসাধারণের অজ্ঞতার দরুণ এই শিল্প এখন জীবন্মৃত অবস্থায় রহিয়াছে। এই অঞ্চলের অনেক অধিবাসী এখনও সুন্দর হুকা ও নৈচা তৈয়ার করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কারিগরদিগের প্রস্তুত নৌকা এখনও বিশেষ সমাদৃত। বাঁশ, বেত ও সোলা হইতে এখানকার অধিবাসীগণ যে সব চিত্তাকর্ষক শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করে তাহা বিদেশীগণ পর্য্যন্ত বিশেষ আদরের সহিত ক্রয় করিয়া থাকে। ছাতার বাট এবং পাটী নির্ম্মাণেও এই মহকুমার বিশেষ সুনাম আছে। এতদঞ্চলের শীতলপাটী ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তালপাতা হইতে যে পাখা হয় তাহাও বিশেষ রমণীয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রস্তুত পিতল কাঁসার জিনিষেরও খুব সুনাম রহিয়াছে। রামচন্দ্রপুর ও রাণীদিয়া অঞ্চলে ঝিনুক হইতে যে বোতাম নির্ম্মিত হইত তাহা কিছুদিন পূর্ব্বেও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এই মহকুমার অনেক স্থানে মুচিগণ চামড়া হইতে যে জুতা তৈয়ার করে এবং স্থানে স্থানে টালী, কিস্টার প্রভৃতি যে সব মৃৎনির্ম্মিত জিনিষ প্রস্তুত হয় তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। এতদঞ্চলের, বিশেষতঃ মেড্ডা ও রামচন্দ্রপুরের কর্ম্মকারগণের প্রস্তুত দা, বটি, খাঁড়ি, প্রুণিং নাইফ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এক সময়ে এই মহকুমাতে দেশলাই প্রস্তুতের জন্যও কিছু কিছু চেষ্টা হইয়াছিল। আমি আশা করি যে, এই মহকুমার শিল্প সাধনার উপরিউক্ত সমস্ত নিদর্শন আপনাদের অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে দেশবাসীর কৃষি ও শিল্পপ্রচেষ্টার পরিচয় পাইয়া দেশের লোক এই সব ব্যাপারে সকলকে উৎসাহদানে উদ্বুদ্ধ করিবে।

বর্ত্তমানে কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে সমষ্টিগতভাবে দেশের সমক্ষে যে সব সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই। কেননা, যে সব সমস্যার ঘাতপ্রতিঘাতে এতদঞ্চলের কৃষি ও শিল্প-প্রচেষ্টা প্রভাবিত হইতেছে তাহার সমাধান না হইলে, মাত্র স্থানীয় চেষ্টার দ্বারা এই অঞ্চলের কৃষি ও শিল্প টিকিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে না। এজন্য সমস্যার ব্যাপকতা ও উহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে সকলের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ আমি কৃষির কথাই বলিতেছি। দেশের সর্ব্বস্তরের লোক যে চরমে কৃষির উপর নির্ভরশীল তাহা বোধ হয় বিস্তৃতভাবে বলিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু কৃষির সুযোগ এ দেশে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। ভারতবর্ষের মধ্যে যে স্থলে মধ্যপ্রদেশে প্রতি এক শত একর আবাদী জমির মধ্যে গড়পরতা জনসংখ্যা ৬১, বোম্বাইয়ে ৬৭, ব্রহ্মদেশে ৮১, পাঞ্জাবে ৮৮, সংযুক্তপ্রদেশে ১৩৬, মাদ্রাজে ১৩৭, আসামে ১৪৪ এবং বিহার

ও উড়িষ্যায় ১৫৫ জন সেই স্থলে বাঙ্গালায় প্রতি একশত একর আবাদী জমিতে গড়পরতা জনসংখ্যা ২১৪ জন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বাপেক্ষা ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই অঞ্চলে প্রতি একশত একর আবাদী জমিতে জনসংখ্যা ২১৪ জনের অনেক বেশীই হইবে। বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমানে জমির উৎপাদিকা শক্তি যে প্রকার, তাহাতে এদেশের জনসাধারণের অনুন্নত অতি হীন জীবনযাত্রার আদর্শ বজায় রাখিতেও মাথা পিছু গড়ে অন্ততঃ এক একর জমি আবশ্যক। কিন্তু বাঙ্গালায় তাহাও নাই। সুতরাং বর্ত্তমানে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে না পারিলে জনসাধারণের পক্ষে কোনরূপে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করাও অসম্ভব হইবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সেচকার্য্যের ব্যবস্থা, উন্নত প্রণালীতে জমি চাষ, পুষ্ট ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ ব্যবহার, জমিতে অর্থকরী ফসলের চাষ, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সার প্রয়োগ, ফসলের রোগ ও পোকার উপদ্রব নিবারণ প্রভৃতি কার্য্যের ফলে জমির উৎপাদিকা শক্তি অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অনেকে শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, বাঙ্গালায় প্রতি একর জমিতে যে পরিমাণ ধান জন্মে জাপানে তাহা অপেক্ষা আড়াই গুণ, ইটালীতে দ্বিগুণ এবং স্পেনে সাড়ে তিনগুণ অধিক ধান জন্মিয়া থাকে। এই সব ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের বিপুল কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সুখের বিষয়, বড়লাট বাহাদুর এদেশে আসিয়াই ভারতীয় কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য দুইজন বিশ্ববিশ্রুত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়াছেন। তিনি উন্নত শ্রেণীর গো প্রজননের উদ্দেশ্যে দেশের স্থানে স্থানে উন্নত ধরণের বৃষ আনিবার জন্য যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এখনও হয়ত অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু একথা অনেকেই দেখেন না যে, বাঙ্গালা দেশে অন্ততঃ ৭৫ লক্ষ দুগ্ধবতী গাভী রহিয়াছে। উৎকৃষ্টতর প্রজননের ফলে এই সব গাভীর প্রদত্ত দুধের পরিমাণ দৈনিক যদি অর্দ্ধ সেরও বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে প্রতিমন দুধের মূল্য গড়ে তিন টাকা এবং প্রত্যেক গাভী বৎসরে ৩০০ দিন দুধ দেয়, উহা ধরিয়া একমাত্র এই বাবদে বাঙ্গালা দেশের আয় বৎসরে প্রায় ৯ কোটী টাকা বাড়িয়া যাইতে পারে। যাহা হউক কেবল গবর্ণমেণ্টের মুখ চাহিয়া থাকিলে কোন জাতি নিজ অবস্থার উন্নতি সাধনে সমর্থ হয় না। দেশের লোক যদি স্বাবলম্বী হয় এবং শ্রমের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারে তাহা হইলে কোন অর্থব্যয় না করিয়া মাত্র শ্রমবিনিয়োগ দ্বারাই সেচকার্য্য, পশু-পক্ষীপালন প্রভৃতি অনেক হিতকর কাজ সমাধা হইতে পারে। কুরুলিয়া খাল তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আমি আজিকার দিনে এই কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধনের সুযোগে আমার মহকুমার অধিবাসীগণকে এই সব বিষয় ভালরূপে চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

শিল্প সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিবার আছে। কিন্তু বর্ত্তমান স্থান ইহার বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র নহে। কাজেই আমি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিতেছি। আমাদের দেশে কুটির শিল্পগুলি বিনষ্ট ও জীবন্মৃত হইবার প্রধান কারণ, বিদেশী কলজাত সস্তা জিনিষের প্রতিযোগিতা। কিন্তু শিল্পীদের মধ্যে মানুষের পরিবর্ত্তনশীল রুচি ও প্রয়োজন মত জিনিষ সরবরাহের জ্ঞানের অভাবও এজন্য কম দায়ী নহে। এমন এক সময় ছিল যখন আমাদের দেশের নিরক্ষর শিল্পীগণও বিদেশে প্রস্তুত শিল্পজাত দ্রব্যের সঙ্গে অনায়াসে প্রতিযোগিতা করিতে পারিত। ঐ সময়ে শিল্পীদের আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু পরিবর্ত্তনের যুগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে অসমর্থ হওয়ার দরুণ আজ বহু শিল্পী পিতৃপুরুষের আজ্জিত পেষা ছাড়িয়া কৃষিজীবি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা এখনও শিল্পের আশ্রয়ে দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহারা মহাজনের কাছে দেনার দায়ে আবদ্ধ। বহু পরিশ্রমে সে যে সব শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করে তাহা জলের দরে মহাজনের নিকট বিক্রয় করিতে হয়। এই অবস্থার দরুণ শিল্পীগণ নিজ নিজ সর্ব্বপ্রকার উৎসাহ উদ্যম হারাইয়াছে।

আধুনিক কলকব্জা বসাইয়া শিল্পজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধনও তাঁহার শক্তির অতীত। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে শিল্পীগণকে মহাজনের কবল হইতে মুক্ত করিতে হইবে, মানুষের রুচি অনুযায়ী নূতন নূতন ডিজাইন ও নূতন ধরণের জিনিষ সম্বন্ধে তাহাদিগকে উপদেশ দিতে হইবে, শিল্পীগণ যাহাতে যথাসম্ভব কম মূল্যে শিল্পজাত দ্রব্যের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে তাহার সুযোগ দিতে হইবে এবং শিল্পজাত দ্রব্য যাহাতে সহজে বিক্রয় হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এতদিন দেশের ভিতরে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে মূলধন সরবরাহের কোন প্রতিষ্ঠানই ছিল না। আমি দেখিয়া সুখী হইলাম যে, সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট দেশের ছোট ছোট শিল্পগুলিতে মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট কর্পোরেশন নামক একটী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের খরচ যোগাইতে এবং এই প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকির কতকাংশ নিজের স্কন্ধে বহন করিতে রাজী হইয়াছেন। আজকাল সকলের মুখেই পল্লীসংগঠনের কথা উঠিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার ত্যাগী কর্ম্মবীর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙ্গলার পল্লীসংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর ভারতের অবিসম্বাদী জননায়ক মহামানব মহাত্মা গান্ধী এই সমস্যার প্রতি সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বড়ই সুখের বিষয় যে, বর্ত্তমানে রাজশক্তিও এই বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন এবং গত দুই বৎসরে পল্লীসংগঠনের জন্য দুই কোটি টাকার উপর ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের ৭ লক্ষ পল্লীগ্রামের নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত যথোচিত উন্নতি সাধন করিতে হইলে, এই দুই কোটী টাকার দ্বারা এক মাসের ব্যয়ও সঙ্কুলান হইবে না। সুতরাং আমরা যদি একমাত্র সরকারী রাজস্ব হইতে অর্থসাহায্যের দ্বারা সর্ব্ববিধ পল্লীগঠনের কাজ সমাধা করার আশায় বসিয়া থাকি তাহা হইলে উহা মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ধাবমান হওয়ারই সমতুল্য হইবে। পল্লীর যদি উন্নতি সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক পল্লীতে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং প্রত্যেক পল্লীসংগঠনের ব্যয় পল্লী হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে।

আমি কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে সকল কথা বলিতে পারি নাই—আমার কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হইলে আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আর আজ যাহারা এই প্রদর্শনীতে সম্মিলিত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি এই বলিতে চাই যে, আমি তাঁহাদেরই একজন। নিতান্ত বন্ধু ও সুহৃদভাবেই আমি তাঁহাদের নিকট অকপটে মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছি। তাঁহাদের নিকট আমার এই বিশেষ অনুরোধ যে, আমি যে সমস্ত সমস্যার কথা উত্থাপন করিয়াছি তাহা তাঁহারা বিশেষভাবে চিন্তা করুন এবং আমার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অধিবাসীগণকে এই সব বিষয়ে উৎসাহিত করুন। আজ আমার এই সব কথায় যদি এই অঞ্চলের সামান্য কিছুও উপকার হয় তাহা হইলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব।

[ব্রাহ্মণবাড়িয়া কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধন অভিভাষণ, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬।]

'হিন্দুস্থানে'র নব গৃহের উদ্বোধন

গত বুধবার ২৩শে ডিসেম্বর তারিখ সন্ধ্যাবেলা ১৬।১ নং অক্রুর দত্ত লেনে একটী সঙ্গীত জলসার আয়োজন হইয়াছিল। ঐ দিন এই গৃহে প্রসিদ্ধ রেকর্ড ও বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ী হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রডাক্টস্ ও ভ্যারাইটিস্ সিণ্ডিকেট লিমিটেডের একটী নূতন ষ্টুডিয়ো ও কার্য্যালয়ের উদ্বোধন উৎসব হয়। এতদুপলক্ষে গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ গায়িকা শ্রীমতী জেবউন্নিসা বাঈ সমাগত অতিথিবর্গকে তাঁহার সুমধুর সঙ্গীতের দ্বারা আপ্যায়িত করেন। এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ধূর্জ্জটি প্রসাদ মুখার্জ্জি, শ্রীযুত রাইচাঁদ বড়াল, মিঃ সাইগল, সুধামাধব সেনগুপ্ত, কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক, জগদীশ চক্রবর্ত্তী, সদানন্দ বসু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুত চণ্ডীচরণ সাহা এবং শ্রীযুত যামিনী মতিলাল সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর আদর আপ্যায়নে মনোযোগী ছিলেন। প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল।

প্রাপ্তি স্বীকার

আমরা রাধা ফিল্ম কোম্পানীর নিকট হইতে একখানি ইংরাজী নববর্ষের সুদৃশ্য দেওয়াল পঞ্জী উপহার পাইয়াছি। তাঁহাদিগকে আমাদের নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

ছায়া ও কায়া

শ্রীমধু বসু

রূপমহলে রূপকথা

রূপমহল সম্প্রতি কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান রেডিও ও গ্রামোফোন আর্টিষ্টদের দ্বারা গঠিত হয়েছে।

এঁদের প্রথম অর্ঘ্য হয়েছে পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের রূপকথা। ধীরেন দাস পরিচালনা করেছেন,—সঙ্গীত সরবরাহ করেছেন কাজি নজরুল—দৃশ্যপটের দায়িত্ব—রমেন চট্টোপাধ্যায়ের।

রূপকথা একটি সঙ্গীত ও নৃত্যমুখর নাটিকা। সঙ্গীতকুশলী ধীরেন দাসের হাতে পড়ে 'রূপকথা' চমৎকার রূপলাভ করেছে। এঁদের অনেক সঙ্গীত সত্যই গর্ব্বের সামগ্রী, এমন কি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ও যে কোনো রঙ্গালয় এদের সঙ্গীত পরিচালনা দেখে ঈর্ষা প্রকাশ করতে পারে।

রামধনুর রঙের মতো, হালকা মেঘের মতো, দোলের দিনের ফাগুয়ার মতো··· এঁরা গানে গানে যে মধুর নাটিকাটিকে পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরেছেন—তা সত্যই রসিকজনের মন হরণ করবে।

গানে এরা যত পটু, অভিনয়ে তত নয়—নাটিকার ভাষাও দুর্ব্বল—এই দিকে দৃষ্টি দিলে তারা সত্যই আনন্দের খোরাক যোগাতে পারবেন। মনে হচ্ছে নৃত্যগীতি-মুখর এই নাটিকা দর্শকদের মুগ্ধ করবে।

শ্রীঅখিল নিয়োগী

শারদীয়া পূজার পর এই আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ, সুতরাং স্বদেশের অনুরাগী পাঠক পাঠিকাদের আমার শুভেচ্ছা ও প্রীতিনমস্কার জানাচ্ছি। নানারূপ পারিবারিক বিপদ এই সময়ের মধ্যে আমার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, সেইজন্যই আমি এ-ক'মাস নিয়মিতভাবে আমার বিভাগ পরিচালনা করতে পারিনি। এই সঙ্গে ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করলাম।

গত বছর অনেক ছবি বিভিন্ন হাউসে মুক্ত হয়েছে। অনেক নাটকও বিভিন্ন রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছে। সে সবের তালিকা সংগ্রহ করছি—বারান্তরে বিশদভাবে এসব নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

বড়দিনে আমোদপ্রিয়দের বেশ খোরাক মিলেছিল। এই সময়ে রঙ্গালয়গুলি সবাই নতুন নাটক নামিয়েছেন, যথা মিনার্ভার পরশুরাম, নাট্যনিকেতনে গোরা, নব নাট্যমন্দিরে যোগাযোগ, চিৎপুরে নতুন সম্প্রদায় কর্তৃক রূপমহল মঞ্চে 'রূপকথা' অভিনীত হয়েছে। আমাদের পৌষালী সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী 'গোরা'র যে আলোচনা করেছেন তাকেই আমাদের অভিমত বলে চালান যায়। এবার অন্যগুলির আলোচনা ক্রমে ক্রমে পত্রস্থ করব।

রঙ্গালয়গুলির অবস্থা খুব ভাল নয়—নব নাট্যমন্দির 'বিজয়া' খুলে বেশ কিছু লাভ করেছিলেন, যার জন্যই আজ পর্য্যন্ত এদের অস্তিত্ব বজায় আছে—তারা উপর্য্যুপরি কয়েকখানা বই খুলে লোকসানের অঙ্ক বাড়িয়ে তুলেছেন। 'রীতিমত নাটকও' মন্দ চলেনি। নাট্যনিকেতনে 'ক্যালকাটা থিয়েটার্স' নামে নবগঠিত সম্প্রদায় অভিনয় করছেন। তারাও যে খুব সাফল্যের সহিত চালাচ্ছেন তাতো মনে হয় না। 'কেদার রায়' খুলে কিছুদিন বেশ চলেছে—এবং এখন গোরাতেও মন্দ অর্থাগম হচ্ছে না বলে শুনেছি। রঙমহল তো পটলই তুলেছেন। একমাত্র মিনার্ভা থিয়েটার পূর্ণোদ্যমে অভিনয় করে চলেছেন।

শ্রীমধু বসু

মায়া

'মায়া' নিউ থিয়েটার্সের নতুন ছবি—অনেকদিনই এর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল,

কিন্তু চিত্রা অন্য ছবি দ্বারা অধিকৃত থাকায় সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি—গত ২৩শে ডিসেম্বর চিত্রায় সর্ব্বপ্রথম 'মায়া' আত্মপ্রকাশ করেছে।

মায়ার গল্পতে এবং অন্যান্য বিষয়েও বিদেশী ছবির অনুকরণ পরিলক্ষিত হল। একটী অনাথা মেয়ে—নানারূপ অসহনীয় অত্যাচার সহ্য করেও আত্মীয়ার বাড়ীতে পরিচারিকার ন্যায় থাকে। সেই পরিবারটী আধুনিক নব্য সমাজের—এ বাড়ীর মেয়ে শান্তা উৎকট আধুনিক ভাবাপন্না যুবতী। সেই বাড়ীতে প্রতাপ এল পড়াশুনা করতে—প্রতাপ বড়লোকের ছেলে এবং শান্তার বাগদত্ত স্বামী। প্রতাপ এদের এই ঢং বরদাস্ত করতে পারে না, মায়ার প্রতি অত্যাচারও চুপ করে মেনে নিতে পারে না—মায়াকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তার প্রিয় গান তাকে গেয়ে শোনায়—ফলে অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়ায়। শান্তা ঈর্ষায় জ্বলে—মায়া ও প্রতাপ উভয়কেই বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করে। এদিকে শেষোক্ত তরুণ তরুণী উভয়ের প্রেমে পড়ে। শান্তারা ষ্টিমার পার্টিতে কয়েকদিনের জন্য যায়—এই অবসরে মায়া ও প্রতাপের মেলামেশা চলতে থাকে। এমনি সময়ে প্রতাপ পিতার কঠিন রোগের 'তার' পেয়ে চলে যায়—কিন্তু যখন সব শেষ করে ফেরে তখন আর মায়ার সন্ধান পায় না। শান্তারা মায়ার পরিচয় পেয়ে তাকে কুলটা জেনে বাড়ী হতে দূর করে দিয়েছে—অভাগিনী নারী সমাজে আশ্রয় পায় না।

বস্তির একটি ঘরে এক অন্ধ ভিখারীর আশ্রয়ে মায়া থাকে—সঙ্গে শিশুপুত্র বেণু। বেণুর অভাব যখন খারাপ হতে লাগল মায়া স্বামীর কাছে যেতে চাইল—কিন্তু প্রতাপের চাকর তাকে ভিখারী স্ত্রীলোক জ্ঞানে বিদায় করে দিল।

প্রতাপ জানতে পারে হাসপাতালে মায়া আশ্রয় নিয়েছিল—সেখান হতে একটী শিশুপুত্র সঙ্গে নিয়ে অন্যত্র কোথাও চলে গেছে—তন্ন তন্ন করে খবর নেয়, কিন্তু তাদের সন্ধান কোন মতেই পায় না। প্রতাপ এখন এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার—পোষ্য নেবার জন্য টাকার লোভ দেখিয়ে বিজ্ঞাপন দিল। বস্তির একটী গুণ্ডা লোভে পড়ে বেণুকেই ভুলিয়ে প্রতাপের হাতে দিয়ে গেল। এদিকে মায়া সন্দেহ করে এই লোকটিকে জিজ্ঞেস করল—"বেণু কোথায়—আমার ছেলে কোথায়।" লোকটী মাতাল অবস্থায় ছিল—চমকে উঠল—মায়াকে অন্য ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে মায়াকে লালসার কথা জানায় এমনি সময়ে পড়ে গিয়ে বোতলের কাঁচে কেটে গিয়ে মারা যায়। ভীষণ চীৎকার, আর্ত্তনাদ মায়া হয় দোষী। কোর্টে বিচার চলছে—মায়ার স্বাভাবিক জ্ঞান নেই, খালি বলে "আমার ছেলে কোথায়?" সেই চীৎকারে কোর্টের প্রাঙ্গনস্থিত প্রতাপ এসে দেখে, তারই 'মায়া'। তার চেষ্টাতেই মায়া নির্দ্দোষ বলে মুক্তিলাভ করে—মিলন হয়।

প্রসিদ্ধ বিদেশী ছবি 'ওয়ে ডাউন ইষ্ট' দেখেছি—লিলিয়ান গিস্ এই ধরণের ভূমিকাতেই নেমেছিলেন—সেই ছবির কাহিনী কিভাবে এগিয়েছিল তা নিশ্চয় মায়ার গল্প লেখক ও পরিচালকের অজানা নেই। মায়া যে ভাবের গল্প তাকে যে যোগ্যভাবে রচনায় ধরা যায় নি তা অতি সত্য কথা। মনে হল মায়ার বিয়ের দৃশ্যটী এবার নতুন তুলে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ গল্প দেখে মনে হয় মায়া অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়েছিল বলেই সমাজের মধ্যে স্থান পায়নি। এই

'মায়া'র একটি দৃশ্য

সময়ের ব্যবধান এমনভাবেই দেখান হয়েছে (প্রতাপের মায়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়া এবং মায়ার ভিক্ষুকের আশ্রয় হওয়া) যা বেশ দ্রুত বোধ হয়—এর মধ্যে আর কিছু দেখালে ভাল হত। কয়েকটী স্থান অনর্থক ফেনান হয়েছে—মায়ার বিচারদৃশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত হয়েছে—এবং শেষের মিলনও আকস্মিক ভাবের হয়েছে। বইখানা বিয়োগান্ত হলেই ভাল হত। মায়ার ভিক্ষুকের আশ্রয়ে বাস করার সময়ে দুঃখের ভাব মোটেই পরিদৃষ্ট হলনা—এর জন্য রচনা, অভিনেত্রী এবং পরিচালক সবাই দায়ী। গল্পটী বেশ জমাট হয়েছে সত্য, কিন্তু রচনা যে কাঁচা হাতের, তার ছাপ সমস্ত ছবিতেই পেলাম। সম্পাদনাও আশানুরূপ ভাল হয়নি—বাজে দৃশ্যগুলির ওপর কাঁচি চালাবার অবকাশ রয়ে গেছে। সুকুমার দাশগুপ্ত এর গল্পাংশের লেখক।

চিত্রনাট্য মন্দ হয়নি—সুপরিচালনায় ছবিখানা উপভোগ্য হয়েছে। কাহিনীর মধ্যে বর্তমানের উৎকট আধুনিকতার বিরুদ্ধে যে সব কথা লেখা হয়েছে তার প্রশংসা করি। শেষের দিকটা যথেষ্ট চিত্তগ্রাহী হওয়া উচিৎ ছিল। আধুনিক তরুণী শান্তার চরিত্র যেভাবে আঁকা হয়েছে তাও সমর্থনযোগ্য নয়। এই সব ত্রুটী যা সমালোচকদের চোখকে পীড়া দেয়, তা ছাড়া মায়া একখানা অতি উপভোগ্য চিত্র হয়েছে—তার পরিচয় দিয়ে দিলাম।

মায়ার টেক্‌নিক্ হয়েছে চমৎকার। আজুরীর নাচের যে পরিকল্পনা—তার প্রশংসা করি মুক্তকণ্ঠে—চমৎকার ভাব এবং নর্তকী নেচেছেনও সুন্দর। সুর ছিল সুপ্ত—তা জেগে উঠলো—পরে আবার সুপ্তির মধ্যে মিশিয়ে গেল। আজুরীকে এরাই যোগ্য কাজে লাগালেন—তাছাড়া অন্যান্য ছবিতে এর লাস্যময় নৃত্য অবলোকন করতে করতে বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। এই নাচের দৃশ্যের সেটিংস্ চমৎকার, অন্যান্য দৃশ্যগুলিও অতি সুন্দর। আরো সৌখিন সমাজের আধুনিক নর-নারীর নাচ, স্ফূর্তি, আমোদ-প্রমোদ কতই না আছে—বেশ উপভোগ্য এগুলি, তবে কিছু কমান দরকার। পশ্চাৎ-পট-সঙ্গীত অতি সুমধুর, দেশী বিদেশী সুরের সংমিশ্রনে সম্ভবতঃ এই সুরের জন্ম হয়েছে। গান আছে অনেকগুলি—সবগুলির রচনাও যেমন সুন্দর, সুরও তেমনি সুন্দর, গাওয়াও হয়েছে তেমনি সুন্দরভাবে। রাইচাঁদ বড়াল ও পঙ্কজ মল্লিক সুরশিল্পী ছিলেন। ফটোগ্রাফী হয়েছে অতি উচ্চাঙ্গের, নতুন ক্যামেরাম্যান বিমল রায় এরি মধ্যে এতটা ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন দেখে আশাতীত আনন্দ লাভ করেছি। ছবির আলোক নিয়ন্ত্রণ হয়েছে উচ্চাঙ্গের—এমন স্বচ্ছ ছবি খুব কমই দেখা যায়! রেকর্ডিং উচ্চাঙ্গের না হলেও প্রশংসনীয় হয়েছে। রেকর্ডার হচ্ছেন বাণী দত্ত। ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করি। রসায়নাগারের কাজেরও খুঁত পাওয়া যায়নি। পরিচালনায় প্রমথেশ বড়ুয়া কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বেশ সহজভাবে ছবিটী এগিয়ে গেছে।

প্রতাপের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল ভাল অভিনয় করেছেন। বেশ সাবলীল ভাবে তাকে অভিনয় ও গান গাইতে দেখলাম। সম্ভবতঃ এই প্রতাপই তার অভিনীত ভূমিকাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভে সমর্থ হবে। [illegible]লাল কথা এবং গানের দ্বারা তিনি সকলকেই পরিতৃপ্ত করতে পেরেছেন। [illegible] ওস্তার ভূমিকায় অহি সান্যাল ও যোগেন চট্টোর অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। অহির অংশটীতো বেশ আনন্দ দেয়, তার গানও ভাল হয়েছে। অন্ধ ভিক্ষুকের ভূমিকায় কৃষ্ণচন্দ্র দের অভিনয়কালীন কথা বেশ

ভাল শুনিয়েছে, কিন্তু তার মুখের ভাব ভাল হয় নি, সুতরাং ও ভাবগুলিকে পর্দায় বন্ধ করে না দেখানোই শ্রেয়। কৃষ্ণচন্দ্রের গান কখানা শ্রুতিমধুর হলেও বিশেষত্বহীন বলে বোধ হল। নায়িকা মায়ার ভূমিকায় যমুনা চলনসই পর্য্যায়ের অভিনয় করেছেন। তাকে দিয়ে না গাওয়ানোই উচিৎ ছিল। যমুনা শেষের দিকে চরিত্রটীর মর্য্যাদা একটু ক্ষুন্ন করে ফেলেছেন। অর্দ্ধ উন্মাদের ভাবও তিনি উচিৎমত ফোটাতে পারেন নি। সিতারা শান্তার ভূমিকায় যে ভাব দেখিয়েছেন তা সঙ্গত হয় নি তবে এর জন্য নারী চরিত্রের রচয়িতাই বেশী। শান্তার মার ভূমিকায় রাজলক্ষ্মী সাধারণ ধরণের অভিনয় করেছেন। হরিমতীর গান শ্রুতিমধুর হয়েছে। অন্যান্য অংশগুলি সুঅভিনীত হয়েছে।

'মায়া' দেখে সাধারণ দর্শকগণ যে বেশ আনন্দ লাভ করবেন তাতে আমরা নিঃসন্দেহ।

ষ্টুডিও সংবাদ

ইষ্ট ইণ্ডিয়ায় ষ্টুডিয়োতে মতিমহল টকিজের হয়ে জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে রাঙা-বৌ পরিচালনা করছেন, নিম্নে তার সম্পূর্ণ ভূমিকালিপি দিলাম। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'ঘূর্ণী হাওয়া' হতে এর গালগথনা নেওয়া হয়েছে।

বিশ্বপতি—জীবন গাঙ্গুলী, সনাতন—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মিঃ বোস—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, অনন্ত—রতীন বন্দ্যোঃ, সুরেন—মণি ঘোষ, নিমাই—অমল বন্দ্যোঃ, কল্যাণী—মায়া দেবী, মন্দা—মেনকা, চন্দ্রা—শেফালিকা (পুতুল), রমা—পূর্ণিমা, পাগলী—রাধারাণী।

কালী ফিল্মের 'টকি অব টকিজ' প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শোনা যাচ্ছে এই মাসের মাঝামাঝি নাকি উত্তরায় এর আত্মপ্রকাশ হবে। 'সোনার সংসার' এখন পর্য্যন্ত যে ভাবে দর্শক আকর্ষণ করছে তাতে মনে হয় না যে সহজে উত্তরা হতে সরবে। সুশীল মজুমদারের 'মুক্তিস্নানে' নায়ক নায়িকার ভূমিকায় এখন অভিনয় করছেন যথাক্রমে জীবন গাঙ্গুলী ও রাণীবালা। এই দুটী ভূমিকার জন্য প্রথমতঃ নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন রাজীব রায় ও শীলা হালদার। শীলার পরিবর্ত্তে রাণীর নির্ব্বাচনে আমরা

'মায়া'র একটি দৃশ্য

খুবই খুসী হয়েছি, কারণ অভিনেত্রী হিসাবে রাণী তাঁর চেয়ে অনেক শক্তিশালিনী।

রাধা ফিল্মের 'ছিন্নহার' তুলছেন পরিচালক হরি ভঞ্জ। প্রধান ভূমিকাগুলিতে নামছেন শান্তি গুপ্তা, রেণুকা রায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি।

শোনা যাচ্ছে পরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষ এখানে যোগদান করেছেন।

নিউ থিয়েটার্স

নীতিন বসুর আগামী চিত্র দিদি (বাংলা) এবং প্রেসিডেন্টের (হিন্দী) কাজ দ্রুত গতিতে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। শেষ দৃশ্য—নবগঠিত মিল ম্যানেজারের (সাইগল) প্রকোষ্ঠের ছবি তোলা হয়েছে। এই দৃশ্যে দেখা গেল, সাইগল তাহার দুইজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর (নবাব ও অমর মল্লিক) আপ্যায়নে ব্যাপৃত। আমাদের মনে হয়, ২।৪ দিনের মধ্যেই ছবি দুইখানির কাজ শেষ হয়ে যাবে।

২নং ষ্টুডিয়োতে গিয়ে দেখলাম, কর্ম-সচিব ফোটাই মিত্তির তাঁর পরবর্ত্তী বাংলা ছবির কথা লিখছেন। প্রকাশ, এখানি একখানা নামকরা ছবি হবে এবং একজন প্রসিদ্ধ ডিরেক্টর ছবিখানি পরিচালনা করবেন। এই ছবির কাহিনী কোন উপন্যাস থেকে নেওয়া হবে না—এই ছবির জন্যই পৃথকভাবে গল্প রচিত হয়েছে। শীঘ্রই ছবিখানির সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠকদের আলোকিত করবো।

রূপবাণীতে বিষবৃক্ষ

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর নবতম চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' রূপবাণীতে বড়দিনের আসরে বিপুল দর্শক আকর্ষণ করছে।

ছবিখানির ফটোগ্রাফী স্থানে স্থানে খুব উচ্চাঙ্গের হয়েছে--বিশেষ ঝড় জলের দৃশ্য বাস্তব বলে মনে হয়। অভিনয়ও— কাননবালা, শান্তি গুপ্তা প্রভৃতির উচ্চাঙ্গের হয়েছে। ছবিখানি রূপবাণীর আসর অনেক দিন দখল করে থাকবে বলেই আমাদের ধারণা।

চন্দ্রনাথ

ভারতী পিকচার্সের 'চন্দ্রনাথের' প্রাচীর-পত্র অনেকদিন আগেই দেখা গেছে—যদিচ এখনও পর্য্যন্ত ছবির কাজ আরম্ভ হয়নি। শোনা যাচ্ছে, এইবার শূটিং আরম্ভ হবে। এতদিন নাকি সরযূর ভূমিকাভিনেত্রী খোঁজা হ'চ্ছিল। শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তাকে নাকি এই ভূমিকায় ঠিক করা হয়েছে। তাহলে এইবার কুমার গুপ্তের পাইওনীয়ার ষ্টুডিয়োতে ঘন ঘন যাতায়াত আসন্ন হয়ে এল!

নব নাট্যমন্দির

আমরা গতকল্য বৃহস্পতিবার নব নাট্যমন্দিরে রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' দেখে এসেছি। আগামীবারে এর পরিচয় প্রকাশ করবো।

মিনার্ভা

মিনর্ভার 'পরশুরাম' বেশ আসর জমিয়ে তুলেছে। শ্রীযুত বরদা দাস গুপ্তের এই নাটকখানিতে হাস্য ও করুণ রস সমানভাবে পরিবেশিত হয়েছে। নাচগান এবং দৃশ্য সজ্জার জাঁকজমক দর্শকদের মুগ্ধ করে। নাটকখানি উচ্চশ্রেণীর না হলেও দর্শকগণ এর অভিনয় দর্শনে খানিকক্ষণ অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতে পারে। পরশুরামের ভূমিকায় শরৎ চট্টোপাধ্যায়, জামদগ্নের ভূমিকায় প্রফুল্ল দাস, রাজা কার্ত্তবীর্য্যের ভূমিকায় কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায় সুন্দর অভিনয় করেছেন। বসন্তের ভূমিকায় রঞ্জিত রায়ের অভিনয়ও উপভোগ্য। রেণুকা ও ভানুমতীর ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীমতী নিভাননী ও লাইট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছোট ছোট ভূমিকায় বঙ্কিম দত্ত, রাজলক্ষ্মী এবং বিশেষ করে ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকাভিনেত্রী বালিকার কৃতিত্ব সর্বাধিক প্রশংসাযোগ্য। মোটের উপর 'পরশুরাম' মিনার্ভার তহবিল বেশ ভারী করে দিচ্ছে।

নাট্যনিকেতন

নাট্যনিকেতনে বড়দিনের আসর বেশ ভালই জমেছিল। এখানে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' দর্শকদের অভিভূত করে দিয়েছে। বড়দিনের আসরে নূতন নাটক 'গোরা' ছাড়া কয়খানি পুরাতন নাটকও অভিনীত হয়েছে।

রঙমহল

কয়েক দিন আগে প্রাচীর পত্র পড়েছিল যে, অভিনেতৃ সঙ্ঘ নাট মহল নাম দিয়ে এখানে বড় দিনের আসর বসাবেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, বড় দিনে আসর বসলো না। এরা যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'রজনী গন্ধা' নামে একখানা নাটকের মহলাও আরম্ভ করেছিলেন বলে শুনেছিলাম। এখন শুনছি, শীঘ্রই নূতনভাবে একটি দল গঠিত হবে পুনরায় রঙমহল পরিচালিত হবে। সম্ভবতঃ লিমিটেড কোম্পানীর অস্তিত্ব থাকবে না।

সচিত্র সাপ্তাহিক
দ্বিতীয় বর্ষ—৪৫শ সংখ্যা
শুক্রবার—২৪শে পৌষ
১৩৪৩
৮ই জানুয়ারী—১৯৩৭
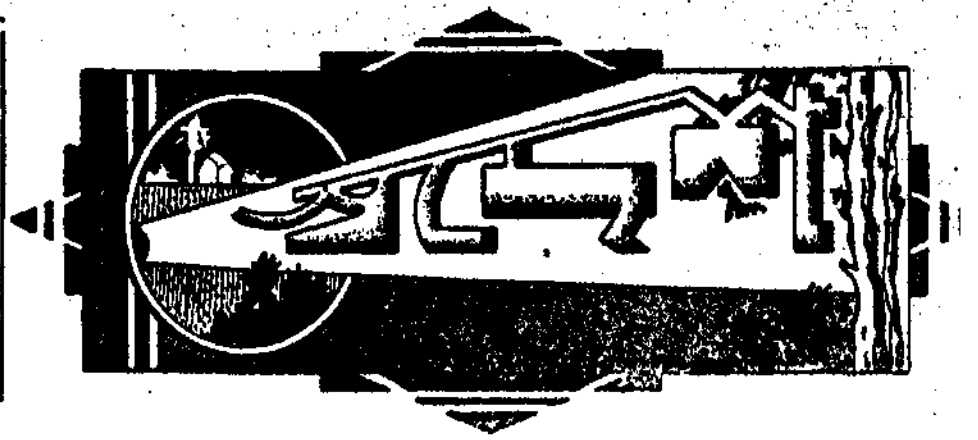
মুক্তির পথ

পরানুকরণপ্রিয়তা পরাধীনের স্বভাবধর্ম্ম হলেও এ বিষয়ে ভারতবাসী আমরা যেমন কেতাদুরস্ত হয়ে উঠেছি এতটা বুঝি আর কেউ হয় নি। আমাদের রাষ্ট্রে, সমাজে, শিক্ষা, দীক্ষায়, ধর্ম্মে, আচারে ও ব্যবহারে সকল দিক দিয়েই পাশ্চাত্যের প্রভাব আজ এমনি প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তার আপাত-মধুর মোহ মাদকতায় মুগ্ধ হয়ে আমরা নিজের বলতে যা কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, সবই তাতে বিসর্জ্জন দিতে বসেছি। আজিকার আন্তর্জ্জাতিক ভাব বিনিময়ের হাটে বেসাতি করতে গিয়ে লাভবান হয়েছে আর সবাই, হয় নি কেবল তারা যারা সে হাটের মাঝে নেমে দিশেহারা হয়ে আপনার পুঁজিপাটাকে ফেলেছে হারিয়ে।

পাশ্চাত্যের শিক্ষা দীক্ষা আমাদের মনের দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করেছে, জ্ঞান বিজ্ঞানের নিত্য নূতন অবদানে আমাদের ধনের ভাণ্ডার রিক্ত করলেও জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলেছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের মনের উদারতাকে সে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করতে শিখিয়েছে—প্রবৃত্তিটাকে করে তুলেছে আত্মসুখপরায়ণ। ব্যক্তিত্বকে করেছে দুর্ব্বল—মনকে করেছে ভীরু। আমাদের দেশের সনাতন যে আদর্শ—পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির যূপকাষ্ঠে তাকে অকাতরে বলি দিয়ে আমরা শিখেছি স্বার্থসঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিতে, আত্ম-সুখকেই বড় করে দেখতে, সমষ্টির মোহে ব্যষ্টিকে বিলিয়ে দিতে।

আমাদের দেশের আদর্শ যেখানে ভোগকে সংযমের পথে বাঁধতে ও সংযমকে পুণ্য কর্ম্মে নিয়োজিত করতে নির্দ্দেশ দিয়েছে—আমাদের গৃহী-ধর্ম্ম যেখানে আমাদের গৃহখানিকে আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী অনাথ আতুর ও অতিথির মধ্যে সম্প্রসারিত করে দেবার ইঙ্গিত করেছে, সেখানে পাশ্চাত্যের সমাজ জীবনের অনুকরণ-প্রিয়তায় আমরা টেনে দিয়েছি দাম্পত্য-জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী। আপনার ক্ষুধার অন্ন অন্যের মুখে তুলে দিয়ে উপবাসেও যারা আত্মসুখ অনুভব করেছে তাদের আদর্শকে আমরা ফেলেছি হারিয়ে। মনটাকে সমষ্টির গণ্ডী থেকে টেনে এনে বেঁধেছি দাম্পত্য-জীবনের দুঃসহ সঙ্কীর্ণতার বন্ধনে। শুধু নিজের ঘরকে আঁকড়ে পড়ে থাকার ভীরু প্রবৃত্তিতে ব্যক্তিত্বকে করেছি অবশ, মনকে করেছি পঙ্গু, দাম্পত্য-প্রেমের নামে স্বার্থসঙ্কীর্ণতার বাঁধনে আপনাকে করেছি বন্দী।

আজ এই মনের বন্দীত্ব থেকে মুক্তির জয় যাত্রায় আমাদের অগ্রসর হতে হবে, প্রেমের নামে সঙ্কীর্ণতার মোহ-ডোর ছিন্ন করে বিলিয়ে বিকিয়ে দিতে হবে আপনাকে সংসারের মাঝে দশের সেবায়। ঘরের মোহ কাটিয়ে যত কিছু ভীরুতা, স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতা, জড়তা ও দাসত্ব পরিহার করে বাহিরের বৃহত্তর জীবন-সিন্ধুর বুকে ঝাঁপ দিতে হবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্তরগত যে সম্পর্ক তাকে সার্থক করে তুলতে হবে আমাদের কর্ম্মে ও সেবাধর্ম্মে। সত্যিকারের পুণ্য ও ধর্ম্ম বলে যদি কিছু থাকে তা এই সমষ্টি সেবার মধ্যেই আছে—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তির জওয়াদি বা শাস্ত্রীয় আদর্শের অন্ধ সংস্কারের মধ্যে নয়।

চাতিম চাতিম

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

এতদিন আমাদের রাজনীতি ছিল ভদ্রলোকের খেলার সামগ্রী। অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের বস্তু থেকে ওটা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ভাব সাধনের বস্তুতে। বড় বড় হোমরা চোমরা নেতারা বড়দিনের ছুটিতে ইষ্টারের অবসরে একদিন বেশ ষ্টাইলের ওপর কংগ্রেস করে গেছেন। তাঁরা পরমানন্দে ফার্ষ্ট ক্লাসে চড়ে কেল-নারের গোস্ত, রুটি, সিগার, ওয়াইন্ উড়াতে উড়াতে এসে প্যাণ্ডালে জমা হতেন; তারপরে তাঁবুতে তাঁবুতে সাহেবী কায়দায় চলতো সখের পলিটিক্স। দেদার স্পিচ দেবার সিটিংএর পর এই ধনীর তামাসা শেষ হ'তো নরম ভাষায় গরম গরম রিজলিউশনে, প্রস্তাব পাশ করায়। আজ এটা খুব চাঞ্চকর মনে হলেও সেইটেই ছিল গোড়া, বিরাট বট বৃক্ষের সর্ষপ প্রমাণ বীজ।

*   *

তারপর এলো ভাবের যুগ। শ্রীঅর-বিন্দ ও তিলককে আশ্রয় করে সখের রাজনীতি বদলে গেল ইমোশনের রাজ-নীতিতে। ধনীরা নিলেন বিদায় আর প্যাণ্ডালে ঢুকলেন ভলাণ্টিয়ার ফৌজ পিছনে মধ্যবিত্তের দল। জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে গরম গরম লেকচার ঝেড়ে, ধ্বজপতাকা নেড়ে তাঁরা আরম্ভ করলেন ভারতীয় একতার ডেমনোষ্ট্রেশন। তখন আরম্ভ হলো মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের চর্চ্চা, তর্জ্জন ও গর্জ্জন, ধর ও পাকড়,—বিপুল এক উদ্দাম ঝঞ্ঝা। অসীম অতল নিস্পন্দ নিদ্রিত সাগরের ওপর এই কেন বুদ্বুদের লীলা দেখতে ছিল যেমন মনকাড়া, বেগে ও গতিতে ছিল তেমনি সুপারফিশিয়্যাল—নিতান্তই অগভীর উপরিভাগের। ভারত মহাসাগরে চলেছিল ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের চঞ্চল ফরফরানি।

*   *

মানুষ যখন যে অনুপাতে বাড়ে, শৈশব কৈশোর যৌবন পার হয়ে সে যখন চলে প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্য্যের দিকে তখন সেই অনুপাতে তার দৃষ্টি যায় বদলে। শিশুর চাপল্যে কিশোর হাসে, কিশোরের দৌরাত্ম্যে যুবক করে উপহাস, যুবকের নাটুকে ভাবন দেখে প্রৌঢ়ের মুখে ফোটে বিজ্ঞের মুচকী হাসি। জাতি বা নেশনও বাড়ে, তারও পরে পরে চলে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ় লীলা। তারও এক একটা অবস্থায় তার ঠিক পূর্ব্বেকার কাঁচা আনাড়ী অবস্থার পাগলামী দেখে পায় হাসি। হেসে কিন্তু লাভ নাই, কারণ অবস্থাগুলো সব কয়টাই সত্য, কোনটাকেই বাদ দিয়ে, বৃদ্ধি বা পুষ্টি সম্ভব নয়। আমাদের মধ্যে শিক্ষিত কালচার্ড জেণ্টলম্যান অনেকে আছেন কিন্তু রাজনীতির এই শৈশব, বাল্য যৌবনের মানুষগুলিকে দেখে তাঁদের রসিকতা বা ব্যঙ্গ আদৌ বুদ্ধির পরিচয় দেয় না। অটোক্র্যাসী জন্ম দেয় ডিমো-ক্র্যাসীকে, তার গর্ভে আবার জন্মায় গণোক্র্যাসী। এবার ছয় বলদের গাড়ীতে কংগ্রেসের গণোক্র্যাসীর হয়েছে জন্ম। এটাও অবশ্য ডিমনষ্ট্রেশন্—লোক দেখানো বাহ্য আড়ম্বর। তা' হোক, তামাসা একদিন সত্য হয়ে উঠতে পারে, মধ্যবিত্তের কংগ্রেস একদিন কেরামৎ মাঝী আর পঞ্চু ধরামীর কংগ্রেসে পরিণত হতে পারে।

*

কেরামৎ আর পঞ্চুকে মানুষ করতে ঢের দেরী আছে, তার জন্য অনেক কাট খড় পোড়াতে হবে, সে মায় এর রাধাকে নাচাতে অমন অনেক চৌদ্দ মন তেল

নিঃশেষ করতে হবে। ছুরি ও ডাণ্ডা হাতে কেরামৎ ও পশুকে শেষপর্যন্ত মধ্যবিত্তের দাওয়ায় তুলে দিলেই যার এর দুঃখ ঘুচবে না। তা' করলে ফল হবে এই, যে, কেরামৎ ও পশু ডাণ্ডা ও ছোরার ঘায়ে ভদ্রলোকের মস্তক চূর্ণ করে খুনী হয়ে ঘুরে দাঁড়াবে পরস্পরের মাথা ও ভুঁড়ি ফাঁসাতে। সৃষ্টির আছে ক্রম-পরম্পরা, তার ধাপগুলোকে সাত তাড়াতাড়ি ডিঙিয়ে-ঠেলে নিয়ে যাওয়া যায় না একেবারে চরম ফলের দিকে। দেশনের পাঁচ মাসের গর্ভ থেকে অপারেশন্ করে পঞ্চাশোর্ধ্ব শিশু বার করলে যা' জন্মাবে তা' হবে একটা বিকৃত বিকলাঙ্গ মাংস পিণ্ড।

* *

কিলিয়ে কোনও কাঁঠালই পাকানো যায় না, না ধর্মের কাঁঠাল, না কর্মের কাঁঠাল, না রাজনীতির কাঁঠাল, না গাছের কাঁঠাল। এই কঠোর বস্তুতন্ত্র জগতে বেহিসাবী কিছুই নাই, শত সহস্র শতাব্দী ধরে যাদের আমরা মানুষের অধিকারে বঞ্চিত রেখে অমানুষ করেছি তাদের আজ দু'পাতা য়ুরোপীয় ইতিহাস পড়ে সখের ঝোঁকে মানুষ করতে পারবো না। অমানুষ করতে যাদের এত শাস্ত্র মন্ত্র এত আচার নিয়ম লেগেছে, মানুষ করতে তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। কথায় আমরা বড় কাঙাল, প্রস্তাব পাশ করায় আমরা প্রচণ্ড লোভী, কাজ আমরা আরম্ভ এবং শেষ করতে চাই বুলিতে আর ডিমনস্ট্রেশন-এ; তার সঙ্গে যখন ইমোশনের মশলা সংযুক্ত হয় তখনই আমাদের জাতীয় যজ্ঞের পঞ্চামৃত প্রস্তুত। আর যে কিছু হাতে কলমে করবার বাকি আছে—এ ধারণা বোধ হয় এখনও আমাদের স্পষ্ট হয়ে জন্মায় নাই।

* *

আজ যাঁরা কংগ্রেসের মাদল ঘাড়ে জেলায় জেলায় পরগণায় পরগণায় গ্রামে গ্রামে টহল দিচ্ছেন, তাঁরা দরিদ্র গ্রামবাসীর ভোট কুড়িয়ে একবার মসনদে চেপে সিট ডাউন করতে পারলে আর ভুলেও সে পাঁকের পথ মাড়াবেন না। তখন তাঁরা চাষা ভুষার স্থানীয় দুঃখ কষ্ট দূর করবার কথা ভুলে কাউন্সিলে ব্যস্ত থাকবেন কংগ্রেসের প্রেষ্টিজ বাঁচাতে। সরকারী বেসরকারী প্রেষ্টিজের চলবে ঠোকাঠুকি, তাতে স্ফুলিঙ্গ উড়বে বিস্তর, দেশের দুঃখের নিকষকালো আকাশে সে রাজনীতিক আতসবাজীর শোভা হবে মারাত্মক। কিন্তু পশু ও কেরামতের দধি-ভাল তা'তে কতখানি সুপ্রসন্ন হবে বলা শক্ত।

* * *

একটা আছে পথের খানা ডোবা আর একটা আছে দূর গন্তব্যের স্বর্ণপুরী। পথের খানা ডোবা থেকে হাত পা বাঁচিয়ে তবে তো ঐ সিংহদরজা খুলে মুক্তির রাজপুরীতে পৌঁছান যাবে। দরিদ্র ভারতের নিরন্ন পথিককে পথের কাঁটা থেকে বাঁচিয়ে কে মুক্তির মণ্ডপে নিয়ে যাবে? সেখানে পৌঁছে তার কুব্জপৃষ্ঠ সোজা করে ঘোলা চোখ উৎফুল্ল করে তাকে নেতাদের জয়-জোকার যে দিতে হবে তার জন্য বল ও তাগৎ সে সঞ্চয় করবে কি করে? ক্ষুধাতৃষ্ণা আধি ব্যাধি যাকে পাগল করে রেখেছে তার কাছে স্বরাজের খোয়াব দেখায় আনন্দ আশা করা বাতুলতা। এসব আইডিয়ালিজম্ হচ্ছে ভরা পেটের বিলাস, তাই ধনী ও মধ্যবিত্তের খোস খবরের ঘুঁটা খোয়াবে তারা কিছুতেই সাড়া দিয়ে উঠতে পারে না। খোয়াব যখন সত্য হবে তখনও খালি পেটেই হয়তো তাদের স্বরাজের গৌরবে ভাঙা বুকটা তাকে টান করে দাঁড়াতে হবে। যুগে যুগে তাই-ই তো হয়েছে।

—:—

নির্ব্বাচন প্রসঙ্গ

দিনাজপুর পল্লীকেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়াছেন শ্রীযুত নিশীথ কুণ্ডু, শ্রীযুত নলিনী অধিকারী এবং রায় সাহেব গিরীন্দ্রনাথ চৌধুরী দলগত চক্রান্তের ফলে নিশীথবাবু কংগ্রেসী মনোনয়ন পান নাই এবং তজ্জন্য তিনি কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্টের পদে ইস্তাফা দিয়াছেন, পাঠকগণ বোধ হয় তাহা অবগত আছেন। নিশীথবাবু অপেক্ষা বড় কংগ্রেস সেবী প্রার্থীদের মধ্যে কেহই নাই। সুতরাং আমাদের মনে হয় ভোটারগণ নিশীথ বাবুকে সমর্থন করিয়া ত্যাগী কর্ম্মীর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। আমাদের নিকট যতদূর সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে মনে নলিনীবাবু বালুরঘাট অঞ্চলের ভোট পাইবেন, গিরীনবাবু কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারীর সহায়তায় ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের ভোট পাইবেন, তবে দিনাজপুর সদর এবং আরো অন্যান্য অঞ্চলের ভোট নিশীথবাবুই পাইবেন বলিয়া মনে হইতেছে।

* * *

দক্ষিণ মধ্য কলিকাতা কেন্দ্র (১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ ওয়ার্ড) হইতে ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইয়াছেন প্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্টর ও ব্যবসায়ী শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র কুমার ওরফে মিঃ পি, সি, কুমার। তিনি হিন্দু মহাস-

ন্যাশনালিষ্ট পার্টির মনোনয়ন পাইয়াছেন। তাঁহার বহু দানধ্যান আছে। তিনি তাঁহার স্বগ্রাম চণ্ডীতলাতে (হুগলী) দেড় লক্ষ টাকার উপর ব্যয় করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিদ্যালয় স্থাপন, গ্রন্থাগার গঠন, দরিদ্রাবাস নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানারূপ জনহিতকর কার্য্যে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তিনি ইউরোপ, আমেরিকা, চীন জাপান প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া শিল্পোন্নতি ও আধুনিক স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের একজন বিশিষ্ট সদস্য। এতদ্ব্যতীত বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট।

*　*　*

এই কেন্দ্র হইতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে দাঁড়াইয়াছেন মিঃ জে, সি, গুপ্ত। ইনি সম্প্রতি নিজের দলের প্রতি যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিলে ব্যবস্থা পরিষদের ভিতরেও যে ইনি স্বদলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? দক্ষিণ মধ্য কলিকাতার ভোটদাতাগণ বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক এবার তাঁহাদের ভোটের সদ্ব্যবহার করিবেন, এই আমাদের অনুরোধ।

*　*　*

পূর্ব্ব কলিকাতা সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে এবার কুমার হিরণ্যকুমার মিত্র সদস্য পদপ্রার্থী হইয়াছেন। স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্রের তিনি সুযোগ্য বংশধর এবং দেশের ও পল্লীর বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। শতাধিক বৎসর হইতে বহু দরিদ্র ছাত্র তাঁহার অনুগ্রহে আহার ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় সাহায্যলাভ করিয়া আসিতেছেন। কলিকাতার প্রথম দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া আর্ত্ত প্রপীড়িত দরিদ্র সেবায় এই বংশ যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে অল্পকালের মধ্যেই পৌরজনসেবায় কুমার যে আগ্রহ ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে কলিকাতার
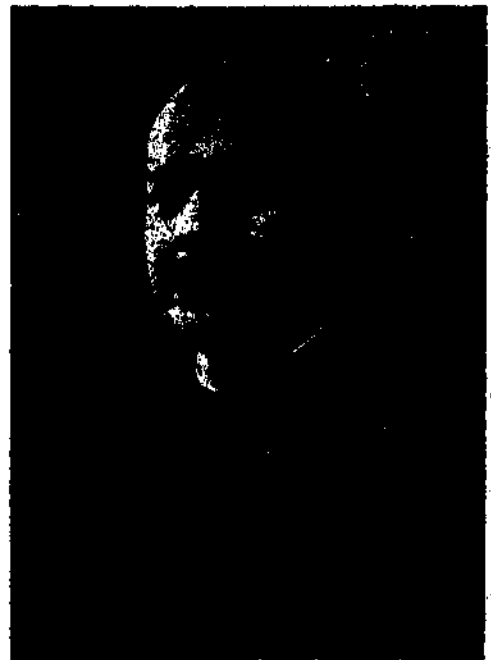
মিঃ পি, সি, কুমার

কুমার এইচ, কে, মিত্র

ভগবানের দর্শন পাওয়া যায় বলিয়া পল্লী-বাসীর যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে অপনোদিত হইয়াছে। ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের সদস্যরূপে তিনি দরিদ্র সেবার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাও প্রশংসনীয়। সুন্দরবন অঞ্চলে বহু দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ও জলাভাবগ্রস্ত নরনারীর সেবায় তিনি মুক্তহস্তে দানে কার্পণ্য করেন নাই। আর তিনি বিশুদ্ধ স্বার্থ রক্ষার ও সাধারণ জনসেবার আগ্রহে তিনি পল্লীবাসীর প্রতিনিধিত্বের দাবী লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। আশা করি পল্লীবাসীগণ যোগ্যের সমাদরে বিমুখ হইবেন না।

* * *

ডায়মণ্ডহারবার নির্বাচন কেন্দ্র হইতে এবার নির্বাচনপ্রার্থী হইয়াছেন মিঃ ডি সি ঘোষ। ঘোষ মহাশয় ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ট্রাইবুন্যালের প্রেসিডেণ্ট, সুতরাং ব্যবস্থা পরিষদে সদস্যগিরির জন্য ব্যস্ত না হওয়াই তাঁহার পক্ষে ভাল ছিল। মিঃ ঘোষের যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্বন্ধে আমরা আজ আর কিছু বলিতে চাহি না তবে পিতার জীবদ্দশায় কি কারণে তিনি পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন এবং পূর্ব্বের সরকারী ডাক বাংলায় কোন্ অপকীর্ত্তির জন্য তাঁহাকে যোগ্য সমাদর লাভ করিতে হইয়াছিল, আশা করি, এই প্রশ্ন দুইটীর সদুত্তর দিয়া তিনি নির্ব্বাচন মণ্ডলীর নিকট ভোট ভিক্ষায় অগ্রসর হইবেন।

* * *

প্রেসিডেন্সী বিভাগ নির্ব্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সান্যাল তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার বসুর বিরুদ্ধে নানারূপ বিরুদ্ধ প্রচার সুরু করিয়া দিয়াছেন। নির্ব্বাচক-মণ্ডলী নলিনাক্ষবাবুকেও চিনে এবং নরেন্দ্র কুমারও তাঁহাদের নিকট সুপরিচিত। সুতরাং শুধু কংগ্রেসী তিলকের জোরে নিন্দায় বেসাতি করিয়া নলিনাক্ষবাবু যে লাভবান হইতে পারিবেন না ইহা নিশ্চিত। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বিরোধী দলের নেতারূপে শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার যে জাতীয়তানিষ্ঠা ও কংগ্রেসী আদর্শপ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে কংগ্রেসী মনোনয়নের বিজয়ধ্বজাবাহী কংগ্রেসসেবাব্রতী নলিনাক্ষ বাবু অপেক্ষা কোন অংশেই কম কংগ্রেস ভক্ত ও দেশসেবক নহেন। ললাটে কংগ্রেসের তিলক না থাকিলে সে যে কংগ্রেসসেবী বলিয়া গণ্য হইবে না, এ নীতিজ্ঞানশীলতা নলিনাক্ষবাবু কি তাঁহার দোস্তের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছেন? নির্ব্বাচনেও নিক নলিনাক্ষ বাবু যতই তাঁহার নিন্দার চেষ্টা করুন, যোগ্যের সমাদর করিতে তাঁহারা পশ্চাৎপদ হইবেন না।

* * *

রায় বাহাদুর ডাক্তার হরিধন দত্ত মহাশয় এবারও নির্ব্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য ইতিমধ্যেই বাজবিদ্যাধিকারী ছাড়িয়া দিয়াছেন। রায় বাহাদুর ইতিপূর্ব্বে দীর্ঘ দশ বৎসর কাল বাঙলার ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধিত্ব করিয়াছেন। ঐ দশ বৎসরে তিনি মধ্য কলিকাতা সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সেবায় কতখানি রক্ত মোক্ষণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কি কি উপকার সাধন করিয়াছেন তাহা জানাইবেন কি? সরকারের দমন নীতি সম্বন্ধে তিনি অতীতে কোন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, নির্ব্বাচকমণ্ডলী তাহা অবিদিত নহে। ভবিষ্যতেও তিনি বিনা বিচারে আটক বন্দী ও দমননীতিমূলক আইনগুলি সম্পর্কে

... প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা অনেকাংশে নির্ব্বাচনমণ্ডলী কিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছেন। রাজেন্দ্র রায় বাহাদুর তাঁহার পুরা ... বাকী বন্ধুর সহিত বড়াই না ... করুন, ভোটদাতা জনসাধারণ তাহাতে ভুলিবে না।

• • •

উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার বিশেষ মহিলা নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী এবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্যপদ প্রার্থী হইয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলাররূপে তিনি নাগরিকদিগের বিশেষভাবে নারী কল্যাণকর কার্য্যে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সহরবাসী নরনারীগণ নিশ্চয়ই তাহা অবিদিত নহেন। কলিকাতার

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী

বহু মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণ আশ্রমের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নতিবিধানে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। বাংলার হতভাগ্য অধিবাসীদিগের অভাব অভিযোগ প্রতিবিধানে তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট। রাজরোষে বাংলার যে সব যুবক যুবতী আজ কারাগারে ও বন্দী-নিবাসে দুঃখময় জীবন যাপনে বাধ্য হইয়াছে তাহাদের বন্দী জীবনের দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতিবিধানে তিনি সকল সময়েই তাঁহার ক্ষুদ্র শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছেন। দীর্ঘকাল কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি দেশ ও দশের সেবায় ত্যাগ স্বীকার ও নির্য্যাতন বরণে কোন দিন পশ্চাৎপদ হন নাই। কলিকাতার মহিলাবৃন্দ তাঁহাদের এই যোগ্যতম প্রতিনিধিকে সাদরে বরণ করিয়া নিজেদের কল্যাণ সাধন ও গৌরব বর্দ্ধন করিবেন। তাঁহার সম্বল কুটীর। ভোট দিবার সময় এই কুটীরবাসিনী দেশসেবিকা নিশ্চয়ই তাঁহাদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিতা হইবেন না এ বিশ্বাস আমাদের যথেষ্ট আছে।

রায় বাহাদুর রাধিকাভূষণ রায়

নব প্রবর্ত্তিত শাসনতন্ত্রে যে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবে, তাহাতে বগুড়া-পাবনা সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে মাত্র একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন এবং হিন্দু ভোটার সকলেই সেই প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন।

যে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবে, লোকের হিতসাধনের ক্ষমতা যে তাহার থাকিবে না, এমন নহে, কিন্তু অনিষ্ট করিবার প্রভূত ক্ষমতা থাকিবে। এই কারণে, হিন্দু ভোটারদিগের পক্ষে এমন যোগ্য লোককে নির্ব্বাচিত করা প্রয়োজন যিনি কোনরূপ প্রভাবে প্রভাবিত না হইয়া কেবল দেশের—বিশেষ হিন্দুদিগের কল্যাণকল্পে আত্মনিয়োগ করিবেন এবং জাতিবর্ণ ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে উক্ত জিলার দরিদ্র কৃষক, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, মহাজন, তালুকদার জমীদার সকলের স্বার্থে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া নিরপেক্ষভাবে কাজ করিয়া দেশের মঙ্গলসাধন করিবেন।

নির্ব্বাচনপ্রার্থীদিগের মধ্যে নাটোরের মহারাজা বাহাদুর যাঁহাকে যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া স্বয়ং নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আমরা তাঁহাকে—তাড়াশের জমিদার শ্রীযুত রাধিকাভূষণ রায়কে সর্ব্বতোভাবে যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া তাঁহার নির্ব্বাচন সমর্থন করিতেছি এবং ভোটারমাত্রকে তাঁহাকে ভোট দিয়া জয়যুক্ত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

রাধিকাভূষণ বাবু দানশীল, ধর্ম্মনিষ্ঠ, চরিত্রবান ও পাবনার শ্রেষ্ঠ জমিদার। তাড়াশের এই জমীদারপরিবার তাঁহাদিগের অর্থ কখনই ভোগ-বিলাসের উপকরণ বলিয়া বিবেচনা ও ব্যবহার করেন নাই; পরন্তু তাহা দেশের ও দশের কল্যাণেই প্রযুক্ত করিয়া আসিয়াছেন। জিলার শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাড়াশের

জমীদারেরা কখন অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন নাই। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ইঁহাদিগের অর্থে সিরাজগঞ্জ বি, এল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত রাজসাহী বিভাগে প্রথম কারীগরী বিদ্যালয়। বনওয়ারী নগরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ প্রভৃতি তাড়াশের জমিদার-পরিবারের অর্থ-সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নানা বিদ্যা প্রতিষ্ঠানে তাঁহারা নানারূপ সাহায্য প্রদান করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহারাই শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

> রায় বাহাদুর রাধিকাভূষণ রায় নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন বলিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা তিনি প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। অসংখ্য বন্ধু বান্ধব তাঁহাকে তার ও পত্রযোগে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি নির্ব্বাচন চালাইবেন বলিয়া পাবনা বগুড়ার সর্ব্বত্র তার করিয়া দিয়াছেন

পীড়িতের চিকিৎসার জন্যই ইঁহাদিগের দানে রাজসাহী জিলার কুসুম্বিতে, বগুড়া জিলার কল্যাণীতে ও পাবনা জিলার বনওয়ারী নগরে নিত্য শত শত দরিদ্র বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্য পাইতেছে। দরিদ্র কৃষকাদির পক্ষে ইহার প্রয়োজন কে অস্বীকার করিবে?

পাবনা সহরে জনসভা প্রভৃতির জন্য টাউন হল এবং বালক ও যুবকগণকে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ চিত্তবিনোদন ব্যবস্থা দানের জন্য বনমালী ইনষ্টিটিউশন ইঁহাদিগের কীর্ত্তি।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে পাবনায় গেঞ্জীর কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই অনুসরণে আজ দেশে বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সে গুলিতে সহস্র সহস্র লোক জীবিকার্জ্জন করিতেছে। ইহা ভিন্ন শ্রীযুত রাধিকাভূষণ রায় মহাশয় বহু স্বদেশী শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অকাতরে অর্থ দিয়াছেন।

ভারতবর্ষে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাবধি ইহা কখন তাড়াশের জমীদারদিগের অর্থ-সাহায্য ও সহানুভূতিতে বঞ্চিত হয় নাই। পাবনায় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশনের জন্য ইঁহারা প্রচুর অর্থ দিয়াছিলেন। দেশে খদ্দর প্রচারেও ইঁহার সাহায্যের ত্রুটি নাই।

ইনি প্রকৃত জাতীয়তার অনুরাগী এবং সর্ব্বজনপ্রিয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ও ইঁহাকে শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিতেন।

আমাদিগের বিশ্বাস, ইঁহার নির্ব্বাচনে পাবনা-বগুড়াবাসী উপকৃত হইবেন।

বর্দ্ধমান ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের বাহাদুরি

গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে

(গল্প)

শ্রীশুভব্রত সেন
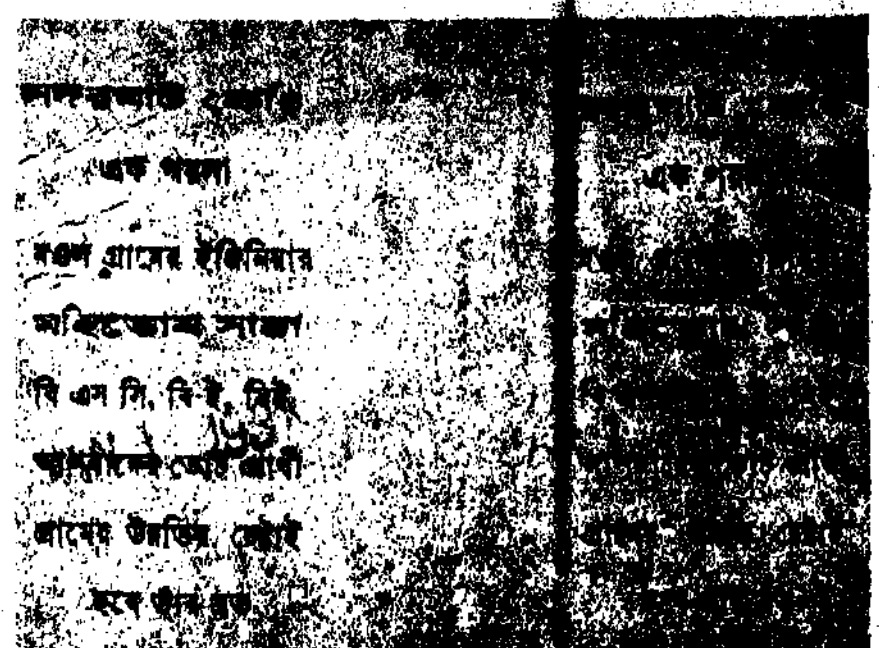
য়ুনিভার্সিটির সিঁড়ি দিয়ে নামবার পথে নিখিলের সৌভাগ্য হয়েছিল চিত্রার খাতা কুড়িয়ে দেবার। সেই থেকে তাদের পরিচয়। ফিফ্‌থ ইয়ারের ছাত্র ছাত্রী তারা, মাঝ দুপুরে নেশার টানে অনেকটা কাছে এসে পড়েছিল।

চাঁদনী রাতে লেকের ধারে বোসে নিখিল বলে—বাড়ী যাবে না চিত্রা, রাত যে অনেক হোল।

আকাশের ঐ স্ফুট জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে চিত্রা বলে—বাড়ী? হ্যাঁ যাব। কিন্তু চেয়ে দেখ দিকি নিখিল, মুক্ত প্রকৃতি কত সুন্দর! স্রষ্টার এ দান তুমি উপভোগ করতে চাও না! ঘরছাড়া হয়ে বেরিয়ে এসে বিশ্বকে যে ভোগ করতে পারে সেই পায় জীবন! বাড়ী? হ্যাঁ সেখানে তো যেতেই হবে। সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বদ্ধ বাতাসই যে বাঙালী নারীর জীবনের সুধ।

চিত্রার অপরূপ কথার ভঙ্গীতে আর তার সেই তীব্র রূপ নিখিলকে মাতাল কোরে তোলে। উন্মত্ত আবেগে সে তুলে নেয় চিত্রাকে বুকের ওপর। বুকের রক্ত তার তালে তালে নেচে চলে ঝড়ের বেগে। চিত্রাকে এত নিবিড় ভাবে পাওয়া তার এই প্রথম। আবেগজড়িত কণ্ঠ থেকে তার বেরিয়ে আসে—চিত্রা, তুমি আমার? চিত্রার মুখে ফুটে ওঠে মৃদু হাসির রেখা। ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত কোরে নিয়ে সে বলে—বাড়ী চল নিখিল।

নিখিলের চোখে বিশ্ব নূতন রূপ ধারণ করে। জ্যোৎস্নাস্নাত প্রকৃতির মতই চিত্রা সুন্দর। এর সৌন্দর্য্য আছে বিদ্যুতের মত তীব্রতায় অসহনীয় দহন। নিখিল ভাবে আর উন্মত্ত হয়ে ওঠে। ক্লাসের পড়া সে ভুলে যায়, তার অসংযত দৃষ্টি বারে বারে খোঁজে শুধু দুটী কালো চোখকে। প্রফেসর দেখে শুধু একটু হাসেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নিখিল বলে—চিত্রা, তোমার জন্যে কি আমি পড়াশুনায় ইস্তফা দেব?

বিস্মিত হয়ে চিত্রা বলে—কেন?

ক্লাসের মাঝে বোসে আমি লেকচার টুকতে পারি না, বইয়ের অক্ষরগুলো পর্য্যন্ত গুলিয়ে যায় সে কার জন্যে চিত্রা? চিত্রা তার আয়ত চোখদুটো তুলে কৃত্রিম অভিমানের সুরে বলে—তার জন্য দায়ী কি আমি?

আবেগের সুরে নিখিল বলে—দায়ী তুমি নও চিত্রা, দায়ী তোমার ঐ সুন্দর মুখ, আর দুটি কালো চোখ।

নিখিলের হাতের ভেতর একটু চাপ দিয়ে চিত্রা বলে রাস্তার মাঝে অত ইমোশানাল হয়ো না, লোকে পাগল বলবে।

চিত্রার হাতটা আরো দৃঢ়ভাবে ধরে নিখিল বলে—বলুক গে। তুমি না বোল্‌লেই হোল।

মৃদু হেসে চিত্রা বলে—গল্প কোরতে কোরতে যে বাড়ী ছাড়িয়ে চলে এলুম নিখিল।

দু জনে তারা আবার বাড়ীর পথে ফেরে।

চিত্রার সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে নিখিল বলে—একটা গান গাওনা চিত্রা।

শ্রান্ত দেহটাকে চেয়ারের ওপর ভার কোরে—এলিয়ে দিয়ে চিত্রা বলে—তোমার কি এতটুকু দয়ামায়া নেই নিখিল? সারাদিন কলেজ করবার পর কি আর গান গাইবার ক্ষমতা থাকে!

অপ্রতিভ হয়ে নিখিল বলে—আমাকে ক্ষমা করো চিত্রা।

তরল হাসিতে ঘরখানা ভরিয়ে দিয়ে চিত্রা বলে—তুমি একেবারে ছেলেমানুষ নিখিল।

চিত্রা গিয়ে বসে অর্গানের সামনে। চিত্রার গলার পরশ পেয়ে যেন গানের সুর মাতাল হয়ে ওঠে, আর তার সাথে বিহ্বল কোরে তোলে গানের শ্রোতাকে। মুগ্ধ নিখিল ভুলে যায় বাইরের জগতের কথা। সমগ্র বিশ্বের মাঝে দুটো তরুণ তরুণী—নিখিল আর চিত্রা। দু জনে কোরে তুলেছে পৃথিবীকে সুন্দর। নিখিলের চমক ভাঙে চিত্রার ডাকে। ভাল লাগে না তার, কল্পনার স্বপ্ন কত সুন্দর, বাস্তবতায় কেন চিত্রা তাকে নামিয়ে নিয়ে আসে!

মৃদু হেসে চিত্রা বলে—কি ভাবছ নিখিল?

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে নিখিল চিত্রার পানে। তার ঐ হাসিটুকু কত মিষ্টি!

বিস্মিত নিখিল বলে—ভাবছি তুমি কত সুন্দর।

চিত্রা হেসে ফেলে। হাস্‌তে হাস্‌তে তার দম আটকে যায়।

নিখিল বলে হাস্‌ছ কেন?

নিখিলের কাঁধে হাত রেখে চিত্রা বলে—হাস্‌ছি তোমার কথা শুনে।

নিখিল চঞ্চল হয়ে ওঠে। চিত্রার কোমল স্পর্শ তার অন্ধ আবেগকে জাগিয়ে তোলে। উন্মত্তের মত তাকে কাছে টেনে নিয়ে নিখিল চায় তার প্রেমের চিহ্ন এঁকে দিতে চিত্রার নরম ঠোঁটের ওপর।

একটু বাষ্পরুদ্ধস্বরে চিত্রা বলে—তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না নিখিল।

নিখিল যেন একটা রূঢ় আঘাত পায়। তাদের আলিঙ্গন শিথিল হয়ে আসে। চিত্রা নিজেকে মুক্ত কোরে নেয়। নির্ব্বাক বিস্ময়ে নিখিল চিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভালবাসা জানাবার ভাষা সে খুঁজে পায় না।

শুধু তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে—চিত্রা তোমাকে আমি কত ভালবাসি তা যদি জান্‌তে। নিখিলের গলার স্বর যেন একটু কেঁপে ওঠে।

অভিমানের সুরে চিত্রা বলে—কখনও না, যে যাকে ভালবাসে সে তার ওপর কখনও অত্যাচার করতে পারেনা।

নিখিল চুপ কোরে থাকে।

খানিক পরে চিত্রা ডাকে—নিখিল। স্বরে তার তীব্র মাদকতা।

নিখিল ভুলে যায় সব কথা। শুধু বলে—কি?

চল কোথাও বেড়িয়ে আসি।

কোথায় যাবে চিত্রা?

প্রাজায় একটা ভাল বই হচ্ছে চল দেখে আসি।

নিখিল দেখে অভিমানের দুরন্ত মেঘ কেটে গেছে। খুসী হয়ে সে উঠে পড়ে।

চিত্রাকে পাশে নিয়ে বোসে ছবি দেখতে নিখিলের লাগছিল বেশ। ছবিখানাও খুব জমে উঠেছে ....একটী অভাগী নারীর ব্যথিত জীবনের কাহিনী ফুটে উঠছে পর্দার বুকে করুণ হয়ে। স্বামী কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা, অনাদৃতা সে নারীর ব্যথাতুর দীর্ঘশ্বাসে আকাশ বাতাসও কেঁদে ওঠে। অন্তরের তীব্রতম ব্যথা ফোটে তার অশ্রু হয়ে। সবটুকু বেদনাকে অন্তরের গোপন তলে লুকিয়ে রেখে সে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয় কার জন্ম উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায়। নিখিলের মনটা ভারী হয়ে ওঠে। তার হৃদয়-বীণায় কোন এক অজানা তন্ত্রীতে বুঝি আঘাত করে এ ব্যথার সুর। নিখিল চঞ্চল হয়ে ওঠে। কয়েকটী মুহূর্ত,—পাশে সে অনুভব করে চিত্রার গরম স্পর্শ। আবার সে ফিরে আসে নিজের বাস্তবিকতায়।

ছবিটা শেষ হলে চিত্রা বলে—মারভেলাস।

নিখিল একটু বিষণ্ণ সুরে বলে—পেনফুল।

চিত্রাকে তাদের দোরে নামিয়ে দিয়ে নিখিল বলে—কালকে এই সময় যেও।

চিত্রা বলে—অল্‌রাইট,. আমা চাই কিন্তু ঠিক পাঁচটায়।

পরের দিন নিখিলের দেরী হয়ে যায় চিত্রার বাড়ী যেতে। সে ভাবতে ভাবতে যায় কি বলে সে ক্ষমা চাইবে চিত্রার কাছে তার এ দেরীর জন্য। কল্পিত কারণ সে খুঁজে পায় না। নিখিল দেখে চিত্রার দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে একটা লাল টুসিটার কার। সে একটু বিস্মিত হয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে নিখিল শোনে চিত্রার গলা--তোমার জন্যে আমি সব কোরতে পারি রাকেশ। আর তুমি কি আমাকে একটুও ভালবাস না?'

ঘুরে পড়ে যেতে যেতে নিখিল সামলে নেয়। কম্পিতপদে সে উঠে এসে দাঁড়ায় চিত্রার ঘরের সুমুখে। সারা জগতের আলো দপ্ কোরে নিভে যায় তার সামনে।······রাকেশের গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ চিত্রা।···অমানিশার ঘন অন্ধকার নেমে আসে নিখিলের চোখের ওপর। চেতনা হয় তার চিত্রার সুতীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে—আনপার্ডনেবল,—নন্‌সেন্স, বেরিয়ে যাও এখুনি এখান থেকে। চিত্রার চোখে আগুনের দৃষ্টি।

মাতালের মত টলতে টলতে বেরিয়ে এসে নিখিল চেপে বসে একটা চলন্ত ট্যাক্সিতে।···

নিজের ঘরে এসে সে এলিয়ে দেয় তার দেহটাকে একটা ইজি চেয়ারের ওপর।···মনে পড়ে তার অনেকদিন আগের কথা···কোন এক স্মিত গোধূলিতে সে কোরে নিয়েছিল ছায়াকে তার জীবন-পথের সঙ্গিনী। গ্রামের মেয়ে সে, আধুনিকতার কৃত্রিম ছলনায় ভালবাসতে জানে না, তাই অন্তর সে সমর্পণ কোরেছিল নিখিলের পায়—নীরবে নিঃশব্দে। কালো সে, তাই পেয়ে এসেছে স্বামীর কাছ থেকে উপেক্ষা, অনাদর। ফোটার ফুলে কোরেছিল সে তার স্বামীর অভিষেক। নিখিলের পায়ে মাথা রেখে সে বোলেছিল —অযোগ্য আমি, তোমায় সুখী কোরতে পারলুম না। ঘৃণায় নিখিল তার পা স'রিয়ে নিয়েছিল। দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু আজ ঝরে পড়ে নিখিলের চোখ থেকে। সে আজ ভাবে---এর জন্যে দায়ী কে? সে—না, তার মা বাবা, যাঁরা তাকে ছায়ার সাথে বেঁধে দিয়েছেন? অসহ্য যন্ত্রনায় নিখিল আর্তনাদ কোরে ওঠে।··· স্বামীর কর্তব্য সে পালন করেনি। ছায়া পেয়ে এসেছে অসহনীয় অত্যাচার তার সেই সরল ভালবাসার বদলে। গ্রামের জমিদার সে, প্রজার রক্তশোষণ কোরে যুগিয়েছে চিত্রার বিলাসের উপকরণ।··· জীবনব্যাপী অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণাই হচ্ছে তার এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত।···চিত্রার রূপে তীব্র মাদকতা আছে, এ রূপ মুগ্ধ করে নিখিলকে, তার অন্তরে জ্বালিয়ে দেয় কামনার আগুন, কিন্তু তাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। ছায়া, কালো সে, তবুও তার রূপে আছে স্নিগ্ধতা, কামনার উপশমের এক অপরূপ শক্তি। তারই অযত্নে উপেক্ষায় সে ফুল শুকিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন।

অসংখ্য এই রকম এলোমেলো চিন্তা নিখিলকে আজ পাগলের মত কোরে তোলে। ছায়ার প্রত্যেক ছোট খাট স্মৃতি ওর কল্পলেখাখানাকে আজ খুঁচিয়ে রক্তাক্ত কোরে দেয়। উন্মত্তের মত নিখিল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বুড়ো চাকর এসে বলে—বাবু একটা চিঠি।

চিঠিটা তার হাত থেকে নিয়ে নিখিল পড়ে। চিঠির ভাষা তাকে অবশ কোরে তোলে।···মৃত্যুপথযাত্রী ছায়া···পাগলের মত নিখিল ছুটে চলে গ্রামের বুকে—যার কোলে সে বেড়ে উঠেছে এই দীর্ঘ ক' বৎসরে, যার উন্মুক্ত উদার আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, মানুষ গড়ে তোলে, তার প্রতি তরুলতা হাতছানি দিয়ে ডাকে আজ নিখিলকে।

ছায়ার বুকে আছড়ে পড়ে নিখিল বলে—জীবনের যে সুর হারিয়ে ফেলেছিলুম, তাকে আজ খুঁজে পেয়েছি ছায়া।

চির অনাদৃতার মুখে ফুটে ওঠে তৃপ্তির হাসি। অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে ছায়া বলে—বেসুরো সুরে বীণা আজ আর বাজবে না, বড় দেরী হয়ে গেছে।

দমকা হাওয়ার এক ঝাপটা এসে ঘরের আধ আলো-করা দীপটাকে নিভিয়ে দিয়ে যায়।

যোগাযোগ

(গল্পাংশ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘোষালরা সুন্দরবনের দিক থেকে এসে হুগলী নূরনগরে জমিদারী পত্তন করলে। নূতন ঘর বাঁধবার তেজ ও শক্তি নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতেই প্রতিবেশী জমিদার চাটুজ্জেদের সঙ্গে লাগলো পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব শেষে খুন জখম ও মামলার ভিতর দিয়ে এসে নিষ্পত্তি হ'লো ঘোষালদের পরাজয়ে। কিন্তু বহুকালব্যাপী কলহে কাবু হয়ে পড়লেন দুই পক্ষই।

চাটুজ্জেরা তাদের শেষ কোপটা দিলে সামাজিকভাবে – ঘোষালদের বংশের অপকীর্তনে,—তারা নাকি অজন্ম ব্রাহ্মণ, কৌশলে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। একে সর্ব্বরিক্ত তাতে এই আঘাত,—ঘোষালরা আবার হ'লো দেশত্যাগী।

এই অপমান ও পরাভব ঘোষালরা—ভুলতে পারলে না তিন পুরুষেও। এদের তৃতীয় পুরুষে একজন কৃতী হয়ে' উঠলো—সে মধুসূদন ঘোষাল। সামান্য ব্যবসায় সূত্রপাত থেকে ক্রমে ফেঁপে উঠতে লাগলো— যেন যাদুর নড়ি হাতে নিয়ে যা ছোঁয় তাই সোনা হ'য়ে যায়। ক্রমে খ্যাতি প্রতিপত্তি ঐশ্বর্য্য লাট বেলাট দরবার এবং সর্ব্বশেষে রাজা মহারাজা উপাধিতে এসে দাঁড়ালো।

মধুসূদন এতদিন কেবল সুবর্ণের সেবাই করছিলেন—সংসার ধর্ম্মে মন দেন নাই—মার উপরোধেও বিবাহে রাজী হন নাই। মধ্যবয়সে তার সাফল্যের শীর্ষস্থানে এসে তার রক্তের ভিতরকার প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসা প্রকট হয়ে উঠলো। চাটুজ্জেদের জব্দ করা চাই-ই। মধু স্থির করলে যে চাটুজ্জেরা কয় পুরুষ আগে তাদের বংশের অপকীর্ত্তি রটিয়েছিল। তাদের কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করলে তাদের মর্ম্মভেদ হ'য়ে যাবে এবং এই সূত্রে ঘোষালদের বহুকাল সঞ্চিত অপমানের প্রতিশোধ নেবার বড় সুযোগ পাওয়া যাবে। মধুর ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন তাই নানাভাবে এই চাটুজ্জেদের জব্দ করবার সুযোগও ঘটলো।

চাটুজ্জেদের অর্থসম্পত্তি কমে এসেছে — ভাগ, বখরা হয়ে গিয়েছে—জমিদারী ও ঋণ এখন সমান সমান। এমনি অবস্থায় চাটুজ্জেদের এক শরিকের সঙ্গে মধুর বাঁধলো প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব। এই চাটুজ্জে পরিবারে ছিল তারা দুই ভাই বিপ্রদাস ও সুবোধ, আর পাঁচ বোন—চার বোনের বিয়ে হয়েছে; সর্ব্বকনিষ্ঠা কুমুদিনী—অষ্টাদশী হ'লেও এখনও কুমারী। সুবোধ ছিল বিলাতে, ব্যারিষ্টারীর চেষ্টায়—বিপ্রদাসের উপর সমস্ত সংসার, জমিদারী ও কুমুদিনীর ভার। কুমুদিনীকে তিনি নিজের আদর্শে এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিতা করছিলেন। মধুসূদনের কোপ পড়লো এই বিপ্রদাসের উপর এবং কুমুদিনীকে বিবাহ করবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

বিপ্রদাসের সমস্ত জমিদারী দু-চারজন মাড়োয়ারীর কাছে ঋণে আবদ্ধ। মধুসূদন কৌশলে ঐ—জমিদারী ছাড়িয়ে নিয়ে বিপ্রদাসকে এগার লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে তার সমস্ত জমিদারী নিজের কাছে আবদ্ধ রাখলে। এই প্রথম চালে মধু হ'লো বিপ্রদাসের মহাজন। তার দ্বিতীয় চাল হ'লো ঘটক পাঠিয়ে কুমুদিনীর সঙ্গে তার বিবাহ প্রস্তাব।

এই বিবাহ প্রস্তাব বিপ্রদাসের ভাল লাগলো না। ঘটককে দুইবার ফিরিয়ে দিয়ে তৃতীয়বার কুমুর মত চাইলো। কুমুদিনী এই বিবাহ প্রস্তাবকে দৈবের দান ব'লে গ্রহণ করলে—এবং এই বিবাহই সে করবে স্থির করলে। বিপ্রদাস দুই একবার বোঝাবার চেষ্টা ক'রে তারপর তাঁর ইচ্ছায় সায় দিলে।

বিবাহের ফলে মধু তাহার ঐশ্বর্য্যের এত বড় আড়ম্বর করলে এবং পদে পদে চাটুজ্জেদের এমন সব অপমান করলে যে তাতে চাটুজ্জেরা ও তাদের প্রজা ও প্রতিবেশীরা সবারই মন বিষিয়ে উঠলো। কিন্তু ভগ্নীর মুখের দিকে চেয়ে বিপ্রদাস সব সহ্য করলে। বিবাহ হ'য়ে গেল। একটা রূঢ় ক্ষিপ্রতা ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যমত্ত মধু কুমুকে নিয়ে এলো কোলকাতায়।

বিপ্রদাসের সাধনা ও কৃষ্টি মধুসূদনের আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। কুমু ছিল বিপ্রদাসের আদর্শে অনুপ্রাণিত। অতএব কুমু আর মধুর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান সৃষ্টি হলো—তারা কেউ তা অতিক্রম করতে পারলে না। অথচ মধুসূদন কুমুদিনীকে ভালবেসেছে; তার জীবনের এটা এমন অসম্ভব আশ্চর্য্য ঘটনা যে সে ঠিকমত ক'রে তাকে মানিয়ে নিতে পারছে না। তার সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে তার ব্যবসাদারের সংস্কার; ওদিকে কুমু চায় তার প্রাণের স্পর্শ। সুরের ভাষা ও ভাবনা সম্পূর্ণ পৃথক। কুমু কিছুতেই মিলতে পারলে না মধুর সঙ্গে। মধুও দেখলে একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে।

চাটুজ্যেদের ঘরের মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল বটে—কিন্তু সে যে এমন মেয়ে পাবে, বিধাতা আগে থাকতেই যার কাছে তার হার মানিয়ে রেখে দিয়েছেন, এ সে মনেও করে নি। অথচ বাইরের দাপটের অনুপাতে মধুর ভিতরে ছিল তেমনি দুর্ব্বলতা—একটা জোর মনে নেই—যে তার ভাগ্যে একজন সাধারণ মেয়ে হ'লেই ভাল হ'তো যার উপর তার শাসন খাটত।

ধৈর্য্যের যে আশ্চর্য্য গভীরতা কুমু অর্জ্জন করেছিল তার প্রভাবে তাঁর জয় হ'তো প্রতিপদে—কিন্তু কোথাও তাঁর এতটুকু ঝাঁজ ছিল না। পরাজিত মধু আহত হ'তো প্রতিপদে এবং রুদ্ধবীর্য্য সর্পের মত শুধু ফোঁস্ ফোঁস্ করতো না—যাকে সামনে পেত তাকেই দংশন করতে চাইতো। মধুর সবার চাইতে বেশী রাগ ছিল বিপ্রদাসের উপর।

বিপ্রদাস অসুস্থ হ'য়ে কোলকাতায় এলো। কুমু মধুসূদনের সোনার পিঞ্জর সহ্য করতে না পেরে চলে এলো তার দাদার বাসায়। মধু ও কুমুর ব্যবধান ক্রমে অনতিক্রম্য হয়ে উঠলো এবং তাদের মিলনের শেষ আশাটুকু পর্য্যন্ত লুপ্ত হ'তে বসলো।

এমন সময় ঘোষাল বংশের ইষ্ট-দেবতা কুমুর পালাবার পথ আগলে দাঁড়ালেন। কুমু অভিমানে শ্বশুর বাড়ীকে অবজ্ঞা করতে চান কিন্তু তার নাড়ীতে গ্রন্থি লাগলো—প্রকাশ পেল—কুমুদিনী অন্তঃস্বত্বা।

কুমুদিনী বিদায় পত্রে তার গুরু ও দাদা বিপ্রদাসের উপদেশ প্রার্থনা করলে। বিপ্রদাস কুমুর সন্তানকে তার নিজের ঘর ছাড়া করবে কোন স্পর্দ্ধায়। মধুসূদন ও কুমুদিনীর ভাবী বংশধর—সেতু হয়ে তাদের এই দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান মিটিয়ে দিলে।

—·—

ব্যথা

শ্রীদীপ্তিরাণী মজুমদার

উদাসী আমার মনের কোণেতে
জাগালে কুঁড়িটি কে তুমি হাসি
কে তুমি তাহারে ফুটালে আবার
বাজায়ে করুণ সুরের বাঁশী।
প্রভাতী বায়ের নব আলোড়নে,
সে যে আজি কাঁদে আপনার মনে,
প্রাণের মধু সে একা নাহি চায়
কারে যেন চায় আপন ক'রে,
কে তুমি আজিকে বিকশি তাহারে
ভাসাইছ এই আঁখির লোরে।
কেন গো নিঠুর ফুটালে মুকুল
তোমার বাঁশীর করুণ সুরে
কেনবা জাগায়ে কাঁদালে তাহারে
এখন কেনবা রহিছ দূরে!
তোমার হিয়ার এরি তরে আমি
এতোটুকু ব্যথা ওঠে নাকি বাজি
কুসুম কি শুধু সহি তার দুখ
একেলা কাঁদিবে দিবস রাজি?
সে যে এত ব্যথা বহিবারে নারে
সে শুধুই চায় তোমারে সাথী।

—

সাধারণ ঘরে রাজার বিবাহ

কথিত আছে, বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরীর রাজপরিবারে এরূপ কোন কন্যা সম্প্রদান করা চলিত না—যাহার পিতৃকুলে ও মাতৃকুলে ঊর্দ্ধতন ষোল পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেই খাঁটী কুলীন না হইত ; অর্থাৎ যে আভিজাত্য গৌরবমণ্ডিত পরিবারের ঊর্দ্ধতন ষোল পুরুষের মধ্যে কেহ কোন সাধারণ গৃহস্থের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছে, সেই পরিবারস্থ কোন জনে রাজার ঘরে পড়িবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত না। কিন্তু গ্রেট বৃটেনের রাজপরিবারে বিবাহ সম্বন্ধে এতদূর বাঁধাবাঁধি ছিল না, কারণ সেখানে রাজাই কয়েকবার প্রজার অনুকূলে এই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন।

প্রথমেই আমরা পরাক্রান্ত নর্ম্মান বংশের সংস্থাপকের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারি। এই বংশের আদিপুরুষ উইলিয়ম আপনাকে 'জারজ' বলিয়া সগৌরবে বিঘোষিত করিয়াছিলেন, কারণ নর্ম্মাণ্ডির ডিউক রবার্টের পুত্র হইলেও তিনি চামার-নন্দিনী আর্লোটার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার উত্তরাধিকারী ও বংশধরগণ প্রধানতঃ ফরাসী বা ফ্লেমিশ ধনাঢ্য পরিবার সমূহ হইতে পত্নী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অবশেষে তৃতীয় এডওয়ার্ডের পুত্র ল্যাঙ্কেষ্টারের ডিউক অর্থাৎ গণ্টের জন ক্যাথেরাইন স্বিনফোর্ডকে তাঁহার তৃতীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সেই সময় পার্লামেণ্টে এই বিধান বিধিবদ্ধ হইল যে, এই বিবাহের ফলে যে সকল সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদের কেহ ইংলণ্ডের সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারিবে না। কিন্তু ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে এই বংশোদ্ভূত হেনরী টিউডর বস্‌ওয়ার্থের সমর-ক্ষেত্রে রাজমুকুট গ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ইয়র্কের এলিজাবেথকে রাজ্ঞীপদে বরণ করেন। এই রাজ্ঞীর পিতৃবংশের অনুসরণ করিলে দেখা যায়, যে ডিউক অব ল্যাঙ্কেষ্টারের বংশে তাঁহার স্বামীর জন্ম, সেই ডিউকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বংশে তাঁহারও জন্ম হইয়াছিল কিন্তু এলিজাবেথ অব ইয়র্কের মাতা এলিজাবেথ উডভিলেকে চতুর্থ এডওয়ার্ড তাঁহার সিংহাসন বিপন্ন করিয়াও রাজ্ঞীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের প্রণয়কাহিনী ইংলণ্ডের ইতিহাসে ঔপন্যাসিক ঘটনার ন্যায় বৈচিত্র্যপূর্ণ। রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ড যে সকল যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন সেই সকল যুদ্ধের একটিতে এলিজাবেথ উডভিলেকে বিধবা হইতে হইয়াছিল। বিধবা হইবার অব্যবহিত পরেই চতুর্থ এডওয়ার্ডের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ। তিনি চতুর্থ এডওয়ার্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া তাঁহার পিতৃহীন সন্তানগণ যাহাতে তাহাদের পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারে বঞ্চিত না হয় এজন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সাক্ষাতেই চতুর্থ এডওয়ার্ড তাঁহার প্রেমে আত্মহারা হইলেন এবং সংগোপনে তাঁহার সহিত পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। স্বামী-হন্তাকে বিবাহ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। এই ঘটনায় মোগল যুবরাজ সেলিমের সহিত নূরজেহানের প্রণয় ও তাঁহার পত্নী সম্রাট [illegible] পরিণয়ের কথা স্মরণ কর। মেহেরুন্নিসা তাঁহার পতিহন্তাকে বিবাহ করিয়া সম্রাজ্ঞী নূরজেহান হইয়াছিলেন।

এলিজাবেথ উডভিলে ইংলণ্ডের রাজ্ঞী হইবার পর তাঁহার পুত্রদ্বয় কর্তৃক বিড়ম্বনার কাহিনী ইতিহাসের পাঠকগণের অজ্ঞাত নহে। কিন্তু তাঁহার কন্যা হেনরী টিউডরকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং এই ভাবে রাজমহিষী হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার খেতাব তাঁহার স্বামীর খেতাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল।

সপ্তম হেনরীর দ্বিতীয় পত্নী এন বলেন লণ্ডনের লর্ড মেয়রের নাতিনী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধা রাণী এলিজাবেথ তাঁহারই দুহিতা। ইংরাজ জাতির তিনিই একমাত্র রাণী—যিনি তাঁহার বংশের নাগরিকতার গৌরব অক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

রাজা দ্বিতীয় জেমস যৎকালে ইয়র্কের ডিউক ছিলেন, সেই সময়, এন হাইডকে বিবাহ করিয়াছিলেন ; এন হাইডই রাজ্ঞী এনের জননী। রাজার সভাসদবর্গ এই বিবাহে প্রচণ্ড আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। এনের পিতা লর্ড ক্লারেণ্ডনের সহিত রাজার সভাসদবর্গের ঘোর বিবাদ চলিতেছিল।

কিন্তু রাজগণের সহিত জনসাধারণের বিবাহ-বন্ধনের যে সকল প্রমাণ বর্ত্তমান, তাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দাম্পত্য-মিলনের দৃষ্টান্ত থিয়োডোরার সহিত পূর্ব্ব রোমান সাম্রাজ্যের বিখ্যাত শাসনকর্তা জষ্টিনিয়ানের বিবাহ। এই বিবাহে নাগরিকবর্গ [illegible] হইয়াছিল।

থিয়োডোরা যে ব্যক্তির কন্যা সে জনসাধারণকে ভালুক [illegible] প্রদর্শন করিত।

নেবু পাতার গন্ধ

(গল্প)

শ্রীযামিনীভূষণ মিত্র

ওর মুঠোর মধ্যে কি রে ব্রত ?

*

ঝড়ের রাত, উন্মত্ত হাওয়া ছুটেছে সমস্ত বিশ্বকে কাঁপিয়ে,—আজ সে নেশায় বিভোর। নেশা—প্রলয়ের নেশা তার, সৃষ্টি চূর্ণ-হ'য়ে গেল। বাইরে ঝড়ের অবিশ্রান্ত সোঁ সোঁ শব্দ—শব্দ তরঙ্গের উন্মাদ উচ্ছ্বাস।

ঘরের কোনে পিলসুজের ওপর প্রদীপটা মিট মিট কোরে জ্বলছিল। খাটের তলায় ঘন অন্ধকার। ব্রততী মার কোল ঘেঁসে শুয়ে ছিল। মা হঠাৎ ব্যাকুল হ'য়ে ডেকে উঠলেন ওরে ব্রততী ওরে—ওরে এক-বার ওঠ মা। প্রথমটা ব্রততী কিছু বুঝতে পারলে না—গম্ভীর কথাটা চেপে তার তন্দ্রার আবেশ—

মা আবার ডেকে উঠলেন—ওরে ব্রতি—ওরে…

ব্রততী চমকে উঠল—

এ্যা কি হ'ল মা তোমার—বুক কন কন করছে ?

হ্যাঁ একটু মালিস কোরে দে মা—

দিচ্ছি, দাঁড়াও অসুধটা আনি—

পিঠের ওপর চাবি শুদ্ধ আঁচলটা ঘুরিয়ে ফেলে ব্রততী প্রদীপের সলতেটা একটু উস্কে দিলে—তাকের ওপর থেকে সে একটা মালিসের শিশি নিয়ে এসে মার বুকে মালিস কোরতে লাগলো। অনন্ত নিরাশায় মার কণ্ঠ ভরে গেল—

আমি বোধ হয় আর বাঁচবনা ব্রতি—তোকে কে দেখবে।

ও রকম অলুক্ষণে কথা বলছ কেন মা—ব্রততী মিনতি কোরে বলে—

চোখদু'টো তার ছলছল কোরে ওঠে। বাইরে ঝোড়ো হাওয়া নাচছে—প্রলয় নাচন—অনেকক্ষণ চুপ কোরে থেকে মা বিকৃত গলায় বল্লেন—

জানলাটা খুলে দে ত ব্রততী—

ব্রততীর মুখের লাবণ্য ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গেল—যেন শীতের শিশির ঢাকা চাঁদ।

ভয়ে ভয়ে ব্রততী বলে উঠল—

বাইরে যে বড় ঝড় মা—কি কোরে খুলি।

আমি বলছি তুই দে—মা জিদ করে বল্লেন। একরাশ মত্ত হাওয়ায় ঘর ভরে গেল এতক্ষণ প্রদীপটা কোন রকমে বেঁচে ছিল। এখন সে অন্ধকারকে বরণ কোরলে। ব্রততী ছুটে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে এলো—অনেক খুঁজে সে একটা দেশলাই আবিষ্কার কোরলে, তার শেষ কাঠিটা দিয়ে সে প্রদীপটাকে কোনও রকমে জ্বেলে ফেল্লে।

ও মা—মা শুনছ ? ব্রততী ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল—বার বার—প্রতিধ্বনিটা দেয়ালে আছড়ে পড়ল—ব্রততী প্রদীপ নিয়ে এসে মার মুখের ওপর ধরল—সে দেখলে মা হাসছে, মৃত্যুর নীল কঠিন হাসি—তাদের ঘরে মৃত্যু উৎসব—ব্রততী ভাবতে পারলে না। নিস্পন্দ ব্রততী লুটিয়ে পড়ল—উন্মত্ত ব্যথায় ভেঙে পড়ল।

কাঁদছে—বিশ্ব কাঁদছে—ব্রততী কাঁদছে।

ওমা—মাগো বলে ব্রততী আর একবার আছড়ে পড়ল—

কিরে কি হ'য়েছে—কি হ'য়েছে—ব্রততীর বাপ পাশের ঘর থেকে ছুটে এলেন।

*

মহুয়া গাছের ফাঁকে সে দিন সন্ধ্যায় পূর্ণিমার আধখানা চাঁদ সবে মাত্র উকি ঝুকি মারছিল। বুনোফুলের গন্ধে একটা অজানা আবেশের আমেজ। ব্রততী

জানালা বয়ে আবছা মাঠের দিকে চেয়ে ছিল। অন্ধকারের বুক চিরে জানলার কাচটিতে একটুকরো চাঁদের রূপালী রেখা সুবে পরিপূর্ণতা লাভ কোরেছে। আলো অন্ধকার ব্রততীর মুখে একটা ম্লান রেখা টেনে দেয়।

ব্রততী চেয়ে থাকে দিঘীর পারে—সুন্দর জোছনায় নতুন ছোঁয়াচ লাগছে আগাছার মাথায়, জ্যোৎস্না—পৃথিবীর বুকে শান্তির আশীষ ছড়িয়ে দেয়—দীঘির কালো জলে থাকে একটা নিথর স্তব্ধতা—

চুপ করে বসে আছ কেন সুবাদি—অঞ্জনা বলে ওঠে—

কে অঞ্জনা? কি সুন্দর চাঁদ দেখ—কান্নার জোয়ারে ব্রততীর বুকটা ফুলে ওঠে, গলাটা কেঁপে যায়—

তুমি কাঁদছ সুবাদি—কেন ভাই কিসের দুঃখ তোমার—

অঞ্জনা বলে বড় ব্যথা পেয়ে।

* *

ব্রততী হেসে বল্লে—আচ্ছা সুব্রতদা—আমি ত এদের বিনা মাইনের ঝি—দিনান্তে দু'টী খেতেও দেবে না—যদি বা দিলে দু'টী খুদ কুঁড়ো—তাও কি কম খোঁটা—মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মানও এক অভিশাপ।

সুব্রত আহত হয়ে বলে উঠলো—কেন কি হয়েছে ব্রততী—

ব্রততী হেসে ফেল্লে—কি হয়েছে? আজ দু'বছর ধরে অত্যাচারের দাগ সারা অঙ্গে ভরে গেছে তা কি তুমি জান না সুব্রতদা—

অব্যক্ত বেদনায় ব্রততীর সমস্ত মুখ যেন [illegible]। মাথাটা তার নুয়ে ওঠে…

ওকি তুমি পড়ে যাচ্ছ যে ব্রততী—সুব্রত তাকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দেয়।

আঃ ভগবান এ আমার মাসী—মা'র আপনার বোন, এরাই দেখলে না আর তুমি সুব্রতদা—অশ্রুভরা গলায় ব্রততী বলে—

বিপদে পর অনেক সময় আপনার হয়, কি হয়েছে আমার বল না? সুব্রত মিনতি কোরে বলে—

আবার ব্রততী হেসে উঠল। আজ যেন সে কিসের আনন্দের সন্ধান পেয়েছে।

ব্রততী বল্লে শুনবে—শুনতে পার্ব্বে? (চুপি চুপি) কি হয়েছে জান? কালকে আমার জন্মদিন ছিল। সকাল থেকে জ্বর হয়েছে মাথা তুলতে পারছি না—কুয়ো থেকে জল তুলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেলুম—মাসীমা রান্না করছিলেন ছুটে এলেন।

ব্রততী হাঁপাতে লাগল—সমস্ত মুখটা ওর রাঙা হয়ে গেছে—

আরও শুনবে—কাঁদবে না—চেঁচিয়ে উঠবে না ত।

শোনো, মাসীমা ছুটে এলেন। পিঠের ওপর গরম খুন্তি দিয়ে—খিল খিল কোরে হেসে উঠল ব্রততী—

দেখবে—দেখো—অসঙ্কোচে সে পিঠের জামাটা খুলে দেখায়।

উঃ! সুব্রত চিৎকার কোরে ওঠে বেদনায়।

চুপ চুপ সুব্রতদা—তুমি বড্ড ছেলে মানুষ—ব্রততী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—

শীতের শিরশিরে হাওয়া দেয়। ব্যথা পাণ্ডুর মুখখানা জানলায় সরিয়ে রেখে ব্রততী বলে—আঃ সুখ কিসের এক বছরের [illegible] যে যাপনা…

কথাটা সে শেষ কোরতে পারে না—কেঁদে ওঠে, বড় অসহ্য কান্নার বেগ—বুকটা তার ফুলে ওঠে শ্রাবণের নদীর মত।

চোখ মুছিয়ে দিচ্ছিল সে কিন্তু—কিন্তু অঞ্জনা এ কান্নার শেষ হবে ত ভাই।

তুমি অমন কোরে কেঁদ না সুবাদি—মা নেই মাসী আছে ত—অঞ্জনা সান্ত্বনার সুরে বলে ওঠে।

দীর্ঘনিঃশ্বাসটা চাপতে গিয়ে জোরেই বেরিয়ে আসে—

মাসীমা অঞ্জনাকে রান্নাঘর থেকে ডাকেন—অঞ্জনা মুখটা ভার কোরে চলে আসে ব্রততী তলিয়ে যায় দিশাহীন চিন্তায়—তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রার অন্তরালে—ঘাট থেকে সকলে যখন চলে যায়। গোধূলির আলোছায়া তখনও আকাশের গায়ে লুকোচুরি খেলে—

ব্রততী ঘাটের সিঁড়িতে বসে একটা কচি ঘাস নিয়ে আনমনে দাঁত দিয়ে কাটে—একটী কিশোর বালক হাসতে হাসতে ছুটে আসে—

দিদি আজ কত এনেছি দেখুন—ছেলেটী হেসে বলে—

কাল আসনি কেন ভাই—ব্রততী হেসে বলে—

ছেলেটী কোনও উত্তর না দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়—

ব্রততী হাসে বড় ব্যথায়। হাসে সকলেই—কোনটা শীতের জোছনা—কোনটা বসন্তের আলো—

নরম হাতে লেবু পাতাগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে সে টেপে—কি মিষ্টি গন্ধ—সমস্ত প্রাণ ওর বিহ্বল হয়ে যায় আনন্দ-ব্যথা-বেদনায়। চোখের কোনে জল চকচক কোরে ওঠে—স্মৃতি ভেসে আসে মূর্তিমতী

গোধূলি সে—কাঁখে জলভরা কলসী নিয়ে সে ফিরে আসে চঞ্চল পায়ে।

কিশোর তখন ওর দেহ থেকে কেঁদে বিদায় নিচ্ছে। ওর দেহের কূলে কূলে উচ্ছল যৌবন সিন্ধু এসেছে আজ। স্বপ্নের বাণী নিয়ে—ফুলের স্বপ্ন নিয়ে।

অঞ্জনা বলে—সত্যি সুবাদি তোমার মত যদি আমার রূপ থাকত।

ব্রততী একটু ম্লান হাসে—

সমস্ত দিন ধরে মাসীর সংসারে কি হাড়ভাঙ্গা খাটুনীই না সে খাটে—সন্ধ্যায় তার অবসন্ন দেহ মন জানালার ফাঁকে বিরাট নীল আকাশে কিসের বেদনায়—হতাশায় কেঁদে মরে—

* *

মাঝের ঘরে মাসীমা ব্রততীর মেশোমশাইয়ের সঙ্গে কথা কইছিলেন।

একটু বিরক্ত হয়ে আঁচল দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে তিনি বল্লেন—কোত্থেকে এক আপদ এসে জুটলো—এখন দু'বেলা খাওয়াও।

বিছানায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ব্রততীর মেশোমশাই শুয়ে পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে মৃদু টানে তামাক খাচ্ছিলেন—স্ত্রীর কথায় তিনি ব্যথিত হয়ে বল্লেন—তা আর কি কর্বে বল—একদিন ওদের সব ছিল—আজ না হয়—

মাসীমা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—তুমি থাম—থাম, আমার একেবারে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার দেখেছ—অতবড় ধিঙ্গি মেয়ে ওকে নিয়ে আমি করিই বা কি, আর বিয়েই বা দেব কি করে—

ধরো না কেন ও তোমার অঞ্জনার মত। আমি যদি অঞ্জুর বিয়ে দিতে পারি ওরও আট্‌কাবে না—

বেশ তাই কোরো—আমি কিন্তু… রাগ কোরে কিংবা বিরক্ত হয়ে তিনি চলে গেলেন…

পাশের ঘরে বসে ব্রততী শিউরে উঠলো—মাসীমা বল্‌ছেন? মাসীমা! তার মার বোন। সে বিশ্বাস কোরতে পারলে না নিজের কাণকে—

রান্নাঘরে মাসীমা ডাকলেন—অঞ্জনা, সোহাগীকে ডেকে আন পিণ্ডি গিলে যাক—

এবার ব্রততী নিজের কাণকে বিশ্বাস কোরেছে—সে হাসলে। সে হাসির নীচে বিশ্বের অন্তহীন কান্নার স্রোত—হৃদয়ের তটরেখায় দুঃখের স্রোত আছড়ে পড়েছে…

অঞ্জনা কাঁপতে কাঁপতে এলো—সুবাদি যদি মার কথাগুলো শুনে থাকে। অঞ্জনার চোখে একটা অসহায় মিনতির কান্নায় উছলে ওঠে—এক একবার সে প্রতিবাদ কোরে ওঠে বড় জ্বালায়—বড় বেদনায়—কিন্তু…

সুবাদি খাবে চল—ভারি গলায় অঞ্জনা বলে—

আজ ব্রততী কাঁদতে পারলে না, সে জানলে সে গলগ্রহ, এর চেয়ে বেশী অনুকম্পা সে পেতে পারে না—

চল পিণ্ডি গিলে আসি—

অঞ্জনা চমকে উঠল—কিন্তু সেদিন সে কিছুই খেতে পারেনি—কেন তা কে জানে।

পিঠে দগদগে ঘা—যন্ত্রণায় ছটফট কোরছে ব্রততী—ম্লানমুখে বেদনাপাণ্ডুর রেখা—

ব্রততী আবার হাসলে বল্লে—পুরুষ মানুষ হয়ে কাঁদছ সুব্রতদা? প্রতিকার কোরতে পারছ না—অত্যাচারের, লাঞ্ছিত নারীকে উদ্ধার কোরতে পারছ না—উত্তেজিত ব্রত—

সত্যি—সত্যি…

আঃ! মূর্চ্ছিতা ব্রততী—

* *

সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপি চুপি ব্রততী ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ঐ যে দীঘির

পাকে আপাছার শুদ্ধ অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে। কি সুন্দর চমৎকার অন্ধকার। ব্রততী চারিদিক অন্ধকারকে প্রাণভরে আলিঙ্গন করছে। আকাশভরা তারা আজ তাকে হাত চানি দিয়ে ডাকছে। কি সুন্দর ঐ তারাগুলোর সঙ্গে খেলা কোরতে।

অন্ধকারে কোথায় যাচ্ছ ব্রততী—

ব্রততী এগিয়েই চলেছে—কই বল্লে না ত কোথায় যাচ্ছ।

ব্রততী ফিরে দাঁড়াল, জানো সুব্রতদা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে।

তা জানি, সুব্রত বল্লে, কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ?

আমি এখানে একটু বসব ঝিলের ধারে, আমায় একটু একলা থাকতে দাও।

তা হয় না ব্রততী।

ছেলেমানুষী কোরো না ফিরে যাও, ব্রততী কঠিন কণ্ঠে বল্লে।

ঝিলের শব্দ? দীঘির ছোট ছোট ঢেউগুলো বড় হতে হতে দুলে ভেঙে পড়ল।

ওর মুঠোর মধ্যে কিরে সুব্রত?

নেবু পাতা জ্যেঠামশাই—নেবুপাতার গন্ধ ও বড্ড ভালবাসত কিনা—

ছায়া ও কায়া

শ্রীমধু বসু

সালতামামি

গত বছর সর্বশুদ্ধ উনিশখানা বড় বাংলা চিত্র কলিকাতায় প্রদর্শিত হয়েছে। নিম্নে তাহাদের নাম দিলাম, যথা,—

১। তরুবালা (প্যারামাউন্ট)
২। কৃষ্ণ সুদামা (রাধা ফিল্ম)
৩। পথের শেষে (ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম)
৪। কাল পরিণয় (কালী ফিল্ম)
৫। বাগদান (কোয়ালিটী পিকচার্স)
৬। মহানিশা (মহানিশা ফিল্ম)
৭। আবর্ত্তন (পপুলার পিকচার্স)
৮। অন্নপূর্ণার মন্দির (কালী ফিল্ম)
৯। পরপারে (চন্দ্র ফিল্ম)
১০। দীপান্তর (ডি জি টকিজ)
১১। রজনী (দেবদত্ত ফিল্ম)
১২। বাঙ্গালী (ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স)
১৩। গৃহদাহ (নিউ থিয়েটার্স)
১৪। সরলা (ফাষ্ট ন্যাশনাল)
১৫। বিজয়া (নিউ থিয়েটার্স রিলিজ)
১৬। সোনার সংসার (ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম)
১৭। পণ্ডিত মশাই (পপুলার পিকচার্স)
১৮। বিষবৃক্ষ (রাধা ফিল্ম)
১৯। মায়া (নিউ থিয়েটার্স)

এদের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছে এমন সব রঙ্গচিত্রের নাম দিলাম যা ঐ বছরেই প্রথম মুক্তিলাভ করেছে—

১। একটী কথা (ভারতলক্ষীর, ছায়াতে প্রথম মুক্তি শুধু বিদেশী চিত্রের সহিত)
২। ঝিলমিলিয়ার জের (রাধা ফিল্ম)
৩। জোয়ার ভাটা (কোয়ালিটী)
৪। ভোট-ভণ্ডুল (কালী ফিল্ম)
৫। হ্যাপী ক্লাব (পপুলার পিকচার্স)
৬। শ্যামসুন্দর (ডি জি টকিজ)
৭। বেজায় রগড় (ভারতলক্ষ্মী)
৮। মন্দ কি (নিউ থিয়েটার্স)
৯। কীর্ত্তিমান (রাধা)

তরুবালার সঙ্গে প্রদর্শিত একখানা গীতি-চিত্র, মহানিশার সঙ্গে প্রদর্শিত আব্বাসউদ্দিনের ১ খানা গীতি-চিত্র, আবর্ত্তনের সঙ্গে প্রদর্শিত তারা ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিদের গীতি-চিত্র 'কুহু কেকা', রজনীর সঙ্গে প্রদর্শিত মৃণাল ঘোষ ও রাধারাণীর গীতি-চিত্র 'জলসা', সরলার সঙ্গে প্রদর্শিত গীতি-চিত্র 'বন্দেমাতরম্', কাল-পরিণয়ের সঙ্গে প্রদর্শিত শচীন দেব বর্ম্মণের একখানা গীতি-চিত্র এ বছরে মুক্তিলাভ করেছে। কালী ফিল্ম ৩ খানা টপিক্যাল চিত্র তুলেছেন, যথা চায়না বনাম ভারত, চায়না বনাম সিভিল-মিলিটারী ফুটবল ম্যাচ এবং গভর্ণর জেনারেলের বড়দিন উপলক্ষে কলিকাতা আগমনের দৃশ্য।

দুঃখের বিষয় এ বছরে এমন একখানি ছবিও বেরোয় নি যা খুব উচ্চ শ্রেণীর বলে পরিগণিত হতে পারে। প্রায় সমস্ত ছবিই সাধারণ ধরণের হয়েছে। হিন্দিতে বরং হেমচন্দ্র পরিচালিত মিলিওনেয়ার রসিকজনের আনন্দের খোরাক যোগাতে পেরেছে, কিন্তু বাংলায় তোর অভাব। উল্লিখিত চিত্রগুলির মধ্যে আমরা গৃহদাহকে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে পারতাম যদি ওর
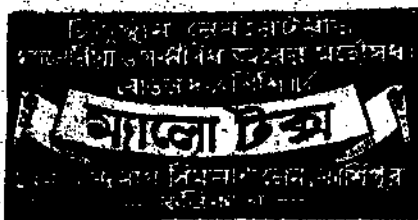
অভিনয়ের দিকটাও টেকনিক্যাল বিভাগের মত উচ্চশ্রেণীর হত। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে 'গৃহদাহ'ই যদি আর বছর ৫।৬ পরে আসতো তবে তা সকলের কাছেই আদরণীয় হতে পারত। ওদের মায়ার প্রশংসা করা যায়—কারণ এতেও রসপিপাসু অন্তরের উপযুক্ত কিছু খোরাক পাওয়া যায়। কাল-পরিণয়, মহানিশা, অন্নপূর্ণার মন্দির, পরপারে, বিজয়া ও পণ্ডিত মশাই দেখতে ভালই লেগেছে, উচ্চাঙ্গের কোন কিছু বিশেষ না থাকলেও বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। সোনার সংসার দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে আনন্দদায়ক চিত্র হিসাবে এর স্থান উচ্চ হতে পারে, কিন্তু মাঝখান হতে রঙ্গরসকে এত বেশী মাত্রায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যাতে আসল জিনিষই চাপা পড়ে গেছে। ধর্ম্মমূলক চিত্র কৃষ্ণ সুদামা সমস্ত বাঙালী সমাজে আশাতীত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য প্রসিদ্ধ চিত্র পরিবেশক অরোরা ফিল্ম শিবরাত্রি নামে ও বীনের একটী ধর্ম্মমূলক ছবি তুলেছেন, তাও সর্ব্বত্র বেশ সমাদর লাভ করেছে।

এ বছরের খারাপ ছবি হয়েছে—জোয়ার ভাটা, ব্যথার দান, আবর্ত্তন, রজনী ও দ্বীপান্তর। এদের মধ্যে একমাত্র দ্বীপান্তরের ফটোগ্রাফী ও রেকর্ডিং ভাল আর রজনীও মন্দ নয়, বাকী সবার অবস্থাই সম পর্য্যায়ের। শ্রীভারতলক্ষ্মী সাউণ্ড ষ্টুডিয়োতে এ বছর যে কয়খানা ছবি তোলা হয়েছে সেগুলির সকলেরই এই বিভাগগুলির কাজ নিম্ন শ্রেণীর হয়েছে। একমাত্র 'বুক কেকা'র রেকর্ডিং ও ফটোগ্রাফী প্রশংসনীয় হয়েছে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড হিসাবে এবারও নিউ থিয়েটার্সের স্থান সর্ব্বশীর্ষে—তাদের গৃহদাহ ও মায়াতে সেই পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বিজয়া সম্বন্ধে এই কথাই বলতে পারলাম না—বিজয়ার রেকর্ডিং ও ফটোগ্রাফী ওদের তুলনায় একটু নিম্নশ্রেণীর হয়েছে। কৃষ্ণ-সুদামা, কালপরিণয়, মহানিশা, অন্নপূর্ণার মন্দির, দ্বীপান্তর, সোনার সংসার, পণ্ডিত মশাই, মায়া ও বিষবৃক্ষের রেকর্ডিং সাধারণভাবে বেশ প্রশংসার যোগ্য হয়েছে। বিমল রায়কে (মায়া) এ বছরের শ্রেষ্ঠ ক্যামেরাম্যান বলতে পারি; বিষবৃক্ষের শব্দের যন্ত্রের শিল্পী প্রবোধ দাসকেও আমরা শ্রেষ্ঠ আসন দিতে পারি প্রবোধ পরপারের তুলেও নাম করেছেন। ইরাণী 'কমলা মকভু'র ফটোগ্রাফী এত চমৎকার হয়েছে যাতে তার সঙ্গে বিদেশী ছবিরও তুলনা চলে—প্রবোধের সম্বন্ধে আমাদের উচ্চ ধারণা হয়েছে। শৈলেন বসু (সোনার সংসার, পথের শেষে) কাজও ভাল হয়েছে। বিভূতি দাসের (বুক কেকা) অল্প কাজেরও প্রশংসা করি। এ ছাড়া এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য আর কোন ছবির নাম মনে পড়ছে না।

ছবির গল্প হিসাবে পণ্ডিত মশাই বেশ উল্লেখযোগ্য। অন্নপূর্ণার মন্দিরেরও নাম করা চলে। কালপরিণয় মন্দ নয়। পরপারে, সরলা ও বিষবৃক্ষের গল্পের সার্থকতা ছিল, কিন্তু কর্ত্তারা যোগ্যভাবে এদের চিত্রনাট্য রচনা করতে পারেন নি।

প্রমথেশ বড়ুয়া গৃহদাহ ও মায়া উভয় চিত্রেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সতু সেন পণ্ডিত মশাইকে বেশ সরলভাবে চিত্রে রূপ দিয়েছেন। ছোট বুক কেকার পরিচালনায় চারু রায়ের প্রশংসা করা যায়। প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী (কালপরিণয়) ও তিনকড়ি চক্রবর্তীর (অন্নপূর্ণার মন্দির) কাজেও আনন্দ পেয়েছি। সুশীল মজুমদারের ওপর (সরলা) আশা রেখেছি ধর্ম্মমূলক চিত্রে (কৃষ্ণ সুদামা) পরিচালনায় ফণি বর্ম্মার কাজ মন্দ হয় নি। এ ছাড়া আর কোন ছবির পরিচালনার প্রশংসা করা চলে না।

অভিনেতাদের মধ্যে সব চেয়ে প্রশংসার পাত্র কৃষ্ণ-সুদামার সুদামা, পরপারের দাদামশায় ও সোনার সংসারের শঙ্করনাথের ভূমিকাভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী। চমৎকার অভিনয় করে তিনি

এবার চিত্রপ্রিয়দের অন্তর জয় করেছেন। বিজয়ার রাসবিহারীর চরিত্রাভিনেতা অমর মল্লিকের কৃতিত্বের উল্লেখ এর পরেই করা চলে। গৃহদাহে কেদারবাবুরূপেও তিনি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বাঙ্গালীতে দীনদাসের ভূমিকাভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের প্রশংসা করছি। অন্নপূর্ণার মন্দিরের প্রধান ভূমিকাভিনেতা বৃদ্ধ ফণি রায়ের অভিনয় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য—চরিত্রটীকে তিনি অতি স্বাভাবিকভাবে মূর্ত্ত করে তুলেছিলেন। তরুবালায় বেহারীর ভূমিকায় শৈলেন চৌধুরীর কৃতিত্ব সর্ববাদী সম্মত। কালপরিণয়েও তার অভিনয় প্রশংসার যোগ্য হয়েছে। রজনীতে রাধ রায়ের সহজ সুন্দর অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করেছে। পণ্ডিত মশাইতে কুঞ্জরূপেও তিনি যশ অর্জ্জন করেছেন। সোনার সংসারে তুলসী লাহিড়ী অতি স্বাভাবিক অভিনয় করে সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। নায়ক চরিত্রাভিনেতাদের মধ্যে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পরপারেতে [illegible]মরূপে যোগ্যভাবে ফুটতে পারেন [illegible]। গৃহদাহে সুরেশের ভূমিকাভিনেতা বিশ্বনাথ ভাদুড়ী সম্বন্ধেও এই ধরণের কথা বলা চলে—। জীবন গাঙ্গুলী এ বছর আশাতীত জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন—কালপরিণয়, আবর্ত্তন, সোনার সংসার প্রভৃতিতে অভিনয় করে। ধ্যাধার দানে নায়কের ভূমিকাভিনেতা হেম গুপ্তের অভিনয় প্রশংসার যোগ্য হয়েছে। ধীরাজ ভট্টাচার্য্য তেমন কঠিন ভূমিকা পান নি, তবে যে গুলিতে নেমেছেন তা বেশ সহজ সুন্দর হয়েছে,—যথা কৃষ্ণ—কৃষ্ণ সুদামা, নিশীথ—বাঙ্গালী ও রঘুনাথ—সোনার সংসার। অহর গাঙ্গুলীকে ৫খানা চিত্রে দেখা গেছে, যথা —তরুবালা, পথের শেষে, কাল পরিণয়, মহানিশা ও বিষবৃক্ষ। কিন্তু অভিনয় তাঁর উল্লেখযোগ্য না হলেও মন্দ নয়। এখনও মাঝে মাঝে দেখা দিলে তাঁকে ভালই লাগবে বলেই মনে হয়। গৃহদাহে মহিমরূপে প্রমথেশ বড়ুয়াকে আমাদের ভাল লেগেছে। পাহাড়ীকে বিজয়ায় নরেনরূপে দেখলাম, মন্দ [illegible]; আর মায়াতে প্রতাপরূপে তাঁর খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ভূমেন রায়, নেমেছেন মহানিশা—ব্রজ, পথের শেষে—যোগেশ ও বিষবৃক্ষে শ্রীশের ভূমিকায়। ব্রজ ও

'দিদি'র একটি দৃশ্য

যোগেশ প্রশংসার যোগ্য। কৃষ্ণধন মুখোঃর দেখা পাই তরুবালা, আবর্ত্তন, মহানিশা, পরপারে, বেজায় রগড়, সরলা ও সোনার সংসারে—দুঃখের বিষয় এত অধিক চিত্রে নামাতে তাঁর অভিনয় বিশেষত্বহীন হয়ে পড়েছে নচেৎ অভিনয় তাঁর বেশ উপভোগ্যই হয়।

গায়ক তারাকুমার ভট্টাচার্য্যকে কালপরিণয়ে দেখি—তৎপর অন্নপূর্ণার মন্দিরে, তারপর সরলায় নায়ক বিধুভূষণরূপে দেখি। অভিনয়ে উল্লেখযোগ্য নন তবে গানে বেশ চলন সই। অন্নপূর্ণার মন্দিরের নায়ক (বিশ্বেশ্বর) ছবি বিশ্বাসের অভিনয় বিশেষত্বহীন। আবর্ত্তনের নায়ক সুপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর বলিষ্ঠ চেহারা দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাত্র। রজনীর শচীন্দ্রনাথের ভূমিকাভিনেতা অমিয় গোস্বামীর কথাও না বললেই চলে। জোয়ার ভাটার নায়ক বিনয় মুখোঃর নাম তবু উল্লেখ করা চলে। কুহু কেকাতে গায়করূপে তারাকুমার ভট্টাচার্য্যকে আমাদের বেশ ভাল লেগেছে। [illegible] বিলাস (শ্যাম লাহা ওরফে তম্য) বিশেষত্বহীন।

তন্ত্র তরুণী কুমারী শীলা হালদার আবর্ত্তনে নায়িকার ভূমিকায় নেমেছেন, কোন দিক দিয়ে উনি উল্লেখযোগ্য নন। মীরা দত্ত আশাপ্রদ—বাঙ্গালীতে পদ্ম ও বিষবৃক্ষে কমলমণি দেখে এই ধারণা হয়েছে। মহানিশার অপর্ণা রেণুকা রায় রজনীতে লবঙ্গলতার ভূমিকায় সুঅভিনয় করেছেন।

সরলার ভূমিকানেত্রী সরলা (অরুণা) চেহারা ও অভিনয় কোন দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য নন। এ বছরে উমা দাসের দেখা পাওয়া যায়নি, পদ্মাবতীকে কয়েকখানা চিত্রে ক্ষুদ্রাংশে দেখা গেছে। উমাকে একেবারেই দেখতে পাইনি। কাননবালা নেমেছেন কৃষ্ণসুদামা (রুক্মিণী) ও বিষবৃক্ষে (কুন্দ)। উল্লেখযোগ্য অভিনয় করবার সুযোগ ছিল বিষবৃক্ষে। শান্তিগুপ্তা বিষবৃক্ষে (সূর্য্যমুখী) ও পণ্ডিত মশাইতে (কুসুম) বেশ উৎরে গেছেন যদিও [illegible] শুকভাব হয়ে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নাকে অরুণবালা, পরপারে ও পথের শেষেতে দেখেছি, উন্নতি হয়েছে বলেই মনে হল। গৃহদাহে অচলার ক্ষুদ্রাংশে মলিনা অতি সুন্দর অভিনয় করেছেন। বিজয়ারূপে চন্দ্রাবতী মন্দ নন মহানিশায় শীরার ভূমিকায় চন্দ্রাবতীর অভিনয় ভাল হয়েছে সোণার সংসারে তারা মন্দ অভিনয় করেন নি, পথের শেষের রাধার তুলনায় ঢের উন্নত। মেনকা নতুন দেখা দিলেন এই সোণার সংসারে—মন্দ নন! ব্যথার দানে শিশুবালার অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয়েছে। পরপারেতে চিন্ময়ীর ভূমিকায় নিভাননীর অভিব্যক্তিও উল্লেখযোগ্য। কালপরিণয়ে রাণীবালার অভিনয় প্রশংসনীয়, মায়া মুখার্জ্জীর কিশোরীর (কালপরিণয়) তুলনায় সতী (অন্নপূর্ণার মন্দির) প্রশংসনীয়। এতে সাবিত্রীর ছোট ভূমিকায় কিশোরী সাবিত্রীকে ভালই লাগল। মনোরমার অভিনয় বিশেষত্বহীন, অন্নপূর্ণার মন্দির, সরলা প্রভৃতি দেখে তাই মনে হয়েছে। বীণাপাণিও অচল, তরুবালা, কৃষ্ণসুদামা ও পরপারেতে তাই প্রমাণিত হয়েছে। দীপান্তরের উষাবতী, ব্যথার দানের ইলা দাস, পণ্ডিত মশাইয়ের রেণুকা ঘোষ মন্দ নন।

অহি সান্যাল ও যোগেন চট্টোঃর (মায়া) প্রশংসা করা যায়। এছাড়া আরো হয়তঃ অনেকে আছেন যাদের নাম উল্লেখ করতে পারলাম না, কারণ মনে পড়ছে না!

সুরশিল্পীরূপে রাইচাঁদ বড়াল (গৃহদাহ ও মায়া) পূর্ব্ব সুনাম বর্দ্ধিত করেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র দে সোণার সংসারে বেশ সুন্দর সুর দিয়েছেন। নিতাই মতিলালেরও প্রশংসা করি কৃত কেকায়; তিমির বরণ ভট্টাচার্য্যও মন্দ সুর দেননি বিজয়াতে।

সায়গল (গৃহদাহ), কৃষ্ণচন্দ্র দে (বিজয়া ও মায়া), পাহাড়ী (মায়া), বিনয় গোস্বামী (সোণার সংসার), কমলা (অন্নপূর্ণার মন্দির, বাঙ্গালী), হরিমতী (গৃহদাহ), রাধারাণী (অলকা, রজনী, কৃষ্ণসুদামা), কানন (কৃষ্ণ সুদামা, বিষবৃক্ষ), মৃণাল ঘোষ (অলকা, কৃষ্ণ সুদামা), তারা ভট্টাঃ (কৃত কেকা, সরলা) প্রভৃতি শ্রুতিমধুর গান গেয়েছেন। নাচে অঞ্জলী মায়াতে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

নব নাট্যমন্দির

আমরা যোগাযোগ দেখে এসেছি, এবার স্থানাভাব সুতরাং আগামী সংখ্যায় আলোচনা প্রকাশিত হবে।

সুকণ্ঠ গায়ক, সুপুরুষ তারাকুমার ভট্টাচার্য্য এখানে যোগদান করে যোগাযোগে কয়েকখানা গান গেয়ে সকলকে তৃপ্তি দিচ্ছেন। শ্রীমতী পুতুল এখানে আসছেন বলে শোনা গেল। কিছুদিনের মধ্যেই এখানে নিতাই ভট্টাচার্য্য বি, এল প্রণীত একটী সামাজিক নাটক অভিনীত হবে। স্থানান্তরে যোগাযোগের সংক্ষিপ্ত গল্পাংশ প্রকাশিত হ'ল।

রূপবাণী

সুসংযত অভিনয় এবং গান রাখা 'কপাল কুণ্ডলা বিষবৃক্ষ'কে ধীরে ধীরে বেশ জনপ্রিয় করে তুলেছে। কাননবালা এবং শান্তি গুপ্তার অভিনয়নৈপুণ্য সত্যই উপভোগ্য। শনিবার ৯ই জানুয়ারী থেকে ছবিখানি রূপবাণীতে পঞ্চম সপ্তাহে পদার্পণ করবে। দর্শকদের যে ছবিখানি ভাল লেগেছে তা তাঁদের ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা থেকেই বোঝা যায়।

সচিত্র সাপ্তাহিক
দ্বিতীয় বর্ষ—১৬শ সংখ্যা
শুক্রবার—১লা মাঘ
১৩৪৩
১৫ই জানুয়ারী—১৯৩৭

কর্ত্তব্য বোধ
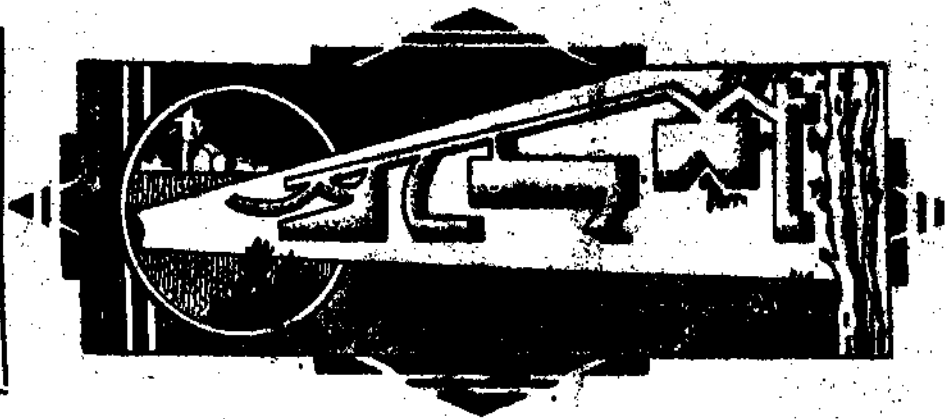
নির্ব্বাচন সমাগত। নিজের ঢাক নিজে পিটাইয়া কার্য্যোদ্ধারের আশায় সকলেই আজ উদ্‌গ্রীব। ছলে বলে বা কৌশলে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিবার উৎকট আগ্রহে দুর্নীতির লীলা-খেলায় তাঁহারাই আজ প্রমত্ত হইয়াছেন, সদুপায়ে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন লাভের আশা যাঁহাদের নাই। নির্ব্বাচন কেবল জন-সেবায় ও দেশ-সেবায় প্রার্থীদিগেরই জনপ্রিয়তা ও দেশপ্রেমের পরিচায়ক নহে। দেশের সেবা ও দশের স্বার্থের প্রতি নির্ব্বাচকমণ্ডলীর অনুরাগেরও কঠোর অগ্নি পরীক্ষা।

চারিদিক হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নায়কগণ নির্ব্বাচনে দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিত্য নানা সদুপদেশ বর্ষণ করিতেছেন। এই উপদেশারণ্যের মধ্যে পড়িয়া নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হওয়া নির্ব্বাচকমণ্ডলীর পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। তাই ভারতের ঋষিপ্রতিম রাষ্ট্রগুরু পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নির্ব্বাচনে দেশবাসীর কর্ত্তব্য অতি সুস্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাবী শাসনতন্ত্রের আমোলে যাঁহারা মন্ত্রীত্বকামী, আমলাতন্ত্রের অনুগত ও দাস মনোবৃত্তি লোক যাঁহারা, দেশ ও দশের বৃহত্তর স্বার্থকে যাঁহারা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থের যূপকাষ্ঠে অকাতরে বলি দিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভোট দেওয়া আর দেশদ্রোহীর পক্ষে ভোট দেওয়া একই কথা।

দেশের ও দশের সেবায় যিনি অকুণ্ঠচিত্তে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির খতিয়ান বা ক্ষুদ্র স্বার্থ ও তুচ্ছ সম্মানের মোহ যাঁহাকে কোন দিনও লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই, অন্যায়ের সহিত আপোষের দুর্ব্বল দৌর্ব্বল্য যিনি পরিহার করিয়াছেন, যাঁহার শির দেশের জনমতের নিকট চিরদিন সশ্রদ্ধচিত্তে আনত হইয়াছে, দরিদ্র নারায়ণের সেবাব্রতকে যিনি নিষ্ঠার সহিত বরণ করিয়া লইয়াছেন, তিনি কংগ্রেসী হউন আর অকংগ্রেসীই হউন, তাঁহার কণ্ঠে জয়মাল্য পরাইয়া দেওয়াই নির্ব্বাচকমণ্ডলীর অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা যোগ্যতা ও আদর্শনিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে তাঁহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

দেশের যুব সমাজের নিকটও আজ কঠোর কর্ত্তব্যের আহ্বান আসিয়াছে। দেশের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি নগরে পল্লীতে দেশবাসীর আজিকার কর্ত্তব্যবোধকে আগ্রহের সহিত তাঁহারা উদ্দীপিত করিয়া তুলুন। এই মহান প্রচেষ্টায় তাঁহারা আজ অবহিত হোন যে, দেশের ও দশের স্বার্থ বিরোধী, আত্মপ্রলুব্ধ ও প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী হীনচেতা রাজভক্তেরা যেন ভোটের যাদু কিম্বা আমলাতান্ত্রিক কারসাজীতে নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে বিপথে পরিচালিত করিতে না পারে।

প্রকৃত দেশসেবক ও জনসেবককে জয়যুক্ত করিয়া তাঁহারা স্বাধীনতা সাধনার অগ্নিশিখা বাংলার বুকে প্রজ্বলিত করুন। জাতির ভবিষ্যত ভাগ্যনিয়ন্তা তাঁহারাই, অগ্রগতির পথে তাঁহারাই পথ প্রদর্শক। অবাঞ্ছনীয় শাসনতন্ত্রের অন্ধ তাবেদার বা আমলাতান্ত্রিক প্রেমমুগ্ধদিগের হীন স্বার্থ সিদ্ধির কুটিল চক্রান্ত যেন বাঙলা দেশকে বিপথে পরিচালিত করিয়া বাঙলার অর্দ্ধ শতাব্দীর জাতীয় সাধনাকে নিষ্ফল করিতে না পারে, ব্যর্থ করিতে না পারে বাঙলার আত্মভোলা তরুণ প্রাণের ত্যাগোজ্জ্বল ও নির্য্যাতনপূত সুদীর্ঘ সাধনাকে।

চাতিম চাতিম

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ভারতের মুসলীম সম্প্রদায় কাহার, কে সেখানে ধর্মের নামে বা দেশের নামে ঠিকাদারী নিয়েছে, এই নিয়ে জিন্না সাহেব ও পণ্ডিত জেবাহির লালে গরম গরম কথা হয়ে গেছে। ঢাকা কার্জন হলে বক্তৃতা দিতে উঠে জিন্না সাহেব বলেছেন, "অল ইণ্ডিয়া মুসলিম্ লীগ চেষ্টা করছে দুই এঁড়ে বাদ দিয়ে একটি খাঁটি মুসলীমের কংক্রিট গাঁথনীর গোয়ালের সৃষ্টি করতে। কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলীম লীগের আসমান জমিন ফারাক, আর ভারত হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের, দুয়েরই কামধেনু। ইলেকসনের ঢিপ্টিক দেশে চারিদিকে যে সব দল কেমন ব্যাঙের ছাতার মত গজাচ্ছে তারা ভুঁইফোড়, সুতরাং সুবিধাবাদী; এই সব খাপছাড়া জীবদের দিয়ে কামধেনু দোহন কার্য্য চলতে পারে না।" জিন্না সাহেব চান না কোন মুসলীম দল ভেঙে কংগ্রেসের বা হিন্দুদের আওতায় গিয়ে ওঠে।

* * *

এইসব 'ক্যাওস্ শক' বুলি জিন্না সাহেবের মুখে শুনে পণ্ডিত জোয়াহির লাল খাপ্পা হয়েছেন। তাঁর ধারণা ক্ষুধিত গণশক্তি যোয়ে তৈল তণ্ডুল বস্ত্র, তারা সে দিক দিয়ে উদরকে দিয়েছে ধর্মের উপরে স্থান; তারা যখন তাঁর সকাশে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে পণ্ডিত জোয়াহির লালকে জয়জোকার দিতে এসেছে, তখন তিনিই দীনবন্ধু পতিতপাবন হিসাবে তাদের একমেবাদ্বিতীয় ঠিকাদার। তারা এসে পণ্ডিতজীকে কথ্যালাজ প্রবলেমের কথা জিজ্ঞাসা করে নি, তারা বলেছে জমির খাজনার কথা, চাষী খাদের কথা, বেকার সমস্যার কথা। এ সব গুলি ব্যাধিরই প্যানেসিয়া বা "সর্বজ্বরগজসিংহ" হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস ও স্থাপনা।

* * *

কথা দুজনেরই ঠিক, তবে আমার বিশ্বাস নেতারা থাকেন এক কাল্পনিক রাজ্যে যার নাম ফুল্স্ প্যারাডাইস্; তাঁরা মিটিংএ মিটিংএ ভিড় দেখে অভ্যস্ত, মান পত্র ও মাল্য চন্দনে তাঁদের মেজাজ থাকে খোস; সে অবস্থায় তাঁরা পত্রপাঠ মনে করে বসেন, যাঁরা তাঁদের ঘিরে সাময়িক ভাবে কূজন ও গুঞ্জন করে তারাই গোটা ভারত। শতকরা দু' পার্সেণ্ট ভোক্যাল ভারতকে আত্মপ্রসাদের ম্যাগনিফাইং গ্লাসএ দেখলে হঠাৎ গোটা ভারত বলেই মনে হয়। এই ভিলিউসন্ নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ গেছেন, তিলক গেছেন, এখন মিটিংএ মিটিংএ নিজেকে ঠকিয়ে সুখ পাচ্ছেন পণ্ডিত জোয়াহির লালজী। নেতাদের এই সহজলভ্য সস্তা সুখের হন্তারক আমি হতে চাই না, তাঁরা মিটিংএ মিটিংএ মানপত্র কুড়িয়ে ব্রিটিশ এম্প্যায়ারের গথিক ইমারৎ ধ্বসাতে থাকুন।

* * *

এই পোষকী রাজনীতি বাদ দিয়ে আমরা কোন রিজন্ বা যুক্তির নিক্তিতে ওজন করে কি পাই? আমরা পাই দু'পার্সেণ্ট হিন্দুস্থান হয়েছে সচেতন ও সবাক, বাকি আটানব্বই পার্সেণ্ট ভারত বা হিন্দুস্থান হচ্ছে নির্বাক যন্ত্র পুত্তলী। এ নির্জীব ক্ষুধাতুরার জজ্জরত নই নড়ন্-চড়ন্ নই কিছু ভারতের দোহাই পেড়ে আমরা লীডার, কেউ চালাই ঐ দু'পার্সেণ্টকে, কেউ তার চেয়ে কিঞ্চিৎ কম ভগ্নাংশকে। আমাদের ঠাকুমার যুগের হাফ পার্সেণ্ট পলিটিকাল ভারত এখন জোয়াহির লালের যুগে টু পার্সেণ্ট হয়েছে, এই হচ্ছে আমা-

দের ত্রিশ বছরের রাজনীতির মোট অঙ্ক ; একে কল্পনার রঙে রঙিয়ে বাগ্‌বিস্তারে ফেনিয়ে ইণ্ডিয়া রবারের মত টেনে কিছুতেই ফিফ্‌টি পার্সেণ্ট করা যেতে পারে না।

* * *

যাদের পেটে ক্ষিদে, পিঠে কাবলীওয়ালার লাঠি, আর মুখে আধ পোড়া বিড়ি তারা জোয়াহির লালজীর মতে অর্থ শাস্ত্র ছাড়া শাস্ত্র পুরাণ কোরাণ শরিফ বোঝে না। তবে কি মন্দিরে মসজিদে গো-হাড় নিষ্ঠীবন ফেলে ক্যালকাটা ও আলিগড় ইউনিভার্সিটির লোকে, কম্যুনাল দাঙ্গার লাঠি ও ছোরা চালায় নপেটা পায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে গ্রাজুয়েটের দল ? গো-মাতার শোকে বা লোভে অধীর হয়ে ভ্রাতৃবধে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে তারা—মৌলবী ও পুরুতের উস্‌কানীতে ? য়ুরোপের আমদানী ফুল কেতাবী ক্লাসকন্‌সাস্ 'গণ' কি এখানে জন্মেছে, না, আমরা অসাড় ষ্ট্যাটিক্] নির্জীব আশী পার্সেণ্টকে খুঁচিয়ে ঘা করবার চেষ্টায় আছি ? সব দিক দিয়েই যারা মরে ভূত হয়ে আছে তাদের পলিটিকাল কাতুকুতু দিয়ে জাগাবার ব্যর্থ প্রয়াস আর কতদিন করা যাবে ?

* * *

ব্রিটিশ এম্‌পায়ারের একটা কার্বিনের অধিকিস্তের ধ্বংস প্রচেষ্টা যেমন নেতারা [illegible] তা তাঁরা করতে থাকুন, বাচনিক [illegible] আমাদের কিছু তো [illegible] নেই। [illegible] হচ্ছে অধির থাকমা, চা[illegible] [illegible] সুমতা, জলকষ্ট এসব কমাতে হলে তো চেপে সিট তাউন করতে হবে কাউন্সিলে, মন্ত্রীদের মসনদে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারে, ইউনিয়ন বোর্ডের মোড়ায়। কি বলেন আপনারা ? স্বরাজে তো কারু অরুচি নেই, কিন্তু সে স্বর্ণভস্ম মকরধ্বজ তৈরী হতে তো বিলম্ব আছে, ততদিন মুমূর্ষু রোগীর কর্ণে আশার ফাঁকা বাণী না ঢেলে কিছু কিঞ্চিৎ টোটকা টাটকা চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থায় আপত্তি কি ?

* * *

কবে স্বরাজে বসে পেট ভরে চিকেন্ ব্রথ ও কালিয়া কোপ্তা দিয়ে সে পথ্য করবে তার জন্ত প্রতীক্ষা না করে ড'টো হাতুড়ে ডাক্তার এসে দৈব মণ্ডের ব্যবস্থা দিলে যে আপাততঃ রোগী কিছু গায়ে বল ও মনে ভরসা পায়। "সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা" এসে ভারত যদি স্বস্বর্গে পরিণত হয়ই তখন তো কোন কথাই থাকবে না। কিন্তু যে রেটে জোয়াহির লালজী ও শরৎ বাবু ঠক বাছতে লেগে গেছেন, তাতে গাঁ উজোড় হবারই দাখিল, বিশুদ্ধ কংগ্রেস মার্কা ন্যাশনাল ভারত। বিশুদ্ধ জিন্নামার্কা মুসলীম ভারত, বিশুদ্ধ হিন্দুমার্কা পরমানন্দী ভারত গড়তে অনেক বৈষম্য, অনেক শত্রুতা অনেক পরতন্ত্রতা ঘটবে বলেই মনে হচ্ছে। তারপর "ধিনতা ধিনা পাকা নোনা" করতে করতে যদি সুদূর সত্যযুগে খাঁটি সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা আসে। এখানে তো বহুকাল এই এম্পায়ারেই আমাদের করে খেতে হবে। বেকারের ক্ষুধার ক্ষুদ কুঁড়া তো কংগ্রেস অফিসে মিলবে না, ঢুকতে হবে মিনিষ্টারের তোষাখানায়। আমাদের এই নেতৃ তাড়িত উদ্ভ্রান্ত জীবনে মনে রাখতে হবে আজকের পলিটিক্স বাঁচিয়ে তবে কালকের পলিটিক্স, রঙিন ভবিষ্যতের খোয়াব বর্তমানের দুঃখ দূর করতে পারেনা। সে বিলাস মোটরচারী এরোপ্লেনচারী নেতাদের চলে, পাদচারী হামাগুড়িচারী মাস্-এর চলে না।

ইলেকসনী যৎকিঞ্চিৎ

সাত বৎসর পরে বাঙ্গলার আইন সভার নির্ব্বাচন হইলে কি হয়, এবারকার নির্ব্বাচনে জনসাধারণের মধ্যে তেমন উৎসাহের সাড়া পাওয়া যাইতেছে কৈ? দেশবাসীর এই নিরুদ্যমের মূলে কতকগুলি কারণও যে না আছে এমন নহে। প্রথমতঃ ম্যাকডোনাল্ডী বাটোয়ারায় বাঙ্গলার হিন্দুগণ তীব্র বিক্ষুব্ধ। নব শাসন-তন্ত্রের বিধান অনুযায়ী বাঙ্গলার ব্যবস্থা পরিষদে ২৫০ শত সদস্যের মধ্যে অমুসলমান সদস্য থাকিবেন মাত্র ৮০।৮৫ জন। বিশেষতঃ যে শাসনতন্ত্রের উদ্বোধনের প্রাক্কালে এই নির্ব্বাচন, তাহা দেশবাসীর অবাঞ্ছিত ও আশা আকাঙ্খার প্রতিকূল। তার উপর দেশবাসীর উৎকট দারিদ্র্য সমস্যাও তাহাকে অনেকটা মুহ্যমান করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই এবারকার নির্ব্বাচনে যে উৎসাহের পরিবর্ত্তে নিরুৎসাহই দেখা যাইবে ইহা তো স্বাভাবিক।

* * *

যুদ্ধের সাধ মিটাইবার সুযোগে যাহারা বঞ্চিত তাহারা যে অন্ততঃ ভোট যুদ্ধে দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এ পর্য্যন্ত ভোট-যুদ্ধে খাঁটী অহিংস মতে পচা ডিম, সোডাওয়াটারের বোতল, ইটপাটকেল পর্য্যন্ত চলিয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদের বিগত নির্ব্বাচনে বিমান-পোতের আমদানীও হইয়াছিল। তবে গোলা-গুলি চলিবার সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এবারকার ভোট-যুদ্ধে ঢাকায় নাকি গুলীও চলি-য়াছে। ঢাকা জেলার রায়পুর গ্রামে এক মৌলবী ভোট মাধুকরী করিতে বাহির হইয়া নিহত হইয়াছেন। এ সংবাদটা অবশ্য কাঁচা, কিন্তু কাণপুর হইতে একজন কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবককে বিষ প্রয়োগের পাকা সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। বেচারা নাকি কংগ্রেসের পক্ষে মফঃস্বলে ভোট মাগিয়া বেড়াইতেছিল। ইহার পর হয় তো ভোট যুদ্ধে কামান দাগা, অনল বৃষ্টি এবং বিষাক্ত গ্যাস নিক্ষেপের সংবাদও শুনা যাইবে।

* * *

এ সব ছাড়াও এবারকার নির্ব্বাচনের আরও কয়েকটী বৈশিষ্ট্য আছে। বিগত শাসনতন্ত্রের আমোলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মহিলাগণ আইন সভায় প্রতি-নিধিত্বের অধিকার লাভ করিলেও বাঙ্গলার মহিলাগণ এতদিন সে সুযোগে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু এবার তাঁহারাও প্রতি-নিধিত্বের অধিকার লাভ করিয়াছেন। মহিলাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ৫টী আসনের মধ্যে একটী আসনের জন্য একজন মহিলা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ঢাকায় এক মুসলমান দম্পতী এবারকার নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, স্ত্রী বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। স্বামী বেচারার ভাগ্যে কি আছে কে বলিতে পারে।

* * *

দ্বিতীয় বিশিষ্টতা হইল, এবারকার নির্ব্বাচনে কোন হিন্দু প্রার্থীই একাধিক কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচন প্রার্থী হন নাই। তবে দুই জন বিশিষ্ট মুসলমান তিনটী ও দুইটী কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়া-ছেন। পূর্ব্ববঙ্গের কোন সুবিখ্যাত মুসলমান পরিবারের ৭জন আগামী নির্ব্বাচনে প্রার্থী হইয়াছেন। আর কোন পরিবারে এত অধিক লোক কখনো নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। উক্ত ৭ জন প্রার্থীর মধ্যে মহিলা সমেত ৩ জন প্রার্থী বঙ্গীয় আইন পরিষদে ও উর্দ্ধতন সভায় বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

একটি প্রশ্ন

পূজার পূর্ব্বে নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী চাট-মোহর বন্যা সাহায্য সমিতি নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সংগৃহীত অর্থ চাট-মোহরবাসীর মঙ্গল ব্যয়িত হইয়াছে কি? ৬ই ডিসেম্বর তারিখের বসুমতীতে জনৈক চাটমোহরবাসী এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া-ছিলেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত নরেনবাবু তাহার সদুত্তর দিতে পারেন নাই। চাট-মোহরবাসী কি এই লোককে ভোট দিবেন?

—জনৈক চাটমোহরবাসী (পাবনা)
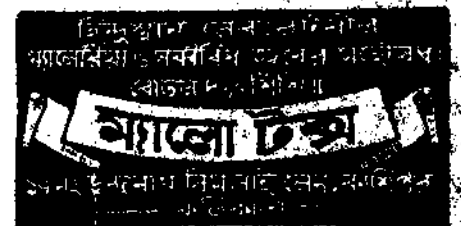
আর একটা বৈশিষ্ট্য হইল, কংগ্রেসের শৃঙ্খলা বিধায়ক বিধি। কিছু দিন পূর্ব্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, যে সব কংগ্রেসী সদস্য কংগ্রেসের কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন তাঁহাদের উপর শৃঙ্খলা বিধায়ক দণ্ড বিধি প্রয়োগ করা হইবে। তদনুসারে কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবার মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, কানপুর, বাঙ্গলা ও আসামের কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মীর প্রতি শৃঙ্খলা বিধায়ক দণ্ড প্রদানের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই দণ্ডের অর্থ— কংগ্রেস প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস কর্ম্মীগণ কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য অর্থাৎ চারি আনার সদস্য পর্য্যন্ত থাকিতে পারিবেন না।

দণ্ডটা অবশ্য অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য প্রযুক্ত হইবে বটে, তথাপি উহা খুব কঠোর হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। বাঙলায় ঢাকার শ্রীযুত ধীরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দিনাজপুরের শ্রীযুত নিশীথ নাথ কুণ্ডু ও কুমিল্লার শ্রীযুত কামিনী কুমার দত্তের উপর উক্ত দণ্ড বিধানের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দণ্ড দানের পূর্ব্বে শরৎবাবু তাঁহাদের নিকট হইতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণের কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন কৈফিয়ৎ দাখিল করিয়াছেন কি না, তাহা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

ভোট-মঙ্গল

ভোট মঙ্গলের পালা গাহিতে নামিয়া কলিকাতাবাসী আমরা সর্ব্বাগ্রে কলিকাতার কথাই আমাদের মনে পড়ে। তাই অগ্রাধিকার স্বভাব স্বত্ব বলিয়া কলিকাতার পালাই সুরু করিলাম। কলিকাতার মহিলা নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়াছেন দুইজন, শ্রীযুক্তা মীরা দত্তগুপ্তা ও শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী। শুনা গেল, কলিকাতার কোন বিশিষ্ট কংগ্রেসী পাণ্ডার চক্রান্তে শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী কংগ্রেসের মনোনয়ন লাভে বঞ্চিতা হইয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসের মনোনয়ন লাভে বঞ্চিতা হইলেও তাঁহার একনিষ্ঠ কংগ্রেস সেবার পরিচয় সহরবাসীর অবিদিত নহে। পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিস্বরূপে তাঁহার পৌর-জন-সেবার কৃতিত্ব তাঁহাকে অধিকতর জনপ্রিয় করিয়াছে। দেশের সেবায় ত্যাগ ও নির্য্যাতন বরণে অগ্রণী হইয়া তিনি কলিকাতার মহিলাকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। দেশের বহু সদনুষ্ঠান ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট। তাঁহার যোগ্যতার সম্বন্ধেও কাহারো কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং কলিকাতার জননী ও ভগিনীগণ যে তাঁহাকেই জয়যুক্ত করিবেন, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

পূর্ব্ব কলিকাতা নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে একজন একনিষ্ঠ কংগ্রেস সেবক প্রার্থী মনোনীত হইয়াছেন। শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু দেশবন্ধুর আমোল হইতে কংগ্রেসের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরকাল পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ডেপুটি মেয়র ও মেয়ররূপে তিনি জনসেবায় যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা কাহারো অবিদিত নহে। বিহার ভূমিকম্পের সময় মেয়র-ফণ্ড খুলিয়া তিনি দুর্গতের সেবায় যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহা পৌর প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর গৌরবান্বিত করিয়াছে। দেশবন্ধু স্মৃতি মন্দিরের প্রেসিডেণ্টরূপেও তিনি দেশবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রিয়ভাজন হইয়াছেন। যোগ্যতায় তিনি যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ইহা বলাই বাহুল্য। পূর্ব্ব কলিকাতার ভোটদাতাগণ কি কাঞ্চন কৌলিন্যের সমাদরের পরিবর্ত্তে প্রকৃত যোগ্যেরই সমাদর করিবেন না?

* * *

মধ্য কলিকাতা সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্রের প্রার্থী রায় বাহাদুর ডাক্তার হরিধন দত্ত মহোদয় ভোটাঙ্গনে নিত্য সাঁঝে যতই বাদশাহী বাহিনী ছাড়িয়া দিন, কংগ্রেসের প্রতিকূলে তাঁহার জয়াশা দুরাশা বলিয়াই মনে হয়। রায় বাহাদুর ইতিপূর্ব্বে দশ বৎসরকাল ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধিত্ব করিয়া নির্ব্বাচক মণ্ডলীর কোনই হিতসাধনে সফল হন নাই। অধিকন্তু দমন আইন ও বিনা বিচারে আটকের আইন সমর্থন করিয়া তিনি কি জনমতের বিরুদ্ধাচরণই করেন নাই? জয়ী হইবার জন্য নারী-রক্ষা ও বেকার সমস্যার সমাধান প্রভৃতি অনেক কিছু গালভরা আশার বাণী শুনাইতে পারেন; কিন্তু মধ্য কলিকাতার সজাগ ভোটদাতাদের এইসব মিঠে ভাওতা দিয়া তাহাদের জাগা ঘরে চুরি করা রায় বাহাদুরের ন্যায় পাকা রাজভক্তের পক্ষে যে সম্ভব হইবে না, ইহা বোধ হয় নিশ্চয় করিয়াই বলা যাইতে পারে।

* * *

দক্ষিণ মধ্য কলিকাতা নির্ব্বাচনকেন্দ্রের উভয় প্রার্থীকেই "এক ভাণ্ড আর ছার, দোষগুণ দিব কার" বলা যাইতে পারে। মিঃ জে, সি, গুপ্ত রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করিয়া কোনদিনও দলের নিকট বিশ্বস্ততা বজায় রাখিতে পারেন নাই। পাকা সুবিধাবাদী হিসাবে তিনি যখন যেদিকে পাল্লা ভারি দেখিয়াছেন, সেই দিকেই ঢলিয়া পড়িয়াছেন। নির্ব্বাচনী সভায় দেশের বেকারদের জন্য তিনি যতই অশ্রুগঙ্গা বহাইয়া ভোটদাতাদের মন ভিজাইবার চেষ্টা করুন, এ্যাডভান্স অফিসে বেচারা সাংবাদিকদিগের বকেয়া বেতন বাজেয়াপ্ত করিয়া তিনি যে ঔদার্য্যের

পরিচয় দিয়াছেন, দরিদ্র সাংবাদিকেরা তাহা কোনদিনও ভুলিতে পারিবে না। তবে যোগ্যতার দিক হইতে তিনি যে চৌদল কুৎ কুৎ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন ইহা অস্বীকার করা যায় না। মন্দের ভালো হিসাবে নির্ব্বাচক মণ্ডলী তাঁহাকে সমর্থনযোগ্য মনে করিলে আমাদের কিছুই বলিবার নাই।

* * *

প্রেসিডেন্সী বিভাগ সহর কেন্দ্রের প্রার্থীরূপে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সান্যাল। বিগত কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে প্রকাশ্য ভাবে কংগ্রেসদ্রোহিতা করিয়াও সান্যাল মহাশয় কংগ্রেসী মনোনয়ন লাভে বঞ্চিত হন নাই। অধিকন্তু কংগ্রেস প্রার্থীরূপে তাঁহার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বসুর প্রতি যে সব অলীক প্রচার কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে কংগ্রেসের মর্য্যাদাই অধিকতর ক্ষুণ্ণ করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত বসু বাঙ্গলার দমন আইনের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন কি না, সে পরিচয় আর সান্যাল মহাশয়ের দিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না, দেশবাসী তাহা সম্যকরূপেই অবগত আছেন। চারি আনার কংগ্রেস সদস্য না হইলেও ব্যবস্থাপক সভায় বিরোধী দলের নেতা হিসাবে তিনি কংগ্রেস ও জাতীয়তা নিষ্ঠার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলার কংগ্রেসী কর্ত্তাদের নিশ্চয়ই অবিদিত নাই। তথাপি তাঁহার বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রার্থীর এই মিথ্যা প্রচার কার্য্যে কংগ্রেসের সমর্থন আছে বলিয়া যদি কেহ সন্দেহ করে তবে তাহাতে কংগ্রেসের মর্য্যাদা নিশ্চয়ই লোক চক্ষে বৃদ্ধি পাইবে না।

* * *

বীরভূম পল্লী নির্ব্বাচনকেন্দ্রের প্রার্থীদ্বয়ের মধ্যে অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বাধিক সমর্থন লাভ করিতেছেন। বীরভূম জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রূপে তিনি পল্লীবাসীর যথেষ্ট হিতসাধন করিয়াছেন। পল্লী গ্রামাঞ্চলে পথ ঘাট নির্ম্মাণ, পানীয় জলের সুব্যবস্থা, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি জন হিতকর কার্য্যে জিতেন্দ্রলাল পল্লীবাসীর হৃদয়ে অধিকতর শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসন অধিকার করিয়াছেন। বাগ্মী প্রবর জিতেন্দ্রলালের ব্যবস্থাপক সভায় কর্ম্ম নৈপুণ্যের পরিচয় আজ নূতন করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। জিতেন্দ্রলাল বিহীন ব্যবস্থাপক সভা শিব হীন যজ্ঞের ন্যায়ই মনে হয়। যোগ্যতম জিতেন্দ্রলালকে জয়যুক্ত করিতে তাঁহার নির্ব্বাচক মণ্ডলী যে নিশ্চয়ই পশ্চাৎপদ হইবেন না এ বিশ্বাস আমাদের যথেষ্টই আছে।

* * *

কংগ্রেস সদস্য হইয়াও কংগ্রেসের সর্ব্বাপেক্ষা বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন কুমিল্লার শ্রীযুক্ত কামিনী কুমার দত্ত। কংগ্রেসের মনোনয়ন লাভের পরে উহা হইতে বঞ্চিত হইয়া তিনি এখন নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। কুমিল্লা ও ত্রিপুরার সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত দত্ত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কেবল জঘন্য প্রথার কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই অধিকন্তু কংগ্রেস প্রার্থীর প্রতিকূলে জয় লাভের দুরাশায় ত্রিপুরা রাজ ষ্টেট, সব ষ্টেট, ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড এবং চৌকিদার ও দফাদারগণের দারস্থ হইতেও কুণ্ঠিত হন নাই। শ্রীযুক্ত দত্তের কংগ্রেসদ্রোহিতার জন্য শরৎ বাবু তাঁহার নিকট হইতে যে কৈফিয়ত তলব করিয়াছিলেন এ পর্য্যন্ত তিনি নাকি তাঁহার উত্তর দেওয়াও আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহার কাপ্তেন ভ্রাতা বেঙ্গল ইমিউনিটীর কর্ম্মচারীদিগকে কি ভাবে তাঁহার ভোটভিক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছেন তাহাও কাহারো অবিদিত নহে। এহেন কামিনী বাবু নির্ব্বাচনে জয়ী হইলে কুমিল্লার সুনামে কি দুরপনেয় কলঙ্কই আরোপিত হইবে না?

* * *

পূর্ব্ব ময়মনসিংহ নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরূপে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন গৌরীপুরের শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন বীরেন্দ্রকিশোর। পিতৃপরিচয়ে যাঁহারা ভোটের বাজারে কিস্তিমাতের আশা রাখেন বীরেন্দ্রকিশোর তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কাঞ্চন-কৌলিন্যের গর্ব্বে তাঁহারা স্বনামধন্য পিতা স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসকে কিভাবে উপেক্ষা ও অনাদর করিয়াছিলেন তাহা অনেকেরই স্মরণ আছে। দেশবন্ধুর আন্দোলে কংগ্রেসের প্রতিকূলে ভোটদান হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার জন্য তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে প্রায় ২ শত স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করিতে হইয়াছিল। এহেন জনসেবক পিতার পুত্ররূপে তিনি আর যাহাই করুন, দোহাই জনসেবার ভাওতা যেন না দেন। বন্ধুবর দত্তের সহিত শিলং শৈল বিহারেই যাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়, জনসেবার মত অবসর তাঁহার কোথায়?

রায় বাহাদুর রাধিকাভূষণ রায়

পাবনা-বগুড়া কেন্দ্রের নির্ব্বাচন-প্রার্থীদিগের মধ্যে নাটোরের মহারাজা বাহাদুর যাঁহাকে যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া স্বয়ং নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আমরা তাঁহাকে— তাড়াশের জমিদার শ্রীযুত রাধিকাভূষণ রায়কে সর্ব্বতোভাবে যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া তাঁহার নির্ব্বাচন সমর্থন করিতেছি এবং ভোটারগণকে তাঁহাকে ভোট দিয়া জয়যুক্ত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

রাধিকাভূষণ বাবু দানশীল, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, চরিত্রবান ও পাবনার শ্রেষ্ঠ জমিদার। তাড়াশের এই জমীদারপরিবার তাঁহাদিগের অর্থ কখনই ভোগ-বিলাসের উপকরণ বলিয়া বিবেচনা ও ব্যবহার করেন নাই, পরন্তু তাহা দেশের ও দশের কল্যাণেই প্রযুক্ত করিয়া আসিয়াছেন।

জিলায় শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাড়াশের জমীদারগণ কখনও অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন নাই। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ইঁহাদিগের অর্থে **সিরাজগঞ্জ বি, এল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়** প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত রাজশাহী বিভাগে প্রথম **কারীগরী বিদ্যালয়, বনওয়ারী-নগরের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও পাবনার এডওয়ার্ড কলেজ** প্রভৃতি তাড়াশের জমিদার-পরিবারের অর্থসাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁহারা নানারূপ সাহায্য প্রদান করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহারাই শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পীড়িতের চিকিৎসার জন্যই ইঁহাদিগের দান ফলে রাজসাহী জিলায় কুসুম্বিতে, বগুড়া জিলার কল্যাণীতে ও পাবনা জিলার বনওয়ারী নগরে নিত্য শত শত দরিদ্র বিনা-মূল্যে ঔষধ ও পথ্য পাইতেছে। দরিদ্র কৃষকাদির পক্ষে ইহার প্রয়োজন কে অস্বীকার করিবে?

পাবনা সহরে জনসভা প্রভৃতির জন্য **টাউন হল** এবং বালক ও যুবকগণকে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ চিত্তবিনোদন ব্যবস্থা দানের জন্য **বনমালী ইনষ্টিটিউশন** ইঁহাদিগের কীর্ত্তি।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে ইনি পাবনায় গেঞ্জীর কল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহারই অনুসরণে আজ দেশে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেগুলিতে সহস্র সহস্র লোক জীবিকার্জ্জন করিতেছে। ইহা ভিন্ন শ্রীযুত রাধিকাভূষণ রায় মহাশয় বহু স্বদেশী শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অকাতরে অর্থ দিয়াছেন।

ভারতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাবধি কখনও তাড়াশের জমিদারদিগের অর্থ-সাহায্য ও সহানুভূতিতে ইহা বঞ্চিত হয় নাই। পাবনায় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশনের জন্য ইঁহারা প্রচুর অর্থ দিয়াছিলেন। দেশে খদ্দর প্রচারেও ইঁহার সাহায্যের ত্রুটি নাই।

ইনি প্রকৃত জাতীয়তার অনুরাগী এবং সর্ব্বজনপ্রিয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ও ইহাকে শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিতেন।

আমাদিগের বিশ্বাস, ইহার নির্ব্বাচনে পাবনা-বগুড়াবাসী উপকৃত হইবেন।

Telegrams:
JECTULE

THE BENGAL IMMUNITY CO., LTD.

MANUFACTURERS OF SERUM, VACCINES, ORGANO-THERAPEUTIC
PRODUCTS, PHARMACEUTICAL PREPARATIONS, ETC.

Rd 5.10.36

153, DHARAMTALA STREET:

Managing Director:
N. N. DUTTA, M.B.

Calcutta, 2nd October, 1936

My dear Dr. ████,

Thanks very much for your letter dated 30.9.36 and good wishes.

You have probably observed that lately there has been a regular craze in Bengal for starting Chemical & Biological manufacturing concerns owing to the success of a very few in the line. I am sorry to say that some of the concerns have already wound up and some are on the way to liquidation. I should not say anything now for those which have lately been started.

You have already been to our Laboratory and I shall like to take you once more any day and show you how works are being carried on efficiently and economically. We cannot exist to-day or to-morrow without efficiency and economy. I know that you would not believe in "Bazar" gossips. You know that Bengalees are unfortunately becoming poorer and consequently jealous and mean-minded.

I would surely like to appoint any suitable Shareholder if available.

Re:- Bi-Vita-B:- I could not trace out any of your order pending. I shall make further enquiry on this matter on hearing from you as to the exact date of the order.

With thanks again and best wishes,

Yours sincerely,

N. Dutta

বেঙ্গল ইমিউনিটীর কাপ্তেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত উল্লিখিত পত্রে বাঙালীকে হীনচেতা বলিয়া অবমাননা করিয়াছেন। ইঁহারই ভ্রাতা কামিনীকুমার দত্ত কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া নির্বাচনে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কুমিল্লার নির্বাচকমণ্ডলী কি কংগ্রেস ভোটে ঐ দম্ভোক্তির সমুচিত প্রত্যুত্তর দিবেন না?

কুহেলিকা

(গল্প)

শ্রীঅনিল কুমার মুখোপাধ্যায়

জীবনের আলো-ছায়া পড়া চলার পথে যাদের সঙ্গে আমার হয়েছিল পরিচয়, নিদ্রা-বিরল রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতো স্মৃতির পর্দায় যারা ভেসে ওঠে আজো—বিভিন্ন রূপে ও চরিত্রে, শুভ্রা তাদেরই একজন।

রূপের দিক দিয়ে অনুপমা সে নয়। সাধারণ—অতি সাধারণ! বয়সকালের উজ্জ্বলতা যাদের মূলধন, শুভ্রা সেই দলের মেয়ে। পাতলা ছিপছিপে গড়ন, মিঠে আমেজলাগা!

শুভ্রা যুবতী—বিবাহিতা!

শুভ্রা শ্যামা—শস্যশ্যামলা নয়! স্বামী জীবিত, নিরুদ্দেশের যাত্রী! পথই যাদের পাথেয়, পথেই যাদের অভিজ্ঞতা, পথেই যারা টানে সমাপ্তির রেখা!

শুভ্রার স্বামী পথচারী!

স্বামী নিরুদ্দেশ তবু শুভ্রার সিঁথির সিঁদুর জাজ্বল্যমান—জলন্ত অগ্নিশিখার মতো! নারীর চিরন্তন স্ফুটন কামনা হয়তো ওর সারাটা বুকে গুমরে কেঁদে বেড়ায়, জীবনের ধূলিরুক্ষ ছায়াহীন রাজপথে চলতে চলতে হয়তো কোনো অসম মুহূর্তে ও হাঁপিয়ে পড়ে, সন্ধ্যাতারার দিকে চেয়ে হয়তো বিগত সুখস্বপ্নের কথা স্মরণ পথে আসে। দু-চোখ জ্বালা করে ওঠে, কোন বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দু-ফোঁটা জল। তখন বোধ হয় অসহ্য ক্লান্তিতে ওর চোখের পাতাদুটী বুজে আসে। চায় একটু নির্ভর আশ্রয়, এক ফোঁটা পিপাসার জল।

কিন্তু সেটা তার আন্তরিক—মৌখিক নয়। অন্ততঃ মুখ ফুটে বলেনি কোনোদিন কারো কাছে।

সমাজের কঠিন পরীক্ষায় শুভ্রা উত্তীর্ণা—চরিত্রবলে বলবতী।

তাই শুভ্রাকে আমার বড়ো ভালো লাগে। নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি আমার নিজের কথা—যা একান্ত ব্যক্তিগত গোপনীয়। আজো বলছি শুভ্রাকে—

শোন শুভ্রা:

কৈশোর ও যৌবনের শুভ সন্ধিক্ষণে যার সঙ্গে আমার ঘটেছিল পরিচয়—সে একটী মেয়ে। নাম তার রাণু। নামে আধুনিকতার উগ্র লেশ নেই, সনাতনী দেব-দেবীর উপস্থিতিও না। শুধু দরদ দিয়ে গড়া, আন্তরিকতার রেশ লাগা!

রাণু নামটী কিন্তু বেশ নয় শুভ্রা? উজ্জ্বল শ্যামলা, চলচলে কমনীয় মুখখানি, চাপা চিবুক, আধো-বোজা-আধো-খোলা ভাসা ভাসা দুটী চোখ—স্তিমিত, ক্লান্ত। পুরন্ত দুটী ঠোঁটে সতত বিরাজমান একটী সহনীয় স্তব্ধতা।—এই রাণু!

পাশাপাশি বাড়ী আমাদের একই রাস্তার ওপর। ঘন সান্নিধ্যের সুযোগ পেয়ে নিবিড় হয়ে উঠল দুজনকার পরিচয়। সুতরাং হ'ল প্রেমের সঞ্চার—নিরর্থক! নিরর্থক কেন, সেটা বুঝেছিলুম পরে—যৌবনের মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়ে।

যাই হ'ক, তখন তাকেই প্রেম ব'লে ধরে নিয়েছিলুম। অপরিণত দেহ-মনের সুলভ সম্প্রীতি। দু'জনকার মধ্যে ছিল একটা আকর্ষণ-গ্রহের সঙ্গে যেমন তারকার! একদণ্ড চোখের আড়ালে গেলে প্রাণ আনচান্ করত, স্নায়ুতে উঠত অশ্রান্ত কোলাহল, শিরা-উপশিরায় আসত অসহ্য চাঞ্চল্য।

বয়সে সে আমার চেয়ে দু-বছরের ছোট কী তার চেয়ে কিছু কম।

বুঝলে শুভ্রা, এমনি করে কিছুদিন চলল। তারপর তার পাত্রস্থ হবার দিন এল। হিন্দুর মেয়ে! জীবনে প্রেমের চেয়ে পরিণয়ের প্রাধান্য বেশী! তাই প্রেমিকের পত্র আসবার আগে অভিভাবকরা পাত্রস্থ করবার জন্য অধীর হয়ে ওঠেন। পাত্রের চেয়েও মারাত্মক পত্র।

রাণুর পাত্রস্থ হবার দিন এল। আমি তখন যৌবনের দুটো সিঁড়ি ভেঙে বোধ হয় তৃতীয় ধাপে পা ফেলেছি কী ফেলব। ও তখন প্রথম ধাপে উঠে দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে—উল্লসিত-উদ্ধত ভঙ্গী। সারা দেহে উদ্দাম উচ্ছলতা, অসহ্য চাঞ্চল্যের সুস্পষ্ট রেখা! আয়ত দু-চোখে তীব্র রঙীন নেশার আমেজ।

আশ্চর্য্য বাড়ন কিন্তু মেয়েদের! এই ক'টা বছরে ওরা পুরুষের চেয়ে এতো বেশী এগিয়ে পড়ে যে, একটা পুরুষের যখন পুরন্ত যৌবন, তখন একটী মেয়ে হয়তো স্তিমিতপ্রায়—অনেকের নিদান! ঠিক তখনই চলে মেয়েদের প্রসাধন পারিপাট্যের পূর্ণ মহলা।—তুমি নিশ্চয়ই বিরক্ত হয়ে পড়'ছ শুভ্রা, নারী চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করাতে।

হাঁ, তারপর তার বিবাহ হল! স্বামীভাগ্য তার ভালোই বলতে হবে—শতকরা নিরানব্বইটা বাঙ্গালী মেয়ের কপালের দিকে চেয়ে। স্বাস্থ্যবান, সচ্চরিত্র, উপার্জ্জনক্ষম তার স্বামী! রাণু সৌভাগ্যবতী!

যথাসময়ে একটী সন্তান হল—মেয়ে। নারী জীবনের চরম সার্থকতার মূর্ত্তিমতী স্বরূপ! তখন তার শরীরে এল পরিবর্ত্তন—আচারে, ব্যবহারে, কথা-বার্ত্তায়, চাল-চলনে সব কিছুতে। রাণু তখন পরিবর্ত্তিত

—সুসংকৃত! দেহের চাঞ্চল্য হয়ে এল স্তিমিত—ম্লান নয়। ফুটে উঠল প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য-সুন্দর, অভিনব। যা দেখলে আপনি মস্তক নুইয়ে পড়ে সঙ্কোচে ও সম্ভ্রমে!

আমারো ব্যতিক্রম হয়নি। লজ্জায় কেমন যেন জড়োসড়ো হয়ে উঠলুম। সে কিন্তু নয়। এইটুকু নারীচরিত্রের অপরূপ মাহাত্ম্য। হয়তো কখনো সামনা-সামনি পড়তুম, কথা বলতে বাধ্য হতে হ'ত। বলতুম অতি সংক্ষেপে আলগোছে। যেন পালাতে পারলেই বাঁচি এমনি ভাব। এ দিকটা দেখলে একটা পুরুষকে কতো দুর্ব্বল, সঙ্কীর্ণ মনে হয়।

সে ভেঙ্গে দিলে আমার লজ্জা-জড়তা। একদিন সকালবেলা—আমার স্মৃতির পাতায় দাগ দেওয়া দিন সেটা। সে সামনে এসে দাঁড়াল! কোলে মেয়ে। আমি তখন বাইরের ঘরে তক্তপোষের ওপর বসে। কী যেন করছিলুম, বোধ হয় ভাবছিলুম কিছু। তাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলুম। বীতরাগ নয়, লজ্জাটাকে এড়াবার একটা সহজ পন্থা। সে নীরবে তাকের বইগুলো ঘাঁটতে লাগল। আমার কাছে এ নীরবতা অসহ্য ঠেকল, মরিয়ার মতো বলে উঠলুম—'ভাগনীটার কী নাম রাখলে'?

'বাসনা'!

এবার কিন্তু সে এগিয়ে এল। সাড়ী-খানা বেশ করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আমার পাশে তক্তপোষের একধারে বসল। মেয়েকে বসিয়ে দিলে আমার কোলের ওপর। কী সুন্দর মেয়েটা। ওর মুখখানি ছাঁচে ঢেলে বসানো, আজো দেখি মেয়ে-টাকে—আমার ভাগিনীটিকে দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। যেন তারই শিশু-উপস্থিতি।

হ্যাঁ শোন শুভা, তারপর কী হল:

একথা সেকথায় হঠাৎ একসময়ে সে আমার একখানি হাত ধরে ফেল। আমি শিউরে উঠলুম, মুখ ফিরিয়ে তাকালুম তার দিকে। দু'চোখের কোলে দীর্ঘ জলরেখা। আমি নির্ব্বাক-নিষ্পলক। চোখের জল মুছলেনা সে, তেমনি ভাবেই বলল—'আমার একটা কথা রাখবে? একান্ত অনুরোধ—'

'রাখবো'! বিবেচনা না করেই বললুম।

একটু চুপ করে থেকে সে বলল—'আজ আমি বুঝতে পারছি অতীতে আমরা যা করেছিলুম তার আগাগোড়া সব ভুল। সে ভুল শোধরাতে চাই, যদি তুমি আশা দাও।'

ওর কথার নিহিত অর্থ আমি বুঝতে পারলুম। কেন না বাল্যপ্রেম প্রেম নয় শুভা,—কলঙ্ক। পরিণত বয়সে সে কথা মনে হলে লজ্জায় মুসড়ে পড়তে হয়। প্রেম ত লজ্জার কারণ নয়, মানুষকে সঙ্কুচিত

করে তোলে না ত'—প্রেমে মানুষ হয় উদার—মুক্ত।

বললুম—স্বচ্ছন্দে। তোমার কথা আমি বুঝতে পেরেছি।

সে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—জানি তুমি অমত কোরবে না। তুমি বুদ্ধিমান, অবুঝ নও। একটু থেমে আবার সে বলল—"আজ থেকে আমরা দু'টী ভাই-বোন—বলো, খুকীর মাথায় হাত দিয়ে বলো! অবশ্যি আমি তোমায় শপথ কোরতে বোলছি না, তবু—"

আমার ডান হাতটা বাসনার মাথায় রাখল।

আমি বললুম বেশ সতেজস্বরেই বললুম—"হ্যা আজ থেকে তুমি আমার বোন, আমি তোমার ভাই। মনে রেখো আমি তোমার দাদা কিংবা তুমি আমার দিদি নও। শুধু ভাই আর বোন। কেউ কারো চেয়ে একতিল উঁচু-নীচু নই—সমান। সম্ভ্রম জ্ঞানটা মানুষের আন্তরিকতার অন্তরায়, সেখানে মাথা তুলে দাঁড়ায় শঙ্কা—আর সতর্কতা!"

বুঝলে শুভা, আমার কথা শেষ হতেই রাণুর পাতলা ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল স্বচ্ছ—সুন্দর। গ্রহযুক্ত চন্দ্রের সঙ্গে সে হাসির উপমা দেওয়া চলে। একটী স্বস্তির নিঃশ্বাস কাণে এল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। মেয়ের চিবুক ছুঁয়ে আদর করে বলল - মামার কোলে লক্ষ্মীটির মতো বসে থাকো কেমন? আমি আসছি।—রাণু বাড়ীর ভেতর চলে গেল।

তারপর আর গল্প নয় শুভা, একটানা কাহিনী—চিরাচরিত! তার যৌবন গিয়ে [illegible] প্রৌঢ়ত্বে—তারপর ক্রমশঃ—। [illegible] আমার প্রবেশাধিকার, সেই— [illegible] সাধারণ দর্শকমাত্র!

বৃটেনের বৈষ্ণবী-নীতি

ভূমধ্যসাগরে ইংলণ্ড ও ইটালী পরস্পরের প্রভাব-প্রতিপত্তি কিরূপ থাকিবে তাহা লইয়া উভয় পক্ষে একটা বোঝা-পড়া হইয়া গিয়াছে। ইটালী-আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় রাষ্ট্র সঙ্ঘের পাণ্ডারূপে বৃটেন যখন ইটালীর উপর স্যাংসন প্রয়োগে সায় দেন তখন জয়লাভে কৃতনিশ্চয় মুসোলিনী বৃটেনকে ভূমধ্যসাগরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া চোখ রাঙাইয়া বলিয়াছিলেন যে, বৃটেন যদি তাহার আবিসিনিয়া বিজয়ের পথে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরে বৃটিশের রণতরীগুলিকে অতল জলধি গর্ভে নিমজ্জিত করিবে। ইহার পর শক্তিশালী বৃটেন নিজের স্বার্থরক্ষার দুশ্চিন্তায় বৈষ্ণবী নীতি অবলম্বন করিলেও মিলানের এক বক্তৃতায় মুসোলিনী বৃটেনকে হুমকী দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, বৃটেন যদি তাহার আবিসিনিয়া বিজয়কে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লয় তাহা হইলে সাধ করিয়া ইটালী ভূমধ্যসাগরে বৃটেনের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিবে না।

কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটেন, মুসোলিনীর এই আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। বৃটেনের মনে এই আশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছিল যে, সম্ভবতঃ ইটালীর আবিসিনিয়া জয়ের ফলে ভূমধ্যসাগরে তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে হয়তো মালটা দ্বীপটী ক্রমে ইটালীর করতলগত হইবে ও মিশরকে নিজের দখলে রাখা বৃটেনের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে! ভবিষ্যতের এই দুর্ভাবনায় ইংলণ্ডের নৌ-বাহিনী সাইপ্রাস দ্বীপে নূতন কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল। আবিসিনিয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বেই ইটালীর সঙ্গে বৃটেনের একটা বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছিল। টানা হ্রদের উপর বৃটেনের স্বার্থে ইটালী হস্তক্ষেপ করিবে না, পরস্পরের এই বন্দোবস্তের ফলে বৃটেন ইটালীর আবিসিনিয়া বিজয়ে আর কোন বিঘ্নোৎপাদন করে নাই। সম্প্রতি ভূমধ্যসাগর সম্পর্কে উভয় পক্ষে যে চুক্তি হইয়াছে তাহাতে স্থির হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরের ভিতর দিয়া ইংলণ্ড ও ইটালী উভয়েরই স্বাধীনভাবে যাতায়াতের সমান অধিকার থাকিবে। তা ছাড়া এখন যেসব স্থান ইংলণ্ড ও ইটালীর অধিকারে আছে তাহার কোন রদবদল হইবে না।

ভূমধ্যসাগর সম্পর্কে ইটালীর সহিত একটা বোঝাপড়া করিবার জন্ম ইংলণ্ডের উৎকণ্ঠার আরও একটা কারণ বিদ্যমান ছিল। স্পেনে আজ যে ঘরোয়া যুদ্ধ আন্তর্জ্জাতিক সমরের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, জার্ম্মাণী ও ইটালী এই ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র দুইটী তাহাতে প্রকাশ্যভাবেই বিদ্রোহী দলপতি ফ্রাঙ্কোকে সৈন্য-সামন্ত ও সমর-সম্ভার দিয়া সাহায্য করিতেছে। ইটালী যে একেবারে নিঃস্বার্থভাবে এই পরার্থ-পরতায় ব্রতী হইয়াছে, তাহা নহে। শুনা গিয়াছিল যে, ইটালীর এই সাহায্যের প্রতিদানে বিদ্রোহী দলপতি ফ্রাঙ্কো তাহাকে বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ এবং

মরক্কো দেশের কতকগুলি বন্দর ছাড়িয়া দিবে। স্পেনে ফ্যাসিষ্টদল শক্তিশালী হইয়া উঠিলে ভূমধ্যসাগরে ইংলণ্ডের বন্ধু ফ্রান্সের অবস্থা যে কাহিল হইয়া পড়িবে এবং ভবিষ্যতে ইঙ্গ-ইটালীতে যুদ্ধ বাধিলে ফরাসীর নৌবল ইংলণ্ডের বিশেষ উপকারে লাগিবে না, বৃটেন ইহা বেশই বুঝিয়াছিল। সেই কারণেই ভূমধ্যসাগরে আপনার স্বার্থ অটুট রাখিবার জন্য বৃটেন ইটালীর সহিত চুক্তি-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য এতদিন একটা সুযোগ সন্ধান করিতেছিল। উপরোক্ত চুক্তির ফলে বৃটেনের শঙ্কা আপাততঃ ঘুচিল বটে কিন্তু আবিসিনিয়ার টানাহ্রদে স্বার্থরক্ষার জন্য বৃটেনকে যেমন মৌন থাকিতে হইয়াছিল, ভূমধ্যসাগরে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি অটুট রাখিবার জন্য স্পেন বিদ্রোহেও এবার তেমনি নিরপেক্ষ থাকিতে হইবে।

স্পেনে গৃহ-বিবাদের প্রথমাবস্থায় বৃটেন, ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মানী, ফরাসী, পর্তুগাল প্রভৃতি শক্তিবর্গ মিলিয়া একটা নিরপেক্ষতার চুক্তি করিয়াছিল বটে কিন্তু সে চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষায় কেহই কোন গরজ দেখায় নাই; বরং অনেকে প্রকাশ্যভাবে তাহা ভঙ্গ করিয়া বিদ্রোহী দলপতিকে রীতিমতভাবে সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছে। বর্ত্তমানে বৃটেন ও ইটালীর মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হইল তাহাতে বৃটেন নিশ্চয়ই আর নিরপেক্ষতার নীতি লইয়া জার্ম্মানী ও ইটালীর সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিবে না। কিন্তু মাঝে হইতে ফ্রান্স বেচারা পড়িল বিষম প্রমাদে। স্পেন বিদ্রোহ যে পথে চলিয়াছে তাহাতে মনে হয় ফ্রান্স ও রুষিয়ার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য নব-অভ্যুদিত ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রগুলি এইবার ফ্রান্সকে ঘিরিয়া ধরিবে। স্পেনে ইটালী ও জার্ম্মানী যদি তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারে তাহা হইলে ভূমধ্য সাগরে ফ্রান্সকে একেবারে কাহিল করিয়া ফেলিবে। ইহাতে ফ্রান্সের পক্ষে আফ্রিকার সৈন্যদলের সাহায্য লাভও সম্ভব হইবে না। অধিকন্তু আফ্রিকার ফরাসী অফিসারগণ জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সহিত একটা গোপন ষড়যন্ত্র করিয়া ফ্রান্সেও ফ্যাসিষ্ট নীতি প্রবর্ত্তনের জন্য সচেষ্ট। ফ্রান্সের পপুলার ফ্রণ্টও শক্তিশালী নহে, কাজেই কোন মুহূর্ত্তে যে ফ্রান্সের উপর ভাগ্যদেবতার রোষদৃষ্টি আপতিত হয় তাহা কিছুই বলা যায় না।

এই সব দুর্ভাবনায় ফ্রান্সকেও এখন বাধ্য হইয়াই বৃটেনের নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। কারণ ফ্রান্সের মনেও আশঙ্কা আছে যে, যদি সে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে তাহা হইলে বন্ধু বৃটেন জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে তাহাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে বিগড়াইয়া বসিতে পারে।

বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষার দুশ্চিন্তায় ম্রিয়মান বৃটেন বৈষ্ণবী নীতি অবলম্বন করিয়া ভাবিতেছেন যে, এই ভাবেই তিনি শক্তিমানদের আবদারকে মানিয়া লইয়া বিশ্বব্যাপী সমরানল প্রজ্জলিত হইতে দিবেন না। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে শক্তিমানদের আব্দারকে প্রশ্রয় দিয়া বৃটেন যে তাহার যুদ্ধ বিরোধী নীতিতে সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিবেন তাহা মনে হয় না। স্পেনে নিরপেক্ষতার চুক্তি ভঙ্গে বিক্ষুব্ধ রুশিয়া স্পেন গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতেছে। সম্প্রতি জাপ-জার্ম্মানীতে যে চুক্তি হইয়া গিয়াছে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য নাকি সাম্যবাদী রুশিয়াকে দাবাইয়া রাখা। কিন্তু সেক্ষেত্রে শক্তিমান রুশিয়াও অবশ্য নীরব থাকিবে না। জার্ম্মানীর মতিগতি বুঝিয়া সেও আজ ভবিষ্যতের জন্য রীতিমত ভাবেই প্রস্তুত হইতেছে। এবং হার হিটলারের দম্ভোক্তির একাধিকবার নির্ভীক ও সমুচিত প্রত্যুত্তর দিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত জাপ-জার্ম্মানীর সন্ধির মূলে আরও একটা গভীর উদ্দেশ্য নিহিত থাকিতে পারে। প্রাচ্যে জাপ সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্নে জাপান বহুদিন হইতেই বিভোর। উত্তর চীনকে করতলগত করিয়া সে ক্রমেই সমগ্র চীনকে গ্রাস করিবার জন্য করাল বদন ব্যাদান করিয়া আছে। জার্ম্মানীর সহিত তাহার সন্ধির

উদ্দেশ্য কেবল সাম্যবাদী রুশকেই সায়েস্তা করা নহে, ভারতমহাসাগরে হল্যাণ্ডের যেসব দ্বীপগুলি আছে সেখানে সন্ধিবদ্ধ উভয় বন্ধুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। একেই তো চীনে জাপান ও আমেরিকার বাণিজ্য বিস্তারে বৃটেনের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হইতেছে। তার উপর জাপ-জার্মানী উভয়ে মিলিয়া ভারতমহাসাগর ও প্রশান্ত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া যদি সিঙ্গাপুরের সন্নিকটে ঘাটী গাড়িয়া বসে তাহা হইলে বৃটিশ সিংহকে যে বিষম প্রমাদ গণিতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

তারপর জার্মানীর লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে রুশিয়ার ইউক্রেণ প্রদেশের উপর। জার্মানী ও জাপান যদি রুশিয়াকে আক্রমণ করে তাহা হইলে চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত ফ্রান্সের পক্ষে তাহার নূতন মিতা রুশিয়াকে সাহায্য করা সম্ভব হইবে না। কারণ সেক্ষেত্রে জার্মানী ও ইটালী হয় তো তাহার ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে এবং সে দুর্দিনে বৈষ্ণব-বন্ধু বৃটেন হয় তো তাহার সাহায্যের জন্য একটী অঙ্গুলীও উত্তোলন করিবে না। বিশেষতঃ রুশের উপর বৃটেনের তো দরদের সীমা নাই, কাজেই জাপ-জার্মানীর চাপে রুশিয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িলেও বৃটেন নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে দেখি তফাতে নীতিই অনুসরণ করিবেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে শক্তিমান জার্মানী ও ইটালী এবং প্রাচ্যে জাপান যে বৃটেনের বৈষ্ণবী নীতিতে মুগ্ধ হইয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে না ইহা নিশ্চিত। সুতরাং আজ ভূমধ্যসাগরে বৃটেন ও ইটালী চুক্তি বন্ধনে আবদ্ধ হইলেও ভবিষ্যতের ভাবনা সে এড়াইতে পারিবে কি?

মাণিকজোড় লরেল হার্ডি

ষ্টান লরেল বলিতেছেন,—একটি বৎসর বেকার ছিলাম, সে সময় মায়ের মত যত্নে, নিঃস্বার্থ স্নেহে আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন শ্রীমতী বুন্। শ্রীমতী বুনের ছিল ঘর ভাড়া দেওয়া পেশা। তাঁকে আমি বলিলাম, বাড়ীভাড়া বা খোরাকী দিব, আমার এমন সংস্থান নাই। চাকরীর চেষ্টা করিতেছি চারিদিকে—কিন্তু নিত্য নিরাশা। এ কথায় সস্নেহ হাস্যে শ্রীমতী বুন বলিলেন—সেজন্য চিন্তা করো না বাবা—এইখানে তুমি থাক। যখন চাকরী মিলবে, টাকা পাবে, তখন আমায় ঘরভাড়া দিও, খোরাকীর টাকা দিও।

আজ দীর্ঘকাল পরে সে কথা মনে পড়িতেছে। অবস্থা ফিরিবামাত্র তাঁর টাকার ঋণ শোধ করিয়াছি—কিন্তু সে স্নেহের ঋণ জীবনে পরিশোধ হইবার নয়। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে স্মরণ করি।

বেকার জীবনের অবসান ঘটিল অকস্মাৎ টেড্ লিওর সঙ্গে সাক্ষাতে। টেডের নাম —টেডি ডেশমণ্ড—এখনও ইনি গ্লাসগো সহরে "প্যালেস্ থিয়েটার" চালাইতেছেন। তাঁকে আমার দুঃখদুর্দশার কথা বলিলে তিনি বলিলেন,—দু'জনে মিলিয়া এস না নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করি। টেডির বোন দিলেন তাঁর হাতে যা' কিছু সঞ্চয় ছিল,—নগদ ছ' পাউণ্ড এবং এই মূলধন লইয়া আমরা বার্টো গ্রাদার্স—কৌতুকাভিনয়ের ব্যবস্থা করিলাম।

এক দিন চান্স পাইলাম—রয়েল ভিক্টোরিয়া হলে অভিনয়ের জন্য। আমরা একটা পিপার মধ্যে আমাদের জোড়জোড় সরঞ্জাম ভরিয়া লইয়া যাত্রা করিলাম—কি প্রচণ্ড বর্ষা—সেই বর্ষায় আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা।

ভিক্টোরিয়া হলের মালিক ছিলেন একজন মহিলা। তাঁর নাম কুমারী লিলিয়ান বেলিশ। আজও এ হাউসের অধ্যক্ষতা তিনিই করিতেছেন। অভিনয়-কালে তিনি বক্সে বসিয়া দর্শকদের হাব-ভাব লক্ষ্য করেন। কোনখানে দর্শকদের ভাল না লাগিলে তিনি সঙ্কেতে তাহা জানান এবং তখনই 'পর্দ্দা' ফেলিয়া দেওয়া হয়।

আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ অভিনয়ের মাঝখানে পর্দ্দা নামিল না—কাজেই আমাদের সে সন্ধ্যার পারিশ্রমিক নগদ ছ' শিলিং পকেটস্থ করিয়া বিদায় লইলাম এবং পুনরভিনয়ের রঙ্গক্ষেত্র সন্ধান করিতে লাগিলাম। আর একজন সঙ্গী জুটিল—কৌতুকাভিনয়ে পটু তার নাম বব্ রীড। সে বলিল—আগামী সপ্তাহে রটারডামে ভ্যারাইটি সার্কাসে আমার আছে বুকিং—'এইট কমিক্স' নামে একাঙ্ক কৌতুক-নাট্য অভিনয় করিব। আমরা দলে আছি চারিজন—আরও চারটি সঙ্গী চাই। তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে?

বিদেশে যাইব অভিনয় করিতে—আনন্দ তাহাতে খুব। আট-ওয়ালে দল গড়িয়া উঠিল। ববরীড, তার স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে; টডলিও, তার স্ত্রী, আমি এবং অষ্টম সঙ্গী একজন ঘর ছাড়া

যুবক। যুবকটি কোন প্রকাণ্ড মঞ্চে অভিনয় করে নাই।

বটারডামে একটা সোমবারে আমাদের উদ্বোধন। সে দিন খুব তারিফ মিলিল। পরের দিন প্রচণ্ড বর্ষা নামিল—'শো' বন্ধ হয়ে গেল। পরের দিনও খুব বৃষ্টি—কাজেই সে দিনও অভিনয় বন্ধ। সারা সপ্তাহ ধরিয়া বর্ষা চলিল—আমরা বেশ মজায় রহিলাম। অভিনয় নাই,—ঘুরিয়া চারিদিক দেখিয়া বেড়াই।

শেষে সপ্তাহ শেষে বব গেল আমাদের বেতন আনিতে। কর্তৃপক্ষ বলিল—মাহিনা কিসের! প্লে বন্ধ গেলে মাহিনাও বন্ধ—নো প্লেলে, নো পে—এমনই ত সর্ত! সুতরাং আমাদের মিলিল এক সপ্তাহের প্রাপ্য বেতনের এক ষষ্ঠাংশ মাত্র।

উপায় নাই! দায়ে পড়িয়া মেয়ে ছেলেদের দেশে পাঠান হইল। আমরা তিনজনে ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া রহিলাম। পুঁজি সামান্য, খাদ্য সম্বন্ধে আশ্চর্য্য মিতব্যয়িতা রক্ষা করিতে লাগিলাম। খাইতাম ঘোড়ার মাংস সিদ্ধ। ঘোড়ার মাংস খুব সস্তা। চাকরী জুটিতেছিল না।

আমার ভাগ্যে আহার বাসস্থান মিলিল প্রচুর আনুগত্য স্বীকার করিয়া। একটা ছোট কাফে গিয়া মালিককে বলিলাম—কমিক-চাকর রাখিবে? খরিদ্দারদের হাসির খোরাক দিব। মালিক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল- কোন দরকার নাই—আমি নাছোড়বান্দা হইলাম। শেষে বলিলাম,—পরখ করুন। ভদ্রলোক নিরুপায় হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, দেখি তোমার বিদ্যা। একটু বিদ্যা দেখাইলাম; খরিদ্দারেরা আমার ভঙ্গিমা-অভিনয়ে খুব আমোদ উপভোগ করিল। মালিক আমাকে বলিল—কত মাহিনা চাও? বলিলাম,—এক পয়সা চাহি না। শুধু আহার আর আস্তানা। মালিক বলিল,—আচ্ছা থাক। আমি সে হোটেলে রহিয়া গেলাম ক্ষুধার পীড়ন ঘুচিল।

টেডিলিও পরামর্শ দিল, চল ব্রুসেলসে গিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করি। পথ দীর্ঘ, ধূলি-সমাচ্ছন্ন -আমরা হাঁটিয়া ব্রুসেলসে চলিলাম। গ্রীষ্মের তাপ ছিল অসহ্য রকম।

সেখানে গিয়া সর্ব্বপ্রধান মিউজিক হল দেখিতে গেলাম—উদ্দেশ্য যদি সেখানে চাকরি জুটাইতে পারি। নিরাশ হইয়া ফিরিতেছি—এমন সময় সেখানকার প্রোগ্রামে দেখিলাম, ছাপা আছে - সেভেন জ্যাকলি ওয়াণ্ডার্স, তখন আমরা ফিরিয়া গিয়া জ্যাকলি সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম—লাইসিয়াম প্যাণ্টোমাইম দলে তাঁর তখন খুব খ্যাতি। তাঁকে আমাদের অবস্থার কথা খুলিয়া বলিলে তিনি আমাদের হাতে নগদ কড়ি দিয়া বলিলেন—গাড়ী ভাড়া লও—লইয়া বাড়ী যাও। এ ভদ্রলোকের উপকার ভুলিবার বা পরিশোধ করিবার নয়।

ইংলণ্ডে ফিরিলাম। এখানে পিতৃ-নামের জোরে প্রিন্সেস থিয়েটারে একখানি নূতন নাটিকায় একটা বাজে ভূমিকা পাইলাম, মাহিনা প্রতি রাত্রি হিসাবে এক শিলিঙ। তখন সে শিলিঙ আমার কাছে হাজার টাকার তুল্য! সেই শিলিঙের জোরে প্রাণ রাখিলাম।

তারপর একদিন এম্পায়ার থিয়েটারের সামনে লিষ্টার স্কোয়ারে সহসা দেখা হইল আলফ্রেড রীভসের সঙ্গে। রীভস কহিল। কি হান! এখন কি করিতেছ? ওহেই এতে 'তারকা' হইয়াছ? আমি জবাব দিলাম। অভাবে শুকাইয়া মরিতেছি।

আমার জীর্ণ মলিন বেশভূষা ও পাণ্ডুর দীন মুখশ্রী দেখিয়া দরদ-ভরে আলফ্রেড বলিল: আর একটি কার্ণো কোম্পানী আমি খাড়া করিয়াছি। আমেরিকা যাইব, চার্লি চ্যাপলিন আসিতেছে, আমার দলে যোগ দিতে। ওরাকার আমার সঙ্গে যোগ দিয়াছে। তোমার খবর কি বল?

আমি কহিলাম। দুর্দ্দশার একশেষ। আমি বেকার।

আলফ্রেড বলিল। এস আমার সঙ্গে। মালিকের সঙ্গে দেখা করিবে। আমাদের দলে তোমায় গ্রহণ করিব।

একবার এই সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া আবার পর ফ্রেড কার্ণোর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করিতে আমার কেমন বাধিতেছিল, কিন্তু নাচার! নিরুপায়, আলফ্রেডের সঙ্গে আসিয়া ফ্রেড কার্ণোর সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিলেন। নীরবে বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর তাঁর মাথার বড় হাট খুলিয়া আমার মাথায় পরাইলেন, বলিলেন। বেশ ত! এ টুপি এখনও তোমার মাথায় বড় হয়! এ বারে মন দিয়া কাজ কর। উড়িও না। নিজেকে মস্ত লোক ভাবিয়া সরিয়া পড়িও না!

কহিলাম না—না। খুব শিক্ষা পাইয়াছি।

ফ্রেড কার্ণো আমায় দিল নগদ পাঁচ পাউণ্ড। বলিল, ভাল কাপড় চোপড় কিনিয়া চলিয়া এস। ক'দিনের মধ্যে আমরা যুক্তরাজ্যে যাত্রা করিব।

এই যাত্রায় চার্লি চ্যাপলিন আসিয়া যোগ দিলেন এবং আমরা দু'জনে হইলাম সাথের সাথী। এক কামরায় দু'জনে আস্তানা লইলাম

[illegible]

হোটেলে একখানি মাত্র কামরা লইয়া ছ'জনে বাসা বাঁধিলাম। নিজেদের খাবার নিজেরা রাঁধিয়া লইতাম। নহিলে আয়ে কুলায় না। শয়নকক্ষের গ্যাসের আলোর রান্না করিতাম। খুব গোপনে, ল্যাণ্ডলেডির অজ্ঞাতে। এক দিন রাত্রে ঘটিল বিঘ্ন। আমার কাজ চিরদিন নোংরা। চিরদিন আমি গৃহকর্মে অপটু। সে রাত্রে গ্যাসের আলোকশিখার উপরে বীনের টীন ধরিয়া সেটা গরম করিয়া লইতেছি, সহসা প্রচণ্ড শব্দে টিন গেল ফাটিয়া। টিনের টুকরা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সে শব্দে ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া হাজির। ব্যাপার দেখিয়া চটিয়া লাল! ভৎর্সনা করিয়া বলিল। কোথাকার কৃপণ! এমনই করিয়া আমার ঘরদ্বার পুড়াইয়া ছাই করিবে! বটে! নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইল, ঘরে কেহ রাঁধিতে পারিবে না। জল গরম করা পর্য্যন্ত চলিবে না। করিলে এ গৃহে ঠাঁই হইবে না।

কিন্তু সে আদেশ শিরোধার্য্য করিলে আমাদের দিন চলে না! আমরা খুব গোপনে রান্না সারিতে লাগিলাম। রান্নার শব্দ ল্যাণ্ডলেডি পাছে শুনিতে পায়, এ জন্য আমি রাঁধিতাম এবং রান্নাকালে চার্লি চ্যাপলিন বেশ জোরে বেহালা বাজাইতেন! যেন বাদ্যচর্চ্চা চলিয়াছে!"

এক দিন বাজনা শুনিতে শুনিতে গ্যাসের আগুনে আমি চপ ভাজিতেছিলাম। চপ গেল পুড়িয়া। দুর্গন্ধে ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিল। পোড়া চপ ফেলিয়া দিলাম এবং বাড়ীওয়ালীর গালির হাত হইতে রক্ষা পাইলাম।

হে বন্ধু বিদায়!

[শ্রীসুধীর রঞ্জন সেন]

ভাষা-হীন কথা যত অশ্রুনীরে আনমিত নিষ্পলক আঁখির সীমায়
নীরবে হারানো রার্ত্তে বেদনার অপরূপ প্রকাশের আকুতি জানায়।
ধরণীর সীমা-হারা মানস-বলাকা যত উড়ে যায় কল্পনা-পাখায়,
প্রথম-মিলন-তীর্থে স্বপনে জাগেনি যেথা হেন কথা: হে বন্ধু বিদায়!

মানস-সরস-যাত্রী আকাশের পথচারী রাজহংস-বলাকার দল
স্মৃতির সুরভি-রেণু বিজড়িয়া শুভ্রপক্ষে সংগোপনে এনেছে কেবল।
সমাপ্তির বুকে কোন্ পথিকের পদধ্বনি ধরে আনে বলাকার পাখা,
পশ্চাতের ধূলি 'পরে নিমেষের চিত্রপট পড়ে রয় অসমাপ্ত আঁকা।

জোছনা-আলোকময় যামিনীর নিরজন শ্যাম তরু-কুঞ্জের ছায়ায়
বনের সোহাগী মেয়ে স্বপনের সুরে ঝিল্লি নিদালীর নূপুর বাজায়।
তন্দ্রার পূজার অর্ঘ্য সে ছন্দ-দোলনে মোরা সঁপেছিনু অন্তরের পায়,
কালের সাগরতীরে সঞ্চয় রয়েছে তা'র, তবে কেন হে বন্ধু বিদায়!

সেদিন কী-কাণাকাণি কী-গোপন জানাজানি আকাশের তারায় তারায়,
বিশ্বের নাড়ীর সাথে প্রাণের সংযোগে মোরা ধরা পড়ে গিয়েছিনু হায়!
সীমার বন্ধন-হারা বিহগ-বিহগী সম নীড়খানি বাঁধিবার লাগি'
রূপালী পাখার বুকে চলার পাথেয়-ধন নিয়েছিনু মোরা অনুরাগী।

সত্য ও সুন্দর প্রেম লভেছিল পরিণতি মৃত্যুহীন আলোর নিলয়
হৃদয়ের বিনিময় অসীমের পানে ধায় নাই যেথা বিরহ সংশয়।
মনেরে জানায় মন সুনিবিড় আলিঙ্গন, ব্যথা শুধু কায়ায় কায়ায়,
কায়ার দেউলে দীপ ছায়ার অঙ্কন-রেখা লিখে যায়: হে বন্ধু বিদায়!

কায়া জেগে আছে যেথা মরণ শিয়রে সেথা, দেহ যেন প্রেমের কঙ্কাল;
বন্দিনী রাজার মেয়ে, আমি তব রাজপুত্র—রূপকথা থাক্ চিরকাল।
তেপান্তর মাঠে অশ্ব চলার উদ্দাম বেগে বিস্মৃতির ধূলি-আবরণ
যদি না টানিয়া দেয় সংসারের বুকে তবে সেইখানে আমার মরণ।

আমার কামনা যবে পাওয়ার বন্দনা হয়ে নেমে আসে দেহ উপকূলে
তোমার আঘাতে সেথা সহস্র তরঙ্গ হয়ে সত্য মোর সংশয়েতে দোলে।
চির-জানা অজানার পথ-রেখা খুঁজে যদি নাহি কভু কাঁদন জাগায়
কামনার লজ্জাহীন সে প্রকাশে প্রেম নাহি, মৃত্যু মাগে হে বন্ধু বিদায়।

সমস্ত ভুবনে মোর পরম সুন্দর তব অলক্ষিতে রূপের প্রকাশ,
তোমার অঞ্চল তলে আমার প্রদীপ জ্বলে বিরহেরে করেছে বিনাশ।
বজ্রের বিদ্যুৎ-দীপ্ত দুঃসহ বেদন যেন প্রকৃতির লৌহের শৃঙ্খল,
শ্যামল সৃষ্টির ভ্রূণে শ্রাবণ-সন্ধ্যার আঁখি বরিষণ গোপন সম্বল।

বাস্তবের রূঢ়নগ্ন নগ্নতার অন্তরালে তুমি নহ কামনার ধন,
কল্পনার স্বর্ণপটে সৃষ্টির চরমরূপে তুমি মোর সুন্দর স্বপন।
অতর্কিত অবসরে এ আকুতি চিরশান্তি লভে যদি শ্মশান শয্যায়
বিস্মৃতি-তিমির-তীরে নতশিরে অশ্রুনীরে মাগি আমি হে বন্ধু বিদায়!

জীবন যেথায় শুকায়ে যায়

(গল্প)

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়

অমলের কথা।

কলকাতা থেকে ক'দিন হল বাড়ী এসেছি। এখানকার আকাশ, বাতাসের কাছে পাই একটা মিষ্টতার স্বাদ, যা কলকাতায় কোনদিন পাবার উপায় নেই। গাছের মাথায় আবীর ছড়িয়ে পড়ে রাঙা সূর্য্যের সোণালী আভা, মাঠের সবুজ গালিচার ওপর ছড়িয়ে দেয় আকাশ তার আত্র শিশির বিন্দু চন্দ্রের রূপালী জ্যোৎস্নার সাথে হয় যেন স্তব্ধ রাত্রির গোপন আলাপন। চারিদিকে চেয়ে যেন মোহ লাগে।

ঘরের মধ্যে বসে একমনে সেদিন ছবি আঁকছি, কখন সূর্য্য অস্ত গেছে, খেয়ালই নেই। হঠাৎ মৃদু একটুখানি হাসির শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখি—মা'র সঙ্গে একটি তরুণী দাঁড়িয়ে। মা বল্লেন—বেলা যে গেল অমু, দিনরাত্রি ছবি এঁকে, চোখ দু'টী যে অন্ধ হয়ে যাবে!

হেসে বল্লাম—বেশ ত মা, তখন তোমার কোল ছেড়ে আর কোথাও যেতে হবে না!

মা বল্লেন—বালাই ষাট, ছেলের কথার ছিরি দেখ। আয় মা, আমরা যাই। তুই বাপু ছবি আঁক।

আড়চোখে চেয়ে দেখলাম—কিন্তু মেয়েটীকে চিনতে পারলাম না। গাঁয়ের মেয়ে নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু কে এ?

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় পা দিয়েছি মা ডাকলেন—একেবারে খাবার খেয়ে বেরুলিনে রে?

বল্লাম—ক্ষিদে নেই মা!

মা স্নেহ কণ্ঠে বল্লেন—দিনরাত এক জায়গায় বসে থাকলে কি ক্ষিদে হয়! হাঁ, ভাল কথা অমু, কলকাতায় কবে যাবিরে?

দেরী আছে মা।

বাইরে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। আস্তে আস্তে নদীর ধার পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলাম। নিজের জীবনের গত কয়েক বছরের কথা মনে পড়ল।…বাবা যখন বেঁচে ছিলেন—তখনই আমার বিয়ে প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল। একদিন যখন আমি কলকাতা যাওয়ার আয়োজন করছি, বাবা ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বল্লেন—অমু, আসছে মাসে তোর আমি বিয়ে দেব ঠিক করেছি—মেয়েটী বড় লক্ষী। বলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। বাবা চিরদিনই কম কথা বলতেন—আর তাছাড়া বেশী কথার দরকারও ছিল না। বল্লাম, আমি ত কোন দিনই আপনার অবাধ্য নই বাবা, যা আদেশ করবেন তাই হবে। বাবা আমার মাথার ওপর হাত রেখে মনে মনে বোধ করি শেষ আশীর্ব্বাদ করলেন—বল্লেন—নেমন্তন্ন রক্ষা করতে পাশের গাঁয়ে গিয়েছিলাম, মেয়েটীকে ভারী পছন্দ হল—একেবারে পাকা কথা দিয়ে এসেছি।…

কলকাতা থাকতেই একদিন নিদারুণ সংবাদ পেলাম—আমি পিতৃহারা হয়েছি। চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ী আসাই ঠিক করেছিলাম—মা বাধা দিলেন, বল্লেন—পুরুষ মানুষের বাড়ী বসে থাকা আমি পছন্দ করিনে। এখানে কিই বা আছে, যা আছে, তা আমি একাই দেখতে পারব।

এক বৎসর কাটবার পর যখন পুনরায় বিয়ের কথা উঠল, মেয়ের সম্বন্ধে কি একটা কাণাঘুষো শুনে, মা পিছিয়ে দাঁড়ালেন। বল্লাম—সেটা কি ভাল হবে মা? বাবা যা ঠিক করে গেছেন—তা পালন না করলে আমি যে প্রত্যবায় ভাগী হব।

কিন্তু মার স্বভাব জানতাম। যার সম্বন্ধে তাঁর মনে এতটুকু সন্দেহেরও অবকাশ জন্মেছে তার যে আর কোন রকমেই এ ঘরে আসবার সম্ভাবনা নেই, জেনে কেবল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলাম।…

মেয়েটীকে দেখে অবাক হয়েছি। যেমন মুখশ্রী তেমনি সাবলীল গতি। অজ্ঞাতসারেই মনের মধ্যে ভেসে উঠল; এমনি একটি মেয়েই যদি মাকে এনে দিতে পারতুম? বাবার মৃত্যুর পর মনের ভেতর থেকে সেই যে না-দেখা মেয়েটিকে নীরবে নির্ব্বাসনে পাঠিয়েছিলুম, ইচ্ছা নেই আবার সেই ধ্বংস স্তূপের উপর নূতন ইমারতের সৃষ্টি করি। মা দুঃখ করে কত দিন বলেছেন—আমিই তোর দুঃখের কারণ হয়ে রইলাম বাবা। দেশে কি মেয়ের অভাব আছে যে সেই মেয়েটিকেই বিয়ে করতে হবে? যদি অপরাধই করে থাকি, তার কি ক্ষমা নেই, তুই কি চিরদিনই এমনি থাকবি?

জবাব দিই—কেন তুমি দুঃখ করছো মা। বৌ নিয়ে ঘর করা, হয়ত তোমার অদৃষ্টে নেই। নইলে সমস্ত ঠিক করে বাবাই বা হঠাৎ চোখ বুজবেন কেন? তাছাড়া, আমিও ভেবে দেখেছি—যে জিনিষের সূচনাতেই সংসারে এমন বিপর্য্যয় ঘটে, সেদিকে পা না বাড়ানই শ্রেয়।

ক'দিন পরের কথা। ব্যবস্থা দিয়ে যাবার সময় শুনতে পেলাম, মা যেন কাকে বলছেন—আমার এই পাগল ছেলেকে নিয়ে কি করি মা, তাই হয়েছে ভাবনা। কোন দিন মুখ ফুটে বলবে না, কি ওর চাই, বা কি খেতে ও ভালবাসে। অথচ, কি যে ওর মন—দুঃখ পেলেই কি কাউকে বলবে? ভুলেও ভেবোনা যেন।

সরে এলাম। বুঝলাম স্নেহময়ী মার পুত্রগর্ব্ব উচ্ছ্বসিত ভাষায় আত্মপ্রকাশ করছে। ঘরের মধ্যে কে ছিল, ঠিক বুঝতে পারলুম না। তবে অনুমানে বুঝলাম—হয়ত শ্রোত্রী, সেদিনকার সেই তরুণীটিই হবে।

রাত্রে মা বল্লেন—আহা, খাসা মেয়েটি। দেখলে চক্ষু যেন জুড়িয়ে যায়। আর কি সুন্দর কথাবার্ত্তা! তুই ত আর বিয়ে করবি নে, নইলে—

বাধা দিয়ে বল্লাম—মেয়েটির ক্ষমতা আছে মা, এর মধ্যেই তোমায় জয় করে ফেলেছে। কিন্তু পরের মেয়ের ওপর তোমার এত লোভ কেন মা?

মা বল্লেন—কেন যে লোভ করি বাবা, তা যদি বুঝতিস! বুকের কাছে দাঁড়িয়ে বল্লে—মাঝে মাঝে যদি এখানে আসি, তা'হলে আপনি রাগ করবেন না ত মাসীমা! শোন মেয়ের কথা।—তিনি কি যেন একটা চেপে গেলেন।

একটু হেসে বল্লাম—কার কথা বলছ মা! যে মেয়েটি তোমার কাছে আসে, তাকে আবিষ্কার করলে কোথায়?

মা বল্লেন—ওমা, তাও জানিসনে! ওযে রূপদহের রায়েদের মেয়ে। শৈলকে তোর মনে আছে ত? ও সেই শৈলর সই।

অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—শৈল? সে আবার কে?

মা হাসতে লাগলেন। বললেন—পাগল ছেলে! শৈল রে? যার সঙ্গে ছোটবেলায় কত খেলা করেছিস! বিজয় হালদারের নাতনী। কলকাতায় যার বিয়ে হয়েছে।

এতক্ষণে যেন সমস্ত পরিষ্কার হল। ভাবলাম—তাই বটে! কত বছর আগেকার ঘটনা। তখন মন ছিল অপূর্ব্ব নেশায় মশগুল। জীবনপথে কত রহস্যময়ী নারীর সাথে হল আলাপ, কতজনের অভাবে মনের মাঝে জেগেছে ব্যথা, বিচ্ছিন্নতার তীব্রতায় অশ্রুধারা ঝরেছে অঝোরে। কিন্তু আশ্চর্য্য, এখন বিস্মৃতির গর্ভে সবই গেছে তলিয়ে। কতদিন অবাক হয়ে ভেবেছি জীবনে যাকে কোন দিনই দেখিনি, তার জন্যে কেনই বা মন এত উতলা হয়ে ওঠে!...মানুষের জীবনে সুখ দুঃখ যে পরস্পর বিরোধী। এক আসে এক যায়, হয়ত অনন্তকাল ব্যাপিয়া জীবনমঞ্চের এই আসা যাওয়া একেবারে অটুট এবং অক্ষয় হয়ে থাকবে।

মা বলতে লাগলেন—তুই তখন এখানে আসিস্ নি। শৈলদের বাড়ী গিয়ে মেয়েটিকে পেলাম। আহা, বাছার কেউ নেই। দুঃসম্পর্কের মাসীর কাছে থাকে। ভারী সুন্দর মেয়েটি।

কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। রূপদহ নামটির সঙ্গে যেন আমি অনেকদিন থেকে পরিচিত। কিন্তু সেই কি?

লীলার কথা—

কতদিনকার কথা। তবু আজও তা মনের মধ্যে জল জল করছে। ছোট বেলা থেকে কলকাতাতেই মানুষ হয়েছি। বিধবা মা'র মেয়ে হয়েও কোন দিন দুঃখের মুখ দেখি নি। মা যে বাড়ীতে কাজ করতেন, সেই বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে আমি স্কুলে পড়তে যেতাম। বাড়ীর কর্ত্তা, আদর করে আমায় 'মা' বলে ডাকতেন। একদিন রাত্রে মা'র সঙ্গে শুয়ে আছি। হঠাৎ আমায় নাড়া দিয়ে তিনি বল্লেন—"লীলা, জেগে আছিস্"?

বললাম—"কেন মা"?

তিনি বললেন—তোর মামীমা'র কাছে যাবি? চল দিনকতক ঘুরে আসি।"

আমি অবাক হলাম! মামীমার কথা জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এই প্রথম শুনলাম। উত্তর দিলাম—"সে কোথায় মা"?

"যেখানেই হ'ক, যেতে রাজী আছিস্ ত"?

"হ্যা, মা, খুব রাজী।"

ক'দিন পরেই কলকাতার বাস চুকিয়ে মামীর বাড়ী এলাম। মামীর বাড়ী মেটে ঘর। কিন্তু ভারী সুন্দর জায়গায়। বুড়ো মেসো মশাই তখন জীবিত ছিলেন বটে, কিন্তু বাতে পঙ্গু। মামীমা মাকে বল্লেন—"হ্যারে, লীলি ত বেশ বড় হয়েছে, ও'র বিয়ে দিবি কবে?"

মা বল্লেন—"পনর বছর ত মোটে বয়েস। বড় হ'ক তবে ত বিয়ে?"

মামীমা গালে হাত দিয়ে বল্লেন—"ওমা, সেকি কথা! কলকাতায় থেকে, তোরা যে একেবারে বিবি হয়ে গেছিস? এই ত বিয়ে দেবার সময়।"

আমি ও'সব কথায় কান দিতাম না। মা কেবল একদিন বল্লেন—"এখানে একটু সাবধানে থাকিস্ মা, পাড়াগাঁ।"

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, মনের মধ্যে যে সুপ্ত বাসনা নারী চিত্তের নিভৃত তলদেশে সঙ্গোপনে লুকিয়ে থাকে, তা'র অস্তিত্ব যে সেই দিনই প্রথম অনুভব করলাম—যেদিন আচম্বিতে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। শান্ত, সৌম্য শুভ্রকেশ বৃদ্ধের হাসিমুখখানি যেন এখনও চোখের সামনে ভাসছে। সারা অন্তর যেন জুড়িয়ে গেল—যখন তিনি আমার মুখখানি তুলে ধরে বল্লেন—"লক্ষ্মী, মা, আমার, তোমায় ঘরে নিয়ে যেতে পারব, এত সৌভাগ্য কি আমার হবে?"

বাড়ীর মধ্যে ঢোকবার পথে মা

আদুরী ভাবেই তাঁরা কাজ করে চলেছেন। শিল্পীরা খাটেন, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগেরই পেশা এই অভিনয়, কিন্তু পারিশ্রমিক যদি না পান তাহলে তারাই বা চালাবেন কি প্রকারে? এ বিষয়ে নির্মলেন্দু, দুর্গাদাস, জীবন গঙ্গো: প্রভৃতিদের অনুযোগ আমি বিভিন্ন পত্রিকায় পড়েছি—অথচ তার প্রতিকারের জন্য আজও কোন নূতন কর্মসূচী চোখে পড়ল না!

তবু নির্মলেন্দুর মত প্রতিভাশালী মঞ্চ শিল্পীর এভাবে অবসর লওয়া আমি পছন্দ করি না—তার উচিৎ কোন রঙ্গালয়ে প্রবেশ করা—তার যে স্থান হবে না তা আমি মনেও করতে পারি না। মনোরঞ্জন, যোগেশচন্দ্র, জীবন, রতীন, প্রভা, শেফালিকা প্রভৃতিরা এভাবে বসে থাকবেন না তা আমিও জানি—তারা হয়ত নূতন ভাবেই যাত্রা সুরু করবেন, না হয়ত অন্য কোথাও যোগ দেবেন, কিন্তু অন্যান্যদের সম্বন্ধে এরূপ আশান্বিত হওয়ার কারণ নেই। সরযূর মত অভিনেত্রীকেও বসে থাকতে হচ্ছে! পূর্বেই বলেছি বেশীদিন লোকলোচনের অন্তরালে থাকলে শিল্পী যত বড়ই হউন না কেন, সর্বসাধারণ তাকে ভুলে যেতে দেরী করেন না। বহুবার আমি প্রাচীনা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী সুশীলাসুন্দরী সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, তার সঙ্গে যোগদানও বাঞ্ছনীয়। আজকাল বর্ষীয়সী নারী চরিত্র অভিনয় করবার যোগ্য অভিনেত্রীর খুবই অভাব, সুতরাং এর প্রয়োজন রঙ্গালয়ের পক্ষে খুবই বেশী।

পোষ্যপুত্র ও দুর্গেশনন্দিনী

বহুদিন পোষ্যপুত্রের অভিনয় হয় না। এরা যদি নূতনভাবে আবার এর পুনরভিনয়ের আয়োজন করেন তাহলে সাধারণের ধন্যবাদভাজন হবেন। তাদের অভিনেতৃসঙ্ঘ যেমন প্রবল তাতে তাদের পক্ষেই এ আয়োজন সম্ভবপর। এভাবে ভূমিকা বণ্টিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যথা:—

শ্যামাকান্ত—অহীন্দ্র চৌধুরী, রজনীনাথ—নরেশ মিত্র, বিনোদ—রবি রায়, হেমেন্দ্র—ভূমেন রায়, ফটিকচাঁদ—জহর গাঙ্গুলী, বৈকুণ্ঠ—সন্তোষ দাস, শিবানী—নীহারবালা, না হলে শান্তি গুপ্তা, শান্তি—চারুবালা, ভূমেন রায়, বীরেন্দ্রসিংহ—রবি রায়, বিদ্যাদিগগজ—নরেশচন্দ্র, আয়েষা—নীহারবালা, না হলে শান্তি গুপ্তা, তিলোত্তমা—শান্তি গুপ্তা বা চারুবালা, বিমলা—নিরুপমা প্রভৃতি।

নাট্যনিকেতন

গোরা বেশ দর্শক আকর্ষণ করছে। অবান্তর বিষয়গুলি বাদ দেওয়াতে গোরা পূর্বাপেক্ষা উপভোগ্য হয়েছে।

শোনা যায় কিছুদিনের মধ্যেই এখানে একখানা পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক অভিনীত হবে।

'দিদি'র একটি দৃশ্য

সিদ্ধেশ্বরী—নিরুপমা, মণিমালা—দুর্গারাণী, তাকিয়াহরি—রাজলক্ষ্মী, বসুমতী—মনোরমা প্রভৃতি।

৺বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' বহুকাল অভিনীত হয়না, যদি নতুনভাবে এর নাট্যরূপ দিয়ে যোগ্য মহলা দিয়ে মঞ্চস্থ করা যায় তাহলে তা কিছুদিন চলবে বলেই মনে করি। এখানাও নাট্যনিকেতনে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভূমিকায় এরা নামলে ভাল হয়, যথা:—ওসমান—অহীন্দ্র, জগৎসিংহ—

নব নাট্যমন্দির

যোগাযোগ প্রতি শনি ও রবিবার অভিনীত হচ্ছে। শীঘ্রই এখানে একখানা নতুন সামাজিক নাটক অভিনীত হবে।

মিনার্ভা

পরশুরামে আশাতীত দর্শক সমাগম প্রতি অভিনয়ে হচ্ছে। ব্যাপার দেখে মনে হয় এই পরশুরাম মিনার্ভার এযাবৎ কার রেকর্ড ভঙ্গ করতে পারবে।

রূপমহল

চিৎপুরের রূপমহলে 'রূপকথা' অভিনীত হচ্ছে। শুনলাম—এরি মধ্যে নাকি অনেকে শিকল কাটতে আরম্ভ করেছেন —প্রথম নম্বর গায়ক মৃণাল ঘোষ। নারদরূপে ইনি দুখানা গান গাইতেন—এখন তুলসী চক্রবর্ত্তী সেই গান করেন। আগামী সংখ্যায় এদের রূপকথার পরিচয় দোব।

ষ্টুডিও সংবাদ

শ্রীভারতলক্ষ্মীর আলিবাবা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই রূপবাণীর রূপালী পর্দায় মর্জ্জিনারূপী নৃত্যপটিয়সী সাধনা বসুকে ভেসে উঠতে দেখা যাবে।

মতিমহল টকিজের 'রাঙা বউ' প্রায় অর্দ্ধেক তোলা হয়ে গেছে—পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ দ্রুত ছবি তুলতে পারেন।

জি, সি, টকিজের 'ইন্দিরা'র কাজও অনেকটা এগিয়েছে—তড়িৎ বসুর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যাতে এবার বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় যোগ্য মর্যাদা পায় তার চিত্ররূপের মধ্য দিয়ে।

কালী ফিল্মসের 'টকি অব টকিজ' গতকল্য ১৩ই জানুয়ারী শ্রীতে মুক্ত হয়েছে—যথাসময়েই পরিচয় দোব।

নিউ থিয়েটার্স

নিউ থিয়েটার্সের 'দিদি'র উভয় সংস্করণ দ্রুতগতিতে এগুচ্ছে—পরিচালক নীতিন বসুর এই ছবি দুখানা যাতে সারা ভারতে সমাদৃত হয় তারই চেষ্টা চলছে। পরিচালক হেমচন্দ্র 'অনাথ আশ্রমে'র হিন্দিরূপটী যাতে ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই শেষ হয় তারই চেষ্টায় আছেন—তারপর তিনি বাংলা নিয়ে পড়বেন। পরিচালক বড়ুয়া তার পরবর্ত্তী গল্পের কাহিনীগুলোর বিষয়গুলি শেষ করে ভূমিকা বণ্টনে মনোযোগী হয়েছেন। শীঘ্রই তিনি মহলা সুরু করবেন। এই কোম্পানীর ১৯৩৭ সালের কর্ম্মসূচী স্থির হয়ে গেছে, শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। আগামীকাল, ১৬ই জানুয়ারী হতে নিউ সিনেমায় মায়ার হিন্দিরূপ প্রদর্শিত হবে।

রাধা ফিল্মস

'লক্ষী দি হরিজন গার্ল' নামে একখানি ছবি সম্প্রতি তোলা হচ্ছে। তামিল ভাষাভাষী কয়েকটি নাম করা অভিনেতা অভিনেত্রী এতে চিত্রাবতরণ করছেন। তাঁদের মধ্যে কে, পি, পরশুরামা পিলাই, টি, পি, মানোজি রাও, জোকার রামুরু, এম, এস, রাঘব, সুন্দর বেকিয়াম, নাইডু এবং কুমালাই চোটাইয়ার প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন—মিঃ সি, জি, রমণ বি, এ, এল, এল, বি। হরিজন সমস্যাকে কেন্দ্র করে ছবির গল্পটি গ্রথিত হয়েছে।

ছিন্নহার

পরিচালক হরি ভঞ্জের পরিচালনায় অপরেশচন্দ্রের 'ছিন্নহারে'র চিত্র গ্রহণ সুরু হয়েছে। এতে অভিনয় করছেন, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, রেণুকা রায়, শান্তি গুপ্তা, মৃণাল ঘোষ, কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। প্রবোধ দাস এই ছবিখানি তুলছেন।

আশা করা যাচ্ছে পরিচালক কালী ঘোষ অতি শীঘ্রই 'অক্ষরের বিয়ে' নিয়ে মেতে উঠবেন।

বিষবৃক্ষ ও খুনী কৌন

বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ সগৌরবে রূপবাণীতে প্রদর্শিত হচ্ছে। বড়দিনের আসরে প্যারাডাইসে এই প্রতিষ্ঠানের হিন্দি ছবি 'খুনী কৌন' যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

শিল্পীর পরিণয়

বন্ধুবর সৈয়দ এহসান করিমের শুভ-বিবাহ গত ৭ই জানুয়ারী তার পার্কসার্কাসস্থিত ভবনে সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। রবিবার বৌভাত উপলক্ষে তার অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে পরিচিত কয়েকজন মঞ্চ ও চিত্র-শিল্পীকে দেখা গেল। ইনি কিছুদিন নির্ব্বাক ও সবাকচিত্রে এবং রঙ্গালয়ে অভিনয় করেছিলেন। নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের প্রীতিভোজনে পরিতৃপ্ত করা হয়। আমরা এই নবদম্পতির কল্যাণ কামনা করি, তাদের এই বন্ধন দৃঢ় এবং সুখের হোক।

বড়দিন সংখ্যা
শুক্রবার ২৫শে ডিসেম্বর
১৯৩৬

বড়দিন

সাধুর পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের বিনাশ, এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে এই পাপতাপভরা ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। গীতায় পার্থ সারথির মুখ নিঃসৃত এই শাশ্বত মাভৈঃ বাণীর সত্যতা আমরা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বযুগেই উপলব্ধি করিয়াছি। অনাচার ও অত্যাচারের ঘনান্ধকার বিদূরিত করিবার জন্য বাঙ্গালার নদীয়ার ভাগ্যাকাশে যেমন একদিন প্রেমময় মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছিল; অত্যাচার প্রপীড়িত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবের মরুপ্রান্তরে যেমন একদিন মহামানব মহম্মদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন—তেমনি পাশ্চাত্যের ধর্ম্মহীন ও প্রপীড়িত মানবাত্মার আকুল আহ্বানে একদিন প্রেমাবতার যীশুখ্রীষ্টের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সেই মহাপুরুষের প্রেমধর্ম্মমূলক উপদেশাবলীতে শিক্ষা ও সভ্যতাবিহীন পাশ্চত্যবাসী একদিন অধ্যাত্ম জ্ঞানালোকের সন্ধান পাইয়াছিল—তাঁহার জীবনের মহান আদর্শ তাহাদিগকে হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া সৌ-ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ হইতে, পাপী তাপী নির্ব্বিশেষে সকলকে কোল দিতে শিখাইয়াছিল। বড়দিন সেই মহাপুরুষেরই পুণ্যস্মৃতি পূতঃ জন্মদিন। সুতরাং এই দিনটী খৃষ্টজগতের একটী স্মরণীয় পবিত্র দিন।

যুগধর্ম্মের প্রভাবে বিশুর অনুগত ও ভক্ত শিষ্যমণ্ডলী তাঁহার প্রেমধর্ম্মের সে আদর্শকে বিস্মৃত হইয়াছে। জড়বাদ ও যন্ত্র বিজ্ঞানের যুগে আস্তিক্যবাদ ক্রমেই নাস্তিক্যের পথে অগ্রসর হইয়াছে। ইহকালসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য জাতি ইহকালের সুখ-সম্পদ ঐশ্বর্য্যলালসা এবং বিলাস-ব্যসনকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য ও সার ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। মহামানবের শিক্ষা দীক্ষার আদর্শ তাহারা ভুলিয়াছে। আত্মস্বার্থ সিদ্ধি ও প্রভুত্ব বিস্তারের দুর্ব্বার মোহে বিশ্বজনীন সৌ-ভ্রাতৃত্ব আজ বিদ্বেষের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। শক্তিহীনের উপর শক্তিমানের অত্যাচার উৎপীড়ন আজও নিবারিত হয় নাই, আর্ত্ত প্রপীড়িত মানবাত্মার মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস শক্তিহীনের চরণ প্রান্তে নিষ্ফল আবেদন জানাইয়া মহাশূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে।

আজিকার দিনটীতে সেই যুগমানবের মহান আদর্শের কথা স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি। খৃষ্ট জগত আজিকার দিনে উৎসব আনন্দ ও বিলাস ব্যসনের প্রাচুর্য্যের মধ্যেও তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষাকে স্মরণ করিয়া আবার তাহা সার্থক করিতে সচেষ্ট হউন; তবেই মহাপুরুষের জন্মদিনের উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

বিদায় বেলায়।

শ্রীশচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত

"অবশেষে নিজের কথা বলবার অবসর আমি পেলাম। ইংলণ্ডের কন্‌ষ্টিটিউশন সে-অবসর আমায় এর আগে দেয় নি। রাজা এবং সম্রাটরূপেও এতদিন যে-কর্ত্তব্য আমার অবশ্য করণীয় ছিল, মাত্র ঘণ্টা কয়েক আগে আমি তা শেষ করে ফেলেছি। আমার উত্তরাধিকারী হয়েচেন আমার ভাই, ডিউক অব ইয়র্ক। এখন রাজানুগত্য স্বীকারই আমার সর্ব্ব প্রথম কাজ। সমস্ত মন দিয়ে আমি তাই করচি"—ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজা অষ্টম এড্‌ওয়ার্ড সিংহাসন ত্যাগ করবার পর বেতারে এই বাণীই প্রচার করেছেন। মাত্র কয়েক দিন আগে যিনি ছিলেন সসাগরা অর্দ্ধ-পৃথিবীর অধীশ্বর, তাঁর স্ব-মুখের এই উক্তি শ্রোতৃদের চিত্তে বেদনাই জাগিয়ে তুলেছিল।

নিজের কথা বলবার অবসর তিনি আগে পান নি। কিন্তু যখন পেলেন, তখনই কি বলবার সব কথা তিনি বলে যেতে পারলেন? মনে হয়, বলবার তাঁর অনেক কথাই ছিল, কিন্তু বলা কিছুই হলো না! এই খানেই ট্রাজেডি।

* *

"আমার এ-কথা তোমরা নিশ্চয় বিশ্বাস করো যে, যে-নারীকে আমি ভালো-বেসেছি, তার সহযোগ এবং সাহচর্য্য ব্যতীত আমি রাজত্বের গুরুভার বহন করতে সত্যই অসমর্থ।"

এই কথা শুনলেই মনে প্রশ্ন ওঠে, কে তাঁকে তাঁর প্রেমের অধিশ্বরীকে জীবন-সঙ্গিনী হতে বাধা দিল? প্রধান মন্ত্রী বল্ড্‌উইন কি? ইংলণ্ডের মন্ত্রী-সভাই কি? জবাব তিনিও দিয়েচেন, বল্ড্‌উইনও দিয়েচেন। তিনি বলেচেন বল্ড্‌উইন বা মন্ত্রী-সভা তাঁকে বাধা দেন নি। বল্ড্‌উইনও বলেচেন, বাধা দেবার অধিকার তাঁর বা মন্ত্রী সভার বা পার্লামেণ্টের নেই। বাধা দেবার অধিকার যদি কারুর নাই থাকবে, তাহলে বাধা পড়ল কেন? কেন ইংলণ্ডের জন-প্রিয় নরপতিকে কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করবার পর জীবন-সঙ্গিনীর অভাবে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হোলো? রয়টারের টেলিগ্রাম, বিলেতের সংবাদ দাতারা এ প্রশ্নের সদুত্তর দেন নি।

* *

মনে পড়চে, টাইম্‌স যেন একদিন বলেছিলেন—"রাজা আভিজাত্যবিহীন কোন বংশের মেয়েকে বিয়ে করতে চান বলে আমরা আপত্তি করচি না। আমাদের আপত্তির কারণ এই যে, যে-রমণীকে তিনি বিয়ে করতে চান, তাঁর প্রাক্তন দুই স্বামী বর্ত্তমান।" তা'হলে কি বুঝতে হবে যে, ডিভোর্সকে টাইম্‌স্ নীতি-বিরুদ্ধ কাজ বলে মনে করেন? ঠিক এই ব্যাপারের পূর্ব্বে টাইম্‌স আর কখনো তা বলেছেন বলে শোনা যায় নি। যে-দেশে ডিভোর্সের ব্যবস্থা রয়েচে, যে দেশের সকল স্তরের সামাজিক নর-নারীই ডিভোর্সকে স্বীকার করে নিয়েচে, সে-দেশের নরপতি কেনই বা বিবাহ-বন্ধন-বিযুক্তা কোন নারীকে বিয়ে করতে পারবেন না? উত্তরে কেউ যদি বলেন যে, সাধারণ সামাজিক লোক যা করতে পারে, রাজা তা করতে পারেন না, তা হলে বলতে হবে এ-কথা বলতে পারে কেবল তারাই যারা রাজাকে দেবতা বলে জানে,—গণ-তন্ত্রের গরব যারা করে, যারা রাজাকে যথেচ্ছ চলবার বা বলবার অধিকার দিতে নারাজ, তাদের মুখে এমন কথা শোভা পায় না। কিন্তু মজা এই যে ইংলণ্ড এই কথাই বলেচে। আর ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজা এডওয়ার্ড ইংলণ্ডের এই উক্তি শুনেই সিংহাসন ছেড়ে দিয়েচেন।

* *

আজকার ইংলণ্ড আর যাই হোক, ডেমোক্র্যাটিক যে নয়—এই ঘটনা তাই প্রকাশ করে দিল। যারা ইংলণ্ডের ডেমোক্র্যাটিক রূপ দিয়েছেন, তারা মরে ভূত হয়ে গেছেন। ইংলণ্ড ডেমোক্রেসীর কাঠামো শুধু বজায় রেখেচে, তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। ইংলণ্ডের সমস্ত শক্তি আজিও রয়েচে আভিজাতদের হাতে, আভিজাতরাই আজও কামনারদের ঘাড়ে চেপে দেশ-শাসন করচে, কামনারদের মুখ দিয়ে বার করিয়ে নিচ্ছে নিজেদের কথা, কামনারদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে নিজেদের কাজ। মনে প্রাণে যদি ইংলণ্ড ডেমোক্র্যাটিক হোতো, তাহলে এই বিয়ের খবরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত, বলত—রাজা এডওয়ার্ড যেমন দেশের রাজা, তেমনি জনগণেরও হৃদয়ের রাজা। রাণী আভিজাত্যের মর্য্যাদাহীনা হলে জনগণের অফ্‌শোষের কি কারণ থাকতে পারে? কিছুই ত নয়।

* *

আজ তাই কেবলই মনে হচ্ছে, ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজাই যে কেবল তাঁর মনের কথা বলবার অবসর পান নি, তা নয়—ইংলণ্ডের সাধারণ প্রজারাও হয়ত

আজৌও মনের কথা বলবার ভাষা খুঁজে পায় নি! যে কনষ্টিটিউশান রাজাকে নির্ব্বাক রেখেছিল; সেই কনষ্টিটিউশানই জনগণকে আজও অবধি জাগবার, নিজেদের কথা বলবার সুযোগ দেয় নি। তারা যে দিন জাগবে, নিজেদের কথা কইবে, সে দিন ভিন্ন বাণী ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ পাবে। তাই এ-বিবাহ সম্বন্ধে বলতে ইচ্ছে হয়, ইংলণ্ড তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ত আজও প্রকাশ করেনি।

* *

রাজা এডওয়ার্ড অপেক্ষা করলেন না জাতির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানবার অভিপ্রায়ে। কেন না তিনি দেখলেন, তাঁর সিংহাসন ত্যাগই হবে সকলের পক্ষে শুভঙ্কর। যে-জীবন তাঁর পক্ষে দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছিল, সে জীবন যাপন করবার দুর্ভোগ থেকে অব্যাহতি পেয়ে তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। যে-রাজা প্রতিমুহূর্ত্তে স্বাধিকার হারাবার অস্বস্তি অনুভব করছিলেন, সে রাজা স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসন বরণ করে নিলেন বলে কনষ্টিটিউশানের কাঠামোর যাঁরা গরব করেন, তাঁরাও আসন্নপ্রায় ইউরোপের দুর্দ্দিনে ঘর সামলাবার সুযোগ পাবেন ভেবে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজা রাজত্বের লোভে যেমন তাঁর ভালবাসার পাত্রীকে পরিত্যাগ করলেন না, তেমনি রাজত্বের লোভে ইংলণ্ডকেও বিপন্ন করলেন না।

* *

পোর্টসমাউথ বন্দরে নীরব-নিশীথে সে দিন যে বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হয়ে গেল, তা দেখবার জন্য দর্শকরা সেখানে উপস্থিত ছিল না—কিন্তু ইংলণ্ডের আত্ম-বিস্মৃত জনগণ একদিন সেই মর্ম্মবিদারক বিদায়-অভিযান মানস-নয়নে দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে, যেমন ক্ষুব্ধ হতে হয়ে ছিল এককালে ফ্রান্সের জনগণকে নেপোলিয়নের বিদায়-অভিযান স্মরণ করে। সে দিন যে মহাপ্রাণ নরপতি ইংলণ্ডকে ভালোবেসেই ইংলণ্ডের মাটির মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন—ইংলণ্ডের ইতিহাস একদিন তাঁকেই দেবে জয়ের গৌরব। ইংলণ্ড পারে নি, এই বিংশ শতকেও, তার এক মহাপ্রাণ রাজাকে নিগড়ে আবদ্ধ রাখতে।

চলচ্চিত্রে "ক্লাসিক্" ছবি

শ্রীনরেন্দ্র দেব

দান্তে, ডিকেন্‌স্, সেক্সপীয়ার, গোটে প্রভৃতির রচনা বিশ্ব-সাহিত্যে 'ক্লাসিক' গ্রন্থরূপে গণ্য। পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষিত সমাজই এঁদের রচনার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। এই জন্য চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের বহুদিন থেকে লোভ ছিল এদের রচনাবলীকে ছবিতে রূপান্তরিত করবার। কারণ, যা বিশ্ববিদিত ও বিশ্বস্তুত হয়ে রয়েছে তাই নিয়ে ছবি করতে পারলে পৃথিবীর সকল দেশে যে তার চাহিদা ও সমাদর হবে এ সম্বন্ধে তাঁরা একেবারে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তবু যে এতকাল সেক্সপীয়ারকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে তাঁরা সাহস করেন নি, তার একমাত্র হেতু হচ্ছে, তাঁদের আশঙ্কা ছিল চলচ্চিত্রের পক্ষে এ প্রচেষ্টা হয় ত ধৃষ্টতা মাত্র হয়ে উঠবে। অর্থাৎ চলচ্চিত্রের শক্তি ও সম্ভাবনার উপর তাঁরা সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন না। বিশেষতঃ মূক ছবির যুগে কোনো কোনো দুঃসাহসী ও লোভপরবশ প্রযোজকেরা দু'চারবার এ প্রচেষ্টা করেও আশানুরূপ কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। সেও একটা কারণ! সেযুগে সেক্সপীয়রের বইয়ের মধ্যে একমাত্র "টেমিং অব দি শ্রু" নাটকখানির উল্লেখ করা যেতে পারে যা বক্স অফিসের সাফল্য আনতে পেরেছিল।

কিন্তু উচ্চাঙ্গের চিত্র বিচারে টিকিট-ঘরের ভীড়টাই যদি কোনো সমালোচকের চরম লক্ষ্য হয়ে ওঠে তাহলে তাঁর দ্বারা যথার্থ ছবির সমালোচনা হওয়া অসম্ভব! সুবিচারের পরিবর্ত্তে সেখানে অবিচার হবার সম্ভাবনাই ষোল আনা! "টেমিং অব দি শ্রু" লোকে ভীড় করে দেখতে গিয়েছিল বটে, কিন্তু সেক্সপীয়ারের তাতে এতটুকুও মর্য্যাদা বাড়ে নি। কারণ, 'ক্লাসিক' ছবি তোলবার কায়দা কানুন তখনও পর্য্যন্ত অনেকেরই অজ্ঞাত ছিল। এই জন্য নির্ব্বাক ছবির যুগে কেবলমাত্র সেক্সপীয়ার কেন—দান্তের—'ইনফার্ণো' গ্যেটের 'ফাউষ্ট' প্রভৃতি বইও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছিল।

সেক্সপীয়ারের "এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা" বোধ হয় "টেমিং অব দি শ্রু"র পর চিত্র জগতে কতকটা খ্যাতি অর্জ্জন করতে পেরেছিল। "মার্চ্চাণ্ট অব ভিনিসের"ও নাম করা যায় এই সঙ্গে। কিন্তু মুখর চিত্রের যুগে সেক্সপীয়ারকে নিয়ে প্রযোজক ও পরিচালকেরা একটু মুস্কিলে পড়েছিলেন। "হ্যামলেটের" ব্যর্থতার পর দীর্ঘকাল আর চিত্র-জগতে সেক্সপীয়ারের আবির্ভাব দেখতে পাওয়া যায় নি।

মুখর চিত্রে এই সময় ডিকেন্‌স্ খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর "টেল অফ টু সিটিজ" এবং "ডেভিড কপারফিল্ড" অপ্রত্যাশিত সাফল্য অর্জ্জন করায় চিত্র প্রযোজকদের লুব্ধ দৃষ্টি আর একবার সেক্সপীয়ারের দিকে ধাবিত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর "মিডসামার্স নাইটস্ ড্রিম" চিত্র-জগতে এক যুগান্তর এনে দিয়েছিল। সম্প্রতি "রোমিও জুলিয়েট" আর একবার চিত্রজগতের সকলকে সচকিত করে তুলেছে!

সেক্সপীয়ারের নাটক চিত্রে রূপান্তরিত করার প্রধান বাধা ছিল এর সুদীর্ঘ ছন্দোবদ্ধ বাচন! কি করে সেগুলি ছবিতে বসানো যেতে পারে এই ছিল প্রযোজক ও পরিচালকের নিকট এক দারুণ সমস্যা! 'রোমিও জুলিয়েটে' সে সমস্যার সমাধান হয়েছে। আর্ভিং থেলবার্গের বহুদিনের স্বপ্ন ও কল্পনা আজ চিত্রপটে সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠেছে! 'রোমিও জুলিয়েট' কেবলমাত্র যে চিত্রজগতের একখানি 'ক্লাসিক' ছবি হয়ে উঠেছে তাই নয়, 'রোমিও জুলিয়েট' সপ্রমাণ করেছে যে উপযুক্ত শিল্পীর সমন্বয়ে, কল্পনাকুশল শক্তিমান পরিচালকের অধীনে যত্ন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ছবি তুললে চলচ্চিত্রেও 'ক্লাসিক' ছবি সৃষ্টি করা যায়!

তারক গঙ্গোপাধ্যায়ের "স্বর্ণলতা" গিরীশ চন্দ্রের "প্রফুল্ল" বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" বঙ্গ-সাহিত্যে 'ক্লাসিক' রচনা বলে পরিগণিত।

জীবন স্রোত বহিয়া যায়

এক কূলে স্বামী, আর এক কূলে স্ত্রী

=মায়া=

চিরদুঃখিনী, অভাগিনী মায়া

দিনের পর দিন যায়, স্বামী হারাণো স্ত্রী-পুত্রের পথ চাহিয়া থাকে।

* =মায়া= *

কোথায়? তাহার সন্ধান কে বলিবে?

নিউ থিয়েটার্সের নূতন চিত্র

——মায়া——

চিত্রায় দেখুন

পরিচালক:
প্রমথেশ বড়ুয়া

চিত্র-শিল্পী:
বিমল রায়

শব্দ-যন্ত্রী:
বাণী দত্ত

সুর-শিল্পী
রাইচাঁদ বড়াল

—ভূমিকায়—

পাহাড়ী, যমুনা, সিতারা, আক্কুরী

যোকেন চট্টো, কৃষ্ণচন্দ্র দে

আমাদের লেখা

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

সাহিত্য নাম দিয়ে বা সাময়িক পত্রাদিতে আমাদের যেসব লেখা বেরোয় সে সম্বন্ধে আমরা একটা কথা খুব বড়াই করে বলে থাকি যে, স্পষ্ট কথা লিখতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করি না। অর্থাৎ এই কথা দ্বারা আমরা এই প্রমাণ করতে চাই যে, নির্ভীকভাবে সত্যকথা বলবার আমাদের সাহস আছে, অন্যদের নেই। কিন্তু বাস্তবিক আমাদের এই আত্মপ্রশংসা প্রকাশের ভিতর কতখানি সত্য আছে তা আলোচনা ও বিচার সাপেক্ষ।

যতকাল সাহিত্য ও সাময়িক পত্রাদির সহিত আমি বিশেষভাবে জড়িত ছিলাম তখন বহু লোকের বহু রচনা পাঠ করবার আমার সুযোগ হোত। তখনকার দিনের সেই সকল রচনা পাঠ করে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, আমাদের মধ্যে পড়ার অভাব খুব বেশী। আমরা অনেকে অনেক লিখি বটে, কিন্তু আমরা পড়েছি খুব কম।

পড়ার সঙ্গে লেখার একটা নিকট আত্মীয়তা আছে বলে পণ্ডিতদের মুখে শুনেছি এবং আমার নিজেরও তাই বিশ্বাস। না পড়ে ভাল লিখতে পারা খুব সহজ ব্যাপার নয়। খুব কম লেখকের সম্বন্ধেই এ কথা বলা চলে যে, তাঁরা পড়াশুনা না করেও ভাল লিখে গেছেন।

কিন্তু এ দেশের চিত্র-পটে তার অযোগ্য প্রযোজনা আমাদের শুধু পীড়া দিয়েছে! অপরিসীম ক্ষোভে ও লজ্জায় বারবার শুধু এই প্রশ্নই মনে জেগেছে—এরা কেন এই সব বই নিয়ে নাড়াচাড়া করবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে? নিজেদের অযোগ্যতা সম্বন্ধে কি এরা এতই অন্ধ! এখনো একখানা বটতলার বই যারা ভাল করে ছবিতে দেখাতে শেখে নি তারা 'ক্লাসিকে' হাত দেয় কোন সাহসে?......

মনে পড়ে যায়, সেই বহু প্রাচীন ইংরাজী প্রবচন—"ফুল র‍্যাসেস্ ইন্—"

হিসেব করলে সেরকম লেখকের সংখ্যা খুব কম, হয়ত সহস্রজনের মধ্যে একজনের নাম করা যায় কিনা সন্দেহ। এ আলোচনা তাঁদের নিয়ে নয়। তাঁরা শতকরা নিরানব্বই জনের মধ্যে পড়েন না। কাজেই তাঁদের নিয়ে আমাদের কথা নয়। আমাদের কথা বাকী নিরানব্বই জনকে নিয়ে—অর্থাৎ আমরা যারা সর্ব্বদা কাগজে, পত্রে গল্প, কবিতা, গান, প্রবন্ধ, কাহিনী, সমালোচনা বা নাটিকা লিখি। লিখি আমরা দুটি লোভে। এ লোভ মানুষ মাত্রেরই থাকা অস্বাভাবিক নয়। প্রথম লোভ আমাদের এই যে লোকে জানুক আমরা লিখতে পারি, দ্বিতীয় লোভ আমরা যা লিখি তা লোকে পড়ুক। এই দুটি কামনার মধ্যে কোন দুষ্ট প্রবৃত্তির চিহ্ন নাই। কিন্তু আমরা এটুকু ভেবে দেখি না যে, আমরা লেখবার পক্ষে কতখানি যোগ্য। আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও ভাষা প্রকাশের ক্ষমতা কতখানি আছে। এ গুলির দিকে আমরা লক্ষ্য করি না বলেই আমাদের লেখার মধ্যে নানা প্রকারের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। এর প্রধান কারণ আমরা পড়াশুনা করি কম লিখি বেশী। পড়া বলতে আমি বলছি না যে কেবলমাত্র ইউরোপীয় কন্টিনেন্টাল বা ভিন্ন দেশীয় কতকগুলি উপন্যাস বা নাটক পড়া। এ ছাড়াও বহু বিষয়, বহু পুস্তক, প্রবন্ধ, কাহিনী প্রভৃতি আমাদের পড়া আবশ্যক। এই পড়ার ভিতর দিয়ে আমরা নিজেকে ভাল করে জানতে পারি। আমাদের চিন্তার ধারা নূতন নূতন পথে প্রবেশ লাভ করে। আমাদের অভিব্যক্তির ভিতর নূতন পদ্ধতি ও সামঞ্জস্য প্রবর্ত্তিত হয়। আমাদের ভাষার জটিলতা দূর হয়, ভাষা প্রয়োগের ক্ষমতা বাড়ে এবং লিখিত বিষয় সম্বন্ধে একটি সুসংবদ্ধ ধারণা স্পষ্টভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

আমাদের মনে অনেক চিন্তা কল্পনার আকারে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় অবস্থান করে। অনেক সময় এক একটি সুন্দর কল্পনা সমূজ্জ্বল ভাবার মনের মধ্যে প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত নিজরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু নিজের মধ্যে চিন্তা করার শক্তি ও অভ্যাসের অভাবে সে সকল অস্পষ্ট ভাবগুলিকে আমরা হারিয়ে ফেলি। বহু চেষ্টায়ও আর সেগুলিকে মনের মধ্যে আনতে পারি না। এই অবস্থাটির জন্য আমাদের পড়ার দৈন্য দায়ী। বিদ্যা ও বিদ্যা প্রয়োগের শক্তির অভাব সেই জন্য স্পষ্ট আমাদের লেখাগুলির মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

যে কথা নিয়ে আমরা গর্ব্ব করি সেই স্পষ্টবাদিতা দুই প্রকারে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব হতে পারে। এক—রূঢ় অমার্জ্জিত ভাষার সাহায্যে, অপর—সংযত, সহানুভূতিপূর্ণ মার্জ্জিত সুষমাযুক্ত ভাষার সাহায্যে ত্রুটিবিচ্যুতি নির্দ্দেশপূর্ব্বক নির্ভুল পথ নির্দ্দেশ দ্বারা। এই দুই প্রকারের লেখার মধ্যেই স্পষ্টবাদিতা তার সম্পদ। কিন্তু সম্পদের স্বেচ্ছাচারিতাই পীড়াদায়ক। স্পষ্টভাষণকে কেবলমাত্র নিজের বাহবার জন্য ব্যবহার না করে অপরের সাহায্যার্থে ব্যবহার করাই শোভন ও কর্ত্তব্য। আমরা সচরাচর তা করি না: আমরা যা বলি তাতে আমাদের নিজেদের মতকেই জাহির করতে চেষ্টা করি, বহুর পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব কি না সে বিচার আমরা করি না। করি না শুধু যে ইচ্ছা করে তা নয়, আমাদের ভাববার, বিচার করবার শক্তির অভাব আছে বলেও খানিকটা। আমাদের লেখক হওয়ার মধ্যে আমাদের জীবনের সাধনার কোনো চিহ্ন প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে না। তার কারণ আমাদের এই লেখক জীবনের পেছনে বাস্তবিকই কোনো সাধনা থাকে না। থাকলে তার আভাষ পাওয়া যেতই। আমাদের লেখক হওয়াটা খানিকটা অকারণেই ঘটে ওঠে। কি করে যে আমরা লেখক হয়ে যাই তা আমাদের নিজেদের কাছে যেমন বিস্ময়ের

বিষয় হয়তো অপরের কাছেও তাই। কোথা দিয়ে কোন দিন কার সঙ্গে পরিচয় সূত্রে, কোন কাগজের সহানুভূতিতে যে আমরা লেখক হয়ে পড়ি ভেবে দেখলে আর লজ্জার সীমা থাকে না। আমাদের নিজের মধ্যে যে দৈন্য তাকে আমরা ঢেকে রাখবার চেষ্টা করি আমাদের বিপুল নির্লজ্জতা দিয়ে। স্থিরভাবে যারা আমাদের অগোচরে আমাদের চলাফেরা কথা-বার্ত্তা, হাবভাব লক্ষ্য করে তারা বোধ হয় নিতান্ত কৃপাপরবশ হয়ে অথবা নিতান্ত অযোগ্য বিবেচনা করেই আমাদের নিয়ে কোনো কথা বলে না। তা নইলে আমরা যা, তা আমরা নিজেরা ভুলে গেলেও আমাদের পাঠকরা তা ভোলে না।

আমাদের অধিকাংশ লেখাই ব্যক্তিগত মত ও অসারতায় পরিপূর্ণ থাকে। অথচ নিজেদের ব্যক্তিত্বের একটা মহিমময় পরিচয় তাতে কিছু পাওয়া যায় না। আমাদের এ অযোগ্যতাটুকু বুঝতে পারি এমন বুদ্ধিটুকুও যেন আমাদের নেই। আশ্চর্য্য আরও লাগে যখন দেখি বিদ্বান ও বিজ্ঞের বিনয়কে আমরা যখন অকাতরে অবহেলা করে নিজেকে লেখক বলে বিবেচনা করতে সঙ্কোচ বোধ করি না। এটি আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতার লক্ষণ। আমাদের বিদ্যার অভাবই এই নির্ব্বুদ্ধিতার আকর। আমাদের ধৃষ্টতা অপরিসীম, আমাদের দুঃসাহস অনির্ব্বচনীয়। আমাদের লজ্জাবোধের অভাব এত বেশী যে, আমরা কিছুতেই ভাবতে পারি না যে, আমরা কিছুই জানি না, লেখবার মত শক্তি আমাদের খুব কম এবং খুব অল্প বিষয়ই আমরা কিছু লিখে বলতে পারি। পরের কাছে নিজের লেখা প্রকাশ করবার যে একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচ যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে দেখা যায় তা আমাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। তাই আমরা আমাদের নিছক দুঃসাহসের জোরে যা ইচ্ছা, যথা ইচ্ছা যে বিষয়ে ইচ্ছা লিখতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করি না।

কিন্তু বাস্তবিক এই দুঃসাহসই আমাদের সত্যকার পরিচয় নয়। আমাদের লেখার হয় তো শক্তি আছে, কিন্তু তা বিদ্যার অভাবে ম্রিয়মান, সীমাবদ্ধ। তাই মনে হয় আরও পড়াশুনা করা আমাদের দরকার। আমরা যা পারি বলে বিশ্বাস করি তাকে আরও উজ্জ্বল, আরও সারবান করে প্রকাশ করবার উপযুক্ত আমরা কেন হব না? কেন নিজেদের ক্ষণিকের জীবনলোভী কীটের মত নিজের উৎফুল্লতায় নিজেকে চিরকালের মত ধ্বংসের পথে নিয়ে যাই? আমাদের যেটুকু বুদ্ধি আছে তাকে বিদ্যাচর্চ্চার দ্বারা আরও প্রখর করে তুলি, যেটুকু শক্তি আছে তাকে নানা দিক দিয়ে খাদ্য যুগিয়ে আরও উন্নত করে তুলি, এই তো আমাদের চাই। লেখাটাই আমাদের জীবনের বড় জিনিষ না হয়ে লেখা পড়ে অপরে আনন্দ পাক এইটেই আমাদের লোভের বস্তু হওয়া উচিত। তার জন্যে যোগ্যতা অর্জ্জনের যে কষ্ট ও সাধনার প্রয়োজন তা থেকে বিমুখ হলে আমাদের ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই হচ্ছে না।

একবার আমরা কল্পনা করতে চেষ্টা করি যদি যে, লোকে যখন আমাদের লেখা পড়ে তখন আমরা যদি সেখানে অদৃশ্য অবস্থায় উপস্থিত থাকতে পারতাম তা হলে কি দেখতাম? লোকে আমাদের লেখাকে কি ভাবে গ্রহণ করে আমাদের সম্বন্ধে তাঁরা কি ধরণের ধারণা পোষণ করেন তা তাহলে আমাদের অবিদিত থাকতো না।

পড়া ও লেখাকে সুসংবদ্ধভাবে প্রয়োগ করার মধ্যেই লেখার সার্থকতা। কিন্তু সে সার্থকতার প্রতি আমাদের মমতাও নেই, লক্ষ্যও নেই। আমাদের সম্বলের মধ্যে আমাদের অল্প-বিদ্যা আর আমাদের ধৃষ্টতা। ধৃষ্টতার মধ্যে নির্লজ্জতার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায় সত্য কিন্তু স্পষ্টবাদিতার তেজ ও যোগ্যতার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

নিউ থিয়েটার্স

আধুনিক চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড যে অল্প দিনের মধ্যেই সাফল্য-গৌরবে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। ১৯৩১ সালে একটী প্রাইভেট কোম্পানীরূপে প্রতিষ্ঠানটী প্রথম জন্মলাভ করে। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ইহার বর্ত্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টার সুবিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার মিঃ বি এন সরকার উত্তর কলিকাতায় চিত্র-গৃহ নির্ম্মাণ করেন। বাঙ্গালীর চিত্রগৃহগুলির মধ্যে চিত্রাই প্রথম। মিঃ সরকারের ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিভা যেমন এই চিত্রাগারটিকে আধুনিক যুগোপযোগী ভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাঁহার পিতা ভারত গবর্ণমেন্টের শাসন পরিষদের আইন-সচিব মান্যবর স্যর এন এন সরকার মহোদয়ের সহযোগিতা ও সদুপদেশ এবং কোম্পানীর সুযোগ্য আর্টিষ্টগণের নট-নিপুণতা ইহাকে সাফল্য-গৌরবে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

নিউ থিয়েটার্সের ষ্টুডিওগুলি ভারতের অপরাপর চলচ্চিত্র কোম্পানীর ষ্টুডিওর তুলনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও আধুনিক উন্নত ধরণের সাজ-সরঞ্জাম বিশিষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমানে কোম্পানীর তিনটী ষ্টুডিও ও একটী লেবরেটরী আছে। ইঁহাদের ফটোগ্রাফী ও শব্দযন্ত্রগুলি উচ্চ শ্রেণীর এবং বহু মূল্যবান। কোম্পানীর ছয়টী ইউনিট আছে, ইহাকে কোম্পানী এক সঙ্গে

উমা

অনায়াসেই ছবখানি ফিল্ম তুলিতে পারেন।

কোম্পানীর প্রধান ক্যামেরাম্যান মিঃ নীতিন বসু একাধারে ক্যামেরাম্যান ও ফিল্ম ডিরেক্টাররূপে যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তাঁহার হিন্দী চণ্ডীদাস, ধূপছাওন ও ভাগ্যচক্র যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের নিকট মিঃ বসুর নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তাঁহাকে সমগ্র প্রাচ্যের না হইলেও অন্ততঃ ভারতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্যামেরাম্যান বলিয়া বহু বিশেষজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

সাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার মিঃ মুকুল বসু মিঃ নীতিন বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া কনিষ্ঠও তাঁহার কর্ম্ম জীবনে যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন।

লেবরেটরীর ভার যাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছে, সেই মিঃ সুবোধ গাঙ্গুলী এই লাইনে সর্ব্ব পুরাতন এবং লেবরেটরীর কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও আছে। সম্পাদনা বিভাগে শ্রীযুত সুবোধ মিত্র বয়সে তরুণ হইলেও সম্পাদনা নৈপুণ্যে অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সঙ্গীত পরিচালক মিঃ রাইচরণ বড়ালের নাম আজ আর কাহারও অবিদিত নহে। তিনি নিউ থিয়েটার্সের ১নং ষ্টুডিওর সঙ্গীত পরিচালক। ২নং ষ্টুডিওর সঙ্গীত পরিচালক শ্রীযুত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য।

নিউ থিয়েটার্সের ফিল্ম ডিরেক্টারদিগের মধ্যে শ্রীযুত নীতিন বসু, পি সি বড়ুয়া, দেবকী বসু, হেমচন্দ্র, প্রফুল্ল রায়, এবং দীনেশরঞ্জন দাশের নাম উল্লেখযোগ্য। নীতিনবাবু হিন্দী চণ্ডীদাস, ডাকু মনসুর ও ধূপছাওন চিত্রে যশস্বী হইয়াছেন। রূপরেখা, দেবদাস, মঞ্জিল গৃহদাহ ও মায়া মিঃ বড়ুয়াকে চিত্রজগতে সুপরিচিত করিয়াছে। দেবকীবাবুর চণ্ডীদাস বাঙলার চিত্রজগতে তাঁহার নামকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। হেমচন্দ্রের মিলিওনেয়ার এবং প্রফুল্ল রায়ের পূজারিণ ও শ্রীযুত দীনেশরঞ্জনের বিজয়া এবং কয়েকখানি তামিল চিত্র তাঁহাদের প্রযোজনা নৈপুণ্যের পরিচায়ক।

নিউ থিয়েটার্সের শিল্পীদের মধ্যে নিয়ে আমরা মাত্র কয়েকজনের কিছু পরিচয় দিতেছি :—

নিউ থিয়েটার্সের সর্ব্বজন প্রিয়া অভিনেত্রী উমাশশী চণ্ডীদাসে রামীর ভূমিকাভিনয়ে সমগ্র ভারতে সুপরিচিতা হইয়াছেন। বাঙলা ছাড়া হিন্দী ও উর্দ্দুতেও তিনি সু-অভিনয় করিতে পারেন। চণ্ডীদাস, পুরাণ ভকত, রূপরেখা, কপাল কুণ্ডলা, ডাকু মনসুর, হিন্দী চণ্ডীদাস, ধূপছাওন ও ভাগ্যচক্রে তাঁহার অভিনয় নৈপুণ্য বাঙলা চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। মিঃ সাইগল প্রথমে টাইপিষ্টরূপে নিউ থিয়েটার্সে যোগদান করিয়া সুগায়ক ও অভিনেতা হিসাবে চিত্রজগতে আজ যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত চিত্রামোদীদিগকে সকল সময়েই মুগ্ধ করিয়াছে।

শ্রীযুত অমর মল্লিক নিউ থিয়েটার্সের গৌরবস্তম্ভ স্বরূপ। চণ্ডীদাস, কপাল কুণ্ডলা, চিরকুমার সভা, দেবদাস, মিলিওনেয়ার ও গৃহদাহ চিত্রে তিনি যথেষ্ট অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে "দিদি"তে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

নটরথী দুর্গাদাসের পরিচয় বাঙলার চিত্রামোদীগণকে নূতন করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। রঙ্গ-মঞ্চের ন্যায়, চলচ্চিত্রেও তিনি নট-নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তিনি মেঘাপাওলা, চণ্ডীদাস, কপাল কুণ্ডলা, মহুয়া ও ভাগ্যচক্রে অভিনয় করিয়াছেন এবং সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্সের "দিদি" চিত্রেও অবতীর্ণ হইয়াছেন।

নিউ থিয়েটার্সের সুদর্শনা ও জনপ্রিয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী চন্দ্রাবতী মীরা বাঈ, দেবদাস, পূজারিণ ও বিজয়া চিত্রে অভিনয় সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন। তিনিও নীতেন বাবুর "দিদি"তে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

নিউ থিয়েটার্সের অন্যতম অভিনেত্রী মলিনা দুলারী বিবি, পুরাণ ভকত, রাজরাণী মীরা, মীরাবাঈ, কারোয়াণ-ই-হায়াত, আফটার দি আর্থ-কোয়েক, মহুয়া, মিলিওনেয়ার এবং গৃহদাহ চিত্রে সু অভিনয় করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছেন।

সুকণ্ঠ গায়ক ও অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল বিভিন্ন চিত্রে অবতীর্ণ হইয়া অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি রাজরাণী মীরা, মীরাবাঈ, হিন্দী চণ্ডীদাস, কারওয়াণ-ই হায়াত, রূপরেখা, ইহুদী কী লেড়কী, পূজারিণ, হিন্দী দেবদাস, মিলিওনেয়ার, ভাগ্যচক্র, ধূপছাওন ও বিজয়ায় অভিনয় করিয়াছেন। মায়ায় বাঙলা ও হিন্দী উভয় সংস্করণেই

মায়ার একটি দৃশ্য

তাঁহার অভিনয় ও সঙ্গীত চিত্রামোদী-দিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে।

দেবদাসে যাঁহারা ভারতজোড়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন নিউ থিয়েটার্সের অন্যতম সুদর্শনা অভিনেত্রী যমুনার নাম তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। রূপরেখায় ইনি একটী ক্ষুদ্র ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন, দেবদাস, গৃহদাহ, মঞ্জিল এবং মায়ার বাংলা ও হিন্দী উভয় ছবিতে ভূমিকার অভিনয়ে ইনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

লীলা দেশাই সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। চিত্রজগতে তাঁহার এই প্রথম আবির্ভাব। ইনি প্রিয়দর্শনা ও সুধাকণ্ঠী। দিদি ও দি প্রেসিডেণ্ট ছবিতে নাট্যামোদীগণ ইঁহার কৃতিত্বের পরিচয় পাইবেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্না নর্ত্তকী কমলেশ কুমারী নিউ থিয়েটার্সের অন্যতম গৌরবস্তম্ভ, ইনি সুশিক্ষিতা। দি প্রেসিডেণ্ট ছবিতে তিনি প্রধানা নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহার ভবিষ্যৎ বেশ গৌরবোজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়।

এত বড় প্রতিষ্ঠানের বিবরণ আমরা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। কিন্তু একজনের কথা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। তিনি হইতেছেন এই কোম্পানীর প্রচার সম্পাদক শ্রীযুত হেমন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়। কোম্পানীর সুষ্ঠু প্রচার কার্য্যের অন্তরালে ইনিই রহিয়াছেন।

এদেশের থিয়েটার

শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র

বাংলা দেশের রসিক সমাজ এবং দর্শক সমাজ বর্ত্তমানে সিনেমা শিল্পের প্রতি যে রকম ভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছেন তাতে এ সময় থিয়েটারের কথা বলতে গেলে কেউ যে শুনবেন তা' মনে হয় না। অথচ রসের দিক দিয়ে বিচার ক'রে দেখতে গেলে থিয়েটারের সঙ্গে সিনেমার তুলনাই করা চলে না। বাংলা দেশের থিয়েটার ক্রমশঃ যে ভাবে ম্লান হয়ে পড়ছে তাতে মনে হয় যে কিছু দিন পরে এর অস্তিত্ব থাকবে কিনা সন্দেহ।

সিনেমার প্রতি অত্যুগ্র আগ্রহ হওয়ার একমাত্র কারণ অল্প খরচে, সুশোভন প্রেক্ষাগৃহে অল্প সময়ের মধ্যে দর্শকরা প্রচুর আনন্দ পেয়ে থাকেন, অথচ তার দ্বিগুণ মূল্য দিয়ে অতি কুৎসিত ও আড়ম্বরহীন প্রেক্ষা গৃহে বসে সে আনন্দ থিয়েটারে গিয়ে পাওয়া যায় না, ফলে আগ্রহ কমতে থাকে।

আর্ট থিয়েটার এবং শিশির কুমারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের থিয়েটারে যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল আজ তার বিন্দুমাত্র নেই, এর কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই যে দর্শক সমাজের ওপর রঙ্গ মঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষ অধিকাংশ সময়ে নানাভাবে অত্যাচার

করে এসেছেন। তাঁদের দিক থেকে যখনই নিষ্ঠার অভাব ঘটেছে তখনই দেখা গেছে যে রঙ্গমঞ্চে লোক সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। উপরন্তু নানা দিক দিয়ে তাঁরা যে অব্যবসায়ীর মত কার্য্য করেছেন তার তুলনা হয় না।

প্রকৃত নিষ্ঠা যদি থাকে তাহলে মৃতকল্প থিয়েটারও যে এ যুগে কিরূপ সজীবতার প্রকাশ দেখাতে পারে তার প্রমাণ মিনার্ভা থিয়েটার দিচ্ছেন। তাঁদের যতই যে ভাবে সমালোচনা করুন না কেন এ কথা আজ কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না যে তাঁদের আন্তরিকতা আছে। বাংলা দেশের কুড়ি বছরের ইতিহাসে যে ক'খানি বই অভিনীত হয়েছে সে গুলি হাতে করে গোণা যায় এবং নতুনত্বের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে এদের সংখ্যা হয় এত কম যে তা নিয়ে হৈ চৈ করাও বাড়াবাড়ি ঠেকে।

থিয়েটার এখনও বাঁচতে পারে যদি উপযুক্ত কোন ব্যবসায়ী পুরাতন দলের সঙ্গে সম্পূর্ণ না মিশে নতুন ভাবে একটি রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করতে ব্রতী হন। অবশ্য পুরাতন শিল্পীদের প্রতি অবিচার করার সমর্থন করতে পারা যায় না, কিন্তু তা হলেও নূতন শিল্পীদের আহ্বান করে এবং সু-সাহিত্যিক ও নাট্যকারদের সাহচর্য্য নিয়ে নতুন ভাবে রঙ্গমঞ্চ গড়ে তোলবার সময় এসেছে এবং এ কথা জোর করে বলতে পারা যায় যে এ ব্যবসায়ে লোকসান না হবার সম্ভাবনাই অত্যন্ত বেশী।

রূপবাণীতে 'বিষবৃক্ষ'

প্রযোজক: রাধা ফিল্ম কোম্পানী, কথা ও কাহিনী: ৺বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরিচালনা: ফণি বর্ম্মা, আলোক চিত্র-শিল্পী: বীরেন দে, শব্দ-যন্ত্রী: নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ, সঙ্গীত রচয়িতা: অখিল নিয়োগী, সুরশিল্পী: পৃথ্বীশ ভাদুড়ী। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন— অহর গাঙ্গুলী, কুমার মিত্র, ভূমেন রায়, জানকী ভট্টাচার্য্য, কানন বালা, শান্তি গুপ্তা, মীরা দত্ত, প্রমীলা বালা ইত্যাদি। চিত্র পরিবেশক: প্রাইমা ফিল্মস লিঃ। শুভ উদ্বোধন রূপবাণীতে মঙ্গলবার ১৫ই ডিসেম্বর '৩৬।

বিষবৃক্ষ স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা, এর কাহিনী বাঙ্গলার গৃহস্থ ঘরের এক করুণ মর্ম্মস্পর্শী আলেখ্য যা বাঙ্গলার পাঠক পাঠিকা মাত্রই জানেন। সুতরাং বিষবৃক্ষের গল্পাংশ এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এতবড় একটা হেভি প্লটকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করা কতবড় দুরূহ ব্যাপার তা সকলেই জানেন। 'বিষবৃক্ষে'র চিত্রনাট্য দেখে আমাদের মনে হ'ল, যিনি চিত্রনাট্য রচনা করেছেন তাঁর বোধ হয় সবে হাতে খড়ি। তা হলেও তাকে আমরা প্রশংসা করি, কারণ চিত্রনাট্যে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও ঘটনাটি এমন ভাবে সাজিয়েছেন যার জন্য দর্শকদের বুঝতে এতটুকুও বাধবে না।

পরিচালনায় ফণি বর্ম্মা আমাদের হতাশ করেন নি। তাঁর পরিচালনার দু'এক জায়গায় ত্রুটি থাকলেও, আর সব জায়গা বেশ ভাল ভাবেই সম্পন্ন করেছেন। আলোক চিত্রে বীরেন দে সাধারণ ভাবে ক্যামেরার হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়েছেন। প্রশংসনীয় তাঁর প্রথম দিকের ঝড় জলের দৃশ্যটি এবং আসল দৃশ্যপট থেকে ক্যামেরার দূরত্ব ব্যবধান। তবে একটি খুঁত তাঁর কাজে, যা আমাদের চোখে পড়েছে, সেটি হচ্ছে আলোক নিয়ন্ত্রণ। এই জিনিষটাকে ঠিক মত কন্‌ট্রোল করতে না পারার জন্য বীরেন বাবুর ক্যামেরার কাজে খুঁত থেকে গেছে। ভবিষ্যতে ছবি তুলতে হলে প্রথমেই যেন তিনি আলোকনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মাথা ঘামান। পরিস্ফুটনাগারের কাজ আরও উন্নত হওয়া উচিত ছিল। শব্দযন্ত্রী নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ ভালো ভাবেই গ্রহণ করেছেন—যা আমাদের উপভোগের কোন ব্যাঘাত জন্মায় নি।

সঙ্গীত রচয়িতা অখিল নিয়োগী তাঁর প্রত্যেক গানের কথা এত সুন্দর ভাবে লিখেছেন, যা আমাদের মানস পটে তাঁর গানের প্রত্যেক লাইন চিরাঙ্কিত হয়ে থাকবে।

পৃথ্বীশ ভাদুড়ী খুসী করেছেন গানের সুর দিয়ে। প্রত্যেক গানখানির সুর দর্শকদের কাছে শ্রুতিমধুর হয়ে উঠেছে। সাজ সজ্জা দৃশ্য পট প্রশংসনীয়। রাজেন দাসের সম্পাদনা অতি চমৎকার।

সবচেয়ে সুন্দর অভিনয় করেছে কুন্দর ভূমিকায় কানন—এমন কি তার অত্যুজ্জ্বল অভিনয় দেখে আমাদের মনে হল কানন নিজেকে বঙ্কিমচন্দ্রের মানস কন্যা কুন্দ ভেবেই বুঝি কুন্দর চরিত্রকে এত জীবন্ত

করতে পেরেছে। শান্তি গুপ্তার সূর্য্যমুখী ভালই হয়েছে। মীরার কমলমণিও মন্দ নয়। প্রমীলার হীরা আমাদের তেমন খুশী করতে পারে নি, কারণ—এই চরিত্রটি বিষবৃক্ষের একটি বিশিষ্ট চরিত্র। কিন্তু প্রমীলার মত সাধারণ মেয়েকে এই চরিত্রে নামানো পরিচালক মহাশয়ের মোটেই ন্যায় সঙ্গত হয় নি। নগেনের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলির অভিনয় স্থানে স্থানে খুবই ভাল হয়েছে। শ্রীশ-এর অংশে ভূমেন রায় চলন সই। দেবেন রূপে কুমার মিত্র এক রকম উৎরে গেছেন। জানকী ভট্টাচার্য্যের আচরণ চলনসই বলা যায়। মোটের ওপর রাধার বিষবৃক্ষ বিষফল প্রসব না করে অমৃত ফলই প্রসব করেছে।

কীর্ত্তিমান

রচনা ও পরিচালনা— অখিল নিয়োগী আলোক চিত্র—অচিন্ত্য ব্যানার্জ্জি শব্দযন্ত্রী—অবনী চ্যাটার্জ্জি। ভূমিকায়: ঠাকুর্দ্দা—তুলসী চক্রবর্ত্তী, খোকা—অজিত চট্টোপাধ্যায়, বন্ধু—পূর্ণেন্দু ভাদুড়ী, ডাক্তার—জানকী ভট্টাচার্য্য, বৌ—লক্ষ্মী, পিসিমা—চপলা প্রভৃতি। চিত্র পরিবেশক: প্রাইমা ফিল্মস লিঃ প্রথম মুক্তি—রূপবাণী ১৫ই ডিসেম্বর, '৩৬।

হাসির ছবির দিক থেকে "কীর্ত্তিমান" বেশ উপভোগ্য—ঠাকুর্দ্দার আদরের দুলাল, বাপের মাথার মনি,—পিসিমার নয়নতারা—খোকা...ঠাকুর্দ্দার পেন্সনের টাকা আনতে গিয়ে রেস্ খেলে কি করে সমস্ত টাকা নষ্ট করল এবং তারপর খোকা ঠাকুর্দ্দার চ্যবনপ্রাশ খেয়ে কী করে আফিন খেয়েছে বলে বাড়ীর সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিল সেইটাই এই গল্পের মূল ঘটনা। অখিল নিয়োগীর পরিচালনায় আমরা খুশী হয়েছি। তাঁর এ প্রথম প্রচেষ্টাকে সফল করতে পেরেছেন বলে আমরা তাঁকে আন্তরিক শুভাশীষ জ্ঞাপন করছি। ক্যামেরার কাজে অচিন্ত্য বন্দোপাধ্যায় সুন্দর হাতল ঘুরিয়েছেন। প্রশংসনীয় তাঁর সফট্ ফটোগ্রাফী, প্রশংসনীয় তাঁর আলোছায়ার সামঞ্জস্য বিধান জ্ঞান!

শব্দধর—অবনী চট্টোপাধ্যায় স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর তুলে আমাদের বেশ খুশী করেছেন। সঙ্গীত মন্দ নয়। অভিনয়ের দিক দিয়ে কারুর কৃতিত্বের ছাপ ফুটে ওঠে নি। মোটের ওপর হাসির কলধ্বনিতে কীর্ত্তিমান বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছে।

—শ্রীঅজিত সেন

রবীন্দ্রনাথের গোরা

[শ্রীঅখিল নিয়োগী]

'গোরা'র বিজ্ঞাপনী প্রসঙ্গে ক্যালকাটা থিয়েটার্স ঘোষণা করেছেন – 'গোরা' বর্ত্তমান যুগের মহাভারত।

এই মহাভারতের সমস্ত রস এবং সকল বিষয়-বস্তু বজায় রেখে তাকে সুষ্ঠু নাট্যরূপ দেওয়া যে কতখানি সম্ভবপর হ'বে— 'গোরা' দেখতে নিমন্ত্রণী পত্র পেয়ে, শুধু সেই কথাই ভাবছিলাম।

বলতে দ্বিধা বোধ কচ্ছি না যে, 'গোরা'র নাট্যরূপ দেখে রবীন্দ্র-সাহিত্য রস-পিপাসুগণ খুশীই হ'বেন।

বোধ করি নট নরেশ চন্দ্রের এই সর্ব্ব-প্রথম নাট্যরূপ দান। তাঁর প্রথম কাজ এমন একখানি জটিল গ্রন্থকে কেন্দ্র করে যে ফল উৎপাদন করেছে—তাতে বিস্মিত না হবার উপায় নেই! তিনি গোরা চরিত্রকে ফোটাতে গিয়ে আশেপাশের চরিত্রগুলির উপর এতটুকু অবিচার করেন নি। সুদক্ষ মালী যেমন সুপটু হাতের জল সিঞ্চনে সব রকম গাছে ফুল ফোটানোতে সাহায্য করে, সাহিত্য রসিক নরেশচন্দ্রও ঠিক তেমনি তাঁর রসানুভূতির দ্বারা— পরেশ, পানু বাবু, সুচরিতা, ললিতা, আনন্দময়ী, মহিম, বিনয়, অবিনাশ, মাসী প্রভৃতি প্রত্যেক চরিত্রটিকে···স্বীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রকাশিত হবার সুযোগ দান করেছেন।

'গোরা'—রবীন্দ্র প্রতিভার মধ্যাহ্ন-যুগে রচিত। যাঁরা বইখানি পড়েছেন তাঁরাই জানেন এই [illegible] সুদূর প্রসারিত। একটি চরিত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে অন্য চরিত্রকে ক্ষুণ্ন করবার যথেষ্ট কারণ আছে—এর নাট্যরূপ দানে। তাই ভয় ছিল নাট্যরূপ আমাদের আশানুরূপ হ'বে না। কিন্তু আবার বলছি নাটক গোরা আমাদের মনোরঞ্জন করেছে। সত্য বটে প্রথম অঙ্কের শেষ দিকে···নাটক হয়ে পড়েছিল একটু মন্থর··· কিন্তু কুশলী নট নটীর সাবলীল অভিনয়ে আবার তা' বেগবান হয়ে উঠেছে।

এইবার অভিনয়ের কথা একটু আলোচনা করা যাক।

'গোরা' অভিনয় যা' আমরা দেখলাম —তাতে 'পরেশ' চরিত্রই তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে ফুটে উঠেছে সকলের বহু ঊর্দ্ধে। অহীন্দ্র বাবু এই সৌম্য শান্ত···আপনাতে আপনি সমাহিত অপূর্ব্ব চরিত্রটিকে মূর্ত্তি দান করেছেন।

কথা তিনি বলেছেন অল্পই কিন্তু···তা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে···। অনেক সময় বেশী কথা বলার চাইতে না বলা যে অধিকতর কার্য্যকরী—পরেশ চরিত্রে আমরা তা' সম্যক উপলব্ধি করতে পারি।

পানু বাবু বেশে নরেশ মিত্রের অভিনয় —চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছে অনেকাংশে কিন্তু অতীতের কোনো একটি বিশেষ ভূমিকার অভিনয়েও আমরা তাঁর এই বাচন-ভঙ্গী লক্ষ্য করেছিলাম। এ বিষয়ে আমরা তাঁকে একটু অবহিত হ'তে বলি। অতুল্য একথা বলতে পারা যায় যে—এক দিকে নরেশবাবুর বীরত্ব এবং অন্য দিকে পানু বাবুর বাচালতা···নাটক খানিকে বেশ চমৎকার ভাবে···কবির রচনা অনুসরণ করে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

রবি রায়ের মহিম উল্লেখ যোগ্য এবং তা দর্শক সাধারণকে তৃপ্তিও দিয়েছে প্রচুর। কিন্তু অতি অভিনয়ের প্রলোভন ছাড়তে পারলে তাঁর সৃষ্টি আরো সাফল্য মণ্ডিত হয়ে উঠবে।

'গোরা' রূপী ভূমেন রায়ের কাছ থেকে আমরা যা' প্রত্যাশা করেছিলাম··· পেয়েছি তার বেশী। তবে একথা স্বীকার করতেই হ'বে যে গোরা সম্পর্কে কবির যে বর্ণনা আছে—তাতে ভূমেন বাবুকে একটুও মানায় নি। কিন্তু সেই ক্ষতি পূরণ করে দিয়েছেন তিনি অভিনয়ে।

রাজলক্ষ্মীর আনন্দময়ীর অভিনয় তাঁর পদ মর্য্যাদা এবং স্নেহশীলা মনকে চমৎকার রূপে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে।

জহর গাঙ্গুলীর বিনয় নিন্দনীয় ত' হয়ই নি, বরং তাঁর অভিনয় পদ্ধতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে আমরা খুশীই হয়েছি।

বরদা সুন্দরী বেশিনী মনোরমা প্রথম দিকটা আমাদের বেশ আনন্দ দিয়েছেন কিন্তু শেষাংশে তিনি তাঁর পদ মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারেন নি—কেন না অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে বরদা সুন্দরীর ভেতর দিয়ে আমরা 'রামী' 'শ্যামী'কে মাঝে মাঝে দেখতে পেয়েছি। তখন আর তাঁর বাচনে কিম্বা অভিনয়ে সেই 'আভিজাত্য-গৌরব' ফুটে ওঠেনি।

মেয়েদের মধ্যে সুচরিতার চাইতে ললিতাই আমাদের আকর্ষণ করেছেন বেশী করে…কি…অভিনয়ে…কি সহজ সরল সাবলীল গতি প্রকাশে।

সুচরিতা আরো পরিমার্জ্জিত হবার অবকাশ রাখে। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কয়েক রজনীর অভিনয়ের পরে শান্তি গুপ্তা এ দৌর্ব্বল্য কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

কৃষ্ণদয়াল বাবুর অভিনয় দেখবার বিশেষ কিছু নেই—কাজেই মণি ঘোষকে এবারের মতো শুধু গঙ্গা জল নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হ'বে।

ছোট খাটো টাইপ পার্টের ভেতর ললিত মিত্র, সন্তোষ দাস প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য।

অবিনাশের ভূমিকাটি চরিত্র অনুযায়ী অভিনীত হয়েছে। গোঁড়া ভক্ত যে সময় সময় কত ভীষণ হতে পারে…অবিনাশ চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ তা' চমৎকার রূপে ফুটিয়েছেন।

দৃশ্য পট সম্পর্কে এই কথা বলা যেতে পারে যে, বাহুল্য বর্ণ সাজসজ্জাকে বর্জ্জন করে চিত্র শিল্পী তাঁর নিপুণ তুলিকায় যা ফুটিয়ে তুলেছেন তা সর্ব্ব দিক দিয়ে প্রশংসা পাবার যোগ্য। ব্রাহ্ম সমাজের দৃশ্যটি চমৎকার হয়েছে। কিন্তু মনে হয় আলোচ্য নাটক আদি ব্রাহ্ম সমাজকে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল—কেননা তখন কেশব সেনের যুগ চলেছে।

রবীন্দ্রনাথের বই বলেই বলতে হচ্ছে যে—কতকগুলি ছোট খাটো ত্রুটি বিচ্যুতি চোখে পড়ল। যেমন নাকি—কৃষ্ণদয়াল বাবুর রোগের দৃশ্যে ঘরে আসবাব পত্রের অভাব। অত বড় লোকের অসুখ…ঘরে একটা টেবিলে পর্য্যন্ত রোগীর আবশ্যকীয় জিনিষ পত্র নেই! সত্য বটে পেছনকার দৃশ্যটি, ব্যবস্থার জন্যেই এর প্রয়োজন হয়ে ছিল, কিন্তু আমরা পরিচালক মহাশয়কে এ বিষয়ে অবহিত হতে বলি।

শেষ দৃশ্যে গোরা আর আনন্দময়ী যখন পরেশ বাবুর বাড়ী এলেন—তাঁরা দোতলা থেকে নেমে এলেন কেন?

আর একটি ছোট কথা—বইয়ে পড়তে যা' ভাল লাগে—নাটকে তা' সব সময় নয়—; অত বেশী খাবারের আমদানী না করলেও নাটকের অঙ্গ হানি হত না। মাসীর রূপ সজ্জা বিশেষ রূপে প্রয়োজন।

গোরা অভিনয়ে রবীন্দ্র নাথের যে গান-গুলি বেছে নেওয়া হয়েছে তা' চমৎকার। কিন্তু গাওয়া আরো ভাল হওয়া উচিৎ।

চিত্রানুরাগীগণ ছবিতে চার্লির গান শুনে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। নাট্য রসিকদের এই ফাঁকে—একটা সুসংবাদ দিয়ে রাখি, পরেশবাবু বেশে অহীন্দ্র বাবু এই বইয়েতে গুন্ গুন্ করে ললিতার সঙ্গে উপাসনার গান গেয়েছেন। হ্যাঁ, নতুন আকর্ষণ বইকি!

মোট কথা—গোরা সাহিত্যানুরাগীদের যে খুসী করবে—এবং একটা রমনীয় সন্ধ্যা যে এর অভিনয় দর্শনে মধুরতর হয়ে উঠবে—একথা অসঙ্কোচে বলা চলে।

কুমার বিশ্বনাথ রায়

৩১ নং ওয়ার্ডের সুযোগ্য ও সর্ব্বজন-প্রিয় কাউন্সিলার কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সদস্য, শিয়ালদহের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং শ্যামবাজারে কুমার আশুতোষ ইনষ্টিটিউসনের প্রতিষ্ঠাতা কুমার বিশ্বনাথ রায় মহাশয় গত অক্টোবর মাসের শেষ-ভাগে ভারত পরিভ্রমণে বাহির হইয়া-ছিলেন। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বহু তীর্থক্ষেত্র এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান পরিদর্শন করিয়া গত ১৮ই ডিসেম্বর তিনি কাশীপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। অল্প দিন হইল জন-সেবার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তিনি যে কর্ম্ম নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ভবিষ্যত অধিক-তর গৌরবোজ্জ্বল হইবেই মনে হয়। আমরা এই তরুণ ও সর্ব্বাঙ্গীন উৎসাহী জনসেবকের কর্ম্ম-জীবনের সাফল্য কামনা করি।
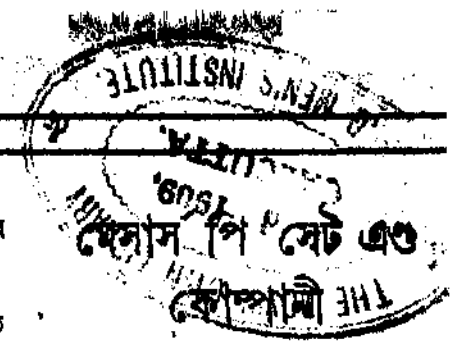
শিশুদের সর্দ্দি কাশি

ডাঃ পি, সরকার এম, বি

কিছু কাল পূর্ব্বে আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অধ্যাপক ডাঃ জন সাক্তাওয়েল বলিয়াছেন যে, জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে স্বাস্থ্যবান শিশুর উপর। পৃথিবীর কোন সুসভ্য দেশে শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীনতা ভারতবর্ষের মত আর কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। ইহা খুব সত্য, সাধারণের স্বাস্থ্য নির্ভর করে জাতির উপর।

ওয়াশিংটনে পাবলিক হেল্থ এসোসিয়েসনের এক অধিবেশনে কয়েক জন খ্যাত নামা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সমগ্র ইউরোপে পূর্ণ সুস্থকায় সবল শিশু কেবলমাত্র রাশিয়ায় দৃষ্ট হয়। যে সমস্ত জাতি বিভিন্ন দেশ হইতে রাশিয়ায় পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, ঐ দেশে শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এক কথা—"চিলড্রেন ফার্ষ্ট।"

আমাদের অভিশপ্ত দেশে প্রতি বৎসর হাজার হাজার অকালে শিশুমৃত্যু দেশের ও জাতীয় ধনসম্পদ হ্রাস করিয়া দিতেছে। জাতির সম্পদ জনশক্তির উপর নির্ভর করে, ইহা বিগত মহাযুদ্ধের সময় বিশেষভাবে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পরই যখন ইউরোপে পুরুষ সংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে হ্রাস পাইল তখন সদ্যাগত শিশুর প্রতি জাতির দৃষ্টি পড়ে। তাহাদের স্বাস্থ্যের দিকে, সুস্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছিল। ইহা সব দেশেই ধ্রুব সত্য যে শিশুগুলি জাতীয় পুনর্গঠনের কেন্দ্রস্থল।

বর্ত্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিকদিগের মত এই যে লোকে বংশানুক্রমের প্রভাবে রোগাক্রান্ত হয় না, তবে তাহারা রোগ প্রবণতার অধিকারী হয় বটে। শ্বাস যন্ত্রের ব্যাধি বা দুর্ব্বলতা অধিকাংশ বংশানুক্রমে পুত্র কন্যার হইয়া থাকে এবং কেহ কেহ এরূপ প্রতিপন্ন করিয়া থাকে যে, শোণিত সম্পর্কাধীন ব্যক্তিদিগের শ্বাস যন্ত্রের ঠিক একই স্থানে যক্ষ্মা বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। এ সব কারণ জন্ম শিশু জন্মাবধি সর্দ্দি কাশিতে ভুগিতে থাকে; এতদ্ভিন্ন শীত কালে গরম পরিচ্ছদ পরিধানের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিলে, বর্ষাকালে অনাবৃত অবস্থায় ভিজিবার ফলে কাশিতে থাকে।

এরূপ অবস্থায় খুব দ্রুত আরোগ্য লাভ করিতে হইলে এরূপ ঔষধের আশ্রয় লওয়া উচিৎ যাহার সাহায্যে রোগ বীজাণু সমূলে ধ্বংস পাইবে ও তৎসঙ্গে ফুসফুস যন্ত্র সুস্থ ও সবল হয়। অদ্যাবধি ফুসফুস ও শ্বাস প্রশ্বাস রোগে যত প্রকার ঔষধ বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে "সিরোলিন রচি" সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। ইউরোপের প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে গৃহ চিকিৎসার জন্য অন্ততঃ এক বোতল করিয়া "সিরোলিন রচি" স্থান লাভ করিয়াছে এবং যে সমস্ত জননী তাহাদের রোগীদিগকে "সিরোলিন রচি" সেবন করাইয়াছেন, তাহারাই ইহার গুণ ও উপকারিতা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন। "সিরোলিন" খাইতে সুস্বাদু বলিয়া শিশুরা বিনা আপত্তিতে সেবন করিয়া থাকে।

মেসার্স পি সেট এণ্ড কোম্পানী

স্বদেশী বিস্কুট ও বার্লি প্রস্তুতকারক মেসার্স পি সেট এণ্ড কোম্পানীর নাম আজ বাঙ্গলার, শুধু বাঙ্গলার কেন ভারতের ঘরে ঘরে প্রচারিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গলার এই স্বদেশী সাধনার যুগে মেসার্স পি সেট এণ্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র শেঠ মহাশয় যে সৃজনী প্রতিভা ও ব্যবসা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন বাঙ্গলার স্বদেশী শিল্পের ইতিহাসে তাহা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ইঁহাদের কারখানায় প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকারের বিস্কুট ও বার্লি উৎকৃষ্টতা ও বিশুদ্ধতায় যে কোন শ্রেণীর বিদেশী বিস্কুট ও বার্লিকে পরাজিত করিয়াছে। লিলি বিস্কুট যেমন বাজারে সর্ব্বজন সমাদৃত, বার্লিও তেমনি তাহার গুণের যোগ্য সমাদর লাভ করিয়াছে। ভারতের বহু প্রসিদ্ধ হাসপাতালে রোগীদের জন্য এই বার্লি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আধুনিক ব্যবসায় বিমুখ বাঙ্গালীদের পক্ষে লিলির কারখানা একটী তীর্থক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। আমরা এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানটীর অধিকতর সাফল্য ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শ্রমিক

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

বিরতি-বিহীন শ্রমে সারা দিনমান
খাটি মোরে খেতে হয় জীবন অবধি ;
আপনারে তিলে তিলে অনিচ্ছায় বধি
বাড়াই যাদের আমি সুখ, ধন, মান
তারাই ফিরায়ে দেয় হীন অপমান
নিঃসম্বল হেরে মোরে ভবের বাজারে ;
অবজ্ঞায় দীনজনে ঠেলিয়া আমারে
ধন দিয়ে মানুষের করে পরিমাণ।
রেল, কল, কারখানা, ডক্ আর খণি
রক্ত শুষে, মাংস অস্থি খেলে মোর খুলে ;
ছুটি নিলে রুটি যায় দয়া নাই মূলে ;
ব্যাধি হলে মৃত বলি লয় এরা গণি।
লাভ লভি' লোভী ধনী ঘরে চলি যায়
ক্ষুধাক্ষীণ অন্নহীন আমি মরি হায় !

———

লীলাবতী

[নাটক]

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

চরিত্র

ভাস্করাচার্য্য—জগৎ-বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ
রত্নেশ্বর—ঐ শিষ্য, পরে জামাতা
দেবদত্ত—ঐ শিষ্য
রাজা, মহামাত্য, স্নানার্থিগণ, বৈরাগী
প্রিয়ব্রতা—ভাস্করের বিধবা ভগিনী
লীলাবতী—ঐ কন্যা
স্নানার্থিনী, নর্ম্মসখীগণ

প্রথম দৃশ্য।

[আসন্ন সন্ধ্যা। লীলাকে ঘিরিয়া পুষ্প-বাটিকায় নর্ম্মসখীগণ গাহিতেছিল।]

দু'টি ফুল ফুটলো আজি এক শাখারি এক বোঁটাতে।
মলয়ার দোলার তালে এ-ওর বুকে চায় লোটাতে ॥
মধুকরীর গুঞ্জরণে
কত সাধই জাগ্‌ছে মনে
বুকের ভাষা ঠোঁট দিয়ে আজ নিরজনে চায় ফোটাতে ॥

১ম সখী। কেমন সখি ঠিক বলেছি কি না?

লীলা। মোটেই ঠিক না। তা এ নতুন গান খানি কোথা থেকে সংগ্রহ করলে সখি?

২য় সখী। তা বুঝি জান না? আজ তোমার বিয়ের বাসরের জন্যে মালবিকার একান্ত অনুরোধে দেবদত্ত রচনা করে দিয়েছেন। আমরা এখন এক বার সেটার মহলা দিয়ে নিচ্ছি।

লীলা। দেবদত্ত কি আজকাল জ্যোতিষ চর্চ্চা ছেড়ে কাব্য চর্চ্চায় মনোযোগ দিয়েছে! মালবিকার অনুরোধে বুঝি?

১ম সখী। না সখি, আমার অনুরোধে নয়, তোমার নাম করে বলতে সে অনুরাগ বশতই অনধিকার চর্চ্চা করে ফেলেছে।

লীলা। আর যেন না করে, বলে দিও।

২য় সখী। সখি দেখ দেখ, বর এদিকে আস্‌তে আস্‌তে ভিড় দেখে পালিয়ে যাচ্ছে!

৩য় সখী। ডাক্ ডাক্, একবার যুগল মিলনটা দেখে নিই।

লীলা। সখি, আমি এখন তাহলে যাই—

১ম সখি। কেন থাকই—না? কি সখি, মুখখানা যে রাঙা হয়ে উঠ্‌লো, আবেশে চোখ দুটি যেন মুদে আস্‌ছে, দুটি ঠোঁট ফেটে হাসি ঝর্‌ছে যে! বর এসে এ মূর্ত্তি দেখলে আর চোখ ফেরাতে পারবে না! কই, কে গেল ডাকতে?

লীলা। ডেকোনা সখি, তোমাদের মিনতি কচ্ছি। দরকার কি?

২য় সখি। বলি দরকার না হয় আমাদের নেই, তোমার তো আছে গো! শ্রীমতীর পূর্ব্বরাগ পর্ব্বটা তো এখনো ভাল করে জমবার সুযোগ পায় নি!

৩য় সখি। আজ পাবে। চাঁদ্‌নী রাতে দখ্‌নে হাওয়ায়, পাশে মনের মানুষ নিয়ে সখী আজ বাসর সাজিয়ে বস্‌বে—ওঃ, ভাবতে এখন থেকে আমার দেহ মাটি মাটি কর্‌ছে।

লীলা। সখি, তোমরা অন্য কথা বল, নয়ত আমি এখন যাই—

১ম সখী। তুমি রাগ করছ সখি? আচ্ছা আমরাই যাচ্ছি। তুমি একটু অপেক্ষা কর—বোধ হয় সে এখনি ঘুরে আসবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[কক্ষমধ্যে জলপাত্রের উপর ভাসমান সছিদ্রতল একটি পাত্রের পার্শ্বে লীলা বসিয়াছিল। বাহিরে সানাই বাজিতেছিল। ব্যস্তভাবে ভাস্কর আসিয়া প্রবেশ করিলেন।]

ভাস্কর। কে লীলা, তুমি এখানে? পাত্র পূর্ণ হয়েছে মা? এখনো হয় নি? কিন্তু হওয়া তো উচিৎ ছিল। আমার কেবলি মনে হচ্ছে লগ্ন অতীত হয়ে এল! রাত্রি প্রথম প্রহর কেটে গেল, বিবাহ সভায় স্বয়ং মহারাজ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত নিমন্ত্রিতেরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন। তবে কি আমার গননায় কোন ভুল হল, না লগ্ন নির্ণয়ে কোন ত্রুটি ঘটলো! নয় তো মা, দেখি একবার পাত্রটা পরীক্ষা করে—

[পাত্র পরীক্ষা করিয়া ভাস্কর হতাশা ব্যঞ্জক আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।]

নিয়তি, নিয়তি; পারলুম না মা,

তোকে রাক্ষসী নিয়তির বুক থেকে ছিনিয়ে রাখতে!

লীলা। কী হল বাবা, তুমি অমন ক'চ্ছ কেন?

ভাস্কর। তোর ভাগ্য চক্রের ছিদ্র মাথার মুকুটের মুক্তাকণা দিয়ে তুই নিজ হাতে রুদ্ধ করে দিলি মা!

লীলা। ছিদ্র বন্ধ হয়ে গেছে! কি হবে বাবা?

ভাস্কর। আমি বিবাহ দেব না। বন্ধ কর নহবৎ, দীপ নিভিয়ে দাও, এ উৎসব হবে না।

[নহবৎ বন্ধ হইল, ভাস্কর বাহিরে যাইতে-ছিলেন রাজা, মহামাত্য ও অনেকে প্রবেশ করিলেন।]

রাজা। কি হয়েছে ভাস্কর? এত উতলা হয়েছ কেন? কন্যা সম্প্রদান কর—

ভাস্কর। বিবাহ হবে না মহারাজ, লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আমার সাধনা ব্যর্থ হয়েছে—লীলার জীবনটাকে আর ব্যর্থ হতে দেব না।

রাজা। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

ভাস্কর। গননায় আমি দেখেছিলাম লীলা পতিপুত্রহীনা হবে। তাই বহু আয়াসে এমন লগ্ন নির্ণয় করেছিলাম, সে সময় বিবাহ দিলে তাকে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না; এবং এই সছিদ্র পাত্রের দ্বারা সেই শুভলগ্ন নির্ণয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু সেই ছিদ্র পথ লীলারই মাথার মুকুটের মুক্তা কণাতে বন্ধ হয়ে গেছে!

রাজা। নিয়তি! এ তোমার কন্যার নিয়তি

ভাস্কর। যদি সত্যই লীলার ভাগ্যে পতিপুত্রহীনতার কথা লেখা থাকে কারো সাধ্য নেই সে বিধান খণ্ডন করে।

ভাস্কর। আমি নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ করবো। একবার হেরেছি আবার চেষ্টা করবো।

মহামাত্য। তোমার মত পণ্ডিতের মুখে এ কথা শোভা পায় না ভাস্কর। নিয়তির বাধ্য কে নয়? সব জেনে শুনে আজ তুমি বালকের মত কথা বলছ!

রাজা। আমার অনুরোধ ভাস্কর, বিলম্ব না করে এখনি কন্যা সম্প্রদান কর। নিয়তির ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে একমাত্র কন্যার ওপর অবিচার করোনা।

প্রিয়ব্রতা। মহারাজের কথা অমান্য করো না দাদা। এতটুকু মেয়ে, ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ঝড় বার বার কি সইতে পারবে? ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর থেকে থেকে কেঁপে উঠছে!

দেবদত্ত। তাই করুন আচার্য্য, আপনি লীলাকে সম্প্রদান করুন। যদি বিধিলিপি অনুকূল হয়, রত্নেশ্বরের সঙ্গে তার এ মিলন সার্থক হবে।

ভাস্কর। তোমরা ত আমার অন্তরের বেদনা বুঝবে না! পাঁচ বছরের ছোট্ট একটি ননীর পুতুলকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে তার মা অন্তর্দ্ধান করলে! সে দিন থেকে মায়ের মমতা নিয়ে রাত্রি দিন তারই মুখ চেয়ে কাটিয়েছি। আমার ওপর অকুণ্ঠ নির্ভরতায় সেও আজ এত বড় হয়েছে। সেই লীলাকে, জেনে শুনে কেমন করে আমি সর্ব্বনাশের মুখে ঠেলে দেবো? তোমরা পিতার কর্ত্তব্যপরায়ণতার বিচার করছো, কিন্তু এই বুকের ভেতরকার মাতৃহৃদয়টার পানে একবারো তাকাচ্ছ না কেন? আমি যে একাধারে ওর মা-বাপ দুই-ই!

প্রিয়ব্রতা। কিন্তু বাগদত্তা কন্যাকে আমরাই বা কেমন করে ঘরে রাখবো?

রাজা। কোন উপায় নেই ভাস্কর, কন্যা সম্প্রদান তোমায় এখনি করতে হবে। সমাজের শিরোমণি হয়ে বাগদত্তা কন্যাকে কোন কারণেই তুমি নিজ অধিকারে রাখতে পার না।

মহামাত্য। আমরা তোমার শুভকাঙ্খী। আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করে মিছে একটা পারিবারিক অশান্তি, অশেষ উদ্বেগ ডেকে এনো না।

দেবদত্ত। বলুন আচার্য্য, আমরা আয়োজন সম্পূর্ণ করিগে—

ভাস্কর। তবে তাই হোক, আয়োজন করগে—লীলাকে আজই সম্প্রদান করি। নিয়তিরই জয় হোক!

রাজা। চল আমরা সভাস্থলে যাই।

[আবার নহবৎ বাজিল। পুরনারীদের শঙ্খ ও উলুধ্বনি শোনা গেল।]

তৃতীয় দৃশ্য

[বাসর। রাত্রি শেষ প্রহর। বাতায়ন পথে জ্যোৎস্না আসিয়া শয্যায় পড়িয়াছে। লীলার দেহলগ্ন হইয়া রত্নেশ্বর অর্দ্ধশায়িত ছিল।

রত্ন। লীলা—

লীলা। বল—

রত্ন। সখীদের আনন্দোচ্ছ্বাসের এতটুকু স্পর্শ কি তোমার মনে লাগে নি? মনকে কোন প্রকারে শান্ত করতে পার নি?

লীলা। এখনো পারিনি—চেষ্টা করছি।

রত্ন। আজকের দিনে মনে কোন দুশ্চিন্তাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। ভবিতব্য তো ভাবনায় খণ্ডন হয় না লীলা! মনে করো আচার্য্যের গণনায় ভুল ছিল। সছিদ্র জলপাত্রের কথা, ভ্রষ্ট-লগ্নের কথা ভুলে যাও।

লীলা। তুমি পুরুষ তাই জান না, নারী স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কা ভুলতে পারে না। সাবিত্রীও পারেন নি।

রত্ন। তবে কি একটা অমূলক বিভীষিকায় চিরকাল—

লীলা। বাবার কোন কথা অমূলক, এ প্রমাণ আমি আজো পাই নি—

রত্ন। আমিও না, কিন্তু বলছিলুম কি, বিবাহ যখন হয়ে গেছে তখন নিয়তির অমোঘ দণ্ডের জন্য আমাদের প্রস্তুত হয়েই থাকতে হবে। মিথ্যে হা-হুতাশ করে লাভ কি?

লীলা। বলেছি ত চেষ্টা করছি!

রত্ন। আজ একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হচ্ছে লীলা—

লীলা। কি বল।

রত্ন। আমায় গ্রহণ করতে তোমার অন্তরের সম্মতি পেয়েছ?

লীলা। সে কথা যদি আমার মুখে শুনে জানতে হয়, তবে থাক্—নাই বা জানলে!

রত্ন। আমার কেবলি মনে হচ্ছে, কত অযোগ্য জন এ মিলন! সারা ভারতের মুকুটমণি তোমার পিতা; রূপে গুণে ধন্যা সেই পিতার একমাত্র কন্যা তুমি, আজ নিজে এসে পথ যাত্রার সঙ্গী খুঁজে নিলে এমন একজনকে, যে আশৈশব মাতৃপিতৃহীন—আশ্রয়হীন—রূপে-গুণে ধনে-মানে ভাগ্যলক্ষ্মীর

কণামাত্র প্রসাদও যে পায়নি কখনো।

লীলা। তোমার কি হয়েছে আজ? কেন আমায় এত কথা শোনাচ্ছ? একটু আগে তুমিই না আমায় বল্‌ছিলে যে ভবিতব্য ভাবনায় খণ্ডন হয় না! আর বিবাহ কি কারো হাতে গড়া জিনিষ, যে ইচ্ছামত সেটাকে ভাঙা-গড়া যাবে! বাবা আমাদের দেবতা, তিনি যা করেন তাতে কারো অমঙ্গল হয় না—দেখে নিও—

রমু। আজকের দিনে একটা ভিক্ষা চাইব লীলা—বিমুখ করো না। একখানা গান শোনাও অনেকদিন তোমার গান শুনিনি।

[লীলা গাহিল]

আমার বুকের বীণা
পড়েছিল গীতি-হীনা
আঁধার ভরা এ মনো-মাঝে।
তুমি প্রিয় আসি' ধীরে
যতনে সে বীণাটিরে
তুলে নিলে আজি মধু-সাঝে॥
তোমার সুরের স্নেহে
পুলক উছলে দেহে
নয়নে ঝরে সে সুরধনী।
চিত্ত মোর ভীতি ভরা
বল বাণী দুঃখ হরা
আশায় বাঁধিব বুক, শুনি॥

চতুর্থ দৃশ্য

[নর্ম্মদাতীরে বহু স্নানার্থীর জনতা, বহু কণ্ঠের অনৈক্য গুঞ্জন]

১ম স্নাঃ। জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয় মহাদ্যুতিং ধান্তারিং সর্ব্ব পাপঘ্নং প্রণতঽস্মি দিবাকরম্।

২য় স্নাঃ। আরে ওই ছোঁড়া, সাঁতার শেখবার আর জায়গা পাসনি, না? সবে ডুব দিয়ে উঠলুম আর পায়ের জলটা গায়ে দিলি! এদিকে শাস্ত্রী মশায় আহ্নিক করছেন—কাদের ছেলে তুই?

স্নানার্থিনী। ওরে ও হাবলু, এদিকে আয় বাবা। ওদিকে সব বামুন পণ্ডিতরা রয়েছে- ছুঁসনে ওঁদিগে। ওরে ও হতভাগা, অত দূরে যাসনি—মরবি ডুবে এখুনি!

৩য়। ওঃ—ভীড়ও হয়েছে বাবা; একটু যে হাত-পা নেড়ে স্নান করবো তার জো নেই।

৪র্থ স্নাঃ। থাকবে কোত্থেকে? বারো বছর পরে এই মহাযোগ—পুণ্য সঞ্চয়ের লোভটা সবারই সমান। এখন তবু ঘাটে নেবে স্নান করতে পাচ্ছ, সকালে শুনলাম এর দ্বিগুণ ভিড় হয়েছিল। আরে রত্ন আসছে—রত্ন, ও রত্ন, ওহে এদিকে—এদিকে—

৩য় স্নাঃ। ওই একটি জলচর! সাঁতার পেলে আর জল থেকে উঠতে চাইবে না।

[রত্নেশ্বর ঘাটে নামিল]

রত্ন। কি হে কতটা পুণ্য অর্জ্জন করলে আজ? বখরা-টখরা দিও এই পাপাত্মাকে।

৪র্থ স্নাঃ। তুমিও তো সেই লোভে এসেছ হে। শক্তিমান তুমি, অর্জ্জন শক্তি আমাদের চেয়ে তোমার ঢের বেশী।

রত্ন। আমার এ স্নান তো নিত্যকর্ম্মের মধ্যে।

[ভিক্ষুকদের অনুচ্চ প্রার্থনা শোনা যাইতেছিল, তিন দিন খেতে পাইনি বাবা, কিছু ভিক্ষে দিয়ে যাও, আমার দুটি চক্ষু নেই বাবা, অন্ধকে দয়া কর ইত্যাদি। সহসা বহু কণ্ঠে 'গেল গেল, ধর'—]

স্নানার্থিনী। হাবলু, (চীৎকার করিয়া) ওরে হাবলু রে—বাবা আমার। ওগো তোমরা সবাই রক্ষা করো।

২য় স্নাঃ। ঐখানে ডুবেছে—ঐখানে, এই সাঁতার কাটছিল—

রত্ন। ওহে শীগগির চলো, তুলতে হবে ছেলেটাকে।

৩য় স্নাঃ। চল—চল—

১ম স্নাঃ। খবরদার কেউ ছুঁয়ো না—ও চণ্ডালের ছেলে!

২য় স্নাঃ। তবে থাক হে, দরকার নেই। আজকের দিনে আর স্পর্শদোষ ঘটিয়ো না।

৩য় স্নাঃ। রত্ন শুনছ?

স্নানার্থিনী। ওগো আমায় ছেড়ে দাও—ঐ যে হাত নেড়ে আমায় ডাকছে বাছা। ছেড়ে দাও—তোমাদের পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও আমায়। এখনো গেলে পাব—বাবা হাবলু, মাকে ছেড়ে কোথা গেলি বাবা? ওগো আমার যে আর কেউ নেই—আমার নীলমণি, আঁধার কুঁড়ের মাণিক, আমার চোখের তারা!

রত্ন। শুনতে পেয়েছি ভাই। তোমরা না যাও—আমি একাই চললুম। তোমাদের পুণ্য তোমাদেরই থাক, স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে তোমরা অক্ষয় স্বর্গ লাভ কর। আমি রাক্ষসী নর্ম্মদার বুক থেকে চাঁড়ালনীর শিশু-ভগবানকে ছিনিয়ে আনি! শাস্ত্রী মশায়, বাড়ী গিয়ে ভালো ক'রে স্মৃতি-টিতিগুলো উল্‌টে দেখবেন, কোথাও আমার জাতে রংপবার ব্যবস্থা পান কিনা। [জলে ঝাঁপ দিল]

১ম স্নাঃ। কে হে ছোকরা—ভাস্করাচার্য্যের জামাতা নয়? ভারী বাচাল ত!

৩য় স্নাঃ। ওই হে বোধ হয় পেয়েছে, ওই হাত নাড়লে না?

৪র্থ স্নাঃ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, রত্ন হাঁফিয়ে উঠেছে বোধ হয়—আমিও যাই—[ঝম্প]

সকলে। পেয়েছে—পেয়েছে!

স্নানার্থিনী। ভগবান তোমায় রাজা করুক বাবা, আমার চুলের পেরমাই নিয়ে বেঁচে থাক। বাবা হাবলু রে, ওগো এইবার আমায় ছেড়ে দাও—

২য় স্নাঃ। ছোকরা কি ডুবো-সাঁতার কেটে আসছে নাকি!

৩য় স্নাঃ। ঘূর্ণীর কাছে এসে রত্ন ডুবলো কেন?

৪র্থ স্নাঃ। [দূর হইতে] রত্ন ডুবেছে—ওকে বাঁচাও।

সকলে। ঘূর্ণীতে পড়েছে—গেল—গেল—বাঁচাও।

২য় স্নাঃ। ওঃ—ভাগ্যি বুদ্ধি করে ছেলেটাকে কেশবের হাতে দিয়েছিল নইলে ওটা শুদ্ধ যেত।

স্নানার্থিনী। কী সর্ব্বনাশ করলে ভগবান! আমার হাবলুকে বাঁচাতে গিয়ে জাত দেবতা জীবন দিলে, হায়—হায়—হায়!

১ম স্নাঃ। নিয়তি—নিয়তি! এত করে বারণ করলুম ছুঁসনে ছুঁসনে—কথা গ্রাহ্য করলে না! ফলবে না! কি বল ভায়া, নইলে আমরা উপস্থিত থাকতে ভাস্করাচার্য্যের জামাতা জলে ডুবে যায়—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্!

[পঞ্চম দৃশ্য]

[ভাস্করের বহির্বাটী; দেবব্রত ও ভাস্কর প্রবেশ করিলেন।

দেবদত্ত। এখনো মূর্চ্ছা ভাঙেনি?

প্রিয়ব্রতা। ভেঙেছে, তবে এখনো আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। কি দেখলে দাদা?

ভাস্কর। কি [illegible]র দেখবো বোন! দেখলুম নর্ম্মদাতীর এখনো লোকারণ্য, এখনো দলে দলে স্নানার্থিরা আসছে, যাচ্ছে, ভিক্ষারীরা তেমনি আর্ত্তনাদে

লোকের করুণা জাগাচ্ছে—নর্ম্মদা তেমনি উদ্বেল তরঙ্গ-ভঙ্গে গর্জ্জন করে চলেছে। কেবল সেই চণ্ডাল রমণী হারানিধি বুকে করে রত্নের উদ্দেশে শোক প্রকাশ কচ্ছে। দেবদত্ত উন্মাদের মত নর্ম্মদার বুকে অনুসন্ধানে নামছিল—আমি নিষেধ করলুম।

প্রিয়ব্রতা। কোন পাপে আমাদের এতবড় সর্ব্বনাশ হ'ল দাদা? এতটুকু মেয়ে কেমন করে আজীবন এই শোকের বোঝা বইবে?

লীলা। বাবা গো—

ভাস্কর। লীলা মা আমার! ওঠ মা!

লীলা। উঠতে পারছি না যে! আমার কি হ'ল বাবা?

ভাস্কর। সর্ব্বনাশ হয়েছে, কিন্তু কি করবি মা! এতে মানুষের তো কোন হাত নেই। চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি তা তো দেখছিস।

লীলা। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো বাবা। তোমাদের শাস্ত্রেই তো বলে স্ত্রীর কর্ত্তব্য সর্ব্বসময়ে স্বামীর অনুগমন করা। সাবিত্রীও তাই করেছিলেন।

ভাস্কর। হ্যাঁ, কিন্তু এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন মা?

লীলা। আমি অনুমৃতা হবো বাবা, তুমি ব্যবস্থা করে দাও।

প্রিয়ব্রতা ও দেবদত্ত। সে কি কথা লীলা?

ভাস্কর। আমার মেয়ের মতই কথা বটে! নিয়তি—নিয়তি! কিন্তু তা তো হয় না মা। তোমার স্বামী গেছে, আরো নানা কর্ত্তব্য তোমার মুখ চেয়ে রয়েছে। কথা নয়, এতদিন পুত্রাধিক

স্নেহে তোমায় মানুষ করেছি। এই মরণাপন্ন বুড়ো বাপকে, এই অনাথা পিসিমাকে, আমার সাধের চতুষ্পাটিকে, গৃহ-দেবতাকে কার হাতে সঁপে দিয়ে যাবি মা ?

লীলা। বুকের ভিতর একটা উদ্দাম ঝড় বইছে। তাকে শান্ত করবার শক্তি পাচ্ছি না! আর কি নিয়েই বা দাঁড়িয়ে থাকবো, একটা অবলম্বন না হ'লে কি মানুষ বাঁচতে পারে বাবা ?

প্রিয়ব্রতা। তুই ভাবিস নি লীলা, আমি যতদিন বাঁচবো তোকে বুকে করে রাখবো। মনকে একটু শান্ত কর মা!

ভাস্কর। সত্যি কথা। একটা অবলম্বন না হলে মানুষ বাঁচতে পারে না ; কিন্তু কি অবলম্বন তোকে দেব মা—

দেবদত্ত। আচার্য্য, লীলাকে গণিত শিক্ষা দিন। আপনার সাহচর্য্য পাবে, একাগ্র থাকলে চিত্ত-চাঞ্চল্য কমে যাবে।

ভাস্কর। ঠিক বলেছ দেবদত্ত, আমিও সেই কথা ভাবছিলাম। কাল থেকে তুমি আমার কাছে গণিতের পাঠ নেবে লীলা।

লীলা। বাবা, আমি বিধবা—স্বর্গগত স্বামীর প্রতি কি আমার কোন কর্ত্তব্য নেই ? তাঁকে ভুলে থাকলে আমি সতীধর্ম্ম হ'তে বিচ্যুত হবো না কি ?

ভাস্কর। ওরে না—না, আমি তোর গুরুজন—যা বলছি শোন্, এতে যদি তোর কোন পাপ হয়, আমি তার ফল ভোগ করবো। পাপ কি বলছিস লীলা, যতদিন ভারতে সতীর সম্মান থাকবে, লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে লীলাবতীর নাম উচ্চারণ করবে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

[লীলা কক্ষ মধ্যে শুইয়াছিল]

লীলা। পারি না যে! সবাই বলে তাকে ভুলে যা ; কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, আমার নানা কর্ত্তব্যের মধ্যেও মনের মণি-কোঠায় তার স্মৃতি উজ্জলতর হয়ে উঠছে। নারী কি স্বামীকে ভুলতে পারে! এক এক সময় চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হয়, জানতে ইচ্ছা করে আমার মত অভিশপ্ত জীবন নিয়ে ভারতে কটি মেয়ে জন্মেছে!

[ব্যস্ত ভাবে ভাস্কর প্রবেশ করিতে লীলা উঠিয়া বসিল]

ভাস্কর। লীলা—

লীলা। কি হ'য়েছে বাবা?

ভাস্কর। জানিস মা, আমার গণিতের পাণ্ডুলিপির কঠিন প্রশ্নমালার নীচে কে এমন সব সমাধান ক'রে রেখেছে?

[লীলা নিরুত্তর রহিল]

চুপ ক'রে রইলি যে! জানিস না বুঝি?

লীলা। আমায় মাপ ক'রো বাবা—আর কখনো এমন কাজ করবো না!

ভাস্কর। এঁ্যা—তুই করেছিস! আমি যে বিশ্বাস করতে পারছি না লীলা! এত অল্প দিনে এ যোগ্যতা কেমন ক'রে লাভ করলি মা?

লীলা। তোমরা যে যত্ন ক'রে শেখাচ্ছ বাবা, অতিবড় নির্বোধও এতে পণ্ডিত হয়

ভাস্কর। ওরে হয় না, হয় না—দেখছি তো এতদিন, এ মনীষা সচরাচর দেখা যায় না। শেখ মা তুই ভাল করে; গণিত শাস্ত্রে ভারতবর্ষ এক নারী প্রতিভা পেয়ে ধন্য হোক! আর হ্যা, আজকের এ স্মৃতিকে আমি সহজে ভুলতে দেবো না। আমার এ গণিতের পাণ্ডুলিপির নাম-করণ করলুম 'লীলাবতী'।

লীলা। তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে বাবা। নইলে তোমার 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' থেকে ছাত্রদের পাঠ দিচ্ছ —'চলো পৃথ্বী স্থিরা ভাতি'। পৃথিবী যে গোলাকার এবং সূর্য্যের চারিদিকে সেই পৃথিবী পরিভ্রমণ করছে তোমার এ সিদ্ধান্ত কেউ মানবে না। আবার আমার নাম নিয়ে—

ভাস্কর। তুই বলিস কি লীলা, যা সত্য তা লোকে মানবে না? ভাস্করের জ্যোতির্গনণা নিরর্থক হ'বে! তা হ'তে পারে না। আজ না হোক কাল, কাল না হোক, ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যে দিন শুধু ভারত নয়, সারা পৃথিবী আমার 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'কে মাথায় তুলে নেবে। তোর কি এতে সন্দেহ আছে মা?

লীলা। না বাবা, আমি কিছু মাত্র সন্দিহান নই। মানুষের এতখানি সাধনা কখনো নিরর্থক হ'তে পারে না।

ভাস্কর। তাই বল্ মা, আমি তোকে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি। আশীর্ব্বাদ কচ্ছি তোর এই সংযম, এই অধ্যবসায়, ঐকান্তিকতা সার্থক হোক। জগদীশ্বর তোর মনে শান্তি দিন।

[নেপথ্যে বৈরাগীর গান শোনা গেল—
কেমন করে ভুলবি অবোধ এতদিনের
ভালবাসা!]

লীলা। ও কে গাইছে!

ভাস্কর। সেই বুড়ো বৈরাগী মা, ওই যে এই দিকেই আসছে।

[গাহিতে গাহিতে বৈরাগী প্রবেশ করিল]

কেমন করে ভুলবি অবোধ এতদিনের
ভালবাসা?
চোখের আড়াল হলেই কি যায় যত দরদ,
যত আশা!
লোকে ভুলে যায় স্বপনে,
পথের দেখা রয়না মনে,
বাঁধলে বাসা মরুভূমে, তোলা কি রে যায়
পিপাসা!

[গান সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে
লীলা আর্ত্তনাদ করিয়া ভাস্করের
বুকে লুটাইয়া পড়িল]

লীলা। উঃ—বাবা গো—

ভাস্কর। কি হ'ল মা! লীলা—একি চেতনা হারাল! বৈরাগী, তুমি এখন যাও। ওরে কে আছিস্—প্রিয়ব্রত শীগগীর জল নিয়ে আয়, দেবদত্ত ব্যজনী নিয়ে এস—লীলা মূর্চ্ছিতা হয়েছে!

[যবনিকা]

ভারতের চিত্র ব্যবসায়

শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ, এম, এ, বি, এল

ভারতীয় চিত্র ব্যবসায়ীরা যদি এখন থেকেই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ না করেন ত' অচিরেই তাঁদের দুর্দ্দিন ঘনিয়ে আসবে।

দেশের যাঁরা শাসন কর্ত্তা—তাঁরা এদিকে কৃপা কটাক্ষপাত করতে কার্পণ্য করেন; ফলে বৈদেশিক চিত্র ব্যবসায়ীগণ এদেশে এসে এই সুকুমার শিল্পকে ভারতীয়দের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে প্রয়াস পাচ্ছেন। কাজেই মনে হয় এদেশের চিত্র নির্ম্মাতা, চিত্র প্রদর্শক এবং চিত্র পরিবেশকগণ, যদি এক যোগে অগ্রসর না হন ত তাঁদের উন্নতির আশা নেই।
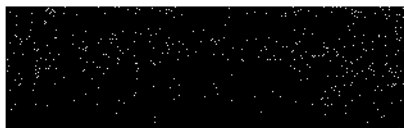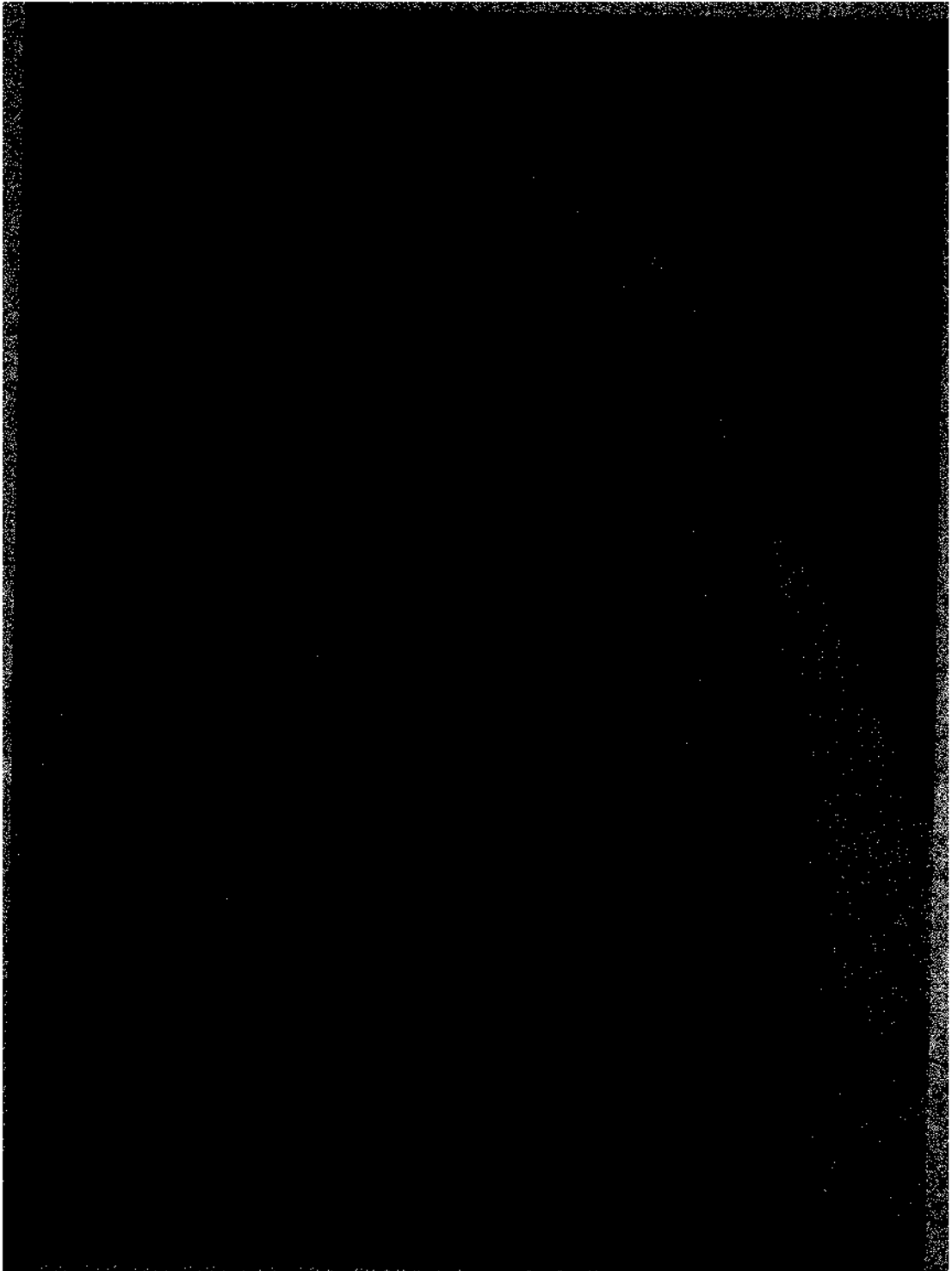
স্পেনে নারী জাগরণ

শ্রীসুরুচিবালা রায় চৌধুরী

কিছুদিন ধরে স্পেনে যে অন্তর্দ্রোহ চলেছে, সে ধ্বংস যজ্ঞে এতদিন কেবল পুরুষেরাই শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু আজ স্পেনের শক্তিরূপিণী নারীও রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে রণক্ষেত্রে আবির্ভূতা হয়েছেন। স্পেনের এই সঙ্কট সন্ধিক্ষণে দেশ ও জাতির প্রতি কর্ত্তব্যবোধের প্রেরণায় ঘর-সংসারের যত কিছু বন্ধন ছিন্ন করে তাঁরা সমর সাধিকারূপে এসে দাঁড়িয়েছেন পুরুষের পাশে। নারী হৃদয়ের দয়া, মায়া, মমতা, করুণা কোমলতা আজ আর তাঁদের অন্তরে স্থান পায় না। উন্মাদ ধ্বংস যজ্ঞে তাঁরা নারীর হৃদয় বৃত্তিগুলিকে ছিন্নমস্তার মতো নিজ হাতে বলি দিয়ে অরাতি সংহারে রুদ্রাণীরূপে আবির্ভূতা হয়েছেন। এর আগে ইউরোপের কোন রণক্ষেত্রে রমণীকে এমন রণ-রঙ্গিনী বেশে দেখা যায় নি।

স্পেনের এই যে নারী জাগরণ এ জাগরণ বড় বেশী দিনের নহে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও স্পেনীয় রমণীগণ সুষুপ্তির ক্রোড়ে মগ্ন ছিলেন। তখন সংসার জীবনই ছিল তাঁদের শ্রেষ্ঠ কাম্য। গৃহ ছিল সুখের আগার, মন ছিল বাহিরের চিন্তামুক্ত, প্রতি প্রভাতে রৌদ্রতপ্ত প্রাঙ্গণে বসে সংসার জীবনের অতি সাধারণ ঘটনাগুলির সমালোচনাই ছিল তাঁদের আনন্দের উৎস। সাধারণ শ্রেণীর মেয়েরা মাঠে ঘাটেও কাজ করতো। তাদের দেহ ছিল যেমন বলিষ্ঠ, মনও ছিল তেমনি সারল্য ও সদানন্দের আকর। কিন্তু জাগরণী গানের সুর তখনও তাঁদের কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে' এমন আকুল করে তোলে নি।

স্পেনীয় নারীদিগের মধ্যে প্রথম জাগরণের সাড়া পড়লো শ্রেণী সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়ে। সুপ্তির ঘোর গেল তাঁদের কেটে, সংসারের চিন্তাসক্ত মন বাইরের আলোকে পেল পথের সন্ধান। কিন্তু সব কিছু দেখার মতো দৃষ্টিশক্তি তখনও তাঁরা লাভ করতে পারেন নি। তখনকার যা কিছু দেখা তা পুরুষের দৃষ্টির সাহায্যেই দেখতে হতো, বুঝতে হতো তাদেরই সহায়তায়।

নিদমহলের রাজকুমারীর মতো মরণ-কাঠির স্পর্শে যারা ঘুমিয়েছিল জীয়ন কাঠির ছোঁয়ায় তারা জাগলো বটে, কিন্তু জাগা তাদের সম্পূর্ণ হলো না, তন্দ্রার ঘোর তখনও তাদের রেখেছিল আড়ষ্ট করে। সংগঠন বা সংহতি শক্তির প্রয়োজনীয়তা তখন তারা অনুভব করে নি, হয় তো তার প্রয়োজনও ছিল না। স্পেনের শ্রেণী সঙ্ঘর্ষে তারা সুপ্তিমগ্ন জীবনে প্রভাত-পাখীর গানই শুনেছিল, কিন্তু সে সুরে সাড়া দেবার জন্য তেমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে নি।

ইউরোপের মহাযুদ্ধের পর সারা বিশ্বে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের যে একটা উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল, স্পেনীয় রমণীগণও তার প্রভাব এড়াতে পারেন নি। সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে যাদের দৃষ্টি ছিল এতদিন আবদ্ধ এতদিনের অজানা বিশ্বের উন্মুক্ত দ্বারে তারা পেল প্রসারিত দৃষ্টি। বন্ধনের বেদনা সেদিন তারা নিবিড়ভাবে অনুভব করলে আর তারই ফলে মুক্তির চিন্তাও তাদের করে তুললে আনমনা। ঘরের মায়া তাদের জাগা মনকে আর ধরে রাখতে পারলে না। বিশ্বের ডাক তাদের অন্তরকে তুলেছিলো আলোড়িত করে। দিগন্ত প্রসারিত দৃষ্টিতে বাইরের পথ দেখতে পেয়ে গৃহবাসিনীরা এলো ঘর ছেড়ে পুরুষের অধীনত্বের নাগপাশ ছিন্ন করে মুক্তির আনন্দ—স্বাধীন জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে।

তারপর স্বাধীন জীবনের আস্বাদ জাগিয়ে তুললো স্পেনীয় নারীদের অন্তরে রাজনৈতিক অধিকার- লাভের বুভুক্ষা। স্পেনের নারী-জীবনে তখন যৌবনের জলতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত—যৌবনের সে উদ্দামতাকে সুষ্ঠু পথে নিয়ন্ত্রিত করে লক্ষ্য স্থলে উপনীত হবার জন্য নেত্রীত্বের ভার নিলেন স্পেনের কয়েকজন সম্রান্ত মহিলা। কিন্তু শক্তি এতদিন যাদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল - সেই শক্তিমানেরা সহজে তার অংশ দিতে চাইলেন না। নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম স্তরে সকল দেশেই যা ঘটে থাকে স্পেনেও তার ব্যতিক্রম হয়

নি। কিন্তু তবু যৌবনের সে জলতরঙ্গ নিরুদ্ধ হয় নি। ইতিমধ্যে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে স্পেনে সামরিক এক নায়কত্বে নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতির পথে এল এক পর্ব্বত প্রমাণ বাধা। পদে পদে নিগ্রহ ও লাঞ্ছনায় বেদনায় স্পেনের নব জাগ্রত নারী জীবন উঠলো বিষিয়ে। সে দুর্দ্দিনে স্পেনের নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের নেত্রী প্রিমো ডি রিভেরা এলেন কণ্ঠে মাভৈঃ বাণী নিয়ে। স্পেনের সামরিক ডিক্টেটরকে তিনি তাঁর সুচিন্তিত যুক্তিতর্কে বুঝিয়ে দিলেন, নির্ব্বিঘ্নে শাসনকার্য্য পরিচালনা করতে হ'লে নারীকে তার ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত করা নির্ব্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। তাঁর সে যুক্তি-জাল খণ্ডন করা সম্ভব হলো না, ফলে স্পেনীয় নারীগণ লাভ করল তাদের একান্ত বাঞ্ছিত পার্লামেণ্টারী ভোটাধিকার।

কিন্তু সেদিনের সে অধিকার শুধু কাগজে পত্রেই নিবদ্ধ ছিল। নূতন নির্ব্বাচন না হওয়ায় স্পেনীয় নারীগণ তাহার সদ্ব্যবহারের সুযোগ লাভ করতে পারেন নি। এমন কি তার কিছুদিন পরে যখন ডিক্টেটরী তন্ত্র উচ্ছেদ করা হয় তখন স্পেনীয় রমণীগণের ভোটাধিকার লাভের কথা অনেকে বিস্মৃতই হয়েছিলেন। পরে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে স্পেনে যেদিন গণ-তান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেইদিনটী স্পেনীয় রমণীগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটী স্মরণীয় দিন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহু বাধাবিঘ্ন ও বিপত্তিকে তুচ্ছ করে তাঁরা যে অধিকার লাভ করেছিলেন, সে অধিকার প্রয়োগের সুযোগ লাভ করে স্পেনীয় রমণীগণ সেদিন আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল ও গৌরবান্বিতা হয়েছিলেন।

এর পরেই স্পেনীয় নারী সমাজে আবার এক দুর্দ্দিন দেখা দিল। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের সাধারণ নির্ব্বাচনে বামপন্থীদের হ'ল শোচনীয় পরাজয়, আর সে পরাজয়ের অপবাদ পড়ল স্পেনীয় নারীদিগের উপর। এ জন্য স্পেনীয় নারীদের সম্মুখে দেখা দিল এক কঠোর অগ্নি পরীক্ষা। দোষী নির্দ্দোষী নির্ব্বিশেষে সকলেই ভোগ করতে বাধ্য হলেন কঠোর নির্য্যাতন। নারীদের সহায়তায় যে সব সামাজিক বিধি বিধান ও আইনকানুন রচিত হয়েছিল তার সবই যেওয়া হলো খতম করে। নারী মজুরদের বেতন হলো হ্রাস—মাত্র ৬টী পেসীর বিনিময়ে তাদের সারাদিন ক্ষেতে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। অবিচারের এই রুদ্র মূর্ত্তির পশ্চাতে দেখা দিল, অনশন, দুঃখ, দৈন্য ও প্রচণ্ড বিক্ষোভ। স্পেনীয় পুরুষগণ সে রুদ্র নীতি মাথা পেতে বেশী দিন সহ্য করে নি। প্রচণ্ড অভাবের তাড়না ও মনুষ্যত্বের অবমাননা তাদের অন্তরকে করে তুললো বিদ্রোহী। আর সে বিদ্রোহ ডেকে নিয়ে এলো জাতির অনন্ত দুঃখ, দৈন্য, অপরিসীম নির্য্যাতন ও দুঃসহ লাঞ্ছনা।

এ দুর্গতির মূল কোথায় স্পেনীয় নারীগণ তা বুঝেছিলেন আর তা বুঝে-ছিলেন বলেই পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে সুবিচার লাভের আশায় সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে সব গেল বদলে, বামপন্থীরা আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন।

এর ফলে দেখা দিল স্পেনে শান্তি ও সমৃদ্ধির এক নব যুগ। বামপন্থীগণ প্রাধান্য লাভ করার পরেই মনোনিবেশ করলেন দেশের শিক্ষা বিস্তারের দিকে। মাদ্রিদেই তখন এমন ২৫ হাজার ছেলেমেয়ে ছিল, যারা স্কুলের অভাবে ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে। দক্ষিণাঞ্চলগুলিতেও শতকরা ৮৫ জন ছিল একেবারে নিরক্ষর, অথচ মানুষ হবার আগ্রহ ও অন্যান্য সদ্গুণ তাদের মধ্যে কম ছিল না। বামপন্থীদের চেষ্টায় ও নারী-সমাজের সহযোগীতায় স্পেনের নিরক্ষর অধিবাসীরা পেয়েছিল জ্ঞানের আলোক আর সে আলোকে তারা নব জীবনের পথের সন্ধান পেয়েছিল।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও যারা মৃতের মত নির্জ্জীব জড়বৎ শান্তিতে ছিল সুপ্ত ঘর সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীই ছিল যাদের জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র—কাল ও যুগধর্ম্ম প্রভাবে তাঁরাই আজ আধুনিক সমর সম্ভারে সুসজ্জিত হয়ে বীরাঙ্গনারূপে অবতীর্ণ হয়েছেন শোণিতাক্ত রণক্ষেত্রে স্বদেশের সঙ্কট মোচনে—স্বদেশবাসীর কল্যাণ কামনায়।

প্রতিবাদ

পাবনা জিলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত জ্ঞানরঞ্জন সরকার জানাইতেছেন: 'আপনার বিখ্যাত সাপ্তাহিক **স্বদেশ** পত্রিকার ১৮ই অগ্রহায়ণ ৪১ সংখ্যায় আগামী এসেম্বলী ইলেকসন সম্বন্ধে পাবনা জিলা কংগ্রেস কমিটীর নামে একটি ভুল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পাবনা জিলা কংগ্রেস কমিটীর মনোনীত প্রার্থী পরিত্যক্ত হওয়ায় বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাবনা জিলা কংগ্রেস কমিটী স্বাধীনভাবে কোন প্রার্থী দাঁড় করাইবার সংকল্প করেন নাই।'

ফোন-১৭৬১ বড়বাজার
টেলিগ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস্
এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স
সন এণ্ড গ্রাণ্ড সন্স অব লেট বি, সরকার
একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি নির্ম্মাতা
সকলেই অবগত আছেন আমরা পৃথক হইয়া উল্লিখিত নাম ও ঠিকানায় এই জুয়েলারী দোকান খুলিয়াছি। মজুরী পূর্ব্বাপেক্ষাও কমান হইয়াছে। পুরাতন সোনা ও রূপার বদলে নূতন গহনা দেওয়া এবং মফঃস্বলের গহনা অতি অল্প সময়ে ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান হয়। আমাদের বি-১নং নূতন ক্যাটলগের জন্ত পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে পাঠাইয়া থাকি।
সকলের সহানুভূতি ও পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
১২৪।১২৪-১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা
বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়

চাতিম চাতিম

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

আগামী এপ্রেল মাস থেকে ভারতের প্রদেশে প্রদেশে নয়া কনষ্টিটিউশন আরম্ভ হচ্ছে। এত দিন দ্ব'ইয়ার্কির (ডায়ার্কি) আমলে কি দপ্তর খানায় (এক্সিকিউটিভ) আর কি রাষ্ট্র সভার বা কাউন্সিলে উভ জায়গায়ই ছিল আমলাতন্ত্র আর প্রতিনিধির জগাখিচুড়ি। সিভিল সার্ভিসের বড় বড় কর্ত্তারা ব্যবস্থাপক সভার গলাবাজীতেও যোগ দিতেন, আর সার নাজিমুদ্দীন প্রভাস চন্দ্র ইত্যাদি মন্ত্রীদের সঙ্গে বসে রাজ্যও চালাতেন। অবশ্য কংগ্রেস ওয়ালারা বলতে পারেন, যে, এ মন্ত্রী ছিল তাদের। কথাটা একেবারেই নির্জ্জলা মিথ্যে নয়, কিন্তু বাঙলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা দেশবন্ধু একদিন সুবিধা পেয়েও সদলবলে এই রাংতার মসনদে চেপে সিট ডাউন করেন নি বলেই তাদের মন্ত্রীর আমদানী হয়েছিল। তাদের মন্ত্রী সার সুরেন্দ্র নাথ প্রদত্ত কর্পোরেশনে স্বরাজ্য দল যে শাসন ও শোষণ দণ্ড আজও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে চালিয়ে চলেছেন সেটা চাক্ষুষ প্রমাণ রাংতার মসনদী শক্তির কতখানি কার্য্যকারিতা।

* * *

রাজনীতি হচ্ছে কূটনীতি, এখানে চিরদিনই বুদ্ধিমানের জয় এবং গোঁয়ারের পরাজয়। আগামী এপ্রিল মাস থেকে আমলা তন্ত্রের সংস্পর্শ কি দপ্তর খানা আর কি ব্যবস্থাপক সভা উভয় ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিচ্ছে; যাঁরা থাকছেন তাঁরা মন্ত্রীদের নির্ব্বাক সচল যন্ত্র পুত্তলী মাত্র। বাঙলার দ্ব'ইয়ার্কি পরিণত হচ্ছে এক অখণ্ড ইয়ার্কিতে। গলাবাজীর ক্ষেত্রটি যাচ্ছে দু'ফাঁক হয়ে, আপার হাউস আর লোয়ার হাউসে। নীচের হাউসে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ছাড়া সরকারী মনোনীত প্রতিনিধি একটিও নেই, এবং অপার হাউসে আছেন মুষ্টিমেয় জন দশেক। অবশ্য এই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দল হবেন একটি অপূর্ব্ব গবেট হাউস, সেখানে হনুমান জাম্বুবান নীল নল অঙ্গদ সবাই আছেন; জমিদার, প্রজা, ব্যবসায়ী, ডিপ্রেসড ক্লাশ, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সবারই মুখপাত্র সেখানে আসন গ্রহণ করে পাতিও ব্যবস্থা দেবেন। সুতরাং 'সে হিসাবে দ্ব'ইয়ার্কি পরিণত হবে পাঁচ ইয়ার্কিতে।

* * *

এই বিচিত্র নবরঙ্গ সভার বৈচিত্র্যের জন্য দায়ী আমাদের নসীব আর গোলটেবিলের মন ভাঙাভাঙি। আমাদের ফুটা নসীব ও হিংস্র ভ্রাতৃপ্রেমের অবসর নিয়ে ম্যাকডোনাল্ড সাহেব বা ব্রিটিশ সরকার এই বাটোয়ারা মূলক জগাখিচুড়ি মার্কা স্বরাজ আমাদের স্কন্ধে চাপিয়েছেন, একথা এখন আর বলে কোন ফল নাই। মেক দি বেষ্ট অফ এ ব্যাড যব,—এটা আমাদের করতেই হবে এবং সেইটে বুঝেই মাদল ঘাড়ে কঙ্করসিক অকঙ্করসিকে জোট যুদ্ধে নেমেছেন। সব সুস্থন্দী মিলে যে সড়ক বানিয়েছেন সেটা কাঁচাই হোক আর পাকাই হোক, ঘুর পথই হোক আর সোজাই হোক, ঐ পথেই আরও পাঁচ দশ বছরের রাজনীতি চলবে। এই অম্লরস দ্রাক্ষাকণই এখন ভারতীয় এবং প্রাদেশিক পলিটিশিয়ান শৃগালের ভক্ষ্য।

* * *

এই দল বেদলের আসরে খুব ধড়িবাজ কূটনীতিজ্ঞ পলিটিশিয়ানের দরকার; কারণ প্রত্যেকটি আইন পাশ করতে' হ'লে মন্ত্রীদের ও আমলাদের মাহিনা এবং রাজকার্য্যের রসদ মঞ্জুর করাতে হলে তেমনি মানুষ চাই যিনি ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই হোক আর বাগবৈখরী মায়াজালেই হোক মেজরিটিকে মুঠার মধ্যে আনতে পারবেন। ফলে অহরহ দল বেদলে জোট বাঁধা বাঁধি চলবে, আজ ফজলুল হক যাবেন কংগ্রেসের কোলে এবং কাল বসবেন খাজা নাজিমুদ্দীনের বামে, এ ব্যভিচার ও দ্বৈরিতা সর্ব্বত্র অম্ল ও বিস্তর চলবেই। এরই নাম পার্টি পলিটিক্স, বুঝিয়ে সমঝিয়ে ঘুষ পর্য্যন্ত ক'বলে দেশবন্ধু অতবড় স্বরাজ্য পার্টি গড়েছিলেন সেটা সর্ব্বজন বিদিত সত্য। এ বিয়ের যে এই—ই হচ্ছে মন্তর।

* * *

যে প্রদেশে কংগ্রেস মেজরিটি আশা করা যায়, অর্থাৎ যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়ায় জাতীয় এলিফেন্ট চিড় খেয়ে দু ফাঁক হয়ে যায় নি, সেখানে কি হবে জানি নে। হয় নয়া কন্‌ষ্টিটিউশন্ গোঁয়ারের মত রেক করতে গিয়ে কংগ্রেসী দল শিঙ ভেঙে পরাস্ত হবেন, অন্য দল এসে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রী সভা গড়বে ; আর নয় তো তাঁরাই সত্যমূর্ত্তি কোম্পানীর মত জেঁকে বসে খদ্দর পরে রাজ্য চালাবেন এবং পরমানন্দে পুলিশের সেলাম কুড়াবেন। কিন্তু বাঙলাতেই হবে বিষম দুর্দ্দৈব। এখানে মাজা-ভাঙা কংগ্রেস পার্টিকে মেজরিটির আশায় বহু দল-পতির ভজনা করতে হবে, রকম বেরকম নাগরের মন কুড়াতে হবে। নইলে তাঁরা নখদন্ত হীন দশায় এক কোণে পড়ে ক্রমাগত নিস্ফল গর্জ্জন ছাড়বেন শরতের নিস্ফলা মেঘের মত।

* *

দু-ইয়ার্কির আমলে কংগ্রেস দল মান অভিমানের পালা গেয়ে গেছেন, যা পলিটিক্সে অচল। এক ইয়ার্কির আমলে তাঁরা অন্ততঃ এগিয়ে এসেছেন তুরী ভেরী জগঝম্প হাতে রঙ্গাঙ্গণে। যখন বৈধ রাজনীতির পথে নাম লেখাতেই হলো তখন তার বাকি পালাটুকু বুদ্ধিমানের মত গেয়ে যাওয়াই সমীচীন। অনেক নর্ত্তন কুর্দ্দন করে নরমুণ্ডের কুতুবমিনার গড়ে স্বাধীন ও লাল কম্যুনিষ্ট রুষ দেশ্ আজ আবার পার্লামেন্টারী নীতিতে ফিরে গেছে। মিশরে নাহাশ পাশা মান ভরে পরিত্যক্ত কন্‌ষ্টিটিউশন পুনরপি যেচে নিয়ে দেশ গঠনে মন দিচ্ছেন। ভারতও পথে পথে ডাণ্ডাগুলি খেলে দীর্ঘ সময় অপচয় করে এখন পার্লামেন্টারী নীতি সেওয়া সাব্যস্ত করেছে। আজ যে পার্লামেন্ট মেকী দেশের ধুরন্ধর কৃতী সন্তানদের জোট পাটে ও চালনায় কাল তা খাঁটী হতে কতক্ষণ?

* *

ওদিকে কিষাণ সঙ্ঘ ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির ঠেলায় কংগ্রেস মণ্ডপ টলমল। তারা নেতাদের পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপে চাইছে মাস্ এফিলিয়েসন ; তার মানে একেবারে বাঁধকাটা বোলাবাণে বুর্জোয়া নেতাদের দেবে ঐরাবতের মত কুমড়ো গড়ানে করে ভাসিয়ে। যদি 'মাস্' হিসাবে কংগ্রেসী খাতায় নাম লেখানো মঞ্জুর হয় তা' হলে শীঘ্রই বুলাভাই সত্যমূর্ত্তি এণ্ড কোং কে গণেশ উল্টিয়ে লাল বাতী জালতে হবে। সোজা কথা—খুব মুখরোচক তামাসা সাদৃশ "ইতরে জনাঃ" শীঘ্রই দেখতে পাবে। এখন কিছু দিন বাজিল তবিয়তে বেঁচে থাকতে পারলেই হয়। সোজা কথা চারি দিকেই অটল আসন সব টলে যাচ্ছে ; তা কি আমলা, কি নেতা আর কি ল্যাণ্ড হোল্ডার বা ধামা হোল্ডার—সবারই। একটা মাথাভাঙা থাড্ডাইরের গায়ে গোটা মানব সমাজটা তথা ভারতবর্ষ চলেছে গড়িয়ে ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল বেগে—কোথায় কোন্ অতলে? কালপুরুষ এর উত্তর দেবে।

আরতি-দি

—[গল্প]—

—শ্রীজীবানন্দ ঘোষ

আরতি-দি'কে আমি এখনো ভালোবাসি, এখনো। আরতি-দি'র সঙ্গে আমি ঠিক তেমনিই কথা কই ; কিন্তু যখন আমি একা আর আরতি-দি' থাকে আমার কল্পনার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে,—তখন। মনে পড়ে, আরতি-দি'কে সেদিন আমি প্রথম দেখি, যেদিন তিনি সাপের মত বেণী দুলিয়ে, রঙীন সিল্কের জামা পরে এগারো বছরের মেয়ের পরিচয় দিয়ে ভর্ত্তি হ'লেন আমাদের স্কুলে। স্কুল তো নয়, পাঠশালা। সভ্য যুগে সভ্য নাম নিয়েছে মাত্র। আমি তখন সাত বছরের ছেলে। সত্যি, আমার সেই সাত বছরের কথা আজো সব মনে আছে। হিংসুটের দল যখন আরতি-দিকে বসবার জন্তে কেউ একটু জায়গা ছেড়ে দিল না, মনে পড়ে, আমি তখন বলে উঠেছিলুম, আমার কাছে বসবে ? আরতি-দি এসে বসলো আমার কাছে নিতান্ত শান্ত মেয়ের মত। ওঃ, আরতি-দির সে কি সুন্দর জামা, কত ফুল আঁকা তাতে, আর কি মধুর গন্ধতেল মাখানো—আর চুলগুলো কি সুন্দর কালো এবং কোঁকড়ানো ! আর,…না, না, সব আমি বলবো না,—বলতে পারবো না। আচ্ছা, তোমরা কেবল এইটুকু শুনে রাখো : আমার আরতি-দির মত সুন্দর মেয়ে তোমরা কেউ কক্ষনো দেখোনি।… হ্যাঁ, আরতি-দি আমার পাশে বসলো, কিন্তু ঠোঁট হ'য়ে আর কুকড়ে। তা' দেখে আমি বললুম, ভালো করে বোসো না। তা'র উত্তরে আমার আরতি-দি কি বললে, জানো ? বললে, তোমার জামা অত ময়লা কেন ? চান করো না কেন ? ভালো জামা পরো না কেন ?… আমি গরীব। কিন্তু সে-কথা চাপা দিয়ে আমি কথা কই। বললুম, তোমার নাম কি ভাই ?

আরতি-দি বোধ হয় বিরক্ত হ'য়েই ঠোঁট করে বললো, আরতি।

আরতি ! বাঃ, বেশ নাম তো ! আমি বললুম হেসে, মন্দিরে যে আরতি হয়, তুমি কি সেই আরতি নাকি ?

কিন্তু আরতি-দি রেগে উঠলো। বললো, ভারী ফাজিল ছেলে তো ! তোর নাম কি ?

নাম ? আমার নাম মানব। নাম বলবার আগে মনে মনে বলি, আমি ফাজিল, কিন্তু তা'র থেকে তুমি আরো বড়। নতুন স্কুলে এসে এতো…

ইস্ ! আরতি-দি তখন বললো, নিজের নামটিতো দেখি খুব। মানব মানে কি জানিস্ ?

মানব মানে—মানুষ। বাড়িয়ে বলি, মহামানবও হয়। মানবের অর্থটা আমার জানা ছিল ভালো করে—মুখস্থ করেছিলুম।

উঃ, আরতি-দির গালের গোড়া দু'টো তখন যে কি রকম লাল হয়ে উঠেছিল, আমার তা আজো মনে আছে। আরতি-দির গায়ের রঙ যেন পাতলা সিল্কের কাপড় ঢাকা রক্ত-জবার দলের মত। সত্যি, এতো ফর্সা আর এতো সুন্দর মেয়ে, আমি যদি না আরতি-দিকে নিজের চোখে দেখতুম, তাহলে নিশ্চয়ই ভাবতুম, কেবল রূপ কথাতেই আছে এ মেয়ে আছে কোন্ নাম না-জানা পরীর দেশে ;—আমাদের এই মানুষের মাঝে এ মেয়ে থাকতে পারে না। তাই আরতি-দিকে দেখে আমার মাঝে মাঝে মনে হ'ত যে, আমার আরতি-দি সত্যিই বোধ হয় কোনো দেবী—কোন্ শাপে এসেছে এখানে—এই মর্ত্তলোকে। মাষ্টার যখন কাউকে মারতেন, তখন আমি আঁৎকে উঠতুম। ভাবতুম, ওই কাঠের একটুখানিও যদি আমার আরতি-দির পিঠে পড়ে, তাহলে নিশ্চয়ই ওই সিল্কের পাতলা কাপড়টা ছিঁড়ে রক্তজবার দলগুলো নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু সেই প্রথম দিনই আমার পাশে বসলো আরতি-দি, তারপরের দিন আর নয়। পরের দিন বসেছিলো সামনের বেঞ্চে। আমি বললুম, আমার কাছে আজ বসবেনা তুমি ?

আরতি-দি নাক সিঁটকে বললো,

বাঃ! ফাজিল ছেলে! নোংরা—নীচু ক্লাশে পড়িস্ তুই!

নীচু ক্লাশে পড়লেও আমাদের ভাঙা বেঞ্চগুলোর সে-হিসেবে মূল্য ছিল না। যে আগে আসবে, সে আগে বসতে পারে। সুতরাং তারপরের দিন আরতি-দি যেখানটায় বসে, আগে এসে তার পাশের জায়গাটায় বসলুম। আরতি-দি এসে তাঁর পাশে আমাকে দেখে বললো, কিরে, তুই এখানে?

আমি এক গাল হেসে বললুম তোমার পাশে—

আরতি-দি তখন খানিকপরে বললো, আচ্ছা, তবে কাল থেকে জামা-কাপড় সব পরিষ্কার পরে আসবি, বুঝলি?

আচ্ছা। উঃ, আরতি-দি বলেছে তাঁর পাশে বসবো! আরতি-দিকে আমার এতো ভালো লেগেছিল সেই প্রথম থেকে যে, আজ পর্য্যন্ত সে-রকম আর কাউকে লাগেনি, লাগে না, হয় তো লাগবেও না;—আর ঐ নামটি,—কি সুন্দর নাম! মনে হয় আমার আরতি-দির যোগ্য নাম ওই আরতি। ইচ্ছে করে কেবল ডাকি, আরতি-দি, আরতি-দি, আরতি-দি! আর ডাকিও, কিন্তু চুপি চুপি—নিরালায়। মুখ দিয়ে হয় তো বেরোয় না, হৃৎপিণ্ডের নাচের তালে তালে ওই নামটা—ওই সুন্দর, মধুর নামটা আমার বুকের মাঝে নাচে যেন।

তারপর থেকে আমি পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে স্কুলে আসতে থাকলুম। একদিন, সত্যি আরতি-দির সঙ্গে পরিচয় হবার মাত্র মাস দেড়েক পরে, নির্লজ্জের মত বলে ফেললুম, আচ্ছা তুমি এতো ভালো জামা পাও কোত্থেকে? তোমার চুল এতো কালো আর এতো সুন্দর কেন? আর তুমি—তুমিও এতো সুন্দর হলে কি করে?

ভারী দুষ্টু ছেলে তো! আরতি-দি রেগেই বলেছিল লজ্জা পেয়ে।

আরতি-দির এই তিরস্কারটুকু কেন জানি আমার ভালই লেগেছিল। আর একদিন আমি বলেছিলুম, আচ্ছা, তোমাকে আমি কি বলবো?

আরতি-দি বলেছিল, কি বলবি তুই জানিস!

আমি বলেছিলুম, তবে ওই নামটা ধরেই ডাকবো'খন।

আরতি-দি নিচের ঠোঁটটা উল্টে রেগে বলেছিল জানিস, তোর চেয়ে আমি বড়—আর উঁচু ক্লাশে পড়ি। ডাকবি দিদি বলে। বলবি, আরতি-দি।

আরতি-দি! আমি খুব খুসী হয়েছিলুম আরতি-দিকে এতো আপন করে পেয়ে। এরপর থেকেই আরতি হ'ল আমার আরতি-দি। এবং জানিনে, কি আছে এই দি'র যোগে,—ক'মাসের মধ্যেই আমি আমার আরতি-দিকে আপনার খুব কাছে পেলুম; পেলুম তাঁর ভাইয়ের স্থান,—বন্ধুত্বও। উঃ, একি আমি কোনোদিন কল্পনা করেছিলুম?

আচ্ছা আরতি-দি, একদিন ছুটির পরে আমি আরতি-দিকে বললুম, আমাকে একদিন তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাবে? খুব বড় বাড়ী, না? তেতালা? ফুল গাছ দেওয়া, না? দারোয়ান আছে, না?

আরতি-দি বললো হেসে, আচ্ছা যাস্ একদিন।

কেন আজকেই চল না? আমি বললুম তক্ষুণি।

আজকেই? আরতি-দি তাদের গাড়ীতে উঠতে উঠতে বললো, আর তবে।

আরতি-দের গাড়ীতে উঠলুম ; বসলুম, আরতি-দির পাশে। উঃ; তখন আমার কি আনন্দ হচ্ছিল! ইচ্ছে করছিল, খুব—খুব কথা কই আরতি-দির সঙ্গে। কিন্তু কেমন জানি একটাও কথা ঠোঁট দু'টোর ফাঁকে আনতে পারছিলুম না যদিও সহস্র সহস্র কথা আমার জিভের নীচে তালগোল পাকাচ্ছিল।

আচ্ছা মানব, আরতি-দিই বললো, তুই—

এবার আমি কথা খুঁজে পেলুম বলবার। বললুম আরতি-দির কথায় বাধা দিয়ে, আরতি-দি, আমাকে তুমি মান্টু বলে ডাকতে পারো না ?

কেন রে ? আরতি-দি ভাঙা ভাঙা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

বললুম, শুনতে ভালো লাগে। আমার মাও ডাকে এই মান্টু বলে।

আচ্ছা তাই, আরতি-দির হাসিতে যেন একরাশ মুক্তো ছড়িয়ে গেল : তোকে মান্টু বলেই ডাকবো। আচ্ছা মান্টু, এরপর তুই হাইস্কুলে পড়বি তো ?

আমার সব আনন্দ আরতি-দি যেন এক মুহূর্তে ভেঙে দিল। কেননা, মা বলেছেন সেদিনো যে, আমাকে তিনি এরপর আর পড়াবেন না। আর সত্যিই তিনি পড়াবেনই বা কোত্থেকে ? তবুও আরতি-দিকে সুখী করবার আশায় বললুম, হয় তো পড়বো।

...তারপর আরতি-দির বাড়ীতে পৌঁছে গেলুম ! চমৎকার বাড়ী ! যেমনটি কল্পনা করেছিলুম ঠিক তেমনটিই।

...এরপর কাটে এক বছর।

আরতি-দিকে পেলুম আরো নিবিড় করে,—আমার আরো কাছে। মনে পড়ে, কতদিন আরতি-দির কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছি, পাশাপাশি কত রাজপুত্তুর আর রাজকুমারীর গল্প করেছি, আর কতদিন দু'জনে কত রকম করে ভবিষ্যৎ জীবনের আলপনা দিয়েছি আর আরতি-দিকে বলেছি, আরতি-দি তোমাকে আমার এত ভালো লাগে কেন ?

আরতি-দি বলেছিল, আমারো তোকে খুব ভালো লাগে মান্টু !

আরতি-দির মুখে এ কথা শুনে আমি যেন স্বর্গ হাতে পেলুম। তারপর।—উ, বলতে আর আমি পারছিনে। মনে হচ্ছে, বুকখানা খালি হয়ে গেছে একেবারে।··· হ্যাঁ, তারপর একদিন আরতি-দি বললো আমাকে, মান্টু, এবার তো আমি সহরে হাইস্কুলে পড়তে চললুম।

হাইস্কুলে! আরতি-দি চলে যাবে!—এ কথা আমার কানে যেতেই আমার বুকখানা যেমন মুচড়ে এলো, মুখখানা গেল সাদা হয়ে। আরতি-দি বুঝতে পেরে হেসে বললো আমার গালে তাঁর সেই চাঁপার পাপড়ির মত দু'টো আঙুলের ঠোকা মেরে, দুষ্টু! আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবি নে ?

না! আমি কাতর কণ্ঠে বললুম, আরতি-দি তুমি যেয়ো না গো!

পাগল! দুষ্টু! আরতি-দি আমার গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তাঁর সেই গোলাপী রঙের গাল আমার গালের সঙ্গে মিশিয়ে বললো।

...কিন্তু আরতি-দি' সহরে হাইস্কুলে পড়তে গেল। আমার কথা শুনলে না। গেল আমাকে লুকিয়ে। আরতি-দি'র চিঠি আসে তাদের বাড়ীতে। দেখি, তাতে মান্টুর কথাও থাকে। যে চিঠিটা প্রথম আসে তাদের বাড়ীতে, তাতে ছিল : মান্টুকে লুকিয়ে পালিয়ে এলুম। কি জানি, যে পাগলা ছেলে, হয়তো আমায় আসতেই দিত না। নিজে কেঁদে হয়তো আমাকেও কাঁদাতো।

তারপর যে চিঠিটা এলো, সেটা এলো আমারই নামে। তাতে আরতি-দি' যা' লিখেছিল, তার সারাংশ হ'ল এই : মান্টু, তোর জন্যে আমার বড্ড মন কেমন করছেরে। তুইও আমার জন্যে খুব কাঁদছিস্ না ? আমি স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছি। মোটা-মোটা বই পড়ছি। তাতে কত ছবি, কত লেখা আর কত গল্প···আচ্ছা, এবার গিয়ে তোকে আমার বইগুলো দেখাবো, কেমন ? মান্টু, লক্ষ্মী ভাই আমার কাঁদিসনে। তোর দিদির ভালবাসা নিস্।

সে চিঠিখানা আজো আমার কাছে আছে।

···দিন কাটে, মাস কাটে,—বছরও কাটে। আরতি-দি' ক্রমে-ক্রমে যেন সরে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে। আমি কেঁদে উঠি : কেন তোমায় ভালো লাগলো আরতি-দি' ? কিন্তু আরতি-দি' শুনতে পায়না আমার কথা। রাত্রে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজলেই দেখি, কে একজন আমারই মত আরতি-দি'র কাছে রয়েছে। আরতি-দি' ভালোবাসে তাকে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি কেঁদে উঠি।

…আরতি-দি'র বাড়ীতে গিয়ে খবর নিই : আরতি-দি' কি আসছে ?

তারা হেসে উঠে বলে, পাগলা ছেলেটা কে—রে !

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আরতি-দি'র সঙ্গে কথা কই : আচ্ছা, তোমার কাছে আমায় নিয়ে চলোনা গো আরতি-দি' ?

আরতি-দি বলে এর উত্তরে মিষ্টি একটু হেসে, পাগল ! দুষ্টু !

…কিন্তু সেদিন…যেন এক যুগ পরে আরতি-দি'দের বাড়ীতে যেতেই আরতি-দি'র সবচেয়ে ছোট ভাইটা আমাকে বললো, এই—এই পাগলা, আমার দিদি আসছে !

দিদি ! মুহূর্ত্তে কথাটা যেন আমার সমস্ত বুকখানার মাঝে একটা ক্ষিপ্র গতিতে বিদ্যুতের তরঙ্গ বইয়ে দিল। বলে উঠলুম, কোন দিদি ? আমার আরতি-দি' ?

ছেলেটা হেসে উঠলো : হি-হি ! বললো, হ্যাঁরে পাগলা, তোর আরতি-দি' !

তবুও বিশ্বাস হ'লনা। ভালো করে খবর নিলুম। শুনলুম, হ্যা, আমার আরতি-দি' সত্যিই আসছে। উঃ কি আনন্দ ! জানতুম, আসবে, আমার আরতি-দি' একদিন ফিরে আসবেই ; তবুও কতোদিন পরে—কতদিন, বোধ হয় ছ'বছর। ছ'বছর, কিন্তু আমার কাছে এক যুগের চেয়েও বেশী। আচ্ছা, আমার আরতি-দি'র চুল কোঁকড়ানো আর কালো, না ? মাথায় আমার চেয়ে মাত্র তিন আঙুলের বড়, না ? বাঁ দিকের গালের ওপর একটা তিল আছে, না ? মনে পড়ে যায় সব কথা। ছ'বছর, (যেটাকে একটু আগে আমি বলেছি একটা যুগের চেয়েও বেশী)—এই ছ'বছর হয়ে আসে আমার কাছে মাত্র কাল-পরশুর মত—যেনআমার আরতি-দি' কাল গেছে, আজ আবার আসছে ফিরে। আচ্ছা, আগে আসুক আরতি-দি', একচোট মা' সাঁতার কাটবো সেই খালে—আঃ ! আর টিফিনের সময় ঘোষেদের যে পেয়ারা গাছটায় বসে আমরা পেয়ারা চিবুতুম আর গল্প করতুম, সেই গাছটাতেও একবার উঠবো। আর উঃ, কত নতুন জিনিষ যে দেখাতে হবে, তার আর কুল-কিনারা নেই। ঘোষেদের পুকুরটা বিলিতি পানায় ভর্ত্তি হয়ে ফুটবল খেলার মাঠ হয়েছে, গাঙ্গুলীদের পড়ো জমিটা হয়েছে ফুল বাগান, মিনুদের বাবার সব শুদ্ধু দশটা বাচ্চা হয়েছে, ভোলা ক্লাশে উঠতে পারেনি এবারো, মেজদির বিয়ে হয়ে গেছে,—তারপর উঃ, সে অনেক—অনেক। আগে আসুক তো আরতি-দি', তারপর একধার থেকে সব বলবো। আরতি-দি' তখন বিরক্ত হ'য়ে বলবে, ওরে মানু, তুই এত কথাও কইতে পারিস্ ! আর হ্যাঁ, আরতি-দি'কে আমি এইটেই আগে জিজ্ঞাসা করবো যে, মিত্তিরদের উড়ে চাকরটা মিথ্যেবাদী কি না। হারামজাদা দু'বছর দেশে কাটিয়ে এসে সে দিন বলে কিনা, মানুবাবু, তুমি তো বেশ বড় হ'য়েছো ! বড় হ'—য়ে—ছো ! আহা, কি বুদ্ধি রে ! আরে বোকা, আমি যদি বড় হই, তাহ'লে আমার আরতি-দি'কি আমার চেয়ে ছোট হ'য়ে গেছে বলতে চাস্ ? হুঁঃ, উড়ে কিনা, ওঁ'র আর কত বুদ্ধি হ'বে !

…আমার ময়লা জামা-কাপড় সব পরিষ্কার হ'য়ে যায়।

…তারপর এলো আরতি-দি'। উঃ, আরতি-দি'কে দেখবার জন্তে সে কি ভিড় ! পাড়ার সমস্ত মেয়ে-পুরুষ ভেঙ্গে পড়লো আরতি-দি'দের বাড়িতে। সকলেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে একজায়গায়। আমি ঢুকতে পারিনে সে-ভিড়ের ভেতর। শুনতে পাই, কত প্রশ্ন, হাসি আর কথা। কিন্তু ওদের দেখা থেকে আমার দেখার প্রয়োজনটা কি কিছু কম ? আমায় কেন ওরা দেখতে দিচ্ছে না ? 'হাওয়া ছাড়ো'…'মেয়ে আমার ঘেমে উঠেছে'…'আসতে কোনো কষ্ট হয় নি তো ?'…'হরির মা, পাখাটা বাপু একটু জোরে নাড়ো'—সে-সব কত কথা ! কিন্তু আমি যে দেখবো আমার আরতি-দি'কে। ভিড় ঠেলে ঢুকি অনেক কষ্টে। কিন্তু—কিন্তু কই আমার আরতি-দি' ? কোথায় ? দেখলুম, একটা আঠার-উনিশ বছরের মেয়ে বসে' আছে একটা চেয়ারে—আর তা'কেই সকলে ডাকছে আরতি বলে,' তা'র সঙ্গেই হ'চ্ছে কথা, হাসি আর প্রশ্ন। এ-ই, তবে কি এই আমার আরতি-দি' ? কিন্তু তবে কোথায় সেই ঢেউ খেলানো আর অন্ধকার করা চুল ? কোথায় সেই হাসি, সেই কথা,—সেই জামা, কাণের ছোট দুল, সাপের মত বেণী ? কোথায় সে-সব ? আর কোথায় সেই তিন আঙুলের তফাৎ আমার থেকে লম্বায় ? কোথায়—কোথায় ? না, না, এ-মেয়ে আমার আরতি-দি' কিছুতেই হ'তে পারে না ! অসম্ভব !

সেই ভিড় ঠেলেই শেষ পর্য্যন্ত আমি বেরিয়ে এলুম। বাইরে এসে দেখতে পেলুম আরতিদি'র সেই ছোট ভাইটাকে।

প্রশ্ন করলুম তা'কে, আরতি-দি' এসেছে নাকি ? সে বললো হেসে, দেখিস্ নি তুই এখোনো ? যা, তবে ঢুকে যা, উ ই ভিড়ের মধ্যে।

ওই ভিড়ের মধ্যে ! তবে,...

অনেকক্ষণ, প্রায় দু'ঘন্টা বাইরে কাটিয়ে আমি আবার ঢুকলাম আরতিদি'-দের বাড়ীতে। সকলে চলে' গেছে। এমন সময় সেই ছোট ছেলেটা আমার হাত ধরে' টান্‌লো। বল্‌লো, তোর আরতি দিকে দেখবি তো আয় আমার সঙ্গে।

ছেলেটা সত্যিই টেনে নিয়ে গেল আমায় একটা ঘরের মধ্যে। সেখানে দেখলাম, সেই মেয়েটাই বসে আছে একটা চেয়ারে, আর তার চেয়ে বছর চারেকের বড় হবে একটা যুবক বসে আছে তার পাশে—একটা ইজিচেয়ারে।

ছেলেটা আমার ঘরের ভেতর ছেড়ে দিয়েই বললো সেই মেয়েটাকে হেসে হেসে, এই বড় দি,' একে—এই পাগলাকে চেনো ? এ কিন্তু তোমাকে চেনে, দেখা করতে এসেছে। এই পাগলা বোস্ না, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? শেষের কথাটা আমাকে।

ছেলেটা চলে গেল। আমি বস্‌লুম একটা চেয়ারে। বস্‌লুম, নিশ্চল, নির্ব্বাক হয়ে, যাদু করার মত যেন পঙ্গু হয়ে গেলুম আমি, যেন কথা কইবার বা একটু নড়াচড়া করবার মত শক্তি আমার মধ্যে নেই একেবারে। এমনি, এমনিই হয়ে গেলাম আমি কিছু ক্ষণের মধ্যে। ছেলেটা আর মেয়েটা যা কথা কইছিল, তা আমি বুঝতে পারছিলাম না কতকটা আমার এই অবস্থার জন্তে আর কতকটা আমার পাঠশালায় সীমাবদ্ধ বিদ্যের জন্তে। কত কথা কইতে থাকলো ওরা দুজনে,—শেষ আর হয় না। কিন্তু এটুকু আমার বেশ মনে আছে যে, ও কথার মধ্যে মাস্টু কথাটা একবারের জন্তেও আসেনি। প্রায় আধ ঘণ্টা এমনি বসে থাকার পর আমি উঠে পড়লাম। বললাম খুব বিনীত ভাবে, আমি আসি এখন।

মেয়েটা যেন চম্‌কে উঠলো। বললো, আরে তুমি খোকা বসেই আছো ? আমার এতটুকু খেয়াল ছিল না। হঁ কি তোমার দরকার বলো তো ?

কি বলবো আমি এর উত্তরে? চুপ করে' রইলাম।

মেয়েটা তখন বললো, আচ্ছা যদি কিছু দরকার থাকে তো আমার সঙ্গে কাল একবার দেখা কোরো, কেমন? আজ আমি বড় ক্লান্ত।

বলে' ফেললাম, দরকার আপনার সঙ্গে কিছু নেই—আরতি-দি'র সঙ্গে।

ছেলেটা আর মেয়েটা হেসে ঘর কাঁপিয়ে দিল। তারপর মেয়েটা বললো, আমার নামই আরতি। তোমার নামটা কি বলো তো?

আমার তখন যা' রাগ হ'চ্ছিল এদের ওপর,—আমার আরতি-দি'র কথা শুনে এরা হাসে! নাম বললাম: মানব।

মানব? আবার সেই হাসি। যেন কিসের ষড়যন্ত্র। যেন এরা আমার আরতি-দির শত্রু।

সমস্ত শরীর আমার কেঁপে উঠলো রাগে। তবুও তা চেপে আমি বললাম, আমি যাচ্ছি।

আরে খোকা, শোনোই না। মেয়েটা বললো বিদ্রূপের সুরে, তোমার নামটা কি বললে? মানব, না? কি করো? পড়ো বুঝি?

আগে পড়তুম,—এখন পড়ি না। আমি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

তারপরের দিন।

তোমার নামটা তাহলে মাহু, অনেক কথা কইবার পর মেয়েটা আমাকে এক সময় বললো, হুঁ, মাহু। (একটু ভেবে) মনে পড়েছে বটে একটু-একটু। তুমি কোনো ইস্কুলে পড়তে? হাঁ, হাঁ মনে পড়ছে বটে। কি করছো এখন? চাকরী?…না? তবে কি?…কিছু না?..

তবুও সন্দেহ হয়: এ কি আরতি-দি সত্যিই?

ক দিন পরে।

দেখ খোকা, আরতি-দি এক দিন বললো আমাকে চুপি চুপি, তুমি "আমাকে যার তার সামনে আরতি দি বোলো না, বুঝলে?

বললাম, আচ্ছা।

…এবার কিন্তু আরতি-দি আর সহরে গিয়ে থাকলো না। রেল গাড়ীতে চড়ে বাড়ী থেকে যাতায়াত করতে থাকলো। আরতি দি নাকি কলেজে পড়ছে। দেখি, বইয়ের গোছা দু হাতে বুকের ওপর ধরে নিয়ে যায়। চোখে থাকে পাতলা সোনার চশমা। পরে, সুন্দর সুন্দর শাড়ী। এক একদিন চুল বেণী করে ঝুলিয়ে রাখে আর সে দিন কপালে ছোট্ট একটু সিঁদুরের ফোঁটাও পরে। সে দিনই দূর থেকে দেখলেই কেমন যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে, এই মেয়েটাই আমার আরতি দি সে দিনই কেবল ইচ্ছে করে, এই মেয়েটার সেই ছ বছর আগেকার মত, গলাটি জড়িয়ে ধরি,—ডাকি তেমনি করে অবিশ্রান্ত ভাবে, আরতি দি, আরতি দি, আরতি দি। কিন্তু এ মেয়েটা বলেছে, তাকে যেন কারোর সামনে না ডাকি আরতি দি বলে। উঃ! না, ডাকবো না! কেন তোমায় ডাকবো সে নামে? তোমাকে সত্যিই আরতি দি, বলবো না, কারণ তুমি আমার আরতি দি নও—কেবল তাকে নকল করতে চেয়েছো, কিন্তু পারোনি। আর আমার আরতি দি-ই যদি হতে, তাহলে তোমার মাহুকে, ও গো আরতি দি, তুমি কখনো এ কথা বলতে পারতে না, আমাকে আদর করতে, মাহু বলে আমাকে ডাকতে,—আর তোমাকে

আরতি-দি বলতে আজ আমার দিক থেকেও কোনো বাধা আস্তো না।

আমি আর বলতে পারছি না। আমার আরতি দি যে আমাকে মূক করে গেছে। সত্যি, আমার আরতি দি গেল কোথায়? কেন—কেন, একে আমি আরতি দি বলবো? আরতি দি, তুমিই বলো না, কেন আমি একে সে নামে ডাকবো? আরতি দি তুমি ফিরে এসো গো! কেন তুমি সহরে গেলে? লেখা পড়া কি তোমার আজও শেষ হল না? এসো, তুমি ফিরে এসো! আমার কান্না পাচ্ছে। সত্যি আমি কাঁদছি দিনরাত—এরা সকলে কাঁদাচ্ছে আমায়। তুমি তো একদিন বলেছিলে, মানু তোকে কাঁদতে দেখলে আমারো কান্না পায় ভাই। তুমি কি সে-কথা ভুলে গেছো? কিন্তু—কিন্তু আর পারছি নে গো, এরা আমাকে কাঁদাচ্ছে কেবল। তাই বলছি, তুমি এসো, আমাকে নিয়ে তুমি পালিয়ে চলো এখান থেকে সেখানে,—যেখানে থাকবো কেবল আমি আর তুমি, থাকবে ওই আকাশ—কালো মেঘ নয়, থাকবে বড় চাঁদ—তারা নয়, থাকবে হাসি—আমার এ কান্না নয়, আর থাকবে আরতি-দি—আবার বলছি, আর থাকবে তুমি তোমার সেই হাসি সেই কথা নিয়ে, এ নকল আরতি দি নয়। আরতি দি এসো, এসো, এসো! আমি যে আর এক মুহূর্তের জন্যেও থাকতে পাচ্ছিনে গো! এরা আমাকে মেরে ফেললে—বলে একেই তুই আরতি দি বলবি। আমি কেমন করে বলবো তা,—আরতি দি আমার কান্না পাচ্ছে—তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছো না, শুনতে পাচ্ছ না,—অনুভব করতে পাচ্ছ না? আরতি দি, তা হলে তুমি কি সত্যিই পাষাণ হলে?

সাধ যায় হই মর্শুমী-ফুল

শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়

আয় বালিকা, এই বাগানে একটুখানি বোস্,
পোষ্-মাসেতে বস্তে হেতায় নেই তো কিছু দোষ।
আজও সবুজ স্মৃতির ডালে
ভোমর মাতে গানের পালে,
'সুইট্ পী' আর 'অ্যাণ্টিরিনাম্'—ফুটেছে 'কস্মোস্'!
আয় বালিকা, আমার কাছে বোস্।

ঝাপ্সা আলোর মশারিতে আব্ছা নদীর জল,
বুলবুলি কি বল্‌চে এখন আমায় খুকী বল্!
অতীতে ফের বাঁধ্‌তে সেতু
চাইচে যে মন, নাই কি হেতু?
ঘাটের পথে বাজ্‌চে না কি এক যুবতীর মল?
কোথায় হাসি—কোথায় চোখের জল?

শীত এসেছে মোর দেশে যে, বসন্ত নেই আর!
দেবেনা কেউ তোর হাতে আজ বেল-চামেলির হার।
এখন যারা আতর-হারা
রামধনু-তান আন্‌চে তারা,—
মর্শুমী-ফুল দিচ্ছে রঙের রসের উপচার,
নেই যদিও গন্ধফুলহার।

বয়েস গেছে। কেশে কে মোর তুষার-ছবি আঁকে।
শোন্ বালিকা, মন তবু চায় হিমেল চাঁদিমাকে।
সুবাস-হারা হৃদয় ব্যাকুল
সাধ যায় হয় মর্শুমী-ফুল,
শীতের ক্ষণিক আলোয়, কোলে রাখ্‌বেনা কি তাকে?
ফিরিও নাকো হিমেল চাঁদিমাকে।

মাণিকজোড় লরেল-হার্ডি

লরেল

ষ্টান্ লরেল্ বলিতেছেন—শীতকাল। আমি নূতন চাকরিতে ঢুকিয়াছি, কাজেই বাসের বাহিরে বসিতে হইল। দুই হাত গরম রাখিবার জন্ম হাতে রাখিলাম অগ্নিসিদ্ধ গরম আলু। হাত গরম রাখা এবং সেই সঙ্গে রাত্রির অভিনয়ের পর আহার—উভয় কার্য্য চলিবে ঐ গরম আলুর কৃপায়। সে রাত্রে আমার হাত গরম ছিল—উৎসাহের আনন্দে। অভিনয়কালে আমার কাজ ছিল, হাতে একখানি পাউরুটি রাখিয়া তাহা কাটা। ভয়ে ভাবনায় আমি সেটাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কাটিলাম—স্পিরোল-এর ভঙ্গিতে। তারপর অভিনয়কালে সে রুটী টানিতে তার আকার হইল কন্সার্টিনা বাজনার মত। ব্যাপার দেখিয়া দর্শকেরা হাসিয়া খুন!

যাই হোক। আমি বেশ জনপ্রিয় হইলাম। তখন ওভার-কোট কিনিলাম, বড় কলার কিনিলাম। তখনকার দিনে পেশাদার বড় অভিনেতাদের এই ওভার-কোট ও কলার ছিল ফ্যাসন।

কিন্তু আমার এ খ্যাতি গৌরব আনন্দ দীর্ঘকাল টিকিল না। চার পাঁচ রাত্রির অভিনয় চুকিলে এক দিন চার্লি চ্যাপলিন আসিয়া হাজির। কোম্পানী তাঁকে এ ভূমিকা গ্রহণে রাজি করাইয়াছে। তিনি আসিয়া এ ভূমিকা গ্রহণ করিলেন—আমি সাজিলাম নগণ্য অনুচর। তাহাতেই খুসী থাকিতে হইল। নিরাশ হইয়াছিলাম, কিন্তু জীবনে এমন নৈরাশ্য অনেককেই সহিতে হয়।

অবশেষে একদা সুদিন উদয় হইল। কার্নো কোম্পানীর আমেরিকান ম্যানেজার আলফ্রেড রীভস আসিয়া দেখা দিলেন—বলিলেন, তিনি একটি সম্প্রদায় লইয়া মার্কিণ যুক্তরাজ্যে দিগ্বিজয়ে বাহির হইতে চাহেন। তিনি বাছিয়া লইলেন এ প্রস্তাবিত সম্প্রদায়ে আলবার্ট অষ্টিন, চার্লি চ্যাপলিন এবং আমাকে।

মার্কিণ মুলুকে চলিয়াছি—আনন্দে আমি দিশাহারা হইলাম। মাহিনা পাইব সপ্তাহে চার পাউণ্ড হিসাবে! আনন্দে আত্মহারা হইবার কথা! তখন জানিতাম না, মার্কিণ মুলুকে জীবিকা-নির্ব্বাহে ব্যয় বড় বেশী। এবং সব চেয়ে বিচিত্র কথা এই যে আমরা তিন জনে সে দিন কল্পনা করি নাই যে, এক দিন হলিউড হইবে আমাদের তিন জনের চিরদিনের আবাস।

মালবোটে চড়িয়া আটলাণ্টিক পার হইয়া আসিলাম নিউইয়র্কে। ৩১নং ষ্ট্রীটে এক বোর্ডিং হাউসে আশ্রয় মিলিল। শয়ন কক্ষের বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া ঘরে গিয়া শয়ন করিলাম। ভাবিয়াছিলাম, বোর্ডিংয়ের দাসী ইংলণ্ডের চিরাচরিত প্রথায় জুতা সাফ করিয়া রাখিবে। কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দেখি, সর্ব্বনাশ! জুতা চুরি গিয়াছে। এখানে ও রকম ভাবে জুতা সাফ করিবার রীতি নাই। পায়ে জুতা আঁটিয়া পথে কোন কাস্ত্রী জুতা-পালিশ ওয়ালার দ্বারা জুতা পালিশ করাইতে হয়।

জুতার জন্ম শোকার্ত্ত হইলাম কিন্তু শোক করিবার সময় নাই। রিহার্শাল আছে—কার্পেটের শ্লীপার পায়ে আঁটিয়া রিহার্শালে গেলাম।

তার পর সেখানকার কলোনিয়াল থিয়েটার-গৃহে আমাদের নূতন প্রমোদ-নাট্যের প্রথম অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল।

রাজ্যের খবরের কাগজওয়ালারা পিছনে লাগিয়াছিল। তারা আমাদের কটুকাটব্য করিয়া কাগজে লিখিয়া দিল—ইংলণ্ড হইতে কতকগুলা কাজিল ইংরেজ আসিয়াছে—তারা যা তা ভাঁড়ামি করিয়া মার্কিণের পয়সা লুটিতে চায়। সাবধান! ভাই মার্কিণ-জাত, ও অভিনয় দেখিতে গিয়া পয়সা জলে ফেলিও না। এ লেখা ছাপানর ফল ফলিল আশ্চর্য্য রকম! দর্শকের দল সুবোধ গোপালের মত সে অনুরোধ পালন করিল—আমাদের অভিনয় দেখিতে আসিল না। আমাদের সর্ব্বনাশ করিল! কেহ কেহ বলিলেন—নূতন বহি রাখিয়া মার্সিং বার্ডস্ অভিনয় কর। অগত্যা তাহারই একাংশ অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল। নাম দিলাম—এ নাইট ইন দি মিউজিক হল।

থিয়েটার-গৃহ লোকারণ্য হইল—আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। টিকিট বিক্রয়

হইল প্রচুর এবং অবশেষে নিউইয়র্কের শ্রেষ্ঠ রঙ্গগৃহ আমাদের সমাদরে তাদের মঞ্চে স্থান দিল। উক্ত অভিনয়ে ছয় সপ্তাহ ধরিয়া আমরা অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিলাম।

হার্ডি

এবার বলিতেছেন অলিভার হার্ডি—তাঁর কাহিনীর পুনরাবৃত্তি। কার্ণো সম্প্রদায়ে ভিড়িয়া ষ্টান লরেল যখন স্রোতের ফুলের মত ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে, আমি তখন হলিউডে আসিয়া ছবিতে অভিনয় করিতেছি। এ চাকরিতে প্রথম প্রবেশ করি ল্যারি শেমনের মারফৎ। ল্যারি শেমন নগদ ছ'পাউণ্ড দামে ছোট একটি কাহিনীর আইডিয়া কিনিয়া চিত্র রচনায় নামিয়াছিল।

নিউইয়র্কে চিত্রাভিনয়ে হাস্যরসিক বলিয়া আমি খ্যাতি লাভ করিলাম। কাজেই আমি স্থির করিলাম, এ কাজে টিকিয়া থাকিব। ল্যারির মাথায় ঘুরিতেছিল নানা কল্পী। সে বলিল, আমাকে ভিলেন সাজাইবে। আমি বুঝিয়াছিলাম, ভিলেন সাজার চেয়ে হাস্যরসের অভিনয়ে আমার মাথা ভাল খেলে। দর্শকের দল আমার হাস্যরসের ভূমিকায় দেখিয়া আমোদ উপভোগ করে; কাজেই এ দিকটায় আমার খ্যাতি মিলিল।

শুধু আমাকে সাজিতে হইল বাক জোন্সের সঙ্গে একখানি 'ভারী' নাটকে—'ভারী' ভূমিকায়। এ ছবির পরিচালক ভ্যান ডাইক। এই ভ্যান ডাইকই শেষে "হোয়াইট শ্যাডোজ ইন দি সাউথ সী" এবং "থিন ম্যান" ছবি পরিচালনা করেন।

কিছু দিন পরে হলিউডে হাল্‌রোচ নামে প্রখ্যাত শ্রীযুক্ত হল রোচ, আমাকে তাঁর ষ্টুডিয়োয় চাকরি দিলেন। তাঁর পরিচালনায় তখন নিপুণা অভিনেত্রী থেডা বারা দুষ্টা নারীর অভিনয়ে বেশ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন—লায়োনেল ব্যারিমুর তখন হল রোচের পরিচালিত চিত্রনাট্যে ছোটখাট ভূমিকায় অভিনয় করিতেন। অসাধারণ প্রতিভাধর এই লায়োনেল। অবসরকালে তিনি ছবি আঁকিতেন—রেখা চিত্র। ভদ্রলোক বাতের ব্যথায় বড় ভুগিতেন। চেয়ারে বসিয়া থাকিতেন—কিন্তু ক্যামেরা চলিবামাত্র তিনি বাত ভুলিয়া আশ্চর্য্য কর্মশক্তিতে শক্তিমান হইয়া উঠিতেন। অভিনয়কালে তাঁকে দেখিয়া কে বলিবে, বাতের ব্যথায় তিনি পীড়িত।

আমার সঙ্গে তখন ভূমিকাভিনয়ে নামিতেন জীন হার্শল্ট, লুইসা কাজেন্দা, জন গিলবার্ট। সেট তৈয়ার হইত মুক্ত প্রান্তরে—গো-চারণ মাঠে, প্রাসাদ-ঘর প্রভৃতি তৈয়ার হইত। সুতরাং ষ্টানের চেয়ে বহু পূর্ব্বে আমি নামিয়াছি ফিল্মরাজ্যে।

লরেল

আবার ষ্টান লরেল বলিতেছেন, কার্ণো সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে একদা আমি আসিলাম লস এঞ্জেলসে। ফিল্মের দিকে আমার ঝোঁক ছিল না—মোটেই না এবং হলিউডের কথা আমার মনের কোণেও কোন দিন স্থান পায় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, আমার তখন মনের
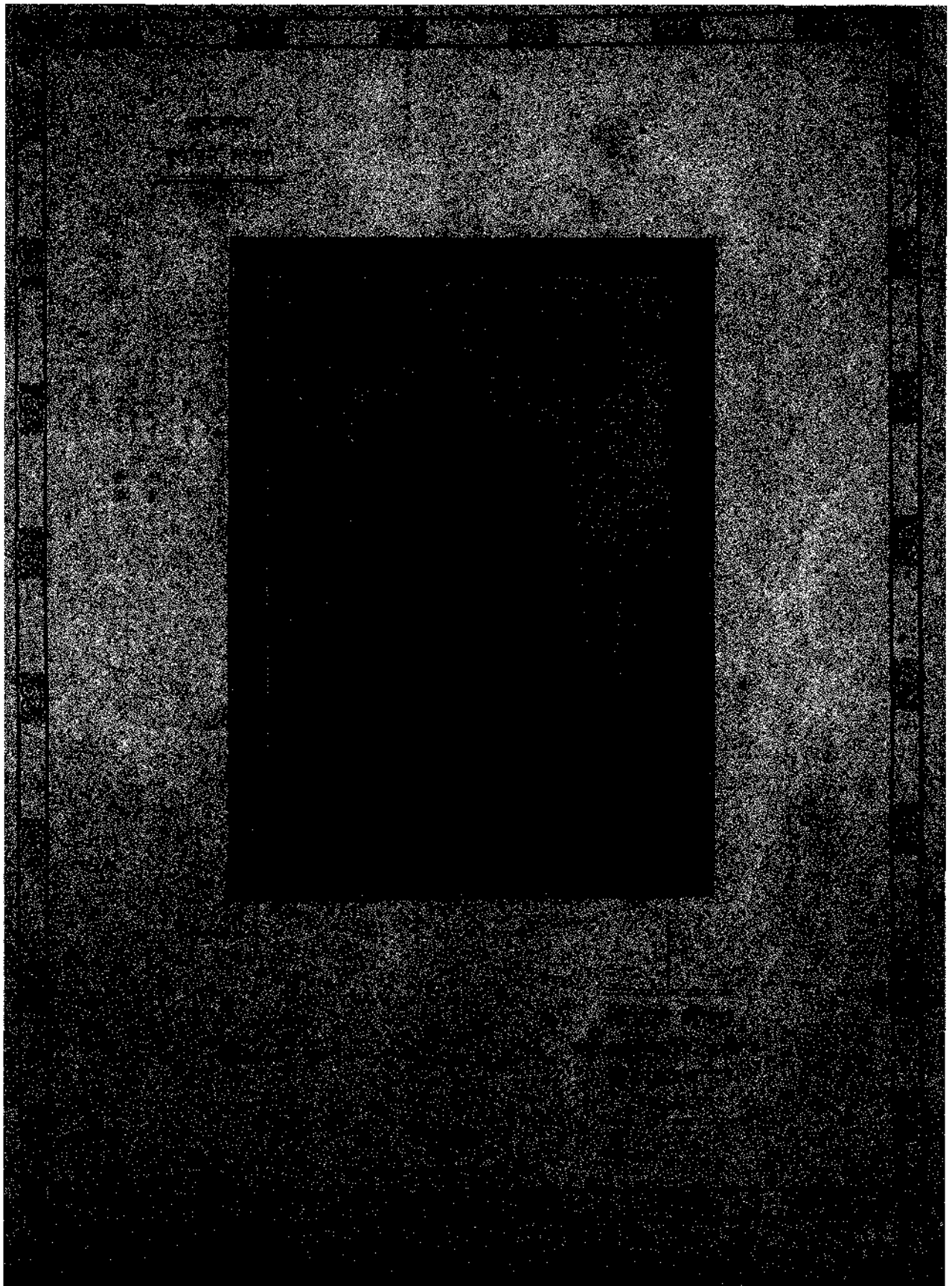
অবস্থা এমন যে প্রতিক্ষণে ভাবিতেছি, আমেরিকা ত্যাগ করিতে পারিলে বাঁচি! এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে দেহে মনে শ্রান্তি ধরিয়াছিল—দেশে ফিরিবার জন্য আমার আকুলতার সীমা ছিল না। আমাদের দলের আর্থার ড্যাণ্ডো নামক আর একজন অভিনেতার মনের অবস্থা হইয়াছিল ঠিক আমার মত। দু'জনে বসিয়া মতলব আঁটিতাম—কি করিয়া মার্কিণ মুলুক ত্যাগ করিব। ভাবিতাম, ইংলণ্ডে কোন প্রমোদ এজেন্টের সঙ্গে চালি ধাপ্পার চাল—সংবাদ দিই, আমরা মার্কিণ মুলুকের সবচেয়ে বিখ্যাত রঙ্গাভিনেতা। এমনই সঙ্কল্প আঁটিয়া চিঠির কাগজ ছাপিলাম, নাম ছাপিলাম "বার্টো ব্রাদার্স"—এবং চিঠির কাগজে এক গাদা থিয়েটারের নাম ছাপিয়া দিলাম—ছাপিলাম এ সব থিয়েটারে অভিনয় করিয়া অসাধারণ সাফল্য অর্জন করিয়াছি। এই কাগজে চিঠি লিখিয়া ইংলণ্ডে বহু এজেন্টকে পাঠাইতে লাগিলাম, যদি আমাদের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট করে।

ফন্দী খাটিল। জাল বাহিনায় বহু জায়গা হইতে আমন্ত্রণ আসিল। এ সময় আমার ব্যাঙ্কে মজুত নগদ ষাট পাউণ্ড। কাজেই ফিলাডেলফিয়ার কার্ণো কোম্পানীর সহিত সম্পর্ক ঘুচাইলাম। ট্রেণে চড়িয়া আসিলাম নিউ ইয়র্কে এবং সেখান হইতে ডেকের যাত্রী হইলাম 'লুসিটানিয়া' নামক জাহাজে।

ইংলণ্ডে আসিয়া ড্যাণ্ডো মার্কিণ পোষাক পরিল, মার্কিণ উচ্চারণে কথা কহিতে লাগিল—দু'জনে বাহির হইলাম, কথাবার্ত্তা কহিত ড্যাণ্ডো—আমি ছিলাম নিস্তব্ধ সহচর। আমাদের চাকরি মিলিল—বেতন সপ্তাহে চল্লিশ পাউণ্ড হিসাবে। মার্কিণ মুলুকে পাইতাম সপ্তাহে চার পাউণ্ড—এখানে একেবারে চল্লিশ পাউণ্ড। এগ্রিমেন্ট সহি করিবার সময় আনন্দে বিস্ময়ে হাত কাঁপিতেছিল।

রিহার্শাল সুরু হইল এবং প্রথম রাত্রের অভিনয়ে জয় জয়কার পড়িয়া গেল—দু'জনের সংযোগে অভিনয় হইল সোনায় সোহাগা। কিন্তু এ মিলন টিকিল না। অচিরে দু'জনে বাধিল তর্ক এবং বিরোধ—তার ফলে ঘটিল বিচ্ছেদ এবং আমি পুরা একটি বৎসর চাকরিশূন্য বেকার বসিয়া রহিলাম।

আষাঢ়ের প্রথম দিবসে

(বড় গল্প)

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জীবনের গতি ঘুরল আবার, নিয়তির রথে ছুটল আয়ু, কাল সমুদ্রে মিলিয়ে গেল কয়েকটা বছরের বুদ্বুদ, প্রেমের 'পরে নেমে এল হৃদয়ের যবনিকা। আকর্ষণের সন্তোষীমায় এখন অন্তের খেলা, কমলদল এবার বোধ হয় পাপড়ি মুদবে, প্রথম আলোকের রেশ সামান্ত মৌখিকতায় দাঁড়িয়েছে, আত্মীয়তার চেয়ে বেশী এখন প্রতিবেশীত্ব।

প্রভাতের সূর্যোদয় এখন প্রদোষের ছায়ান্ধকার, সকল বস্তুর মত এ জিনিষেরও যে স্বাভাবিক মৃত্যু আছে তা' বোধ হয় জানা ছিল না আগে—জানা ছিল না যে জীবনে বসন্ত আসে একবার, তার পরে যা' ঘটে সেত শুধু নিছক পুনরাবৃত্তি।

মৃণাল আর সে-মৃণাল নেই, তার দেহ-বৃন্তে এমন কাঁটার লীলা, যা শুভ্র, যা রূপজ সেই শোভন পরিণতি থেকে সে যেন কোথায় ছিটকে পড়ল, তার প্রতি আর একজনের মোহ এখন কেটে গেছে।

জীবনের রঙ্গমঞ্চে একা রবিদা'। এর আকর্ষণের স্রোতে কেউ কেউ এসেছিল ডুব দিতে। তবু মৃণালের স্থানে আর কেহ প্রতিষ্ঠিত হল না। শুধু বিগত পৃষ্ঠা-গুলোকে উল্টে উল্টে দেখি, আর ভাবি তাকে কি কিছুতেই ফিরিয়ে আনা যায় না?

মনে পড়ে কিছুদিন আগেও মৃণাল এক সন্ধ্যায় সন্ধি করতে এসেছিল, বলে-ছিল—কি রবিদা', এখনো কি আমি তোমার কেউ নই; আর একজনের জন্ম এখনো কি তুমি দূরে থাকবে? প্রশ্নের দিকটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম—মৃণাল, তুমি কি অন্যরকম হয়ে উঠতে পার না? ও অপরূপ গ্রীবা ভঙ্গিমা করে জবাব দিলে—ও কথা তোমার সাজেনা রবিদা', আমাকে তুমি কী দিলে? আমার ব্যথা কি এক-বারও ভেবে দেখেছ? শুধু করেছ স্বার্থপরের মত নীতিবাদের বুজরুকী।

কথাটা প্রাণে লাগল, তাই বললাম—তোমার কাছ থেকেই বা আমি কী পেয়েছি মৃণাল?

কি চাও তুমি?

মনে হল বলি—চাই অনেক কিছু মৃণাল, চাই তোমায় সার্থক করতে। কিন্তু তা' না বলে শুধু জানালাম—সে কি তোমায় বলে দিতে হবে?

হ্যাঁ বলে দিতে হবে, অত লজ্জা কিসের? আমি কি শুধু যেচেই দেব, তুমি জোর করে কি নিতে জান না? বলে ও কিসের জন্যে যেন অপেক্ষা করলে, তারপর চলে গেল।

গেল বটে, কিন্তু পরের দিন একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলে। তাতে লিখেছে—

রবিদা,

প্রথমে বলি পাওয়া না পাওয়ার কথা। রাত্রে ঐ অবস্থায় কেউ কাউকে যেচে প্রাপ্য জিনিষ দিতে পারে না, সেটা আদায় করে নিতে হয়। আমার দিক থেকে কোন বাধা ছিল না, এবং কখনো থাকবেও না—অনায়াসে কাল রাত্রে তোমার সমস্ত প্রাপ্য পেতে পারতে। থাক্, এর জন্যে আর আমায় কখনো দোষ দিও না।

এ'প্রকারে 'আর' কতদিন কাটবে? তোমার ত বলা অনেক কিছু বলবার আছে, কিন্তু আমার কথাটা ত একবারও ভেবে দেখলে না? সবই যেন তুমি ভুলে গেছ! তুমি বড় নিজেকে লুকিয়ে রাখ, তোমার মত আমি কিছু লুকিয়ে যাব না, একদিন সব জানাব—একেবারে জানাব।—মৃণাল।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, কিন্তু আমার কী করবার আছে? ও চলেছে অন্য পথে, দেহ বিলাসই ওর কাম্য, আমার সাথে ওর আর মিলবে না। যে জিনিষ গেছে, যে বসন্ত হারালো, তাকে আর চলবে না ফিরিয়ে আনা।

মাঝে মাঝে ও এসে আঘাত দেয়, সব সহ্য করি। বলে, আর একজনের জন্যে এই যে তুমি উদারতা দেখালে, সেটা হল তোমার নিছক স্বার্থপরতা।

আশ্চর্য্য হয়ে জবাব দিই—একে তুমি স্বার্থপরতা বলো মৃণাল?—হ্যাঁ, তাই বলি। সংযমের বুজরুকী করে ও শুধু সহজ নাম কেনার ফন্দী, আসলে তোমার দেবার শক্তি নেই, নেবার সাহসও নেই।

এ রকমটি কখনো ভেবে দেখিনি, তাই একথাটা অত্যধিক আশ্চর্য্য লাগে। মন বিভ্রান্ত হয়, মাথার ভেতর যেন চিন্তের দাপাদাপি শুরু হয়। নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে তবু বলি—এ তুমি বুঝবে না মৃণাল, তোমার [illegible] এ [illegible] কোনো [illegible]।

[illegible] এক[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] দেখা হবে এই পত্রবাহকের হাতে লিখে জানিয়ে দাও। বিশেষ দরকার।—মৃণাল।

ওরকম কাকুতি প্রকাশ কখনো দেখিনি, তাই তখনি ওর কাছে গেলাম। চোখে পড়ল ওর অসহায় চেহারা, অনেক ভাবনায়, অনেক দুঃখে তা' যেন মর্মান্তিক ভাবে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। আমায় দেখে ও ওর অশ্রুভারাক্রান্ত ধরাগলায় বলে উঠল—রবিদা', তোমার জন্যেই কি আমায় এত অপমান সইতে হবে? তুমি কি আমায় বাঁচাতে পারো না?

আশ্চর্য্য হয়ে শুধালাম—কেন, কি হ'ল?

আমাদের গোপন সম্পর্ক তোমার 'আর একজন' টের পেয়েছে, সে আজ যাচ্ছে তাই করলে। এখন কি করব বলে দাও।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জানালাম—এখন আর কিছু করবার নেই মৃণাল।

ও একটা যেন আঘাত পেয়ে বললে—করবার নেই? তুমি আমায় রক্ষা করতে পার না? না, আমার পথে তুমি আসতে পারবে না, তোমার দেহবিলাস তোমায় বাধা দেবে।

এতখানি আঘাত ও আশা করেনি, তাই ও অশ্রু গোপন করে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—এতখানি স্বার্থপর হবে আমি ভাবিনি রবিদা'।

ওর সেই অভিসম্পাত নিয়েই এখন আমার দিন কাটে—

ভূকম্প বিধ্বস্ত ধরিত্রীর মত মাঝে তা' অন্তরকে নাড়া দেয়, বিরহ লাঞ্ছিত বক্ষ হতে মধ্যে মধ্যে যেন হয় বেদনার রক্ত-বমন, তবুও সব নীরবে সহ্য করি। সহ্য করি আর দেখি—মৃণালের বেষ্টনীর স্রোতরেখা আমার তট হতে সরে গেল, মাঝখানে সৃষ্টি হল ধূ ধূ বালুর জলহীন খরতপ্ত মরুদেশ! তারই অপর পারে আকর্ষণের শেষ-লীলায় উন্মত্ত মদির ফেনা; লেখাশুলেখার আরক্তিম গোধূলির মাধুর্য্যের মত। এ-প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকি মরুচারী অশান্ত পথিক, প্রেমহীন, তৃপ্তিহীন, শান্তিহীন আকণ্ঠ-পিপাসা বাধে এসে

অতৃপ্তির জর্জর বন্ধনে! দাঁড়িয়ে দেখি ওপারে মৃণালের সেই অন্তের খেলা, নিমজ্জিত্মান রূপবহ্নি, রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত, পঙ্কহীন। তারপর হয়ত মাঝে গাঢ় কাল মৃত্যুর তমসা, অন্ধকারের ঘনকৃষ্ণ যবনিকা আস্তে আস্তে বুলিয়ে দেয় বিস্মরণীর প্রেতশীর্ণ উত্তরীয়; বাণীহীন, বিষণ্ণ, বিধুর। রেখে যায় অতিকষ্টে সেইখানে বিদ্রোহবিক্ষুব্ধ অকথিত এই কথা—আমরা অতৃপ্ত, বুভুক্ষু; কী পেলাম? কী লাভ হল এই ব্যবধানের অচলায়তন অবরোধে? হে প্রেমের দেবতা, পাষাণস্তূপ গিরিশৃঙ্গের মাঝে তুমি আছো উপলমুখরা নির্ঝরিণীরূপে, সীমাহীন সসাগরা প্রান্তরে তোমার প্রকাশ দিগন্তকোণে চুম্বনেচ্ছু অনন্ত নভোসীমায়, ফুলরাজ্যে রজনীগন্ধা, জুঁই চামেলীদল ঘোষণা করে তোমার মহিমার অপরূপ জয়বার্তা। তবুও হে বিরাট, হে দুর্জ্জের, আমাদের ললাটে যে অতৃপ্তির ক্ষত চিহ্ন এঁকে দিলে, তার অঙ্কে ভবরাজ্যের অধিবাসী আমি নগরধারের শান্তি কোলাহলকে ভারাক্রান্ত করলাম পুঞ্জীভূত বেদনার মেঘে, ক্ষোভের নিঃশ্বাসে। আর রেখে গেলাম এই পৃথিবীর তৃপ্তিহীন মরুদেশে মৃণালের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসা, স্বার্থহীন, মৃত্যুহীন, অম্লান, অকলঙ্ক।

ক্ষয়পাণ্ডুর অভিশপ্ত জীবনের কাছে আবার এসেছে সেই নববর্ষা, সেই আষাঢ়ের প্রথম দিবস, সেই মেঘপুঞ্জের জনতা, বৃষ্টির মাতামাতি। এ দিনটি আমার কাছে স্মরণীয়, এদিনটিতেই আমি মৃণালকে প্রথম পেয়েছিলাম, ব্যবধান যতই রচিত হোক এটিকে কেউই ভুলিনি।

তাই আশা ছিল মৃণাল আজ আসবে, বলবে হেসে—শ্বশুর'পর হয়ে যাই রবিদা' এদিনটির অমর্য্যাদা কিছুতেই করব না।

অপেক্ষাতে কাটল সকাল, কাটল দুপুর বিকালও কেটে গেল, গড়ালো রাত্রি! তবু কারও দেখা নেই, কেউই এল না। ও বোধ হয় আমায় একেবারে ভুলে গেছে!

বাইরে টিপিটিপি বৃষ্টির মাতামাতি চলেছে, তারই ঠাণ্ডা হাওয়ার পরশ লেগে একটু বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যেন চোখে পড়ল মৃণাল এক প্রমোদ সভায় আনন্দে মত্ত হয়েছে, ওর চারিধারে ভোগবিলাসের সফেন তরঙ্গমালা। আমায় দেখতে পেয়ে ও যেন একটু হেসে বলল—আমার পরিণতি দেখতে এসেছ রবিদা'? আমি ঘাড় নেড়ে বললাম—হ্যাঁ মৃণাল, ওপথে নয়, ওপথে নয়, তুমি অন্য পথে বড় হয়ে ওঠ।

দৃশ্য পাল্টালো, আবার যেন দেখলাম মৃণাল আমার দরজায় এসে আঘাত করছে, যেন বলছে—আজকের দিনটাকে কি ভুলে গেলে রবিদা'?

ঘুম ভেঙ্গে গেল, ধড়মড় করে উঠে বসলাম। চীৎকার করে সকলকে বললাম তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না, বাইরে যে কে ডাকছে।

ওরা বাইরে ঘুরে এসে বললে—কই কেউ ত নয়' ওত শুধু ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁঝিঁর আওয়াজ।

বৃষ্টি! শুধুই কি বৃষ্টি! থাকতে পারলাম না, বেরিয়ে পড়লাম মৃণালদের বাড়ীর উদ্দেশে। খানিকদূর যেতেই চোখে পড়ল ওদের বাড়ীর গেটে একটা মোটর গাড়ী দাঁড়িয়ে, মৃণালকে একটা র‍্যাপার দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে তার ভেতর থেকে আর একজন নামল। এতরাত্রে ওরা বোধ হয় থিয়েটার দেখে ফিরছে।

ফিরে এসে নিজের বিছানায় মাতালের মত শুয়ে পড়লাম। রাত সব চুকে গেছে।

কিন্তু একি! খানিক পরে কে ঐ ডাকছে! মৃণালের কণ্ঠস্বর, আমি সাড়া দিলাম না।

ও সোজা ঢুকে এসে আমার দরজা চাপড়ে আমায় ডাকল—রবিদা, ও রবিদা'?

তবুও আমি সাড়া দিলাম না, আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে।

বাঃ বেশ লোক যা হোক ত। আজকের দিনটাকে কি ভুলে থাকতে হয়। এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে?

আমি নির্বাক, নিঃশব্দ, বেপথুমান। সাড়া না পেয়ে খানিকটা অপেক্ষা করে ও ফিরে গেল। আমার চোখ দিয়ে তখন অশ্রু নেমেছে। বাইরে আষাঢ়ের প্রথম দিবস তখনো কাঁদছে।

"ভারতে সমবায়ে বেচাকেনা"

শ্রীললিত মোহন হাজরা

[illegible] দেশের কো-অপারেটিভ মার্কেটিং-কে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করতে পারা যায়—যেমন কৃষি সম্পর্কীয় এবং কৃষীতর শিল্প-সম্পর্কীয়। আমাদের দেশ কৃষি প্রধান দেশ—শতকরা ৭২ জন কৃষির উপর নির্ভর করে। সুতরাং কৃষি সম্পর্কীয় সমবায়ই আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে 'আধ-পেটা' খেয়ে দিনের পর দিন কাটায় লক্ষ লক্ষ লোক। আর এরাই হচ্ছে দেশের কৃষক। মধ্যবর্ত্তী কারা তাই বলা যাক। মধ্যবর্ত্তী হচ্ছে দেশের 'আড়ৎদার, দালাল, ও ফড়িয়া' যারা নিজের জন্তে এই বিশাল ভারতটীকে রসাতলে দিতে বসেছে। আগেই বলা হয়েছে যে দেশে যদি সমবায়-নীতি অবলম্বনে বেচাকেনার চলতি হয় তা হলে এই নিরীহ কৃষক সম্প্রদায়কে এমনি ভাবে দোটানায় পড়ে প্রাণ হারাতে হয় না। আর এই নিঃস্ব সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতিতে দিন দিনই গড়ে উঠতে পারে [illegible] গা [illegible] উৎপন্ন [illegible] সুবিধা হলে [illegible] এই সমবায় [illegible] থাকতে পারে। [illegible] লোকদের [illegible] য়েছে। আর [illegible] লো ও বড় বড় ব্যাবসায়ীরা নিজেদের ইচ্ছামত বাজার কমিয়ে দিয়ে দেশের উৎপন্ন ফসল্ এই নিঃসহায় কৃষকদের কাছ হতে কিনে বিদেশে চালান করে দিন দিনই নিজেদের পকেট বোঝাই করছে। কৃষকেরা হাচুক আর মরুক সদিকে লক্ষ্য নেই, তাদের হাতে টাকা আসলেই হলো। এই সব বড় বড় ব্যবসায়ীদের গাইড বা 'সঙ্ঘ' রয়েছে কিন্তু এই সবহারাদের রক্ষা করার কেউ নেই। এদের না আছে কোন সমিতি না আছে কোন নিজেদের মধ্যে একতা। যেখানে শিক্ষার আলো প্রবেশ করতে পারে নাই সেখান হতে এর চেয়ে বেশী কিছু আশা করা বৃথা। ক্রেতাদের সঙ্গে এদের কোন চাক্ষুষ আলাপ নেই বা পত্রাদি বিনিময়ে মাল পাঠাবার কোন ব্যবস্থাই নেই। এই কৃষকদল যদি সমবায়-মত সঙ্ঘবদ্ধ হয় ও একত্রে কাজ করে তা' হলে তারা নিজেদের লাভমত দরেই মাল বিক্রী করতে পারে। সুখের বিষয় ভারতের কৃষকদের মধ্যে সমবায়-নীতি অবলম্বনে কেনাবেচার আন্দোলন দেখা দিয়েছে।

এ আন্দোলন সর্ব্বপ্রথমে দেখা দেয় ব্রহ্মদেশে আর সঙ্গে সঙ্গে সেটী কার্য্যকরী হয়ে উঠে। এখানে কেবলমাত্র ধান চাল বিক্রীর জন্তে কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি কাজ করে। ধানকাটার সময়ে এই সমিতির কাজ আরম্ভ হয়। আবার মাস চারেকের পরে বন্ধ হয়ে যায়। ব্রহ্মদেশের পর এই আন্দোলন দেখা দিল বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে। এখানে কেবল মাত্র তুলার ব্যবসায়ের সুবিধার জন্তে এই সমিতি গড়ে উঠেছে। এখানকার কার্য্যকলাপ সারা ভারতের চোখ [illegible] ১৯৩০ খৃঃ অব্দে এখানে ২৫টী কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটী গড়ে উঠেছিল ও ঐ বৎসরের সমিতিগুলির কাজ হয়েছিল পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকার উপর। পুণার গুড়ের বিরাট ব্যবসায় আছে। সেখানে

অর্থ সঞ্চয়ের বিড়ম্বনা

অর্থ সঞ্চয় করা, জগতের বিখ্যাত উভয় সঙ্কটগুলির অন্যতম। করিলেও রক্ষা নাই ; না করিলে আরও অধিক বিপদের সম্ভাবনা। রোজ আনি রোজ খাই, কথাটি শুনিতে ভাল। কিন্তু ইহার সহজ সরল [illegible] আড়ালে রহিয়াছে আর একটি কথা। কথাটি সত্য, কিন্তু আশার বা আনন্দের বাণী নহে। রোজ আনি রোজ খাই—অর্থাৎ রোজ না আনিলে রোজ খাইবারও পথ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ! সরল সহজ জীবনযাত্রা ও কাব্যপ্ররোচিত "উদাত্ত"মনা ভাব, [illegible] পেটে ঠিক উপভোগ্য নহে। এই জন্য পৃথিবীর সকল দেশে, সকল অবস্থার লোকই সঞ্চয়প্রার্থী। সঞ্চয়ই বিপদের আশ্রয়, দুর্দিনের বল, দুরবস্থার সম্বল, বার্দ্ধক্যের অবলম্বন। এহেন সঞ্চয়ের গুণগ্রাহী আমরা সকলেই। কিন্তু মুস্কিল এই যে, সঞ্চয় যতই [illegible], কর্পূরের মত হাওয়ায় মিলাইয়া যায়। সঞ্চিত অর্থের প্রধান জাতিগত দোষ এই যে, তাহার পরিমাণ যতই বাড়ে, তাহা অকস্মাৎ লোপ পাইবার আশঙ্কাও সমানে বাড়িয়া চলে! ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিলাম— লোকসান। সুদে খাটাইলাম—অধমর্ণ ফেরার। লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিলাম—চোর ডাকাত ইত্যাদি। বন্ধকি তমসুকেও—মামলা মোকদ্দমা হয়রাণ।—অথচ নিঃসম্বল থাকাও চলে না।

যদি কখন রোজগার বন্ধ হইয়া যায়, যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়, যদি কখন অনেক টাকার প্রয়োজন হয়—হইবেই, কেননা জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, এ সব ত ঘটিবেই, খরচও হইবেই— বিনা সঞ্চয়ে অর্থ কোথা হইতে জুটিবে? নগদ সঞ্চয়ে বিপদ ; তাছাড়া উপায়ই বা কি আছে? আছে। আজকাল বীমাতে টাকা রাখবার বহুবিধ উপায় আছে। এমন বীমা হয় যাহাতে হঠাৎ মৃত্যু ঘটিলে, বাৎসরিক অল্প অল্প টাকা দিয়া, দুর্দ্দিনে পরিবারের জন্য বহু অর্থের ব্যবস্থা করা চলে। যথা মাসিক ২০।২৫ টাকা ব্যয়ে, মৃত্যু ঘটিলে বা জীবদ্দশায়, নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে পর, পাঁচ হাজার হইতে সাত হাজার টাকা পাইবার ব্যবস্থা করা যায়। কন্যার বিবাহ, পুত্রের উচ্চশিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থাও বীমার সাহায্যে করা চলে। বীমার টাকা বিনা "প্রোবেটে" বিনা "ষ্ট্যাম্প" খরচায় পাওয়া যায়। বীমায় খাটান অর্থ অপরের কবলে পড়ার আশঙ্কা নাই। পত্নী, পুত্র বা কন্যার নামে বীমা লিখিয়া দিলে আর নিজেও সে টাকা ভাঙ্গিতে পারিবে না। ক্ষণিকের মোহ বা দুর্বলতা জনিত ব্যয়েচ্ছা বীমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, নগদ সঞ্চয় করিয়া কেহ যথার্থ সঞ্চিত অর্থ অপেক্ষা অধিক কিছু কোন সময়ে পাইতে পারেন না। কিন্তু বীমার ক্ষেত্রে এক কিস্তি "প্রিমিয়াম" জমা হইলেই মৃত্যু ঘটিলে বীমাকৃত পুরা টাকা পাওয়া যায়। আমাদের বহু পরিচিত সূত্রে পাঁচশত টাকা "প্রিমিয়াম" দিয়া দশ হাজার টাকা পাইয়াছে এরূপ উদাহরণ দেখা গিয়াছে।

জীবন অনিশ্চিত, নগদ সঞ্চয় তদপেক্ষা অধিক অনিশ্চিত ও দুঃসাধ্য। এ ক্ষেত্রে বীমাই মুক্তি [illegible]। কোম্পানী লিমিটেড আজ চল্লিশ বৎসর যাবত বীমার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অদ্যাবধি এক কোটী [illegible] কোম্পানী বীমাকারীদের দিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার মজুত তহবিল দুই কোটী কুড়ি লক্ষ [illegible], ইহার মধ্যে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা, ইলেক্ট্রীক কোম্পানীর সেয়ার হাজার লক্ষ টাকা, ইমারতে [illegible] না (সওয়া লাখ টাকা), অন্যান্য সেয়ার বাইশ লক্ষ টাকা, ডিবেঞ্চার তের লক্ষ টাকা, [illegible] হইয়াছে এগার লক্ষ টাকা ইত্যাদি। কোম্পানীর বার্ষিক আয় প্রায় তিরিশ লক্ষ [illegible] টাকায় সকল সুবিধা পাইবেন—ঝুঁকি বা অপব্যয়ের ভয় থাকিবে না। ঠিকানা—[illegible]—কা[illegible] হতে এক লক্ষ টাকা মূল্যেই ও সকল সর্ত্তেই বীমার ব্যবস্থা আছে।